তাফসীরে মাযহারী

তাফসীরে মাযহারী
দশম খণ্ড

ত্রয়োবিংশতিতম, চতুর্বিংশতিতম, পঞ্চবিংশতিতম ও ষষ্ঠবিংশতিতম পারা
(সূরা ইয়া-সীন থেকে সূরা ফাতহ্ পর্যন্ত)

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

আনিসুর রাহমান অনূদিত

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ।

তাফসীরে মাযহারী ঃ কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদক ঃ আনিসুর রাহমান

প্রকাশক ঃ হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

পরিবেশক ঃ সেরহিন্দ প্রকাশন
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ ঃ বিলু চৌধুরী

কাতেব ঃ বশীর মেসবাহ্

মুদ্রক ঃ খন্দকার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ্
নাটোর প্রেস লিঃ
৮৯, যোগীনগর রোড, উয়ারী,
ঢাকা- ১২০৩।
ফোন ঃ ৭১১১০১২, ৭১১৯৪৯০

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০১, জিলহজ, ১৪২১ হিজরী

বিনিময় ঃ তিন শত কুড়ি টাকা মাত্র

TAFSIRE MAZHARI – (10th Volume) Written by Hazrat Allama Kazi Sanaullah Panipathi (Rh.) Translated by Anisur Rahman and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia and distributed by Serhind Prokashan, Dhaka.

Exchange : Taka Three Hundred Twenty only. US$ 20.00

মেঘে মেঘে বেলা বয়ে যায়। হারিয়ে যায় প্রলোভনপরিবেষ্টিত প্রায়ান্ধকার জীবন। অযথার্থ গন্তব্যের দিকে ছুটে চলা মানুষের তবু হুঁশ হয় না। জাগে না অনুতাপের অভিঘাত। জ্বলে না অনুসন্ধিৎসার অনল। দিন কাটে, রাত্রি কেটে যায়— সাময়িকতায়। সাম্প্রতিকতায়। অনাবশ্যক ব্যতিব্যস্ততায়। আত্মঅত্যাচারে। আত্মবিনাশের আয়োজনে।

তবুও থামে না মানুষ। ভাবে না, কে আমরা? কোথা থেকে এসেছি? যাবোই বা কোথায়? জানতে চেষ্টা করে না এই মহাপৃথিবী, এই মহাজীবন ও এই মহাপ্রস্থানের অর্থ কী? অথচ আমাদের চোখের সামনেই প্রতিনিয়ত মরে ঝরে যাচ্ছে পুষ্পের সম্ভার। পাখির কুজন। ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে স্বজন-বন্ধন। ক্ষয়ে যাচ্ছে স্মৃতি-বিস্মৃতি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, তৃপ্তি-অতৃপ্তি। মুছে যাচ্ছে ঋদ্ধি-রোদন, সিদ্ধি-সিদ্ধান্তহীনতা, প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন। আমরা ক্রমশঃই অগ্রসর হচ্ছি অবধারিত অজীবনের দিকে। অনিবার্য অনিশ্চয়তার দিকে। একা। একা একা।

শ্রুতি-দৃষ্টি-অনুভব তবুও আমাদের আড়ষ্ট। অসচল। অজাগ্রত। অথচ বেলা তো বয়েই চলেছে। দিবাবসানও সুনিশ্চিত। সুনিশ্চিত মহাপ্রলয়। মহাপুনরুত্থান। মহাবিচারের দিবস। কী জবাব হবে তখন আমাদের, যখন প্রশ্ন করা হবে, কেনো জ্বালাওনি দীপ বিশ্বাসের, যথাসময়ে? কেনো দাওনি সাড়া, যথা আহ্বানে, আমার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের। তোমাকে তো দেওয়া হয়েছিলো যথেষ্ট সময়, আত্মশোধনের। খুলে রাখা হয়েছিলো তওবার তোরণ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। তুমি তো মহামূল্যবান মানবজীবন পেয়েছিলে আমারই দয়ায়, দানে, অনুকম্পায়। পেয়েছিলে শ্রুতি, দৃষ্টি, বোধ-বুদ্ধি, জীবনোপকরণ। তবুও যথাকালে কেনো উদ্বোধন ঘটাওনি আত্মদর্শনের, সত্যদর্শনের?

অতএব পৃথিবীর পথচারীরা! থামো। সচকিত হও। এখনই। এই মুহূর্তে। অপথ, বিপথ ও কুপথ ছেড়ে ফিরে এসো মূল পথে। মূল মৃত্তিকায়। মৌলিক আকাশে। স্নাত হও প্রত্যাশিত প্রত্যুষের পবিত্র আলোয়। গ্রহণ করো সর্ববৃহৎ, সর্বমহৎ ও সর্বমহিমময় আকাশাগত গ্রন্থ এই কোরআন। বলো, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতা! আমি জানি, তুমি মমতার মহাপারাবার। পরম মার্জনাপরবশ। অতএব আমাকে স্থিত করো তোমার আশ্রয়ে। আমাকে আচ্ছাদিত করো তোমার মমতা ও মার্জনার নিশরীরি নূরে।

তওবার এ আহ্বান সকলের জন্য। এ আহ্বান হচ্ছে শুভ্রতা, পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার শাশ্বত আহ্বান। অতএব এ আহ্বানকে মান্য করে ধন্য হতে হবে সকলকেই। সাম্প্রতিকতা যাদেরকে বিদগ্ধসমাজ বলে চিহ্নিত করেছে তাদেরকে যেমন, তেমনি তাদেরকেও, যাদের ধর্মাচরণ কেবল আনুষ্ঠানসর্বস্ব। উভয় দলই উন্নাসিক, উগ্র, সাম্প্রদায়িক। সে কারণে অজ্ঞও। ইসলামের পথ সহজ, সরল ও অবিভাজ্য। এর কোনো ডান অথবা বাম নেই। নেই কোনো সমান্তরলতা, কিংবা বিকল্প। তাই আমরা সকলকেই সংযত, সংহত ও সংরক্ত হতে বলি। বলি, হে মহামানবতা! জেগে ওঠো ঔদার্য্যের অভিঘাতে, মহানুভবতার স্পর্শে এবং মহাকল্যাণের স্ফুরণে। আরো বলি, অকৃজ্ঞতায় কোনো সৌন্দর্য নেই, উন্নাসিকতায় নেই মহত্ত্ব। অতএব এসো প্রেমের পথে। জ্ঞানের পরিব্রাজনায়। জ্ঞানকেন্দ্র মহাগ্রন্থ আল কোরআনের তরঙ্গমুখর অতলতায়।

একথা অস্বীকার না করে উপায় নেই যে, কোরআন শিখতে হবে কোরআনের যথাব্যাখ্যা সহকারে। যাঁর প্রতি এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিলো, তিনিই এর ব্যাখ্যা করেছেন সারাজীবন ধরে। কথায়, মৌনতায়, আচরণে, সমর্থনে, নির্দেশনায়। সেই যথাব্যাখ্যার সারাৎসার নিয়েই রচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাফসীরশাস্ত্র। বহুসংখ্যক মনীষী ছিলেন এই মহানশাস্ত্রের সেবক। তাঁদের একনিষ্ঠ পরিচর্চায়, গবেষণায় ও প্রণোদনায় মানুষ তাই সহজে বুঝতে পারে কোরআনের মূল মর্ম ও বক্তব্যকে।

সেই সকল বিরলপ্রজ তাফসীরকারগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠজন যিনি, তাঁর নাম কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী। তিরিশটির অধিক মহামূল্যবান গ্রন্থের সফল রচয়িতা তিনি। তার মধ্যে তাফসীরে মাযহারীতেই বিবৃত ও বিতরিত হয়েছে তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রতিভার অবাক ও নির্বাক করে দেওয়া বিচ্ছুরণ। ভারসাম্যমূলকতা ও ভাবনা-বেদনার যথাঅধিকাররূপে বিকশিত হয়েছে এখানে বর্ণনাসঞ্জাত বিদ্যা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ ও অন্তর্জাত বিদ্যার। মিলিত হয়েছে রেওয়ায়েত, দেরায়েত ও ফেরাসাত। সম্ভবতঃ এরকম শিখরস্পর্শী অভিজ্ঞানের সমীভূত সন্নিপাত অন্য কোনো গ্রন্থের নেই। তাই শত শত বৎসর গত হলেও এ মহাগ্রন্থের আবেদন এখনো অভিনতুন। আশা করা যায় এর আবেদন একইভাবে অভিনতুন থেকে যাবে প্রজন্ম প্রজন্মান্তরের জ্ঞানপিপাসুদের অনুসঙ্গে ও আগ্রহে। যতোদিন না বিনাশ হবে আমাদের এই সাধের পৃথিবী। যতোদিন না নিক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হবে নক্ষত্রপুঞ্জ। শুরু হবে মহাপ্রলয়। আমরা তো মনে করি পৃথিবীর সকল ভাষায় অক্ষরান্তরিত হওয়া প্রয়োজন এই কালজয়ী গ্রন্থের। বলতে হয়, বাংলাদেশ বিলম্বেই বুকে ধারণ করতে পারলো এই মহামহীরুহের অনুধ্যানকে, অক্ষরান্তরকে। আর এটাও আমাদেরকে অবাক হয়ে দেখতে হচ্ছে যে, আমরা, খানকাবাসী গুটিকতক ফকির দরবেশ এই মহান নির্মাণকর্মের প্রান্তরিক শ্রমিক। এই সৌভাগ্য আমরা রাখি কোথায়? ভয় শুধু একটাই যে, এই সুবিপুল দানের যথাকৃতজ্ঞতা আমরা প্রকাশ করতে পারবো তো? তবে ভরসা কেবল এই যে, আমরা তো তাঁর সততস্বাধীন অভিপ্রায়ের অনুদাস। আমরা তো আমাদের দিকের কেউ নই। আমরা যে তাঁর। সেকারণেই তো ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে আমাদের সাধ-সাধ্য, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, প্রশ্ন-জবাব, কুণ্ঠা, দোদুল্যমানতা। এভাবেই প্রায় তিনশ বছরের পিপাসিত প্রতীক্ষার পটভূমিতে প্রস্ফুটিত হচ্ছে তাফসীরে মাযহারীর খণ্ড গ্রন্থসমূহ— বিরল কমলের মতো, বিনম্র বসন্তের মতো। আমরা তাই অকুণ্ঠচিত্তে এই স্বীকৃতিটুকু দিতে চাই যে, আমাদের আশ্রয়, প্রশ্রয়, বরাভয়, বিজয়— সবকিছুই তো তোমার দয়া ও দান। অতএব সকল প্রশংসা-প্রশস্তি, স্তব-স্তুতি, গরিমা-গৌরব কেবল তোমার। তোমারই।

হে আমাদের মহামার্জনাপরবশ ও মহামমতাময় আল্লাহ্! হে আমাদের সৃজয়িতা-পালয়িতা-দাতা-বিধাতা-পরিত্রাতা! আমরা অবশ্যই পাপিষ্ঠ, আত্মঅত্যাচারী। আমরা নিচ, নিকৃষ্ট, নিষ্‌দীপ, অনুল্লেখ্য, তুচ্ছ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ। বিনাশ করো আমাদের অহমিকাকে, অন্ধকারকে,

বিভ্রান্তি-উদ্‌ভ্রান্তিকে। আমাদেরকে অনুকম্পায়িত করো। করো তোমার একান্ত ক্ষমাভাজন, নৈকট্যভাজন, আপন। আমাদেরকে বাঁচাও দূরত্বের দুর্ভোগ থেকে, পাপ থেকে, প্রবৃত্তিচারিতা থেকে, সীমাবদ্ধতা থেকে, সীমাকর্ষণ ও সীমামগ্নতা থেকে। আমরা সতত ছুঁয়ে থাকতে চাই তোমার দয়া, ক্ষমা ও দান-অনুদানের অসীমতাকে। পৃথিবীতে এবং পরবর্তী পৃথিবীতে চাই তোমা কর্তৃক প্রদত্ত কল্যাণসম্ভার। আমাদের জন্য। গ্রন্থকর্তা, অনুবাদকবৃন্দ, প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকা, সহায়ক-সহায়িকা সকলের জন্য। আর যিনি তোমার প্রিয়তম জন, তোমার সর্বশেষ বার্তাবাহক অক্ষরের অমুখাপেক্ষী (উম্মি) সেই রসুলের প্রতি বর্ষণ করো সর্বোৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম। ওই মহান বর্ষণে তুমি আরো সিক্ত করো তাঁর অন্যান্য নবী-রসুল ভ্রাতৃবৃন্দকে, তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজনকে, তাঁর প্রিয়ভাজন সহচরবৃন্দকে, আউলিয়ায়ে কেরামকে এবং বিশেষভাবে আমাদের মহান পীর ও মোর্শেদ শায়েখ হাকিম আবদুল হাকিমকে। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

কাযী ছানাউল্লাহ্ পানিপথী ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান জিন্নুরাইনের অধস্তন পুরুষ। ছিলেন ইমামশ্রেষ্ঠ আবু হানিফার মাযহাবের অনুসারী। আর তাঁর আধ্যাত্মিক সংশ্লিষ্টতা ছিলো মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সঙ্গে। তাঁর পীর মোর্শেদ ছিলেন সে জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সিদ্ধপুরুষ মীর্জা মাযহারে শহীদ জানে জাঁনা। তাঁর পীর মোর্শেদ নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী, তাঁর পীর মোর্শেদ খাজা সাইফুদ্দিন সেরহিন্দী, তাঁর পীর মোর্শেদ খাজা মোহাম্মদ মাসুম এবং তাঁর পীর মোর্শেদ হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমেদ ফারুকী সেরহিন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন। এই সিলসিলাই ঊর্ধ্বতন আরো একুশ জন পীর মোর্শেদের মাধ্যমে মিলিত হয়েছে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দীক ইবনে আবু কোহাফার সঙ্গে। তাই মোজাদ্দেদিয়া তরিকার আর এক নাম নেসবতে সিদ্দিকী।

এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই একবার আসে। আবার যথাসময়ে চলেও যায়। চিরচলিষ্ণু সময় এখানে কাউকেই স্থায়ী করে রাখে না। কাযী ছানাউল্লাহ্'র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে তাঁর শুভপদার্পণ ঘটেছিলো ১১৪৩ হিজরী সনে এবং পৃথিবী তাঁকে বিদায় দিয়ে শোকাকুলা হয়েছিলো ১২২৫ হিজরী সনের ১১ই রমজানে। জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বে বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছিলো সংবেদনময়তা ও প্রতিভা। শানিত ধীসম্পন্ন এই মহাপুরুষ মাত্র সাত বৎসর বয়সে স্মৃতিস্থ করেছিলেন সমগ্র কোরআন। এরপর শুরু করেছিলেন অন্যান্য বিদ্যার অনুশীলন। হাদিস শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন পৃথিবীখ্যাত হাদিসবিশারদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভীর নিকট। সতীর্থ হিসেবে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন শাহ আবদুল আজিজ দেহলভীর সঙ্গে। প্রথমোক্তজন বলতেন, 'ছানাউল্লাহ্কে ফেরেশতারাও সম্মান করে'। আর শেষোক্তজন তাঁকে বলতেন 'এ যুগের বায়হাকী'। আর তাঁর প্রাণপ্রিয় পীর মোর্শেদ তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'পথের দিশারী' (আলামুল হুদা)। তিনি আরো বলতেন, 'কী নিয়ে এসেছো'— মহাবিচারের দিবসে আমি এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন হলে জবাবে বলবো, 'ছানাউল্লাহ্কে'।

তাঁর পূর্বপুরুষগণের কেউ কেউ ছিলেন প্রতিথযশা বিচারকর্তা। তিনিও ছিলেন তাঁর জন্মভূমি ও কর্মভূমি ঐতিহাসিক পানিপথ শহরের স্বনামধন্য বিচারপতি। ভারতের সুদীর্ঘকালের মুসলিম শাসন তখন অস্তাচলমুখী। চলেছে সাম্রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবক্ষয়। ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে বিলাস-ক্লান্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো। তৎসত্ত্বেও কাযী ছানাউল্লাহ্ প্রায় একক প্রচেষ্টায় ভারতভূমিতে নতুন করে নির্মাণ করলেন জ্ঞানের অনির্বাণ বাতিঘর। চাঞ্চল্য, চমক ইত্যাকার বহির্জাগতিক প্ররোচনা তাঁকে এতোটুকুও চেতনাভ্রষ্ট করতে পারলো না। তার ফলেই তো সৃজিত হলো— এই অক্ষয় আলোর উৎসব। তিনি দিনের পর দিন রত রইলেন জ্ঞান চর্চায়। আর রাতের পর রাত ভরে তুললেন ইবাদত-উপাসনায়। প্রতিদিন তিনি পাঠ করতেন এক মঞ্জিল কোরআন এবং অতিরিক্তরূপে আদায় করতেন একশত রাকাত নামাজ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি এভাবেই করে নিয়েছিলেন সমৃদ্ধ ও সফল।

তাফসীরে মাযহারীর নামকরণ করেছেন তিনি তাঁর প্রিয়তম পীর-মোর্শেদ শায়েখ মীর্জা মাযহারে শহীদ জানে জানাঁ'র নামানুসারে। এভাবেই তিনি যেমন যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন ইলমে মারেফাতকে, তেমনি যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন ধর্মের পথের প্রকৃত পথিকৃৎ পীর ও মোর্শেদকে। এভাবে জ্ঞান ও জ্ঞানীকে সম্মান প্রদর্শন করাই জ্ঞানের নিদর্শন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যাঁরা এরকম করেন না, তাঁরা জ্ঞানে অপরিপূর্ণ। বিশেষভাবে তাদেরকে এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে আমরা প্রকৃত জ্ঞানের রাজ্যে উদাত্ত আহ্বান জানাই। বলি, প্রকৃত পীর-মোর্শেদের কাছে বায়াত হতে এবং সর্বশেষ ও সর্বসহজ তরিকা খাস মোজাদ্দেদিয়া গ্রহণ করতে। সংবাদ পৌঁছানোই তো বাহকগণের দায়িত্ব।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাগণের জ্ঞাতার্থে জানাই, এই খণ্ডের সুরা ইয়াসিনের অবশিষ্টাংশ ছিলো পূর্ববর্তী খণ্ডভূত। সেখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এই সুরা আনা হয়েছে এখানে। যুথবদ্ধতাই যেহেতু আমাদের মূল প্রেরণা ও প্রয়াস তাই এরকম সামান্য রদবদল নিশ্চয় অসিদ্ধ কোনো-কিছু নয়। আর অনুবাদকগণ তো সকলেই এই নগণ্য দরবেশের আত্মিক আত্মজ। তাই এই খণ্ডের অনুবাদকসহ সকল অনুবাদকই তার প্রিয়জন ও আর্শীবাদভাজন। আল্লাহ্পাক দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন তাঁদেরকে এবং তাঁদের আপনজনগণকে। আমিন।

দিল্লীর নাদ্ওয়াতুন মুসান্নিফের পরিচালক মাওলানা আবদুদ্ দাঈম কর্তৃক উর্দু অনুলিপি থেকে চলেছে আমাদের এই অনুবাদ। অবশ্য পাশাপাশি মূল আরবী অনুলিপি দেখেও আমরা সম্পন্ন করেছি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা। এভাবে আমাদের অনুবাদকে করতে চেয়েছি বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাগণের মননানুকূল। আর আয়াতের সরাসরি বঙ্গানুবাদ আমরা উদ্ধৃত করেছি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের 'কুরআনুল করীম' থেকে।

সর্বশেষে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের প্রতি উপরোধ— কোথাও অনবধানতা কিংবা ত্রুটি নয়নগোচর হলে জানাবেন। আমরা তাহলে সংশোধিত হতে পারবো দোয়া ও কৃতজ্ঞতা সহকারে।

শান্তিবারতা— পরিসূচনায় ও পরিসমাপ্তিতে।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, পাগলাবাজার, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

ত্রয়োবিংশতিতম পারা— সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ২২—৮৩

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ১—১৮২

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ১—৮৮

সূরা যুমার ঃ আয়াত ১—৭৫

চতুর্বিংশতিতম পারা— সূরা যুমার ঃ আয়াত ৩২—৭৫

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ১—৮৫

সূরা হা-মীম-আস্সাজ্দা ঃ আয়াত ১—৪৬

তাফসীরে মাযহারী

দশম খণ্ড

ত্রয়োবিংশতিতম, চতুর্বিংশতিতম, পঞ্চবিংশতিতম ও ষষ্ঠবিংশতিতম পারা
(সূরা ইয়া-সীন থেকে সূরা ফাতহ্ পর্যন্ত)

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ২২—৮৩
সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ১—১৮২
সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ১—৮৮
সূরা যুমার ঃ আয়াত ১—৭৫
সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ১—৮৫
সূরা হা-মীম-আস্সাজ্দা ঃ আয়াত ১—৫৪
সূরা শূরা ঃ আয়াত ১—৫৩
সূরা যুখ্রুফ ঃ আয়াত ১—৮৯
সূরা দুখান ঃ আয়াত ১—৫৯
সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত ১—৩৭
সূরা আহ্কাফ ঃ আয়াত ১—৩৫
সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ১—৩৮
সূরা ফাতহ্ ঃ আয়াত ১—২৯

❑ 'আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে আমি তাঁহার ইবাদত করিব না?'

❑ 'আমি কি তাঁহার পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিব? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাহিলে উহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা আমাকে উদ্ধার করিতেও পারিবে না।

❑ 'এইরূপ করিলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়িব।'

❑ 'আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন।'

হজরত ঈসা সত্যধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন ইনতাকিয়া নামক নগরীতে। সেখানকার হাবীব নামক জনৈক বৃদ্ধ তাঁদের কথায় ইমান আনেন। কিন্তু সেখানকার রাজা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করে। করে বন্দী। তখন হজরত ঈসা তাঁদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন শামউন নামক আর এক প্রতিনিধিকে। তিনি সুকৌশলে রাজদরবারে সম্মানজনক স্থান অধিকার করেন এবং প্রতিনিধিদ্বয়কেও রাজার সুনজরে আনতে সক্ষম হন। জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান, মৃতকে জীবন্ত করা ইত্যাদি অলৌকিকত্ব দেখে এক সময় রাজা সত্যধর্ম গ্রহণের প্রতি আগ্রহান্বিতও হয়। কিন্তু তার সভাসদদের প্ররোচনায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে। শুধু তাই নয়, প্রতিনিধিদ্বয়কে হত্যা করার মতো অপসিদ্ধান্তও গ্রহণ করে।

একথা কানে যায় নগরীর উপকণ্ঠে বসবাসরত হাবীবের। তিনি তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ছুটে আসেন নগরীর দিকে। নগরবাসীদের যাকে সামনে পান, তাকেই বলতে থাকেন, তোমরা প্রতিনিধিদ্বয়ের ধর্মমতকে গ্রহণ করো। তাঁরা আল্লাহ্র সত্যের বার্তাবাহক। তাঁরা যেহেতু তোমাদের কাছে পার্থিব কোনো কিছুর প্রত্যাশা করেন না, সেহেতু এটা নিশ্চিত যে, তাঁরা সত্যাধিষ্ঠিত প্রেরিত পুরুষ। তাঁর এমতো বক্তব্য শুরু হয়েছে পূর্ববর্তী খণ্ডে উদ্ধৃত ২০ সংখ্যক আয়াত থেকে। আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয় তাঁর ওই বক্তব্যেরই ধারাবাহিকতা।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'আমার কী যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর ইবাদত করবো না?' এখানে সৎপথপ্রদর্শনের একটি কুশলী পদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি প্রণিধাননীয়।
উপদেশদাতা হাবীব এখানে অব্যর্থ যুক্তির সাহায্যে একথাই বলতে চেয়েছেন যে, সৃষ্টিকর্তা যেহেতু এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নয় এবং তাঁর প্রতি সকলের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি যখন সুনিশ্চিত, তখন সেই সর্বশক্তিধর মহাসৃজয়িতার উপাসনা না করার কোনো অজুহাত আর থাকতেই পারে না।

কাতাদা সূত্রে ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হাবীব উপাসনারত ছিলেন এক গিরিগহ্বরাভ্যন্তরে। সেই নিভৃতিতেই তাঁর অন্তরে সহসা এই আশংকার উদয় হলো যে, আল্লাহ্র বার্তাবাহকদ্বয়ের প্রাণ সংহার করা হবে। তিনি তাই বিচলিত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। বুঝতে পারলেন, তাঁর আশংকা অমূলক নয়। তিনি তখন নগরবাসীদের প্রতি এই বলে উদাত্ত আহ্বান জানালেন যে, হে নগরবাসী! যারা তোমাদের নিকট পার্থিব কোনোকিছুর প্রত্যাশী নন, তাঁদেরকে আল্লাহ্র সত্য বাণীবাহকরূপে বিশ্বাস করো। তারা জবাব দিলো, তুমিও তো দেখছি আমাদের ধর্মমত পরিত্যাগ করেছো। তখনই তিনি বললেন, কেনো আমি তাঁর ইবাদত করবো না, যিনি তোমার আমার সকলের সৃষ্টিকর্তা এবং যাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন আমাদের সকলের? অর্থাৎ আমি তো অবশ্যই তাঁর সকাশে প্রত্যানীত হবো, তোমরাও তো বাদ পড়বে না।

লক্ষণীয় যে, এখানে হাবীব সৃষ্টির বিষয়টি সম্পৃক্ত করেছেন নিজের সঙ্গে। বলেছেন— 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন'। এর কারণ হচ্ছে, সৃষ্টিকর্ম একটি নেয়ামত। আল্লাহ্পাক সৃষ্টি না করলে মানুষ কখনোই অস্তিত্বশীল হতো না। তাই আল্লাহ্র এই নেয়ামতের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জ্ঞাপন ইমানদারগণের একটি অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। এই অত্যাবশ্যক দায়িত্ব পালনার্থেই তাই হাবীব কথাটি বলেছেন এভাবে— 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন'। পক্ষান্তরে চৈতন্যোদয়ার্থে অবিশ্বাসীদের প্রতি সাবধানবাণী

উচ্চারণ করা ইমানদারদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তাই তিনি পরক্ষণেই অবিশ্বাসী জনতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি। বিষয়টিকে বিশেষ করে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলেছেন— 'এবং যার প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'।

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, হাবীব নাজ্জার যখন নগরবাসীদেরকে বললেন, তোমরা মহাসত্যের বার্তাবাহকদ্বয়ের অনুসারী হও, তখন তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো রাজার সামনে। রাজা জিজ্ঞেস করলো, তুমি ওই প্রতিনিধিদ্বয়ের অনুসারী হয়েছো কেনো? তিনি বললেন, তাঁরা তো ওই পরম সত্তার প্রতি আহ্বান
জানিয়েছেন, যিনি সকলের একক স্রষ্টা এবং সকলের অবশেষ উপস্থিতি হবে তাঁরই সকাশে। সুতরাং সেই পরম সত্তার ইবাদত না করার পক্ষে কি আর কোনো যুক্তি থাকে? অর্থাৎ আমি যদি তাঁর উপাসনা না করি, তবে মহাবিচারের দিবসে তাঁর নিকটে কোন অজুহাত আমি উত্থাপন করবো, মহা পুনরুত্থান যখন নিশ্চিত? তৎসঙ্গে সুনিশ্চিত চিরস্বস্তি এবং চিরশাস্তির বিষয়টিও?

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করবো? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না' (২৩)। 'এইরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো' (২৪)।

এখানে 'তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না' কথাটির মর্মার্থ এরকম— তোমরা মনে করো তোমাদের অলীক উপাস্যসমূহ আল্লাহ্ সকাশে তোমাদের জন্য শাফায়াত করবে। কিন্তু তারা তো স্থবির। অপ্রাণ। সুতরাং তারা আর সুপারিশ করবে কীভাবে। সেরকম যোগ্যতা যে তাদের একেবারেই নেই। একথাটিও তোমরা জেনে রাখো যে, শাফায়াত অপেক্ষা আল্লাহ্র দয়াপ্রাপ্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যাদের শাফায়াতে শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভ সুদূর পরাহত, তাদের সুপারিশে রহমতপ্রাপ্তি আরো অধিক অসম্ভব।

'ইন্নী ইজাল্ লাফী দ্বলালিম মুবীন' অর্থ এরকম করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো। অর্থাৎ এমতাবস্থায়, আমি কি তবে ওই সকল কাল্পনিক দেব-দেবীর বিগ্রহগুলোর উপাসক হবো, যাদের উপকার অথবা অপকার করবার কোনো প্রকার যোগ্যতাই নেই? এরকম করলে আমি তো অবশ্যই হয়ে যাবো পুরোপুরি বিপথগামী।

পরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের উপর ইমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো'। একথার অর্থ— হে নগরবাসী ও নগরবাসীদের রাজা! তোমরা ভালো করে শুনে রাখো, আমি কস্মিনকালেও বিভ্রান্তির অনুরক্ত হবো না। আমি ইমানদার। আমি ইমান এনেছি আমার প্রভুপ্রতিপালকের প্রতি, যিনি তোমাদেরও প্রভুপ্রতিপালক।

এখানে 'ফাস্মাউ'নী' অর্থ তোমরা আমার কথা শোনো। অর্থাৎ তোমরা আমার ইমানের ঘোষণা শুনে রাখো।

এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হাবীব নাজ্জারের উপদেশপূর্ণ বক্তব্যের যবনিকাপাত ঘটেছে এখানেই। তাঁর স্বজাতি কেবল জানতে
চেয়েছিলো, তিনি প্রতিনিধিদ্বয়ের ধর্মমতকে গ্রহণ করেছেন কিনা। তাদের এমতো জিজ্ঞাসার জবাব তো তিনি দিয়েছেনই, তৎসঙ্গে তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সুসঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায়। অবশেষে বক্তব্য সমাপ্ত করেছেন একথা
বলে যে— তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক যিনি, আমি তো তাঁরই প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছি। আর তোমরাও আমার এই ঘোষণাটি উত্তমরূপে অবগত হও। সেই সঙ্গে একথাও অনুধাবন করতে চেষ্টা করো যে, বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যুত্তম, নতুবা আমি এ পথ অবলম্বন করবো কেনো?

উল্লেখ্য, এখানে 'আমার প্রতিপালকের উপর ইমান এনেছি' না বলে বলা হয়েছে 'তোমাদের প্রতিপালকের উপর ইমান এনেছি'। এটাই বক্তব্যকে বলিষ্ঠ করার আলংকারিক পদ্ধতি। হাবীব নাজ্জার এখানে এমতো উৎকৃষ্ট পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, হাবীব নাজ্জারের এরকম সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় বক্তব্য শোনার পরক্ষণেই তাঁর স্বজাতিরা তাঁর উপরে একযোগে আক্রমণ করেছিলো। শহীদ করে দিয়েছিলো তাঁকে। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, তারা তাঁকে এমনভাবে পদপিষ্ট করেছিলো যে, বের হয়ে গিয়েছিলো তাঁর নাড়িভুঁড়ি। সুদ্দী বলেছেন, তাঁর
বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা তাঁকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে শুরু করেছিলো পাথর। তিনি কেবল উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন, হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার স্বজাতিকে সুপথ প্রদর্শন করো। শেষ পর্যন্ত জনতা তাঁকে টুকরো টুকরো করে ছেড়েছিলো। হাসান বসরী বলেছেন, শিরশ্ছেদ করে তাঁর ছিন্ন মস্তক তারা লটকিয়ে রেখেছিলো প্রাচীরগাত্রে। ইনতাকিয়াতেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন তিনি। পেয়েছিলেন শাহাদতের মহান মর্যাদা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হজরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী রসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরক্ষণেই নিবেদন জানালেন, আমাকে আমার স্বসম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে তাদের

নিকটে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হোক। রসুল স. বললেন, ওরওয়া! তারা তো তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তিনি বললেন, হে রহমতের সাগর! আমার স্বগোত্রীয়রা আমাকে ভালোবাসে। আমি নিদ্রিত হয়ে পড়লে তারা আমাকে জাগায় না। আমার প্রতি তারা এরকমই শিষ্টাচরণ করে। রসুল স. মৌন রইলেন। তিনি ফিরে গেলেন তাঁর জনপদবাসীদের কাছে। আমন্ত্রণ জানালেন ইসলামের। তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। বিদ্রূপবানে জর্জরিত করলো তাঁকে। একদিন ফজরের সময় তিনি নামাজ পাঠ করছিলেন তাঁর গৃহের ছাদে। জনৈক সাকাফী দূর থেকে তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করে দিলো। সংবাদটি পৌঁছে গেলো রসুল স. এর কাছে। তিনি স. তখন বললেন, ওরওয়ার পরিণতি ওই সৌভাগ্যবান লোকটির মতো, যার কথা বলা হয়েছে সুরা ইয়া-সীনে। তিনিও তাঁর স্বজাতির সামনে ইমানের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে জানিয়েছিলেন সত্যের আহ্বান। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়ে পান করেছিলেন শাহাদতের অমিয় পেয়ালা।

কেউ কেউ বলেছেন, হাবীব নাজ্জার তাঁর ইমানের ঘোষণা দিয়েছিলেন ওই বার্তাবাহকদ্বয়কে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ তিনি তাঁদেরকে শুনিয়ে বলেছিলেন, সাক্ষী থাকুন, আমি আপনাদের প্রভুপালকের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছি।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ২৬, ২৭

❑ তাহাকে বলা হইল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর'। সে বলিয়া উঠিল, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানিতে পারিত—

❑ 'কিরূপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হাবীব নাজ্জার শহীদ হলেন। তখন তাঁকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো।

অনেকে মনে করেন, হাবীব নাজ্জারকে তখন দেওয়া হয়েছিলো জান্নাতের সুসংবাদ। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে 'জান্নাত' অর্থ কবর। কারণ বিশ্বাসীগণের জন্য কবরাভ্যন্তরকে করে দেওয়া হয় জান্নাতের উদ্যান। আলোচ্য বাক্যটি একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্নের জবাব। ওই প্রশ্নটিসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায় এরকম— হাবীব নাজ্জার যখন অটল ইমান নিয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে কী বললেন? বললেন, জান্নাতে প্রবেশ করো। তিনি তখন বললেন, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি আমার এই সৌভাগ্যের কথা জানতে পারতো—

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'কিরূপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন'।

এখানে 'মা গাফারালী' (ক্ষমা করেছেন) কথাটির 'মা' অব্যয়টি যোজক, প্রশ্নসূচক ও ধাতুমূল। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার স্বজাতি! তোমরা কি জানো আমার প্রভুপালক আমাকে কীরূপে বা কী কারণে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন? তবে শোনো, তিনি ক্ষমা করেছেন আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও তোমাদের বৈরী আচরণের মুখে আমার ধৈর্যাবলম্বনের কারণে।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত বিশ্বাসীগণ থাকেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে সতত মুক্ত। হাবীব নাজ্জারও ছিলেন তেমনি বিশ্বাসী, প্রকৃত আল্লাহ্প্রেমিক। তাই বুঝতে হবে, ক্ষমাপ্রাপ্তি ও বিশেষ সম্মানলাভের কথা তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে জানাতে চেয়েছিলেন তাদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনার্থে নয়। বরং তিনি তাঁর অনন্য মর্যাদার
কথা একারণেই তাদেরকে জানাতে চেয়েছিলেন, যেনো এতে করে তাদের চৈতন্যোদয় হয় এবং তারাও গ্রহণ করে এমতো মর্যাদাপ্রাপ্তির সুযোগ। এরকমও বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছিলেন— দ্যাখো, দ্যাখো, আমাকে দেওয়া হয়েছে কীরূপ মার্জনাবৈভব ও অক্ষয়সম্মান। এবার তবে তোমরাই বলো, কার মতাদর্শ সত্য? তোমাদের, না আমার?

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ২৮, ২৯

তাফসীরে মাযহারী/১৯

❑ আমি তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করি নাই এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না।

❑ উহা ছিল কেবলমাত্র এক মহানাদ। ফলে উহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

বাগবী লিখেছেন, ইনতাকিয়াবাসীরা যখন আল্লাহ্‌র প্রিয় দাস হাবীব নাজ্জারকে শহীদ করে দিলো, তখন আল্লাহ্ রোষতপ্ত হলেন। তাদের প্রতি অবতীর্ণ করলেন গজব। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবার আদেশ দিলেন হজরত জিবরাইলকে। মহাহুংকার ছাড়লেন হজরত জিবরাইল। সেই মহানাদে চিরস্থবির হয়ে গেলো নগরী ও নগরবাসীরা। সেকথাই আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে— 'আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিলো না। তা ছিলো কেবলমাত্র এক মহানাদ। ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো।'

এখানে 'আলা ক্বওমিহী' বলে বুঝানো হয়েছে হাবীব নাজ্জারের সম্প্রদায়কে। 'মিম বা'দিহী' (তারপর) অর্থ তার শহীদ হওয়ার পর। 'মিন জুনদিম্ মিনাস্ সামায়ি' অর্থ আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি। অর্থাৎ তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য বহুসংখ্যক আযাবের ফেরেশতা আমি প্রেরণ করিনি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম বদর ও পরিখার যুদ্ধের সময়। বরং একজন ফেরেশতার প্রাণসংহারক বিকট আওয়াজে আমি চিরনিথর করে দিয়েছিলাম তাদের জনপদ। উল্লেখ্য, আলোচ্য বক্তব্যে ইনতাকিয়াবাসীদের অপযশ বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে। অর্থাৎ 'আকাশ থেকে কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি' বলে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো জনপদকে ধ্বংস করবার জন্য বহুসংখ্যক ফেরেশতাকে পাঠানো আল্লাহ্‌র রীতি নয়। তবে বদর ও পরিখার যুদ্ধে বিরাট ফেরেশতাবাহিনী প্রেরণের কারণ কেবল কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া ছিলো না। বরং ওই সকল ফেরেশতা মূলতঃ ছিলো শুভসংবাদপ্রদাতা। তাদের প্রধান কাজ ছিলো রসুল স. এর মহান মর্যাদাকে প্রকাশ করা এবং তাঁর সহযোদ্ধাগণের হৃদয়ে জারী রাখা অনাবিল প্রশান্তিপ্রবাহ। অন্য আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে 'আল্লাহ্ তো করেছিলেন কেবল তোমাদের মনোবিনোদনার্থে যাতে করে তোমাদের অন্তর থাকে প্রশান্ত। আর তাঁর পক্ষ ছাড়া অন্য কোনো পক্ষ থেকে সাহায্য তো আসতেই পারে না'।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'মা কুন্না' কথাটির 'মা' হচ্ছে যোজক অব্যয়। আর 'জুনুদ' অর্থ এখানে আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ, ঝঞ্ঝাবায়ু, অথবা অতিবৃষ্টি। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়কে বিনাশ করবার জন্য আমি যেমন শাস্তিপ্রদায়ক ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, হাবীব নাজ্জারের সম্প্রদায়ের অবাধ্যদের উপরে সেরকম কোনো বাহিনী প্রেরণ করিনি। বরং আমি তাদের বিনাশসাধন করেছিলাম প্রস্তরবৃষ্টি, ঝঞ্ঝাঝড় অথবা অতিবর্ষণের মাধ্যমে।

তাফসীরে মাযহারী/২০

বাগবী লিখেছেন, ভাষ্যকারগণ বলেন, হজরত জিবরাইল ইনতাকিয়া নগরীর প্রবেশতোরণের দু'পাশের চৌকাঠ ধরে ছেড়েছিলেন এক কলিজাচৌচির করা চিৎকার। ওই মহানাদ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো তারা।

'খমিদূন' অর্থ কেবলমাত্র এক মহানাদ। অর্থাৎ একটি মাত্র মহানাদের ফলেই নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো তাদের কলকোলাহল। আর 'ফাইজা' কথাটির 'ফা' অব্যয়টি এখানে হেতুনির্দেশক। অর্থাৎ ওই একটি মাত্র বীভৎস আওয়াজের আঘাত হেতু নিভে গিয়েছিলো তাদের জীবনপ্রদীপ।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৩০, ৩১, ৩২

❑ পরিতাপ বান্দাদের জন্য; উহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।

❑ উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা উহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে না?

❑ এবং অবশ্যই উহাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অপরিণামদর্শী মানুষের জন্য আক্ষেপ! তারা কতোই না হতভাগ্য, তাদেরকে কল্যাণের পথ প্রদর্শনের নিমিত্তে যখনই তাদের নিকট আমার কোনো বার্তাবাহক প্রেরণ করা হয়েছে, তখনই তারা তাদেরকে করেছে প্রত্যাখ্যান। তাদের প্রতি নিক্ষেপ করেছে বিদ্রূপ-পরিহাসের তীক্ষ্ণ তীর।

এখানে ‘হাস্‌রতান’ (আক্ষেপ) শব্দটিকে ‘তানভীন’ সহকারে ব্যবহার করা হয়েছে সম্ভ্রমার্থে। অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রযোজিত পরিতাপ বা আক্ষেপটি অত্যুচ্চ পর্যায়ের।

‘ইল্‌লা কানুবিহী’ কথাটির ব্যতিক্রমী অব্যয় ‘ইল্‌লা’ এখানে একই সঙ্গে শর্ত ও পরিণতিপ্রকাশক। তাই বলা হয়েছে— যখনই কোনো রসুল এসেছে, তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। আর এমতো বক্তব্যেই প্রকাশ পেয়েছে সম্ভ্রমার্থক আক্ষেপ। যাঁরা পরিশুদ্ধচিত্ত, কল্যাণকামী ও নিতান্ত সজ্জন, যাঁদের সদুপদেশের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ইহ-পারত্রিক সফলতা, তাঁদের বিরুদ্ধপক্ষীয়দের চরম পরিণতির উপর পরিতাপ প্রকাশ করাই সঙ্গত। তাদের জন্য আক্ষেপ করে

ফেরেশতা-জ্বিন-ইনসান সকলেই। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঋণাত্মক আক্ষেপ। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এখানকার আক্ষেপ অপরাধীদের অপরাধের গুরুত্বনির্দেশক।

কেউ কেউ বলেছেন, সম্বোধন অব্যয়ের সম্বোধিতজন এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে লোকসকল! ওই সকল মানুষের জন্য আক্ষেপ করো, যারা উপহাস করে তাদের কল্যাণার্থে প্রেরিত নবী-রসুলগণকে। ‘হাস্‌রত’ অর্থ— পরিতাপ, অনুতাপ, অনুশোচনা, আক্ষেপ।

বাগবী লিখেছেন, ‘ইয়া হাস্‌রতান’ (হায় আক্ষেপ) কথাটির বক্তা ও বক্তব্যের সময় সম্পর্কে রয়েছে দুটি অভিমত। একটি হচ্ছে— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যেহেতু ব্যঙ্গবিদ্রূপের বশবর্তী হয়ে নবী-রসুলগণকে অস্বীকার করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাই পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে বলবেন, আজ আমার বান্দাদের চরম অনুশোচনা, অনুতাপ ও আক্ষেপের দিন। অপর অভিমতটি হচ্ছে— এরকম কথা বলবে ক্ষতিগ্রস্তরা। আবুল আলিয়া বলেছেন, ‘ইয়া হাস্‌রতান আ’লাল ই’বাদ’ এরকম বলেছিলো ইনতাকিয়াবাসীরা, যখন তারা প্রত্যক্ষ করেছিলো আসন্ন শাস্তির স্বরূপ।

‘আলইবাদ’ এর ‘আলিফলাম’ (আল) এখানে সীমিতার্থক। অর্থাৎ এখানে ‘বান্দাদের জন্য’ অর্থ কেবল ‘ইনতাকিয়াবাসীদের জন্য’। অথবা বলা যেতে পারে, কথাটির উদ্দেশ্য সকল দেশের ও সকল কালের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা তাদের নবী-রসুলগণকে বিদ্রূপ করে। যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে এখানে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে মক্কার মুশরিকদের প্রতি।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— ‘তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না’? এখানে ‘তারা কি লক্ষ্য করে না’ অর্থ মক্কাবাসীরা কি লক্ষ্য করে না। আর ‘যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না’ অর্থ ওই সকল বিনাশপ্রাপ্তরা পৃথিবীতে আর কখনো ফিরে আসবে না।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— ‘এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকটে উপস্থিত করা হবে’। এখানকার ‘সকলকে’ কথাটি সম্পৃক্ত হবে ‘আমার নিকট’ কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ আমার নিকটে তখন উপস্থিত হতে হবে সকলকেই। অথবা ‘মুহদ্বারূন’ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে ‘সকলকে’ কথাটি। আর সেমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তখন সকলকে উপস্থিত করানো হবে আমার সকাশে।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

❑ উহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা উহারা আহার করে।

❑ উহাতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙুরের উদ্যান এবং উহাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ,

❑ যাহাতে উহারা আহার করিতে পারে উহার ফলমূল হইতে, অথচ উহাদের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই। তবুও কি উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?

❑ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং উহারা যাহাদিগকে জানে না তাহাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া।

❑ উহাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন উহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মৃত সদৃশ বিশুষ্ক মৃত্তিকাও মানুষের জন্য একটি বিশেষ নিদর্শন। আমি বিশুষ্ক মৃত্তিকাকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি বিভিন্ন প্রকারের ফসল। ওই ফসল ভক্ষণ করেই তো তারা জীবন ধারণ করে।

এখানে **'হাব্বান'** অর্থ কৃষিজাত আহার্য বস্তু। যেমন যব, গম, ধান ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকারের সবজিও এর অন্তর্ভূত। আর এখানে **'আহার করে'** কথাটির পূর্বে **'তা থেকে'** উল্লেখ করাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, শস্য ও সবজিই মানুষের প্রধান আহার্য। মানুষের জীবনধারণের জন্য এগুলো অপরিহার্য।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— **'তাতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙুরের উদ্যান এবং তাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ'**।

পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত **'হাববুন'** যেহেতু জাতিবাচক, সেহেতু শব্দটি সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে একবচনরূপে। কিন্তু এই আয়াতের **'নাখীল'** ও **'আ'নাব'** দ্বারা বুঝানো হয়েছে ফলমূলকে। তাই এখানে শব্দ দু'টো ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনরূপে। **'নাখীল'** বলে খেজুর বৃক্ষকে। আর **'আ'নাব'** অর্থ খেজুর। উল্লেখ্য, শস্য-সবজির সঙ্গে আঙুর ও খেজুরের উল্লেখ করা যেতো। কিন্তু এখানে খেজুর ও আঙুরের উল্লেখ করা হয়েছে পৃথকভাবে। এর হেতু নির্ণয়ার্থে এরকম বলা যেতে পারে যে, অন্যান্য ফল-ফসলের চেয়ে খেজুরের গুরুত্ব বেশী। আর খেজুরগাছ আল্লাহ্‌র সৃজননৈপুণ্যের একটি অনন্যসাধারণ নিদর্শন।

এখানে **'মিনাল উয়ূ'ন'** কথাটির **'মিন'** অব্যয়টি আংশিক অর্থ প্রকাশক। অর্থাৎ কিছু প্রস্রবণ বা ঝরণা। কিন্তু আখফাশের মতে **'মিন'** এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— **'যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফলমূল থেকে, অথচ তাদের হস্ত তা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না'?** এখানে **'মিন ছামারিহী'** অর্থ ওই সকল বাগান বা বৃক্ষের ফলমূল থেকে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার **'ছামারিহী'** কথাটির **'হী'** (তার) সর্বনামটি সম্পর্কযুক্ত আল্লাহ্‌র সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যাতে তারা আহার করতে পারে আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট ফলসম্ভার থেকে।

'ওয়ামা আ'মিলাত্হু আইদীহিম' অর্থ অথচ তাদের হস্ত তা সৃষ্টি করেনি। এখানকার **'মা'** (যা) হচ্ছে যোজক অব্যয়। শব্দটির সম্পৃক্তি ঘটেছে **'ছামারিহী'**র সঙ্গে। এভাবে মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা পান করে নিজের হাতে তৈরী করা শরবত, সিরকা ইত্যাদি। কিন্তু কারো কারো মতে এখানকার **'মা'** ব্যবহৃত হয়েছে নেতিবাচক অর্থে। অর্থাৎ সকল প্রকার ফল ও ফসল সৃষ্টি করেন আল্লাহ্ স্বয়ং। সৃজনকর্মে মানুষের প্রবেশাধিকার মাত্রই নেই।

'আফালা ইয়াশ্কুরূন' অর্থ তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। **'ফা'** এখানে যোজক এবং এর যোজ্য রয়েছে উহ্য। এমতাবস্থায় কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— তারা কি আল্লাহ্‌র নেয়ামতরাজির প্রতি কৃতজ্ঞ? মোটেও নয়। অথচ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছিলো তাদের অত্যাবশ্যক একটি কর্তব্য।

এর পরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— **'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে'**। এখানে **'আযওয়াজ্ব'** অর্থ শ্রেণী, জাতি। **'মা তুমবিতুল আরদ্ব'** অর্থ তরুলতা, উদ্ভিদ। **'মিন আনফুসিহিম'** অর্থ মানুষ, নর ও নারী। আর **'মিম্মা লা ইয়া'লামূন'** অর্থ তারা যাদেরকে জানে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অন্য যে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষ অনবগত। এভাবে বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— সকল পরিদৃশ্যমান ও অদৃশ্য সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌পাক দিয়েছেন যুগলরূপ— পরস্পরের পরিপূরক।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— **'তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, তা থেকে আমি দিবালোক অপসারণ করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে'**।

অনস্তিত্বের অন্ধকারই সৃষ্টির মূল প্রকৃতি। তার উপরে প্রতিভাসিত করা হয় অস্তিত্বের বা পরিদৃশ্যমানতার আলোক। রাত্রির অন্ধকারের উপরে দিবসের আলো প্রতিষ্ঠিত হয় সেভাবেই। তাই রাত্রি হচ্ছে আল্লাহ্‌র সৃজনরহস্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আলোচ্য আয়াতে সে বিষয়টিকেই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে— রাতের আঁধারের উপর থেকে আমি যখন দিবালোককে অপসারণ করি, তখন অন্ধকার পায় তার প্রকৃত স্বরূপ। এখানে **'সালখ'** অর্থ খোলস উন্মোচন। মর্মার্থ— দিবাবসান, নিশিথের আগমন।

❑ আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।
❑ এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে।
❑ সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।

'ওয়াশ শামসু তাজ্‌রী' অর্থ আর সূর্য ভ্রমণ করে। মর্মার্থ মহাশূন্যে সূর্য সঞ্চরণ করে তেমনভাবে, যেমনভাবে সলিলাভ্যন্তরে সন্তরণ করে মৎস্য। কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে দিবস-বিভাবরী বিবর্তনের কারণ।

'লি মুস্‌তাক্বর্‌রিল্‌ লাহা' অর্থ তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। কথাটির 'মীম' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ধাত্যর্থে। অর্থাৎ সূর্য মান্য করে চলে একটি সুনির্ধারিত পরিক্রমণ। অথবা 'মুসতাক্বর' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ক্রিয়ার আধাররূপে। অর্থাৎ সূর্য ভ্রমণ করে একটি কেন্দ্রীয় গন্তব্যের দিকে, যেমন প্রবাসী ব্যক্তি অতিক্রম করে তার প্রবাসী জীবন। তার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কক্ষপথ। বর্ণনাটি উপস্থাপিত হয়েছে সাদৃশ্য হিসেবে। কিংবা 'মুসতাক্বর' অর্থ এখানে পূর্ণ দ্বিপ্রহর, যখন সূর্য থাকে দৃশ্যতঃ নিশ্চল। মনে হয় তার গতি এখন রুদ্ধ। অথবা 'মুস্‌তাক্বর' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে সূর্যের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পরিভ্রমণপরিধিকে। এই দুই সময়ে সূর্য অবস্থান করে উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি অথবা দক্ষিণ গোলার্ধের মকরক্রান্তির উপর। দিবসের পরিসর হয় প্রসারিত, কিংবা সংকুচিত। এরকমও বলা যেতে পারে যে, শব্দটির অর্থ—সূর্যের সর্বপূর্ব অথবা সর্বপশ্চিম সীমান্ত। সূর্য তার কক্ষপথ পরিভ্রমণ করে ৩৬৫ দিনে একবার। অথচ একদিনের জন্যও তার উদয় ও অস্ত হুবহু একস্থানে হয় না। কেননা তার কক্ষপথ ডিম্বাকৃতির। তাই তার পূর্বের শেষ সীমান্ত এবং পশ্চিমের শেষ সীমান্তকে এখানে 'মুস্‌তাক্বর' বলা হয়েছে। অথবা 'মুস্‌তাক্বর' বা 'গন্তব্য' বলা হয়েছে ওই স্থানকে, মহাপ্রলয়কালে যেখানে গিয়ে থেমে যাবে লক্ষ কোটি বছর ধরে কক্ষ পরিক্রমণরত বহ্নিমান সূর্য। উল্লেখ্য, সূর্যের এমন কোনো সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল

নেই, যেখানে গিয়ে সে থেমে যায়। সেজন্যই এখানে 'গন্তব্য' কথাটিকে এতোরকমভাবে ব্যাখ্যা করা হলো। হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্যও এরকম। তিনি বলেছেন, সূর্যের চলমানতা বিরতিবিহীন।

আমর ইবনে দীনার সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ 'মুস্‌তাক্বির্‌রিল্‌লাহা' কথাটিকে পাঠ করতেন 'মুস্‌তাক্বর্‌রল্‌লাহা'। এমতাবস্থায় কথাটির অর্থ হয়— সূর্যের পরিভ্রমণে কোনো বিরাম নেই। কিন্তু যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, সূর্য স্থির হয় আরশের নিচে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু জর গিফারী বলেছেন, একবার সূর্যের অস্তগমনকালে রসুল স. বললেন, জানো, সূর্য কোথায় যায়? আমি নিবেদন করলাম, আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসুলই সমধিক জ্ঞাত। তিনি স. বললেন, সূর্য গমন করে আরশের নিম্নে। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়। অনুমতি প্রার্থনা করে পুনঃপরিক্রমণের। তার প্রার্থনা গৃহীত হয়। তখন সে শুরু করে পুনঃপরিক্রমণ। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, যখন তার সেজদা গৃহীত হবে না। পুনঃ পরিক্রমণের অনুমতিও মিলবে না। আদেশ দেওয়া হবে, যেখান থেকে পরিভ্রমণ শুরু করেছো, সেখানেই ফিরে যাও। সে নির্দেশ পালন করবে। দেখা যাবে সূর্য উদিত হয়েছে পশ্চিম দিক থেকে। 'সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে' কথাটির সারমর্ম এরকমই। তিনি স. আরো বলেছেন, সূর্য থেমে যায় আরশের নিম্নদেশে। বোখারী, মুসলিম। হাদিসটির মর্মার্থ— অস্তমিত সূর্য সেজদাবনত হয় আরশের নিচে। সে অনুমতিপ্রাপ্ত হয় পুনঃউদয়ের। কিন্তু এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যখন পুনঃউদয়ের অনুমতি সে আর পাবে না। তখন তার উদয় হবে বিপরীত দিক থেকে। উল্লেখ্য, মহাপ্রলয়ের নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটিও একটি বিশেষ নিদর্শন।

একটি সংশয় ঃ দিবা-রাত্রির উপস্থিতি সকল স্থানে এক সঙ্গে হয় না। তাই সকল স্থানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এক রকম নয়। সূর্য যখন কর্কটক্রান্তির শিখরে শোভা পায়, তখন ধ্রুবনক্ষত্রের নিম্নে বুলগেরিয়া অতিক্রম করলেও সেখানে ইশার সময় হয় না।

তাই কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় গোধূলি, কোথাও প্রত্যুষ। তাহলে সূর্যের এমন অবকাশ কোথায় যে, সে আরশের নিচে সেজদাবনত হবে?

সংশয়ভঞ্জন ঃ আমি বলি, অস্ত ও উদয়ের মধ্যবর্তী মুহূর্তাংশই হচ্ছে সূর্যের সেজদার ক্ষণ, যদিও তা পরিদৃশ্যমান নয় (আরশ যেহেতু পরিদৃশ্যমান নয়, সেহেতু আরশের নিম্নদেশে সূর্যের সেজদাবনত অবস্থাও পরিদৃশ্যমান না হওয়াই সমীচীন)। ওই দৃশ্যাতীত ক্ষণেই দায়িত্বশীল ফেরেশতারা সূর্যকে হাজির করে আরশের নিচে। ঠিক তখনই সূর্য সেজদা করে এবং অনুমতিপ্রাপ্ত হয় পুনঃ পরিক্রমণের। অবস্থানগত তারতম্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাই রাত্রির সূচনালগ্নে এবং অবসানকালে ঘটে সংকোচন অথবা প্রসরণ। বিষয়টি মহারহস্যময় বলেই তো এরপর বলা হয়েছে— এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

কেউ কেউ বলেছেন, 'সূর্য সেজদা করে আরশের নিচে' হাদিসটি অসংলগ্ন প্রকৃতির। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সেজদা অর্থ এখানে আনুগত্য। কিন্তু এই অভিমত দু'টো হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী।

'জালিকা তাক্বদীরুল আ'যীযিল আ'লীম' অর্থ এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ সূর্য ও সৌরজগতের নিয়ন্ত্রণ এমন এক অতুলনীয় সত্তা কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত, যিনি মহাপরাক্রমশালী এবং যিনি জানেন সকল কিছুর প্রকৃত তাৎপর্য।

পরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে'। একথার অর্থ— চন্দ্রের জন্যও আমি নির্ধারণ করেছি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ এবং আটাশটি অক্ষাংশ। প্রতি রাতে সে অতিক্রম করে এক একটি অক্ষাংশ। তার এমতো যাত্রার কোনো পূর্বাপর ঘটে না। আর শেষ ঘাঁটিতে পৌঁছলে তার আকৃতি হয়ে যায় অতি ক্ষীণ, ধনুকের মতো বাঁকা এবং জীর্ণ খেজুর-শাখা সদৃশ। তারপর ঘনকৃষ্ণ অমাবস্যায় সে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যায় সূর্যের আড়ালে।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে'।

'লাশ্ শামসু ইয়ামবাগী লাহা' অর্থ সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয়। 'আন্ তুদরিকাল ক্বমার' অর্থ চন্দ্রের নাগাল পাওয়া। অর্থাৎ সূর্য কখনোই চন্দ্রের মতো দ্রুত ধাবমান হতে পারবে না। এরকম বলেছেন বায়যাবী। তাঁর এমতো অভিমতের ভিত্তি হচ্ছে জ্যোতির্বিদদের মতবাদ। তারা বলে, চন্দ্রের গতি সূর্যের গতি অপেক্ষা দ্রুততর। চাঁদ তার কক্ষপথ পরিভ্রমণ করে এক মাসে। আর সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথ পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে এক বৎসরে।

আমার মতে বিষয়টির স্বরূপ অন্যরকম। প্রকৃত কথা হচ্ছে— চন্দ্রের জন্য নির্ধারিত গতিময়তা সূর্য কখনো পেতে পারে না। এরকম হওয়া সম্ভবই নয়। কারণ এতে রয়েছে মহাবিপর্যয়ের সমূহ সম্ভাবনা। অথবা আয়াতের মর্মার্থ হবে এরকম— গুরুত্ব ও উপযোগিতার দিক দিয়ে সূর্য চন্দ্রের অনুরূপ নয়। অথবা বলা যায়— সূর্য ও চন্দ্র আপনাপন কক্ষপথে চলমান। তাদের এমতো গতিপথ অপরিবর্তনীয়। তাদের কক্ষান্তর অসম্ভব। এরকমও হওয়া সম্ভব যে, এখানে 'সূর্য' অর্থ দিবস এবং 'চন্দ্র' অর্থ রজনী। এমতাবস্থায় মর্মার্থ দাঁড়াবে— দিবসের পক্ষে সম্ভব নয় রজনীকে অতিক্রম করা। তাদের আগমন ও নির্গমনের পালা সুনিয়ন্ত্রিত। বাগবীর বক্তব্য এরকমই।

'ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিঁই ইয়াস্বাহূন' অর্থ এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। এখানে 'প্রত্যেকে' অর্থ সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই। বায়যাবী লিখেছেন, কথাটির অর্থ— সকল সূর্য ও সবকয়টি চন্দ্র। কারণ, তাদের উভয়ের অবস্থান সতত পরিবর্তনশীল। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে সূর্য ও চন্দ্রের

আলোচনা প্রসঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীর কথাও এসে গিয়েছে। যদি তাই হয়, তবে এখানে 'প্রত্যেক' শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে সূর্য ও চন্দ্রসহ প্রত্যেকটি নক্ষত্র। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থক সর্বনাম 'কুল্লুন' (তাদের প্রত্যেকে)।

'ফী ফালাক্' অর্থ এক আকাশে। অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটতম আকাশের পৃথক পৃথক কক্ষপথে। বিষয়টিকে অন্য আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে— 'আর আমি সুশোভিত করেছি পৃথিবীর আকাশকে প্রদীপমালায়, যেগুলো মৎস্যসদৃশ সন্তরণশীল'।

আলোচ্য আয়াতের প্রকাশ্য বিঘোষণা এই যে, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ বাধ্যগতভাবে আকাশে সঞ্চরণশীল। কোনোটিই স্থির নয়। আকাশের সঞ্চালনেই ওগুলো সঞ্চালিত হয়। তাদের সঞ্চালন স্বকীয় নয়। আবার দার্শনিকেরাও বলে, গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন আরোপিত, স্বসৃষ্ট নয়। স্বচালিত হলে আকাশমার্গের বিপর্যয় হতো অনিবার্য। ফেটে ভেঙে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতো সবকিছু।

প্রাচীন দার্শনিকেরা আকাশের সংখ্যা নির্ণয় করেছে নক্ষত্ররাজির আবর্তনের সংখ্যার উপর। তারা বলে, নক্ষত্রগুলোর কক্ষপথ যতগুলি, আকাশের সংখ্যাও ততো সংখ্যক। তাদের মতে আকাশের সংখ্যা নয়টি এবং পেঁয়াজের খোসার মতো আকাশগুলো

পরস্পরবিজড়িত। সর্বোচ্চ নবম আকাশকে তারা সকল আকাশের পরিবেষ্টনকারী বলে জানে, যা পূর্ব থেকে পশ্চিমে দু'টি মেরুদণ্ড ও একটি বৃত্তে আবর্তন করে। তার এক একটি চক্র সম্পন্ন হয় এক দিন এক রাতে। অন্যান্য আকাশের আবর্তন হয় দু'ধরনের, তার মধ্যে একটির আবর্তন নবম আকাশের আবর্তনানুসারী। অর্থাৎ নবম আকাশের সাথে তা আবর্তিত হয় পূর্ব থেকে পশ্চিমে। অন্য আবর্তনটি স্বকীয় ও স্বাভাবিক এবং তার গতি পশ্চিম থেকে পূর্বে। এর চক্রবৃত্ত নবম আকাশের চক্রবৃত্ত থেকে পৃথক। মেরুদণ্ড দু'টিও পৃথক। নবম ও অষ্টম আকাশের দু'টি দু'টি করে চারটি মেরু পরস্পরবিচ্ছিন্ন। সূর্য অষ্টম আকাশের চক্রবৃত্তানুসারী। তারা অষ্টম আকাশকে আবার রাশির আকাশও বলে।
কারণ অষ্টম আকাশের বৃত্তের রয়েছে বারোটি অংশ। প্রতিটি অংশের নাম রাশি। তার মধ্যে আবার সাতটি রাশি (কমর, আতারিফ, জোহরা, শামস্, মিররিখ, মুশতারী, সোহল) ব্যতীত অন্যান্য নক্ষত্ররাশির সম্পর্ক পরিবর্তিত হয় না, তাদের নৈকট্য ও দূরত্বের মধ্যে তারতম্য ঘটলেও পূর্ণ একটি দিবস ও রাত্রিতে তাদের আবর্তন সম্পন্ন হয় না। কিছুটা ঘাটতি থেকেই যায়, অত্যল্প হলেও। এ কারণেই পরিক্রমণশীল নক্ষত্র ব্যতিরেকে অন্যান্য নক্ষত্র অষ্টম আকাশ সংলগ্ন, বরং সেগুলো অর্গলাবদ্ধের মতো প্রোথিত।

এটাও নিশ্চিত যে, পরিক্রমণশীল নক্ষত্রের আবর্তন হয় একদিন-একরাত পূর্ব হওয়ার কিছু আগেই। তাই চন্দ্রের কক্ষপরিক্রমণ শেষ হয় কখনো তিরিশ দিনে, আবার কখনো ঊনতিরিশ দিনে। আবার সূর্যের কক্ষপ্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে কখনো ৩৬৫ দিন, আবার কখনো ৩৬৪ দিন। অন্যান্য নক্ষত্রের গতিবিধিও এরকম। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, সাতটি পরিক্রমণশীল নক্ষত্রের গতি পশ্চিম

থেকে পূর্বে। চন্দ্রের কক্ষপ্রদক্ষিণ এক মাসে সম্পন্ন হয় বলেই জ্যোতির্বিদেরা বলে, চন্দ্রই সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিসম্পন্ন। আর সূর্য যেহেতু কক্ষপ্রদক্ষিণ সম্পন্ন করতে সময় লাগায় এক বৎসর, তাই অবশ্যই সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা মন্থরতর। অন্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধিও এরকম।

পাঁচটি গ্রহকে বলে 'খাম্সায়ে মুতাহায়্যেরা'। সেগুলো হচ্ছে আতারিফ, জোহরা, মুশতারী, মিররিখ এবং সোহল। এদের পরিক্রমণ কক্ষাতিরিক্ত— কখনো কম, কখনো পরিমিত। এগুলোকে 'অনির্বাহ পঞ্চক' বলে একারণেই। এগুলো নিজে নিজেই গতিশীল। তবে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র অপেক্ষা এগুলোর গতি-প্রকৃতি পৃথক। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মোটামুটি ব্যাখ্যা এরকমই।

কিন্তু কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, আকাশ অনধিক সাতটি। সুতরাং একথা অস্বীকারকারী কাফের। আর প্রতিটি আকাশ যে এক সময় ফেটে যাবে ও দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাবে সে কথাও কোরআনসম্মত। সুতরাং একথা অবিশ্বাসকারীও কাফের। কোরআন মজীদে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হয়েছে— 'আকাশ যখন ফেটে যাবে', 'যখন আকাশ জড়িয়ে যাবে', 'যখন চন্দ্র হবে খণ্ডিত' ইত্যাদি।

যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, আকাশগুলো পরস্পর মিলিত নয় এবং এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব অনেক। সুতরাং যারা বলে আকাশগুলো পরস্পরলগ্ন, তারা ফাসেক।

সূপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্বের সমান।

হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে তিরমিজি ও আবু দাউদ কর্তৃক একটি দীর্ঘ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশ এবং তারপরের এক আকাশ থেকে অপর আকাশের ব্যবধান একাত্তর, বায়াত্তর অথবা তিয়াত্তর বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। উল্লেখ্য, পথ চলার গতি দ্রুত অথবা মন্থর দু'রকমেরই হতে পারে। এটাই সম্ভবত এমতো বর্ণনাবৈষম্যের হেতু। আর বর্ণিত হাদিসসমূহের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এ সম্পর্কিত তথ্যাবলী ভুল। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের কথা বিশ্বাস করবে তার ইমান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কোরআন মজীদের অকাট্য সাক্ষ্য এই যে, আকাশ এক সময় ফেটে যাবে এবং জড়িয়ে যাবে। অতএব, একথা বলতে আর বাধা নেই যে, সকল গ্রহ-নক্ষত্র অবস্থান করছে প্রথম আকাশেই। এক আয়াতে তো স্পষ্ট করে বলাই হয়েছে 'আমি পৃথিবীর আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালায়'। অন্যত্র উক্ত হয়েছে 'আর আকাশের সবকিছুই পরিক্রমণশীল'। এরকম বলতেও কোনো দোষ নেই যে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো পরিক্রমণ করে একই গতিতে, সাতটি উল্লেখযোগ্য গ্রহের পরিক্রমণের সময়সীমা পৃথক পৃথক এবং পাঁচটি অসম গ্রহের কক্ষপ্রদক্ষিণ সম্পন্ন

হয় কখনো একটু আগে, আবার কখনো একটু পরে। আর এগুলোকেই আয়াতে বলা হয়েছে 'আল-খুন্নাসিল জ্বাওয়ারিল কুন্নাস....'। আল্লাহ্তায়ালাই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

❑ উহাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি উহাদের বংশধরদিগকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম;

❑ এবং উহাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে উহারা আরোহণ করে।

❑ আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি; সে অবস্থায় উহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না এবং উহারা পরিত্রাণও পাইবে না—

❑ আমার অনুগ্রহ না হইলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে না দিলে।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এটাও তাদের জন্য একটি নিদর্শন যে, আমি মানুষের উর্ধ্বতন-অধস্তন বংশধরদের জলযানারোহণকে নিরাপদ রাখি, যেমন নিরাপদ রেখেছিলাম নবী নুহ ও তার বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে। এরকম যানবাহন তো রয়েছে স্থলে-অন্তরীক্ষেও। যেমন মরুজাহাজ উষ্ট্র। সেগুলোও তো নিরাপত্তাপ্রাপ্ত আমা কর্তৃক।

এখানকার 'জুররিয়্যাত' এর শাব্দিক অর্থ সন্তান, যাদেরকে গ্রহণ করা হয় বাণিজ্য সহযাত্রীরূপে। কখনো অর্থ হয় সফরসঙ্গী সন্তান ও পরিবার। আবার কখনো শব্দটি ব্যবহৃত হয় কেবল 'সঙ্গিনী' অর্থে। যেমন এক হাদিসে এসেছে, যুদ্ধে নিহত এক রমণীকে দেখে রসুল স. একবার বলেছিলেন, মেয়েটি তো সমরসম্পৃক্তা নয়। তখন তিনি স. সেনাপতি হজরত খালেদ ইবনে ওলীদকে এইমর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'জুররিয়্যাত' ও শ্রমিককে যেনো হত্যা করা না হয়।

হজরত ওমর বলেছেন, 'জুররিয়্যাতকে' সাথে নিয়ে হজ করো। তাদের অর্থ ভক্ষণ কোরো না। কিন্তু তাদের রজ্জুও ছেড়ে দিয়ো না (কোরো না পর্যবেক্ষণমুক্ত)। নেহায়া।

'আলফুলক' অর্থ জলযান, নৌকা, তরণী। জলযানারোহণ প্রসঙ্গে রমণী ও সন্তানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে একারণে যে, তাদেরকে সফরসঙ্গী করা স্বস্তিদায়ক নয়। তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে হয় বিশেষভাবে।

বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আলফুলক' অর্থ নবী নুহের কিশতী। আর 'জুররিয়্যাত' বলে বুঝানো হয়েছে পূর্ব পুরুষকে। সন্তান যেমন 'জুররিয়্যাত', তেমনি 'জুররিয়্যাত' বলে বুঝানো হয় পিতামহ প্রপিতামহগণকেও। বায়যাবী লিখেছেন, এখানে 'আলফুলক' অর্থ যদি নবী নুহের বজরাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে এরকম— আল্লাহ্পাক তাদের পিতৃপুরুষদেরকে বজরায় আরোহণ করিয়েছিলেন তখন, যখন তাদের পরবর্তী বংশধরেরা ছিলো অজ্ঞ তাদের পৃষ্ঠদেশে। এমতাবস্থায় 'জুররিয়্যাত' কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হবে যুগপৎ বিস্ময় ও আশার সঞ্চার করা।

'মিম্ মিছলিহী' অর্থ অনুরূপ। অর্থাৎ নবী নুহের জাহাজের মতো। 'মা ইয়ারকাবুন' অর্থ তারা আরোহণ করে যাতে। যেমন জলে জলযান এবং স্থলে মরুজাহাজ উষ্ট্র এবং জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষের এমতো অন্যান্য বাহনসমূহ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না—(৪৩) আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ না করতে দিলে(৪৪)।

এখানে 'ওয়া ইন্ নাশা নুগরিকহুম' অর্থ আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি। 'ফালা সরীখা লাহুম' অর্থ সে অবস্থায় তাদের থাকবে না কোনো সাহায্যকারী, যে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে ওই নিশ্চিত নিমজ্জন থেকে। অথবা বলা যায়, সে অবস্থায় কেউ সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করবারও অবকাশ পাবে না। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— সে অবস্থায় কেউই আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

'ইল্লা রহমাতাম্ মিন্না' অর্থ আমার অনুগ্রহ না হলে। আর 'ওয়া মাতাআ'ন ইলা হীন' অর্থ এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে। এখানে 'হীন' অর্থ কিছুকাল, আয়ুষ্কাল, যা আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্ধারিত।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

❑ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার',

❑ এবং যখনই উহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন উহাদের নিকট আসে, তখনই উহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

❑ যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর' তখন কাফিরগণ মু'মিনদিগকে বলে, 'যাহাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে খাওয়াইতে পারিতেন আমরা কি তাহাকে খাওয়াইব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।'

❑ উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?'

❑ ইহারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যাহা ইহাদিগকে আঘাত করিবে ইহাদের বাক-বিতণ্ডাকালে।

❑ তখন উহারা ওসিয়াত করিতে সমর্থ হইবে না এবং নিজেদের পরিবারপরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতেও পরিবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যখন তাদেরকে অতীত ও ভবিষ্যতের অকল্যাণ সম্পর্কে সাবধান হতে বলা হয় এবং আহ্বান জানানো হয় আল্লাহ্র অনুগ্রহের অনুকূল জীবন যাপনের প্রতি, তখন তারা সে শুভআহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'মা বাইনা আইদীকুম' (যা রয়েছে তোমাদের সম্মুখে) অর্থ পরকাল। আর 'মা খলফাকুম' (যা আছে তোমাদের পশ্চাতে) অর্থ ইহকাল। অর্থাৎ কর্ম করো আখেরাতের জন্য এবং সতর্ক জীবনযাপন করো ইহকালে। পৃথিবীর প্রেমে নিমজ্জিত হয়ো না। কাতাদা বলেছেন, এখানে 'মা বাইনা আইদীকুম' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে অতীতের অবাধ্যদের ধ্বংসের ঘটনাবলীর দিকে এবং 'মা খলফাকুম' বলে বুঝানো হয়েছে পারলৌকিক শাস্তিকে। কেউ কেউ বলেছেন, নৈসর্গিক বিপদাপদকে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা কি দ্যাখে না, তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে বিপদ— পৃথিবীজাত ও আকাশাগত'।

'লাআ'ল্লাকুম তুরহামুন' অর্থ যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো। অর্থাৎ তোমরা যেনো আশাধারী হতে পারো আল্লাহ্র করুণার।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'এবং যখনই তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোনো নিদর্শন তাদের নিকট আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ

ফিরিয়ে নেয়'। একথার অর্থ— তারা এতোই হতভাগা যে, আল্লাহ্র কোনো একটি নিদর্শনকেও সম্মান করতে জানে না। মান্য করে না আল্লাহ্র মহাপ্রতাপশালিতার প্রমাণকে। তারা যে চিরভ্রষ্ট।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করো, তখন কাফেরেরা মুমিনদেরকে বলে, যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন, আমরা কি তাকে খাওয়াব'?

এখানে ‘ব্যয় করো’ অর্থ অভাবগ্রস্তদেরকে দান করো। ‘যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন, আমরা কি তাকে খাওয়াবো’ অর্থ অভাবগ্রস্তদেরকে তারা দান তো করেই না, উপরন্তু তাদের এমতো অপকর্মের পক্ষে তারা অপযুক্তি উপস্থাপন করে এভাবে— রিজিকদাতা তো আল্লাহ্ স্বয়ং। কারো রিজিক পাওয়া না পাওয়া তো সম্পূর্ণতই তাঁর ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তিনি যাকে অন্নদান করতে চান না, সে-ই তো অভুক্ত থাকে। তাই বুঝতে হবে, অভুক্তকে আহার প্রদান আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহলে আমরা যাবো কেনো? কেনো দান করতে যাবো তাকে, যাকে আল্লাহ্ই দান করেননি? কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, অভাবী মুসলমানেরা কাফের কুরায়েশদের কাছে কিছু যাচনা করলে তারা
এরকম বলতো। ইসমাইল ইবনে খালেদ থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির এবং হাসান বসরী থেকে ইবনে আবী হাতেম। উল্লেখ্য, ‘অভিপ্রায়’ ও ‘নির্দেশ’ নিশ্চয়ই এক কথা নয়। মানুষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালনের। আল্লাহ্র চিরদুর্জ্ঞেয় ও সততস্বাধীন অভিপ্রায়ের রহস্যোদ্ধার তাদের দায়িত্ব নয়। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা স্বচ্ছধারণাবিবর্জিত বলেই এমতো মূর্খজনোচিত উক্তি করে থাকে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো’। উক্তিটি হতে পারে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের। যদি তাই হয়, তবে এর মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে মুসলমানেরা! তোমরা আমাদেরকে আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে বলছো। দান করতে বলছো তাদেরকে, যাদেরকে দান করা আল্লাহ্র ইচ্ছা নয়। অতএব তোমরাই রয়েছো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। আবার কথাটি বিশ্বাসীদেরও হতে পারে। যদি
তাই হয় তবে মর্মার্থ দাঁড়াবে— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। তোমরা অজ্ঞ, তাই আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে অনীহ। দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য শুরু করেছো কুটতর্ক। সুতরাং তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্ত।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— ‘তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বলো, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আমার প্রিয়তম নবী ও তাঁর সহচরবর্গকে লক্ষ্য করে আরো বলে, তোমরা বলো, আল্লাহ্র নির্দেশ না মানলে আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কই শাস্তি-টাস্তি তো কিছুই হয় না আমাদের। তাই বলি, তোমাদের কথা যদি সত্যিই হয়, তবে বলো, কবে আসবে তথাকথিত শাস্তি?

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— ‘তারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাকবিতণ্ডাকালে’।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘মহানাদ’ অর্থ মহাপ্রলয়ের প্রাক্কালের প্রথম শিঙ্গাধ্বনি।

একটি সংশয় ঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো শিঙ্গাধ্বনির কথা বিশ্বাসই করে না। তাহলে এখানে ‘তারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের’ এরকম করে বলা হলো কেনো?

সংশয়ভঞ্জন ঃ এখানে অপেক্ষা করার অর্থ তাদের অপরাধপ্রবণতা পরিহার না করা। অর্থাৎ আমৃত্যু পাপমগ্ন থাকা। অথবা পাপকর্মে নিমগ্ন থাকা অবস্থায় মহাপ্রলয় উপস্থিত হওয়া, যাতে করে দৃশ্যতঃ মনে হয়, তারা যেনো পাপ পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে ওই শিঙ্গাধ্বনির অপেক্ষাতেই ছিলো।

‘যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের বাক-বিতণ্ডাকালে’ অর্থ শিঙ্গার ফুৎকার উত্থিত হবে সহসা, যখন তারা থাকবে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যকার ঘোর পার্থিব কর্মে কোলাহলমুখর।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, বাজারে বস্ত্রবিক্রেতা ও ক্রেতা কাপড়ের দরদাম ঠিক করতে থাকবে। তাদের দরদাম, কাপড়গোছানো এসকল কিছু শেষ হতে না হতেই অকস্মাৎ শুরু হবে শিঙ্গার ফুৎকারের সুবিকট আওয়াজ। এভাবে কেউ তখন তার উষ্ট্রী দোহন করে দুধ নিয়ে ফিরতে থাকবে স্বগৃহে, কিন্তু দুধপানের অবকাশ সে পাবে না, কেউ আহারকালে আহারের গ্রাস ওঠাবে মুখের কাছে, কিন্তু অবকাশ পাবে না তা গলাধঃকরণের।

ফারইয়াবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে হঠাৎ, যখন মানুষ বাজারে ব্যস্ত থাকবে ক্রয়-বিক্রয়ে। বস্ত্রবিক্রেতা মাপতে থাকবে কাপড়, দুগ্ধদোহন করতে থাকবে উটের রাখাল, আবার কেউ ব্যস্ত থাকবে দুনিয়ার নানা কাজে।

এর পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— ‘তখন তারা ওসীয়ত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে আসতেও পারবে না’।

হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম থেকে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ তাঁর ‘জাওয়াইদুজ্ জুহুদ’ গ্রন্থে লিখেছেন, কিয়ামত এসে পড়বে অতর্কিতে, যখন কাপড়ের দোকানদার মেপে দিতে থাকবে বিক্রিত কাপড়, দোহনকারী দুগ্ধদোহন করতে থাকবে তার উষ্ট্রীর। এরপর তিনি পাঠ করলেন ‘তখন তারা ওসীয়ত করতে সমর্থ হবে না ......’। অর্থাৎ কিয়ামত শুরু হলে কেউ তার

পরিবার-পরিজনকে বৈষয়িক বিষয়ে কোনো ওসীয়ত করবার অবকাশই পাবে না। এমনকি নিজের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে মিলিত হবার সময়ও তারা পাবে না। তার আগেই ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮

❑ যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখনই তাহারা কবর হইতে ছুটিয়া আসিবে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে।

❑ উহারা বলিবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? দয়াময় আল্লাহ্ তো ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন।'

❑ ইহা হইবে কেবল এক মহানাদ; তখনই ইহাদের সকলকে উপস্থিত করা হইবে আমার সম্মুখে,

❑ আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

❑ এই দিন জান্নাতবাসিগণ আনন্দে মগ্ন থাকিবে,

❑ তাহারা এবং তাহাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে।

❑ সেথায় থাকিবে তাহাদের জন্য ফলমূল এবং তাহাদের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু,

❑ সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সম্ভাষণ।

'ওয়া নুফিখা ফিস্ সূর' অর্থ আর যখন শিঙ্গার ফুৎকার দেওয়া হবে। বিষয়টি সুনিশ্চিত। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীত কালার্থক শব্দ 'নুফিখা', যেনো তা হয়েই গিয়েছে।

এখানে বলা হয়েছে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকারধ্বনির কথা। প্রথম ফুৎকারে জীবিত সকল কিছু মৃত্যুবরণ করবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকার শুনে সকলে পুনরুত্থিত হবে তাদের আপনাপন সমাধিস্থল থেকে। ছুটে যাবে বিচারের ময়দানে। তাই এখানে বলা হয়েছে— তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে।

দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে এরকম বলেছেন ইবনে আবী হাতেম। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা একবার এক সমাবেশে বললেন, রসুল স. বলেছেন, দুই ফুৎকারের মধ্যকার ব্যবধান হচ্ছে চল্লিশ।
লোকেরা বললো, চল্লিশ কী— দিন, মাস, না বৎসর? তিনি বললেন, জানি না। কেননা রসুল স. একথা স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু সর্বোন্নত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে চল্লিশ বৎসরের।

'জ্বদছ' এর বহুবচন 'আজ্বদাছ'। এর অর্থ সমাধিসমূহ। 'ইয়ান্সিলূন' অর্থ উত্থিত হবে, ছুটে আসবে। 'নাসল' এর ধাতুগত অর্থ একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। যেমন বলা হয় 'নাসালাল ওয়াবারু মিনাল বায়ীর' (উট থেকে তার পশম পৃথক করা হয়েছে)। সন্তান যেমন এক সময় পিতা থেকে পৃথক হয়ে যায়, তেমনি তখন সমাধি থেকে পৃথক হয়ে যাবে সমাধিবাসীরা। কোনো কোনো ভাষাবিদ শব্দটির অর্থ করেছেন— দ্রুতগতিতে ছুটে আসা। অর্থাৎ কবরবাসীরা তখন ছুটে আসবে তাদের

প্রভুপ্রতিপালক সকাশে। 'কামুস' অভিধানেও শব্দটির অর্থ করা হয়েছে এভাবে। এর ধাতুমূলরূপ হচ্ছে— নাসল, নাসীল ও নুসলান।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে ওঠালো'। বিষয়টি ধ্রুবসত্য। তাই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সুনিশ্চিতার্থক অতীতকালের ক্রিয়াপদ। কিন্তু এর অর্থ হবে ভবিষ্যতকালের। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন এরকম কথা অবশ্যই বলবে।

এখানকার 'ওয়াইল' শব্দটি ধাতুমূল হলেও এ থেকে কোনো শব্দ নিস্পন্ন হয় না। অধিকাংশ ভাষাবিশারদদের মতে এর ধাতুগত কোনো অর্থ নেই। তবে একথা সর্বজনবিদিত যে, 'ওয়াইল' হচ্ছে নরকের একটি ভয়ংকর অধিত্যকার নাম। আবার কামুস রচয়িতা বলেছেন, শব্দটির অর্থ পাঁকে পড়া, দুর্ভোগকবলিত হওয়া। তাই এখানে শব্দটির বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে আক্ষেপপ্রকাশক অভিব্যক্তিরূপে এভাবে— হায়! দুর্ভোগ আমাদের।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে আহমদ, তিরমিজি, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও হান্নাদ কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক প্রত্যয়িত এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম 'ওয়াইল'। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চল্লিশ বৎসর ধরে ক্রমাবতরণ করে পৌঁছে যাবে ওই ঝুলন্ত উপত্যকায়।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে সাঈদ ইবনে মনসুর, ইবনে মুনজির ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, জাহান্নামের এক উপত্যকার নাম 'ওয়াইল'। সেখানে জমা হবে জাহান্নামীদের পুঁজ ও রক্ত। উপত্যকাটি নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র রসুলের অস্বীকারকারীদের জন্য। হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান থেকে ইবনে জারীর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকস্থিত একটি পাহাড়ের নাম 'ওয়াইল'।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে শিথিল সূত্রে বায্যার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নরকে রয়েছে একটি সুউচ্চ শৈলশিখর। আরাফবাসীরাও শৈলচূড়ায় ওঠানামা করতে থাকবে। ওই শৈলচূড়ার নাম 'ওয়াইল'।

'মাম্ বাআ'ছনা মিম্ মারক্বদিনা' অর্থ, কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে ওঠালো? হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা বলেছেন, শিঙ্গার দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি স্থগিত থাকবে। তাই তারা তখন থাকবে ঘোর সুখনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। দ্বিতীয় ফুৎকার ধ্বনিত হলে তারা হতচকিত হয়ে বলবে, কে আমাদেরকে জাগালো?

মুতাজিলারা বলে, কবরে কোনো আযাব হবে না। আলোচ্য বাক্যকেই তারা তাদের অভিমতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। বলে, কবর যদি নিদ্রাস্থলই হয়, তবে সেখানে আর আযাবের অবকাশ কোথায়? কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেন, তারা তো নিদ্রামগ্ন থাকবে দুই ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে। সুতরাং তার পূর্বে কবর আযাব হবে না, একথা কীভাবে বলা যায়? তাত্ত্বিকগণ বলেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যখন পুনরুত্থিত হয়ে জাহান্নামের ভয়ংকরতা দেখবে, তখন ওই আযাবের তুলনায় তাদের কাছে কবর আযাবকে মনে হবে স্বপ্নপুরীসদৃশ। তাই তারা তখন বলবে, হায়রে! কে আমাদেরকে জাগালো স্বপ্নিল সুপ্তি থেকে?

এরপর বলা হয়েছে— 'দয়াময় আল্লাহ্ তো তারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসুলগণ সত্যিই বলেছিলেন'। উল্লেখ্য, সেদিন অবিশ্বাসীদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসবে এমতো বিশ্বাসানুকূল উক্তি। কেউ কেউ বলেছেন, এমতো উক্তি উচ্চারণ করবে ফেরেশতারা এবং সেটা হবে অবিশ্বাসীদের 'কে আমাদেরকে জাগালো' প্রশ্নের জবাব। মুজাহিদ বলেছেন, অবিশ্বাসীদের এমতো প্রশ্নের জবাবে এরকম কথা বলবে বিশ্বাসীরা। তবে একথা ঠিক যে, আলোচ্য বাক্য কোনো প্রশ্নের জবাব নয়। কারণ আলোচ্য আয়াত প্রশ্নোত্তরাকারসম্পন্ন নয়। বরং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদেরকে তাদের অপপরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেওয়াই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কথাটির মাধ্যমে তাদেরকে একথাই বলে দেওয়া হয়েছে যে, মহাপুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার এবং রসুলের বাণী সত্য। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে আল্লাহ্‌র যে প্রতিশ্রুতি ও রসুলের যে সতর্কবাণী অস্বীকার করেছিলে, আজ দ্যাখো আল্লাহ্ তা বাস্তবায়ন করলেন। দেখালেন সত্যের স্বরূপ। সুতরাং 'কে আমাদেরকে জাগালো' এরকম প্রশ্ন এখন নিষ্ফল।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'এটা হবে কেবল এক মহানাদ, তখনই এদেরকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে'। একথার অর্থ— শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকারধ্বনিও একটি মাত্র সুবিকট আওয়াজ। ওই আওয়াজ ফুৎকারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল মানুষকে বিচারার্থে উপস্থিত করা হবে আমার সকাশে। এরও কোনো অন্যথা ঘটবে না।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে'। একথার অর্থ— আজ প্রতিফল প্রদান দিবস। আজ দেওয়া হবে সকলের কর্মকাণ্ডের যথোপযুক্ত বিনিময়। চিরশাস্তি, অথবা চিরস্বস্তি। কারো প্রতি কোনো অন্যায়াচরণ করা হবে না।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— **'এই দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে'**।

এখানকার **'শুগুল'**(আনন্দে মগ্ন থাকবে) কথাটির মর্মার্থ গ্রহণে ভাষাবিশারদগণ মতদ্বৈধতা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আনন্দ' অর্থ দুই সন্তানের জননীর সঙ্গে সহবাসের মতো পুলক। ওয়াকী ইবনে জাররাদ বলেছেন, এর অর্থ সঙ্গীতানন্দ। আরো বলেছেন, জান্নাতীগণ থাকবে জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতত নির্ভয় ও নির্লিপ্ত। সেটাই হবে তাদের আনন্দমগ্ন থাকা। কালাবী বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতের নেয়ামতসম্ভারের মধ্যে থাকবে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত। নারকীদের কথা তাদের মনেই থাকবে না। হাসান বলেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতের আদর আপ্যায়নে থাকবে আসক্তা নিমজ্জিত। ইবনে কীসানের মতে তারা থাকবে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, জান্নাতবাসীরা যে যা পছন্দ করে তাই নিয়ে মত্ত থাকবে তখন।

আধ্যাত্মিক সাধকগণের আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। সেকারণেই তাঁরা জান্নাতে উপভোগ করবেন কেবল আল্লাহ্দর্শনের আনন্দ। ওই পবিত্র দর্শনই তাঁদের **'শুগুল'**। আবার অনেক জান্নাতবাসীর **'শুগুল'** হবে তখন পানাহার, রতিবিহার, সঙ্গীত ইত্যাদি। এ সম্পর্কে আবু নাঈম খাজা বায়েজীদ বোস্তামীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। উক্তিটি এরকম— আল্লাহ্র এমন অনেক বান্দা রয়েছেন, যাঁরা জান্নাতে মশগুল থাকবেন কেবল আল্লাহ্র দীদার নিয়ে। যদি কখনো তাতে ছেদ পড়ে, তবে তারা চিৎকার করে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাবার জন্য ফরিয়াদ জানাতে থাকবেন, যেমন করে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাবার জন্য ফরিয়াদ জানাবে জাহান্নামবাসীরা।

'শুগুল' শব্দটির সঙ্গে তান্ভীন সংযোগ করে করা হয়েছে **'শুগুলিন্'**। এই তান্ভীন আভিজাত্যপ্রকাশক। অর্থাৎ এরকম তান্ভীন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে জান্নাতবাসীদের অনন্য আভিজাত্য প্রকাশার্থে। তাঁদের সেখানকার সম্ভোগসম্ভার হবে অফুরন্ত। সে সকল সম্ভোগোপকরণের পরিমাপ করার সাধ্য কারো নেই।

এখানকার **'ফাকিহুন'** শব্দটি সাধিত হয়েছে **'ফাকাহাতুন'** থেকে। এর অর্থ মগ্নতা, মত্ততা। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা সেখানকার আনন্দে থাকবে পূর্ণনিমগ্ন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সীমাহীন আনন্দে তখন বুঁদ হয়ে থাকবে তারা।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— **'তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে'**।

এখানে **'জিলালিন্'** অর্থ সুশীতল ছায়া। **'জেল'** এর বহুবচন **'জিলাল'**। অথবা **'জিলাল'** বহুবচন **'জুল্লাতুন'** এর। **'জুল্লাতুন'** অর্থ ছায়াপ্রদায়ক বস্তু, যা প্রতিহত করে সূর্যোত্তাপ। যেমন বাসগৃহ, তাঁবু, ঘনপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ।

'আরিকা'র বহুবচন **'আরাইক'**। এর অর্থ অন্তরায় সৃষ্টিকারী মশারী। ছা'লাবীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বাগবী লিখেছেন, অন্তরায়বিবর্জিত মশারী **'আরিকা'** নয়। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মশারীআচ্ছাদিত শয়নশয্যা আড়ালশূন্য হলে তাকে **'আরিকা'** বলে না। অন্তরালবিবর্জিত শয্যা বা আসনও **'আরিকা'** নয়। বরং অন্তরায়াচ্ছাদিত শয়নশয্যা অথবা রাজসিংহাসনকেই বলে **'আরিকা'**। আর এমতো সুআবৃত ও সুসজ্জিত আসনেই হেলান দিয়ে সস্ত্রীক উপবেশন করবে জান্নাতবাসীরা। মুজাহিদের উক্তি উদ্ধৃত করে বায়হাকী বলেছেন, তাদের ওই সুখাসনগুলোর মশারী হবে ইয়াকুতবিশিষ্ট ও মনি-মুক্তার সূত্রসম্বলিত।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— **'সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং তাদের জন্য বাঞ্ছিত সকলকিছু'**। একথার অর্থ— সেখানে পানাহারের প্রকৃষ্ট উপকরণও মওজুদ থাকবে তাদের জন্য। এছাড়া তারা যা চাইবে, তা-ই পাবে। **'বাঞ্ছিত সকলকিছু'** কথাটির অর্থ হবে এখানে— পৃথিবীর জীবনে জান্নাতের অফুরন্ত সুখ তারা যেভাবে চাইতো, সেখানে তা তেমনই পাবে।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— **'সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্ভাষণ'**। একথার অর্থ— আল্লাহ্পাক তাদেরকে সালাম জানাবেন সরাসরি। অথবা সালাম পৌঁছানো হবে তাঁর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। ওই শান্তিসম্ভাষণই হবে বেহেশতবাসীদের সকল সুখের সূত্র।

হজরত জাবের সূত্রে ইবনে মাজা, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া, আজারী ও দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকবে, তখন হঠাৎ তাদের উপরে পতিত হবে একটি জ্যোতির সম্পাত। শিরোত্তোলন করতেই তারা দেখতে পাবে, আবির্ভাব ঘটেছে আল্লাহ্র উদাহরণরহিত উপস্থিতির। তখন তিনি জান্নাতবাসীদেরকে শোনাবেন শান্তিসম্ভাষণ। বলবেন, তোমাদের উপরে শান্তি, কেবলই শান্তি। ওই শান্তিবারতার কথাই বলা হয়েছে 'সালামুন ক্বওলাম্ মির রব্বির রহীম' আয়াতে। তিনি স. আরো বলেছেন, জান্নাতবাসীরা তখন অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন জ্যোতিচ্ছটার দিকে। আল্লাহ্ও তখন অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখতে থাকবেন তাঁর প্রিয়তম বান্দাদেরকে। ওই সময় জান্নাতের অফুরন্ত সম্ভোগসম্ভারের কথা আর তাদের মনেই থাকবে না। দীদার। কেবলই দীদার। হুঁশ হবে তখন,

যখন মাঝখানে সৃষ্টি করা হবে অন্তরাল। কিন্তু দীদারের রেশ চলতে থাকবে তখনো, জান্নাতের অলি, গলি, অলিন্দে, সবখানে।

আল্লামা সুয়ূ্যতী বলেছেন, আল্লাহ্‌পাকের দীদার সংঘটিত হবে স্থানাতীত ও কালাতীত পর্যায়ে। কেননা তিনি স্থান ও কালসম্ভূত নন।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে শান্তিসম্ভাষণ জানাবে ফেরেশতারা। মুকাতিল বলেছেন, জান্নাতের প্রতিটি দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে ফেরেশতামণ্ডলী। তারা উচ্চারণ করতে থাকবে— ওহে অক্ষয় সৌভাগ্যাধিকারী ব্যক্তিবর্গ! শোনো সম্ভাষণ— শাশ্বত শান্তির— চিরায়ত নিরাপত্তার।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭

❑ আর 'হে অপরাধিগণ! তোমরা আজ পৃথক হইয়া যাও।'

❑ হে বনী আদম! আমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করিও না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

❑ আর আমারই 'ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

❑ শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, তবুও কি তোমরা বুঝ নাই?

❑ ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

❑ আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা ইহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলে।

❑ আমি আজ ইহাদের মুখ মোহর করিয়া দিব, ইহাদের হস্ত কথা বলিবে আমার সহিত এবং ইহাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে ইহাদের কৃতকর্মের।

❑ আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই ইহাদের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতাম, তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিতে পাইত!

❑ এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই স্ব স্ব স্থানে ইহাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতাম, ফলে ইহারা চলিতে পারিত না এবং ফিরিয়াও আসিতে পারিত না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আর হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও'। মুকাতিল, সুদ্দী ও জুজায বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হবে— হে পাপিষ্ঠের দল! তোমরা আজ পুণ্যবানদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে যাও। একথা বলেই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদেরকে পৃথক করে ফেলা হবে চিরতরে। তাদের জন্য নির্ধারণ করা হবে চিরকালীন জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

জুহাক বলেছেন, অবিশ্বাসীদেরকে বন্দী করা হবে দোজখের একটি প্রকোষ্ঠে। তারপর বন্ধ করা হবে তার অগ্নিতোরণ। তখন তারা কোনোকিছুই আর দেখতে পাবে না। দৃষ্ট হবে না তারাও।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবার পর জাহান্নামীদেরকে আবদ্ধ করা হবে লোহার সিন্দুকে। তারপর তার ডালা বন্ধ করে দেওয়া হবে লৌহকীলক দিয়ে। ওই সিন্দুকটি আবার আবদ্ধ করা হবে আর একটি ধাতুনির্মিত সিন্দুকের মধ্যে। তারপর সেটিকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের অন্ধকার গহ্বরে। তখন তারা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাবে না। তাই অন্যের শাস্তিও থাকবে তাদের দৃষ্টিবহির্ভূত। সুয়াইদ ইবনে আলকামা সূত্রে আবু নাঈম ও বায়হাকীও হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কোরো না, কারণ সে তোমাদের
প্রকাশ্য শত্রু (৬০)? আর আমারই ইবাদত করো, এটাই সরল পথ (৬১)। শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিলো, তবুও কি তোমরা বুঝনি (৬২)'?

এখানে 'আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি' অর্থ আমি কি আমার নবী-রসুলগণের মাধ্যমে শয়তানের আনুগত্যের অনিষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেইনি? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এরকম না বাচক প্রশ্নের অস্বীকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় হাঁ বাচকতা। তাই কথাটির সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— আমি তো তোমাদেরকে পূর্বাহ্নেই এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। বাক্যটি পূর্বের 'তোমরা আজ পৃথক

হয়ে যাও' নির্দেশটির কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ হে অপরাধীরা! আজ তোমাদেরকে পুণ্যবানদের কাছ থেকে পৃথক হবার নির্দেশ দিচ্ছি এই কারণে যে, তোমরা আমা কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বসতর্কতাকে মান্য করোনি।

'লা তা'বুদুশ্ শায়ত্বান' অর্থ শয়তানের দাসত্ব কোরো না। অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্যকে পরিহার করে গ্রহণ কোরো না শয়তানের আনুগত্যকে। 'ইন্নাহু লাকুম আদুউউম মুবীন' অর্থ কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অর্থাৎ শয়তান যে তোমাদের নিশ্চিত দুশমন। সেকারণেই তো নিষেধ করেছিলাম তার দাসত্ব করতে।

'হাজা সিরাতুম্ মুসতাক্বীম' অর্থ এটাই সরল পথ। এখানে 'সিরাত' শব্দটি 'তান্ভীন' সংযোগে সন্নিবেশিত করা হয়েছে আধিক্য প্রকাশার্থে। কিংবা আংশিকতা বোঝানোর জন্য। কারণ 'তাওহীদ' (আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস) সরল পথে চলার একটি অংশ।

'জিবিল্লান' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে সৃষ্টজীব, অথবা একটি দলকে, যারা অর্জন করেছে পূর্ণজ্ঞান, অথবা পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা। 'শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিলো' কথাটি শয়তানের শত্রুতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা বিভ্রান্ত করা শত্রুতামূলক কাজ। আর এ কাজেই সে থাকে সতত সচেষ্ট। সুতরাং সে যে আদমসন্তানদের শত্রু, সেকথা সুনিশ্চিত। আল্লাহ্তায়ালাই সকল ইষ্ট-অনিষ্টের অধিকর্তা। অথচ সে পরিত্রাণ প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য মানুষকে প্ররোচিত করে মূর্তির ইবাদত করতে। এভাবে তাদেরকে লিপ্ত করায় শিরিকের মতো অনপনেয় পাপে।

'আফালাম তাকূনূ তা'ক্বিলুন' অর্থ তবুও কি তোমরা বুঝনি? প্রশ্নটি ভর্ৎসনা ও হুমকিপ্রকাশক।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এটাই সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো (৬৩)। আজ তোমরা এতে প্রবেশ করো, কারণ তোমরা একে অস্বীকার করেছিলে (৬৪)।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দিবো, এদের হাত কথা বলবে আমার সঙ্গে এদের চরণ সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের'।

মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্পাক কাফেরদের জবান বন্ধ করে দিবেন। তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাকশক্তি দিয়ে। সেই বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে এখানে। এ প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একদিন আমরা রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি স. মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো, কেনো আমি সম্মিত হলাম? আমরা বললাম, আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুলই তা উত্তমরূপে অবগত। তিনি স. বললেন, শোনো তাহলে, মহাবিচারের সময় এক লোক আল্লাহ্কে বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা। তুমি আমাকে জুলুম থেকে রেহাই দাওনি। আল্লাহ্

বলবেন, কীভাবে? সে বলবে, আমি নিজের সাক্ষ্য ছাড়া আর কারো সাক্ষ্য মানি না। আল্লাহ্ বলবেন, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তাহলে সাক্ষ্য দিক। এরপর তার মুখে এঁটে দেওয়া হবে কুলুপ। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে করা হবে বাকশক্তিসম্পন্ন। তারা তখন

প্রকাশ করতে থাকবে তার অপকর্মসমূহের ফিরিস্তি। শেষে যখন তার মুখের কুলুপ খুলে দেওয়া হবে, তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে, দূর হও। নিপাত যাও। আমি তো ভেবেছিলাম, তোমরাই আমাকে রক্ষা করবে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমরা পরকালে কীভাবে আল্লাহ্‌কে দেখবো? তিনি স. বললেন, নির্মেঘ আকাশে দ্বিপ্রহরের সূর্যদর্শন কি অন্তরালসম্পন্ন হয়? সাহাবীগণ বললেন, না। তিনি স. বললেন, পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশের পূর্ণচন্দ্রিমা কি দর্শনবিমুক্ত থাকে? সকলে সমস্বরে বললেন, না। তিনি স. বললেন, শপথ ওই পবিত্রাতিপবিত্র সত্তার! যার অধিকারে আমার জীবনদীপ, তোমাদের আল্লাহ্ দর্শনও হবে তেমনি অবাধ। আল্লাহ্ তখন তাঁর এক বান্দাকে ডেকে বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে আভিজাত্যমণ্ডিত করিনি? করিনি কি জননেতা? দান করিনি কি সহধর্মিণী? গৃহপালিত পশুগুলোকে কি করিনি তোমাদের আজ্ঞাবহ? দেইনি কি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক চতুর্থাংশ অংশের সম্ভোগাধিকার? বান্দা বলবে, নিশ্চয়। আল্লাহ্ বলবেন, আজকের এই মহাসম্মেলনের প্রতীতি কি তোমার ছিলো? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ্ বলবেন, ঠিক আছে, তুমি যেমন আমাকে বিস্মৃত হয়েছিলে, তেমনি আজ আমিও তোমাকে বিস্মৃতিভূত করলাম।

এরপর আল্লাহ্‌পাক সাক্ষাতকার গ্রহণ করবেন তাঁর আর এক বান্দার। তার সঙ্গেও প্রশ্নোত্তর হবে এরকমই। এরপর প্রশ্ন করবেন তৃতীয় আর একজনকে। সে হবে কপটাচারী। আল্লাহ্‌র প্রশ্নের উত্তরে সে বলতে থাকবে, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা! আমি ইমান এনেছিলাম তোমার উপর। তোমার বাণী ও তোমার প্রেরিত পুরুষগণের উপর। নামাজ পড়েছিলাম। জাকাতও দিয়েছিলাম। এরপর সে শুরু করবে আল্লাহ্‌র উচ্ছ্বসিত স্তব-স্তুতি। আল্লাহ্ রোষান্বিত হবেন। বলবেন, এবার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। সে তখন বিপাকে পড়বে। আল্লাহ্ তার মুখে কুলুপ এঁটে দিবেন। তার অপকর্মের ফিরিস্তি বর্ণনা করতে থাকবে তার উরুদেশ। মুসলিম। সর্বোন্নত সূত্রে হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে তিবরানী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন মুখে কুলুপ লাগিয়ে দেওয়া হলে সর্বপ্রথম সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে বাম উরু। মুয়াবিয়া ইবনে হাইদাহ্ সূত্রে আহমদ, নাসাঈ, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে তোমরা হবে চরম সংকটকবলিত। তোমাদের মুখ থাকবে বন্ধ। প্রথমে কথা বলবে তোমাদের বাম উরু ও হাত।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে পরীক্ষা করবার জন্য ডাকা হবে এক মুমিন বান্দাকে। তার প্রভুপালয়িতা নেপথ্য থেকে তার সম্মুখে উপস্থাপন করবেন তার

আমলনামা। সে সবিনয়ে স্বীকৃতি দিবে, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমলনামায় যা কিছু লেখা আছে, তার সবই আমি করেছি। আল্লাহ্ তখন তার পাপরাশির উপরে স্থাপন করবেন আবরণ। মার্জনা করবেন তাকে। তার পাপের কথা তাই কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না। কেবল তার পুণ্য নজরে আসবে সকলের। এরপর ডাকা হবে এক কপট বিশ্বাসীকে। তার সামনে তার আমলনামা হাজির করা হলে সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা। তোমার সম্মানের শপথ! আমলনামায় লেখা পাপগুলো আমি করিনি। তোমার ফেরেশতারা ইচ্ছে করে এগুলো লিখেছে। আল্লাহ্ বলবেন, মনে করে দ্যাখো তুমি এই অপকর্মগুলো করেছো অমুক অমুক স্থানে। সে বলবে, তোমার আভিজাত্যের কসম! আমি এগুলো করিইনি। এভাবে যখন সে অস্বীকার করতেই থাকবে তখন তাকে করা হবে বাকরুদ্ধ। হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেন, আমার ধারণা, এরপর রসুল স. বলেছিলেন, তখন প্রথমে বাকস্ফূরিত হবে তার উরুদেশ থেকে। এরপর তিনি স. আবৃত্তি করলেন 'আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দিব......'।

আবু ইয়ালী কর্তৃক বর্ণিত এবং হাকেম কর্তৃক যাচাইকৃত হজরত আবু সাঈদ খুদরীর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের প্রাক্কালে অবিশ্বাসীদের অপকর্ম সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে তাদেরকে দেওয়া হবে ধিক্কার। কিন্তু তারা তাদের অপরাধ অস্বীকার করবে। বলা হবে, তাহলে শপথ করে বলো। তারা উচ্চারণ করতে থাকবে শপথের পর শপথ। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে করবেন বাকহীন। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাতা হিসেবে দাঁড় করাবেন তাদেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে। তারপর তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন দোজখে।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই এদের চক্ষুগুলোকে লোপ করে দিতাম, তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেতো'?

এখানে 'আস্‌সিরাত' অর্থ পথ, ওই পথ যে পথে তারা চলতে অভ্যস্ত। আর 'কি করে তারা দেখতে পেতো' প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। বাগবী লিখেছেন, হাসান ও সুদ্দী কথাটির অর্থ করেছেন— তারা দেখতে সমর্থ হতো না পথের নিশানা। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, আতা ও মুকাতিলের অভিমত হচ্ছে, এখানে 'আ'ইয়ুন' অর্থ বিভ্রান্তির চক্ষু এবং চক্ষুগুলোকে লোপ করে দেওয়ার অর্থ এখানে চোখগুলোকে উপড়ে ফেলা। বিভ্রান্তির চক্ষুগুলোকে হেদায়েতের পথের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। তাই তাঁদের অভিমত্যানুসারে বক্তব্যের অর্থ দাঁড়াবে— আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদের চোখগুলো উপড়ে ফেলে দূরে নিক্ষেপ করতাম, যেনো তারা দেখতে না পায় বিভ্রান্তির পথ, যাতে করে তারা ফিরতে পারে সুপথের দিকে। কিন্তু আমার অভিপ্রায় তা নয়। সুতরাং তাদের পক্ষে সুপথদর্শন যে অসম্ভব।

এরপরের আয়াতে (৬৭) বলা হয়েছে— 'এবং আমি ইচ্ছা করলে অবশ্যই স্ব স্বস্থানে এদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিতাম, ফলে এরা চলতে পারতো না এবং

ফিরেও আসতে পারতো না'। একথার অর্থ— আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তো তাদেরকে তাদের বসতবাটিতেই রূপান্তরিত করে দিতে পারতাম শূকর ও বানরে। ফলে তারা হারিয়ে ফেলতো মানুষের মতো স্বাভাবিক গতিবিধি। ফিরেও পেতে পারতো না পূর্বরূপ। কেউ কেউ কথাটির অর্থ করেছেন— আমি তাদেরকে নিশ্চল পাথরে পরিবর্তিত করতে পারতাম। তখন তারা স্থবির হয়ে পড়ে থাকতো আপনাপন বাসগৃহে।

'ওয়ালা ইয়ারজ্বিউন' অর্থ তারা স্থানচ্যুত হতে পারতো না, হয়ে যেতো চলচ্ছক্তিরহিত। কেউ কেউ অর্থ করেছেন— আমার রসুলকে অস্বীকারের পর তারা আর ফিরে আসতে পারতো না স্বীকৃতিদাতারূপে।

হাসান বসরীর অভিমতানুসারে এই আয়াত ও এর পূর্বের আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এরকম— প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে তারা হয়েছে আকৃতি রূপান্তরের উপযুক্ত। কিন্তু আমি যে করুণার পারাবার, মার্জনার মহাসাগর। তাই তাদেরকে নিপতিত করিনি তাৎক্ষণিক শাস্তিতে। এটা হচ্ছে আমার পরম সহিষ্ণুতা ও নিগূঢ় প্রজ্ঞাময়তার এক অতুলনীয় নিদর্শন।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯, ৭০

❑ আমি যাহাকে দীর্ঘ জীবন দান করি প্রকৃতিগতভাবে তাহার অবনতি ঘটাই। তবুও কি উহারা বুঝে না?

❑ আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয় নহে। ইহা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন;

❑ যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে জীবিতগণকে এবং যাহাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি যাকে দীর্ঘ আয়ু দান করি, তাকে স্বাভাবিকভাবেই করে ফেলি বলহীন। অর্থাৎ প্রথমে তাকে দান করি যৌবনের শক্তিমত্তা, তারপর তার উপরে আরোপ করি বার্ধ্যক্যের দৌর্বল্য। এ হচ্ছে আমা কর্তৃক নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম।

এখানকার 'তবুও কি তারা বোঝে না' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তাদের এতটুকু বোধ থাকাই যথেষ্ট ছিলো যে, যে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ প্রকৃতিগতভাবে তাদের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম, তিনি তাদের দৃষ্টি শক্তি বিলোপ ও

আকৃতি পরিবর্তন করতেও নিশ্চয় সক্ষম। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসে শ্লথ গতিতে, আর তাদের আকৃতি পরিবর্তনের বিষয়টি হবে এক সঙ্গে।

কালাবীর বক্তব্যের অনুসরণে বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা রসুল স.কে মনে করতো কবি। বলতো কোরআন তাঁরই রচিত কাব্য। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (৬৯)। বলা হয়—

'আমি রসুলকে কাব্যরচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নয়'। একথার অর্থ— আমি আমার রসুলকে শিক্ষা দিয়েছি আমার বাণী আলকোরআন। এ বাণী প্রত্যাদেশিত। এ বাণী তার স্বসৃষ্ট বা স্বরচিত নয়। কবিতার মতো কল্পনাবিহার এবং ছন্দসর্বস্বতা এতে নেই। কেবল চিত্তবিনোদন এর লক্ষ্য নয়। আর আমার রসুলের জন্য এটা নিতান্ত অশোভন যে, তিনি শুধু দায়িত্বহীন শিল্পসৃষ্টিতে মগ্ন থাকবেন।

একটি সংশয় ঃ হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে বোখারী ও মুসলিম তাঁদের আপনাপন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. একবার একটি ছন্দবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন এভাবে— আনান্ নাবীয়্যু লা কাজিব ঃ আনাব্‌নু আবদিল মুত্তালিব (আমি একজন নবী, একথা অসত্য নয়। আর আমি তো পৌত্র আবদুল মুত্তালিবের)। হজরত জুনদুব ইবনে আবু সুফিয়ানের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার আবৃত্তি করেছিলেন— হাল আনতা ইল্‌লা ইসবুউ'ন রুমীতি ঃ ওয়া ফী সাবীলিল্লাহি মা

লাক্বীতি (আরে তুমি তো কেবল একটি আঙুল, আহত হয়েছো আল্লাহ্‌র পথে)। সুতরাং একথা কীভাবে বলা যায় যে, রসুল স. কাব্যরচনা করেননি?

সংশয়ের সমাধান ঃ উল্লেখিত পঙক্তিগুলো রসুল স. এর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। কথাগুলোকে কাব্যায়িত করার উদ্দেশ্য তাঁর ছিলো না। ছিলো না তা সচেতন কাব্যকল্পনাজাত। পঙক্তিশেষের মিলও সৃষ্টি হয়েছে কাকতালীয়ভাবে, দৈবাৎ। এরকম স্বতঃস্ফূর্ত দুই একটি পঙক্তির নির্মাতাকে কবি বলা যায় না। কোনো কোনো গদ্যেও রয়েছে ছন্দের ঝংকার। তাই বলে কি তা কবিতা? কাব্য তো কবির সচেতন শিল্পপরিকল্পনার ফসল। খলিল তো জনোন্মাদনামূলক কোরাসকে কবিতা বলার পক্ষপাতিই নন।

তাছাড়া কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. প্রথমোক্ত বাণীর শেষ শব্দটি পাঠ করেছেন হরকত সহযোগে। অর্থাৎ মুত্তালিব এর স্থানে তিনি স. পাঠ করেছিলেন 'মুত্তালিবি'। আর এরকম করলে অন্ত্যমিল আর থাকে না। আবার শেষোক্ত বাণীতেও অন্ত্যমিল পরিলক্ষিত হয় না। 'রুমীতি' ও 'লাক্বীত' এর মধ্যে কোনো মিল নেই। সুতরাং রসুল স. কবিদের মতো মিল দিয়ে বাক্য রচনা করতেন, একথা কিছুতেই বলা যায় না।

বাগবী লিখেছেন, রসুল স. অন্যের রচিত কবিতাও নিখুঁত অন্ত্যমিলসহ আবৃত্তি করতে পারতেন না। কিছু না কিছু অমিল থেকেই যেতো। হাসান সূত্রে তিনি

লিখেছেন, একবার রসুল স. উপদেশচ্ছলে আবৃত্তি করলেন— কাফা বিল ইসলামি ওয়াশ শাইবি লিল্‌মারই মাহিয়ান। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কবিরা কবিতাটি আবৃত্তি করেন এভাবে— 'কাফাশ্‌ শাইবু ওয়াল ইসলামু বিল মারই নাহিয়ান'। রসুল স. পুনরায় আবৃত্তি করলেন। কিন্তু এবারও উচ্চারিত হলো আগের মতো। তখন হজরত আবু বকর বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্‌র সত্য পয়গম্বর। কবি কিছুতেই নন। আল্লাহ্‌পাক তো স্বয়ং ঘোষণা করেছেন 'আমি রসুলকে কাব্যরচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নয়'।

আবদুর রহমান ইবনে আবীয্ যানাদের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. একবার আব্বাস ইবনে মারদাসকে বললেন, বলো, তোমরা কি এই কবিতাটি এভাবে পাঠ করো— আসবাহা নাহবী ওয়া নাহবুল আবীদ্ ✻ বাইনাল আকরাআ ওয়া উয়াইনাতা? হজরত আবু বকর আবৃত্তি শুনে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল স. আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক আমার জনয়িতা-জনয়িত্রী। আপনি না আবৃত্তিকার, না কবি। আর কাব্যনিষ্ঠ হওয়া আপনার জন্য সঙ্গতও নয়। কবিরা তো পঙক্তিটি উচ্চারণ করে এভাবে— বাইনা উয়াইনাতা ওয়াল আক্‌রাই।

মিকদাম ইবনে শুরাইহের পিতা বর্ণনা করেছেন, আমি একবার উম্মতজননী হজরত আয়েশার নিকটে জানতে চাইলাম, মহাসম্মানিতা মাতঃ! রসুল স. কি কখনো দৃষ্টান্ত হিসেবে কোনো কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একবার তিনি স. ইবনে রওয়াহার কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন এভাবে— ওয়া ইয়াতীকাল আখবার মাল্‌লাম তুযাওভিদী। মুয়াম্মারের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, একবার জনৈক ব্যক্তি জননী আয়েশার নিকটে জানতে চাইলেন, রসুল স. প্রসঙ্গক্রমে কবিতা থেকে কি কোনো উদ্ধৃতি দিতেন? তিনি বললেন, কবিতা ছিলো তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক অনাগ্রহের বিষয়। তাই তিনি তাঁর বক্তব্যকে রাখতেন সাধারণতঃ কাব্য-উদ্ধৃতিমুক্ত। তবে আমি তাঁকে একবার কায়েস ইবনে তরফ গোত্রের এক কবির কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি। কবিতাটি এরকম—

সাতুব্‌দী লাকাল আইয়্যামু মা কুনতা জ্বাহিলান
ওয়া ইয়াতিকা বিল আখবারি মাল্‌লাম তুয়াওভিদী।

কিন্তু রসুল স. শেষ চরণটি আবৃত্তি করেছিলেন এভাবে— ওয়া ইয়াতীকা মাল্‌লাম তুয়াওভিদী বিল আখবারি। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কবিতাটি এরকম নয়। তিনি স. বললেন, আমি তো কবি নই। কাব্যচর্চা আমার জন্য শোভনও নয়।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার 'ওয়ামা ইয়ামবাগীলাহু' কথাটির 'লাহু' সর্বনামটি সম্পৃক্ত হবে কোরআনের সঙ্গে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— কোরআন কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়। সুতরাং একে কাব্য বলা সমীচীন নয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'ইন্‌হুয়া ইল্‌লা জিকর'‍ুঁউ ওয়া ক্বুরআনুম্ মুবীন' (এটা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কোরআন)। এখানে 'জিকরুন্' অর্থ সদুপদেশ, শুভসমাচার, সুপথসন্দেশ। 'মুবীন' অর্থ বর্ণনাকারী, প্রকাশক, সুস্পষ্ট বাণীসম্ভার, যাতে রয়েছে বিস্মৃত ইতিহাস, মহাসত্যের মহা-নির্দেশনা। কবিদের কাব্যকল্পনা কখনোই এরকম নয়। মানুষের পক্ষে এমতো বাণী নির্মাণ অসম্ভব।

এরপরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— 'যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতগণকে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে'।

এখানে 'যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতগণকে' অর্থ— যাতে আমার রসুল সাবধান হতে বলতে পারেন তাদেরকে, যারা ইমান এনেছে। প্রকৃত
ইমানদারগণের অন্তরাত্মা জীবন্ত। তাই তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে জীবিত। পক্ষান্তরে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তারা মৃততুল্য। তাদের শাস্তি অনিবার্য। কোরআন তাই সতর্ক হতে বলে ইমানদারগণকে। আর কাফেরদেরকে শোনায় শাস্তির সংবাদ। এই শাস্তি অনিবার্য, অবশ্য-বাস্তবায়নব্য। তাই এখানে বলা হয়েছে— যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে। 'ইয়াহিক্বকাল ক্বওল' অর্থ শাস্তির কথা।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬

❑ উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে উহাদের জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি 'আন'আম' এবং উহারাই এইগুলির অধিকারী?

❑ এবং আমি এইগুলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি। এইগুলির কতক তাহাদের বাহন এবং উহাদের কতক তাহারা আহার করে।

❑ তাহাদের জন্য এইগুলিতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না?

❑ তাহারা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে এই আশায় যে, তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে।

❑ কিন্তু এইসব ইলাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে; তাহাদিগকে উহাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হইবে।

❑ অতএব তাহাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা ব্যক্ত করে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি আনআ'ম।

এখানে 'তারা কি লক্ষ্য করে না' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— তারা তো লক্ষ্য করেই। 'আমার হাতে সৃষ্ট' অর্থ আমা কর্তৃক সৃষ্ট। অর্থাৎ সৃজনকর্মে আমি ছাড়া আর কোনো অংশীদার নেই। সৃজন সম্পূর্ণতই আমার।

'আন্‌আ'মান' অর্থ চতুষ্পদ জন্তু। এদের মাধ্যমে মানুষ লাভ করে প্রভূত কল্যাণ। তাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তুর কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফাহুম লাহা মালিকূন' (এবং তারাই এগুলোর অধিকারী)। একথার অর্থ আমিই তাদেরকে বানিয়েছি চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মালিক, যাতে তারা তাদের প্রয়োজনমতো সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারে।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং এদের কতক তারা আহার করে' একথার অর্থ— এগুলোর মালিকানা আমি তো তাদেরকে দিয়েছিই, উপরন্তু এগুলোকে করে দিয়েছি তাদের সার্বক্ষণিক বশীভূত। ফলে যখন যেভাবে খুশী, এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে তারা। কখনো কাজে লাগায় বাহনরূপে। আবার কখনো এগুলোকে করে তাদের আহার্য।

এরপরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু'। একথার অর্থ— তারা পশুগুলোর দ্বারা লাভ করে আরো অনেক প্রকারের উপকার। যেমন তাদের পশম ও চামড়া দ্বারা প্রস্তুত করে পোশাক, পাদুকা, তাঁবু ইত্যাদি। আবার পান করে এগুলোর দুধ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না'? এই প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক! আর এর সংযোগ রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়— তারা কি আমা কর্তৃক প্রদত্ত এসকল নেয়ামতকে স্বীকার করে? এর জন্য যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য ইলাহ্‌কে গ্রহণ করেছে এই আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে (৭৪)। কিন্তু এই সব ইলাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে' (৭৫)। একথার অর্থ— কী বিস্ময়! কী অবাধ্যাচরণ! আমি সকল কিছুর একমাত্র সৃজয়িতা। সকলের প্রভুপালনকর্তা। জীবনোপকরণ দাতা। অথচ মানুষ কী অবলীলায় আমাকে বিস্মৃত হয়ে বন্দনা-প্রার্থনায় রত হয় অপ্রাণ প্রতিমাসমূহের, যেগুলো নিজেই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নয়। অন্যের ইষ্ট-অনিষ্ট

করবার কোনো প্রকার যোগ্যতা তাদের থাকবে কীভাবে। তারা এবং তাদের উপাসকদের পরিণতি তাই হবে একই রকম। তাদের সকলকেই করা হবে এক কাতারভুক্ত এবং নিক্ষেপ করা হবে নরকাগ্নিতে।

হজরত আবু দারদা সূত্রে বায়হাকী ও হাকেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার সাথে মানুষ ও জ্বিনদের আচরণ বিস্ময়কর। আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি। আমিই দান করি তাদের জীবনোপকরণ। অথচ তারা দাসত্ব করে অন্যের। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর এক জনের।

'ওয়াহুম জুনদুম মুহদ্বরুন' অর্থ তাদেরকে তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে প্রতিমাপূজারী ও তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোকে একত্রিত করা হবে। দেখে মনে হবে তারা যেনো একই বাহিনীভূত। ওই একীভূত বাহিনীকে শেষে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে জাহান্নামে।

এরপরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'অতএব তাদের কথা তোমাকে যেনো দুঃখ না দেয়'।

এখানে 'ফালা ইয়াহ্‌যুনকা' (যেনো দুঃখ না দেয়) কথাটির 'ফা' (যেনো) অব্যয়টি কারণ প্রকাশক। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অংশীবাদীদের ভয়াবহ পরিণামের কথা তো শুনলেন। অতএব আপনি আপনার অন্তরে তাদের প্রতি আর সমবেদনা লালন করবেন কেনো? আপনি তাদের কল্যাণকামী। কিন্তু তারা তো কল্যাণ লাভের উপযোগী নয়। তাছাড়া তারা তো আপনার প্রতি সদাসর্বদা নিক্ষেপ করে অস্বীকৃতি ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ শর। সুতরাং তাদের প্রতি আপনার মমতা ও অনুকম্পার ছায়া তো প্রত্যাহার করে নেওয়াই সমীচীন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি সর্বজ্ঞ। তাই আমি ভালো করেই জানি, আপনার প্রতি কী তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা তারা পোষণ করে তাদের মনে। আর তাদের প্রকাশ্য অপকথনসমূহ সম্পর্কেও তো আমি অনবগত নই। সুতরাং আপনি ব্যথিত হবেন না। যথা সময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি আমি তাদেরকে দিবোই।

হাকেম কর্তৃক বর্ণিত ও সূত্রপরীক্ষিত এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার আস ইবনে ওয়াইল একটি ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থি নিয়ে উপস্থিত হলো রসুল স. সকাশে। বললো, মোহাম্মদ! দ্যাখো, হাড্ডিটির অবস্থা। এরপরেও কি তুমি বলতে চাও, আল্লাহ্ এই হাড্ডিটিকে পুনর্জীবিত করবেন? রসুল স. বললেন, অবশ্যই, মহাপুনরুত্থান অনিবার্য। মনে রেখো, আল্লাহ্ তোমাকেও মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করবেন এবং প্রবেশ করাবেন জাহান্নামে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াতত্রয়। বলা হয়েছে—

❑ মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু হইতে? অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

❑ এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়। সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে?'

❑ বল, 'উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।'

এখানে 'আলইনসান' (মানুষ) বলে বোঝানো হয়েছে আস ইবনে ওয়াইলকে। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম বহুসংখ্যক সূত্রপরম্পরায় মুজাহিদ, ইকরামা, ওরওয়া, ইবনে যোবায়ের ও সুদ্দীর মাধ্যমে, বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে এবং বাগবী তাঁর স্বসূত্রসম্বলিত বিবরণে উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য আয়াতত্রয় অবতীর্ণ হয়েছে উবাই ইবনে খালফকে লক্ষ্য করে। ওই হতভাগাই ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো রসুল স. সকাশে। লিপ্ত হয়েছিলো মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারদিবস সম্পর্কিত বিতণ্ডায়। বলেছিলো, এই ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থিতে আল্লাহ্ কী করে আবার জীবনদান করবেন? রসুল স. বলেছিলেন, তোমাকেও মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে এবং নিক্ষেপ করা হবে নরকে। এভাবে 'আওয়ালাম ইয়ারল ইনসানা' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— উবাই ইবনে খালফ এবং তার মতো পুনরুত্থান অস্বীকারকারীরা কি দ্যাখে না? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সম্পৃক্তি রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— পুনর্জীবন দানে আমি যে সম্পূর্ণ সক্ষম, সেকথা কি মানুষ অস্বীকার করে? অথচ একথাও তো তারা ভালো করে জানে যে, তাদেরকে জীবনদান করেছি আমিই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে। অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী'। একথার অর্থ— মৃতবৎ শুক্রবিন্দু থেকে আমি তাদেরকে জীবিত অস্তিত্বে পরিণত করেছি, একথা তো তারা ভালো করেই জানে। অথচ মহাপুনরুত্থানের বিষয়টিকে করে অস্বীকার। লিপ্ত হয় অজ্ঞজনোচিত ও অযথার্থ বাক-বিতণ্ডায়। প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি তো সহজতর। এই সোজা কথাটিও তারা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

'ফাইজা হুয়া খসীমুম মুবীন' অর্থ— সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। কথাটি বলা হয়েছে রসুল স. কে সান্ত্বনা প্রদানার্থে। উদ্দেশ্য তাঁকে জানিয়ে দেওয়া যে- হে আমার রসুল! তাদের বাকবিতণ্ডা মূল্যহীন। সুতরাং আপনি মনোক্ষুণ্ন হবেন না। একই সঙ্গে বাক্যটিতে অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে প্রচণ্ড ধিক্কার। যেনো বলা হয়েছে— অবিশ্বাসীরা স্বভাবতই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি অকৃতজ্ঞ। নতুবা একথা তারা সহজেই বুঝতো যে, আল্লাহ্তায়ালা নিছক দয়া করে অনুল্লেখ্য শুক্রকণা থেকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবজাতি।

কোনো কোনো বিদ্বান কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— নিকৃষ্টতম শুক্রবিন্দু থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্তির পর মানুষ বড় হয়েছে। লাভ করেছে জ্ঞান। এ সকল কিছু তো আমারই দয়া। অথচ তারা তাদের জ্ঞান ও বাকশক্তিকে শেষে প্রয়োগ করে আমারই বিরুদ্ধে। বচসা-বিতণ্ডা শুরু করে আমার রসুলের সঙ্গে। এতে করে কি তাদের সম্মান বাড়ে? না, বাড়েনা। বরং বিতণ্ডা রচনার কারণে তারা হয়ে পড়ে তার সূচনালগ্নের সেই অপবিত্র শুক্রকণার মতো তুচ্ছ। বিশ্বাসবিশোভিত উন্নত জীবনযাপন পরিহার করে তারা মান্য করে বিতণ্ডাবিতর্কিত অশুভ জীবনকে। বিশ্বাসবিরোধী কুটতর্ক যে জঘন্যতম, সে ধারণাটুকুও তাদের নেই।

পরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'এবং সে আমার সম্পর্কে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণসঞ্চার করবে যখন তা পচেগলে যাবে'? একথার অর্থ— বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে— তারা বলে, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে আমি অক্ষম। তারা আমার ক্ষমতাকে তুলনা করে তাদের নিজেদের অক্ষমতার সাথে। মনে করে, তারা যেমন মৃতকে জীবন দান করতে অক্ষম, আমিও তেমনি। কী অপবিত্র ভাবনা! স্রষ্টা কি সৃষ্টির সমতুল হয়? আমি তো মহা স্রষ্টা। তাদেরকে তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ শুক্রকণা থেকে সৃষ্টি করেছি আমিই। তাহলে তাদের অস্থি-চর্মকে পুনর্জীবন দান করতে পারবো না কেনো? হাড্ডিতে প্রাণ সঞ্চার করা অপেক্ষা শুক্রকণায় প্রাণসঞ্চার করা কি কম বিস্ময়ের? প্রথম বিস্ময়কে যদি আমি বাস্তবায়িত করতে পারি, তবে দ্বিতীয় বিস্ময়কে অস্তিত্বদান করতে পারবো না কেনো?

'রমীম' অর্থ ক্ষয়িষ্ণু অস্থি। বায়যাবী লিখেছেন, অস্থির প্রাণ আছে। তেমনি প্রাণ আছে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। সেগুলোও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ হচ্ছে— মৃতের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন অপবিত্র হয়ে যায়, তেমনি অপবিত্র হয়ে যায় তার অস্থিও। ইমাম শাফেয়ীও এরকম বলেছেন। ইবনে জাওজী তাঁর 'আত্তাহকীক' গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম আহমদও এমতো অভিমতের প্রবক্তা।

আমি বলি, প্রকৃত কথা হচ্ছে— মৃতের দাঁত ও অবিচ্ছিন্ন অস্থি পবিত্র। আর যারা মৃতের অস্থিকে অপবিত্র বলেন, তারা প্রমাণরূপে উপস্থাপন করেন এই

আয়াতকেই। এর স্বপক্ষে তাঁরা একটি হাদিসও উল্লেখ করে থাকেন। হাদিসটি এই— রসুল স. বলেছেন, মৃতের অস্থি দ্বারা কোনো উপকার গ্রহণ করা যাবে না। স্বসূত্রে আবুবকর শামী আবু যোবায়েরের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত জাবের থেকে। 'আল মুগান্নী' এবং 'তানকীহুত্ তাহ্‌কীক' গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা উত্তম পদবাচ্য। হাদিসটি আবার ইবনে ওয়াহাব তাঁর 'মসনদ' গ্রন্থে জামআ ইবনে সালেহ্ সূত্রে আবু যোবায়েরের মাধ্যমে হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন এভাবে— মৃতের কোনোকিছু থেকেই সুবিধা ভোগ করা যাবে না। সুবিধা ভোগ করা যাবে না তার অস্তিত্বের কোনো অংশ থেকেও। 'তানকীহ্' প্রণেতা লিখেছেন, জামআ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। তাঁর বর্ণনাটিও শিথিল সূত্রসম্পন্ন। ইবনে মা'ওয়ার তাঁর সমালোচনা করেছেন।

'হেদায়া' রচয়িতা লিখেছেন, মৃতের পশম ও অস্থিতে প্রাণ নেই। আর যার প্রাণ নেই, তার মৃত্যুও নেই। কাজেই তা পবিত্র। আর হাদিসে ঘোষিত হয়েছে মৃত থেকে সুবিধাভোগের নিষিদ্ধতা। অথচ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, অস্থিতেও প্রাণ আছে। সুতরাং হেদায়া রচয়িতার অভিমত কতোটুকু সঠিক, তা প্রণিধাননীয়। তবে হানাফীগণের পক্ষ থেকে প্রাঞ্জল একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যায়। সেটি হচ্ছে— অপবিত্রকারী বস্তু হচ্ছে প্রবাহিত রক্ত। আর অস্থি, পশম ও পুচ্ছগুচ্ছে রক্ত প্রবাহিত হয় না, যদিও তা জীবন্ত। একারণেই বলা হয়, যে জীবের মধ্যে রক্তপ্রবাহ নেই, সে জীব যদি কোনো আবদ্ধ পানিতে পড়ে মরে যায়, তবে সেই পানি অপবিত্র হয় না।

হজরত সালমান ফারসী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে খাদ্যবস্তু ও পানীয়ের মধ্যে শোণিতপ্রবাহহীন কীটপতঙ্গ পড়ে মরে থাকে, সেই খাদ্যবস্তু ভক্ষণ সিদ্ধ এবং সেই পানীয় দ্বারা ওজু গোসল জায়েয। দারাকুতনী বলেছেন, সাঈদ ইবনে সাঈদ যুবাইদী থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন কেবল বাকীয়া। অন্য কারো দ্বারা হাদিসটি বর্ণিত হয়নি। আর সাঈদ অপরিচিত। ইবনে আদী বলেছেন, তিনি তেমন পরিচিত নন।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, খাদ্যপাত্রে মক্ষিকা বসলে সেটিকে খাদ্যাভ্যন্তরে ডুবিয়ে দিয়ো। তারপর সেটিকে উঠিয়ে নিক্ষেপ কোরো বাইরে। কারণ মক্ষিকার এক পাখায় থাকে রোগজীবানু এবং অন্য পাখায় থাকে তার প্রতিষেধক। বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার একটি মৃত ছাগলকে দেখে বললেন, তোমরা এর চামড়া ব্যবহার করছো না কেনো? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ছাগলটি তো মৃত। তিনি স. বললেন, এর গোশত ভক্ষণ করা কেবল নিষিদ্ধ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. মৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন? কিন্তু তার চামড়া ও পশম ব্যবহার

করতে নিষেধ করেননি। এই হাদিসের সূত্রসংযুক্ত আবদুল জব্বার ইবনে মুসলিম বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল। এরকম বলেছেন দারাকুতনী। কিন্তু ইবনে হাব্বান তাঁকে চিহ্নিত করেছেন বলিষ্ঠ বর্ণনাকারীরূপে।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটির সূত্রপরম্পরা তো উত্তম পর্যায়ের ঠিকই, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে ইবনে জাওজী কী করে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেন যে, মৃত পশুর পশম ও পালক পবিত্র। অথচ অস্থি'র পবিত্রতার দলিল ওই হাদিস থেকে প্রমাণ করেন না, যেখানে বলা হয়েছে, মৃত পশুর কোনো অংশ থেকে সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। মোটকথা, 'মৃত পশুর কোনো অংশ থেকে সুবিধা ভোগ করা যাবে না' হাদিসটির অর্থ— তার গোশত ভক্ষণ করা যাবে না। কেননা প্রবহমান রক্তসম্বলিত গোশতই কেবল ভক্ষণযোগ্য। আর অস্থি, পালক ও পশমে রক্তপ্রবাহও নেই। সেকারণে সেগুলো থেকে সুবিধা গ্রহণেও কোনো বাধা নেই। বাধা নেই মৃত পশুর চামড়া ব্যবহার করাতেও। তবে শর্ত হচ্ছে ওই চামড়াকে করতে হবে পাক। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে ফেলতে হবে তার জলীয় অংশ।

দারাকুতনীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি স্বকর্ণে রসুল স. কে বলতে শুনেছি, শুনে রাখো, ভক্ষণযোগ্য অংশগুলো ছাড়া মৃত পশুর অন্যান্য অংশ সিদ্ধ। চামড়া, পালক, পশম, অস্থি হালাল। কারণ জবাই করলেও

এগুলোর পবিত্রতা অর্জিত হয় না। দারাকুতনী হাদিসটির সূত্রসংযুক্ত আবু বকর হাজালীকে বলেছেন পরিত্যাজ্য। গুণদর বলেছেন, সে অসত্যভাষী। ইয়াহ্ইয়া ও আলী বলেছেন, সে উল্লেখযোগ্য কেউ নয়।

দারাকুতনীর বর্ণনায় আরো এসেছে, উম্মতজননী হজরত উম্মে সালমা বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মৃত পশুর চামড়া পাকা করা হলে আর কোনো অসুবিধা থাকে না। বিপত্তি থাকে না তার পশম, পালক ও শিঙ ব্যবহারেও, যদি তা পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়। দারাকুতনী বলেছেন, হাদিসটি
বর্ণিত হয়েছে শুধু ইউসুফ ইবনে সফরের মাধ্যমে। আর ইউসুফের বর্ণনা অগ্রাহ্য। কেননা সে অসত্যভাষী। রহীম বলেছেন, সে অনুল্লেখ্য। ইবনে হাব্বান বলেছেন, তার বিবৃতি প্রামাণ্য নয়।

হজরত ছওবান-আবু ইয়ালী-হুমাইদি-শামী-সুলায়মান ইবনে জাওজী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, একবার রসুল স. তাঁর প্রিয়তমা কন্যা হজরত ফাতেমার জন্য ক্রয় করেছিলেন ছাগলের অন্ত্র থেকে তৈরী একটি অলংকার এবং হাতির দাঁতের দুটি চিরুনি। ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা হুমাইদ ও সুলায়মান পরিচিত কোনো বর্ণনাকারী নয়। ইমাম আহমদ বলেছেন, আমি হুমাইদি সম্পর্কে কিছুই জানি না। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, আমি সুলায়মানকে চিনি না। উপরন্তু আপত্তিকর বিষয় হচ্ছে, বর্ণনাটিতে উল্লেখিত 'আজ্ব' শব্দটির অর্থ ভূচর অথবা জলচর কচ্ছপের খোলস। ইবনে কুতাইবা বলেছেন, শব্দটির অর্থ কচ্ছপের খোলস নয়, বরং ওই বস্তু, যা মানুষ নির্মাণ করে অস্থি অথবা দাঁত খোদাই করে। যদি তাই হয়, তবুও তো বস্তুটি মৃত থেকে

নির্মিত, তাই তা নিষিদ্ধ। সুতরাং কী করে রসুল স. এরকম নিষিদ্ধ বস্তু তাঁর কন্যার জন্য ক্রয় করতে পারেন। আসমায়ী বলেছেন, 'আজ্ব' হচ্ছে তৈজসপত্র। শব্দটির অর্থ সর্বসাধারণ যা বোঝে, তা নয়।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, আসমায়ীর 'আজ্ব' শব্দটির সর্বজনবোধ্য অর্থ এখানে গ্রহণীয় নয়। কথাটি বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। কেননা 'আল মুহকাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হস্তীদন্তকেই 'আজ্ব' বলে। অন্য অর্থে শব্দটি ব্যবহারযোগ্য নয়।

জুহুরী লিখেছেন, 'আজ্ব' হচ্ছে 'আজ্বজ্বাতুন' এর বহুবচন। আর 'আজ্ব' বলে হস্তীঅস্থিকে। সম্ভবতঃ আসমায়ীর ধারণায় হস্তীঅস্থি অপবিত্র। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন, এই হাদিসের সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ গ্রহণীয় নয়।

'কামুস' রচয়িতা লিখেছেন, 'আজ্ব' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এর দ্বারা হস্তীঅস্থি ও তৈজসপত্র, দু'টোই বোঝায়। জাযারী তাঁর 'নেহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আজ্ব' বলে জল ও স্থলের কচ্ছপের খোলসকে। অথবা সামুদ্রিক কোনো প্রাণীর মেরুদণ্ডকে, যার দ্বারা প্রস্তুত করা হয় অলংকার।

বাকীয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে আমর ইবনে খালেদের মাধ্যমে বায়হাকী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. হস্তীদন্তনির্মিত চিরুনি ব্যবহার করতেন। বায়হাকী মন্তব্য করেছেন, অজ্ঞাতনামা বর্ণনাকারীর মাধ্যমে পরিবেশিত বাকীয়ার এই বর্ণনাটি শিথিলসূত্রবিশিষ্ট। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, হাদিসটির সূত্রশৃঙ্খল শিথিল হলেও এর প্রতিপাদ্য বিষয় উত্তম পদবাচ্য। এরকম কিছু কিছু শিথিলসূত্রবিশিষ্ট সমার্থক হাদিস বোখারী ও মুসলিমের গ্রন্থেও বিদ্যমান।

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'বলো, এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি, যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদেরকে বলে দিন, এই অস্থিতে যিনি একবার প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, তিনিই পুনর্বার এতে সঞ্চার করবেন জীবন। কারণ সৃজন, পুনঃসৃজন সম্পূর্ণতঃই তাঁর অভিপ্রায়, জ্ঞান ও ক্ষমতায়ত্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত'। একথার অর্থ— সমগ্র সৃষ্টি যেহেতু তাঁর, সেহেতু তিনিই কেবল জানেন তাদের প্রকাশ্য-গোপন সকল তত্ত্ব ও রহস্য। সুতরাং সৃজন-পুনঃসৃজন সবকিছুই ঘটবে তাঁর জ্ঞাতসারে। অভিপ্রায় ও ক্ষমতানুসারে। যথানিয়মে ও যথাসময়ে। তিনি যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

সূরা ইয়া-সীন ঃ আয়াত ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩

❑ তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা হইতে প্রজ্বলিত কর।

❑ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

❑ তাঁহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও', ফলে উহা হইয়া যায়।

❑ অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁহার হস্তেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা থেকে প্রজ্জ্বলিত করো'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বৃক্ষ দু'ধরনের— 'মুরখ' ও 'ইফার'। এই দু'ধরনের বৃক্ষই একই সঙ্গে জলীয় ও অগ্নিময়। তাই দেখা যায় বৃক্ষ থেকে তাজা ডাল কেটে নিলে তা থেকে নির্গত হয় পানি। আবার দু'টো ডাল নিয়ে একসঙ্গে ঘষাঘষি করলে তা থেকে উৎপন্ন হয় আগুন। আরববাসীরা বলেন, সবধরনের গাছেই আগুন আছে। বৃক্ষবিশারদদের অভিমতও এরকম।

'ফাইজা আন্‌তুম মিনহু তু'ক্বিদূন' অর্থ— এবং তোমরা তা থেকে প্রজ্জ্বলিত করো। অর্থাৎ বৃক্ষশাখা ঘষে আগুন উৎপাদন করার সময় তোমরা এমতো সন্দেহে নিপতিত হয়োনা যে, এতে করে আগুন উৎপাদন সম্ভব কিনা। কারণ পানি ও আগুন পরস্পরকে বিলোপকারী। বিষয়টি সুনিশ্চিত। আর এমতো সুনিশ্চিতি তো দিয়েছি আমিই। তাহলে তোমরা কেনো একথা বিশ্বাস করতে চাওনা যে, আমি ক্ষয়িষ্ণু অস্থিকে করতে পারবো পূর্বের মতো সতেজ, সজীব ও প্রাণময়। আমি যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সংযোগ রয়েছে একটি অনুক্ত বাক্যের সঙ্গে। ওই অনুক্ত বাক্যসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন নভোমণ্ডল ও পৃথিবী। একথা তো তোমরাও মানো। তাহলে একথা কেনো মানতে চাওনা যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি মৃতকে জীবন দান করতে অবশ্যই সক্ষম। তাঁর দ্বারা সুবিশাল মহাবিশ্ব সৃজন সম্ভব হলে ক্ষুদ্র মানুষের পুনঃসৃষ্টিতো অবশ্যই

সম্ভব। তিনি যে সর্বশক্তিধর। উল্লেখ্য, মানুষের মধ্যেও রয়েছে মহাবিশ্বের উপকরণসমূহের নির্যাস। পার্থক্য কেবল এতোটুকু যে, মহাবিশ্ব বিশাল। আর মনুষ্যবিশ্ব ক্ষুদ্র। একারণেই মানুষ সৃষ্টি পুনঃসৃষ্টি প্রসঙ্গে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনতা! তোমাদের সম্মুখে এমতো অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেনো তোমরা এ কথা বিশ্বাস করতে চাওনা যে, আল্লাহ্ সুমহান সৃজয়িতা এবং তাঁর জ্ঞান সর্বত্রগামী?

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোনোকিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়'।

আয়াতখানি আল্লাহ্‌র অপার শক্তিমত্তার একটি অতিদূরবর্তী উপমা মাত্র। যেমন প্রতাপশালী কোনো ব্যক্তির আদেশ তার অনুচরদের দ্বারা প্রতিপালিত হয় তাৎক্ষণিকভাবে, তেমনি আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তার প্রভাবপুষ্ট অভিপ্রায়ও বাস্তবায়িত হয় মুহূর্তমধ্যে। আর তাঁর চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ের এমতো অবশ্যম্ভাবী বাস্তবায়ন সম্পূর্ণতঃই পরিশ্রম ও সৃজনোপকরণমুক্ত। উল্লেখ্য, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সন্দেহ-বৃক্ষের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে এই উপমাটি। নতুবা সৃষ্টির সামর্থ্য কখনোই আল্লাহ্‌র সামর্থ্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ সকল কিছুতেই তিনি আনুরূপ্যবিহীন, আকার-প্রকারহীন।

সবশেষের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হস্তেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব, আর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'।

এখানকার 'সুব্হান' শব্দটি ধাতুমূল এবং সাধারণ কর্মপদ একটি অনুক্ত ক্রিয়ার। আর 'ফা' (অতএব) অব্যয়টি এখানে কারণপ্রকাশক। সুতরাং এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত মানুষ! যখন তোমরা জানতে পারলে, যে আল্লাহ্ শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে, তিনি নিশ্চয় ক্ষয়প্রাপ্ত অস্থিতে করতে পারবেন প্রাণের সঞ্চার। তাঁর সৃজনক্ষমতার স্বরূপ তোমাদের জ্ঞানায়ত্ত নয়। তবুও শোনো একটি উপমা— তিনি এমন সুমহান সৃজনকর্তা যে, 'হও' বললেই সবকিছু হয়ে যায়। এর জন্য সময়, শ্রম, নির্মাণোপকরণ কোনোকিছুরই প্রয়োজন হয় না। অতএব এখন তোমাদের অবশ্যদায়িত্ব এই যে, তোমরা তোমাদের মহামহিম প্রভুপালনকর্তার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করবে। সকলে এবং সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়ভূত। আর এটাও অবশ্যম্ভাবী যে, তোমাদের সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন কেবল তাঁরই সকাশে।

'মালাকূত' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'মালাক' থেকে। এর অর্থ কর্তৃত্ব, অধিকার। কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে সকলের এবং সকলকিছুর উপরে আল্লাহ্তায়ালার নিরঙ্কুশ ও সর্বময় কর্তৃত্বের কথা।

'ওয়া ইলাইহি তুরজ্বাউন' অর্থ এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। কথাটির মধ্যে নিহিত রয়েছে যুগপৎ শুভ ও অশুভ সংবাদ, যথাক্রমে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের জন্য। অর্থাৎ ওই প্রত্যাবর্তনস্থলে তাদের জন্য নির্ধারিত হবে চিরস্বস্তি, অথবা চিরশাস্তি।

হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা তোমাদের মৃত নিকটজনদের স্বস্তি কামনায় সুরা ইয়া-সীন পাঠ কোরো। আহমদ, আবুদাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হাব্বানও হাকেমের অপর বর্ণনায় এসেছে, সুরা ইয়া-সীন কোরআনের হৃৎপিণ্ড। যে ব্যক্তি এই সুরা কেবল আল্লাহ্র সন্তোষার্জনার্থে ও পরকালের পুণ্য সঞ্চয়ার্থে আবৃত্তি করবে, আল্লাহ্ তাকে মার্জনা করবেন। তোমরা তোমাদের মৃত নিকটজনের শান্তির জন্য এই সুরা তেলাওয়াত কোরো।

জাযারী তাঁর 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের উদ্দেশ্যে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, তাকে অবশ্যই মার্জনা করা হবে। তোমরা তোমাদের মৃত আপনজনের মাগফিরাতের জন্য সুরা ইয়া-সীন পাঠ কোরো।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ের অন্তরাত্মা রয়েছে। আর কোরআনের অন্তরাত্মা হচ্ছে সুরা ইয়া-সীন। যে একবার এই সুরা পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে দান করবেন দশবার কোরআন খতমের সওয়াব। হাদিসটি শিথিল সূত্রবিশিষ্ট।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, সে হবে ক্ষমাপ্রাপ্ত। বায়হাকী। হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. শুভসংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাতে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, প্রাতে সে হবে মার্জনাপ্রাপ্ত। শিথিল সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে আবু নাঈমের মাধ্যমে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি একবার সুরা ইয়া-সীন পাঠ করলো, সে যেনো সমগ্র কোরআন পাঠ করলো দশবার। শিথিল সূত্রশৃঙ্খলসহযোগে হাদিসটি উপস্থাপন করেছেন বায়হাকী। হজরত আনাস সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, সে মৃত্যুবরণ করবে শহীদ হিসেবে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে দারেমী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিতোষপ্রাপ্তির আশায় সুরা ইয়া-সীন আবৃত্তি করবে, সে হবে ক্ষমার পাত্র।

দায়লামী ও আবু শায়েখ ইবনে হাব্বান 'ফাজায়েল' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু জাবের বলেছেন, মৃত্যুপথযাত্রীদের সম্মুখে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করলে তার মৃত্যুকষ্ট লাঘব হয়। মাহামেলী তাঁর 'আমালী' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন পূরণের উপলক্ষ হিসেবে সুরা ইয়া-সীনকে নির্বাচন করবে, তার প্রয়োজন পূরণ করা হবে। এই হাদিসের সমার্থক আর একটি হাদিস প্রায়োন্নত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে দারেমী কর্তৃক।

'আল মুসতাদরাক' গ্রন্থে রয়েছে, ইমাম আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেছেন, যে ব্যক্তি আত্মার কাঠিন্য অনুভব করে, সে যেনো একটি পেয়ালায় জাফরান দ্বারা সুরা ইয়া-সীন লিখে ওই পেয়ালা ধুয়ে পান করে।

ইবনে ফরীস বর্ণনা করেছেন, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, উন্মাদের উপরে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করলে ওই উন্মাদ ভালো হয়ে যাবে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সুরা ইয়া-সীন পাঠ করবে, তার দিবস কাটবে আনন্দে। আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে ভোর পর্যন্ত সে থাকবে সানন্দে। অভিজ্ঞগণ এরকমই বর্ণনা করেছেন।

সূরা সাফ্‌ফাত

এই সুরা কোরআন মজীদের ৩৭ সংখ্যক সুরা। এর রুকুর সংখ্যা ৫ এবং আয়াতের সংখ্যা ১৮২। সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

❑ শপথ তাহাদের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান
❑ ও যাহারা কঠোর পরিচালক
❑ এবং যাহারা 'যিক্‌র' আবৃত্তিতে রত-
❑ নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ এক,
❑ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের।

প্রথমে বলা হয়েছে— **'শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান'।**

'সাফ্‌ফাত' অর্থ সারিবদ্ধ হওয়া। হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদা এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে উপস্থাপন করেছেন একটি হাদিস। হাদিসটি এই— হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, ফেরেশতারা দাসত্বের কাঠগড়ায় তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তোমরাও কি সেভাবে (নামাজ পাঠকালে অথবা যুদ্ধের ময়দানে) সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে না? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ফেরেশতারা কীভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি স. বললেন, তারা পঙক্তি পূর্ণ করে এবং পঙক্তিমধ্যে গ্রহণ করে অটল অবস্থান।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরেশতারা তাদের ডানা শূন্যে মেলে রেখে স্থির হয়ে দাঁড়ায় এবং ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোনো কাজের ব্যাপারে প্রকাশ করেন তাঁর অভিপ্রায়। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানে 'সাফ্‌ফাত' বলে বুঝানো হয়েছে উড়ন্ত পাখিদের সারিবদ্ধতার কথা। কেননা অন্য এক আয়াতে 'আত্‌ত্বইরু সাফ্‌ফাত' বলে সারিবদ্ধ উড়ন্ত পাখির কথাই বলা হয়েছে।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'ও যারা কঠোর পরিচালক'। একথার অর্থ— এবং শপথ ওই সকল ফেরেশতার যারা মেঘপুঞ্জের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'কঠোর পরিচালক' (আয্‌যাজ্বিরতি) বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল ফেরেশতাকে যারা মানুষের মনে পুণ্যবাসনার উদয় ঘটায় এবং তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে পাপ-পথ থেকে। কিংবা বাধাদান করে কল্যাণের পথে বিপত্তিসৃষ্টিকারী শয়তানকে। কাতাদা বলেছেন, 'আয্‌যাজ্বিরত' হচ্ছে অশুভ ভাষণ প্রতিরোধক কোরআনের আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'ফাত্‌তালিয়াতি জিকরা' এবং যারা জিকির আবৃত্তিতে রত। একথার অর্থ— এবং শপথ ওই সকল ফেরেশতার যারা আল্লাহ্‌র জিকির করে, কিংবা পাঠ করে নবী রসুলগণের উপরে অবতারিত কিতাবসমূহের আয়াত।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানকার ১, ২ এবং ৩ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'সাফ্‌ফাত' 'যাজ্বিরত' ও 'তালিয়াত' শব্দগুলোর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, ওই সকল বিজ্ঞ মনীষী সত্তার শপথ— যারা নামাজের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে সারিবদ্ধ হয়, দলিল প্রমাণের সহায়তায় মানুষকে বিরত রাখে অবিশ্বাস ও পাপ- পঙ্কিলতা থেকে এবং তেলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশিত বাণী। অথবা এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যারা জেহাদের সময় শত্রুর সম্মুখে সীসা দিয়ে ঢালাই করা অনড় প্রাচীরের মতো সুসংহত হয়ে দাঁড়ায়, কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে শত্রুকে, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে যুদ্ধাশ্ব এবং জেহাদের ময়দানেও বিস্মৃত হয় না আল্লাহ্‌র জিকির, আক্রান্ত হলেও। বর্ণিত তিনটি কর্মকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে সংযোজক অব্যয় 'ওয়াও' ও 'ফা' এর মাধ্যমে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কর্ম তিনটি পৃথক প্রকৃতির।

এখানে 'ফা' ব্যবহৃত হয়েছে কর্মের ক্রম বজায়ার্থে। প্রথমত সারিবদ্ধ হওয়া, এরপর বাধা প্রদান ও পরিচালন এবং সবশেষে জিকির। সারিবদ্ধ হওয়া পূর্ণ শৃঙ্খলার প্রতীক। অমঙ্গলে বাধাদান ও মঙ্গলের দিকে পরিচালনা ওই প্রতীকের পরিপূরক। আর

জিকির হচ্ছে প্রশান্তিদায়ক। অথবা 'ফা' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে শৃঙ্খলা ও ক্রমোন্নতির জন্য। যেমন 'ছুম্মা কানা মিনাল্ লাজীনা আমানু'। এই আয়াতে 'ছুম্মা' সংযুক্তি (আতফ)টি ব্যবহৃত হয়েছে কেবল মহত্ব ও মর্যাদা প্রকাশার্থে।

এরপরের আয়াতে(৪) বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ এক'। একথার অর্থ— হে মক্কাবাসী! ভালো করে শুনে নাও, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভুপালকের এককত্ব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অনেক উর্ধ্বে। উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকেরা
বলেছিলো, কী বিস্ময়! মোহাম্মদ তাহলে কি সকল উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করলো? আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাদের এমতো অপমন্তব্যের প্রেক্ষিতে।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের'।

এখানকার 'মাশারীক্ব' অর্থ প্রতিটি পূর্বাচলের। কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে সূর্যের সকল উদয়স্থলকে। কেননা বৎসরের ৩৬৫ দিনে প্রতি দিন সূর্যোদয়ের ঘটতে থাকে স্থানান্তর। অস্তস্থলের পরিবর্তনও ঘটতে থাকে একইভাবে। কিন্তু এখানে কেবল উদয়স্থলের উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অস্তস্থলের কথা আর আলাদা করে বলা হয়নি। কেননা সূর্যাস্ত অপেক্ষা সূর্যোদয়ই আল্লাহ্র অধিকতর মহিমা ও শক্তিমত্তা প্রকাশক। তাই আধিক্যের পর অনাধিক্যকে আর উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি এখানে।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

❑ আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি,
❑ এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে।
❑ ফলে উহারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে—
❑ বিতাড়নের জন্য এবং উহাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।
❑ তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি পৃথিবীর আকাশকে সুশোভিত করেছি নক্ষত্রপুঞ্জের আলোকচ্ছটা দ্বারা। এখানে 'আস্সামাআদ্ দুন্ইয়া' অর্থ সেই আকাশ, যা তোমাদের সবচেয়ে নিকটে। আর 'বিযীনাতিনিল কাওয়াকিব' অর্থ

তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা। অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশকে করেছি নক্ষত্রশ্রীশোভিত।
অথবা বলা যেতে পারে— প্রথমাকাশের তারকারাজিকে আমি দান করেছি সৌন্দর্য। কিংবা— প্রথম আসমানকে সুশোভিত করেছি তারকারাজির সুষমা দ্বারা। এই সুষমা দ্বারা বুঝানো হয়েছে নক্ষত্রনিঃসৃত আলো ও সেগুলোর গঠনশৈলীকে। হজরত ইবনে আব্বাস 'নক্ষত্ররাজির সুষমা' কথাটির অর্থ করেছেন— নক্ষত্রনিঃসৃত আলোকচ্ছটা।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে'। একথার অর্থ— যে নক্ষত্রসুষমা দ্বারা আমি পৃথিবীর আকাশকে সজ্জিত করেছি, ওই নক্ষত্র নিক্ষেপ করে প্রতিহত করা হয় বিদ্রোহী শয়তানকে। এখানে 'মারিদ' অর্থ বিদ্রোহী, অবাধ্য।

আলোচিত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সকল নক্ষত্রের অবস্থান পৃথিবীর নিকটতম আকাশে এবং এই আকাশ শয়তান থেকে সুরক্ষিতও। বায়যাবী লিখেছেন, স্বস্থানে স্থির নক্ষত্রগুলোর অবস্থান অষ্টম আসমানে এবং চাঁদ ব্যতীত অবশিষ্ট ছয়টি গ্রহের অবস্থান দ্বিতীয় থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত। আর চাঁদ আছে প্রথম আসমানে। একথা যদি সত্য বলে ধরেও নেওয়া হয়, তবু নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা আকাশ সুশোভিত হওয়ার বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হয় না। কেননা পৃথিবীবাসীদের কাছে

বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। রাতের আকাশের দিকে তাকালেই দেখা যায়, অসংখ্য নক্ষত্র অজস্র উজ্জ্বল মনিমুক্তার মতো ফুটে রয়েছে আকাশের গায়ে। কতোইনা অপরূপ সেগুলোর দ্যুতিচ্ছটা। বায়যাবীর বক্তব্য থেকে একথাই অনুমিত হয় যে, তিনি সম্ভবতঃ মনে করেন, প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের গ্রহ-নক্ষত্রের বিন্যাস-বিষয়ক বিবরণ অযথার্থ নয়। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, তাদের মতবাদ সত্য নয়। কারণ কোরআন, হাদিস ও ঐকমত্য (ইজমা) এর পরিপন্থী। কোরআন মজীদে রয়েছে কেবল সাতটি আকাশের কথা। অষ্টম আকাশের উল্লেখ সেখানে নেই। আবার অষ্টম আকাশকে যদি স্থির তারকার আকাশ বা অন্য কোনো নাম দেওয়া হয়, তবুও সাতের অধিক আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে না। শরাবকে শরাব না বলে যদি অন্য কোনো নামে অভিহিত করা হয়, তবে কি তা হালাল হয়ে যায়? আবার এ বিষয়টিও সুপ্রমাণিত যে, সকল নক্ষত্রের অবস্থান এই প্রথম আকাশেই। অন্যান্য আকাশকে নক্ষত্রায়িত করা হয়নি। তাই এখানে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে— আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি। পরক্ষণেই বলা হয়েছে— এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে। অর্থাৎ প্রথম আকাশসহ অন্য সাতটি আকাশের সুরক্ষা আমি নিশ্চিত করেছি শয়তানের অনুপ্রবেশ থেকে, প্রথমাকাশের উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে। শয়তানকে প্রথমে এবং প্রথমাকাশে প্রতিহত করাই সমীচীন। আর তা করতে প্রথমাকাশ থেকে উলকা ছুঁড়ে মারাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক।

পরবর্তী আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'ফলে তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক থেকে—(৮) বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি (৯)। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে (১০)। একথার অর্থ— আমার আকাশ রক্ষাকারী ফেরেশতাদের অতন্দ্র প্রহরার কারণে শয়তান ঊর্ধ্বদেশের কোনো পরিকল্পনার কথা শুনতে পারে না। তারা তাকে বিতাড়নের জন্য সকল দিক থেকে ছুঁড়ে মারতে থাকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা এবং তাকে এবং তার অনুচরদেরকে দিতে থাকে অবিরাম শাস্তি। তবুও যদি কেউ কোনো কিছু শুনে ফেলে, তবে তার দিকে নিক্ষেপ করা হয় প্রজ্জ্বলিত উল্কাখণ্ড। ফলে সে হয়ে যায় ভস্মীভূত।

এখানে ''খতিফাল খত্ফাতা' অর্থ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে। 'ফা আত্বায়াহু' অর্থ তার পশ্চাদ্ধাবন করে। আর 'শিহাবুন ছাক্বিব' অর্থ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। উল্লেখ্য, শয়তান চুপিসারে কোনো গোপন আকাশী সংবাদ শুনে পালাবার সময়েই কেবল তাকে ভস্মীভূত করবার জন্য ছুঁড়ে মারা হয় জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। আর তখনই দৃষ্টি গোচর হয়, আকাশের কোনো তারা যেনো খসে পড়লো।

গ্রীসদেশীয় প্রাচীন দার্শনিকেরা উল্কাপতন সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছে। কিন্তু তাদের অভিমতগুলো অযথার্থ। কেননা সেগুলো আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বাণীর খেলাফ। উল্কাপাত ঘটে আকাশ থেকেই। যেমন আকাশ থেকে পতিত হয় বৃষ্টি ও শিলা। এক আয়াতে রয়েছে 'আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি'। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমিই নামিয়ে থাকি শিলাবৃষ্টি আকাশী গিরিমালা থেকে'। কাতাদা সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্তায়ালা তারকারাজিকে সৃষ্টি করেছেন তিনটি উদ্দেশ্যে— আকাশ সুশোভিত করতে, শয়তান বিতাড়ন করতে এবং পথের দিক নির্দেশনা দিতে। সুতরাং এর অন্য উদ্দেশ্য অনুসন্ধান বাতুলতামাত্র।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন আল্লাহ্ আকাশে কোনো হুকুম জারী করেন, তখন ফেরেশতারা আতঙ্কিত হয়ে নাড়তে থাকে তাদের ডানা। তাদের ওই ডানা সঞ্চালনের শব্দ শ্রুত হয় পাথরের উপরে শিকলপতনের শব্দের মতো। যখন তাদের আতঙ্ক স্তিমিত হয়, তখন তারা একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে, তোমার প্রভুপালয়িতা কী আদেশ করেছেন? সে জবাব দেয়, তাঁর আদেশ অতি সত্য, মহামর্যাদা ও মহিমাসম্পন্ন। তখন তাদের কথোপকথন চুরি করে শোনার চেষ্টা করে শয়তান এবং সেকথা পাচার করে তার স্বজাতিদের মধ্যে, যারা একজন আরেকজনের উপরে সওয়ার হয়ে অবস্থান গ্রহণ করে অপেক্ষায় থাকে আকাশের কাছাকাছি। বর্ণনাকারী আবু সুফিয়ান তার হাতকে তেরছাভাবে উপস্থাপন করে এবং হাতের আঙ্গুলগুলো বিস্তৃত করে শয়তানদের অবস্থান গ্রহণের বিষয়টি বুঝিয়ে দেন এবং বলেন, এভাবে অবস্থান গ্রহণকারী শয়তানেরা প্রত্যেকে ওই চুরি করা সংবাদ

পৌঁছে দেয় তাদের নিম্নবর্তীদের নিকটে। সর্বনিম্নের শয়তান সেকথা জানিয়ে দেয় যাদুকর ও গণকদের কাছে। তারা আবার সেগুলোকে অতিরঞ্জিত করে জনসমক্ষে প্রচার করে সাজে ভবিষ্যদ্বক্তা। উল্লেখ্য, শয়তানদের এমতো প্রচেষ্টা সফল হয় কচিৎ। অধিকাংশ সময়ে সংবাদ পৌঁছানোর আগেই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাদেরকে ভস্মসাৎ করে দেয় প্রহরী ফেরেশতার দল।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আমাদের মহাপ্রভুপালয়িতা যখন কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ করেন তখন আরশবহনকারী ফেরেশতারা সমস্বরে বর্ণনা করে আল্লাহ্র সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা। তারপর তা জানিয়ে দেয়

নিম্নবর্তী ফেরেশতাদেরকে। তারা জানায় তন্নিম্নবর্তীদেরকে। এভাবে সে নির্দেশ চলে আসে প্রথম আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের কাছে। শয়তান প্রথম আকাশে উঠে গোপনে সে সংবাদ শুনতে চেষ্টা করে এবং শুনতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয় অন্য শয়তানকে। সে আরেক শয়তানকে। এভাবে সর্বনিম্নবর্তী শয়তান তা জেনে ফেলে এবং সে কথা বলে দেয় তাদের একান্ত বশংবদ কোনো জ্যোতিষি অথবা গণককে। তারা যদি তা অবিকৃতভাবে বলতে পারে, তবে তা সত্য হয়। কিন্তু তারা তো স্বভাবতই মিথ্যাচারী ও অতিরঞ্জনপ্রিয়। তাই তাদের কথা প্রায়শই সত্য হয় না।

বোখারীর বর্ণনায় এসেছে, উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি, ফেরেশতারা মেঘপুঞ্জের উপরে এসে আল্লাহ্‌র নির্দেশাদি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে। শয়তান তা শুনে নিয়ে জানিয়ে দেয় তাদের একান্ত অনুচর জ্যোতিষিদেরকে। তারা আবার তখন প্রাপ্ত সংবাদকে জনসমক্ষে প্রচার করে তার সঙ্গে অনেক মিথ্যা মিলিয়ে।

বায়যাবী লিখেছেন, নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের আঘাতপ্রাপ্ত শয়তান আহত হয়ে পলায়ন করে, না একেবারে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ মতদ্বৈধতা করেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে, আড়ি পেতে থাকা শয়তানকে কখনো কখনো নিক্ষিপ্ত উল্কাঘাত স্পর্শ করে, কখনো করে না। যেমন ভাসমান নৌকার আরোহী পর্যন্ত কখনো নদীর ঢেউ পৌঁছে, আবার কখনো পৌঁছে না। ভেঙে পড়ে নৌকাগাত্রে আঘাত খেয়ে। তবে একথা ঠিক যে, তার দিকে ছুটন্ত উল্কাপিণ্ড দেখে একবার সে পলায়ন করলে তৎক্ষণাৎ আর ফিরে আসার চেষ্টা করে না।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত **১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮**

❑ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহারা সৃষ্টিতে দৃঢ়তর, না আমি অন্য যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছি তাহা? উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি আঠাল মৃত্তিকা হইতে।

❑ তুমি তো বিস্ময় বোধ করিতেছ, আর উহারা করিতেছে বিদ্রূপ।

❑ এবং যখন উহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয় উহারা তাহা গ্রহণ করে না।

❑ উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে উপহাস করে

❑ এবং বলে, 'ইহা তো এক সুস্পষ্ট জাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

❑ 'আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব, তখনও কি আমাদিগকে উত্থিত করা হইবে?

❑ 'এবং আমাদের পূর্বপুরুষদিগকেও?'

❑ বল, 'হাঁ, এবং তোমরা হইবে লাঞ্ছিত।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মক্কার অংশীবাদীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন, না তারা বাদে অপরাপর সৃষ্টিকে। মানুষকে তো আমি সৃষ্টি করেছি আঠালো মৃত্তিকা থেকে।

এখানে 'মান খলাক্বনা' (অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি) অর্থ মানুষ ছাড়া অন্য যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি। যেমন আকাশমণ্ডলী, ভূমণ্ডল, উদয়স্থল-অস্তস্থল, প্রদীপ্ত প্রদীপ সদৃশ নক্ষত্রপুঞ্জ ইত্যাদি। 'মান' (যা কিছু) অব্যয়টি ব্যবহৃত হয় সাধারণত সচেতন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সচেতন অচেতন সকলের ক্ষেত্রে। আর এখানকার 'তারা সৃষ্টিতে দৃঢ়তর, না অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট মানুষ ছাড়া মহাবিশ্বের অন্যান্য সৃষ্টির অস্তিত্বায়নই তো অধিক কঠিন।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি' বলে বোঝানো হয়েছে অতীতের বিনাশপ্রাপ্ত দুর্ধর্ষ আদ, ছামুদ ইত্যাদি জাতিকে। এমতো অর্থ গ্রহণ করলে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে মক্কাবাসী পৌত্তলিক জনতা! বলো, তোমরা কি অতীত যুগের আদ, ছামুদদের মতো প্রচণ্ড প্রতাপের অধিকারী? নিশ্চয় নও। অথচ দ্যাখো তারাও আমার রুদ্র রোষ থেকে রক্ষা পায়নি। তাহলে তোমরা কীভাবে ভাবতে পারো আল্লাহ্‌দ্রোহী হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে?

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার সমার্থক আয়াতও রয়েছে। যেমন 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, না আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করা'। তাছাড়া আলোচ্য আয়াতের 'তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠালো মৃত্তিকা থেকে' কথাটিও একথা প্রমাণ করে যে, এখানে 'অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি বলে বুঝানো হয়েছে মানুষ ছাড়া অপরাপর সৃষ্টিকে।

'লাযীব' অর্থ আঠালো, যা স্পর্শ করলে হাতে লেগে থাকে। মুজাহিদ ও জুহাক শব্দটির অর্থ করেছেন— গলিত। উল্লেখ্য, মানুষ এবং অপরাপর সৃষ্টির সৃজনসূচনা

একরকম নয়। মানুষের সৃজনোপকরণ গলিত কাদা। আর আকাশ-পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে সৃজনোপকরণ ব্যতিরেকে, আল্লাহ্র অভিপ্রায় ও আদেশের মাধ্যমে সরাসরি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে। আরো উল্লেখ্য, এখানে মানুষের সৃজনোপকরণের কথা উল্লেখ করে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, সুবিশাল আকাশ ও বিশাল ধরিত্রি সৃষ্টির তুলনায় মানুষের ক্ষুদ্রাবয়ব সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। সুতরাং যে আল্লাহ্ অতি বৃহৎ আকাশ ও বৃহৎ বিশ্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি তো মানুষ সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির ব্যাপারে আরো অধিক সক্ষম। তাহলে মক্কার পৌত্তলিকেরা পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করে কীভাবে? আঠালো মৃত্তিকায় থাকে পানি ও মাটি। মানুষের মৃত্যুর পরে ওই পানি ও মাটি আপনাপন অবস্থানে রয়ে যায়। আর আল্লাহ্র মতো মহাশক্তিধরের পক্ষে ওই পানি ও মাটির পুনঃএকত্রকরণ তো অতি সহজ। এমতো ক্ষেত্রে উপকরণসমূহের বিদ্যমানতা এবং আল্লাহ্র সৃজনক্ষমতা দু'টোই তো রয়েছে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তুমি তো বিস্ময়বোধ করছো, আর তারা করছে বিদ্রূপ'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার স্বজাতি সহজ সত্যকে অস্বীকার করছে বলে আপনি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন, অথচ দেখুন, তারা এখনো আশ্রয় করে আছে বিদ্রূপপ্রবণতাকে।

আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'বাল'(বরং) এখানে অবতরনিকা স্বরূপ। শব্দটির মাধ্যমে এখানে বিষয়ান্তর ঘটানো হয়নি। ঘটানো হয়েছে ভাবান্তর। এর মাধ্যমে এখানে দেওয়া হয়েছে কেবল পরিস্থিতির বিবরণ। সত্যপ্রত্যাখ্যানের প্রতিক্রিয়া এখানে হয়েছে দু'রকমের— আল্লাহ্র রসুল হয়েছেন বিস্ময়াপন্ন, এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের অস্বীকৃতিতে পূর্ববৎ অনড় তো রয়েছেই, তদুপরি সত্যের প্রতি ক্রমাগত করে চলেছে উপহাস।

'আজ্বিব' অর্থ বিস্মিত হওয়া, অবাক মানা। অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক অবস্থায় মানুষ সাধারণত বিস্মিত হয়। এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থে। এক হাদিসে বলা হয়েছে 'আ'জ্বিবা রব্বুকা মিন কওমিন ইয়ুসাককুনা ইলাল জান্নাতি ফিস্ সালাসিলি' (তোমার প্রভু বিস্মিত হয়ে দেখবেন একটি দলকে, যাদেরকে শিকল পরা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতের দিকে)। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'সুব্হানাহু মা আ'জামা শানুহু' (পবিত্রতা বর্ণনা করি ওই সুমহান সত্তার)। উল্লেখ্য, আশ্চর্য হওয়ার ঘটনা ঘটে অস্বাভাবিক কর্মের ক্ষেত্রেও। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আমার এই কাজ মানুষের কাছে বিস্ময়কর যে, তাঁদের একজনের উপরে আমি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করি'।

সৌন্দর্যানুভূতিজনিত বিস্ময় প্রকাশার্থেও শব্দটির ব্যবহার সুপ্রচল। যেমন বলা হয় 'আ'জ্বাবানি কাজা' (এই কথা আমার খুব পছন্দ হয়েছে)। এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়া মিনান্নাসি মাঁইয়্যু'জ্বিবুকা ক্বওলুহু'(কোনো কোনো লোকের কথা আপনার কাছে খুব ভালো লাগে)। এক হাদিসে এসেছে 'আ'জ্বিবা রব্বুকুম মিন

শাব্বিন' (যুবকের এই কথা তোমার প্রভুপালকের খুব ভালো লেগেছে)। মন্দ কোনো কিছু দেখে প্রতিক্রিয়া প্রকাশকালেও শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয় 'আ'জ্বিবতু মিম্ বুখলিকা ওয়া শারহিকা' (তোমার এই কৃপণতা ও লোভ লালসা আমার কাছে খারাপ লাগে)। এক কবি বলেছেন—

শাইআনি আ'জ্বীবানি হুমা আব্রাদু মিন ইয়াখিন

শাইখুন্ ইয়াতাসব্বা ওয়া সবিয়্যুন ইয়াতাশাইয়্যাখ

বরফের চেয়ে অধিক শীতল এ দু'টি বিষয় বিস্ময়কর, বাচ্চার বুড়ো সাজা এবং বৃদ্ধের শিশু সাজা।

আবার ভালো অথবা মন্দ উভয়ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করার সময়ও শব্দটিকে ব্যবহার করার প্রচলন দেখা যায়। যেমন 'মা আকারামাহু' (সে কতোইনা দয়ালু) 'মা আজ্হালাহু' (সে কতো মূর্খ) 'মা আশাদ্দা বাইয়াদ্বহু' (এর শুভ্রতা কতো বেশী) মা আশাদ্দা ইস্তিখরাজুহু' (এর মর্ম উদঘাটন করা কতোইনা কঠিন কাজ)। এ সকল উদাহরণ দেওয়া হলো একথা বুঝাতে যে, ওই সকল দয়া মূর্খতা, শুভ্রতা ও মর্মোদ্ঘাটন অস্বাভাবিক প্রকৃতির।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোনো বিষয়ের সূত্রের অজ্ঞতার কারণে মানুষের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাকেই বলে বিস্ময়। সুতরাং শব্দটিকে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না। কেননা অজ্ঞতা থেকে আল্লাহ্পাক সতত পবিত্র। কেউ কেউ বলেছেন, কোনো কিছুকে বিরাট কিছু মনে হলে মানুষের হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার নাম বিস্মিত হওয়া।

অবশ্য এখানকার উভয় ব্যাখ্যাই সমপ্রকৃতির। আর এ ধরনের ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অস্বাভাবিক বিষয়কেই মানুষ বিরাট কিছু বলে ভাবে, আবার অজ্ঞতা প্রকাশ করে সেই সকল ক্ষেত্রে, যা তার কাছে অসাধারণ।

অধিকাংশ ক্বারী বলেছেন, এখানকার 'আজিব্‌তা' শব্দটির 'তা' বর্ণটি মধ্যম পুরুষের । আর এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে রসুল স.কে। এভাবে বক্তব্যার্থ দাঁড়ায়— রসুল স.কে তারা সত্যবাদী বলে জানে, তাদের সামনে প্রকাশ করা হয়েছে অনেক অলৌকিকত্ব, আবার তারা শুনে চলেছে কোরআনের অপার্থিব বাণী সম্ভারের আবৃত্তি, তৎসত্ত্বেও তারা তাঁর রেসালাতের দাবি মেনে নিতে চায় না, তিনি স. তো বিস্ময়বোধ করেন একারণেই। অথবা বলা যেতে পারে— মহাবিশ্বের পরতে পরতে অংশীবাদীরা প্রত্যক্ষ করে চলেছে আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত, অথচ তারা পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করতে চায় না। এই সহজ কথাটিও বুঝতে চায় না যে, পূর্বের সৃষ্টি অপেক্ষা পরের সৃষ্টি অধিকতর সহজ। রসুল স. এর বিস্ময়ান্বিত হওয়ার কারণ তো এটাই।

কাতাদা বলেছেন, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরেও মানুষ যে কীভাবে পথভ্রষ্টতাকে আঁকড়ে থাকতে পারে, সে কথা ভেবে রসুল স. আশ্চর্য্যান্বিত হতেন। তিনি স. ভাবতেন, এই কোরআন যে শুনবে, সে-ই পথপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু মক্কার মুশরিকেরা সত্যিই দুর্ভাগা। না হলে কোরআন শুনে তারা বিদ্রূপ করতে

পারতো না। উল্লেখ্য, তারা পুনরুত্থান নিয়ে তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতোই, তদুপরি উপহাস করতো রসুল স. এর বিস্ময় নিয়েও। তাই এখানে বলা হয়েছে— আপনি হয়ে যান বিস্মিত, আর তারা আপনার বিস্ময়ানুভূতি নিয়ে করে বিদ্রূপ।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়, তারা তা গ্রহণ করে না'। একথার অর্থ— এবং যখন তাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে শুভ উপদেশ দেওয়া হয়, তখন সে শুভ উপদেশকে তারা মান্য করে না। অথবা— যখন মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবসের যাথার্থ্য সম্পর্কে তাদেরকে জানানো হয়, তখন অবিমৃশ্যকারিতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা তা মেনে নিতে চায় না। লাভ করতে পারে না কোনো কল্যাণ।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তারা কোনো নিদর্শন দেখলে উপহাস করে'। একথার অর্থ— অলৌকিক নিদর্শন দেখলেও তারা ঠাট্টা-পরিহাস করে এবং এ অপকর্মে একে অপরকে আহ্বান জানায়। এখানে 'কোনো নিদর্শন' বলে এমন ঘটনার কথা বুঝানো হয়েছে, যা রসুল স. এর রেসালাতের সত্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। হজরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'কোনো নিদর্শন' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে রসুল স. কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার অলৌকিক ঘটনাকে।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'এবং বলে, এটা তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়'। একথার অর্থ— স্বচক্ষে চন্দ্রদ্বিখণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য দেখেও তারা রসুল স.কে সত্য নবী বলে স্বীকার করতে চায় না। বলে, মোহাম্মদ যাদুকর। আর এটা তার যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'আমরা যখন মরে যাবো এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখনও কি আমাদেরকে উত্থিত করা হবে (১৬) এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও(১৭)'?

এখানে 'আ ইন্না লা মাব্‌উ'ছূন' অর্থ কী, আমাদেরকে উত্থিত করা হবে? এ হচ্ছে ক্রিয়াবাচক বাক্যের পরিবর্তে নামবাচক বাক্য দ্বারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের প্রতি জোর দেওয়ার প্রমাণ। তাছাড়া কথাটির দ্বারা তাদের এমতো মনোভাবও প্রকাশ করা হয়েছে যে, পুনরুত্থান অসম্ভব এবং মরদেহ মাটিতে মিশে যাবার পর তো তা আরো অসম্ভব।

'আওয়া আবাউনাল আউয়ালূন' অর্থ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও? অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের মৃত্যু ঘটেছে তো আরো আগে। তাদেরকেও কি তাহলে আমাদের সঙ্গে এক সময়ে ওঠানো হবে? তা আবার কী করে হয়?

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'বলো, হ্যাঁ, এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তোমাকে ও তোমাদের পূর্বপুরুষকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে এবং সেদিন তোমাদের অপদস্থ হওয়ার বিষয়টিও সুনিশ্চিত। এখানকার 'দাখিরুন' শব্দটির অর্থ চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১

❑ উহা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ— আর তখনই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।

❑ এবং উহারা বলিবে, 'দুর্ভোগ আমাদের! ইহাই তো কর্মফল দিবস।'
❑ ইহাই ফয়সালার দিন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপুনরুত্থান সূচিত হবে শিঙ্গার একটি মাত্র বিকট বজ্রনিনাদ সদৃশ ফুৎকারধ্বনির মাধ্যমে। প্রত্যেকে তখন আপনাপন সমাধিস্থলে পুনর্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে এবং ভয়ে আতংকে একে অপরকে দেখতে থাকবে। অশুভ পরিণতির নিশ্চিতি বুঝতে পেরে বলে উঠবে, দুর্ভোগ আমাদের। এটাই তো দেখছি পৃথিবীতে শ্রুত কর্মফল দিবস। তখন ফেরেশতারা বলে উঠবে, হ্যাঁ, এটাই সেই মীমাংসার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

এখানে **'যাজ্‌রাতুন ওয়াহিদাতুন'** অর্থ একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ। অর্থাৎ শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকার। উল্লেখ্য, শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মৃত্যুবরণ করবে এবং আপন আপন কবরে পুনরুত্থিত হবে দ্বিতীয় ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে।

'যাজ্‌রা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হাঁকিয়ে বের করে দেওয়া, চিৎকার করে থামিয়ে দেওয়া। যেমন বলা হয় **'যাজ্বারার রায়ী গানামাহু'** (রাখাল ধমক দিয়ে তার ছাগপালকে থামিয়ে দিলো)। শব্দটির দ্বারা এখানে বুঝানো হয়েছে— দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কবরবাসীরা পুনরুত্থিত হবে, যেমন প্রথম শিঙ্গাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হবে সবাই। অর্থাৎ শিঙ্গাধ্বনির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে তাৎক্ষণিকভাবে, এতটুকুও বিলম্ব হবে না।

'ফা ইজাহুম ইয়ানজুরুন' অর্থ আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ পুনরুত্থিত জনেরা দণ্ডায়মান হওয়ার সাথে সাথেই ভয়ে আতংকে এদিক ওদিক দেখতে থাকবে। অথবা **'ইয়ানজুরুন'** অর্থ এখানে **'ইয়ানতাজিরুন'**। অর্থাৎ তারা তখন উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করা হয়, তা বুঝবার জন্য এদিকে সেদিকে নিক্ষেপ করতে থাকবে ত্রস্ত দৃষ্টি।

'ইয়া ওয়াইলানা' অর্থ দুর্ভোগ আমাদের। শব্দটির **'ইয়া'** অব্যয়টি হুমকি প্রকাশক। **'ইয়াওমাদ্ দীন'** অর্থ এটাই তো সেই কর্মফল দিবস। **'ইয়াওমাল ফাস্‌লি'** অর্থ ফয়সালার দিন, যেদিন চিরকালের জন্য পৃথক করে দেওয়া হবে সৌভাগ্যশালী ও দুর্ভাগাদেরকে। কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন, **'হাজা ইয়াওমুদ্‌দীন'** (এটাইতো সেই কর্মফল দিবস) উক্তিটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের

শেষ উক্তি। আর ২১ সংখ্যক আয়াতে উদ্ধৃত উক্তিটি ফেরেশতাদের। আবার কেউ কেউ বলেছেন, সম্পূর্ণটাই কাফেরদের উক্তি। ফেরেশতাদের কোনো বক্তব্য এখানে নেই।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪

❑ ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে, 'একত্র কর যালিম ও উহাদের সহচরগণকে এবং উহাদিগকে যাহাদের 'ইবাদত করিত তাহারা—
❑ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং উহাদিগকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে,
❑ 'অতঃপর উহাদিগকে থামাও, কারণ উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে ঃ

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহাপুনরুত্থান পর্ব সম্পন্ন হলে আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন, সীমালংঘনকারী, সীমালংঘনকারীদের সহচর এবং তারা যে সকল প্রতিমা ও শয়তানের উপাসনা করতো তাদের সকলকে একত্র করো। আর তাদেরকে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলো।

এখানে **'উহ্‌শুরু'** অর্থ একত্র করো, সমবেত করো হিসাব-নিকাশ গ্রহণের স্থানে। **'জলামু'** অর্থ সীমালংঘনকারী। আর **'ওয়া আযওয়াজ্বাহুম'** অর্থ তাদের সহচরদেরকে।

নোমান ইবনে শরীক থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, **'সীমালংঘনকারী ও তাদের সহচর'** অর্থ জালেম এবং তাদের সমপ্রকৃতির লোক। এভাবে সেদিন একত্র করা হবে সুদখোরের সঙ্গে সুদখোরকে, ব্যভিচারীর সঙ্গে ব্যভিচারীকে এবং মদ্যপের সঙ্গে মদ্যপকে। জান্নাত হবে যেমন সমপ্রকৃতির পুণ্যবানদের বসবাস স্থল, তেমনি জাহান্নামও হবে সমপ্রকৃতির অপরাধীদের আবাস।

বায়হাকী আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, **'আয্‌ওয়াজ্ব'** অর্থ সমপর্যায়ভূত। বাগবী লিখেছেন, কাতাদা ও কালাবী বলেছেন, শব্দটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে ওই সকল লোককে যাদের কার্যকলাপ সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন সাদৃশ্য রয়েছে এক মাতালের সঙ্গে অন্য মাতালের, এক সুদ ভক্ষণকারীর সঙ্গে অন্য সুদ ভক্ষণকারীর। জুহাক বলেছেন,

'আয্ওয়াজ্বাহুম' অর্থ তাদেরকে তাদের পরামর্শদাতা শয়তানের সঙ্গে জড়ো করো। অর্থাৎ প্রতিটি কাফেরকে তার পরিচালক শয়তানের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে দাও। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ তাদেরকে শৃঙ্খলিত করো তাদের পৌত্তলিক সহধর্মিণীদের সঙ্গে।

'মাকানু ইয়া'বুদূন' অর্থ যাদের ইবাদত তারা করতো। অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা যে সকল মূর্তি ও শয়তানের পূজা করতো। মুকাতিল বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ শয়তান। কেননা এক আয়াতে আজ্ঞা করা হয়েছে **'তোমরা শয়তানের পূজা কোরো না'**। প্রকৃত কথা হচ্ছে, কথাটি ব্যাপকার্থক নয়, বরং বিশেষার্থক। কারণ অংশীবাদীরা কেবল মূর্তি ও শয়তানের উপাসনাই করে না, উপাসনা করে কোনো কোনো পুণ্যবানেরও। যেমন আল্লাহ্র পুত্র ভেবে কেউ উপাসনা করে হজরত ঈসা ও হজরত উযায়েরের। আবার আল্লাহ্র কন্যা মনে করে কেউ পূজা করে ফেরেশতার।
সুতরাং বুঝতে হবে সেদিন অংশীবাদীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে কেবল তাদের পূজিত প্রতিমাগুলোকে এবং শয়তানকে। হজরত ঈসা ও হজরত উযায়ের তো আল্লাহ্র নবী। আর ফেরেশতারাও নিরপরাধ।

'ফাহ্দূহুম ইলা সিরাত্বিল জ্বাহীম' অর্থ এবং তাদেরকে পরিচালিত করে জাহান্নামের পথে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ— তাদেরকে দোজখের পথ বাতলে দাও। ইবনে কীসান অর্থ করেছেন— তাদেরকে দোজখের দিকে অগ্রসর করিয়ে দাও। উল্লেখ্য, পিছন দিক দিয়ে যে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তাকে আরববাসীরা বলেন **'হাদী'** (পরিচালক, পথনির্দেশক)।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— **'অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে'**।

ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন, বিতাড়িত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পুলসিরাতের নিকটে পৌঁছলে আল্লাহ্তায়ালা পুনঃআদেশ করবেন, ওদেরকে এখানে থামাও। তাদেরকে এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একথাই বলা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এখানে বিবৃত হয়েছে পূর্ববর্তী আদেশের কারণ। হজরত ইবনে আব্বাস তাঁর এক বর্ণনায় বলেছেন, তখন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেওয়া হবে তাদের সকল কথা ও কাজের। তাঁর আর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, তাদেরকে তখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে **'লাইলাহা ইল্লাল্লহ্'** (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই) কলেমা সম্পর্কে।

হজরত আবু বারযাহ্ আসলামী থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো বান্দা পুলসিরাত থেকে পা ওঠাতে পারবে না, যতক্ষণ না এই চারটি প্রশ্নের মীমাংসা হবে— ১. জীবন কাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. শরীরকে শ্রান্ত করেছে কোন কাজে খাটিয়ে? ৩. জ্ঞানার্জনের পর সে জ্ঞান লাগিয়েছে কী ধরনের কাজে? ৪. সম্পদ অর্জন ও ব্যয় করেছে কীভাবে? এরকম হাদিস আরো বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি ও ইবনে মারদুবিয়া এবং হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল, হজরত আবু দারদা ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী। ইবনে মোবারক তাঁর **'জুহুদ'** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু দারদা বলেছেন, আমি ভয় করি সে সময়ের কথা মনে করে, যে সময় আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি যা জানতে তা আমলে এনেছিলে কিনা?

ইমাম আহমদ তাঁর **'জুহুদ'** গ্রন্থে বলেছেন, হজরত আবু দারদা বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে বান্দাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করা হবে, এলেম অনুসারে তুমি কী পরিমাণ আমল করেছো?

আবকা ইবনে আবদুল্লাহ্ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, জাহান্নামের উপরে রয়েছে সাতটি পুল। সবাইকে ওই পুলগুলো অতিক্রম করার হুকুম দেওয়া হবে। প্রথম পুলের কাছে পৌঁছলে ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, এদেরকে থামাও। এদেরকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রথমে হিসাব নেওয়া হবে নামাজের। ফলে যারা ধ্বংস হওয়ার উপযুক্ত তারা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যারা পরিত্রাণপ্রাপ্তির উপযোগী তারা পাবে পরিত্রাণ। দ্বিতীয় পুলের কাছে পৌঁছানোর পর জিজ্ঞেস করা হবে আমানত সম্পর্কে। তখন যারা আমানতের খেয়ানত করেছিলো তারা হয়ে যাবে ধ্বংস এবং মুক্তি পাবে তারা, যারা আমানত রক্ষা করেছিলো। তৃতীয় পুলের সন্নিকটে পৌঁছলে প্রশ্ন করা হবে আত্মীয়তার হক প্রতিপালন সম্পর্কে। ফলে আত্মীয়তার বন্ধন যারা ছিন্ন করেছিলো, তারা হয়ে যাবে শাস্তিকবলিত। আর নাজাত পাবে আত্মীয়তা বজায়কারীরা। ওই সময় আত্মীয়তার বন্ধন বলতে থাকবে, হে আল্লাহ্! যারা আমাকে অটুট রেখেছিলো, তুমিও তাদেরকে অটুট রাখো এবং যারা আমাকে ছিন্ন করেছিলো তুমিও তাদেরকে করে ফেলো ছিন্নভিন্ন।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪

❑ 'তোমাদের কী হইল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করিতেছ না?'
❑ বস্তুত সেই দিন উহারা আত্মসমর্পণ করিবে
❑ এবং উহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

❑ উহারা বলিবে, 'তোমরা তো তোমাদের শক্তি লইয়া আমাদের নিকট আসিতে।'
❑ তাহারা বলিবে, 'তোমারা তো বিশ্বাসীই ছিলে না,
❑ 'এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।
❑ 'আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হইয়াছে, আমাদিগকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করিতে হইবে।
❑ 'আমরা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।'
❑ উহারা সকলেই সেই দিন শাস্তির শরীক হইবে।
❑ অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছো না'? এ কথার অর্থ— একত্রায়িত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তখন বিদ্রূপ ও ধমকের সুরে বলা হবে, সত্যের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে তোমরা ছিলে একে অপরের সহযোগী, এখন তবে তোমরা একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসছো না কেনো?

পরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'বস্তুত সেই দিন তারা আত্মসমর্পণ করবে'। একথার অর্থ— আসলে তখন তারা বাধ্য হয়ে করবে আত্মসমর্পণ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুসতাস্‌লিমূন' অর্থ অসহায় হয়ে পড়বে। অর্থাৎ সেদিন তারা হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ অসহায়। হাসান কথাটির অর্থ করেছেন, তখন তারা হয়ে পড়বে নিতান্ত অনুগত, একান্ত বাধ্য। যেমন ইস্‌তাস্‌লামা লিশাইইন' অর্থ কোনোকিছুর তাবেদার হয়ে পড়া, নির্দেশানুগত হওয়া।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে'? একথার অর্থ উপায়ন্তর না দেখে এবং কেউ কাউকে সাহায্য না করতে পেরে তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী নেতা ও জনতা মুখোমুখি ঝগড়া বিবাদ বাধাবে। দোষারোপ করতে থাকবে একে অপরকে।

বা'দ্বুহুম আ'লা বা'দ্বিন' অর্থ একে অপরের সামনাসামনি হয়ে। আর 'ইয়াতাসাআলূন' অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ করবে, বিবাদ বাধাবে।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনতা তাদের ধর্মীয় গুরু, নেতা, অথবা কুমন্ত্রণাদাতা শয়তানকে লক্ষ্য করে তপ্ত স্বরে বলবে, পৃথিবীতে খুব তো দাপট দেখাতে তোমরা। এখানে তাহলে চুপ মেরে রয়েছো কেনো?

'ইয়ামীন' অর্থ দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ শক্তি বা দাপট, অখণ্ডনীয় যুক্তি, ধর্মীয় দৃঢ়তা। জুহাক ও মুজাহিদও এরকম অর্থ করেছেন। কেউ

কেউ বলেছেন 'ইয়ামীন' অর্থ এখানে শপথ। অর্থাৎ তোমরা তখন শপথ করে বলতে যে, তোমাদের ধর্মই সঠিক। কোনো কোনো আলেম শব্দটির অর্থ করেছেন জবরদস্তি। অর্থাৎ তোমরা তখন জোর-জবরদস্তি খাটিয়ে আমাদেরকে ধর্মভ্রষ্ট হতে বাধ্য করতে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যই দিতে না।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না'। একথার অর্থ— তাদের ধর্মীয় নেতা ও সমাজপতিরা তখন বলবে, না। আমরা তোমাদেরকে ধর্মভ্রষ্ট করিনি। তোমরা বিপথগামী হয়েছিলে স্বেচ্ছায়। বিশ্বাসী তো তোমরা ছিলেইনা।

এরপরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'এবং তোমাদের উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিলো না, বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— তাদের নেতৃস্থানীয়রা আরো বলবে, ধর্মীয় ব্যাপারে আমরা তোমাদের উপরে কোনো কর্তৃত্ব খাটাইনি। বিপথগামিতাকে পছন্দ করেছিলে তোমরাই। হয়ে গিয়েছিলে সীমালংঘনকারী।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে, আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে (৩০)। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত (৩১)। একথার অর্থ— তাদের নেতৃবর্গ শেষে তাদের নিজেদের দোষও স্বীকার করবে। বলবে, দ্যাখো। তোমরা আমরা উভয়েই অপরাধী। এখন শাস্তিভোগ আমাদের জন্য অনিবার্য। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। সেজন্যই তো তোমাদেরকে আহ্বান জানাতাম পথভ্রষ্টতার দিকে। তোমরাও সে আহ্বানে হৃষ্টচিত্তে সাড়া দিয়েছো। এভাবে এখন আমাদের উপরে বাস্তবায়িত হবে আল্লাহ্‌র পূর্বঘোষিত বাণী, আর আল্লাহ্‌র বাণী তো সত্য।

উল্লেখ্য, এখানে 'আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই আয়াতের দিকে, যেখানে বলা হয়েছে 'আমি জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করবো জ্বিন, ইনসান ও পাথর দ্বারা'। এভাবে তাদের একথার অর্থ দাঁড়িয়েছে— দ্যাখো, তোমাদের ও আমাদের পথভ্রষ্টতা ভাগ্যের ফের ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের নরকগমন অদৃষ্টলিপিতে পূর্বাহ্নেই লিপিবদ্ধ ছিলো। পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট করে ও হয়ে আমরা তা বাস্তবায়ন করেছি মাত্র। আমরা যে চিরভ্রষ্ট।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা সকলেই সেদিন শাস্তির শরীক হবে (৩৩) অপরাধীদের প্রতি আমি এরকমই করে থাকি' (৩৪)। একথার অর্থ— সেদিন শাস্তিভোগের অংশীদার হবে অবিশ্বাসী নেতা-জনতা সকলেই। অবিশ্বাসীদের প্রতি আমা কর্তৃক আরোপিত শাস্তি এরকমই।

তাফসীরে মাযহারী/৭৪

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

❑ উহাদিগকে 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই' বলা হইলে উহারা অহংকার করিত
❑ এবং বলিত, 'আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্‌গণকে বর্জন করিব?'
❑ বরং সে তো সত্য লইয়া আসিয়াছে এবং সে রাসূলদিগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।
❑ তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে
❑ এবং তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল পাইবে—

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— পৃথিবীতে ওই অবিশ্বাসীদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের প্রকৃতি ছিলো এরকমঃ তাদের সামনে আমার প্রেরিত বার্তাবাহকগণ যখন 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই' এই মহাসত্য উচ্চারণ করতেন, তখন তারা প্রত্যাখ্যান করতো দম্ভভরে। বলতো, আমরা কি উন্মাদ এক কবির কথায় আমাদের এতোদিনকার পূজা-পার্বন পরিত্যাগ করতে পারি?

এখানে 'উন্মাদ কবি' অর্থ রসুলেপাক স.! মক্কার মুশরিকেরা বিভিন্ন সময়ে তাঁকে 'কবি' 'যাদুকর' ইত্যাদি বলে উত্যক্ত করতো।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'বরং সে তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সে রসুলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছে'। একথার অর্থ— অংশীবাদীদের উল্লেখিত অপমন্তব্যের জবাবে আল্লাহ্তায়ালা সুনিশ্চিতার্থক ভঙ্গিতে বলেন, কস্মিনকালেও তিনি কবি নন। তিনি হচ্ছেন আমা কর্তৃক নির্বাচিত নবী। তিনি অবশ্যই সত্যসহ প্রেরিত হয়েছেন। সে কারণেই তো পূর্ববর্তী সকল নবীর তিনি প্রত্যয়নকারী। তিনি বলেন, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সকল নবী সত্য।

এখানে 'সে রসুলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছে' কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিই বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে, রসুল স. এর দাবি নতুন কোনো বিষয় নয়। ইতোপূর্বে তাঁর মতো অনেক নবী রসুল এসেছিলেন। আর তাদের প্রচারিত ধর্মমতও তাঁর আনীত ধর্মমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে (৩৮) এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে'(৩৯)। একথার অর্থ— হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমাদেরকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে মর্মন্তুদ শাস্তির স্বাদ। শাস্তি ভোগ করবে তোমরা অপরাধের গুরুত্ব ও পরিমাণানুসারে।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

❑ তবে তাহারা নয় যাহারা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা।
❑ তাহাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্ক—
❑ ফলমূল; আর তাহারা হইবে সম্মানিত,
❑ সুখদ-কাননে
❑ তাহারা মুখামুখি হইয়া আসনে আসীন হইবে।

আলোচ্য আয়াত পঞ্চকের মর্মার্থ হচ্ছে— মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে কেবল অবিশ্বাসীরা। কিন্তু যারা একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, তারা সম্পূর্ণরূপে হবে শাস্তির সংশ্রবমুক্ত। তাদেরকে করা হবে পুরস্কৃত। দেওয়া হবে পূর্বনির্ধারিত অফুরন্ত জীবনোপকরণ, বেহেশতের সুস্বাদু ফলমূল। তদুপরি তাদেরকে করা হবে সম্মানিত। মনোরম কুসুমকাননে সুখাসনে মুখোমুখি উপবেশন করানো হবে তাদেরকে।

এখানে 'রিয্কুম্ মা'লূম' অর্থ নির্ধারিত জীবনোপকরণ, যা চিরস্থায়ী ও পরিতৃপ্তিপ্রদায়ক, সুস্বাদু। 'ফাওয়াকিহ্' অর্থ স্বাদে গন্ধে ভরপুর ফল, যা কেবল সাধারণ আহার্যের মতো ক্ষুধানিবারক নয়, চিত্তপ্রশান্তিপ্রদায়ক। শব্দটি 'ফাকিহাতুন' এর বহুবচন। আবার 'ফাকিহাতুন' অর্থ কেবল ওই সকল ফলমূল, যা কেবলই ক্ষুণ্নিবৃত্তিনিবারক, মনোমুগ্ধকর কিছু নয়। 'রিয্ক্ব' বলা হয় ওই দুই ধরনের আহার্য বস্তুকেই। উল্লেখ্য, জান্নাতবাসীদেরকে ক্ষুণ্নিবৃত্তি পরিপূরণের জন্য আহার্যভক্ষণ করতে হবে না। তাদের শরীর সুরক্ষিত থাকবে পানাহার ব্যতিরেকেই। তবুও তারা পানাহার করবে কেবল আহারাস্বাদ গ্রহণের জন্য। তাই তাদের আহার্যবস্তু হবে কেবল বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের মনোমুগ্ধকর ফলমূল।

'ওয়াহুম মুক্রমূন' অর্থ আর তারা হবে সম্মানিত। অর্থাৎ তারা সেখানে রিজিক পাবে সম্মানের সঙ্গে। পৃথিবীবাসীদের মতো রিজিকের জন্য তাদেরকে কোনো দুঃশ্চিন্তায় ভুগতে হবে না। দিতে হবে না কোনো শ্রম। এমনকি মুখ ফুটে চাইতেও হবে না কোনোকিছু। আর 'ফী জান্নাতিন্ নাঈম' অর্থ সুখদ কাননে, চিত্তসুখকর উদ্যানে।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯

❑ তাহাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিবেশন করা হইবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে
❑ শুভ্র উজ্জ্বল, যাহা হইবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।
❑ উহাতে ক্ষতিকর কিছু থাকিবে না এবং উহাতে তাহারা মাতালও হইবে না,
❑ তাহাদের সঙ্গে থাকিবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরীগণ।
❑ তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— সুখদ কাননে উপবিষ্ট জান্নাতবাসীদেরকে তখন পরিবেশন করা হবে শুভ্রোজ্জ্বল শরাবপূর্ণ পান পাত্র। ওই শরাব হবে অতি স্বাদু এবং ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। যারা তা পান করবে, তারা তাই মাতালও হবে না। হবে না চৈতন্যচ্যুত।

এখানে 'কা'সিন' অর্থ সুরা, শরাব, মদ্য, অথবা সেই পানপাত্র যা থাকে সুরায় পরিপূর্ণ। জনৈক কবি বলেছেন 'ওয়া কা'সিন শারিব্তু আ'লা লাজ্জাতিন'। এখানে 'কা'সিন অর্থ সুরা, সুরাভর্তি পানপাত্র নয়। কেননা পানযোগ্যবস্তু সুরা, পানপাত্র নয়। আখফাশ বলেছেন, কোরআনের সকল স্থানেই 'কা'সিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সুরা অর্থে।

'মায়ীন' অর্থ প্রবহমান সুরা, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য। অর্থাৎ এখানে 'মায়ীন' অর্থ 'আ'য়ীন' (পরিদৃশ্যমান)। অথবা শব্দটির অর্থ হবে ঝরণা থেকে প্রবহমান সুরা। এমতোক্ষেত্রেও 'মায়ীন' এর অর্থ হবে 'আ'য়ীন'। আর 'আ'য়ীন' অর্থ হবে ঝরণা। প্রকৃত কথা হচ্ছে, যা দেখতে পানির মতো, তা-ই 'মায়ীন'। জান্নাতে শরাব প্রবাহিত হবে পানির প্রবাহের মতো। তাই একে বলা হয়েছে 'মায়ীন'। কিংবা কথাটির দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতের পানীয় বস্তু হবে অতি সুস্বাদু।

হাসান বলেছেন, জান্নাতের সুরা হবে দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র। 'লাজ্জাত' শব্দটি হয়তো মূল ধাতু। সুতরাং শব্দটির অর্থ হবে— সুস্বাদু হওয়ার কারণে প্রকৃত অর্থেই তা উপভোগ্য। কিংবা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক, যার পুংলিঙ্গ 'লাজ্জুন'। আর 'লাজ্জুন' শব্দ গুণবাচক, যেমন গুণবাচক শব্দ 'সুস্বাদু'।

এখানকার 'লা ফীহা গউলুন' কথাটির 'ইয়াগুলু' অর্থ ক্ষতিকর। 'গালা' অর্থ সে ধ্বংস করে দিয়েছে, করে দিয়েছে পণ্ড। অর্থাৎ জান্নাতের শরাব দুনিয়ার শরাবের মতো ক্ষতিকর নয়। ওই শরাব পান করলে শারীরিক অথবা মানসিক কোনো অপপ্রতিক্রিয়াই হবে না। বিকল হবে না বুদ্ধি-বিবেক।

'ইউনযাফুন' অর্থ মাতালও হবে না। 'নাযফুন' অর্থ কোনোকিছুর শেষ হয়ে যাওয়া, শব্দটি সকর্মক ও অকর্মক উভয় অবস্থাতেই ব্যবহার্য। 'কামুস' গ্রন্থে এরকমই বলা হয়েছে। 'নাযাফ' শব্দটি শব্দগঠনপ্রক্রিয়া 'ইফয়ালে' ব্যবহৃত হলে অর্থ প্রদান করে বিস্তৃতি ও গভীরতার। অর্থাৎ বেহেশতের শরাব পান করলে পানকারীর জ্ঞানবুদ্ধি বিপর্যস্ত হবে না এবং তার পানেচ্ছা ও পানীয় কখনো শেষ হবে না। উল্লেখ্য, জ্ঞানবুদ্ধির বিভ্রাট ঘটা ও শরাব শেষ হয়ে যাওয়া পানকারীর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। এরকম কষ্ট থেকে বেহেশতের শরাব পানকারীরা থাকবে মুক্ত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা হূরীগণ (৪৮)। তারা যেনো সুরক্ষিত ডিম্ব'(৪৯)। একথার অর্থ— শরাবপানকালে তাদের সঙ্গে থাকবে ব্রীড়াবনতা ও আয়তআঁখিনী ললনাকুল। তারা দেখতে হবে গোপনে সংরক্ষিত উজ্জ্বল ডিমের মতো অনিন্দ্যসুন্দর।

'কৃসিরাতুত্ ত্বরফি' অর্থ আনতনয়না, ব্রীড়াবনতা। অর্থাৎ ওই সকল কুমারী রমণীর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে কেবল তাদের বেহেশতী স্বামীদের দিকে। অন্য কারো দিকে তারা দৃষ্টিপাত করবে না। 'য়ীন' অর্থ আয়তলোচনা, সুন্দর আঁখির অধিকারিণী। শব্দটি ব্যবহৃত হয় পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই।

'বায়দ্বুন' অর্থ ডিম, বিশেষ করে উট পাখির ডিম। শব্দটি বহুবচন 'বায়দ্বাতুন' এর। হাসান বলেছেন, উটপাখিরা তাদের ডিমগুলোকে লুহাওয়া ও ধূলাবালি থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের ডানার নিচে লুকিয়ে রাখে। ডিমগুলোর রঙ হয় হরিদ্রাভ শুভ্র। আরববাসীরা সুন্দরী নারীকে তুলনা করে ওই সুরক্ষিত ডিমের সঙ্গে। এখানেও বেহেশতের হূরীদের ক্ষেত্রে এই উপমাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

জননী হজরত উম্মে সালমা থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন 'য়ীন' বলে পটলচেরা আঁখিবিশিষ্ট মেয়েদেরকে। পাখি যেমন তার পালক দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তেমনি বেহেশতের হূরীরাও হবে আয়তলোচনা। তাদের দেহত্বক হবে অতি সূক্ষ্ম এবং মসৃন। দেখে মনে হবে যেনো ডিমের বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্যের উপর সেঁটে আছে এক সূক্ষ্ম ত্বকাবরণ।

'মাক্নূন' অর্থ গোপনে রক্ষিত, সুরক্ষিত— যেমন সযত্নে নিজেদের ডিম রক্ষা করে উটপাখিরা।

সূরা সাফ্ফাতঃ আয়াত ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১

❒ তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

❑ তাহাদের কেহ বলিবে, 'আমার ছিল এক সংগী;

❑ 'সে বলিত, 'তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে,

❑ 'আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে?'

❑ আল্লাহ্ বলিবেন, 'তোমরা কি তাহাকে দেখিতে চাও?'

❑ অতঃপর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

❑ বলিবে, 'আল্লাহ্র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে,

❑ 'আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো হাযিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম।

❑ 'আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না

❑ 'প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না!'

❑ ইহা তো মহাসাফল্য।

❑ এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা,

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে'। একথার অর্থ— সুরা পানরত অবস্থায় বেহেশতবাসীরা মুখোমুখি বসে খোশগল্প করতে থাকবে। বলা বাহুল্য, এরকম খোশগল্প খুবই আনন্দদায়ক। জনৈক কবি তাই বলেছেন—

ওয়ামা বাক্বিয়াত মিনাল লাজ্জাতি ইল্লা
আহাদীছাল কিরামি আ'লাল মাদামি
ভোগের আর বাকী নেই কিছু শুধু এইটুকু ছাড়া
যা পানের আসরে মধুর আলাপনে দেয় সাড়া।

উল্লেখ্য, এখানকার 'আক্ববালা' শব্দটি বক্তব্যকে আরো সুদৃঢ় করেছে। যেনো ওই আলাপনের ঘটনা অতি বাস্তব।

এর পরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের কেউ বলবে, আমার ছিলো এক সঙ্গী (৫১); সে বলতো, তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে (৫২), আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে (৫৩)'? একথার অর্থ— ওই মধুর আলাপচারিতার সময়

এক বেহেশতবাসী আর এক বেহেশতবাসীকে বলবে, পৃথিবীতে আমার এক সঙ্গী ছিলো। সে পুনরুত্থান , বেহেশত- দোজখ কিছুই বিশ্বাস করতো না। উল্টো আমাকে বলতো, তুমিও কি পরকালে বিশ্বাস করো? আমরা মরে গিয়ে পরিণত হবো মাটি ও হাড়ে। এরপরেও আমাদেরকে আবার শাস্তি পেতে হবে?

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'ক্বরীন' অর্থ শয়তান সম্পর্কিত। অর্থাৎ পৃথিবীতে শয়তান ছিলো আমার সঙ্গী। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এখানে 'সঙ্গী' অর্থ মানুষ সঙ্গী, শয়তান সঙ্গী নয়। আর 'আমার ছিলো এক সঙ্গী' অর্থ আমার ছিলো এক

ভাই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ওই বেহেশতবাসী ও তার দুনিয়ার জীবনের সঙ্গী ছিলো একই পরিবারভূত। তাদের একজন ছিলো বিশ্বাসী এবং অপরজন অবিশ্বাসী। তাদের নাম যথাক্রমে ইয়াহুদা এবং মাতরুস। সুরা কাহাফেও এদুজনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

'লামিনাল মুতাসদ্দিক্বীন' অর্থ— তুমিও কি পরকালে বিশ্বাস করো? তুমি কি তাদের দলভূত যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী? ...মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পরেও আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে শাস্তি বা স্বস্তি দেওয়া হবে? এতো বিবেকবহির্ভূত আজব কথা। প্রশ্নবোধকটি বিস্ময়সূচক।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও'। এখানকার 'তোমরা কি তাকে দেখতে চাও' কথাটি আল্লাহ্তায়ালার হতে পারে। হতে পারে ফেরেশতারও। আবার এরকমও হতে
পারে যে, কথাটি বলবে ওই বেহেশতবাসী, যে ইতোপূর্বে আলাপচারিতা শুরু করেছিলো 'আমার ছিলো এক সঙ্গী' একথা বলে। শেষোক্ত অবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— আমার ওই অবিশ্বাসী সঙ্গী বা ভ্রাতা এখন জাহান্নামবাসী। তুমি কি তাকে দেখতে চাও।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে'। একথার অর্থ— এরপর সে দৃষ্টি নিম্নমুখী করে দেখতে পাবে, তার সেই সঙ্গীটি রয়েছে দোজখের কেন্দ্রস্থলে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে কয়েকটি জানালা থাকবে। ওই জানালায় উঁকি দিলে বেহেশতবাসীরা দেখতে পাবে দোজখীদেরকে।

'সাওয়াইল জ্বাহীম' অর্থ দোজখের মধ্যস্থলে। যে স্থানের চতুর্দিকের দূরত্ব সমান তাকেই বলে 'সাওয়া'। এই আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হান্নাদ উল্লেখ
করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, ওই ব্যক্তিটি জ্বলন্ত দোজখের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার অন্যান্য বেহেশতী সাথিদেরকে বলবে, আমি মানুষের মাথাগুলোকে টগবগ করে ফুটতে দেখছি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বলবে, আল্লাহ্র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে(৫৬), আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও হাজিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম'(৫৭)। একথার অর্থ— সে

তখন ওই দোজখবাসীকে বলবে, আল্লার শপথ! অপপ্ররোচনা দিয়ে তুমি তো আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। ভাগ্যিস আল্লাহ্ আমাকে অনুগ্রহ করেছেন। না হলে তোমার কথা বিশ্বাস করে এখন আমিও তোমার মতো জ্বলতে থাকতাম দোজখের আগুনে।

এখানে 'নি'মাতু রব্বি' অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহ। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত হেদায়েত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না (৫৮) প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে না' (৫৯)। একথার অর্থ— সে আরো বলবে, একবার তো আমরা পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করেছিলাম। আর আমাদেরকে কখনো মৃত্যুবরণ করতে হবে না। আর কখনো শাস্তিও দেওয়া হবে না আমাদেরকে। সুতরাং আমাদের এই জান্নাতবাস চিরকালীন। উল্লেখ্য, এমতো বক্তব্যের মাধ্যমে ওই জান্নাতী ব্যক্তি ও তার অন্যান্য সাথীরা দোজখীদেরকে ধিক্কার দিতে থাকবে। অথবা তারা এরকম কথা বলবে নিজেদের আলাপচারিতায়। শেষোক্ত অবস্থায় তাদের এমতো বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ ও দোজখীদেরকে ভর্ৎসনা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ইহা তো মহাসাফল্য (৬০)। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকের উচিত সাধনা করা' (৬১)।

কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকার বলেছেন, যখন মৃত্যুকে জবাই করা হবে, তখন জান্নাতবাসীরা আনন্দিত হয়ে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, আমাদেরকে আর কখনো কি মরতে হবে? তারা বলবে, না। একথা শুনে জান্নাতবাসীরা সমস্বরে বলে উঠবে— এটাই তো মহাসাফল্য। এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা। এরকমও হতে পারে যে, এ কথাগুলো আল্লাহ্র।

জাগতিক সাফল্যের জন্য মানুষ সারাজীবন ধরে বহু চেষ্টা-সাধনা করে। অথচ তা প্রকৃত সাফল্য নয়। কারণ, পৃথিবীর সুখ-দুঃখ সব কিছুই এক সময় শেষ হয়ে যায়। আর আখেরাতের সুখ-দুঃখ অনন্ত। সুতরাং অনন্ত সুখের জীবন লাভ করার জন্যই সকলের চেষ্টা সাধনা করা উচিত। কারণ এটাই মহাসাফল্য। সেকারণেই শেষে বলা হয়েছে— এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকের উচিত সাধনা করা।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৬২, ৬৩

❑ আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ?
❑ যালিমদের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করিয়াছি পরীক্ষাস্বরূপ,

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আপ্যায়নের জন্য এটাই শ্রেয়, না যাক্কুম বৃক্ষ'?

'যাক্কুম' হচ্ছে দোজখাভ্যন্তরস্থিত দুর্গন্ধযুক্ত, বিস্বাদ ও কুৎসিৎ ধরনের গাছ। ওই গাছই হবে দোজখবাসীদের আহার্য, যা তাদেরকে জোর করে খাওয়ানো হবে। আর ভীষণভাবে অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তারা তা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হবে। যেমন এক প্রবাদবচনে বলা হয়েছে 'তাযাক্কামাত্ ত্বয়ামু' (সে আহার করলো বড়ই বিস্বাদ ও কষ্টের সঙ্গে)।

'নুযুল' হচ্ছে ওই বস্তু, যা আপ্যায়নের প্রথম পর্বেই অতিথিদের সামনে উপস্থিত করা হয়। এখানে 'আপ্যায়নের জন্য এটাই কি শ্রেয়' বলে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, সুরা-নারী-সুখদ কানন-খোশগল্পের আসর এসকল কিছু বেহেশতবাসীরা পাবে প্রথম পর্বেই। পরের পর্ব তো অনুমানের অতীত। সুতরাং হে মানুষ! বলো, এমতো সাদর আপ্যায়ন উত্তম, না উত্তম দোজখীদের প্রাথমিক আহার হিসেবে উপস্থিতকৃত দুর্গন্ধময়, কুৎসিৎ ও বিস্বাদপূর্ণ বৃক্ষ যাক্কুম? তাদের পরবর্তী দুর্ভোগতো অননুমাননীয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যাক্কুমের একটি ক্ষুদ্রাংশও যদি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তবে বিনষ্ট হয়ে যাবে পৃথিবীবাসীদের সমস্ত জীবিকা, আর যার আহার্য হবে যাক্কুম, তার অবস্থা হবে কীরূপ? তিরমিজি বলেছেন, বর্ণনাটি সঠিক। আবু ইমরান খাওলানি সূত্রে আবু নাঈম এবং 'জাওয়ায়েদুজ্ জুহুদ' গ্রন্থের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ বর্ণনা করেছেন, মানুষ যাক্কুমকে যতো আঁচড়াবে, যাক্কুমও ততো আঁচড়াবে মানুষকে।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'জালেমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ'। একথার অর্থ— আমি এই যাক্কুম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি সীমালংঘনকারীদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য। এখানে 'ফিত্না' অর্থ পরীক্ষা। অর্থাৎ পৃথিবীর পরীক্ষা এবং পরবর্তী পৃথিবীর মহা শাস্তি ও দুর্গতি। আর এখানে 'জলিমীন' (সীমালংঘনকারীরা) বলে বুঝানো হয়েছে অংশীবাদীদেরকে। তারা বলতো, আগুন তো গাছকে পুড়িয়ে ভস্ম করে। তাহলে দোজখের আগুনে যাক্কুম গাছের অস্তিত্ব থাকবে কীভাবে? ইবনে যাবআরী একবার এক কুরায়েশ গোত্রনায়ককে বললো, মোহাম্মদ আমাদেরকে যাক্কুমের কথা বলে ভয় দেখায়। অথচ আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় যাক্কুম অর্থ মাখন ও খেজুর। আবু জেহেল এ কথা শুনে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলো। দাসীকে ডেকে বললো, আমাদের
জন্য যাক্কুম নিয়ে এসো। একটু পরে দাসী নিয়ে এলো মাখন ও খেজুর। আবু জেহেল বললো, খাও। এই হচ্ছে সেই যাক্কুম, মোহাম্মদ যার কথা বলে তোমাদেরকে ভয় দেখায়।

কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আবু জেহেল একবার মক্কাবাসীদেরকে ডেকে বললো, তোমাদের সাথী নাকি একথা বলে যে, দোজখের

আগুনের ভিতরে এক গাছ থাকবে? অথচ আগুন তো গাছকে গ্রাস করে ফেলে। আল্লাহ্র শপথ! আমি তো জানি, মাখন ও খেজুরকে বলে যাক্কুম। তার এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত। বলা হয়—

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪

❑ এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হইতে,
❑ ইহার মোচা যেন শয়তানের মাথা
❑ উহারা ইহা হইতে ভক্ষণ করিবে এবং উদর পূর্ণ করিবে ইহা দ্বারা।
❑ তদুপরি উহাদের জন্য থাকিবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।
❑ আর উহাদের গন্তব্য হইবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে।
❑ উহারা উহাদের পিতৃপুরুষগণকে পাইয়াছিল বিপথগামী
❑ এবং তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হইয়াছিল।
❑ উহাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল,
❑ এবং আমি উহাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছিলাম।
❑ সুতরাং লক্ষ্য কর যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছিল!
❑ তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যাক্কুম বৃক্ষ বেরিয়ে আসে জাহান্নামের নিম্নদেশ থেকে। এই বৃক্ষের ফল দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত, শয়তানের মাথার মতো।

'আস্‌লিল জাহীম' অর্থ জাহান্নামের গর্ত। এরকম বলেছেন সুদ্দী। আর হাসানের মতে কথাটির অর্থ জাহান্নামের তলদেশ বা নিম্নদেশ। অর্থাৎ যাক্কুম

বৃক্ষের মূল প্রোথিত থাকবে জাহান্নামের তলদেশে এবং এর শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে থাকবে জাহান্নামের চতুর্দিকে। 'ত্বলউ'হা' অর্থ এর মোচা বা ফল। ফলকে 'ত্বল্‌উ' বলা হয় এজন্য যে, তা আত্মপ্রকাশ করে গাছ থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'শয়তানের মাথা' বলে বুঝানো হয়েছে শয়তান জ্বিনদের মাথাকে। যাক্কুম গাছ অতি কুৎসিত। তাই একে তুলনা করা হয়েছে শয়তানের মাথার সঙ্গে। তাছাড়া কুৎসিত কোনো কিছুকে সাধারণতঃ শয়তানই বলা হয়ে থাকে। আর শয়তানকে সাধারণ চোখে দেখা না গেলেও কুৎসিত কোনোকিছুকে মানুষ শয়তানই ধারণা করে থাকে। সে কারণেও এখানে এই উপমাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'শায়াত্বীন' কথাটির
অর্থ— এক ধরনের কদাকার বীভৎস সাপ, যার মাথায় থাকে লোম। সম্ভবতঃ ওই সাপের সঙ্গেই এখানে তুলনা করা হয়েছে যাক্কুম বৃক্ষকে। আবার কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন, মরুভূমিতে কুশ্রী ও উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত একধরনের গাছ হয়। ওই গাছকে বলে 'শয়তানের রাজা'। আর এখানে হয়তো ওই গাছকেই করা হয়েছে যাক্কুম গাছের উপমা।

এরপরের আয়াতে (৬৬) বলা হয়েছে— 'তারা তা থেকে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে তা দ্বারা'। একথার অর্থ— ক্ষুধার তাড়নায় তারা ওই যাক্কুম পেটপুরে খাবে। অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের উদর পরিপূর্ণ করা হবে যাক্কুম দ্বারা।

এরপরের আয়াতে(৬৭) বলা হয়েছে— 'তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ'। একথার অর্থ পেটভরে যাক্কুম খাবার পর তারা পিপাসার্ত হয়ে পড়বে। পানি খেতে চাইবে। তখন তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'ছুম্‌মা' শব্দটি 'অতঃপর' অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে 'অধিকন্তু' বা 'তদুপরি' অর্থে। এভাবে

বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে শাস্তির তীব্রতাকে। অর্থাৎ খাদ্য হিসেবে যাক্কুম তো বিস্বাদ বটেই, তদুপরি অতি বিস্বাদ হবে ফুটন্ত পানি, যা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে তাদের উদরে।

'লা শাওবা' অর্থ মিশ্রিত করা, মিলানো। অর্থাৎ ফুটন্ত পানি তাদের পেটে প্রবিষ্ট হবার পর তা মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে।

এরপরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'আর এদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে'। বাগবী লিখেছেন, প্রথমে গরম পানি পান করানোর জন্য তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানির প্রস্রবণের কাছে। সেখানে ফুটন্ত পানি
গিলিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে। এতে করে বোঝা যায় ফুটন্ত পানির প্রস্রবণ ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রয়েছে দোজখের পৃথক দু'টি স্থানে। এক আয়াতে একথার প্রমাণও রয়েছে। যেমন 'তারা ঘুরপাক খেতে থাকবে দোজখাগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিলো বিপথগামী(৬৯) এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিলো'(৭০)। একথার অর্থ— তাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলো ধর্মভ্রষ্ট। আর তারা চিন্তা-ভাবনা না করে হয়ে গিয়েছিলো তাদের ওই পথভ্রষ্ট পূর্বসুরীদের অনুগামী। জাহান্নামের শাস্তি তো তাদেরকে ভোগ করতে হবে সেকারণেই।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিলো (৭১) এবং আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম (৭২)। সুতরাং লক্ষ্য করো, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো, তাদের
পরিণাম কী হয়েছিলো! (৭৩) তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র (৭৪)। একথার অর্থ— তাদের পূর্বপুরুষদের পূর্বপুরুষেরাও ছিলো ধর্মভ্রষ্ট। তাদের কাছে সতর্ককারীরূপে আমি প্রেরণ করেছিলাম নবী ও রসুল। কিন্তু তারা তাদেরকে মান্য করেনি। হে আমার রসুল! শুনুন, তাদের শেষ পরিণাম কী মর্মান্তিক হয়েছিলো। তবে ওই সকল লোকের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক ছিলো ইমানদার, সত্যাশ্রয়ী। তাদের পরিণাম অবশ্যই অশুভ হয়নি। তাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম আমার রোষ ও শাস্তি থেকে।

এখানে 'আল আউয়ালীন' অর্থ সুদূর অতীতের উম্মতগণ। 'মুনজিরীন' অর্থ সতর্ককারী, নবী, রসুল, যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র রোষ ও শাস্তি থেকে সাবধান করে দেন। 'ফানজুর' অর্থ লক্ষ্য করো। শব্দটির সম্বোধ্য এখানে প্রত্যক্ষত রসুল স. এবং পরোক্ষত তাঁর পুরো সম্প্রদায়, যারা শুনেছিলো অতীতের অবাধ্যদের বিনাশপ্রাপ্তির কাহিনী এবং দেখেছিলো তাদের বিরাণ জনপদের ধ্বংসচিহ্ন।

এখানকার 'কাইফা কানা' (কী হয়েছিলো) কথাটির মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে বিস্ময়সূচক প্রশ্নবোধক বিনয়ের ভাব। এর উদ্দেশ্য অনুসন্ধিৎসার কথা বলা নয়, বরং সন্দেহাতীতরূপে একথা বলা যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তি ইহকাল ও পরকালে এরকমই হয়ে থাকে।

'তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র' অর্থ— যারা ওই সকল নবী-রসুলগণের সতর্কসংকেতকে মেনে নিয়ে বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়েছিলো, তারা পৃথিবীতে ছিলো নিরাপদ। পরবর্তী পৃথিবীতে তাদের নিরাপত্তা তো অধিকতর নিশ্চিত। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস থেকে তারা সতত পৃথক।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২

❑ নূহ আমাকে আহ্‌বান করিয়াছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী।

❑ তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে।
❑ তাহার বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশপরম্পরায়,
❑ আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।
❑ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বার্ষিত হউক!
❑ এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি,
❑ সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।
❑ অন্য সকলকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— **'নুহ আমাকে আহ্বান করেছিলো, আর আমি উত্তম সাড়া দানকারী'**। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার শুনুন আপনার পূর্ববর্তী নবী নুহের কথা। তাঁর সম্প্রদায় হয়ে গিয়েছিলো বিপথগামী। তাদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি প্রেরণ করেছিলাম নুহকে। কিন্তু তারা নুহকে মান্য করেনি। তবুও তিনি দীর্ঘদিন ধরে আন্তরিক দরদ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যাপৃত থেকেছিলেন পথপ্রদর্শন কর্মে। তারপর এক সময় যখন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি তাঁকে একথা জানালাম যে, যারা ইমান আনবার তারা ইতোমধ্যেই ইমান এনেছে, আর কেউই ইমান আনবে না, তখন তিনি ওই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসের জন্য আমার নিকটে প্রার্থনা জানালেন। আমি তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম। আমি তো তিনি ও তাঁর মতো একনিষ্ঠ পুণ্যবানগণের প্রার্থনা উত্তমরূপে মঞ্জুর করি।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণভাবে বলা হয়েছিলো পূর্ববর্তী উম্মতদের নিকটে সতর্ককারী বা নবী-রসুল প্রেরণের কথা। আর এই আয়াত থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ বিশেষ নবীগণের আলোচনা। আর নবী নুহের কথা এসেছে সর্বাগ্রে।

পরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— **'তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে'**। একথার অর্থ— তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে নিয়ে আমি তাঁর সম্প্রদায়ের অবাধ্যদেরকে সমূলে বিনাশ করলাম মহা প্লাবনের শাস্তি দিয়ে। কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী তাদেরকে
রাখলাম নিরাপদে। তাই ওই মহাসংকট তাদের স্পর্শ করতে পারলো না। এখানে **'মহাসংকট'** বলে আপন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রদত্ত তাঁর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে।

এরপরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— **'তাঁর বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশপরম্পরায়'**। একথার অর্থ— ওই সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন থেকে তাঁর বংশ ছাড়া আর কারো বংশ নিস্তার পায়নি। তাই প্লাবন পরবর্তী সকল মানুষ তাঁরই বংশভূত। আর তা এখনো প্রবহমান।

তিরমিজি প্রমুখ লিখেছেন, হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে রসুল স. বলেছেন, নবী নুহের ছিলো তিন পুত্র— হাম, শাম ও ইয়াফেস। প্লাবনপরবর্তী মানববংশ প্রবহমান রয়েছে তাঁদের মাধ্যমেই। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আরবীয়গণের ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ শাম। আবিসিনীয়দের পূর্বপুরুষ হাম এবং রোমীয়দের পূর্বপুরুষ ইয়াফেস। জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মহাপ্লাবনের পর নৌকা থেকে নিরাপদে অবতরণ করেছিলেন হজরত নুহ, তাঁর সন্তানগণ ও তাঁদের সহধর্মিণীগণ। আর সকলে মৃত্যুবরণ করেছিলো বানে ডুবে।

উল্লেখিত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়— ১. ওই মহাপ্লাবনে হজরত নুহ ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরগণ ছাড়া অন্য সকলেই ডুবে মরে গিয়েছিলো। ২. কেবল তাঁর সন্তানত্রয় ছাড়া অন্য সকলের বংশপ্রবাহ হয়ে গিয়েছিলো রুদ্ধ। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষ তাঁদেরই বংশপ্রবাহভূত।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, হজরত নুহের ওই তিন পুত্রের নাম শাম, হাম ও ইয়াফেস। আরব, পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা শামের বংশধর। আফ্রিকার অধিবাসীরা বংশধর হামের। আর ইয়াফেসের বংশধরেরা হচ্ছে তুর্কীস্তানী, খরজী, ইয়াজুজ মাজুজ ও ভারতসহ প্রাচ্যবাসীরা।

আমি বলি, হজরত নুহের নবুয়ত পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ছিলো না। এই বিশেষত্ব রয়েছে কেবল শেষ নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর জন্য। হজরত নুহ প্রেরিত হয়েছিলেন কেবল তাঁর স্বজাতির পথ প্রদর্শনার্থে। সুদীর্ঘ দিবস ধরে বহুভাবে অত্যাচারিত হয়েও তিনি তাদের মঙ্গল কামনা করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে অপপ্রার্থনা করেছিলেন এভাবে **'রব্বি লা তাজার আ'লাল আরদ্বি মিনাল কাফিরীনা দাইয়্যারা'** (হে আল্লাহ্! অবিশ্বাসীদের কোনো বসত আর এজগতে রেখো না)। এখানে **'আরদ্ব'** অর্থ— ওই ভূখণ্ড যেখানে বসবাস করতো তাঁর স্বজাতিরা। অর্থাৎ ইরাক। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে— প্লাবনপরবর্তী সময়ে ওই ভূখণ্ডে হজরত নুহের বংশ ব্যতিরেকে অন্য কারো বংশ বিদ্যমান ছিলো না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— **'আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি (৭৮)। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নুহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক'(৭৯)**। একথার অর্থ—

আমি নুহের বৃত্তান্তকে পরবর্তী যুগের মানুষের স্মৃতিতে অম্লান রেখেছি, যাতে বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নিরবচ্ছিন্নরূপে পৌঁছতে থাকে শান্তিবারতা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন 'সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নুহের প্রতি শান্তি বর্ষিত

হোক' এই উক্তিটি আল্লাহ্‌র। এমতাবস্থায় এখানকার 'তারাকনা' (স্মরণে রেখেছি) ক্রিয়াটির কর্মপদ উহ্য হবে এবং কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— আমি পরবর্তীদের মধ্যে নুহের প্রসঙ্গকে উচ্চকিত করেছি, তাদের কাছে তাঁকে করেছি খ্যাতিমান।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি (৮০), সে ছিলো আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম (৮১)। অন্য সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম (৮২)। একথার অর্থ— নুহকে আমি পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম প্রেরণ করে যেভাবে পুরস্কৃত করেছিলাম, সেভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি তাদেরকে, যারা সৎকর্মপরায়ণ, পুণ্যবান। নিঃসন্দেহে নুহ আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দাগণের অন্যতম। তাই তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে শাস্তিমুক্ত রেখেছিলাম এবং তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয় সকলকে দিয়েছিলাম সলিলসমাধি। উল্লেখ্য, এখানকার ৮০ ও ৮১ সংখ্যক আয়াতে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যও রয়েছে শুভসংবাদ। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ও পুণ্যবান, তাদেরকেও এখানে দেওয়া হয়েছে পুরস্কারের অঙ্গীকার।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭

❑ আর ইব্‌রাহীম তো তাহার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত।
❑ স্মরণ কর, সে তাহার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল বিশুদ্ধচিত্তে;
❑ যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তোমরা কিসের পূজা করিতেছ?
❑ 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলিকে চাও?
❑ 'জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আর ইব্রাহিম তো তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র এককত্বে অটুট বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, অথবা শরিয়তের বিধানাবলীতে, কিংবা অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রে নবী হজরত ইব্রাহিম ছিলেন হজরত নুহের যোগ্য উত্তরসুরী। উল্লেখ্য, হজরত ইব্রাহিম আবির্ভূত হয়েছিলেন
হজরত নূহের মহাতিরোধানের দুই হাজার ছয়শত চল্লিশ বৎসর পর। তাঁদের উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন নবী হুদ ও নবী সালেহ।

পরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিলো বিশুদ্ধচিত্তে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন,
নবী ইব্রাহিম সকলের এবং সকলকিছুর মোহ ত্যাগ করে প্রশান্ত হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে হয়েছিলেন আমার অভিমুখী। উল্লেখ্য, পুত্রউৎসর্গ করার ঘটনা হজরত ইব্রাহিমের সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌ অভিমুখী হওয়ার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলো, তোমরা কিসের পূজা করছো (৮৫)? তোমরা কী আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলিকে চাও' (৮৬) ? উল্লেখ্য, নবী ইব্রাহীম এখানকার প্রশ্ন দু'টো জবাবের প্রত্যাশায় করেননি। বরং এভাবে প্রশ্নাকারে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকদেরকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছিলেন একথা যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে অন্য কারো অথবা অন্য কোনোকিছুর উপাসনায় লিপ্ত হওয়া মহাপাপ। অথচ তোমরা এই মহাপাপকে এখনো আঁকড়ে ধরে আছো। একান্ত নির্বোধের মতো ক্রমাগত করে চলেছো অলীক দেব-দেবী মূর্তির পূজা।

এখানকার 'আলিহাতান্' (উপাস্য) শব্দটি 'তুরীদূন' (তোমরা কামনা করো) এর ক্রিয়ার সহকর্মপদ। আর 'দুনাল্লাহি' (আল্লাহ্‌র পরিবর্তে) বিশেষণ 'আলিহাতান' এর এবং 'আইফ্‌কান' শব্দটি 'তুরীদূন' এর নৈমিত্তিক কর্মপদ। এভাবে এখানে

সহকর্মপদের ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে পরবর্তী কর্মপদে। আর নৈমিত্তিক কর্মপদ সর্বাগ্রে বসিয়ে একথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাদের সম্পূর্ণ পূজা-পার্বণ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যা ও কল্পনা। এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্রও নেই।

এরপরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'জগতসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী'? একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম তাদেরকে আরো বলেছিলেন, সমগ্র বিশ্বের সৃজক, নিয়ন্ত্রক, পরিচালক ও প্রতিপালক সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা তাহলে কী? তোমরা কি তাঁর ইবাদত চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছো, না তাঁর ইবাদতে শরীক করে নিয়েছো অন্যকে? উভয়টিই তো মহা পাপ। এর জন্য শাস্তিভোগ যে অনিবার্য, সে ভয় কি তোমাদের নেই? তোমাদের এমতো অপবিশ্বাসের ভিত্তি তাহলে কী? তাঁর সম্পর্কে দৃঢ় প্রতীতি তো দূরের কথা সাধারণ ধারনাও তো তোমাদের নেই।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৮৮

❑ অতঃপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাইল

তাফসীরে মাযহারী/৮৯

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকালো'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিম তাঁর বক্তব্য শেষ করে দৃষ্টি উত্তোলন করলেন। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন নিশিথের আকাশ ভরা নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে।

এখানে 'ফীনুনুজুম' অর্থ তারকারাজির দিকে একবার তাকালেন। কিংবা নজর নিবদ্ধ করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত পাঁজি-পুথির দিকে। এমতো ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বলতে হয়, পূর্ববর্তী শরিয়তে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া দু'টোই বৈধ ছিলো। নতুবা হজরত ইব্রাহিম নক্ষত্রের গতিবিধির দিকে দৃষ্টি করতেন না। আমাদের শরিয়তে কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা নিষিদ্ধ।

রযীন বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শরিয়তের বিধানে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অপেক্ষা ভবিষ্যদ্বক্তার অপরাধ অধিকতর গুরু। ভবিষ্যদ্বক্তারা হচ্ছে যাদুকর। আর যাদুকর হচ্ছে কাফের। প্রকৃত কথা হচ্ছে এই তিন দলই কাফের। এদের সকলের উপর শরিয়তের একই শাস্তি প্রযোজ্য। নক্ষত্রের গতিবিধি দ্বারা সকল ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয়, এরকম মনে করা নিষিদ্ধ। কালচক্র সাধিত হয় নক্ষত্রের গতিবিধির উপর, এমনটি ধারনা করা নিষিদ্ধ। তবে কালচক্রের নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ্পাক। আর আল্লাহ্পাক কর্তৃক সৃষ্ট কালচক্রের শুভ-অশুভের সংকেত নক্ষত্রের গতিবিধি, এমনটি মনে করাতে কোন দোষ নেই। যেমন ঔষধ রোগ নিরাময়ের নিমিত্ত, বিষপান নিমিত্ত মৃত্যুর। এমতাবস্থায় এই বিশ্বাসটিই প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, আল্লাহ্তায়ালাই সকল কর্মের ও ঘটনার স্রষ্টা। মানুষের কর্মকাণ্ডও তেমনি। মানুষ ভালো বা মন্দ কর্মের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা সৃজন করেন আল্লাহ্। মানুষ নির্মাতা মাত্র। সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র। প্রকৃত অবস্থা এটাই। মানুষের অবস্থাই যদি এরকম হয়, তবে নক্ষত্রগুলোর অবস্থা তো সম্পূর্ণই আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের উপরে নির্ভরশীল। সুতরাং কেউ যেনো মনে না করে যে, নক্ষত্ররাজি ভালো-মন্দ কোনো কিছুর নিয়ামক। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য সাধারণতঃ আল্লাহ্র দিকে থাকে না। আল্লাহ্তায়ালাই যে নক্ষত্রসহ সকল কিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক সে কথা তারা ভুলেই যায়। রসুল স. জ্যোতির্বিজ্ঞানকে নিষিদ্ধ বলেছেন একারণেই।

হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ জুহনী বর্ণনা করেছেন, আমরা তখন অবস্থান করছিলাম হুদাইবিয়ায়। রাতে খুব বৃষ্টি হলো। ভোরে রসুল স. আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বসে বললেন, তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক কী বলেছেন? আমরা জবাব দিলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই তা উত্তমরূপে অবগত। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে মানে, কেউ কেউ মানে না। যারা বলে আল্লাহ্ই অনুগ্রহ করে আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, তারা আমাকে মানে ও বিশ্বাস করে। আর যারা বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে, তাদের বিশ্বাস আমার উপরে নেই। তারা তারকাপূজারী। বোখারী, মুসলিম।

তাফসীরে মাযহারী/৯০

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখনই আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটান, তখনই একদল অবিশ্বাসী হয়ে যায়। বৃষ্টিপাত ঘটান আল্লাহ্। অথচ তারা বলে, বৃষ্টি হয়েছে অমুক অমুক তারার কারণে। মুসলিম। ইমাম গাজ্জালী তাঁর 'আলমুনকিজ্ মিনাদ্ দ্বলাল' গ্রন্থে লিখেছেন, অতীত যুগের কোনো কোনো নবীকে আল্লাহ্তায়ালা চিকিৎসাবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই দুই বিদ্যার অধিকারী হয় অবিশ্বাসীরা। বিদ্যা দু'টো ধারণাসম্ভূত। তার প্রমাণ এই যে, তারকাগণনাকারী ভবিষ্যদ্বক্তারা ফেরাউনকে নবী মুসার জন্মের সংবাদ দিয়েছিলো।

বলেছিলো, তাঁর হাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে ফেরাউনের সাধের সাম্রাজ্য। তাদের একথা সত্য হয়েছিলো। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, তারা কিন্তু ওই ঘটনাকে প্রতিহতও করতে পারেনি।

স্বসূত্রে বোখারী বলেন, ইমাম জুহুরী বলেছেন, ইবনে নাতুর ছিলেন ইলিয়ার প্রশাসক এবং সিরিয়ার খৃষ্টানদের ধর্মগুরু। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার হিরাক্লিয়াস সিরিয়ায় এলেন। তখন একদিন সকালে দেখলাম, তিনি চিন্তান্বিত। তার অনুচরদের একজন জিজ্ঞেস করলো, মনে হচ্ছে, আপনি কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। হিরাক্লিয়াস ছিলো বিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ। সে বললো, গতরাতে তারকাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে আমি জানতে পারলাম, খত্‌নাকৃত সম্প্রদায়ের বাদশাহ জন্মগ্রহণ করেছেন। বলো দেখি, তারা কোন জাতি, যারা খত্‌না করায়? তার সঙ্গী-সাথিরা জবাব দিলো, ইহুদীরা। কিন্তু তাদের সম্পর্কে তো আপনার দুশ্চিন্তিত হবার কিছু দেখি না। নির্দেশ দিন, এই মুহূর্তে রাজ্যের সকল ইহুদীকে আমরা কতল করে ফেলি। এরকম আলাপচারিতা চলাকালে সেখানে উপস্থিত হলো সিরিয়ার প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত এক ব্যক্তি। সে এসে জানালো, আরবের এক লোক নিজেকে নবী দাবি করছে। লোকটি ছিলো আরব। হিরাক্লিয়াস আদেশ দিলো, সে খত্‌নাকৃত কিনা তা পরীক্ষা করা হোক। নির্দেশ প্রতিপালিত হলো। পরীক্ষাকারী বললো, সে খত্‌নাকৃত। হিরাক্লিয়াস লোকটিকে বললো, আরবরা কি সকলেই খত্‌না করায়? সে বললো, হ্যাঁ। হিরাক্লিয়াস তখন মন্তব্য করলো, ওই সম্প্রদায়ের বাদশাহ জন্মগ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তার এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকে আরো অধিক তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়ে হিরাক্লিয়াস তখন গমন করলো হেমসে। সেখানে গিয়ে ওই সঙ্গীর মাধ্যমে নিশ্চিত হলো, হ্যাঁ, তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি একজন নবী।

শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, জুহুরীর এই বৃত্তান্ত প্রলম্বিত নয়, সমন্বিত সূত্র সম্ভূত। আবু নাঈম তাঁর 'দালায়েল' পুস্তকে লিখেছেন, জুহুরী স্বয়ং বলেছেন, আমি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে দামেশকে ইবনে নাতুরের সাক্ষাত পেয়েছিলাম। আমি মনে করি, তিনি এরকম কথা প্রচার করেছিলেন তার ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে। এই ঘটনাটির দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জ্যোতির্বিদেরাও সংঘটিতব্য কোনো কোনো ঘটনা পূর্বাহ্নে আঁচ করতে পারে। কিন্তু তবুও এই

বিদ্যা নিষিদ্ধ। কেননা এতে এই ধারণার সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, নক্ষত্রগুলোই ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর নিয়ামক। অদৃষ্টলিপি পরিবর্তনের সাধ্য তো কারো নেই। সুতরাং এই বিদ্যার চর্চা করার অর্থ সময়েরও অপচয়। সম্ভবতঃ খৃস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সময় এই বিদ্যার ব্যাপক চর্চা হতো এবং তা তাদের শরিয়তে বৈধও ছিলো। না হলে তাদের ধর্মগুরুরা এ বিষয়ে এতো বেশী জড়িয়ে পড়তেন না।

কেউ কেউ বলেছেন, জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে কোনোকিছুই জানা যায় না। তাই তাঁরা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে বলেন, হজরত ইব্রাহিম তখন তারকারাজির দিকে তাকিয়েছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে তার বক্তব্যকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলবার জন্য। কেননা তারকারাজির প্রভাব তাদের ধারণায় ছিলো অপ্রতিরোধ্য। তাই ব্যাপকভাবে চর্চিত ওই বিদ্যার আনুকূল্যকে হজরত ইব্রাহিম একারণেই আপাতমান্য করেছিলেন যে, এতে করে তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করার উপায় আর তারা খুঁজে পাবে না। অবশেষে তিনি তাদেরকে এই উপসংহারেই স্থিত করবেন যে, দ্যাখো, তোমাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো কিন্তু অলীক।

প্রকৃত ঘটনা ছিলো এরকম— পরের দিন ছিলো তাদের বাৎসরিক উৎসবের দিন। তাদের নিয়ম ছিলো, উৎসবে যাবার আগে তারা তাদের দেব-দেবী মূর্তিগুলোর সামনে ফরাশ বিছিয়ে দিতো এবং সেগুলোর উপর রাখতো বিভিন্ন ধরনের আহার্যদ্রব্য। উৎসব থেকে ফিরে এসে তারা আবার ওই আহার্যদ্রব্যগুলোই ভক্ষণ করতো (এটাকে তারা মনে করতো অতি পুণ্যের কাজ)। তারা সেদিন এভাবে আহার্যদ্রব্যগুলো প্রতিমার সামনে সাজিয়ে দেওয়ার পর হজরত ইব্রাহিমকে বললো, চলো, মেলায় যাবে না? তিনি তখনই তাকালেন তারকারাজির দিকে।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬

❑ এবং বলিল, 'আমি অসুস্থ।'

❑ অতঃপর উহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল।

❑ পরে সে সন্তর্পণে উহাদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলিল, 'তোমরা খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না কেন?'

- ‘তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা কথা বল না?’
- অতঃপর সে উহাদের উপর সবলে আঘাত হানিল।
- তখন ঐ লোকগুলি তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল।
- সে বলিল, ‘তোমরা নিজেরা যাহাদিগকে খোদাই করিয়া নির্মাণ কর তোমরা কি তাহাদেরই পূজা কর?
- ‘প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা তৈরি কর তাহাও।’

প্রথমে বলা হয়েছে— ‘এবং বললো, আমি অসুস্থ’। একথার অর্থ— আমার অবস্থা তেমন সুখকর নয়। হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার ‘আমি অসুস্থ’ কথাটির অর্থ করেছেন— আমি প্লেগে আক্রান্ত। উল্লেখ্য, তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা প্লেগ রোগের কথা শুনলেই কেটে পড়তো। হাসান ‘ইন্নী সাক্বীম’ অর্থ ‘আমি অসুস্থ’ই করেছেন। আর মুকাতিল অর্থ করেছেন— আমি ব্যথিত।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নবী ইব্রাহিম সারাজীবনে অসঠিক কথা বলেছেন তিনবার। একবার বলেছিলেন ‘আমি অসুস্থ’। আর একবার বলেছিলেন ‘বাল ফাআ’লাহু কাবীরুহুম হাজা’ (বরং এটা করেছে তাদের পালের গোদা)। অন্য আর একবার তাঁর পত্নী সারাকে পরিচয় দিয়েছিলেন ‘ভগ্নি’ বলে। সুরা আম্বিয়ার তাফসীরেও এই হাদিসটি উদ্ধৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত হাদিসের ‘অসঠিক’ অর্থ দ্ব্যর্থবোধক বাক্য, অপ্রস্তুত প্রশংসা— যে বাক্যে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে একরকম এবং শ্রোতা তা গ্রহণ করে অন্য অর্থে। জুহাক বলেছেন, এখানকার ‘আমি অসুস্থ’ কথাটির অর্থ হবে— আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো।

এরকমও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, নবী ইব্রাহিমের ‘আমি অসুস্থ’ কথাটি প্রকৃতপক্ষে অসঠিক ছিলো না। কেননা জীবন অনিশ্চিত। মানুষের মৃত্যু হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। এরকম ভেবে যে কেউ ‘আমি অসুস্থ’ এরকম বলতেই পারে। আবার হঠাৎ করে কেউ মারা গেলে লোকে বলে, সে কি সুস্থ অবস্থায় মরলো? জনৈক আরববাসী বলেছেন, যার গর্দানের উপরে সারাক্ষণ মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলছে, সেকি কখনো নিজেকে সুস্থ ভাবতে পারে? আবার কথাটির অর্থ এরকমও হওয়া সম্ভব যে— তোমাদের অংশীবাদী জীবন যাপন দেখে আমি মানসিকভাবে পীড়িত। সুরা আমবিয়াতে বর্ণিত আয়াতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

পরের আয়াতে (৯০) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তারা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেলো’। একথার অর্থ— অসুস্থতার কথা শুনে তারা আর হজরত ইব্রাহিমকে মেলায় যাবার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করলো না। তাকে রেখেই সদলবলে চলে গেলো মেলায়।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘পরে সে সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলির নিকটে গেলো এবং বললো, তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছো না কেনো (৯১)। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বলো না’ (৯২)। একথার অর্থ— তারা মেলায় চলে যাবার পর হজরত ইব্রাহিম নিঃশব্দে গিয়ে উপস্থিত হলেন তাদের দেব-দেবীগুলোর সামনে। ঠাট্টাচ্ছলে বললেন, কী ব্যাপার! এতো খাবার তোমাদের সামনে। তবুও তো খাচ্ছো না। কথাও তো বলছো না। কী হলো তোমাদের?

এখানকার ‘রগা’ শব্দটির অর্থ চুপি চুপি ফেরা। শব্দটি ‘রওয়াগাতাছ্ ছায়লাবু’ (খেঁকশিয়ালের চলার নিঃশব্দতা) কথাটির ‘রগতা’ (নিঃশব্দতা) এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এর প্রকৃত আক্ষরিক অর্থ— চালাকির সঙ্গে ফিরে ফিরে যাওয়া। বাগবী লিখেছেন, ‘রগা’ বলে প্রত্যাবর্তনকারীর গোপন প্রত্যাবর্তনকে।

এরপরের আয়াতে (৯৩) বলা হয়েছে— ‘অতঃপর সে তাদের উপর সবলে আঘাত হানলো’। ‘রগা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এখানেও। এর পরক্ষণেই উল্লেখ এসেছে ‘আ’লা’ শব্দটির। এভাবে এখানে একথাটিই সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, হজরত ইব্রাহিম মূর্তিগুলোকে কর্তৃতায়ত্ত করলেন। এরকমও হতে পারে যে, হজরত ইব্রাহিমের ওই সন্তর্পিত পদচারণা ছিলো মূর্তিগুলোর জন্য ক্ষতিকর। সেকারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ‘আ’লা’।

‘দ্বরবান’ অর্থ আঘাত হানলো। ‘বিলইয়ামিন’ অর্থ সবলে, ডান হাতের প্রচণ্ড আঘাতে। অর্থাৎ হজরত ইব্রাহিম তাঁর ডান হাত দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন মূর্তিগুলোকে। আবার ‘ইয়ামিন’ শব্দটি এখানে শপথ প্রকাশকরূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তিনি মূর্তিগুলোকে ভাঙবেন বলে শপথ করেছিলেন। সেই শপথ পূরণার্থে তাদের উপরে হানলেন সবল কুঠারাঘাত। তাঁর এমতো শপথ উদ্ধৃত হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে— ‘যখন তোমরা পশ্চাদ্গমন করবে, আল্লাহ্র শপথ! তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করবো’।

এরপরের আয়াতে (৯৪) বলা হয়েছে— ‘তখন ওই লোকগুলি তার দিকে ছুটে এলো’। একথার অর্থ— লোকেরা মেলা থেকে ফিরে এসে তাদের দেব-দেবীর করুণ অবস্থা দেখে মর্মাহত হলো। আক্ষেপের স্বরে একে অপরকে শুনিয়ে বলতে লাগলো, যে এরকম করেছে, সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী। এভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ তাদের মনে হলো হজরত ইব্রাহিমের কথা। মনে হলো, ওই যুবককেই তো আমরা আমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করতে শুনেছি। একথা মনে হতেই তারা দৌড়ে ছুটে এলো হজরত ইব্রাহিমের কাছে। রোষতপ্ত কণ্ঠে মূর্তিভঙ্গের দায়ে দায়ী করলো হজরত ইব্রাহিমকে। বললো, নিশ্চয়, এ অপকর্ম তোমার।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ করো তোমরা কি তাদেরকেই পূজা করো (৯৫)? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী করো তা-ও' (৯৬)।

এখানকার প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। পরের আয়াতের বক্তব্য সেই অস্বীকৃতিকে করেছে অধিকতর গুরুত্ববহ। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— স্বসৃষ্ট কোনোকিছু কি পূজা পাবার যোগ্য? কখনোই নয়। পূজা পাবার যোগ্য কেবল সেই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং তাদের কর্মকাণ্ডসমূহ।

এখানকার 'ওয়ামা তা'মালূন' (তোমরা যা তৈরী করো তা-ও) এর 'মা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের এবং তোমাদের কাজকর্মেরও স্রষ্টা। তাহলে তোমরা সেই একক মহাসৃজয়িতাকে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করো কেনো, যারা তোমাদেরই মুখাপেক্ষী।

আশায়েরা সম্প্রদায়ের বিজ্ঞবিদ্বানগণ বলেন— মানুষের সকল কাজ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেন। এই আয়াত তার প্রমাণ। আর পথভ্রষ্ট মুতাজিলারা বলে, বান্দা নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। তাদের কাছে এখানকার 'মা তা'মালূন' এর 'মা' যোজক অব্যয়। সর্বনামটি উহ্য। নিঃসন্দেহে তাদের এরকম ধারণা অযথার্থ। কেননা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী করো তা-ও। সুতরাং বুঝতে হবে, মানুষ কেবল আকার আকৃতির নির্মাতা, অথবা আবিষ্কারক। কিন্তু স্রষ্টা কদাচ নয়। সৃজন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র। আবার মানুষ যে বুদ্ধি ও শক্তি সামর্থ দিয়ে মূর্তি বানায় এবং যে সকল উপাদান কর্মে ব্যবহার করে সে সকল কিছুর স্রষ্টাও তো আল্লাহ্। তাই একথাও স্বীকার করতে হবে যে, সৎ ও অসৎ কর্মের নির্মাতা হিসেবেই মানুষকে চিহ্নিত করা হবে পুণ্যবান অথবা পাপীরূপে। তাদের কর্মাবলীর স্রষ্টা হিসেবে নয়।

এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'মা' ক্রিয়ামূল হলেও শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে কর্মপদীরূপে। যদি তাই হয় তবে এখানকার 'তা'মালূন' হয়ে যাবে 'তানহিতুন' (তোমাদের সহস্ত নির্মিত) এর মতো। অর্থাৎ ওই মূর্তিনির্মাতারা ছিলো কাফের এবং স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে তারা অপ্রকৃতিস্থিতপ্রায়। তা না হলে কি আর তারা স্বনির্মিত কোনো কিছুর উপাসক হয়?

আশায়েরা ইমামগণের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা সঠিক। আর মুতাজিলা সম্প্রদায়ের উভয় ব্যাখ্যাই ভুল। কেননা তাদের ধারণা অস্বচ্ছ ও অন্তঃসারশূন্য। কাজের নির্মাণনৈপুণ্যও তো আল্লাহ্র দান। সুতরাং মুতাজিলাদের ব্যাখ্যানুসারে আকৃতির সৃষ্টিও মানুষের স্বসৃষ্ট কর্ম বলে প্রমাণিত হয় না, বরং সেটা তাদের অভ্যাস, অথবা শ্রমপরিণাম। এতে করে বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্য সকল কিছুর মতো আকার আকৃতির স্রষ্টাও আল্লাহ্ স্বয়ং।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ৯৭, ৯৮, ৯৯

❑ উহারা বলিল, 'ইহার জন্য এক ইমারত নির্মাণ কর, অতঃপর ইহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।'
❑ উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু আমি উহাদিগকে অতিশয় হেয় করিয়া দিলাম।
❑ সে বলিল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিবেন;

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা বললো, এর জন্য এক ইমারত নির্মাণ করো, অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করো'। একথার অর্থ— হজরত ইব্রাহিমের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে পারলো না। তাই রেগে গেলো খুব। তাদের নেতৃস্থানীয়রা পরামর্শ দিলো, তোমরা বরং এই বিদ্রোহী যুবককে উপযুক্ত শাস্তি দাও। প্রথমে চারিদিকে পাকা দেয়াল দিয়ে প্রস্তুত করো একটি দুর্ভেদ্য আবেষ্টনী। তারপর তার ভিতর কাঠ জমা করে প্রজ্জ্বলিত করো বিশাল অগ্নিকুণ্ড। আর ওই অগ্নিকুণ্ডেই নিক্ষেপ করো তাকে।

মুকাতিল বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন নির্মাণ করলো প্রস্তরবেষ্টিত একটি মজবুত আবেষ্টনী। প্রাচীরের উচ্চতা ও ঘনত্ব ছিলো যথাক্রমে তিরিশ হাত ও দশ হাত। ওই বেষ্টনীর মধ্যে তারা জমা করলো অনেক কাঠ। তারপর তাতে ধরিয়ে দিলো আগুন।

পরের আয়াতে (৯৮) বলা হয়েছে— 'তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিলো; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম'।

এখানে 'কাইদা' অর্থ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ। অর্থাৎ সর্বসমক্ষে হজরত ইব্রাহিমের অকাট্য যুক্তিসমূহ যেনো প্রকাশ না হয়ে পড়ে, তাঁর সত্য আহ্বান যেনো জাগাতে না পারে বেভুল জনতাকে, তাই তার সম্প্রদায় তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলো। হাত পা বেঁধে তাকে নিক্ষেপ করলো ওই জ্বলন্ত হুতাশনে।

‘ফাজাআ’লনা হুমুল আস্ফালীন’ অর্থ কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম। অর্থাৎ নস্যাৎ করে দিলাম তাদের অশুভ পরিকল্পনাকে। আগুনকে হুকুম দিলাম— শীতল ও শান্তিদায়ক হও। উল্লেখ্য, ওই লেলিহান অগ্নিকুণ্ড হজরত ইব্রাহিমের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। পুড়ে গিয়েছিলো কেবল তাঁর হাত-পায়ের বাঁধন। আর ঘটনাটি ঘটেছিলো নমরুদের রাজত্বকালে ইরাক রাজ্যের ব্যবিলন অঞ্চলে।

তাফসীরে মাযহারী/৯৬

এর পরের আয়াতে (৯৯) বলা হয়েছে— ‘সে বললো, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন’। একথার অর্থ— অগ্নিকুণ্ডে নিরাপদে বসে থাকতে দেখেও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর ধর্মমতকে গ্রহণ করলো না। তখন ব্যথিত হলেন তিনি। আপনমনে বললেন, আমি এই অবিশ্বাসীদের সংশ্রব ত্যাগ করে এমন কোনো জায়গায় চলে যাবো, যেখানে আমার ধর্মকর্ম হবে সম্পূর্ণরূপে একাগ্রতাবিমণ্ডিত ও নির্বিঘ্ন। আর আল্লাহ্ই আমাকে সন্ধান দান করবেন ওই নিরাপদ স্থানের। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমার প্রভুপালক নিশ্চয় আমাকে ওই ভূখণ্ডের প্রতি পরিচালিত করবেন, যে ভূখণ্ডে যাবার জন্য আমি আদিষ্ট। অর্থাৎ সিরিয়ায়।

ঘটনার বিবরণ এরকম— হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তমা পত্নী হজরত সারাকে নিয়ে ব্যবিলন থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথ চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলেন মিসর রাজ্যের সীমানায়। তখনকার মিসরের সম্রাটের নাম ছিলো সাদিফ বিন সাদিফ। ইবনে মুলকিন সংকলিত বোখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলা হয়েছে, তৎকালীন মিসররাজ ছিলো সিনান বিন উলুয়ান। সে ছিলো জোহাকের সহোদর ভ্রাতা। কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিলো ওমর বিন ইমরাউল কায়েস। সেই রাজাই হজরত ইব্রাহিমের কাছ থেকে হজরত সারাকে ছিনিয়ে নিলো। ঘোড়ায় উঠিয়ে নিয়ে গেলো তার রাজমহলে। আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে প্রশান্ত রাখবার ব্যবস্থা করলেন। তুলে দিলেন তাঁর দৃষ্টির সম্মুখের পর্দা। ফলে মিসররাজ ও হজরত সারার গতিবিধি তাঁর দৃষ্টিতে ভেসে রইলো সারাক্ষণ। হজরত সারা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ অনিন্দ্যরূপসী। মিসররাজ তাই তার অপবাসনা চরিতার্থ করতে মরিয়া হয়ে উঠলো। কিন্তু হজরত সারার দিকে একটু অগ্রসর হতেই শুরু হলো ভূমিকম্প। সমস্ত প্রাসাদ দুলতে লাগলো ভীষণভাবে। ভয়ে সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলো। প্রবেশ করলো অন্য এক প্রাসাদে। কিন্তু সে প্রাসাদও হলো ভূমিকম্প কবলিত। এভাবে কয়েকটি প্রাসাদ ঘুরে এসে সে হজরত সারার কাছে করজোড়ে পরিত্রাণ প্রার্থনা করলো। হজরত সারা বললেন, ইব্রাহিম হচ্ছেন আল্লাহ্র নবী। তাঁর অসন্তোষকবলিত হয়েছো বলেই তুমি এখন ভূমিকম্প-কবলিত। রাজা এবার বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারলো। সসম্মানে হজরত সারাকে প্রত্যর্পণ করলো হজরত ইব্রাহিমের নিকট। অন্য এক বিবরণে ঘটনাটি এসেছে এভাবে— ফেরাউন হজরত সারাকে ধরবার জন্য হাত বাড়ালো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেলো তার হাত। বিপদ দেখে সে শরণ প্রার্থনা করলো হজরত সারার। বললো, আর সে এরকম করবে না। তিনি দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে গেলো তার অবশ হাত। কিন্তু আবার সে বাড়িয়ে দিলো তার কামনাতাড়িত হাত। এবারও তার হাত হয়ে গেলো অবশ। পুনরায় ক্ষমাপ্রার্থী হলো সে। তিনবার এরকম করবার পর সে বাধ্য হলো সংযত হতে।

তাফসীরে মাযহারী/৯৭

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ তাঁর ‘মসনদ’ গ্রন্থে এবং বোখারী মুসলিম তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একদিন নবী ইব্রাহিম তাঁর সহধর্মিণী সারাকে নিয়ে অতিক্রম করছিলেন এক অত্যাচারী রাজার রাজ্যসীমানা। রাজা সংবাদ পেলো, এক বিদেশী পথিক এক অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীকে নিয়ে তার রাজ্য অতিক্রম করে যাচ্ছে। সে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলো, ওই পথিককে ও তার সঙ্গিনীকে এক্ষুণি ধরে আনা হোক। হুকুম তামিল করা হলো। রাজা হজরত ইব্রাহিমকে একান্তে ডেকে বললো, পথিক! তোমার সঙ্গের রমণীটি কে? নবী ইব্রাহিম বললেন, আমার বোন। ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন, দ্যাখো সারা! এতদঞ্চলে বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনী বলতে আমাদের দু’জন ব্যতীত আর কেউ নেই।। সেকারণেই আমি ওই অত্যাচারী রাজার কাছে বলেছি, তুমি আমার বোন। তুমি জিজ্ঞাসিত হলে এরকমই বোলো। নয়তো আমি প্রমাণিত হবো অসত্যভাষী বলে। রাজা এবার তার কাছে ডেকে নিলো হজরত সারাকে। অসৎ উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালো তাঁর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত হয়ে গেলো শক্তিরহিত। নিরুপায় রাজা ক্ষমাপ্রার্থী হলো। প্রতিজ্ঞা করলো, আর কখনো সে এরকম করবে না। এখন সে শুধু চায়, তার অবশ হাত দু’টো ভালো হয়ে যাক। সারা দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে গেলো তার হাত। কিন্তু পরক্ষণেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো সে। কিন্তু এবার তার অবস্থা হলো প্রথম বারের চেয়ে অধিক শোচনীয়। বিপদ বুঝে এবারও ক্ষমাপ্রার্থী হলো সে। প্রতিজ্ঞাও করলো আগের মতো। সারার দোয়ায় এবারও বিপদমুক্ত হতে পারলো সে। কিন্তু এবার আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো না। বরং তাঁর সেবিকা হিসেবে দান করলো হাজেরা নাম্নী এক রমণীকে। দ্বাররক্ষককে ডেকে নির্দেশ দিলো, শিগগির এদেরকে যথাস্থানে পৌঁছে দে। তোরা যাকে ধরে এনেছিলি, সে তো মানুষ নয়, শয়তান। সারা হাজেরাকে নিয়ে হাজির হলেন নবী ইব্রাহিম সকাশে। দেখলেন, তিনি নামাজে মগ্ন। নামাজরত নবী ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, কী সংবাদ? সারা মুখে জবাব দিলেন, ভালো। আল্লাহ্তায়ালাই দয়াপরবশ হয়ে রাজাকে প্রতিহত করেছেন। বিদায়কালে সে উপঢৌকনরূপে দিয়েছে এই সেবিকাটিকে।

‘মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া’ গ্রন্থে রয়েছে, সাদিফের হাত যখন অবশ হলো, তখন সে শরণ প্রার্থনা করলো হজরত ইব্রাহিম সকাশে। হজরত ইব্রাহিম দোয়া করলেন। সে সুস্থ হয়ে গেলো। উপঢৌকনরূপে সম্প্রদান করলো বিবি হাজেরাকে। তিনিই পরবর্তীতে হয়েছিলেন নবী ইব্রাহিমের সহধর্মিণী। ছিলেন আমানত রক্ষাকারিণী এবং রহস্যময় জ্ঞানের অধিকারিণী। উল্লেখ্য, হজরত হাজেরাকে সম্প্রদান করবার সময় সাদিফ হজরত ইব্রাহিম অথবা হজরত সারাকে বলেছিলো, ‘হাজা আজরি’ (এ হচ্ছে আমার প্রতিদান)। সেকারণেই তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিলো হাজেরা। হজরত ইব্রাহিম তাঁকে হজরত সারার অধীন করে দিয়েছিলেন। কারণ সারার প্রসন্নতাই ছিলো তাঁর অধিক কাম্য। তখন পর্যন্ত

তাফসীরে মাযহারী/৯৮

হজরত সারা ছিলেন নিঃসন্তান। তাই একদিন তিনি তাঁর প্রিয়তম পতিকে বললেন,

হাজেরাকে আমি আপনার হাতেই দিলাম। হয়তো আপনি সন্তানের পিতা হতে পারেন তার মাধ্যমেই।
সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ১০০, ১০১

❑ 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।'
❑ অতঃপর আমি তাহাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করো'। একথার অর্থ— নতুন ভূখণ্ডে গমন করে হজরত ইব্রাহিম হজরত সারা ও হাজেরাকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতলেন। কিছুদিন পরেই অনুভব করলেন, সন্তানহীন জীবন শুষ্কমরুভূমির মতো। তাই তিনি সন্তান প্রার্থনা করলেন এভাবে— হে আমার প্রভুপালক! আমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করো , যে হবে পুণ্যবানদের মধ্যে একজন।

মুকাতিল বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম সন্তানপ্রার্থী হয়েছিলেন সিরিয়ায় স্থিত হবার পর।

পরের আয়াতে (১০১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম'।

এখানে 'হালীম' অর্থ স্থিরবুদ্ধি, সহিষ্ণু। আর এখানে 'স্থিরবুদ্ধি পুত্র' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত ইসমাইলকে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এই অভিমতটি সঠিক। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, শা'বী, হাসান, মুজাহিদ, রবী ইবনে আনাস, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী এবং কালাবী প্রমুখের নিকটেও এই অভিমতটি গ্রহণযোগ্য। আতা ও ইউসুফ ইবনে মালিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত
ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাঁর পরিবর্তে অদৃশ্য জগত থেকে প্রেরিত দুম্বা কোরবানী করা হয়েছিলো তিনি ইসমাইল ব্যতীত অন্য কেউ নন। ওয়াকিদী ও ইবনে আসাকেরের উদ্ধৃতিতে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে আমের ইবনে সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত সারা তখন পর্যন্ত ছিলেন নিঃসন্তানা, তিনি মিসর থেকে আনীত কিবতী ক্রীতদাসী হাজেরাকে সম্প্রদান করেন হজরত ইব্রাহিমের নিকট। আর প্রথমে সন্তানবতী হন হজরত হাজেরাই। হজরত সারা তাই ঈর্ষান্বিতা হন। সুরা ইব্রাহিমের তাফসীরে ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত ইব্রাহিম তখন হজরত হাজেরা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাইলকে রেখে আসেন মক্কার জনমানবহীন এক প্রান্তরে। বোখারী কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটিও উল্লেখ করা হয়েছে সুরা ইব্রাহিমের তাফসীর ব্যপদেশে।

একথা সুনিশ্চিত যে, এখানে 'স্থিরবুদ্ধি পুত্র' বলে বুঝানো হয়েছে— হজরত ইসমাইলকে। আর তাঁকেই কোরবানী করার নির্দেশ পেয়েছিলেন হজরত ইব্রাহিম। অর্থাৎ তিনিই ছিলেন 'জবীহ'(উৎসর্গকৃত), কিন্তু ইহুদী খৃষ্টানেরা বলে, 'জবীহ' ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের অপর পুত্র সারানন্দন হজরত ইসহাক। তাদের উক্তি যে অসত্য, তা বলাই বাহুল্য।

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজীর বরাত দিয়ে বাগবী লিখেছেন, খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ একবার এক পুণ্যবান নবমুসলমানকে (যিনি পূর্বে ছিলেন ইহুদী) জিজ্ঞেস করলেন, বলুন দেখি, হজরত ইব্রাহিম তাঁর কোন পুত্রকে জবেহ করবার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন? তিনি বললেন, ইসমাইলকে। তিনি আরো বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! ইহুদীরা একথা জানে। কিন্তু হিংসাবশতঃ স্বীকার করতে চায় না। বলে,'জাবীহুল্লাহ'র অনন্যসাধারণ সম্মান পেয়েছিলেন হজরত ইসহাক। তারা নিশ্চয় অসত্যভাষী। হজরত ইসমাইলই ছিলেন 'জাবীহুল্লহ্'। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, তাঁর পরিবর্তে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত যে দুম্বাটি জবেহ করা হয়েছিলো, সে দুম্বার শিঙ বহুকাল পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো কাবাগৃহে। অনেক পরে খলিফা হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়েরকে উৎখাত করবার জন্য দুরাচার হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন কাবাশরীফের দিকে উপর্যুপরি কামানের গোলা নিক্ষেপ করে, তখন কাবাগৃহে আগুন ধরে যায় এবং ওই শিঙ দু'টোও পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। বনি সালেমের জনৈক পুণ্যবতী রমণীর বরাতে সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকী তাঁর সংকলিত গ্রন্থে হজরত তালহা ইবনে ওসমান থেকে বর্ণনা করেছেন, দুম্বার শিঙ দু'টো কাবাগৃহে টাঙানো ছিলো।

বাগবী লিখেছেন, শা'বী বলেছেন, আমি শিঙ দু'টোকে কাবায় বাঁধা অবস্থায় দেখেছি। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যাঁর অধিকারে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্বে দুম্বার শিঙসহমাথা ঝুলানো ছিলো

এবং কাবার পানি নিষ্কাশনের নালা ছিলো শুষ্ক। আসমায়ী বলেছেন, আমি একবার আবু আমর ইবনে আলাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলুন তো, 'জাবিহুল্লাহ্' ছিলেন কে— ইসমাইল, না ইসহাক? তিনি বললেন, তোমার কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে? ইসহাক আবার মক্কায় ছিলেন কবে? পিতার সঙ্গে কাবা নির্মাণে তো অংশগ্রহণ করেছিলেন ইসমাইলই।

বাগবী লিখেছেন, উভয় উদ্ধৃতিই বর্ণিত হয়েছে রসুল স. থেকে। আমি বলি, তাঁর এমতো মন্তব্যে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দু'টোর একটাও রসুল স. এর বাণী নয়। কেননা, ওদু'টোর একটিকে গ্রাহ্য করলে অপরটি হয়ে যাবে অবিশ্বাস্য। আবার দু'টোকে একসঙ্গে গ্রহণ করলে বুঝতে হবে দু'টোরই সূত্রপরম্পরা অসঠিক ও অপ্রামাণ্য।

বাগবী লিখেছেন, সাহাবীগণের মধ্যে হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত ইবনে আব্বাস এবং তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীনের মধ্যে কা'ব আহবার, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদা, মাসরুক, ইকরামা, আতা,

মুকাতিল, জুহুরী ও সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে, জাবীহুল্লাহ্ ছিলেন হজরত ইসহাক। হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে এরকম বর্ণিত হয়েছে ইকরামা ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের কর্তৃক। সাঈদ ইবনে যোবায়েরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম যখন সিরিয়ায় বসবাসরত, তখন তাঁকে স্বপ্নে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো হজরত ইসহাককে জবেহ করবার জন্য। তিনি তখন তাঁর প্রিয় পুত্র ইসহাককে সঙ্গে নিয়ে গমন করেন মক্কায়। এক মাস সময়ের দূরত্ব অতিক্রম করেন সকাল থেকে দ্বিপ্রহরের মধ্যে। জবেহ করার স্থান নির্ধারিত হয়েছিলো মীনায়। সেখানেই উপস্থিত হন পিতা-পুত্র দু'জনে। এরপর আল্লাহ্পাক যখন হজরত ইসহাকের পরিবর্তে দুম্বা জবেহ করার নির্দেশ দেন, তখন প্রেরিত দুম্বাটিকেই জবেহ করেন তিনি। তারপর দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করে ফিরে যান সিরিয়ায়। ওই সময় আল্লাহ্পাক তাঁর জন্য পথ ও পথিমধ্যের পাহাড়গুলোকে করে দিয়েছিলেন অন্তর্হিত।

অপরদিকে হজরত ইসমাইলের 'জাবীহুলাহ্' হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় এভাবে—

১. একথা সুপ্রমাণিত যে, সিরিয়ায় হিজরতের পর হজরত ইব্রাহিম সন্তানরূপে প্রথম লাভ করেছিলেন হজরত ইসমাইলকে।

২. আল্লাহ্ বলেছেন 'আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি সন্তানের সুসংবাদ দিলাম' (আয়াত ১০১)। আবার পরবর্তী আয়াত শুরু হয়েছে 'ফা' সহযোগে। সুতরাং একথা বলতে আর কোনো বাধা নেই যে, ঘটনাদু'টো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এর মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকলেও। আর হজরত ইসহাকের
জন্ম যেহেতু হয়েছিলো তাঁর হিজরতের অনেক পরে, তাই তিনি জাবীহুল্লাহ্ নন। যাঁর জন্মই হয়নি তার উপর নিশ্চয় জবেহ করার আদেশ প্রযোজ্য হতে পারে না।

৩. এবার আসা যাক হজরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ প্রসঙ্গে। এখানকার 'গুলামুন হালীম' (স্থিরবুদ্ধি পুত্র) কথাটিকে যদি হজরত ইসহাক সম্পর্কে বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়, তবে বলতে হয়, পরবর্তীতে যাকে জবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি হজরত ইসহাক নন, অন্য কেউ। কেননা যোজ্য ও যোজিতের মধ্যে পার্থক্য অবশম্ভাবী।

একটি সংশয় ঃ হজরত ইসহাকের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে দু'বার— একবার জন্মের এবং আর একবার নবুয়ত প্রাপ্তির। 'স্থিরবুদ্ধি পুত্র' কথাটি তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী। তাহলে তাঁর জন্মের সুসংবাদবাহী কথাটি কোথায়?

সংশয়ভঞ্জন ঃ এমতো সন্দেহ ভিত্তিহীন এবং দৃশ্যতঃ কোরআনের আয়াতের বক্তব্যের পরিপন্থী। কেননা এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ফাবাশ্শারনাহু বিইসহাক্বি নাবিয়্যাম্ মিনাস্ সলিহীন' (আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছি ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ এবং বলে দিয়েছি যে, তার নবুয়ত ও নবীরূপে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত দেওয়া

হয়েছে)। এমন কথা এখানে বলা হয়নি যে, আমি ইসহাকের নবুয়তের সুসংবাদ দিলাম। অর্থাৎ এখানকার সুসংবাদটি তাঁর জন্ম ও নবুয়তপ্রাপ্তি উভয়ের। কেবল নবুয়তপ্রাপ্তির নয়।

৪. হজরত সারাকে হজরত ইসহাক এবং হজরত ইসহাকের পুত্র হজরত ইয়াকুবের সুসংবাদ দেওয়া হয় এক সঙ্গে এভাবে 'আমি ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ প্রদান করলাম, আরো সুসংবাদ প্রদান করলাম তার পুত্র ইয়াকুবের'। তখন নিশ্চয় হজরত ইসহাক কিশোর। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদানুসারে হজরত ইয়াকুবের জন্মই হয়নি। এমতাবস্থায় হজরত ইসহাক জাবীহুল্লাহ্ হতে পারেন কীভাবে?

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ১০২, ১০৩

❑ অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সংগে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল তখন ইব্রাহীম বলিল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ্ করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলিল, 'হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন।'

❑ যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং ইব্রাহীম তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল,

প্রথমে বলা হয়েছে— 'অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করবার মতো বয়সে উপনীত হলো' একথার অর্থ— আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদানুসারে যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হলেন হজরত ইসমাইল। বড় হতে লাগলেন ধীরে ধীরে। এভাবে এক সময় হয়ে গেলেন এক কর্মঠ কিশোর। নানা বিষয়ে হয়ে উঠলেন পিতার কর্মসহযোগী।

'সাআ' অর্থ কাজ করার চেষ্টা । হজরত ইব্রাহিমের সঙ্গে পাহাড় পর্যন্ত দৌড়ে বেড়াবার উপযুক্ত হওয়া। মুজাহিদ বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, শব্দটির অর্থ যৌবনবান হওয়া এবং তাঁর পিতার কাজের মতো কাজের অন্বেষণ করা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ তেরো বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর উদ্দেশ্য সাত বৎসরে পৌঁছানো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তখন ইব্রাহিম বললো, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কী বলো'? একথার অর্থ—

হজরত ইব্রাহিম স্বপ্নে প্রাপ্ত সরাসরি নির্দেশে অথবা দর্শিত স্বপ্নের মর্মানুসারে ইসমাইলকে বললেন, প্রিয়তম পুত্র আমার! আমি স্বপ্নে দেখলাম, তোমাকে আমি জবেহ করছি। এখন বলো, এ বিষয়ে তোমার অভিমত কী?

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম বোরাকে সওয়ার হয়ে সিরিয়া থেকে মক্কাভিমুখে যাত্রা করতেন ভোর বেলায়। আর দ্বিপ্রহরে হজরত হাজেরার গৃহে পৌঁছে পানাহারের পর উপভোগ করতেন দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম। ফিরতি পথে রওয়ানা করতেন দুপুরের পর এবং সিরিয়ায় ফিরতেন রাতে। ইসমাইল ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকলেন। হজরত ইব্রাহিম আশা পোষণ করতেন, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে যেনো ইসমাইল হন আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণসমর্পিত। একনিষ্ঠ হন কেবল তাঁরই ইবাদতে। এক সময় ইসমাইল হয়ে উঠলেন প্রায় যুবক। তখন এক জিলহজের ৮ তারিখে তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন, ইসমাইলকে জবাই করো। ভোরে নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি ভাবতে লাগলেন, স্বপ্নের মর্মার্থ কী? আর এ স্বপ্ন কি আল্লাহ্র পক্ষের প্রত্যাদেশ, না শয়তানের পক্ষের প্রক্ষেপণ? এই চিন্তার কারণেই জিলহজের ৮ তারিখকে বলা হয় 'ইয়াওমুন তারভিয়া' (চিন্তার দিন)। পরের রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন। সকালে উঠে নিশ্চিত হলেন, এ স্বপ্ন প্রত্যাদেশ, যা অবশ্য পালনীয়। একারণেই ৯ই জিলহজকে বলে 'ইয়াওমুল আরাফা' (পরিচিতির দিন) বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমানে' হজরত ইবনে আব্বাস থেকে কালাবী সূত্রে আবু সালেহের মাধ্যমে এরকমই বর্ণনা করেছেন।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখের বর্ণনায় এসেছে, স্বপ্নাদিষ্ট হবার পর হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে বললেন, তুমি রশি ও ছুরি নিয়ে অগ্রসর হও। আমি ওই গিরিপথে যাচ্ছি কাঠ সংগ্রহের জন্য। এভাবে কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে তিনি পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেন ছবীর গিরিপথের একান্তে। তখন তিনি পুত্রকে জানালেন স্বপ্নের বৃত্তান্ত। খুলে বললেন সব।

মুকাতিল বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম ওই স্বপ্ন দেখেছিলেন পর পর তিন রাত্রি। এরপর তিনি যখন নিশ্চিত হলেন যে, এ হচ্ছে প্রত্যাদেশ, তখন পুত্রকে তা অবহিত করলেন। বললেন— বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বলো?

সুদ্দী বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম যখন প্রার্থনা জানালেন, 'হে আমার প্রভুপ্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করো' তখন আল্লাহ্ সুসংবাদ দিলেন এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের। আর ঠিক তখনই তিনি মানত করলেন, ওই পুত্রকে তিনি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবান করবেন। এরপর যথাসময়ে ওই প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। যখন তিনি বড় হলেন, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো, এবার তোমার মানত পূর্ণ করো। কিন্তু সুদ্দীর এমতো বিবরণ

যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এর মধ্যে পরীক্ষার বিষয়টি অনুপস্থিত। প্রকৃত কথা হচ্ছে হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলকে পরীক্ষাকরণার্থেই আল্লাহ্তায়ালা দিয়েছিলেন জবেহ করার নির্দেশ। মানত পূরণকরণার্থে নয়।

বাগবী লিখেছেন, নির্দেশপ্রাপ্তির পর হজরত ইব্রাহিম হজরত ইসমাইলকে বললেন, চলো, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবানী করবো। হজরত ইসমাইল তখন ছুরি ও রশি নিয়ে এলেন। তারপর পিতার সঙ্গে গমন করলেন পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে বললেন, কোরবানীর পশু কোথায়? হজরত ইব্রাহিম বললেন, প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখলাম, তোমাকেই জবেহ করছি।

'ফানজুর মাজা তারা' অর্থ এখন বলো, তোমার অভিমত কী? অর্থাৎ এবার তুমিই চিন্তা-ভাবনা করে তোমার মতামত জানাও। এখানকার 'তারা' শব্দটি 'রুইয়াত' (চোখে দেখা) থেকে সাধিত নয়। বরং শব্দটি সাধিত হয়েছে 'রায়' বা পরামর্শ থেকে। অর্থাৎ তিনি 'তোমার অভিমত কী' বলে নিতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় পুত্রের আনুগত্যের পরীক্ষা। যাচাই করতে চেয়েছিলেন তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সে বললো, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তা-ই করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন'। একথার অর্থ— হজরত ইসমাইল জবাব দিলেন, হে আমার মহাসম্মানিত জনয়িতা! আপনি যেরকম নির্দেশ পেয়েছেন, সেরকমই করুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ানুকূলেই পাবেন।

আলোচ্য বাক্যে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নবীগণের স্বপ্নও প্রত্যাদেশ, যা অবশ্য প্রতিপালনীয়। আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আম্বিয়াগণের স্বপ্নও ওহী। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী, হজরত আবু হোরায়রা ও হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মুসলিম, আহমদ ও ইবনে মাজা আবু রযীনের বরাতে এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে সুপরিণত সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, শুভ স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

পরের আয়াতে (১০৩) বলা হয়েছে— 'যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো, এবং ইব্রাহিম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করলো'।

এখানে 'ফালাম্মা আস্লামা' অর্থ যখন উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো। অর্থাৎ যখন পিতাপুত্র দু'জনেই আল্লাহ্র আদেশের প্রতি হলো পূর্ণসমর্পিত। কাতাদা বলেছেন, 'আস্লামা' অর্থ, সমর্পণ করা। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে এবং হজরত ইসমাইল তাঁর জীবনকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেলন।

'ওয়া তাল্লাহু লিল্ জ্বাবীন' অর্থ তিনি তাঁর পুত্রকে কাত করে শায়িত করলেন ভূমিতে। অর্থাৎ জবেহ্ করার জন্য তিনি তাঁকে শোয়ালেন কাত করে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইব্রাহিম তখন হজরত ইসমাইলকে কাত করে

এমনভাবে শুইয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর কপাল ছিলো দুই বাহুর মাঝখানে। বর্ণনাটি উপস্থাপন করেছেন আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম। জনৈক কুরায়েশ কর্তৃক কথিত এবং আতা ইবনে শায়েরের সূত্রে বাগবী কর্তৃক পরিবেশিত এক বিবরণে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ঘটনাটি ঘটেছিলো ওই স্থানে, যেখানে এখনো কোরবানী করেন হজ পালনকারীরা।

বাগবী লিখেছেন, বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, হজরত ইসমাইল তখন পিতাকে বললেন, পিতা! আপনি আমাকে শক্ত করে বাঁধুন, যাতে করে আমি হাত পা ছুঁড়তে না পারি। আর আপনার পরিধেয় গুটিয়ে নিন, যাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত আপনার পরিধেয় রক্তরঞ্জিত না করতে পারে। যাতে আমার সওয়াব প্রাপ্তিতে ন্যূনতা না ঘটে। আবার আপনার রক্তরঞ্জিত বস্ত্র দেখে যেনো আমার মাতা শোকাকুলা না হন। ছুরিটিও ভালো করে ধার দিয়ে নিন, যাতে আমার কণ্ঠনালী অতিদ্রুত কর্তিত হয়, আমিও যেনো মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়ে যাই সহজে। মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চয় ভয়াবহ ও কঠিন। আর আপনি যখন আমার মায়ের কাছে যাবেন, তখন তাঁকে আমার সালাম জানাবেন। আমার গায়ের জামা নিয়ে গিয়ে যদি তাঁকে দিতে চান, তবে তা-ও করতে পারেন। তাহলে হয়তো তিনি পাবেন সান্ত্বনার একটি অবলম্বন। হজরত ইব্রাহিম বললেন, হে আমার প্রাণাধিক পুত্র! আল্লাহ্র আদেশ পালন করার ক্ষেত্রে তুমিই আমার সর্বোত্তম সহযোগী। একথা
বলে তিনি জবেহ্ করার প্রস্তুতি নিলেন। ছুরি ধার দিলেন। পরিধেয় বস্ত্র গুটিয়ে নিলেন। তারপর তাঁকে কাত করে শোয়ালেন। তাঁর হাত পা বাঁধলেন শক্ত করে। শেষে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে আদর করলেন প্রাণপ্রিয় পুত্রকে। তারপর উপর্যুপরি ছুরি চালাতে লাগলেন প্রিয়তম পুত্রের কণ্ঠনালীতে। কিন্তু ছুরি কিছুই করতে পারলো না। তিনি পুনরায় পাথরে ঘষে ছুরিতে ধার দিয়ে নিলেন। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হলো না।

সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয়তম পুত্রের কণ্ঠদেশে কয়েকবার জোরে শোরে ছুরি চালালেন। কিন্তু ছুরি তার চামড়াও কাটতে পারলো না। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তখন তাঁর কণ্ঠদেশে লাগিয়ে দিয়েছিলেন তামার পাত। বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসমাইল তখন বললেন, হে আমার পিতা! আপনি আমাকে ঢেকে দিন। আমাকে দেখলে আপনি মমতাপরবশ হবেন। আপনার হাত হয়ে পড়বে শিথিল। ফলে আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর করা আপনার জন্য হয়ে পড়বে কঠিন। আর আমার নজর শাণিত ছুরির প্রতি পড়লে আমিও হয়ে যেতে পারি চঞ্চল ও বিহ্বল। হজরত ইব্রাহিম তাই করলেন। কিন্তু বস্ত্রাবৃত আত্মজের উপরে যখনই ছুরি চালালেন, তখনই ছুরি হারিয়ে ফেললো তার সম্পূর্ণ ধার।

সুদ্দীর উদ্ধৃতিতে ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বলেন— হজরত ইব্রাহীম ছুরি চালিয়েছিলেন প্রচণ্ড শক্তিতে, কিন্তু ছুরি অচল। হজরত ইসমাইলের কণ্ঠনালীর উপর আল্লাহ্পাক জড়িয়ে দিয়েছিলেন চামড়ার চাকতি। যদ্দরুন ছুরি

হয়েছেলো ভোঁতা। হাদিস বিশারদগণ বলেন, সে সময় হজরত ইসমাইল, হজরত ইব্রাহিমকে বলেছিলেন— পিতা! আমাকে উপুড় করে শোয়ান, নয়তো আমার মুখশ্রী আপনার অন্তরে জাগাবে অপত্য স্নেহ। আবার জবাইয়ের ছুরি দেখলে আমার মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারে আতঙ্ক। কাজেই আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিন। তাই করলেন হজরত ইব্রাহিম। কিন্তু এতেও প্রমাণিত হলো ছুরিটি কর্তনক্ষম নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে মুনজির, ইবনে আবী হাতেম এবং মুজাহিদ সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, জবেহ্ করার প্রাক্কালে হজরত ইব্রাহিম হজরত ইসমাইলকে শুইয়ে দিয়েছিলেন অধোবদনে। হজরত কা'ব আহবার সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা ও মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক স্বসূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত ইব্রাহিম যখন তাঁর প্রিয়পুত্রকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কোরবান করতে উদ্যোগী হলেন, তখন শয়তান মনে করলো, এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ। এসময় যদি আমি ইব্রাহিমের পরিবার পরিজনকে ধোকা না দিতে পারি, তবে তার পরবর্তী বংশধরদেরকে আর কখনো ধোকায় ফেলতে পারবো না। একথা ভেবেই

সে অপরিচিত পুরুষের বেশে হজরত হাজেরার কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, তুমি কি জানো, নবী ইব্রাহিম তোমার ছেলেকে নিয়ে কোথায় গেলেন? হজরত হাজেরা বললেন, দু'জনেই তো গেলো ওই গিরিপথের দিকে কাঠ আনতে। সে বললো, তুমি তো জানো না। তিনি তো তোমার পুত্রকে জবেহ্ করবার জন্য নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, অসম্ভব। তিনি যে পুত্র অন্তঃপ্রাণ। শয়তান বললো, ইব্রাহিম তো বলেন, পুত্রকে জবেহ্ করবার জন্য তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ পেয়েছেন। হজরত হাজেরা বললেন, আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যপালনীয়। একথা শুনে শয়তান নিরাশ হয়ে গেলো। উপস্থিত হলো হজরত ইসমাইলের কাছে। তিনি তখন ছিলেন তাঁর মহাসম্মানিত পিতার অনুগমনরত। শয়তান বললো, এই ছেলে! তুমি কি জানো, তোমার পিতা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? বালক ইসমাইল বললেন, আমরা তো যাচ্ছি কাঠ সংগ্রহ করতে। শয়তান বললো, তুমি জানো না। তোমাকে জবেহ্ করার জন্যই তোমার পিতা তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। তিনি বললেন, কী কারণে আমাকে জবেহ্ করা হবে? শয়তান বললো তিনি মনে করেন, এটা আল্লাহ্র আদেশ। ইসমাইল বললেন, তাহলে তো তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করবেনই। এরকম আমল যে অত্যাবশ্যক। শয়তান এবারও পরাস্ত হলো। কিন্তু দমলো না । এগিয়ে গেলো হজরত ইব্রাহিমের দিকে। বললো, হে পুণ্যবান বৃদ্ধ! আপনি কোথায় চলেছেন? তিনি বললেন, গিরিপথের দিকে। কাজ আছে। সে বললো, আল্লাহ্র কসম! আমি জানি, আপনি শয়তানের ধোকায় পড়েছেন। সে স্বপ্নে আপনার ছেলেকে জবেহ্ করার হুকুম দিয়েছে। হজরত ইব্রাহিম চিনতে পারলেন, এ নির্ঘাত শয়তান। বললেন, আল্লাহ্র দুশমন! এই মুহূর্তে তুই চলে

যা। আল্লাহ্র আদেশ আমি অবশ্যই পালন করবো। শয়তান এবারেও পরাস্ত হলো। এভাবে আল্লাহ্তায়ালা সুরক্ষিত রাখলেন হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর পরিবার পরিজনকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু তোফায়েল বর্ণনা করেছেন, পুত্র জবেহ্ করার আদেশ পেয়ে হজরত ইব্রাহিম তা কার্যকর করতে অগ্রসর হলেন। শয়তান বাধা দিতে চেয়েও তাঁর গতিরোধ করতে পারলো না। যখন জামরাহে উকবাতে উপস্থিত হলেন, তখন পুনরায় শয়তান আর্বিভূত হলো। হজরত ইব্রাহিম তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন সাতটি কংকর। ফলে সে পালিয়ে গেলো। এরপর তিনি উপস্থিত হলেন জামরাহে উস্তায়। সেখানেও তার দিকে ছুঁড়ে মারলেন সাতটি প্রস্তরকণা। ফলে এবারেও তাকে পলায়ন করতে হলো। শেষে যখন তিনি জামরাহে কুবরাতে গমন করলেন, তখনও উদয় হলো শয়তান। তিনিও পূর্ববৎ নিক্ষেপ করলেন সাতটি পাথরদানা। সঙ্গে সঙ্গে শয়তান পালালো। হজরত ইব্রাহিম অগ্রসর হলেন আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর করতে।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ১০৪, ১০৫, ১০৬

❑ তখন আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম, 'হে ইব্রাহীম!

❑ 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে!'— এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

❑ নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

আলোচ্য আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— ইসমাইলকে কাত করে শুইয়ে যখন তার পিতা ইব্রাহিম তার কণ্ঠদেশে ছুরি চালালেন, তখন আমি রুদ্ধ করে দিলাম ছুরির জবেহ্ করার শক্তি। আর ইব্রাহিমকে বললাম, হে আমার নবী! তুমি তো আমা কর্তৃক প্রদর্শিত স্বপ্ন সত্য করে দেখালে। এভাবে যারা আমার আদেশ কার্যকর করতে ব্রতী হয়, তারাই সৎকর্মপারয়ণ। আর তাদেরকে আমি এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিঃসন্দেহে এটা ছিলো এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'ওয়া নাদাইনাহু (তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম) কথাটির 'ওয়াও' অতিরিক্ত এবং কথাটি পূর্ববর্তী আয়াতের 'যখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করলো' শর্তযুক্ত বাক্যের পরিণতি। বায়যাবী লিখেছেন, বর্ণিত বাক্যের পরিণতি এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য কথাগুলো হবে এরকম— তখন পিতা-পুত্রের অন্তর ভরে গেলো অপার্থিব আনন্দে, যে আনন্দ আল্লাহ্পাক আর কাউকে দান করেননি। এভাবে আল্লাহ্পাক তাঁদেরকে দান করেছেন মহাসম্মান।

আর তাঁদের জন্য পরকালেও রেখে দিয়েছেন বিশেষ পুরস্কার, যা বর্ণনাতীত। আর এমতো পুরস্কার প্রাপ্তির অঙ্গীকার শ্রবণে তারাও আল্লাহ্তায়ালার দরবারে জ্ঞাপন করেছিলেন অজস্র কৃতজ্ঞতা।

আমি বলি, এরকমও হতে পারে যে, 'ওয়াও' এখানে যোজক অব্যয় এবং এর সংযোগ রয়েছে ওই উহ্য বক্তব্যের সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যখন পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ অবনত মস্তকে মেনে নিলেন, হজরত ইব্রাহিম তাঁর প্রিয় পুত্রকে কাত করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন, তখন আল্লাহ্ ছুরিকে কর্তনকর্ম থেকে বিরত রাখলেন এবং প্রত্যাদেশ করলেন— হে

ইব্রাহিম তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছো। নিঃসন্দেহে এটাই আমার পুরস্কার। আর এভাবে আমি পুরস্কৃত করি তাদেরকে, যারা সৎকর্মপরায়ণ।

'ক্বদ্ সদ্দাক্বতার রুইয়া' অর্থ তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে। উল্লেখ্য, যে কোনো আদেশের উদ্দেশ্য থাকে তা পালিত হবে কিনা, তা পরীক্ষা করা। হজরত ইব্রাহিম সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। জবেহ করার সকল আয়োজনই তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু হজরত ইসমাইলকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ্ স্বয়ং। কারণ জীবন ও মৃত্যু দান সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অধিকারভূত।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম কেবল দেখেছিলেন, তিনি তাঁর প্রাণাধিক পুত্রকে জবেহ করছেন। রক্ত প্রবাহিত হতে তিনি দেখেননি। তাঁর দেখা ওই স্বপ্নই বাস্তবরূপ লাভ করেছিলো। অর্থাৎ জবেহ তিনি ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু তা ছিলো রক্তপাতবিবর্জিত। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে বলতে হয়, তাঁর স্বপ্ন ও তার বাস্তবায়ন ছিলো হুবহু এক। নতুবা তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়নকে গ্রহণ করতে হবে রূপক অর্থে।

একটি প্রশ্ন ঃ পুত্রকে জবেহ করা যদি হজরত ইব্রাহিমের উপরে অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব) না হয়ে থাকে, যদি কেবল জবেহ করার উপকরণাদি একত্রিত করা ও ছুরি চালানোই তাঁর কর্তব্য হয়ে থাকে, তাহলে ১০৭ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'ফাদাইনাহু' (আমি তাকে ফিদিয়া দিয়েছি) কথাটির অর্থ কী দাঁড়ায়? ফিদিয়া তো অত্যাবশ্যক দায়িত্বের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

জবাবঃ জবেহ শুরু করা অর্থাৎ ছুরি চালানো পর্যন্তই ছিলো হজরত ইব্রাহিমের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। আর জবেহ শুরু করলে জবেহ হয়ে যাওয়াও অনিবার্য হয়ে থাকে। এজন্য জবেহ শুরু করাই পরোক্ষার্থে জবেহ হয়ে যাওয়া। তাই জবেহ শুরু করার পরেও জবেহ না হওয়াই ফিদিয়া বা পরিবর্তিত নির্দেশ।

দ্রষ্টব্যঃ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত ইসমাইলের গ্রীবাদেশে ছুরি চালানোর ওয়াজিব দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়ার পরেও তা স্বাভাবিক পরিণতি লাভ না করার অর্থই আদেশ স্থগিত বা রহিত হওয়া।

'ইন্না কাজালিকা নাজ্বযিল মুহ্সিনীন' অর্থ এভাবেই আমি সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। একথার অর্থ— ইব্রাহিমকে আমি যেভাবে

পুরস্কৃত করেছি, জবেহ এর জন্য শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দিয়েছি, জবেহ হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি ইসমাইলকে এবং পিতা-পুত্র উভয়কে দান করেছি পৃথিবীবাসীদের উপরে সমুচ্চ মর্যাদা, সেভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি তাঁর অনুকূল মনোভাবের অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণগণকে।

'ইন্না হাজা লাহুওয়াল বালাউল মুবীন' অর্থ নিশ্চয়ই এটা ছিলো এক স্পষ্ট পরীক্ষা। অর্থাৎ পুত্র জবেহ করার এই আদেশটি ছিলো নিঃসন্দেহে এক বিরাট পরীক্ষা। এর দ্বারা হজরত ইব্রাহিম ও হজরত ইসমাইলের আল্লাহ্ প্রেমের গভীরতা ও
তীব্রতা যাচাই করাই ছিলো মূল উদ্দেশ্য। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'বালাউ' এর অর্থ অনুগ্রহ। অর্থাৎ পুত্রের স্থলে দুম্বা জবেহ করার আদেশ ছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বৃহৎ অনুগ্রহ।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত **১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩**

❑ আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে।
❑ আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।
❑ ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।
❑ এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।
❑ সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম;
❑ আমি তাহাকে সুসংবাদ দিয়াছিলাম ইস্হাকের, সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম,

❑ আমি তাহাকে বরকত দান করিয়াছিলাম এবং ইস্হাককেও; তাহাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কোরবানীর বিনিময়ে'। এখানে 'কোরবানী' অর্থ বেহেশত থেকে প্রেরিত এক দুম্বা।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইব্রাহিম যখন আওয়াজ শুনলেন 'হে ইব্রাহিম' তখন তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। দেখতে পেলেন হজরত জিবরাইলকে।

তাঁর হাতে রয়েছে একটি শিঙবিশিষ্ট দুম্বা। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! এই দুম্বাটি হচ্ছে আপনার পুত্র কোরবানীর বিনিময়। এটাকে জবেহ করুন। একথা বলেই হজরত জিবরাইল উচ্চারণ করলেন 'আল্লাহু আকবার'। দুম্বাটিও উচ্চারণ করলো আল্লাহু আকবার। সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করলেন মহাপুণ্যবান পিতাপুত্রও। তারপর দুম্বাটিকে মীনার
কোরবানীগৃহে নিয়ে গিয়ে সেটিকে জবেহ করলেন হজরত ইব্রাহিম। উল্লেখ্য, হজরত ইসমাইলের পরিবর্তে জবেহ করার জন্য কোরবানীর দুম্বাটি ছিলো আল্লাহ্র প্রতিদান। তাই ওই প্রতিদান বা বিনিময়ের সম্পর্ক আল্লাহ্তায়ালা করেছেন নিজের সঙ্গে। বলেছেন— আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কোরবানীর বিনিময়ে।

'আ'জীম' অর্থ এখানে হৃষ্টপুষ্ট, সুঠাম দেহবিশিষ্ট। অথবা পুণ্যের দিক থেকে সমুচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। হোসাইন ইবনে ফজল বলেছেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওই কোরবানী প্রেরিত হয়েছিলো বলেই এখানে প্রযুক্ত হয়েছে এমতো বিশেষণ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এরকম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার অধিকার কোরবানীর পশুটির ছিলো। মুজাহিদ বলেছেন, তাকে 'আ'জীম' (শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট) বলা হয়েছে একারণে যে, তা ছিলো মকবুল (গৃহিত)। বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ কোরআন ব্যাখ্যাতা মন্তব্য করেছেন, কোরবানীর ওই দুম্বাটি বেহেশতে অতিবাহিত করেছিলো চল্লিশটি বসন্ত। অর্থাৎ বেহেশতের চল্লিশটি বসন্তে চরে চরে সে হয়েছিলো বিশেষভাবে হৃষ্টপুষ্ট। ইবনে আবী শাইবা, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনাতেও এরকম বলা হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, দুম্বাটি ছিলো ওই দুম্বা, যাকে কোরবানী করেছিলেন হজরত আদমের পুত্র হজরত হাবিল।

হানাফীগণ আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কেউ যদি তার আপন পুত্রকে কোরবানী করার মানত করে, তার জন্য ওয়াজিব হবে একটি ছাগল কোরবানী করা। বায়যাবী লিখেছেন, হানাফীগণের এমতো অভিমতের কোনোরূপ প্রমাণ এই আয়াতে নেই। আমি বলি, সুরা হজের 'ওয়ালি ইয়ুওফু নুজুরাহুম' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই মাসআলাটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে এরকম মানতের ক্ষেত্রে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা পুত্র-কোরবানীর মানত পাপ। আর পাপযুক্ত মানত পরিপূরণ ওয়াজিব হয় না। ইমাম আবু ইউসুফও এরকম বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা অধিকতর সূক্ষ্মদর্শী। তাই তিনি বলেছেন, শরিয়ত অনুসারে যা পালন করা ওয়াজিব হয় না, তা-ও রূপক অর্থে নির্ধারিত হয়ে যায়। সুতরাং কেউ পুত্র কোরবানীর মানত করলে তা অবশ্যই পরিহার্য হয় বটে, কিন্তু একথাও ভাবতে অসুবিধা নেই যে, সে প্রকারান্তরে অন্ততঃ একটি ছাগল কোরবানী করাকে তো নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছে। কারণ এটাই কোরবানীর নিম্নতম পরিমাণ। আর আল্লাহ্ই হজরত ইসমাইলের ক্ষেত্রে এরকম পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

পরের আয়াতে (১০৮) বলা হয়েছে— 'আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি'। একথার অর্থ— আমি মহান পিতা-পুত্রের এই অনন্য কোরবানীর ঘটনাটিকে পরবর্তী সময়ের মানুষের স্মৃতিতে জীবন্ত করে রেখেছি। তাইতো তাদের চর্চিত বিষয়াবলীর মধ্যে এই কাহিনীটি সতত জাগ্রত।

এখানে 'তারক্না' শব্দটির কর্মপদটি রয়েছে উহ্য। এর কারণ হচ্ছে, হজরত ইব্রাহিম প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি আপনাআপনিই স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়। 'তার পরবর্তীদের স্মরণে' অর্থ পরবর্তী উম্মতের ধর্মাচরণে, অর্থাৎ ঈদুল আজহার কোরবানীর রীতি অত্যাবশ্যক করে দিয়ে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ইব্রাহিমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক (১০৯)। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি'(১১০)। একথার অর্থ— আমার নবী ইব্রাহিমের উপরে বর্ষিত হোক অফুরন্ত শান্তি। এভাবেই আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের জন্য অক্ষয় শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ধারণ করে তাদেরকে করি পুরস্কৃত। উল্লেখ্য, এখানে 'কাজালিকা' এর পূর্বে নিশ্চয়তাপ্রদায়ক শব্দ 'ইন্না' ব্যবহৃত হয়নি পুনরাবৃত্তি পরিহারার্থে। কেননা ইতোপূর্বে এব্যাপারে ১০৫ সংখ্যক আয়াতে নিশ্চয়তা ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে 'ইননা কাজালিকা নাজ্যিল মুহসিনীন'।

এরপরের আয়াতে (১১১) বলা হয়েছে— 'সে ছিলো আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম'। একথার অর্থ— নিঃসন্দেহে যারা আমার বিশ্বাসী দাস, নবী ইব্রাহিম ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

এরপরের আয়াতে (১১২) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিলো এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম'। একথার অর্থ— আমি ইব্রাহিমকে দিয়েছিলাম আর একজন পুণ্যবান সন্তানের শুভসমাচার। তিনিও ছিলেন আমা কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রেরিত নবী। পুণ্যবানদের মধ্যে তাঁর মর্যাদাও ছিলো অনন্যসাধারণ। উল্লেখ্য, এখানে প্রথমে 'নবী' এবং পরে 'সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম' বলার মধ্যে ফুটে উঠেছে হজরত ইসহাকের প্রতুল প্রশংসা ও অতুল মাহাত্ম্য। তদুপরি এই ইঙ্গিতটিও প্রকাশ পেয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ হওয়াই নবী হওয়ার প্রধান ভিত্তি। অর্থাৎ নবীগণের পুণ্যাত্মা হওয়া অনিবার্য।

এরপরের আয়াতে (১১৩) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও; তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী'।

এখানে 'ওয়া বারক্না আ'লাইহি' অর্থ আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম। অর্থাৎ আমি ইব্রাহিমের উপরে অবতীর্ণ করেছিলাম অপরিমেয় কল্যাণ— ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। তাঁর বংশবৃক্ষকে করেছি সুবিস্তৃত।

'ওয়া আ'লা ইসহাক্বা' অর্থ এবং ইসহাককেও। অর্থাৎ ইসহাকের বংশকেও আমি পৃথকভাবে করেছি কল্যাণময়। নবী ইয়াকুব থেকে নবী ঈসা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রেরিত প্রায় এক হাজার নবী ওই বিশেষ কল্যাণপ্রবাহেরই প্রমাণ।

'ওয়ামিন জুররিইয়াতিহিমা মুহসিনুন' অর্থ তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপারয়ণ আর 'ওয়া জলিমুল্ লিনাফসিহী মুবীন' অর্থ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। অর্থাৎ তাঁদের বিশাল উত্তরপুরুষদের মধ্যে সকলে এরকম অবস্থায় থাকেনি। কেউ কেউ হয়েছে পুণ্যাভিসারী। আবার কেউ কেউ হয়েছে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট। এখানে এরকম বলে এ বিষয়টিকেও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উত্তরপুরুষদের পথভ্রষ্টতা তাদের পুণ্যবান পূর্বপুরুষের উপরে প্রভাববিস্তারক হয় না।

সূরা সাফ্ফাত ঃ আয়াত ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২

❑ আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি,
❑ এবং তাহাদিগকে এবং তাহাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে।
❑ আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদিগকে, ফলে তাহারাই হইয়াছিল বিজয়ী।
❑ আমি উভয়কে দিয়াছিলাম বিশদ কিতাব।
❑ এবং তাহাদিগকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে।
❑ আমি তাহাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।
❑ মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হইক।
❑এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।
❑ তাহারা উভয়েই ছিলো আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতসম্ভারের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আমি আমার নবী মুসা ও হারুনকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছিলাম। তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের উপর মিসরের কুখ্যাত সম্রাট দীর্ঘদিন ধরে অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলো। ওই অত্যাচারী ফেরাউন এবং তার অত্যাচারী অনুসারীদেরকে তাই আমি ফেলেছিলাম

মহা সংকটে। তাদেরকে দিয়েছিলাম সলিল সমাধি। আর ওই মহাবিপদ থেকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মুসা-হারুন নবীভ্রাতৃদ্বয় ও তার অনুসারীদেরকে। আমি তাদেরকে এভাবে সাহায্য করেছিলাম বলেই তো তারা হতে পেরেছিলো বিজয়ী। এরপর আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ আকাশজ গ্রন্থ— তওরাত। যাতে ছিলো আমা কর্তৃক প্রবর্তিত বিধানাবলীর বিশদ বিবরণ। এভাবে আমি ওই নবী ভ্রাতৃদ্বয়কে পরিচালিত করেছিলাম শুভ ও সরল পথে। তাদের স্মৃতিও আমি জাগ্রত রেখেছি পরবর্তী যুগের মানুষের স্মৃতিপটে। তাদের উপরেও বর্ষিত হোক শান্তি, অনাবিল ও অফুরন্ত স্বস্তিসম্ভার। তাদেরকে যে ভাবে আমি পুরস্কৃত করেছি, সেভাবেই আমি যুগে যুগে পুরস্কৃত করে থাকি তাদের মতো পুণ্যপ্রেমিকদেরকে। হে আমার রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা! শুনে রাখুন, আপনার ওই দু'জন পূর্বসূরীও ছিলো আমার বিশ্বাসী দাসদের অন্যতম।

সূরা সাফ্ফাতঃ আয়াত ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২

❑ ইল্য়াসও ছিলো রাসূলদের একজন।
❑ স্মরণ কর, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি সাবধান হইবে না?
❑ তোমরা কি বাআলকে ডাকিবে এবং পরিত্যাগ করিবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা—
❑ 'আল্লাহ্কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের— প্রতিপালক তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের।'
❑ কিন্তু উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলো, কাজেই উহাদিগকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হইবে।
❑ তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।
❑ আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি।
❑ ইল্য়াসিনের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

❑ এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।
❑ সে ছিলো আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'ইলিয়াসও ছিলো রসুলদের একজন'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার শুনুন ইলিয়াসের বৃত্তান্ত। তিনিও ছিলেন আমা কর্তৃক প্রেরিত পুরষগণের একজন।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, হজরত ইলিয়াস ও হজরত ইদ্রিস নাম দু'টো একই রসুলের। তাঁর নিকট সংরক্ষিত কোরআনের অনুলিপিতে লেখা ছিলো 'ওয়া ইন্না ইদ্রিসা লামিনাল মুরসালীন'। অর্থাৎ 'ইলিয়াস' এর স্থলে ছিলো 'ইদ্রিস'। ইকরামার অভিমতও এরকম। কিন্তু অন্যান্য বিদ্বজ্জনের অভিমত হচ্ছে, হজরত ইলিয়াস ছিলেন বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের একজন রসুল। তিনি 'ইদ্রিস' নন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত ইলিয়াস ছিলেন হজরত ইয়াসা এর চাচাতো ভাই। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাঁর বংশানুক্রমকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে ঃ ইলিয়াস ইবনে বশরি ইবনে কাইহাস ইবনে ইরায ইবনে হারুন ইবনে ইমরান।

বর্ণনাকারী সাহাবীগণের উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হজরত ইলিয়াসের পূর্ববর্তী নবীর মহাপ্রয়াণের পর বনী ইসরাইলদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো বিভিন্ন রকমের নতুন নতুন ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ড। মূর্তিপূজার মতো ঘৃণ্যকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো অনেকেই। এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর তাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত হন হজরত ইলিয়াস। তিনি ছিলেন হজরত মুসার পরবর্তী যুগের একজন নবী। উল্লেখ্য, হজরত মুসার পরবর্তী নবীগণের মূল দায়িত্ব ছিলো তওরাতের অনুশাসনগুলোকেই নতুন করে প্রাণবন্ত করে তোলা। নতুন কোনো বিধান প্রবর্তন করা নয়। তখন বনী ইসরাইলেরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো সিরিয়ায়। তারা সিরিয়া অধিকার করতে পেরেছিলো তাদের পূর্বসূরী নবী হজরত ইউশা

ইবনে নুনের নেতৃত্বে। তারা ছিলো বেশ কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত। তার মধ্যে একটি গোত্রের বসবাস নির্ধারিত হয়েছিল বাআ'লাবাক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। হজরত ইলিয়াস ছিলেন ওই
গোত্রভূত। আর আপন গোত্রের পথপ্রদর্শনের নিমিত্তেই প্রেরণ করা হয়েছিলো তাঁকে। ওই সময় বাআ'লাবাকের বাদশাহ ছিলো উজুব। সে তার গোত্রের লোকদেরকে মূর্তিপূজা করতে বাধ্য করেছিলো। সে নিজেও ছিলো ঘোর পৌত্তলিক। সে পূজা করতো বাআল নামক এক মূর্তির। ওই মূর্তির মুখ ছিলো চারটি। হজরত ইলিয়াস আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানালেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করলো না। বাদশাহর কাছেও বিষয়টি ছিলো গুরুত্বহীন। আর তার স্ত্রী আজবিল ছিলো চরম নবীবিদ্বেষিণী। বাদশাহর উপরে ছিলো তার একচ্ছত্র প্রভাব। বাদশাহ কোনো যুদ্ধে গেলে পুরুষের বেশে রাজ্যশাসন করতো সে-ই। বলা হয়ে থাকে,

নবী ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাকারিয়াকে শহীদ করিয়েছিলো এই আজবিলই। তার ছিলো এক বিচক্ষণ মুখপাত্র। তিনি ছিলেন ইমানদার। কিন্তু তিনি বাইরে কখনো তা প্রকাশ করতেন না। তিনিই কৌশলে বিভিন্ন কথা বলে প্রায় তিন শত নবীকে আজবিলের জিঘাংসার আগুন থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আবার শত চেষ্টা করেও কাউকে কাউকে রক্ষা করতে সমর্থ হননি। বহুপুরুষের সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধা হয়েছিলো সে। সাত জন নবীও ছিলেন তাদের মধ্যে। এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, তার ছেলে-মেয়ে ছিলো সত্তরটি।

বাদশাহ উজুবের নিকট প্রতিবেশী ছিলেন মাযদাকী। তিনি ছিলেন এক আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাসী। তিনি মূর্তিপূজারী বাদশাহর সংশোধন কীভাবে হয়, তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটেই ছিলো তার একটি মনোমুগ্ধকর বাগান। বাদশাহ উজুব ও বেগম আজবিল দু'জনেই বাগানটি পছন্দ করতো। তারা ফুরসত পেলেই ওই বাগানে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো। স্নান-পানাহার করতো। উজুব মাযদাকীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করতো। কিন্তু আজবিল করতো হিংসা। কিন্তু তা বাইরে প্রকাশ করতো না। মাঝে মাঝে কেবল উজুবকে বলতো, বাগানটা হুকুমদখল করে নিলে হয় না। উজুব তার একথায় পাত্তা দিতো না বলে মনে মনে বিভিন্ন ফন্দি ফিকির আঁটতো সে। একবার উজুবকে বেরিয়ে যেতে হলো এক যুদ্ধযাত্রায়। আজবিল ভাবলো এই তো সুযোগ। সে দু'জন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ঠিক করলো। তাদেরকে বললো, তোমরা সাক্ষ্য দিয়ো, মাযদাকী বাদশাহকে গালি দিয়েছে। আর সে কথা তোমরা স্বকর্ণে শুনেছো। তখন ওই রাজ্যের বিধান ছিলো, বাদশাহকে যদি কেউ গালি দেয়, তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যাহোক, সাক্ষ্যদাতাদেরকে প্রস্তুত করে সে ডেকে পাঠালো মাযদাকীকে। বললো, আমি শুনতে পেলাম, তুমি বাদশাহকে গালি দিয়েছো। মাযদাকী অভিযোগ অস্বীকার করলেন। তখন উপস্থিত করানো হলো মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদ্বয়কে। তারা মাযদাকীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো। এভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করে আজবিল
হত্যা করলো মাযদাকীকে এবং দখল করে নিলো তার সুদৃশ্য বাগান। উজুব যুদ্ধযাত্রা থেকে ফিরে এসে এ ঘটনা শুনে মর্মাহত হলো। উজুব বললো, কাজটা তুমি ভালো করোনি। মনে হচ্ছে এর পরিণাম হবে অত্যন্ত অশুভ। সে ছিলো সৎ ও ভদ্রপ্রতিবেশী। ছিলো আমার প্রিয়ভাজন। আজবিল বললো, তোমার বিধান অনুযায়ীই তো আমি তার বিচার করেছি। সে তোমাকে গালি দিয়েছিলো বলেই তো আমি গোস্বা সম্বরণ করতে পারিনি। উজুব তবুও আশ্বস্ত হলো না। কিছুকাল পরেই আবির্ভূত হলেন নবী ইলিয়াস। তিনি বাদশাহ উজুব ও তার রাজ্যের জনতার কাছে ঘোষণা করলেন, মাযদাকী ছিলেন আল্লাহ্র ওলী। তাঁকে হত্যা করায় আল্লাহ্ অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন, কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা না করলে এবং মাযদাকীর উত্তরাধিকারকে তার বাগান প্রত্যর্পণ না করলে নেমে আসবে ভয়ংকর আযাব। ওই বাগানেই পড়ে থাকবে বাদশাহ-বেগমের ছিন্ন ভিন্ন লাশ। আল্লাহ্তায়ালা একথা জানিয়েছেন শপথ করে।

এরকম ঘোষণা শুনে উজুব রেগে গেলো। নবী ইলিয়াসের কথা তার বিশ্বাস হলো না। তাকে ডেকে এনে বললো, মনে হচ্ছে তোমার বক্তব্য অযথার্থ। পৃথিবীতে আরো অনেক বাদশাহ তো রয়েছে। যারা দেদারছে করে চলেছে মূর্তিপূজা। করে চলেছে অনেক অন্যায়। তবুও তাদের উপরে শাস্তি অবতীর্ণ হয়নি। আমি তো তাদের মতো অতো বেশী পাপ করিনি। তাহলে আমার উপরে আযাব আসবে কেনো? শেষ পর্যন্ত উজুব সিদ্ধান্ত নিলো, ইলিয়াসকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে হত্যা করতে হবে। হজরত ইলিয়াস উজুবের এমতো নির্দয় মনোভাবের কথা বুঝতে পেরে আত্মগোপন করলেন। আশ্রয় নিলেন এক দুর্গম পর্বতের নির্জন গুহায়। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি ওই নিভৃত গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন সাতটি বছর। খাদ্য ছিলো তাঁর তৃণ ও অরণ্যের ফল। উজুব অনেক গুপ্তচর-সিপাই-শান্ত্রী লাগিয়েও তাঁর সন্ধান বের করতে পারেনি।

সাত বছর পর বাদশাহ উজুবের সবচেয়ে প্রিয় এক পুত্র হয়ে পড়লো পীড়িত। সে শরণাপন্ন হলো তার পরম পূজনীয় প্রতিমা বাআলের। বাআল প্রতিমাটির সেবা যত্নের জন্য উজুব নিয়োজিত করেছিলো চারশত কর্মচারী। বাআল মূর্তিটির পেটে শয়তান ঢুকে কথা বলতো। আর ওই চারশত পাণ্ডা তা কান লাগিয়ে শুনতো। কিন্তু এবার ঘটলো বিপত্তি। তারা শত চেষ্টা করেও মূর্তির অভ্যন্তর থেকে কোনো আওয়াজ শুনতে পেলো না। শেষে এক পাণ্ডা বললো, সম্রাটপ্রবর! মনে হয় বাআল আপনার প্রতি

অতুষ্ট। উজুব বললো, কেনো, আমি তো তার একনিষ্ঠ উপাসক। পাণ্ডা বললো, যে ইলিয়াস বাআল কে অস্বীকারকারী, সে ইলিয়াসকে তো আপনি এখন পর্যন্ত বধ করতে পারেননি। উজুব বললো, তাকে হত্যা তো করতামই। কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেলো না যে। চেষ্টা এখনো চলছে। কিন্তু এখন
আমার পুত্র রোগভোগে জর্জরিত। এখন তাঁর নিরাময় কামনা ছাড়া অন্য কোনো দিকে আমি মনোযোগই বা দেই কী করে? আগে আমার সন্তান সুস্থ হোক। তারপর তো বাআ'লকে আমি পরিতুষ্ট করবোই। এক পাণ্ডা প্রস্তাব দিলো, সিরিয়ায় রয়েছে বেশকিছু জাগ্রত দেবীমূর্তি। তাদের কাছে এব্যাপারে সুপারিশের আবেদন করা যেতে পারে। প্রস্তাবটি উজুবের মনোপুত হলো। সে তার চারশ পাণ্ডাকেই পাঠিয়ে দিলো সিরিয়ায়। ইত্যবসরে হজরত ইলিয়াস প্রত্যাদেশ পেলেন, এবার তুমি আত্মপ্রকাশ করো। জনসমক্ষে হাজির হও। ভয় নেই। আমি স্বয়ং তোমার রক্ষক। এবার তাদের উপরে আমি প্রতিষ্ঠিত করবো তোমার প্রতাপ ও প্রভাব।

নির্দেশ পেয়ে লোকালয়ে নেমে এলেন হজরত ইলিয়াস। দেখলেন একদল লোক কোথাও যাচ্ছে। তিনি তাদেরকে বললেন, থামো। তারা থামলো। তিনি বললেন, তোমরা যারা এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত এবং যারা উপস্থিত নয়, তাদের সকলের প্রতি আমার একই নির্দেশ। তা হচ্ছে— তোমরা তোমাদের বাদশাহর কাছে যাও। তাকে বলো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনিই বনী ইসরাইলসহ সকল মানুষের স্রষ্টা। তিনিই সকলের রিজিকদাতা এবং

জীবন-মৃত্যু প্রদাতা। তাকে একথাও জানিয়ে দিয়ো— হে উজুব! তোমার সন্তানের আরোগ্য ভিক্ষা করো কেবল আল্লাহ্র কাছে। তিনিই একমাত্র আরোগ্যদাতা। সুতরাং তুমি অংশীবাদী হয়ো না। প্রার্থনা কোরো না গায়রুল্লাহ্র কাছে। যদি তুমি এরকম না করো, তবে তোমার পুত্রের রোগভোগ হবে আরো অধিক অসহনীয় ও প্রলম্বিত। এভাবে মৃত্যুই হবে তার অশুভ পরিণাম। এভাবেই একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা এবং জীবন-মৃত্যুপ্রদাতা।

হজরত ইলিয়াসের একথা পাণ্ডাদের কানেও পৌঁছলো। তারা উজুবের কাছে গিয়ে বললো, আমরা ইলিয়াসের দেখা পেয়েছি। সে আমাদেরকে তেজস্বীভাষায় সংযত হবার নির্দেশ দিলো। আর আপনাকে জানালো এই এই নসিহত। আমরা সংখ্যায় ছিলাম অনেক। তবুও তার কথার উপরে আমরা কোনো কথাই বলতে পারলাম না। ভয়ে আতংকে কেমন যেনো চুপসে গেলাম সকলে। অথচ সে এক শীর্ণকায় দীর্ঘদেহী মানুষ। তার মাথার চুল ঝরে পড়েছে। গায়ের চামড়াও কেমন অমসৃণ। পরনে কেবল একটি পশমী কোর্তা এবং জীর্ণ পাজামা। কাঁটা দিয়ে সেলাই করা ছিলো তার কোর্তার সম্মুখভাগ। তাদের কথা শুনে উজুবও আতংকিত হয়ে পড়লো। তাঁর উপরে শক্তিপ্রয়োগের কথা ভাবতেও পারলো না। পাণ্ডাদেরকে বললো, বুঝলাম। শক্তিপ্রয়োগ আর চলবে না। এবার খাটাতে হবে কৌশল। তোমরা এবার গিয়ে তাকে লোভ দেখাও। বলো, আমরা আপনার উপর ইমান এনেছি। আমাদের জনপদবাসীরাও আপনাকে দেখে আপনার উপরে ইমান
আনতে চায়। সুতরাং চলুন আমাদের সঙ্গে। দেখবে, একথা বললে সহজেই তিনি তোমাদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিবেন। আর সেই সুযোগে তোমরা তাকে এনে হাজির করতে পারবে আমার সামনে।

উজুবের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে সোৎসাহে বেরিয়ে পড়লো পাণ্ডারা। গিয়ে উপস্থিত হলো ওই পাহাড়ের গুহায়, যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন হজরত ইলিয়াস। তারা ডাকতে লাগলো, হে আমাদের নবী। দয়া করে বের হয়ে আসুন। আমরা আপনার প্রতি ইমান এনেছি। আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্র পয়গম্বর। আমাদের বাদশাহ্ এবং রাজ্যের সকলেই আপনার উপরে ইমান এনেছে। তারা আপনাকে সালাম বলেছে। এখন সকলেই আপনার সঙ্গ লাভের জন্য উন্মুখ। সুতরাং আপনি নির্জনবাস পরিত্যাগ করুন। বসবাস শুরু করুন আপনার অনুগত জনতার সঙ্গে। এখন আমাদের জীবন যাপিত হবে আপনার সদয় আদেশানুসারে।

হজরত ইলিয়াস তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। ভাবলেন, এখন তাদের কথা না শুনলে হয়তো আল্লাহ্ অতুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হলো, আল্লাহ্র বিনা অনুমতিতে তিনি স্থান ত্যাগই বা করবেন কেমন করে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এখনো তো এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ এলো না। তিনি তাই প্রার্থনা জানালেন, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! ওদের কথা যদি সত্য হয়, তবে তুমি

আমাকে স্থানত্যাগের অনুমতি দান করো। আর যদি তারা অসত্যভাষী হয়, তবে তাদের উপর আপতিত করো অগ্নিবৃষ্টি। তাঁর এমতো প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই বাইরে শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলো সকলে।

উজুব ও তার সঙ্গী-সাথীরা যথাসময়ে এ সংবাদ পেলো। কিন্তু তবু তারা তাদের কুমতলব পরিত্যাগ করলো না। পুনরায় প্রতারণার মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করতে চাইলো। এবার সে প্রস্তুত করলো আরো বেশী ধূর্ত ও ফন্দিবাজের একটি দল। তারা গিয়ে উপস্থিত হলো হজরত ইলিয়াসের বসতগুহার কাছাকাছি। বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা আল্লাহ্র ক্রোধ ও

কর্তৃত্ব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইতোপূর্বে যারা আপনার কাছে এসেছিলো, আমরা তাদের মতো নই। তারা ছিলো ভণ্ড, প্রতারক। আমাদেরকে কোনো কিছু না জানিয়েই তারা আপনার কাছে এসেছিলো। আমরা যদি তাদের অসৎ উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারতাম, তবে তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম। আপনার কাছে তাদেরকে ঘেঁষতেই দিতাম না। ভালোই হয়েছে, আল্লাহ্ নিজেই আপনার ও আমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। হজরত ইলিয়াস এবারও দোয়া প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরেও শুরু হলো অগ্নিবৃষ্টি।

এদিকে উজুবের পুত্রের অসুখ দিন দিন বেড়েই চললো। দুই দুইবার কৌশল ব্যর্থ হওয়াতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো আরো বেশী। একবার তার মনে হলো, এবার নিজেই গিয়ে তাকে শেষ করে দিয়ে আসবে। কিন্তু পুত্রের পীড়া-যন্ত্রণা তার উদ্যমকে বার বার প্রতিহত করতে লাগলো। শেষে সে ঠিক করলো, এবার পাঠাতে হবে রাণীর ওই মুখপাত্রটিকে, যে প্রকৃতই সাধু ও সজ্জন, সম্ভবত ইলিয়াসের উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারীও। হয়তো একে পাঠালে তার সঙ্গে ইলিয়াসও পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নেমে আসবে। লোকটি বিচক্ষণ, দক্ষ ও বিশ্বস্ত। নয়তো এরকম সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে উজুব অনেক আগেই পরিত্যাগ করতো। উজুবের মনে হলো, তকে পরিত্যাগ না করে একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। এবার তার দ্বারাই উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া নিশ্চিত। উজুব তাঁকে ডেকে এনে বললো, তুমি ইলিয়াসকে জানাও, তার সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করার ইচ্ছা আমার নেই। একথা বলে তাঁর সঙ্গে দিলো কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীকে। তাদেরকে একান্তে ডেকে বুঝিয়ে দিলো, রাণীর মুখপাত্রের কথা শুনে যদি ইলিয়াস চলে আসে, তো ভালোই। যদি না আসতে চায়, তবে তোমরা তাকে জোরপূর্বক ধরে এনো। আর মুখপাত্রকে বললো, দুই দুইবার আমার লোকজন ভস্মীভূত হলো। এদিকে আমার প্রিয় পুত্রের অবস্থা করুণ। এমতাবস্থায় ক্ষমাপ্রার্থনা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নাই। আমি বুঝতে পারলাম ইলিয়াস নবীর অসন্তোষ ও অপপ্রার্থনার ফলেই আমি আজ বিপদকবলিত। এখন আমরা তাঁর আনীত

ধর্মাদর্শই গ্রহণ করতে চাই। পরিত্যাগ করতে চাই পৌত্তলিকতাকে। কিন্তু তিনি যদি আমাদের মাঝে না আসেন, তাহলে আমরা কী করে পাবো সৎপথ ও শুভনির্দেশনা।

মুখপাত্র ও তার সঙ্গের সান্ত্রীরা গিয়ে উপস্থিত হলো পবর্ত-গহ্বরবাসী হজরত ইলিয়াসের কাছে। মুখপাত্র তাঁর নাম ধরে সম্বোধন করলেন। তিনি কণ্ঠের আওয়াজ শুনেই তাঁকে চিনতে পারলেন। প্রত্যাদেশ হলো, হে ইলিয়াস! এবার বাইরে এসো। তোমার সত্যবাদী ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাত করো। তোমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ককে করো পুনরুজ্জীবিত। হজরত ইলিয়াস বাইরে এলেন। সালাম বিনিময় ও করমর্দন করলেন তাঁর সঙ্গে। মুখপাত্র বললেন, আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে এই অবাধ্য ও অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মহাদুরাচার রাজা। এখন যদি আপনি আমার সঙ্গে যেতে সম্মত না হন, তবে সে আমাকে হত্যা করবে। এখন আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনই আদেশ করুন আমাকে। যদি রাজদরবার পরিত্যাগ করে আপনার সঙ্গে থেকে যেতে বলেন, তবে আমি তাই করবো। আর যদি আমার মাধ্যমে ওই দুরাচারকে কোনো সংবাদ দিতে চান, তবে তাও আমি পৌঁছে দিতে প্রস্তুত। আবার যদি চান, আমি আপনার পক্ষাবলম্বী হয়ে রাজদ্রোহী হই,
তবে তা-ও পালন করবো আমি প্রফুল্লচিত্তে। অথবা যদি ইচ্ছা হয়, তবে আপনার মহান প্রভুপালকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হোন, যেনো তিনিই এই জটিল সমস্যা থেকে আমাদের পরিত্রাণের পথকে করে দেন সুগম।

আল্লাহ্ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাঁর প্রিয় নবীকে জানালেন, বাদশাহর সকল পরিকল্পনা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। সে তোমাকে কব্জা করতে চায়। কিন্তু এখনকার এই প্রতিনিধিদলটিকে ফিরিয়ে দিয়ো না। যদি ফিরিয়ে দাও, তবে বাদশাহ তাদেরকে দায়িত্বে অবহেলা করার দায়ে অবিশ্বাস করবে ও হত্যা করে ফেলবে। সুতরাং এবার তুমি রাজদরবারে যাও। বাদশাহ তোমার এবং ওই মুমিনের (মুখপাত্রের) কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি তার পুত্রের রোগ আরো বাড়িয়ে দিবো। শেষে মৃত্যুকেও বিজয়ী করে দিবো তার উপর। ফলে সে এমনভাবে শোকগ্রস্ত হবে যে, অন্য কোনোকিছু আর তার মনেই থাকবে না। সুতরাং বাদশাহপুত্রের মৃত্যুর পর তুমি নির্বিঘ্নে স্বআবাসে আবার ফিরে আসতে পারবে।

হজরত ইলিয়াস নির্ভয়ে নেমে এলেন লোকালয়ে। নিশঙ্কচিত্তে সাক্ষাত করলেন বাদশাহর সঙ্গে। কিন্তু বাদশাহর মনের অবস্থা তখন শোচনীয়। পুত্র মৃত্যুপথযাত্রী। সে পুত্র ছাড়া অন্যদিকে ভালো করে মনোযোগই দিতে পারলো না। কিছুকালের মধ্যেই তার পুত্রবিয়োগ ঘটলো। ফলে আরো বেশী শোকাকুল হয়ে গেলো সে এবং তার অনুচরেরা। মৃতের সৎকার ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলো সকলে। হজরত ইলিয়াস নির্বিঘ্নে ফিরে গেলেন তাঁর আপন ডেরায়।

ক্রমে শোক প্রশমিত হলো। সম্বিত ফিরে এলো তাদের। বাদশাহরও মনে পড়লো, নবী ইলিয়াস তো এসেছিলেন। অথচ তার ব্যাপারে কিছুই করা হলো না। মুখপাত্রকে ডেকে সে এবারে জিজ্ঞাসাবাদ করলো। মুখপাত্র বললেন, রাজপুত্রের বিরহে

আমরা তো সকলেই তখন ছিলাম শোকমগ্ন। জানি না, সবার অলক্ষ্যে কখন যেনো স্থান ত্যাগ করেছেন তিনি। আর একথাও আমার জানা নেই যে, আপনি এখন তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন কিনা।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলো। হজরত ইলিয়াস ভাবলেন, এখন থেকে তার লোকালয়ে বসবাস করাই উত্তম। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতিও মিললো এ ব্যাপারে। তিনি লোকালয়ে নেমে এলেন। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন এক বনী ইসরাইলি রমণীর বাড়ীতে। পরবর্তীতে ওই রমণীই হয়েছিলেন মৎসোদরবাসী নবী ইউনুসের মাতা। নবী ইউনুস তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। প্রায় ছয় মাস ওই বাড়ীতে অতিবাহিত করলেন হজরত ইলিয়াস। ইউনুসজননীর সেবাযত্নে কোনো ত্রুটি ছিলো না। কিন্তু সুদীর্ঘ দিবস ধরে পর্বতের নিভৃত গুহায় বসবাসে অভ্যস্ত হজরত ইলিয়াস লোকালয়ে বসবাস করতে স্বস্তি বোধ করছিলেন না। তাই কাউকে কিছু না জানিয়েই একদিন ফিরে গেলেন তাঁর পাহাড়ী আবাসে।

তিনি চলে যাওয়ায় ইউনুসজননী হয়ে পড়লেন চিন্তিত ও ভীত। কিছুদিনের মধ্যেই দুধ ছাড়ালেন শিশু ইউনুসকে। এর কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হলো শিশুপুত্র। তিনি হয়ে গেলেন উন্মাদিনী প্রায়। হজরত ইলিয়াসকে খুঁজতে বেরুলেন তিনি। অনেক বন-বাদাড়-পাহাড় খুঁজে খুঁজে দেখা পেলেন হজরত ইলিয়াসের । বললেন, আপনি চলে আসার পর থেকেই আমি বিপদাপন্না। আমার শিশুপুত্রটি আর নেই। আমার এই একটিই সন্তান। তার শোক যে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। তাকে আমি দাফন করিনি। তার মৃত্যুসংবাদও কাউকে জানাইনি। এখন আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেনো তাকে পুনর্জীবন দান করেন। হজরত ইলিয়াস বললেন, আমি তো আল্লাহ্‌র আদেশের একান্ত বাধ্যগত দাস। কারো পুনর্জীবনপ্রার্থনার অনুমতি তো আমি পাইনি। ইউনুস জননী আর কিছু বলতে পারলেন না। নীরবে রোদন করতে লাগলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত ইলিয়াসের অন্তরে সৃষ্টি করলেন ইউনুসজননীর জন্য অনাবিল মমতা। তিনি তাই জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, তোমার পুত্রবিয়োগ ঘটেছে কবে? ইউনুসজননী বললেন, সাত দিন আগে। হজরত ইলিয়াস বললেন, চলো বাড়ীর দিকে যাই। দু'জনে পথ চলতে শুরু করলেন। সাতদিন একটানা পথ চলার পর তারা উপস্থিত হলেন ওই বাড়ীতে। হজরত ইলিয়াস ওজু করলেন। পূর্ণ মনোযোগ ও মহব্বতের সঙ্গে নামাজ পাঠ করলেন। তারপর রত হলেন প্রার্থনায়। প্রার্থনা গৃহীত হলো। আল্লাহ্ জীবিত করে দিলেন ইউনুস ইবনে মাতাকে। এরপর সেখানে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলেন না হজরত ইলিয়াস। চলে গেলেন তাঁর সেই পাহাড়ী ডেরায়।

তাফসীরে মাযহারী/১২০

সময় গড়িয়ে চললো। হজরত ইলিয়াস তাঁর পাহাড়ী আবাসে বসে ইবাদত বন্দেগীতে সময় কাটান এবং নিরবচ্ছিন্নরূপে প্রার্থনা করতে থাকেন তাঁর পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের পথ প্রাপ্তির জন্য। কিন্তু তাদের বোধোদয় ঘটে না। রয়ে যায় পূর্ববৎ ভ্রষ্ট ও নষ্ট। হজরত ইলিয়াসের হৃদয় ভরে যায় ব্যাথায়-বেদনায়। এভাবে সাত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন প্রত্যাদেশ হলো— হে ইলিয়াস! তুমি এতো বিষণ্ন হও কেনো? তুমি তো আমা কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি, সুস্পষ্ট প্রত্যাদেশবাহী প্রেরিত পুরুষ। সুতরাং তোমার যা প্রয়োজন তা আমার কাছে চাও। আমি দান করবো। আমি তো অসীম দয়ালু, সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। হজরত ইলিয়াস বললেন, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভুপালয়িতা! তুমি আমাকে মৃত্যু দাও। মিলিয়ে দাও আমাকে আমার সম্মানিত পূর্বপুরুষগণের সঙ্গে। বনী ইসরাইলদের পথভ্রষ্টতা দেখে আমার হৃদয় বেদনা-জর্জরিত। আমিও হয়েছি তাদের চক্ষুশূল। অন্তর্দহনের আগুনে জ্বলছি নিরন্তর। আল্লাহ্ বললেন, সে সময় এখনো আসেনি, যখন তোমার মতো মানুষ থেকে আমি পৃথিবীকে শূন্য করবো। মনে রেখো, তোমার মতো নির্বাচিত জন যারা, তাদের বরকতেই আমি রক্ষা করে চলেছি পৃথিবীর অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব। তাই তোমরা সংখ্যায় কম, কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মৃত্যু নয়, অন্য কিছু চাও। আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবো। হজরত ইলিয়াস বললেন, তাহলে পথভ্রষ্টদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা আমাকে দাও। আল্লাহ্ বললেন, কী রকম? হজরত ইলিয়াস বললেন, আমি চাই সাত বছরের বৃষ্টিপাতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, যেনো আমার অনুমতি ব্যতিরেকে আকাশে মেঘ না জমে। নামেনা এক ফোঁটা বৃষ্টিও। আমি ধারণা করি, এরকম ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে, তারা আমার নির্দেশানুগত না হয়ে পারবে না। আল্লাহ্ জানালেন, ওহে ইলিয়াস! আমি যে আমার সৃষ্টির প্রতি অপরিসীম দয়াপরবশ, তারা পাপে ও অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়া সত্ত্বেও। হজরত ইলিয়াস বললেন, তাহলে বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণাধিকার দাও ছয় বৎসরের। আল্লাহ্ বললেন, তা হয় না। হজরত ইলিয়াস বললেন, তা হলে পাঁচ বৎসরের জন্য। আল্লাহ্ বললেন, এই সময়ও আমার করুণানুকূল নয়। তবে অবাধ্যদের প্রতি প্রতিশোধ প্রয়োগার্থে তোমার নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হলো তিন বৎসরের বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণাধিকার। তুমি ইচ্ছা করলে এবার তিন বৎসর যাবত বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখতে পারো। তিনি বললেন, তাহলে আমি জীবিত থাকবো কীভাবে? আল্লাহ্ জানালেন, একদল পাখিকে আমি তোমার সেবায় নিয়োজিত রাখবো। তারা সুদূরের কোনো সুজলা সুফলা জনপদ থেকে তোমার জন্য বহন করে আনবে ফল-ফসল ও পানীয়। এরপর থেকে বন্ধ হলো বৃষ্টিপাত। মাঠঘাট ফেটে চৌচির হলো। খরায় পুড়ে গেলো তৃণ ও উদ্ভিদ। পানীয় জল ও খাদ্যের অভাবে মরে গেলো গৃহপালিত ও বন্য জীবজন্তুরা। মানুষের জীবনযাপন হয়ে পড়লো দুর্বিষহ। হজরত ইলিয়াস পূর্ববৎ নিজেকে গোপন করে রাখলেন। তাঁর পানাহারের সরবরাহ ছিলো সুনিশ্চিত। কখনো কখনো তিনি নেমে আসতেন সমতলভূমির কোনো একান্ত ভক্তের বাড়িতে।

লোকেরা যখন টের পেতো সেই বাড়ি থেকে রুটির গন্ধ ভেসে আসছে, তখন বুঝতো, নিশ্চয় সেখানে হজরত ইলিয়াসের আগমন ঘটেছে। তখন সেই বাড়িতে হামলা করতো তারা, কিন্তু তাঁকে না পেয়ে দুর্ব্যবহার করতো ওই বাড়িওয়ালার সঙ্গে।

হজরত ইলিয়াস তাঁর মুষ্টিমেয় অনুচরদের মাধ্যমে একথা প্রচার করে দিয়েছিলেন যে, তিন বৎসর ধরে বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে শত চেষ্টা করলেও কেউ দুর্ভিক্ষের কবল থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না। একদিন তিনি এক বৃদ্ধার বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোনো খাদ্যদ্রব্য আছে? বৃদ্ধা বললো, হ্যাঁ। আমার কাছে রয়েছে সামান্য কিছু আটা এবং যৎসামান্য জয়তুন তেল। তিনি বললেন, আমার সামনে সেগুলো হাজির করো। বৃদ্ধা তাই করলো। তিনি সেগুলোর উপরে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার আটার বস্তা আটায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো এবং পূর্ণ হয়ে গেলো তার তেলের পাত্র। তিনি স্থান ত্যাগ করবার পর বরকতময় খাদ্যের গন্ধ পেয়ে লোকেরা জড়ো হলো সেখানে। বৃদ্ধাকে বললো, কী ব্যাপার! এতো কিছু তুমি কোথায় পেলে? বৃদ্ধা খুলে বললো সব। সকলেই তখন বুঝতে পারলো বৃদ্ধার কাছে যিনি এসেছিলেন, তিনি হজরত ইলিয়াস ছাড়া অন্য কেউ নন। তারা তখন হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজতে শুরু করলো। এক স্থানে পেয়েও গেলো তাঁকে। কিন্তু সেখান থেকে অতি দ্রুত পলায়ন করলেন হজরত ইলিয়াস। আশ্রয় নিলেন জনৈকা বনী ইসরাইল মহিলার বাড়ীতে। ওই মহিলা তাঁকে তার গৃহমধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। তার পুত্র আল ইয়াসা ইবনে উখতুব তখন অসুস্থ। হজরত ইলিয়াস তার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করলেন। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেলো এবং হয়ে গেলো হজরত ইলিয়াসের একান্ত অনুরক্ত ও সার্বক্ষণিক সহচর।

কিছুকাল পর প্রত্যাদেশ হলো— হে ইলিয়াস! বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিয়ে তুমি সৃষ্টিকুলকে ধ্বংস করে ফেলছো। ইতোমধ্যেই জীবনহানি ঘটেছে অনেক পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ ও গাছ-পালার। ওরা তো কোনো পাপ করেনি। হজরত ইলিয়াস নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! এবার আমাকে সম্মতি দাও, আমি সকলের জন্য দোয়া করি, যেনো এই চরম সংকট থেকে তারা মুক্তি পায়। হয়তো এবার অংশীবাদী জনতার চৈতন্যোদয় ঘটবে। বুঝতে পারবে সত্যের স্বরূপ। প্রত্যাদেশ হলো, সম্মতি দেওয়া হলো। একথা শোনার পর পর হজরত ইলিয়াস উপস্থিত হলেন জনতার সামনে। বললেন, শোনো হে জনতা! একথা সত্য যে, তোমরা খাদ্যাভাবে কষ্ট পাচ্ছো। কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করো, এ হচ্ছে তোমাদের পাপের ফল। তোমাদের পাপের কারণেই দেখো ইতোমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কতো পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ-তৃণ-উদ্ভিদ। এখনো সময় আছে। বাঁচতে যদি চাও, তবে পরিহার করো পৌত্তলিকতা। ওই মূর্তিগুলো তো জড়প্রতিমা মাত্র। কারো উপকার-অপকার করার ক্ষমতা তাদের এতটুকুও নেই। প্রমাণ যদি চাও, তবে মূর্তিগুলোকে এনে এক জায়গায় জড়ো করো। তাদেরকে বলো, অবসান ঘটাক

বৃষ্টিহীনতার । যদি তা তারা না পারে, তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে তোমরা এতদিন উপাসক ছিলে মিথ্যা মাবুদের। তাই আমি বলি, এই মুহূর্তে পরিত্যাগ করো অংশীবাদিতা। আমি তাহলে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে বৃষ্টিপ্রার্থনা করবো। আশা করি তিনি তোমাদের বিপদাপদ দূর করে দিবেন। জনতা জবাব দিলো, হে ইলিয়াস! আপনি ঠিকই বলেছেন। একথা বলেই তারা তাদের পূজ্যপ্রতিমাগুলোকে এনে এক জায়গায় জড়ো করলো। তাদের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করলো। কিন্তু কোনো সাড়া পেলো না। বাধ্য হয়ে তারা শরণাপন্ন হলো হজরত ইলিয়াসের। হজরত ইলিয়াস দোয়া করলেন। তাঁর সঙ্গে শরীক হলো আলইয়াসা। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিক থেকে উত্থিত হলো এক টুকরা মেঘ। মেঘখণ্ডটি প্রসারিত হতে লাগলো ধীরে ধীরে। অল্পক্ষণের মধ্যে সারা আকাশ ঢেকে গেলো মেঘে। শুরু হলো মুষলধারায় বৃষ্টি। প্রাণ ফিরে পেলো বিশুষ্ক মৃত্তিকা। তা থেকে উদগত হলো তৃণগুল্ম উদ্ভিদ। শুরু হলো শস্যের সম্ভাবনা, সমারোহ। এভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা রক্ষা করলেন ওষ্ঠাগতপ্রাণ বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র এই বিশেষ দানের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো না। গ্রহণ করলো না হজরত ইলিয়াস কর্তৃক আনীত ধর্মমতকে। পুনরায় নিমজ্জিত হলো ঘোর পৌত্তলিকতায়।

হজরত ইলিয়াস মর্মাহত হলেন। নিবেদন জানালেন, হে আমার পরম প্রভুপালক! এই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে এবার আমাকে মুক্তি দাও। জবাব এলো, এতো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ওই নির্দিষ্ট তারিখে অমুক স্থানে গমন কোরো। দেখবে, সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে একটি বাহন। কাল বিলম্ব না করে ওই বাহনে আরোহণ কোরো।

নির্দিষ্ট তারিখ এসে পড়তেই হজরত ইলিয়াস আল ইয়াসাকে সঙ্গে নিয়ে উক্ত স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অকস্মাৎ তাঁর সামনে উপস্থিত হলো একটি অগ্নিবর্ণের ঘোড়া। হজরত ইলিয়াস এক লাফে তার উপর উঠে পড়লেন। ঘোড়াটিও চলতে শুরু করলো সঙ্গে সঙ্গে। আল ইয়াসা চিৎকার করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! আমার জন্য আপনার কী আদেশ? ঘোড়াটি তখন হজরত ইলিয়াসকে নিয়ে মহাশূন্যের দিকে উড়াল দিয়েছে। উড়ন্ত অবস্থায় হজরত ইলিয়াস নিচের দিকে ছুঁড়ে দিলেন একটি স্বলিখিত দলিল। আল ইয়াসা সেটিকে তুলে নিলেন। দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে— তোমাকে বনী ইসরাইলদের পরবর্তী পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছে। দু'জনের মধ্যে সেটাই ছিলো শেষ সাক্ষাত। এরপর আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত ইলিয়াসকে দান করলেন ফেরেশতাদের স্বভাব। পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত করে দিলেন তাঁকে। দান করলেন ফেরেশতাদের মতো উড়ালপ্রবণ ডানা। তিনি হলেন একই সঙ্গে মৃত্তিকানির্মিত মানুষ এবং ডানা বিশিষ্ট আকাশচারী ফেরেশতা।

এদিকে আল্লাহ্‌তায়ালা এক অজ্ঞাত প্রতাপশালী রাজাকে চড়াও করে দিলেন বাদশাহ্ উজুব ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের উপর। ওই রাজা প্রথমেই বাদশাহ্

ও তার পত্নীকে হত্যা করে ফেলে রাখলো শহীদ মাযদাকীর বাগানে। সেখানেই পচে গলে মাটিতে মিশে গেলো তাদের লাশ। আল্লাহ্‌পাক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আলইয়াসাকে জানালেন, তুমিই বনী ইসরাইলদের বর্তমান নবী। এতোদিনে বোধদয় ঘটলো দুর্বিনীত বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীর। এবার তারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলো নতুন নবী আল ইয়াসাকে। তাঁর মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত তারা অনড় রইলো তাঁর আনীত ধর্মাদর্শের উপর।

আবদুল আজিজ ইবনে আবু দারদার উদ্ধৃতি দিয়ে সারাই ইবনে ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইলিয়াস এবং হজরত খিজির বায়তুল মাকদিসে উপস্থিত হয়ে প্রতি রমজানে রোজা রাখেন এবং একে অপরের সঙ্গে মিলিত হন হজের সময়ে। এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, হজরত ইলিয়াস বিরাণ মরুভূমির জনশূন্য অরণ্যের এবং হজরত খিজির সমুদ্রের দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ একজন পথ দেখান মরুচারী ও অরণ্যচারী বিভ্রান্ত পথিককে এবং বিপন্ন সমুদ্রচারীকে উদ্ধার করেন অপর জন।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, তোমরা কি সাবধান হবে না (১২৪)? তোমরা কি বাআলকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা— (১২৫) আল্লাহ্‌কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের— প্রতিপালক তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদের' (১২৬)।

উল্লেখ্য, ওই সময়ের বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠী পূজা করতো 'বাআল' নামক এক বৃহৎ প্রতিমার। তার নামেই তাদের জনপদের নাম রাখা হয়েছিলো 'বাআলবাক'। মুজাহিদ, ইকরামা ও কাতাদা বলেছেন, ইয়ামিনী ভাষায় 'বাআল' অর্থ প্রতিপালক।

এরপরের আয়াতে (১২৭) বলা হয়েছে— 'কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে'।

এখানে 'মুহ্দ্বরূন' এর আক্ষরিক অর্থ ডেকে পাঠানো হবে। তবে এখানকার বাকভঙ্গি একথাই প্রমাণ করে যে, তাদেরকে তখন উপস্থিত করানো হবে শাস্তি প্রদানের জন্য। অর্থাৎ 'ইহ্দ্বর' অর্থ ডেকে পাঠানো হলেও এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শাস্তি প্রদানার্থে নিকৃষ্ট স্থানে সমবেত করানোকে।

এরপরের আয়াতে (১২৮) বলা হয়েছে— 'তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

আগের আয়াতের 'কাজ্জাবু' শব্দের বহুপদী সর্বনাম থেকে একথাটি পৃথক। কিন্তু 'আল মুহ্দ্বরূন' (উপস্থিত করা হবে) কথাটি থেকে পৃথক নয়। নতুবা কথাটির অর্থ বাকরীতিসিদ্ধ হবে না। কেননা 'আলমুহ্দ্বরূন' এর উদ্দেশ্য শাস্তির জন্য হাজির করানো লোকজন। কারো কারো মতে পৃথকীকরণবোধক শব্দ এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে 'আলমুহ্দ্বরূন' কথাটি শুরু থেকেই পৃথক। এর উদ্দেশ্য কিছু মন্দ লোক যারা আল্লাহ্‌র নবীকে মিথ্যা বলেছিলো। রূপক অর্থে

অবশ্য সকল ধরনের লোকই কথাটির উদ্দেশ্য। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'কাফেলার সব লোক চোর ছিলো না, কিন্তু আহ্বানকারী সবাইকে চোর বলেছে'। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— মিথ্যাচারীদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য সমবেত করা হবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ দাস, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা থাকবে সতত শাস্তিমুক্ত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি (১২৯)। ইল্য়াসিনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক'(১৩০)। একথার অর্থ— আমি আমার প্রিয় নবী ইলিয়াসের বৃত্তান্তকেও পরবর্তী যুগের মানুষের স্মৃতিতে জীবন্ত করে রেখেছি। তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক অফুরন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা।

এখানে 'ইল্ইয়াসিন' বলে হজরত ইলিয়াসকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'ইল্ইয়াসিন' অর্থ এখানে ইলিয়াস। যেমন 'সিনীন' অর্থ সিনাই, 'সমাইন' অর্থ 'ইসমাইল', 'মিকাইন' অর্থ মিকাইল। ফাররা বলেছেন, 'ইল্ইয়াসিন' হচ্ছে 'ইলিয়াস' এর বহুবচন। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে 'ইল্ইয়াসিন' বলে বোঝানো হয়েছে হজরত ইলিয়াস ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরবর্গকে। অথবা কেবল ইলিয়াস অনুসারীগণকে। যেমন 'আশয়ারীন' অর্থ আশায়েরা মতাবলম্বীগণ।

ক্বারী ইবনে আমের ও ক্বারী নাফে' এর উচ্চারণে 'আল' ও 'ইয়াসিন' এসেছে পৃথকভাবে। এভাবে মিলিত, অথচ পৃথক উচ্চারণ করলে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— ইয়াসিনের পুত্রের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এমতোক্ষেত্রে 'ইয়াসিন' হবে হজরত ইলিয়াসের পিতার নাম। আবার এরকম হওয়াও সম্ভব যে, 'ইলিয়াস' এরই অপর নাম 'আলইয়াসিন'। এমতাবস্থায় 'আলইয়াসিন' এর উদ্দেশ্য হবে, ইলিয়াসের বিশ্বাসী সঙ্গীগণ। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, এখানে 'ইয়াসিন' অর্থ রসুলেপাক স. অথবা কোরআন মজীদ, কিংবা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত অন্য কোনো কিতাব। কিন্তু এমতো অর্থ এখানে

কিছুতেই প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ এখানে একের পর এক ক্রমাগত বর্ণিত হচ্ছে নবী-রসুলগণের বৃত্তান্ত। হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ তাই অবান্তর। পূর্বাপর বক্তব্যের যোগসূত্রটিও তাহলে আর থাকে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি (১৩১)। সে ছিলো আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম' (১৩২)। একথার অর্থ— নবী ইলিয়াসকে আমি যেভাবে অনুগৃহীত করেছিলাম, সেভাবেই আমি অনুগৃহীত করে থাকি অপরাপর পুণ্যবানগণকে। আর নিঃসন্দেহে ইলিয়াস ছিলো আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী দাসগণের অন্যতম। উল্লেখ্য, এখানে 'ইন্নাহু' কথাটির 'হু' (সে) বলে যে হজরত ইলিয়াসকেই বুঝানো হয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ আয়াত ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮

- লূতও ছিলো রাসূলদের একজন।
- আমি তাহাকে এবং তাহার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম—
- এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিলো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।
- অতঃপর অবশিষ্টদিগকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়াছিলাম।
- তোমরা তো উহাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করিয়া থাকো সকালে ও
- সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

আলোচ্য আয়াতষষ্ঠকের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার শুনুন লুতের ইতিবৃত্ত। লুতও ছিলো আমা কর্তৃক প্রেরিত এক রসুল। পাপিষ্ঠ সাদুমবাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি তাকে প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তার আহ্বানে তারা সাড়া দেয়নি। পাপমগ্ন রয়ে গিয়েছিলো পূর্ববৎ। লুতের শত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন তাদের চৈতন্যোদয় হলো না, তখন আমি তাদের উপরে আপতিত করলাম সর্বগ্রাসী আযাব। আর ওই আযাব থেকে আমি অবশ্যই রক্ষা করেছি আমার প্রিয় নবী লুতকে এবং তার পরিবারের অন্যান্য বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীকে। কেবল ওই বৃদ্ধাকে নয়, যে তার পরিবারভূত হওয়া সত্ত্বেও ছিলো পাপিষ্ঠদের অনুরাগিণী। আযাবের স্থান থেকে অন্যত্র গমনের নির্দেশ যখন আমি আমার নবী লুতকে দিলাম, তখন সে তার পরিবার পরিজন নিয়ে প্রভাতের পূর্বেই যাত্রা করলো স্থানান্তরে। কিন্তু ওই বৃদ্ধা, যে তার স্ত্রী হলেও ছিলো অবিশ্বাসিনী, সে রয়ে গেলো পশ্চাতে। ফলে পাপিষ্ঠ সাদুমবাসীদের সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হলো চিরতরে। আমি তাদের সকলকে এবং তাদের জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছি। হে মক্কার অংশীবাদীরা! তোমরা তো বাণিজ্য ব্যপদেশে প্রায়শঃই সাদুমবাসীদের ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের পাশ দিয়ে গমনাগমন করো। প্রত্যক্ষ করো আল্লাহ্‌র ক্রোধের নির্মম নিদর্শন। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? সত্য বলে স্বীকার করবে না আমা কর্তৃক প্রেরিত রসুল মোহাম্মদ মোস্তফাকে? তাঁর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশাবলীকে?

এখানে 'ইজ্‌ নাজ্জাইনাহু ওয়া আহ্‌লাহু আজ্‌মায়ীন' অর্থ আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম। 'ইল্‌লা আজুযা' অর্থ এক বৃদ্ধা ব্যতীত। উল্লেখ্য, ওই বৃদ্ধা ছিলো হজরত লুতের স্ত্রী। সে ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারিণী। সেও ধ্বংস হয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সাদুম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে।

'ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করে থাকো' অর্থ— হে মক্কাবাসীরা! তোমরা যখন সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যাও, তখন তোমাদের পথের পাশেই পড়ে সাদুমবাসীদের

বিধ্বস্ত জনপদ। 'সকালে ও সন্ধ্যায়' অর্থ— তোমরা ওই বিরাণ জনপদ কখনো অতিক্রম করো রাতে, কখনো প্রাতে। অর্থাৎ এক এক সফরে এক এক সময়ে।

'আফালা তা'ক্বিলূন' অর্থ তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? অর্থাৎ তোমরা কি একেবারেই জ্ঞানবুদ্ধিরহিত যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানের ভয়াবহ পরিণতির প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও সাবধান হবে না? গ্রহণ করবে না সত্যধর্ম ইসলামকে? আলোচ্য বাক্যটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি এক চরম সাবধানবাণী, কঠিন হুমকি।

❑ ইউনূসও ছিলো রসূলদের একজন।
❑ স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করিয়া বোঝাই নৌযানে পৌঁছিল,
❑ অতঃপর সে লটারিতে যোগদান করিল এবং পরাভূত হইল।
❑ পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।
❑ সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করিত,
❑ তাহা হইলে তাহাকে উত্থান দিবস পর্যন্ত থাকিতে হইত উহার উদরে।
❑ অতঃপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করিলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।
❑ পরে আমি তাহার উপর এক লাউ গাছ উদ্গত করিলাম,
❑ তাহাকে আমি এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম।
❑ এবং তাহারা ঈমান আনিয়াছিল; ফলে আমি তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।

এখান থেকে শুরু হয়েছে নবী ইউনুসের ইতিবৃত্ত। প্রথমে বলা হয়েছে— **'ইউনুসও ছিলো রসুলদের একজন'**। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আরো শুনুন ইউনুসের ইতিকাহিনী। ইউনুসও ছিলো আমা কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রেরিত রসুলগণের একজন।

পরের আয়াতে (১৪০) বলা হয়েছে— **'স্মরণ করো, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছুলো'**। এখানে **'আবাক্বা'** এর আক্ষরিক অর্থ— প্রভুর কাছ থেকে ক্রীতদাসের পলায়ন। এরকম বলা হয়েছে এ কারণে যে, হজরত ইউনুস ভুল সিদ্ধান্তক্রমে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে গোপনে চলে এসেছিলেন তাঁর জনপদবাসীদের কাছ থেকে। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্য কোনো দেশে চলে যাবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন নৌ ঘাটে। উঠে বসেছিলেন যাত্রী বোঝাই একটি নৌকায়।

ইমাম আহমদ তাঁর **'জুহুদ'** গ্রন্থে , আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির আবদুর রাজ্জাক তাউসের বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন, হজরত ইউনুস তাঁর জনপদবাসীদেরকে সত্যধর্মের প্রতি আহ্বান জানান। বলেন, সত্যপ্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহ্‌র শাস্তি অনিবার্য। একবার তিনি প্রত্যাদেশানুসারে সকলকে আযাব আপতিত হওয়ার নির্দিষ্ট দিন ক্ষণ জানিয়ে দিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই লোকেরা শুরু করে দিলো রোদন। ক্ষমাপ্রার্থী হলো বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে। ফলে আল্লাহ্ তাঁর আযাব প্রত্যাহার করলেন। হজরত ইউনুস ভাবলেন, এবার তিনি মানুষের সামনে প্রমাণিত হবেন অসত্যাচারী বলে। তাই তিনি মনস্থ করলেন, অন্যত্র পালিয়ে যাবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। পৌঁছলেন সমুদ্রতীরের এক নৌ ঘাটে। একটি যাত্রীবোঝাই নৌকা দেখতে পেয়ে উঠে পড়লেন। নৌকা ছেড়ে দেওয়া হলো। চলতে চলতে মাঝ দরিয়ায় এসে নৌকা আড়াআড়ি অবস্থায় থেমে গেলো। মাঝিরা বললো, নিশ্চয় নৌকায় রয়েছে কোনো পলাতক গোলাম। কে সেই পলাতক গোলাম তা নির্ণয়ের জন্য তারা লটারীর আয়োজন করলো। পর পর তিন লটারীতেই উঠে এলো হজরত ইউনুসের নাম।

এরপরের আয়াতে (১৪১) তাই বলা হয়েছে— **'অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করলো এবং পরাভূত হলো'**।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস এবং ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহের বর্ণনায় এসেছে, লোকেরা লটারীর গুটি চালনা করেছিলো তিনবার। আর তিনবারই উঠে এসেছিলো হজরত ইউনুসের নাম। তিনি আরো লিখেছেন, হজরত ইউনুস সমুদ্রতীরে

পৌঁছলেন তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে। যাত্রী বোঝাই নৌকাটিতে প্রথমে উঠতে গেলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু হঠাৎ একটি প্রচণ্ড ঢেউ এসে
তাঁকে নিয়ে গেলো সমুদ্রাভ্যন্তরে। বড় ছেলে অগ্রসর হতেই তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আর একটি ভয়ংকর ঢেউ। তীরে দাঁড়ানো ছোট ছেলেটিকেও অকস্মাৎ ধরে নিয়ে গেলো একটি হিংস্র বাঘ। হজরত ইউনুস তখন গিয়ে উঠলেন আর একটি

তাফসীরে মাযহারী/১২৮

মাটি নিক্ষেপ করতে করতে বললেন, দাউদ ধ্বংস হয়ে যাবে সেইদিন, যেদিন ঝুলানো হবে ন্যায়বিচারের পাল্লা। তিনি যে মহাবিচারকর্তা! তিনি যে পবিত্র নূরের স্রষ্টা। হায়! বিনাশ হবে, সবচেয়ে বেশী বিনাশ হবে দাউদের, যখন তাকে ঘাড় ধরে সোপর্দ করা হবে অত্যাচারিতের অধিকারে। আর কুঞ্চিতমুখ করে টেনে হিঁচড়ে তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে পাপিষ্ঠদের সঙ্গে। তিনিই পবিত্র। তিনিই মহামহিম। তিনিই পুতঃপবিত্র নূরের সৃজয়িতা।

আকাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। অবিশ্রান্ত রোদনের কারণে কবুল করেছি তোমার প্রার্থনা। তিনি নিবেদন করলেন, কিন্তু যার অধিকার আমি খর্ব করেছি, তোমার সেই বান্দা তো আমাকে ক্ষমা করলো না। পুনঃ আওয়াজ ধ্বনিত হলো, বিচারের দিন আমি তাকে দিবো অনেক অনেক পুণ্য ও প্রতিদান, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। বলবো, তুমি আমার নবী দাউদের উপরে কি এখনো অপ্রসন্ন? সে বলবে, কিন্তু আমি জানতে চাই এতো বিশাল পুণ্যের অধিকারী আমি হলাম কী করে? আমি তো সেরকম কোনো পুণ্যকর্ম করিনি। আমি বলবো, আমার প্রিয়ভাজন দাউদের কারণেই তোমাকে এতো কিছু দেওয়া হয়েছে। এখন তোমার উচিত তাকে দায়মুক্ত করা। একথা শুনে সে তোমাকে মাফ করে দিবে।

এখানে 'খর্‌রা রকিয়া' অর্থ নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো। অর্থাৎ তখন হজরত দাউদ লুটিয়ে পড়লেন সেজদায়। এখানে 'রুকু' অর্থ সেজদা। কেননা রুকু হচ্ছে সেজদার সূচনা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হজরত দাউদ তখন রুকু অবস্থায় সেজদা আদায় করেছিলেন। অর্থাৎ ইস্‌তেগফারের (ক্ষমাপ্রার্থনার) নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করা অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলেন সেজদায়। হানাফীগণ তাই বলেন, সেজদার আয়াত শুনে কেউ যদি রুকু করে, তবুও তার তেলাওয়াতের সেজদা আদায় হয়ে যাবে। কেননা এখানে 'রুকু' অর্থ সেজদা। আর তেলাওয়াতের সেজদার মূল উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাই এমতোক্ষেত্রে রুকু করলেও সেজদা আদায় হয়ে যাবে। কারণ সম্মান প্রদর্শন করা যায় রুকু ও সেজদা উভয়টির দ্বারা।

এমতোক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অর্থ হবে— আল্লাহ্‌কে যাঁরা সম্মান করেন তাঁদের অনুসারী হয়ে যাওয়া। অথবা যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অহংকার করে তাদের শত্রু হয়ে যাওয়া। তুল্যমূল্যতার (কিয়াসের) দাবি এটাই।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, সেজদার আয়াত পাঠ করার পরক্ষণে কেবল রুকু করলে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা অধিকতর সূক্ষ্ম কিয়াস এটাই দাবি করে যে, সম্মান প্রদর্শন ওয়াজিব হলে তা সেজদার আকারে প্রদর্শন করাও হয় ওয়াজিব। সেকারণেই সকলে এব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নামাজের মধ্যে কোরআন পাঠ করার সময় সেজদার আয়াত এসে গেলে, তা পাঠ করার পরক্ষণে সেজদায় পতিত হয়ে তেলাওয়াতের ওয়াজিব সেজদা আদায় করতে হবে। তখন রুকুর মাধ্যমে তেলাওয়াতের সেজদা আদায় হবে না।

অবশিষ্ট রইলো আলোচ্য আয়াতের 'রুকু' সম্পর্কে। এখানে অবশ্য 'রুকু'র রূপক অর্থ সেজদাই গ্রহণীয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে রূপক ও বাস্তবের এমতো অর্থান্তর সঙ্গত ও শুদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা কিন্তু এখানে সূক্ষ্ম যুক্তি অপেক্ষা প্রকাশ্য যুক্তিকেই অধিকতর প্রাধান্য প্রদান করেছেন। কেননা প্রকাশ্য যুক্তি ও তুল্যমূল্যতার প্রভাব কম ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। হাদিস শরীফের মাধ্যমেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত ইবনে ওমর নামাজ পাঠকালে সেজদার আয়াত পাঠ করে ফেললে রুকু করে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন। অন্য কোনো সাহাবী তাদের এরকম আমলের প্রতি ভিন্নমত ব্যক্ত করেননি। এতে করে বুঝা যায়, বিষয়টি ঐকমত্যসম্মত।

উল্লেখ্য, সূক্ষ্ম কিয়াস কেবল সূক্ষ্মতার কারণেই প্রকাশ্য কিয়াসের উপরে প্রাধান্য প্রাপ্তির যোগ্য নয়। আবার প্রকাশ্য কিয়াসও নয় কেবল প্রকাশসর্বস্ব। বরং এমতো প্রাধান্যের কারণ নির্ণীত হয়ে থাকে ভিন্নতর প্রেক্ষিতে। উসুলে ফেকাহ্ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আর এখানে বিষয়টি তেমন প্রাসঙ্গিকও নয়। তবে এতোটুকু কেবল বলা যেতে পারে যে, সূক্ষ্ম কিয়াসের বিষয়গত সীমাবদ্ধতা নেই।

মাসআলা ঃ সেজদার আয়াত পাঠ করার পরক্ষণে যদি রুকু করা হয় এবং তখন তেলাওয়াতের সেজদার নিয়ত যদি না-ও করা হয়, তবুও তাতে করে নামাজের সেজদার সাথে সাথে তেলাওয়াতের সেজদাও আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এরকম যদি করা হয় সেজদার আয়াতের পরের আরো দু' একটি আয়াত পাঠ করার পর, তবে তাতে করেও নামাজের সেজদার সাথে সাথে তেলাওয়াতের সেজদাও আদায় হয়ে যাবে। এরকম বলেন ইমাম আবু হানিফা। কিন্তু অন্য ইমামত্রয় বলেন, এভাবে তেলাওয়াতের সেজদা আদায় হবে না, চাই এর মধ্যে তেলাওয়াতের সেজদা থাকুক অথবা না থাকুক।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফার মতে নামাজে থাকা অবস্থাতেই তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করা ওয়াজিব। অন্যান্য হানাফীগণও এই অভিমতের প্রবক্তা।

মোহাম্মদ ইবনে আসলাম বলেন, নামাজের নির্ধারিত সেজদাকে তেলাওয়াতের সেজদা হিসেবে গণ্য করা সূক্ষ্ম কিয়াসের পরিপন্থী। কেননা নামাজের অঙ্গরূপে নির্ধারিত সেজদা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফরজ, যা অন্য কোনো সেজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না, যেমন রমজানের ফরজ রোজা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না অন্য কোনো কাজা হয়ে যাওয়া রোজার। এমতোক্ষেত্রে প্রকাশ্য কিয়াসই সূক্ষ্ম কিয়াস অপেক্ষা অধিকতর প্রাধান্য প্রাপ্তির যোগ্য, যদিও রুকুকে তেলাওয়াতের সেজদার স্থলাভিষিক্ত ভাবা কিয়াসের পরিপন্থী। আর একথাও স্পষ্ট যে, এমতোক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতেই বিষয়টির বিধিসম্মত বৈধতা নিরূপণ করা হয়েছে।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেন, সুরা 'সোয়াদ' এর আয়াত পাঠ করলে সেজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম মালেক আবার তেলাওয়াতের সিজদাকে বলেছেন সুন্নত, ওয়াজিব বলেননি। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, তেলাওয়াতের সেজদা মূলতঃ কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক এবং নামাজের মধ্যে এ সেজদা আদায়ের অবকাশ নেই। আর নামাজের বাইরে তেলাওয়াতের সেজদা মোস্তাহাব।

ইবনে জাওজী বলেছেন, তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব নয়। তাঁর অভিমতের পরিপোষকরূপে তিনি বর্ণনা করেছেন এই হাদিস— হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমি রসুল স.কে সুরা 'সোয়াদ' এর এই আয়াত পাঠ করার পর সেজদা করতে দেখেছি। কিন্তু তা ওয়াজিব সেজদার মধ্যে পরিগণিত নয়। ইবনে জাওজী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি সূত্রে এবং তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। আমি বলি, বোখারী তাঁর 'বিশুদ্ধ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সুরা সোয়াদের সেজদা ওয়াজিব সেজদার মধ্যে গণ্য নয়। আমি অবশ্য রসুল স.কে এই সেজদা করতে দেখেছি। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি সুরা 'সোয়াদে'র সেজদা করবো? তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'ফাবি হুদাহু মুক্বতাদিহ্' থেকে 'ওয়া মিন জুররিয়্যাতিহী দাঊদা ও সুলায়মানা' পর্যন্ত পাঠ করে বললেন, তোমাদের রসুল তাঁর পূর্বসূরী নবী রসুলগণের অনুসরণের জন্য আদিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাসের এই বর্ণনাটির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এখানকার সেজদা রসুল স. এর উপরেও ছিলো ওয়াজিব। এটাই আমাদের জন্য প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যার উপর আমল করা হয়। সুতরাং বুঝতে হবে, ইতোপূর্বে বর্ণিত 'এই সেজদা ওয়াজিব সেজদারূপে গণ্য নয়' কথাটি হয়ে গিয়েছে রহিত, অথবা বিলুপ্ত। আর পরের বিবরণটি সর্বোন্নত পর্যায়ের। এখানে রসুল স. নিজে সেজদা করতেন বলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

ইবনে জাওজী আরো উল্লেখ করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, একদিন রসুল স. আমাদেরকে ডেকে একত্র করলেন। পাঠ করে শোনালেন সুরা সোয়াদ। যখন এই আয়াত পড়া শেষ করলেন, তখন মিম্বার থেকে নেমে এসে সেজদা করলেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও সেজদা করলাম। এরপর পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করে শুরু করলেন বক্তৃতা। একস্থানে এসে পুনঃ পাঠ করলেন এই আয়াত। আমরা তখন সেজদা করার জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে শুরু করলাম। তিনি স. বললেন, এ হচ্ছে একজন নবীর ক্ষমাপ্রার্থনার সেজদা। কিন্তু তোমরা তো দেখছি এ সেজদা করতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পড়লে। একথা বলার পর তিনি মিম্বার থেকে নেমে এলেন। তারপর সেজদা করলেন। আমরাও সেজদা করলাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। দারাকুতনী হাদিসটির বর্ণনাকারী। হাদিসটিতে অবশ্য আমাদের অভিমতের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। বরং হাদিসটি আমাদের অভিমতের অনুকূলেই। এখানে এতোটুকুই কেবল অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য যে, সেজদার আয়াত

পাঠকালে সাধারণতঃ সেজদা ওয়াজিব নয়, বরং তা সুন্নত। আর আমাদের কাছে ফতোয়া হিসেবে এটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অবশ্য হানাফীগণের মধ্যে তাহতাবীর বিবরণ ইমাম আবু হানিফার বিবরণের পরিপন্থী। অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা বলেন, তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব এবং হানাফী মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম তাহতাবী বলেন, তেলাওয়াতের সেজদা সুন্নত। অবশ্য আমাদের পক্ষে রয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. সুরা সোয়াদ পাঠকালে সেজদা করেছেন। দারাকুতনী সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জাওজী। হজরত আবু সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের বিবরণও তো এরকমই। অর্থাৎ সেখানেও বলা হয়েছে রসুল স. এর সেজদা করার কথা। তাহাবী, আবু দাউদ, হাকেম।

বায়হাকী বলেছেন, বহুসংখ্যক সাহাবী সুরা সোয়াদ এর সেজদা করেছেন। ফাযের ইবনে ইয়াজিদ বলেছেন, আমি একবার হজরত ওমরের পিছনে দাঁড়িয়ে ফজরের নামাজ পড়লাম। তিনি সুরা সোয়াদ পাঠ করলেন এবং সেজদার স্থানে সেজদা করলেন। নামাজ শেষে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! এই তেলাওয়াতের সেজদা কি ওয়াজিব? তিনি বললেন, রসুল স. এরকম করেছেন। আবু মরিয়ম বলেছেন, হজরত ওমর একবার সিরিয়ায় এলেন। সেখানে তিনি হজরত দাউদের ইবাদতখানায় গিয়ে নামাজ পাঠ করলেন। সুরা সোয়াদ এবং সেজদার আয়াত পাঠ করার পর সেজদা করলেন।

হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. সুরা সোয়াদ পাঠকালে সেজদা করেছেন এবং বলেছেন, নবী দাউদ সেজদা করেছেন ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য, আর আমরা সেজদা করি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে। এই হাদিসটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ ইবনে মোহাম্মদ থেকে ওমর ইবনে জাররের সূত্রপরম্পরায় এবং দারাকুতনী ও ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'উম্' নামক গ্রন্থে ইবনে উয়াইনা— আইয়ুব—ইকরামা—হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে সরাসরি রসুল স. থেকে। হাদিসটির অপর সূত্রপরম্পরা এরকম ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে বযঈ—ওমর ইবনে জর—জর—সাঈদ ইবনে যোবায়ের—হজরত ইবনে আব্বাস—রসুলে পাক স.। কিন্তু ইবনে বযঈর কারণে এই সূত্রপরম্পরাটি ত্রুটিপূর্ণ ও সমালোচিত। ইবনে সাকান হাদিসটিকে সনাক্ত করেছেন যথাসূত্রসম্বলিতরূপে। কিন্তু ইবনে আদী বলেছেন, বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনে হাজারের অভিমতও এরকম। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এর দ্বারা বড় জোর এতোটুকুই বুঝা যায় যে, রসুল স. নবী দাউদের সেজদার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন এবং হেতু বর্ণনা করেছেন আমাদের সেজদা করার। অর্থাৎ আমাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশই এই সেজদা করার হেতু। আর এতে করে এই সেজদার ওয়াজিব হওয়াও অপ্রমাণিত থাকে না। কেননা সকল ফরজ ও ওয়াজিব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ইমাম আবু হানিফা তার 'মসনদ' গ্রন্থে হজরত আবু মুসা আশয়ারী—ইয়াজ আশয়ারী—সাম্মাক ইবনে হারব সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সুরা সোয়াদে সেজদা করেছেন। বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ মাজানী থেকে প্রাপ্ত সূত্রানুসারে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, সুরা সোয়াদ লিপিবদ্ধ করছি। যখন সেজদার আয়াত লিপিবদ্ধ করতে গেলাম, তখন দেখলাম আমার দোয়াত কলম ও সামনে রক্ষিত অন্যান্য সামগ্রী উল্টে পড়ে গেলো। আমি এই স্বপ্নটির বৃত্তান্ত রসুল স.কে জানালাম। কিন্তু তিনি একথা শুনে সেজদা করলেন না। ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এতে করে বুঝা যায়, সুরা সোয়াদের সেজদার আয়াত অন্য সকল সেজদার আয়াতের মতোই বাধ্যতামূলকরূপে পরিগণিত হয় এবং তা বহালও থাকে। ইতোপূর্বে তা বাধ্যতামূলক ছিলো না। এতে করে আরো জানা যায় যে, ইতোপূর্বে বর্ণিত হজরত আবু সাঈদের বর্ণনাটি ছিলো এই ঘটনারও আগের।

পরিচ্ছেদঃ হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এক লোক একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! বিগত রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছি। আমি যখন সেজদা করলাম, তখন বিস্মিত হয়ে দেখলাম, গাছটিও আমার সঙ্গে সেজদা করলো এবং বললো, হে আমার প্রভুপালয়িতা! আমার জন্য এই সেজদাকে তুমি প্রতিদানের নিমিত্ত করো, এর কারণে বিলুপ্ত করো আমার পাপরাশি, আমার জন্য একে তুমি সংরক্ষণ করো তোমার সকাশে এবং এ সেজদা তুমি দয়া করে গ্রহণ করো, যেমন করে তুমি সেজদা গ্রহণ করেছিলে তোমার প্রিয় নবী দাউদের। আমি দেখলাম, এই বৃত্তান্ত শোনার পর রসুল স. সুরা সোয়াদের সেজদার আয়াত পাঠ করলেন এবং সেজদাও করলেন। তারপর ওই কথাগুলোও উচ্চারণ করলেন, যেগুলো উচ্চারণ করেছিলো ওই গাছটি। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে সনাক্ত করেছেন 'দুষ্প্রাপ্য'রূপে। ইবনে হাব্বান, হাকেম ও ইবনে মাজাও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় 'এ সেজদা তুমি দয়া করে গ্রহণ করো, যেমন করে তুমি সেজদা গ্রহণ করেছিলে তোমার প্রিয় নবী দাউদের' কথাটুকু নেই।

নিদর্শনা ঃ এই আয়াত যাঁরা আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সিজদা করে নিন।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম'।

এখানে 'লা যুলফা' অর্থ বর্ণনাতীত নৈকট্যের মর্যাদা। অর্থাৎ এমন নিরুপম নৈকট্য ও উচ্চ মর্যাদা যা নবী দাউদ লাভ করেছিলেন বিশুদ্ধ অনুতাপ ও ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে, বর্ণিত ভুল না করলে সে মর্যাদা তিনি কিছুতেই লাভ করতে পারতেন না। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে শব্দটির অর্থ হবে— ইহকালের প্রভূত কল্যাণ এবং পরকালের সমুচ্চ সম্মান।

'মাআব' অর্থ শুভ পরিণাম, যে পরিণামের দিকে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন।

আমি বলি, হজরত দাউদ উরিয়ার মৃত্যু কামনা করতেন এবং সেজন্য বার বার তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতেন— এ সকল কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন এক নবীর প্রতি এ হচ্ছে নির্জলা অপবাদ। তিনি এমতো অপবাদ থেকে পবিত্র ছিলেন। কোরআন মজীদের বিবরণ থেকে কেবল এতোটুকুই জানা যায় যে, তিনি তাঁর অধীনস্থ কারো স্ত্রীকে বিবাহ করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আগ্রহ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তৎপূর্বেই আল্লাহ্ তাঁকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বাদী-বিবাদীরূপে পাঠিয়েছিলেন দু'জন ফেরেশতাকে। সাথে সাথে তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন এবং অনুতাপজর্জরিত হৃদয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন মহান আল্লাহ্ সকাশে।

'মাদারেক' রচয়িতা লিখেছেন, হজরত দাউদের সময়ের সাধারণ রীতি এই ছিলো যে, কেউ কারো স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাইলে তাকে সরাসরি তালাক দিতে বলতে পারতো। এরকম প্রস্তাব তখন দূষণীয় ছিলো না। মদীনার কোনো কোনো আনসার সাহাবী মক্কার কোনো কোনো মুহাজির সাহাবীর জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। এটা ছিলো তাঁদের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ও প্রিয়ভাজনতার চরম বহিঃপ্রকাশ। হজরত দাউদ ঘটনাক্রমে উরিয়ার স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর প্রচলিত রীতি অনুসারেই তাঁকে তালাক দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উরিয়াও হয়তো নবীর প্রতি যথাবিনয়বশতঃ সে প্রস্তাবে অসম্মত হতে পারেননি। তালাক দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। আর হজরত দাউদও তাঁর মুক্ত স্ত্রীকে পরিণয়াবদ্ধ করেছিলেন শরিয়ত সম্মতরূপে।

আমি মনে করি, হজরত দাউদ তখন সেরকম পদ্ধতি অবলম্বন করেননি, যেরকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন আমাদের রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স.। তিনি তো হজরত জায়েদের স্ত্রী হজরত জয়নবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারো কাছে তা প্রকাশ করেননি। বরং হজরত জায়েদকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হজরত জায়েদ তাঁর স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে পারেননি এবং রসুল স.ও পারেননি হজরত জয়নবকে বিবাহ না করে থাকতে। কারণ এটা ছিলো আল্লাহ্‌তায়ালার পরিকল্পনা ও পবিত্র অভিপ্রায়। উল্লেখ্য, হজরত দাউদ এরকম পদ্ধতি গ্রহণ করলে হয়তো আল্লাহ্ কর্তৃক ভর্ৎসিত হতেন না। তিনি তো আল্লাহর ইঙ্গিতের অপেক্ষা না করে নিজে নিজেই বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কোরআন মজীদের বিবরণে এরকমই উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্যই তো আগন্তুক বাদী-বিবাদীর একজন অপরজনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিলো যে, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা। তবুও সে বলে, 'আমার জিম্মায় এইটি দিয়ে দাও'। সে এরকম বলেনি যে, এ লোক আমাকে হত্যা করতে চায়। হজরত দাউদও একথার উত্তরে তাকে জানিয়েছিলেন, 'তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সঙ্গে যুক্ত করবার দাবি করে সে তোমার উপর জুলুম করেছে'। এরকম বলেননি যে, সে তোমাকে

হত্যা করতে চেয়ে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। সুতরাং হজরত দাউদ উরিয়াকে মেরে ফেলার জন্য বার বার তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন— এরকম অপবাদ হজরত দাউদের উপরে বর্তায় না। একজন নবীর পক্ষে এরকম করা শোভনও নয়। তিনি কেবল বিবাহ করবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। আর এরকম বাসনা প্রকাশ শরিয়তসিদ্ধ হলেও একজন নবীর পক্ষে ছিলো অশোভন। আর ওই অশোভনতা অপনোদনার্থেই আল্লাহ্ তাঁর কাছে প্রেরণ করেছিলেন ছদ্মবেশী ফেরেশতাদ্বয়কে। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সচেতন হয়েছিলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন অনুতপ্ত হয়ে। 'নৈকট্যের মর্যাদা' ও 'শুভপরিণাম'ও লাভ করেছিলেন অবশেষে। এরকম ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত ও নবুয়তের মহান মর্যাদার অনুকূল। আল্লাহ্‌তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত।

বাগবী লিখেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ্ বলেছেন, সানুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থনা আল্লাহ্ কর্তৃক সর্বোত্তম বিনিময়ের মাধ্যমে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও হজরত দাউদ প্রায়শঃই রোদন করতেন। প্রায় সারাক্ষণ তাঁর নয়ন থাকতো অশ্রুসিক্ত। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো সত্তর বৎসর। আর এই ঘটনার পর তিনি তাঁর দিবসসমূহকে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন চারভাগে। প্রথম দিন নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন জনগণের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য, পরের দিন ব্যয় করতেন সহধর্মিণীগণের জন্য, এরপরের দিন বিশেষভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করতেন বনে-জঙ্গলে-পাহাড়ে গিয়ে। আর চতুর্থ দিবস তিনি তাঁর নিভৃত প্রকোষ্ঠে কাটিয়ে দিতেন ক্ষমা প্রার্থনা ও বিলাপ-রোদনের মাধ্যমে। তাঁর ওই ইবাদতখানায় তাঁর রোদনসঙ্গী হতো চার হাজার সংসারাসক্তিহীন দরবেশ। বনে-জঙ্গলে যাবার দিন এলেও তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যেতেন রাজপ্রাসাদ পিছনে ফেলে। সেখানেও তিনি কখনো উচ্চকণ্ঠে এবং কখনো নিম্নকণ্ঠে আল্লাহ্‌র জিকির করতেন এবং কাঁদতেন। তাঁর সঙ্গে কাঁদতো পাথর-পাহাড়-অরণ্যানী-পাখপাখালি এবং বনের পশুরাও। তাদের সম্মিলিত কান্না নদী হয়ে বয়ে যেতো সমুদ্রের দিকে। পরে তিনি উপস্থিত হতেন সমুদ্রের কিনারাতে। সেখানে তাঁর রোদনসঙ্গী হতো সামুদ্রিক প্রাণীকুল। তারপর তিনি স্বগৃহে ফিরে আসতেন দিবাবসানে। স্বগৃহে ক্রন্দন ও বিলাপের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতো, আজ আল্লাহ্‌র নবী দাউদের রোদন-বিলাপের দিবস। যারা এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে চায়, তারা যেনো চলে আসে। তাঁর ইবাদতখানার মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হতো ফরাস, সেগুলোর মধ্যে ভরা থাকতো খেজুরের ছাল ও আঁশ। তিনি উপবেশন করতেন মাঝের ফরাসে। তারপর চার হাজার দরবেশ লম্বা লম্বা টুপি পরে ও হাতে লাঠি নিয়ে এসে বসতো তাঁর দু'পাশের ফরাসে। হজরত দাউদ উচ্চস্বরে ক্রন্দন শুরু করতেন। দরবেশগণও শুরু করতো উচ্চকণ্ঠে ক্রন্দন। চোখের পানিতে ফরাস ভিজে যেতো। আর ওই সিক্ত ফরাসে কাটা মুরগীর বাচ্চার মতো তড়পাতে শুরু করতেন তিনি। তাঁর পুত্র সুলায়মান এসে পরম যত্নে ওঠাতেন রোরুদ্যমান পিতাকে। হজরত দাউদ তখন দু'হাতের অঞ্জলি ভরে চোখের পানি নিয়ে নিজের

মুখমণ্ডলে মুছতেন এবং বিলাপের সুরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতেন, হে আমার পরম প্রেমময় প্রভু! আমার অপরাধ মার্জনা করো। এক বর্ণনায় এরকমও এসেছে যে, হজরত দাউদের কান্না পৃথিবীর সকল মানুষের কান্নার সমান।

ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, মার্জনার শুভসমাচার প্রাপ্তির পরেও হজরত দাউদ মাথা ওঠাতেন না। ফেরেশতারা তখন বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার শুরু ভুলে হলেও সমাপ্তি তো মার্জনায়। সুতরাং আপনি মস্তক উত্তোলন করুন। এরপর থেকে তিনি মস্তক উত্তোলন করলেন। তবে তখন থেকে জীবনভর তিনি পানীয় পান করেননি এবং আহার্য গ্রহণ করেননি চোখের পানিতে না ভিজিয়ে।

আওজায়ী এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন সুপরিণত সূত্রপরম্পরাসম্পন্ন একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, নবী দাউদের দুই চোখ দিয়ে মশক থেকে পানি গড়িয়ে পড়ার মতো করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো সারাক্ষণ। ফলে তাঁর মুখমণ্ডলে সৃষ্টি হয়েছিলো নালা।

ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যখন হজরত দাউদের ক্ষমাপ্রার্থনা কবুল করলেন, তখন তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার পরম প্রভুপালয়িতা! তুমি তো আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছো, কিন্তু এটা কি সমীচীন যে, আমি আমার কৃতকর্মের কথা বিস্মৃত হবো এবং নিজের ও অন্যদের অপরাধ মার্জনার জন্য তোমার সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করবো না? এমতো আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তাঁর হাতের তালুতে লিখে দিলেন 'পাপ', যা মুছে ফেলা ছিলো অসম্ভব। যখন তিনি পানাহার করতেন, তখন লেখাটি দৃষ্টিতে পড়তো তাঁর। জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় যখন সামনে হাত প্রসারিত করতেন, তখন লোকেরা ওই 'পাপ' কথাটি দেখবার জন্য কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করতো। আবার যখন তিনি নিজের ও অন্যদের জন্য হাত তুলে দোয়া করতেন, তখনো 'পাপ' কথাটি দেখতেন তাঁর চোখের সামনে।

হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে কাতাদা বর্ণনা করেছেন, ওই ঘটনার পর হজরত দাউদ সবসময় অপরাপর অপরাধীদের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন এবং বলতেন, হে দাউদ! তুমিও তো গোনাহগার। সুতরাং তাদেরই দলভূত হয়ে থাকো। পানিতে অশ্রু না মেশা পর্যন্ত তিনি ওই পানি পান করতেন না। শুকনো রুটিকেও তিনি করতেন অশ্রুসিক্ত। তারপর ভক্ষণ করতেন তাতে কিছু লবন ও ছাই মিশিয়ে। বলতেন, গোনাহগারদের খাদ্য এরকমই হয়। আগে তিনি অর্ধরাত্রি বিশ্রাম করতেন, বাকী অর্ধরাত্রি কাটাতেন ইবাদতে এবং রোজা রাখতেন একদিন পর একদিন। কিন্তু এই ঘটনার পর প্রায় সারারাত্রি কাটিয়ে দিতেন ইবাদতে এবং প্রায় প্রতিদিনই রাখতেন রোজা।

সাবেত বলেছেন, হজরত দাউদ যখন আল্লাহ্‌র শাস্তির কথা স্মরণ করতেন, তখন তাঁর অস্থিসন্ধিসমূহ হয়ে পড়তো শিথিল। নিজেকে তিনি আর তখন সংযত রাখতে পারতেন না। আবার রহমতের কথা স্মরণ করলে তিনি হতেন প্রকৃতিস্থ। এক বর্ণনায় এরকমও এসেছে যে, তিনি যখন যবুর শরীফ পাঠ করতেন, তখন তা

শোনার জন্য সমবেত হতো জঙ্গলের জীবজন্তু ও পাখিরা। কিন্তু এই ঘটনার পর তারা জড়ো হতো বটে, কিন্তু বলতো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার স্খলন যে আপনার কণ্ঠস্বরের মিষ্টতাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি'। একথার অর্থ— হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধিত্ব দিয়েছি এবং করেছি তোমার পূর্ববর্তী নবী রসুলগণের যথার্থ উত্তরসূরী। এখানে 'খলিফা' অর্থ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি।

জ্ঞাতব্য ঃ একবার হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব হজরত তালহা, হজরত যোবায়ের, হজরত কাব এবং হজরত সালমান ফারসীকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো, খলিফা ও বাদশাহ'র মধ্যে পার্থক্য কী? হজরত তালহা ও হজরত যোবায়ের বললেন, আমরা জানি না। হজরত সালমান ফারসী বললেন, খলিফা তিনি, যিনি জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার করেন, সকলের জীবিকা বণ্টন করেন সমভাবে, মানুষের প্রতি দয়ামায়া প্রদর্শন করেন আপন পরিবার পরিজনের মতো এবং সকল সমস্যার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে। হজরত কা'ব একথা শুনে বললেন, আমি মনে করেছিলাম, আমি ছাড়া এই মজলিশের অন্য কেউ এতদুভয়ের পার্থক্য সম্পর্কে জানে না। হজরত সালমান বলেন, একবার হজরত ওমর জিজ্ঞেস করেন, আমি খলিফা না বাদশাহ্‌। আমি বললাম, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! আপনি যদি মুসলমানদের জমি থেকে এক দিরহাম অথবা এরও কম আদায় করেন এবং তা ব্যয় করেন অসিদ্ধ কোনো ক্ষেত্রে, তবে বুঝবেন আপনি খলিফা নন, বাদশাহ। একথা শোনার পর হজরত ওমরের চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

সুলায়মান ইবনে আবুল আওজা বলেছেন, একবার এক সমাবেশে হজরত ওমর বললেন, আমি জানি না, আমি খলিফা, না বাদশাহ। এক লোক বললো, হে আমিরুল মুমিনীন! এই দুই পদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। হজরত ওমর বললেন, কী রকম? লোকটি বললো, খলিফা যা নিয়ে থাকেন, তা সত্যের উপরে নিয়ে থাকেন এবং যা দিয়ে থাকেন, তা-ও দিয়ে থাকেন সত্যের উপরে। আলহামদু লিল্লাহ্‌। আপনি সেরকম। আর বাদশাহ হয়ে থাকে জালেম। সে একজনের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে এবং অন্যকে তা প্রদানও করে অন্যায়ভাবে। একথা শোনার পর হজরত ওমর নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

হজরত মুয়াবিয়া যখন মিম্বরে বসতেন, তখন বলতেন, হে জনমণ্ডলী! ধনসম্পদকে একত্র করা এবং বণ্টন করার নাম খেলাফত নয়, বরং খেলাফত হচ্ছে সতত সত্যাধিষ্ঠিত হওয়ার নাম। যেমন ন্যায়বিচারের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুসারে জবাবদিহিতার মাধ্যমে জনগণের দায়িত্ব পালন করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে

বিচ্যুত করবে'। এখানে 'বিল হাক্বক্বি' অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুসারে সুবিচার করো। 'ওয়ালা তাত্তাবিয়িল হাওয়া' অর্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ বা খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না'। 'আ'ন সাবীলিল্লাহ্‌' অর্থ আল্লাহ্‌র পথ থেকে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যে সকল বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছেন, সেই সকল বিধি-বিধান থেকে তোমাকে বিচ্যুত করবে, করবে বিপথগামী। উল্লেখ্য, যারা প্রবৃত্তির অনুসারী, তাদের ন্যায়বিচারবোধ হয় বিপর্যস্ত। এ ধরনের প্রবৃত্তিপূজকেরাই এই উম্মতের ভ্রষ্ট ফেরকাসমূহের উদগাতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়, তদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে'। এখানকার 'বিমা নাসূ' (বিস্মৃত হয়ে আছে) কথাটির 'মা' ক্রিয়ামূলরূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তাদের কঠিন শাস্তি হবে মহাবিচারের দিবসের জবাবদিহিতার কথা ভুলে যাবার জন্যই। আর ওই দিবসের কথা স্মরণ রাখা যেতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র পথে অবিচল থেকে এবং প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

❑ আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা উহাদের যাহারা কাফির, সুতরাং কাফিরদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

❑ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, আমি কি তাহাদিগকে সমান গণ্য করিব? আমি কি মুত্তাকীদিগকে অপরাধীদের সমান গণ্য করিব?

❑ এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি জনতাকে জানিয়ে দিন, আমি আকাশ-পৃথিবীসহ এই বিশাল সৃষ্টি ক্রীড়াচ্ছলে ও শুভ উদ্দেশ্য

ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিনি। এ সকল কিছুই হচ্ছে আমার সত্তা-গুণবত্তা-কার্যাবলীর নিদর্শন। মানুষ এ সকল কিছু দেখে আমার আনুগত্য ও দাসত্বকে স্বীকার করবে এবং আমার যথার্থ উপাসনার মাধ্যমে লাভ করবে আমার পরিতোষ ও আরো বহুবিধ অনুগ্রহসম্ভার। বেঁচে থাকবে তাদের প্রবৃত্তির অশুভ প্ররোচনা থেকে। যারা এরকম করবে না, তারা অবশ্যই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সুতরাং তাদের জন্য জাহান্নামের অনন্ত দুর্ভোগ অনিবার্য।

এখানে 'বাত্বিলা' অর্থ অনর্থক, উদ্দেশ্যবিহীন। অর্থাৎ যারা এই মহাসৃষ্টিকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মনে করে, তারা প্রবৃত্তিপূজক, সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচারী। এরকম লোকেরা অবশ্যই কাফের, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। আর তাদের জাহান্নামবাসও অবধারিত। এখানে 'লিল্‌লাজীনা কাফারু' (যারা কাফের) কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করে তাদেরকে করা হয়েছে অধিকতর তিরস্কারার্হ ও নিন্দার্হ।

পরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমান গণ্য করবো? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করবো'?

এখানে 'আম নাজ্‌আ'লু' কথাটির 'আম' অর্থ 'বাল' (বরং)। এভাবে এখানকার বক্তব্যার্থটি দাঁড়ায়— এই মহাবিশ্বকে যদি অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন বলে মনে করা হয়, তবে সত্যাশ্রয়ী বিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবিশ্বাসীদের মধ্যে আর কোনো মর্যাদাগত পার্থক্য থাকে না। সত্য ও মিথ্যা উভয়টি হয়ে যায় সমান। এমতো অপসমতার অপনোদনার্থেই এখানে উত্থাপিত

হয়েছে প্রথমোক্ত অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নটি। আর 'আম' ('বাল') শব্দটির মাধ্যমেই এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন নয় এমতো বক্তব্যটিকে করা হয়েছে সুপরিস্ফুট।

পরের প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ পুণ্যবান ও পাপিষ্ঠরা কখনোই সমান বলে গণ্য হতে পারে না। এভাবে এখানকার শেষোক্ত অস্বীকৃতিটি হয়েছে প্রথমোক্ত অস্বীকৃতিটির পরিপূরক। আলোচ্য আয়াতে পুনরুত্থানের অবশ্যম্ভাবিতার একটি বৌদ্ধিক প্রমাণ নিহিত রয়েছে, যা প্রমান করে পুনরুত্থানের অবশ্যম্ভাবী স্বীকৃতি। কারণ, এ জগতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মাঝে বিরাজমান রয়েছে অসমতা। ধন সম্পদ সন্তান-সন্ততিতে অবিশ্বাসীরাই সাধারণতঃ বিশ্বাসীদের চেয়ে সমৃদ্ধ। এ কারণেই এই পৃথিবীর জীবন সাঙ্গ হওয়ার পর অন্য কোন স্থানে উভয়ের চিত্তবৃত্তি অনুসারে প্রতিদান পাওয়া জ্ঞানতঃ অনিবার্য। আর সেটাই হবে পুনরুত্থানের জগত।

মুকাতিল বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা বিশ্বাসীগণকে বলতো, পরকালে যে সুফল তোমরা লাভ করবে, তেমনি লাভ করবো আমরাও। তাদের এমতো অপকথনের পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'এক কল্যাণময় কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার প্রতি অবতারিত এই কোরআন মহাকল্যাণময় এবং

সুপ্রচুর সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ। আমি এই কোরআন আপনার উপর একারণেই অবতীর্ণ করেছি যে, মানুষ যেনো এর আয়াতসমূহ পাঠ করে, শোনে ও অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। আর যারা সুস্থ ও শুভ বোধবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা যেনো হয়ে যায় এর পুণ্যময় উপদেশাবলীর অনুরাগী, অনুগামী ও বাস্তবায়নকারী।

এখানে 'কিতাব' অর্থ এই কোরআন, যা আকশজ বাণী বৈভবরূপে অবতীর্ণ হয়েছে মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। 'মুবারাকুন' অর্থ 'মহাকল্যাণময়, 'লিইয়াদ্দাব্বারূ' অর্থ যেনো অনুধাবন করে। অর্থাৎ এই উম্মতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেনো সচেষ্ট হয় এর আয়াতসমূহের মর্মোদ্‌ঘাটনে। অথবা এর অর্থ— জ্ঞানীরা যেনো গভীরভাবে একথা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এই গ্রন্থ অবশ্যই অবতারিত হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। এই গ্রন্থ মনুষ্যরচিত অবশ্যই নয়। হওয়া সম্ভবও নয়। হাসান বলেছেন, এখানে অনুধাবন করার অর্থ কোরআনের আয়াতের অনুসরণ করা, এর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহকে সর্বান্তঃকরণে মান্য করে চলা।

'ওয়া লিইয়াতাজাক্কারা উলুল আল্বাব্' অর্থ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। ভ্রষ্ট খারেজীরা বলে, আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করার ক্ষেত্রে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের রয়েছে স্বভাবগত মৌলিক যোগ্যতা। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, এমতো যোগ্যতা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এক বিশেষ দয়া ও দান। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতারিত গ্রন্থ সেই বিশেষ দয়া ও দানের প্রতিভূ। সুতরাং আকাশজ গ্রন্থের সহায়তা ব্যতিরেকে কেবল বোধ ও বুদ্ধি প্রকৃত সত্যের স্বরূপ উন্মোচন করতে অক্ষম। সেকারণেই এখানে এসেছে কিতাব অধ্যয়ন ও অনুধাবনের নির্দেশ। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'অনুধাবন করে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে প্রাথমিক জ্ঞানের সঙ্গে। আর পরিণত বা চূড়ান্ত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে 'গ্রহণ করে উপদেশ' কথাটির।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯. ৪০

❑ আমি দাউদকে দান করিলাম সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

❑ যখন অপরাহ্নে তাহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল,

❑ তখন সে বলিল, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে;

❑ 'এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর।' অতঃপর সে উহাদের পদ ও গলদেশ ছেদন করিতে লাগিল।

❑ আমি তো সুলায়মানকে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখিলাম একটি ধড়; অতঃপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হইল।

❑ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।'

❑ তখন আমি তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করিত সেথায় মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইত,

❑ এবং শয়তানদিগকে, যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ-নির্মাণকারী ও ডুবুরী,

❑ এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে।

❑ 'এইসব আমার অনুগ্রহ, ইহা হইতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখিতে পার। ইহার জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হইবে না।'

❑ এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার শুনুন নবী দাউদের পুত্র নবী সুলায়মানের বৃত্তান্ত। সুলায়মান ছিলো দাউদের পুত্র। সে ছিলো আমার প্রিয়ভাজন দাস এবং ছিলো আমার একান্ত অনুগত।

এখানে 'ইন্নাহু আউয়াব' (সে ছিলো অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী) কথাটি প্রথমোক্ত বাক্যটির কারণ। অর্থাৎ সুলায়মান আমার একান্ত অনুগত অথবা আমার প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলো বলেই ছিলো আমার প্রিয়ভাজন দাস।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে ধাবমানোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হলো'। একথার অর্থ— একদিনের ঘটনা। সেদিন বিকেলে সুলায়মান যুদ্ধের জন্য সযত্নে পালিত কিছুসংখ্যক সুদৃশ্য তেজী ঘোড়া পরিদর্শন করতে করতে মশগুল হয়ে পড়লো। এভাবে সূর্য অস্তমিত হলো। বাদ পড়ে গেলো তার অপরাহ্নকালীন নির্ধারিত ইবাদত।

এখানে 'বিল আ'শিয়্যি' অর্থ অপরাহ্ন, দিবসের শেষ ভাগ। 'আস্সফিনাতু' অর্থ উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি। 'সাফিন' অর্থ ওই অশ্ব, যে দাঁড়িয়ে থাকে তার তিনটি পায়ের উপর এবং চতুর্থ পা আলতোভাবে লাগিয়ে রাখে মাটিতে। এরকম অশ্বই হয়ে থাকে অভিজাত শ্রেণীর, উৎকৃষ্ট বংশোদ্ভূত।

'আল জ্বিয়াদ' শব্দটি 'জ্বদ' অথবা 'জ্বাওয়াদ' এর বহুবচন। এর অর্থ ধাবমানোদ্যত, ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন। কারো কারো মতে শব্দটি বহুবচন 'জাইয়েদ' এর, যার অর্থ বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— সবার আগে ছুটে চলা দূরন্ত প্রকৃতির ঘোড়া। কারো কারো মতে, 'ধাবমানোদ্যত' ও 'উৎকৃষ্ট' বলে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ওই ঘোড়াগুলোর দুইটি বিশেষ গুণ।

কালাবী বলেছেন, হজরত সুলায়মান দামেস্ক ও নসিবাঈনবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হস্তগত করেছিলেন এক হাজার উত্তম জাতের ঘোড়া। মুকাতিল বলেছেন, হজরত সুলায়মান হজরত দাউদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন উৎকৃষ্টজাতের এক সহস্র অশ্ব। কিন্তু তাঁর এই বিবরণটি যথার্থ নয়। কেননা তা একটি হাদিসের পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে, রসুল স.বলেছেন, আমরা নবী-রসুলেরা উত্তরাধিকার রাখি না, আমাদের পরিত্যক্ত সকল কিছু হয়ে যায় দান।

ইব্রাহিম তাঈমীর বরাত দিয়ে আবদ ইবনে হুমাইদ, ফারইয়াবী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, নবী সুলায়মানের ছিলো বিশ হাজার ঘোড়া এবং সেগুলো ছিলো পাখিদের মতো ডানাবিশিষ্ট। ওই ঘোড়াগুলোকে তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী করেছিলেন।

আউফের সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হাসান বলেছেন, আমার কাছে এরকম তথ্য পৌঁছেছে যে, হজরত সুলায়মান যে ঘোড়াগুলোকে জবেহ করেছিলেন, সেগুলো ছিলো ডানাওয়ালা। আর ঘোড়াগুলো ধরে আনা হয়েছিলো সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে। তাঁর পূর্বে ও পরে অন্য কেউ এরকম সামুদ্রিক ঘোড়ার অধিকারী ছিলো না। ইকরামা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, সেগুলো ছিলো বিশ হাজার ডানাযুক্ত ঘোড়া।

বর্ণনাকারীদের মতে ঘটনাটি ঘটেছিলো এভাবে— হজরত সুলায়মান দ্বিপ্রহরে নামাজের পর তাঁর জন্য নির্ধারিত আসনে সমাসীন হলেন। তাঁকে দেখানোর জন্য সারিবদ্ধভাবে ঘোড়াগুলোকে তাঁর সামনে নিয়ে আসা হতে লাগলো। এভাবে নয় শত ঘোড়া দেখার পর তাঁর আসরের নামাজের কথা মনে পড়লো। দেখলেন, সূর্য ততোক্ষণে অস্তমিত হয়েছে। নামাজের সময় আর নেই বলে তিনি যারপরনেই মনঃক্ষুণ্ন হলেন।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'তখন সে বললো, আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে'।

এখানে 'আল খইর' অর্থ প্রচুর ধন সম্পদ, প্রতুল বিত্তবৈভব। অর্থাৎ ওই সকল নয়নপ্রীতিকর অশ্ব, যার কারণে শেষ হয়ে গিয়েছিলো আসরের নামাজ পাঠের নির্ধারিত সময়। অথবা এখানে 'আল খইর' অর্থ 'আল খইল'। অর্থাৎ অশ্বরাজি। কেননা আরববাসীগণ ব্যাপকহারে 'র' এর স্থলে 'লাম' এবং 'লাম' এর স্থলে 'র' বর্ণের প্রয়োগ ঘটিয়ে থাকেন। যেমন তাঁরা 'ইখতাল্‌তু' এর উচ্চারণ করেন 'ইখতার্‌তু' (আমি তাকে ধোকা দিয়েছি)।

ঘোড়াকে 'খইর' (কল্যাণ) বলা হয়ে থাকে একারণে যে, তার কপালে রয়েছে কল্যাণের বিচ্ছুরণ। যেমন এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অশ্বের ললাটদেশে থাকবে সৌভাগ্যের জয়টিকা, যা হবে পুণ্য ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আনয়নকারী। বহুসংখ্যক সাহাবী থেকে হাদিসটি আপনাপন 'বিশুদ্ধ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

'আহবাব্‌তু' এর অর্থ 'আছারতু' (আমি প্রাধান্য দিয়েছি) ধরা হলে আরবী ভাষার রীতি অনুসারে 'আ'ন' এর পরিবর্তে আসে 'আ'লা'। সেই হিসেবে এখানে 'আ'ন জিকরি রব্‌বী' এর স্থলে হওয়া উচিত ছিলো 'আ'লা জিকরি রব্‌বী'। কিন্তু এখানে 'আ'ন জিকরি রব্‌বী'ই বলা হয়েছে। (আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়েছি) এরকম করা হয়েছে অবশ্য প্রাধান্য প্রদানের মধ্যে বিমুখতা প্রদর্শনেরও মনোভাব রয়েছে বলে।

কোনো কোনো ভাষাবিশারদ এখানকার 'আহ্‌বাব্‌তু' কথাটির অর্থ করেছেন— আমি বসে আছি এবং এখানে 'হুব্‌বুল খইর' হচ্ছে কর্মকারক, যার মধ্যে বিবৃত হয়েছে কর্মের কারণ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— অশ্বগুলোর মায়ায় আমি এতোক্ষণ ধরে ঠায় বসে রয়েছি

'হাত্তা তাওয়ারাত্‌ বিল হিজাব্‌' অর্থ এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সূর্য অন্তর্হিত হয়েছে পশ্চিমের দিকচক্রবালের অন্তরালে। আর ইতোপূর্বের আয়াতের 'আ'শিয়্যি' এর রূপক অর্থ যেহেতু সূর্য, তাই এই আয়াতে স্পষ্ট করে সূর্যের উল্লেখ না করে 'তাওয়ারাত' এর সর্বনামকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে সূর্যের। বাগবী লিখেছেন, 'হিজাব' একটি পাহাড়ের নাম, যার দূরত্ব ককেসাস পর্বতমালা থেকে এক বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। সূর্য অস্তগমন করে ওই পাহাড়ের অন্তরালে।

এরপরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'এগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন করো। অতঃপর সে তার পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগলো'। একথার অর্থ— তখন সুলায়মান ভাবলো, এই ঘোড়াগুলোর চিত্তহারী সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার কারণেই যেহেতু আসরের নামাজ কাজা হয়ে গেলো, সেহেতু সেগুলোকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কোরবানী করাই শ্রেয়ঃ। একথা ভেবেই সে তার অনুচরবর্গকে

আদেশ দিলো, ওগুলোকে আবার আমার কাছে আনো। অনুচরবর্গ যথারীতি আদেশ প্রতিপালন করলো। তখন সে আমার নাম নিয়ে কর্তন করতে লাগলো অশ্বগুলোর পদসমুদয় ও কণ্ঠদেশ।

এখানে 'মাস্‌হাম্‌ বিস্‌সুক্বি' অর্থ উরু ছেদন করলো। এরকম অর্থ করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান, কাতাদা, মুকাতিল এবং অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণ। ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত সুলায়মান ঘোড়াগুলোর পা কেটে দিয়েছিলেন তলোয়ার দিয়ে। হজরত উবাই ইবনে কা'বের উদ্ধৃতি দিয়ে তিবরানী তার 'আল আউসাত' গ্রন্থে, ইসমাইল তার 'মুয়া'জ্জম' গ্রন্থে এবং ইবনে মারদুবিয়া উত্তমসূত্রপরম্পরায় বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন,

তখন আল্লাহ্র আদেশে তরবারী দিয়ে ঘোড়াগুলোর পা ও গর্দান কেটে ফেলা হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্র স্মরণচ্যুতির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার ক্ষতিপূরণ, তাঁর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশা এবং তাঁরই পরিতোষার্জনের উদগ্র অনুরাগ।

হাসান বলেছেন, হজরত সুলায়মান যখন ওই অশ্বগুলো বধ করলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁকে দান করলেন তদপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ও অত্যধিক গতিসম্পন্ন বাহন। অর্থাৎ বাতাসকে করে দিলেন তাঁর নির্দেশানুগত।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, হজরত সুলায়মান জবেহকৃত ঘোড়াগুলোর গোশত দান করে দিয়েছিলেন প্রজাসাধারণকে। তাঁর শরিয়তের বিধানে ঘোড়ার গোশত হালাল ছিলো। আমাদের শরিয়তেও ঘোড়ার গোশত হালাল বলে মতপ্রকাশ করেছেন অধিকাংশ ধর্মবেত্তা। কেবল ইমাম আবু হানিফার মতে ঘোড়ার গোশত মকরুহ (অপছন্দনীয়)।

কেউ কেউ আবার বলেছেন, তিনি ওই ঘোড়াগুলোকে জেহাদের জন্য ওয়াকফ (দান) করে দিয়েছিলেন এবং তলোয়ার দিয়ে সেগুলোর গলায় ও পায়ে লাগিয়ে দিয়েছিলেন বিশেষ চিহ্ন।

জুহুরীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত আলী বলেছেন, হজরত সুলায়মান 'এগুলিকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে এসো' এরকম নির্দেশ দিয়েছিলেন ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ সূর্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন অস্তমিত সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনো, যেনো আমি আসরের নামাজ আদায় করতে পারি। ফেরেশতারা তাই করলো এবং তিনি সময়মতো আসরের নামাজ আদায় করে নিলেন। জুহুরী ও ইবনে কীসান বলেছেন, হজরত সুলায়মান মায়া-মমতাবশতঃ ওই ঘোড়াগুলোর গলার ও পায়ের ধুলো নিজ হাতে সরিয়ে দিয়েছিলেন। বাগবী মন্তব্য করেছেন, তাঁদের এই অভিমতটি অদৃঢ়। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য উক্তিগুলো উদ্ধৃত করা হয়েছে ইতোপূর্বেই।

আমার মতে হজরত সুলায়মান 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়েছে' এরকম কথা বলেছিলেন অতিশয় অনুশোচনার সঙ্গে। আর তাঁর এমতো উক্তিই জুহুরীর ব্যাখ্যাকে ভুল প্রমাণিত করে।

এর পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'আমি তো সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপরে রাখলাম একটি ধড়; অতঃপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হলো'। একথার অর্থ— আমি সুলায়মানকে পুনরায় পরীক্ষা করলাম। এবার তার সিংহাসনের উপরে ফেলে রাখলাম হাত-পা ছাড়া একটি মানবশিশুর শরীর। আমার এমতো পরীক্ষার উদ্দেশ্য সে বুঝতে পারলো তৎক্ষণাৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে মুখ ফেরালো অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে।

এখানে 'ফাতান্না' অর্থ পরীক্ষা করলাম। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একদিন সুলায়মান নবী বললেন, আজ রাতে আমি আমার নিরানব্বই জন (অন্য বর্ণনামতে একশ জন) সহধর্মিণীর কাছে গমন করবো। ফলে প্রত্যেকের গর্ভে জন্ম লাভ করবে একজন করে নিপুণ অশ্বারোহী মুজাহিদ। ফেরেশতাগণ একথা শুনে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ্' বলবেন। কিন্তু তিনি 'ইনশাআল্লাহ্' বলতে ভুলে গেলেন। সেকারণেই সে রাতে তিনি তাঁর প্রত্যেক পত্নীর সঙ্গে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও কেউই গর্ভ ধারণ করলো না। গর্ভবতী হলো কেবল একজন। সে কিছুকাল পর জন্ম দিলো একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন শিশু। শপথ সেই পবিত্রতম সত্তার, যার অধিকারে মোহাম্মদের জীবন, তিনি যদি 'ইনশাআল্লাহ্' বলতেন, তবে তাঁর মহিষীগণ সকলেই সে রাতে গর্ভধারণ করতেন এবং যথাসময়ে তাঁদের উদর থেকে জন্মলাভ করতো এক একজন সুদক্ষ অশ্বারোহী ধর্মযোদ্ধা। বোখারী, মুসলিম। উল্লেখ্য, ওই অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন নবজাতককে ধাত্রী নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছিলো হজরত সুলায়মানের সিংহাসনে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই এখানে বলা হয়েছে 'তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়'।

'ছুম্‌মা আনাব্' অর্থ আমার অভিমুখী হলো। অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তিনি সাবধান হলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কখনো 'ইনশাআল্লাহ্' বলা পরিত্যাগ করবেন না। ইমাম তাউস এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যাটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য। কেননা এ সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের ভাষ্যও এ প্রকারের।

'জ্বাসাদা' অর্থ ওই দেহ, যাতে প্রাণের স্পন্দন নেই। উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে এখানে এমতো অর্থই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। কেননা নবী-রসুলগণের পবিত্রতা নিঃসন্দেহে কালিমামুক্ত। কিন্তু তিবরানী তাঁর 'আল আউসাত' গ্রন্থে এবং ইবনে মারদুবিয়া শিথিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, নবী সুলায়মানের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। জ্বিনেরা নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শ করলো, এই শিশু যদি জীবিত থাকে, তবে পরবর্তী সময়ে এর জবরদস্তিমূলক আনুগত্য থেকে আমরা কিছুতেই নিস্তার পাবো না। তাই আমাদের উচিত, একে হত্যা করা, অথবা পাগল বানিয়ে দেওয়া। নবী সুলায়মান তাদের এই গোপন দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারলেন। তাই শিশুটিকে লুকিয়ে রেখে দিলেন মেঘপুঞ্জের ভিতর। পরে হঠাৎ একদিন দেখলেন, তাঁর সিংহাসনে পড়ে রয়েছে শিশুটির মৃতদেহ। এটাই ছিলো তাঁর জন্য পরীক্ষা। কেননা তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহ্র উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করেননি।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, ওয়াহাব ইবনে মুনাববাহ্ বলেছেন, হজরত সুলায়মান ছিলেন জল-স্থলের একচ্ছত্র বাদশাহ্। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা ছিলো তাঁর অনুগত। একদিন তিনি জানতে পারলেন, সম্পূর্ণরূপে দুর্গম সমুদ্রবেষ্টিত সায়দুন নামক এক দ্বীপরাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করে চলেছে এক বিধর্মী রাজা। বাতাস ছিলো হজরত সুলায়মানের নির্দেশানুগত। তাই তিনি একদিন বাতাসবাহী সিংহাসনে সমারূঢ় হয়ে বহুসংখ্যক লোকলস্কর ও জ্বিন সঙ্গে নিয়ে গমন করলেন ওই রাজ্যে। সেখানকার রাজাকে কতল করে গণিমতরূপে লাভ করলেন দ্বীপরাজ্যটির সকল ধনসম্পদ। আরো পেলেন রূপসী রাজকন্যা জারাদাহ্‌কে। তাকে আহ্বান জানালেন সত্য ধর্মের দিকে। রাজকন্যা জারাদাহ্ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আহ্বান কবুল করলো। হজরত সুলায়মান তখন তাকে পরিণয়াবদ্ধ করলেন। তাকে ভালোও বাসতে শুরু করলেন অন্য রাণীদের চেয়ে বেশী। তৎসত্ত্বেও জারাদাহ্ দিনাতিপাত করতো বিষণ্ণচিত্ত হয়ে। চোখ থাকতো সারাক্ষণ অশ্রুসজল। তাই নবী-সম্রাট সুলায়মান একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, কী কারণে তুমি এতো কষ্ট পাও? জারাদাহ্ বললো, সম্রাটপ্রবর! আমার প্রয়াত পিতা ও তার রাজত্বের কথা যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। তিনি বললেন, কেনো, তুমি তো এখন তার চেয়ে অনেক বিশাল সাম্রাজ্যের স্বনামধন্যা সম্রাজ্ঞী। তদুপরি তুমি পেয়েছ সত্য ধর্মের পরিচয়। এই নেয়ামত তো অতুলনীয়। জারাদাহ্ বললো, সে কথা সত্যি। তবু পিতার কথা মনে হলে আমি হয়ে পড়ি শোকাকুলা। তাই আমার মিনতি, আপনি জ্বিনদেরকে দিয়ে আমার পিতার একটি মূর্তি তৈরী করিয়ে দিন। আমি সকাল-সন্ধ্যা ওই মূর্তির দিকে তাকালে হয়তো কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পাবো।

হজরত সুলায়মান শিল্পী জ্বিনদেরকে হুকুম করলেন, যতো তাড়াতাড়ি পারো নিখুঁতভাবে সম্রাজ্ঞী জারাদাহের পিতার মূর্তি নির্মাণ করে দাও। জ্বিনেরা হুকুম পালন করলো। জারাদাহ্ তাজ্জব হয়ে দেখলো, মুর্তিটি অবিকল তার বাপের মতো। সে তখন মূর্তিটিকে বস্ত্রাবৃত করলো। মাথায় বেঁধে দিলো উষ্ণীষ। তার বাপ যেভাবে যে কাপড়ে সাজতো, মূর্তিটিকে সেভাবেই সাজিয়ে দিলো সে। হজরত সুলায়মান যখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন তখন সে দাস-দাসীদেরকে নিয়ে মূর্তির সামনে উপস্থিত হতো। সকাল-সন্ধ্যায় সেটিকে সেজদা করতো। দাস-দাসীদেরকেও এরকম করতে বলতো। এভাবে হজরত সুলায়মানের ঘরেই শুরু হলো মূর্তি পূজা। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি এসব কিছু জানতেই পারলেন না। এ সম্পর্কে প্রথম অবহিত হলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আসফ ইবনে বরখিয়া। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিলো তাঁর অবাধ যাতায়াত। তাই মূর্তিপূজার ব্যাপারটি প্রথম অবলোকন করেন তিনিই। সম্রাটকে ডেকে বলেন, আমি এখন শিথিল অস্থিগ্রন্থিসম্পন্ন পরকালাভিমুখী এক বৃদ্ধ। এখন আমার মনে সাধ জেগেছে, জনসমাবেশে আল্লাহ্‌র নবী-রসুলগণের বৈশিষ্ট্যাবলীর সম্যক বিবরণ দেই। তাঁদের সম্পর্কে লোকে যা জানে না, তা বলি। হজরত সুলায়মান বললেন, ঠিক আছে।

তাই হবে। তিনি তখন লোকজনকে সমবেত হতে বললেন। সকলে সমবেত হলে আসফ বক্তৃতা করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। জনসমক্ষে দিতে শুরু করলেন পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের বিভিন্ন গুণবত্তার বিবরণ। শেষে এলো বর্তমান নবী সুলায়মান প্রসঙ্গ। তাঁর প্রসঙ্গে বললেন, সম্রাট সুলায়মানও আল্লাহ্‌র নবী। বাল্যবেলায় তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ও সহিষ্ণু। তখন তিনি সংযমীও ছিলেন। আর আদেশ দান করতেন বিজ্ঞতার সঙ্গে। নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকেও থাকতেন অনেক দূরে। হজরত সুলায়মান বললেন, আসফ! তুমি তো কেবল আমার বাল্যবেলার কথাই বললে। আমার পরিণত বয়সের কথা কিছুই বললে না। পরে অন্দর মহলে নিয়ে জানালেন তাঁর অসন্তোষের কথা। আসফ বললেন, সম্রাটপ্রবর কি জানেন, একটি নারীর রূপমুগ্ধ হওয়ার কারণে তাঁর ঘরে চল্লিশ দিন ধরে চলেছে প্রতিমাপূজা? তিনি বললেন, কী বলছো তুমি? আমার ঘরে? আসফ বললেন, হ্যাঁ, আপনারই ঘরে। তিনি উচ্চারণ করলেন **'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন'**। বুঝতে পারছি, তুমি না জেনে শুনে কিছুই বলোনি। একথা বলেই তিনি জারাদাহের ঘরে গেলেন। মূর্তিটি ভেঙে চুরমার করলেন। জারাদাহ্‌কে দিলেন কঠিন শাস্তি। তারপর রাজ পোশাক খুলে পরলেন সাধারণ পোশাক, যার সুতা কেটেছিলো ও বয়ন করেছিলো কুমারী মেয়েরা এবং যা প্রাপ্তবয়স্ক কোনো নারী-পুরুষ দ্বারা ইতোপূর্বে স্পর্শিতও হয়নি। ওই পোশাক পরে তিনি চলে গেলেন জঙ্গলে। সেখানে চুলার ছাই দিয়ে নির্মাণ করলেন বিছানা। তারপর ওই ভস্মশয্যার উপরে লুটিয়ে পড়লেন সেজদায়। ডুকরে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন মহামহিম আল্লাহ্‌র সমীপে। দিবাবসান হলে সাশ্রুনয়নে স্বআবাসে ফিরে এলেন আল্লাহ্‌র নবী হযরত সুলায়মান।

এরপর মহাবিপদ দেখা দিলো অন্য দিক থেকে। তাঁর ছিলো এক অতি বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী। নাম তার আমিনা। ওই আমিনার কাছেই তিনি গচ্ছিত রাখতেন তাঁর নাম খচিত রাজকীয় মোহরাঙ্কিত আংটি, যখন যেতেন শৌচাগারে অথবা কোনো রাণীর একান্ত সন্নিধানে। প্রয়োজন পূরিত হবার পর পাকপবিত্র হয়ে ওই আংটিটি পুনরায় পরিধান করতেন হাতে। অর্থাৎ অপবিত্র শরীরে ওই আংটিটি তিনি পরিধান করতেন না। একদিন তিনি আংটিটি আমিনার হাতে দিয়ে প্রবেশ করলেন শৌচাগারে। একটু পরে আমিনার সামনে হজরত সুলায়মানের আকৃতি ধরে আবির্ভূত হলো সখর নামের এক সামুদ্রিক জ্বিন। তাকে দেখেই আমিনা আংটিটি দিয়ে দিলো। বুঝতেই পারলো না যে, তিনি হজরত সুলায়মান নন। সখর আংটিটি সঙ্গে সঙ্গে হাতে পরে নিলো। গিয়ে বসলো রাজসিংহাসনে। দরবারে যথারীতি সমবেত হলো মানুষ, জ্বিন ও বিহঙ্গবাহিনী। সকলেই মনে করতে লাগলো, ইনিই মহামান্য সম্রাট সুলায়মান। ওদিকে শৌচাগার থেকে পবিত্র হয়ে বেরিয়ে এলেন হজরত সুলায়মান। তাঁকে দেখেই হতচকিত হলো আমিনা।

কিন্তু তার মনে হলো, এ লোক আসল সুলায়মান নন। বললো, কে তুমি? তিনি বললেন, আমি সুলায়মান ইবনে দাউদ। আমিনা বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। তিনি তো একটু আগেই তাঁর আংটিটি নিয়ে গিয়েছেন।

তিনি এখন স্বসিংহাসনে সমারুঢ়। তাদের কথাকাটাকাটি শুনতে পেয়ে সমবেত হলো অন্দর মহলের লোকেরা। তাদের কাছেও মনে হলো, এ লোক কিছুতেই সুলায়মান ইবনে দাউদ নন। তিনি বুঝতে পারলেন, এবার শুরু হলো তাঁর ভুলের শাস্তি। তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে গেলেন। বনী ইসরাইল জনতার দ্বারে দ্বারে গিয়ে বললেন, আমিই সুলায়মান ইবনে দাউদ। লোকে মনে করলো, তিনি পাগল। তাই দেখামাত্র তাড়িয়ে দিতে লাগলো তাঁকে। কেউ ঢিল ছুঁড়তে লাগলো। কেউ দিতে লাগলো গালি। বলাবলি করতে লাগলো, দ্যাখো, দ্যাখো। এই পাগলের কাণ্ড দেখে যাও। সে নাকি দাউদপুত্র সুলায়মান। বেগতিক দেখে তিনি লোকালয় ছেড়ে চলে গেলেন সমুদ্রের দিকে। সেখানে চাকরী নিলেন এক মৎস্য ঠিকাদারের অধীনে। তিনি তার মাছের বোঝা বাজারে পৌঁছে দিতেন। মজুরী হিসেবে পেতেন দু'টি মাছ। একটি মাছ আগুনে সেঁকে নিতেন। অপরটি দিয়ে কিনতেন একটি রুটি। দিনের পর দিন ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ করতে লাগলেন এভাবে। চল্লিশ দিন তাঁর ঘরে মূর্তিপূজা হয়েছিলো বলে এভাবেই তাঁকে বয়ে বেড়াতে হলো মহাবিড়ম্বনা।

ওদিকে রাজদরবারের নিয়মের পরিবর্তন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো আসফ ও অন্যান্য বনী ইসরাইল দরবারীদের চোখে। আসফ দরবারীদেরকে একান্তে ডেকে বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য করেছো, রাজদরবারের রীতিপ্রকৃতি আর আগের মতো নেই? তারা বললো, হ্যাঁ। সবকিছু যেনো কেমন হয়ে গিয়েছে। আসফ তখন সাক্ষাত করলেন রাজমহিষীগণের সঙ্গে। বললেন, আমরা তো দেখছি রাজা ও রাজদরবার কেমন যেনো বিশৃঙ্খল। আপনারা তেমন কিছু লক্ষ্য করেছেন কী? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। আমরাও তো ভেবে পাচ্ছিনা এমন হচ্ছে কেনো? রাজা যে আমাদেরকে ঋতুবর্তী অবস্থাতেও রেহাই দেয় না। অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য ফরজ গোসলও করে না। আসফ উচ্চারণ করলেন **'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিঊন'**। নিঃসন্দেহে এ যে এক সাংঘাতিক পরীক্ষা। চল্লিশ দিন গত হওয়ার পর শয়তান সখরের কারসাজি এভাবে ধরা পড়লো সকলের দৃষ্টিতে। সকলেই তাকে চিনতে পেরেছে দেখে সখর আর রাজ প্রাসাদে তিষ্ঠাতে পারলো না। পালিয়ে গেলো সমুদ্রের দিকে। হাতের আংটিটি খুলে ফেলে ছুঁড়ে মারলো সমুদ্রের অথৈ পানিতে। সঙ্গে সঙ্গে আংটিটি গিলে ফেললো একটি সামুদ্রিক মাছ। মাছটি আবার ধরা পড়লো এক জেলের জালে। মৎস্য ঠিকাদার অন্য মাছের সঙ্গে সেটিকে কিনে নিলো। সারাদিন কাজ করার পর হজরত সুলায়মান মজুরী হিসেবে ওই মাছটি পেলেন আর একটি সাধারণ মাছের সঙ্গে। সাধারণ মাছটির বিনিময়ে খরিদ করলেন রুটি। আর ওই মাছটি সেঁকে নেওয়ার আগে তার পেট চিরে ফেলতেই পেলেন হারানো আংটিটি। সাথে সাথে সেটি হাতের আঙ্গুলে পরলেন। রাজমহিমাও প্রকাশ পেতে শুরু করলো তৎক্ষণাৎ। তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। পূর্বের মতো রাজানুগত হয়ে দরবারে আগমন করলো বাধ্যানুগত মানুষ, বশীভূত জ্বিন ও একান্ত অনুরক্ত পক্ষীকুল। হজরত সুলায়মান পুনঃপুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা

করতে লাগলেন। প্রকাশ করতে লাগলেন আল্লাহ্‌র সকৃতজ্ঞ মহিমা ও পবিত্রতা। জ্বিনদেরকে নির্দেশ দিলেন, দূরাচার সখরকে এক্ষুণি ধরে নিয়ে এসো। তারা যথারীতি নির্দেশ পালন করলো। গভীর সমুদ্র থেকে ধরে নিয়ে এলো সখরকে। তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডে গর্ত করে তার ভিতর ঢোকালেন তাকে। তারপর ওই গর্তের উপরে আর একটি প্রস্তরখণ্ড রেখে লোহা ও রাং দিয়ে আটকে দিলেন শক্ত করে। তারপর আদেশ করলেন, প্রস্তরবন্দী সখরকে এবার ফেলে দাও সমুদ্রের গভীর অতলে। ওহাব কর্তৃক বর্ণিত আনুপূর্বিক ইতিবৃত্তটি এরকমই।

সুদ্দী বর্ণনা করেছেন, হজরত সুলায়মানের স্ত্রী ছিলো একশতজন। তাদের একজনের নাম ছিলো জারাদাহ্। সে ছিলো তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত। তাই তার কাছেই তিনি প্রয়োজন দেখা দিলে আংটিটি গচ্ছিত রাখতেন। একদিন জারাদাহ্ বললো, মহামান্য সম্রাট! আমার ভাইয়ের সঙ্গে অমুক লোকের ঝগড়া বিবাদ আছে। সুতরাং আমার ভাই মোকদ্দমা নিয়ে হাজির হলে আপনি যেনো তার পক্ষে আপনার সদয় সিদ্ধান্ত দান করেন। তিনি বললেন, আচ্ছা। কিন্তু কার্যতঃ তিনি তাঁর এ অঙ্গীকার পালন করতে পারেননি। মহাবিপদে তিনি পতিত হয়েছিলেন সেকারণেই।

একদিন তিনি জারাদাহের কাছে মোহরাংকিত অঙ্গুরীয়টি রেখে শৌচাগারে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর আকৃতি ধরে এক জ্বিন উপস্থিত হলো জারাদাহের কাছে। জারাদাহ্ তাঁকে অঙ্গুরীয়টি দিয়ে দিলো। ওই জ্বিন অঙ্গুরীয়টি হাতে পরে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে বসলো সিংহাসনে। এদিকে শৌচাগার থেকে বেরিয়ে নবী সুলায়মান জারাদাহের কাছে গিয়ে বললেন, অঙ্গুরীয়টি দাও। জারাদাহ্ বললো, কী বলছেন আপনি! একটু আগেই তো আপনি অঙ্গুরীয়টি নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, অসম্ভব। পরক্ষণেই বুঝলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। তিনি তাই আশ্রয় গ্রহণ করলেন নিভৃত প্রকোষ্ঠে। সেখানেও স্বস্তি না পেয়ে বেরিয়ে পড়লেন অজানার উদ্দেশ্যে। ওদিকে ওই জ্বিন শয়তান দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন করতে লাগলো। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা। জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রমাদ গুণলেন। সাধারণ জনতা এর কোনো কারণ ঠাহর করতে পারলো না। একদল বিচক্ষণ লোক

সম্রাজ্ঞীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, আপনারা বলুন তো কেনো এমন হচ্ছে? সম্রাটের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা-সিদ্ধান্ত যে আগের মতো সুসঙ্গত নয়। ইনিই কি আমাদের স্বনামধন্য সম্রাট? যদি তাই হন, তবে তো আমাদের বলতেই হয় যে, তিনি এখন বুদ্ধিভ্রষ্ট। একথা শুনে সম্রাজ্ঞীরা কাঁদতে শুরু করলেন। বিচক্ষণ লোকেরা রাজমহল থেকে ফিরে এসে তওরাত শরীফ পাঠে মগ্ন হলেন। শয়তান সম্রাট বুঝতে পারলো, তার কারসাজি সকলের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে। তাই কোনোমতে চল্লিশ দিন এলোমেলোভাবে রাজ্য চালাবার পর সে বাধ্য হলো পালিয়ে যেতে। সমুদ্রের দিকে ঘোরাঘুরি করতে করতে একসময় তার অঙ্গুরীয়টি হাত ফসকে পড়ে গেলো সমুদ্রে। একটি মাছ সেটিকে গিলে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। রাজ্যহারা নবী সুলায়মানও তখন মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সমুদ্রের পাড়ে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করে দিনাতিপাত করছিলেন প্রায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে। তিনি একদল মৎস্য শিকারকে দেখতে পেয়ে বললেন, আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে একটি মাছ দিতে পারো? আমি তোমাদের সম্রাট সুলায়মান। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একজন মৎস্যশিকারী তাঁর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলো। তাঁর মস্তক হয়ে গেলো রক্তাক্ত। সমুদ্রের পানিতে তিনি রক্ত ধুয়ে ফেলতে লাগলেন। অন্য মৎস্য শিকারীরা তখন দুষ্ট মৎস্য শিকারীটিকে ভর্ৎসনা করলো। নিতান্ত মমতাপরবশ হয়ে তাঁকে দান করলো দু'টো মাছ। তিনি মাছ দু'টো কাটতে গিয়ে একটি মাছের পেটে পেলেন তাঁর হারানো অঙ্গুরীয়টি। সঙ্গে সঙ্গে পরে নিলেন হাতের আঙুলে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পেলেন হৃত রাজ্যাধিকার। আগের মতো আবার পূর্ণ অনুগত হয়ে গেলো মানুষ, জ্বিন ও পক্ষীবাহিনী। সকলেই বুঝতে পারলো, ইনিই হচ্ছেন আসল সুলায়মান। ভুল ধারণা ও অযথার্থ আচরণের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো সকলে। তিনি বললেন, তোমাদের কোনো দোষ নেই। যা ভাগ্যে ছিলো তাই ঘটেছে। এরপর নির্দেশ দিলেন, ওই দুরাচার জ্বিনটিকে এক্ষুণি আমার কাছে ধরে আনা হোক, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেখানেই সে আত্মগোপন করুক না কেনো। সম্রাটের অনুজ্ঞা প্রতিপালিত হলো যথারীতি। তিনি ওই জ্বিনটিকে বন্দী করলেন একটি সিন্দুকের মধ্যে। তারপর তাতে শক্ত তালা এঁটে দিয়ে ফেলে দিলেন গভীর সমুদ্রে। সেখানেই সে বন্দী অবস্থায় এখনো জীবিত।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত সুলায়মান তিন দিন ধরে নির্জনে কাটালেন। তখন আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, তুমি তিন দিন ধরে আত্মগোপন করে রয়েছো, আমার বান্দাদের অভাব অভিযোগের প্রতি মোটেও দৃষ্টি দিচ্ছো না। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাক তাঁর এমতো আচরণ পছন্দ করেননি বলে তাকে পরীক্ষায় নিপতিত করেছিলেন। এ কথাগুলোর আগে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব যথারীতি বিবৃত করেছেন মোহরাংকিত অঙ্গুরীয় এবং জ্বিন শয়তানের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা। হাসান বলেছেন, আল্লাহ্ তখন এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, যাতে করে শয়তান তাঁর পত্নীগণের উপরে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাগবীও এ সকল কিছু বর্ণনা করেছেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্'র বরাতে হজরত ইবনে আব্বাসের বিবৃতিরূপে আবদ ইবনে হুমাইদ, নাসাঈ ও ইবনে মারদুবিয়াও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে জারীর এই ঘটনাকে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্'র মতো সুদ্দী সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের কতিপয় বর্ণনাসূত্রে একথাও এসেছে যে, জ্বিন সখর সিংহাসনে আরোহণ করার পর কেবল হজরত সুলায়মানের সত্তা ও তাঁর পত্নীগণ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো। হাসান সূত্রে বাগবীও এরকম ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আরো মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি তাঁর প্রিয় নবীর পত্নীগণের উপরে শয়তানকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দিবেন। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, মোহরাংকিত আংটি হারানো, শাহীমহলে মূর্তিপূজা এসকল কিছুই ইহুদীদের দুরভিসন্ধিমূলক রটনা।

বাগবী লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত সুলায়মান যখন বিপদে পতিত হলেন, তখন দেখতে পেলেন মোহরাংকিত আংটিটি হঠাৎ তাঁর হাত থেকে খুলে পড়ে গেল। আংটিটি উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় হাতে পরলেন তিনি। কিন্তু আবার সেটি খুলে পড়ে গেলো। ওই আংটিই ছিলো তাঁর শাসনাধিকারের প্রতীক। তাই তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন যে, রাজ্যের শাসনাধিকার আর তার নেই। আসফও বললেন, সম্রাটপ্রবর! আপনি পরীক্ষায় নিপতিত। এ পরীক্ষা চলতে থাকবে চৌদ্দ দিন। তাই এই চৌদ্দদিন আপনি এ আংটি ধারণ করতে পারবেন না। একথা শুনেই হজরত সুলায়মান দ্রুত গিয়ে আত্মগোপন করলেন ভূগর্ভস্থ এক গোপন প্রকোষ্ঠে। আংটিটি পরিধান করলেন আসফ এবং গিয়ে বসলেন রাজসিংহাসনে। তিনি ছিলেন অপ্রকৃত সম্রাট, ঠিক যেনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন শরীর। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'এবং তার আসনের উপরে রাখলাম একটি ধড়'। অর্থাৎ ধড় অর্থ এখানে আসফ। উল্লেখ্য, আসফের রাজত্ব চলে চৌদ্দদিন ধরে। এই চৌদ্দ দিন তিনি সকল কিছু পরিচালনা করতেন হজরত সুলায়মানের অনুকরণেই। চৌদ্দদিন গত হলে তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। ফিরিয়ে দেন হজরত সুলায়মানের আংটি ও সিংহাসন।

আমার মতে ওয়াহাবের বিবরণ অযথার্থ। কেননা তা কোরআনের বক্তব্যের পূর্ণ অনুকূল নয়। তিনি বলেছেন, সায়দুন নামক সমুদ্রপরিবেষ্টিত ওই দ্বীপে বাতাসবাহী সিংহাসন নিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অথচ ওই সময় পর্যন্ত তিনি বাতাসের

নিয়ন্ত্রণাধিকার পানইনি। পেয়েছিলেন বর্ণিত পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার পরে। পরবর্তী আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য একথাটিকেই প্রমাণ করে। আর ওয়াহাব বর্ণিত ঘটনাটিকে যদি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনাও করা হয়, তবুও হজরত সুলায়মানকে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে দায়ী করা যায় না। একথাও কিছুতেই বলা যায় না যে, পাপ সংঘটিত হয়েছে তাঁর দ্বারা। কেননা মূর্তি পূজা সকল নবীর শরিয়তে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শরিয়তে মূর্তি নির্মাণ করা অসিদ্ধ ছিলো না। আর রাণী জারাদাহ্ তো মূর্তিপূজা করতো তাঁর অগোচরে। সুতরাং তার জন্য তাঁকে দায়ী করা যেতে পারে না কিছুতেই।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— **'সে বললো হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে দান করো এমন এক রাজ্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। তুমিতো পরম দাতা'**।

নবী-রসুল এবং পুণ্যবানগণের রীতি হচ্ছে প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারপর যা চাইতে ইচ্ছা হয়, তা চাওয়া। হজরত সুলায়মানও তেমনই করেছেন। আলোচ্য আয়াত তার প্রমাণ। আর ক্ষমা প্রার্থনার পরে এভাবে নিজের অভিলাষ জ্ঞাপন একথাই প্রমাণ করে যে, বর্ণিত পরীক্ষাটি ছিলো তাঁর ইহ-পারলৌকিক মর্যাদা বৃদ্ধির উপলক্ষ; যেমন হজরত আইয়ুবের উপরে আপতিত পরীক্ষাও ছিলো তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ। অর্থাৎ হজরত সুলায়মান তখন কোনো পাপ যেমন করেননি, তেমনি ঘটেনি তাঁর যৎকিঞ্চিত পদস্খলনও। যদি সেরকম কিছু হতো, তবে তিনি

কেবল ক্ষমাপ্রার্থনাই করতেন। কোনো কিছু চাওয়ার সাহস করতেন না। অর্থাৎ তাঁর পিতা হজরত দাউদের মতো চিন্তাগত কোনো ভুলও তিনি করেননি। করলে হজরত দাউদের ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ্ বলেছিলেন 'অতঃপর আমি তার ক্রটি ক্ষমা করলাম'— সেরকম কোনো কিছু এখানেও বলতেন।

মুকাতিল ও ইবনে কীসান এখানকার **'মিম বা'দী'** কথাটির অর্থ করেছেন **'আমার জামানার পরে'**। অর্থাৎ আমার জামানার পরে আমার মতো বিশাল রাজ্যের অধিকারী যেনো আর কেউ না হয়। অন্য এক আয়াতে কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে এরকম অর্থেই। যেমন **'ফামা ইয়াহ্দীহী মিম বা'দিল্লাহ্'** (আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে কে পথপ্রদর্শন করবে)। আতা ইবনে রেবাহ্ বলেছেন, এখানকার **'লা ইয়ামবাগী লিআহাদিম্ মিম্ বা'দী'** কথাটির অর্থ হবে— হে আমার প্রভুপালক! যেমন তুমি আমার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে দিয়েছিলে অপরকে, তেমনি করে যেনো আমাকে আর রাজ্যচ্যুত কোরো না। আমার সাম্রাজ্যকে কোরো না অন্যের অধিকারভূত। কিন্তু কথা হচ্ছে, এধরনের প্রার্থনা হজরত সুলায়মান করেছিলেন কেনো? তিনি ছিলেন আল্লাহ্র নবী। কেবল সম্রাট তো ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন নবুয়তের বিশেষ প্রতীক ও অলৌকিকত্ব। মুকাতিল বলেছেন, তিনি এমতো প্রার্থনার মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন জ্বিন জাতি ও বিহঙ্গপ্রজাতির উপর। পরের আয়াতে সেকথা স্পষ্ট করে বলাও হয়েছে।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একদিন বললেন, গত রাতে এক দুষ্ট জ্বিন থুথু ছিটাতে ছিটাতে আমার নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। আল্লাহ্ আমাকে তার উপর ক্ষমতাবান করলেন। আমি তাকে মসজিদের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখতে চাইলাম। যদি বেঁধে রাখতাম, তবে তোমরা তাকে এখন স্বচক্ষে দেখতেও পেতে ভোর বেলায়। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেলো আমার ভ্রাতা সুলায়মানের কথা। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন **'এবং আমাকে দান করো এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া অন্য কেউ না হয়'**। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। বোখারী, মুসলিম।

আমি বলি, হজরত সুলায়মানের এমতো প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিলো— যে লোক মর্যাদায় আমার চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর, সে যেনো আমার রাজ্যের মতো এতো বিশাল রাজ্যের অধিকারী না হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সতত আল্লাহ্র স্মরণ মগ্ন, সে ব্যক্তি সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও ক্ষতির কিছু নেই। তার জন্য পৃথিবীর প্রাপ্তি বরং পুণ্য অর্জনের উপকরণ বা নিমিত্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণচ্যুত, তার জন্য পৃথিবীপ্রসক্তি তীব্র হলাহল সদৃশ ক্ষতিকর।

একটি সংশয় ঃ আল্লাহ্র নৈকট্যের দিক থেকে রসুল স. এর মর্যাদা ছিলো হজরত সুলায়মানের চেয়ে বেশী। কিন্তু তাঁকে তাহলে হজরত সুলায়মানের মতো সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি করা হলো না কেনো? আবার দেখা যায়, তিনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দুষ্ট জ্বিনকে বেঁধে রাখলেন না। এর কারণ কী?

সংশয়ভঞ্জন ঃ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রসুল স. এর মর্যাদা হজরত সুলায়মানের মর্যাদা অপেক্ষা বেশী। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যেতে পারে না যে, হজরত সুলায়মানের প্রার্থনার কারণে রসুল স.কে সুবিশাল সাম্রাজ্য দেওয়া হয়নি। বরং আল্লাহ্ বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছিলেন রসুল স. এর ইচ্ছার উপর। অর্থাৎ তিনি হতে পারতেন সম্রাট নবী, অথবা বিত্তহীন নবী দু'টোর যে কোনো একটি। কিন্তু তিনি হতে চেয়েছিলেন আল্লাহ্র বিত্তবৈভববর্জিত বান্দা। তাঁর কাছে বিত্তহীনতা ছিলো বাদশাহীর চেয়ে উত্তম। এখন অবশিষ্ট রইলো, দুষ্ট জ্বিনটিকে তিনি স. কেনো বাঁধেননি তার কারণ অনুসন্ধান। এ বিষয়টিও ছিলো তাঁর ইচ্ছাধীন। কিন্তু তিনি ওই জ্বিনটিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন কেবল তাঁর পূর্বসূরী নবী হজরত সুলায়মানের দোয়ার প্রতি

সম্মান প্রদর্শনার্থে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, রসুল স. ছিলেন জ্বিন-মানুষসহ সকল সৃষ্টির উপরে সমভাবে ক্ষমতাবান। তিনি যে মহাসৃষ্টির মহা রহমত। সে কারণেই জনৈক কবি বলেছে— হে মহাসম্মানিত সর্বশেষ রসুল! বৃক্ষও তো আপনার কথা শোনে। পা না থাকা সত্ত্বেও আপনার ডাকে সেজদা করতে করতে চলে আসে কাণ্ডে ভর করে আপনার সকাশে। সুতরাং বলা যায়, ফকিরী-দরবেশী ছিলো তাঁর অতি প্রিয়। ফকিরী পোশাকও ছিলো তাঁর প্রিয় পোশাক। তাঁর খলিফা চতুষ্টয়ও ছিলেন এরকম। ছিলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ অনুসারী।

এরপর বলা হয়েছে 'ইন্নাকা আন্‌তাল ওহ্‌হাব'। (তুমিতো পরম দাতা)। অর্থাৎ তুমি যদি কাউকে কিছু দিতে চাও, তবে তা প্রতিহত করার সাধ্য যেমন কারো নেই, তেমনি এমন কোনো দাতাও কেউ নেই, যে দান করতে পারে তুমি না চাইলে।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করতো সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো'।

এখানে 'ফাসাখ্‌খার্‌না লাহুর রীহা' অর্থ আমি বাতাসকে তার অধীন করে দিলাম। 'রুখাআ' অর্থ মৃদুগতিসম্পন্ন বাতাস, যা উত্তপ্ত হবে না, অথবা যা চলবে না তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আর এখানকার 'আসাবা' অর্থ 'আরদা'। অর্থাৎ যেখানে যেতে সে ইচ্ছা করতো। যেমন আরববাসীগণ বলেন 'আসাবাস সাওয়াবা পাআখতাল জাওয়াবা' (সে সঠিক জবাব দিতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু জবাবে ভুল করলো)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এবং শয়তানদেরকে, যারা সকলেই ছিলো প্রাসাদ-নির্মাণকারী ও ডুবুরী (৩৭), এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরো অনেককে' (৩৮)।

এখানে 'কুল্‌লা বান্‌নায়ি' অর্থ সকলেই ছিলো প্রাসাদ নির্মাণকারী। 'ওয়া গওয়াসি' অর্থ ডুবুরী, যারা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মনিমুক্তা সংগ্রহ করে আনে। উল্লেখ্য, হজরত সুলায়মানই প্রথম ব্যক্তি যিনি জ্বিন ডুবুরীদের দ্বারা সমুদ্রাভ্যন্তর থেকে মণিমুক্তা তুলে এনেছিলেন।

'মুক্বর্‌রানীন' অর্থ শৃঙ্খলাবদ্ধ। হজরত সুলায়মান জ্বিনজাতিকে ভাগ করেছিলেন দুইভাগে। যারা কাজের তাদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন প্রাসাদ নির্মাণ ও মণিমুক্তা আহরণের কাজে। আর অকাজের জ্বিনগুলোকে রেখেছিলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, যাতে তাদের দুষ্টামি থেকে মানুষ থাকতে পারে নিরাপদ। আমি বলি, সম্ভবতঃ শয়তান জ্বিনদের নেতা ইবলিসের উপরে নবী সুলায়মানকে আধিপত্য দেওয়া হয়নি। কেননা আল্লাহ্‌পাক তাকে কিয়ামত পর্যন্ত স্বাধীন করে দিয়েছেন। যেমন এক আয়াতে তাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় তুমি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষমান'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এই সব আমার অনুগ্রহ, এটা থেকে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পারো। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না (৩৯) এবং আমার নিকট রয়েছে তার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভপরিণাম' (৪০)।

এখানে 'হাজা আ'ত্বউনা' অর্থ এসব আমার অনুগ্রহ। অর্থাৎ হে আমার নবী সুলায়মান! তোমাকে আমি এতোকিছু দান করলাম তোমার প্রতি বিশেষভাবে প্রীত ও অনুগ্রহপরবশ হয়ে। 'ফামনুন আও আমসিক্' অর্থ তুমি যাকে খুশী দিতে অথবা নিজে রাখতে পারো। 'বিগইরি হিসাব' অর্থ এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। অর্থাৎ তোমাকে এরকম কখনো বলা হবে না যে, তুমি অমুককে কেনো দিয়েছো, অথবা অমুককে দাওনি কেনো? হাসান বলেছেন, বিত্ত-বৈভবই সাধারণতঃ বিত্তপতিদের অশুভ পরিণামের কারণ হয়। কেবল সুলায়মান ছিলেন এমতো অশুভতা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। কেননা তাঁকে একথা বলেই দেওয়া হয়েছিলো যে, কাউকে কিছু দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণতই তাঁর ইচ্ছাধীন। দিলে তিনি পুণ্যলাভ করবেন। না দিলে দায়ী হবেন না।

'বিগইরি হিসাব' (হিসাব ছাড়া) কথাটি আবার এখানে 'পুরস্কার' বা 'উপহার' অর্থেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আমি তোমাকে দিয়েছি অগণন উপহার, অপরিমেয় পুরস্কার।

মুকাতিল বলেছেন, এখানকার 'হাজা আ'ত্বউনা' (এসব আমার অনুগ্রহ) এর উদ্দেশ্য— আমি জ্বিনজাতিকে করে দিয়েছি তোমার বশীভূত। আর 'ফামনুন' অর্থ তুমি তাদের মধ্যে যাকে খুশী অধীনস্থ করে রাখতে পারো এবং ছেড়ে দিতে পারো যাকে খুশী। এর জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। আর 'লা যুলফা' অর্থ সুলায়মানের জন্য রয়েছে যুগপৎ পৃথিবীর প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং পরবর্তী পৃথিবীর প্রভূত মর্যাদা। আর তার পরিণামও হবে অত্যন্ত শুভ। অর্থাৎ জান্নাত।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

❑ স্মরণ কর, আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহবান করিয়া বলিয়াছিল, 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে',

❑ আমি তাহাকে বলিলাম, 'তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়।'

❑ আমি তাহাকে দান করিলাম তাহার পরিজনবর্গ ও তাহাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ।

❑ আমি তাহাকে আদেশ করিলাম, 'একমুষ্টি তৃণ লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভংগ করিও না।' আমি তো তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার স্মরণ করুন আমার প্রিয় নবী আইয়ুব প্রসঙ্গ। আমি তাকে পরীক্ষা করেছিলাম দুরারোগ্য ব্যধিতে নিপতিত করে। ওই অবস্থাতেও শয়তান তাকে প্রতারণায় ফেলতে চেয়েছিলো। তাই সে মর্মাহত হয়ে আমাকে ডেকে বলেছিলো, হে আমার প্রভুপালয়িতা! শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে। এখনকার 'বিনুসুবিন্' কথাটি এসেছে 'নুসুব' থেকে। এর অর্থ কষ্ট, যন্ত্রণা, পীড়া, বেদনা। মুকাতিল ও কাতাদা বলেছেন, 'নুসুব' অর্থ দৈহিক কষ্ট এবং 'আ'জাব' অর্থ আর্থিক বিপর্যয়। হজরত আইয়ুবের দুঃখকষ্টের বিশদ বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করেছি সুরা আম্বিয়ার তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

পরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করো, এইতো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়'। একথার অর্থ— যখন পরীক্ষার সুদীর্ঘ তিক্ত অধ্যায় শেষ হলো, তখন আমি রোগজর্জরিত আইয়ুবকে লক্ষ্য করে বললাম, তোমার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করো। সে তাই করলো। সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে উদ্‌গত হলো স্বচ্ছ সলিলবিশিষ্ট ঝর্ণা। আমি বললাম, এটা স্নানের ও পানের শীতল সলিল। এবার এই পানি দিয়ে স্নান করো এবং এর পানি পান করো পরিতৃপ্তির সঙ্গে। হজরত আইয়ুব আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করলেন। স্নানের পর দূর হয়ে গেলো তাঁর শরীরের সকল রোগ এবং পানের পর অপসৃত হলো অভ্যন্তরীণ অস্বস্তি।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করেছিলেন দু'বার। প্রথম পদাঘাতে বের হয়ে এসেছিলো শীতল পানির ঝর্ণা এবং দ্বিতীয়

পদাঘাতে নির্গত হয়েছিলো উষ্ণ প্রস্রবণ। প্রথমটির পানি দিয়ে তিনি গোসল করেছিলেন এবং পানি পান করেছিলেন দ্বিতীয়টির। মুজাহিদ সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, হজরত আইয়ুবের ডান পায়ের আঘাতে একটি প্রস্রবণ বেরিয়ে এসেছিলো এবং ডান হাত দিয়ে পিছনের দিকের মাটিতে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলো আর একটি প্রস্রবণ। একটির পানি তিনি পান করেছিলেন এবং স্নান করেছিলেন অন্যটির পানি দিয়ে।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে দান করলাম তার পরিবারবর্গ ও তাদের মতো আরো, আমার অনুগ্রহস্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ'। একথার অর্থ— উপর্যুপরি বিপদাপদ অবতীর্ণ করে আমি তাকে করেছিলাম পরিজন-স্বজনহীন। কিন্তু সে সকল বিপদ অতিক্রম করলো পরম ধৈর্যের সঙ্গে। আমিও তাকে যথাপুরস্কারে ধন্য করলাম। পুনরায় দান করলাম পরিজন-স্বজন। তৎসহ আরো অধিক। এটা ছিলো তার প্রতি আমার বিশেষ অনুগ্রহের নিদর্শন এবং বোধবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের জন্য শুভউপদেশ।

এর পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'আমি তাকে আদেশ করলাম, এক মুষ্টি তৃণ নাও ও তা দ্বারা আঘাত করো এবং শপথ ভঙ্গ কোরো না। আমি তো তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কতো উত্তম বান্দা সে। সে ছিলো আমার অভিমুখী'।

'দ্বিগ্‌ছা' অর্থ এক মুঠো তৃণ, অথবা লতা-পাতা-ডাল। উল্লেখ্য, হজরত আইয়ুব ভুল বুঝে একবার এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে একশত কশাঘাত করবেন। অথচ তাঁর স্ত্রী রহিমা ছিলেন পরম পুণ্যবতী, নির্দোষ। এদিকে প্রতিজ্ঞাপূরণও অত্যাবশ্যক। তাই আল্লাহ্ তাঁকে প্রতিজ্ঞা পূরণ সহজ করে দিলেন এভাবে— তুমি এক মুঠো (এক শতের মতো) লতা-পাতা-ডাল নাও, তারপর তা দিয়ে তোমার স্ত্রীর শরীরে আঘাত করো, এভাবে পূরণ করো তোমার শপথ। বলা বাহুল্য, হজরত আইয়ুব যথারীতি এ নির্দেশ প্রতিপালন করলেন ও মুক্ত হয়ে গেলেন শপথভঙ্গের দায় থেকে।

'ইন্না ওয়াজ্বাদ্নাহু সবিরা' অর্থ আমি তো তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। অর্থাৎ পরীক্ষাস্বরূপ আমি তার উপর দৈহিক, বৈত্তিক ও পারিবারিক দুঃখ-কষ্ট অবতীর্ণ করা সত্ত্বেও তাকে ধৈর্যচ্যুত হতে দেখিনি। উল্লেখ্য, এই অনন্যসাধারণ ধৈর্যের কারণেই আল্লাহ্পাক তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পূর্বের মতো সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিজন-স্বজন বেষ্টিত জীবন। আর তাঁর 'শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে' এই উক্তিটিও ছিলো না ধৈর্যের পরিপন্থী। কেননা তা হতাশা বা হাহুতাশ জাতীয় কিছু ছিলো না। ছিলো আরোগ্যকামনামূলক প্রার্থনা।

আমি বলি, এ প্রসঙ্গে আমাদের স্বনামধন্য শায়েখ শহীদ মীর্জা জানে জানা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, হজরত আইয়ুব দীর্ঘ দিন ধরে অসহনীয় রোগযন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে নিরাময় করতে চাইলেন। তাই তাঁর হৃদয়ে এ বিষয়টির উদ্ভাবন ঘটালেন যে, ক্ষমাপ্রার্থনা ও বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আবেদন-নিবেদন জানানো, কেবল ধৈর্যধারণ অপেক্ষা

উত্তম। তাই তিনি স্বভাবগতভাবে সহিষ্ণু হওয়া সত্ত্বেও কেবল আল্লাহ্র পরিতোষ কামনায় শুরু করে দিলেন প্রার্থনা। এভাবে তিনি ধৈর্যের মর্যাদা থেকে উন্নীত হয়ে পৌঁছে গেলেন আল্লাহ্র পরিতোষের মর্যাদায়। তখন আল্লাহ্ তাঁর ধৈর্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঘোষণা করলেন 'কতো উত্তম বান্দা সে'।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪

❑ স্মরণ কর, আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইস্হাক ও ইয়া'কূবের কথা, উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।
❑ আমি তাহাদিগকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, উহা ছিল পরলোকের স্মরণ।
❑ অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
❑ স্মরণ কর, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুল-কিফ্লের কথা, ইহারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।
❑ ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা। মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আবাস—
❑ চিরস্থায়ী জান্নাত, যাহার দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত।
❑ সেথায় তাহারা আসীন হইবে হেলান দিয়া, সেথায় তাহারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাহিবে।
❑ এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ।
❑ ইহা হিসাব দিবসের জন্য তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।
❑ ইহা তো আমার দেওয়া রিয্ক যাহা নিঃশেষ হইবে না,

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার আসুন আমার প্রিয় নবী ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব প্রসঙ্গে। তারা ছিলো আমার পরম আনুগত্যপরায়ণ দাস এবং ছিলো ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে শক্তিমান ও মারেফতের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মদর্শী। উল্লেখ্য, আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাগণ এরকম শক্তিমান ও সূক্ষ্মদর্শীই হয়ে থাকেন।

এখানে 'উলিল আইদি' অর্থ হস্তবিশিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপাসনায় সতত প্রস্তুত, সুদৃঢ়। আর 'ওয়াল আব্‌সার' অর্থ চক্ষুবিশিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মারেফত জ্ঞানে সূক্ষ্মদর্শী গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও মুজাহিদ এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। হাত দ্বারাই সাধারণতঃ সকল কাজ করা হয়ে থাকে। তাই এখানে শারীরিক ইবাদতের দৃঢ়তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে 'উলিল আইদি' (হাত বিশিষ্ট)। আর আল্লাহ্‌র মারেফত লাভের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টিই যেহেতু মূল অবলম্বন, তাই এ বিষয়টিকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে 'আব্‌সার' (চক্ষুবিশিষ্ট)। আবার এই ত্রয়ী নবীর এমতো গুণবত্তা প্রকাশের মাধ্যমে একথাটিকেই পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, যারা তাঁদের মতো গুণবিশিষ্ট নয়, তারা প্রকৃত অর্থে ক্ষমতাহীন ও অন্ধ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ক্ষেত্রে অক্ষম ও তাঁর মারেফতের ক্ষেত্রে দৃষ্টিবিবর্জিত।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, তা ছিলো পরকালের স্মরণ (৪৬)। অবশ্যই তারা ছিলো আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত (৪৭)।

এখানে 'জিকরাদ্‌দার' অর্থ পরকালের স্মরণ। উল্লেখ্য, পরকালের স্মরণমগ্নতাই নবী-রসুলগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁরা নিজেরা হন পরকালের স্মরণমগ্ন এবং জনগণকে আহ্বান জানান স্মরণমগ্নতার প্রতি। তাঁরা চান আল্লাহ্‌র দীদার ও নৈকট্য। আর তা হবে পরকালে। তাই পরকালের প্রতিই নিবেদিত থাকে তাঁদের সকল অভিনিবেশ। এখনে 'জিকরাদ্‌দার' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে 'জিকরি সাহিবিদ্‌দার' (পরকালের স্মরণকারী) অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে বিশেষভাবে পরকালের স্মরণকারীরূপে মনোনীত করে নিয়েছেন। আর এভাবে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সকলের দৃষ্টি পরকালের প্রতিই সতত নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা ওই জগত চিরস্থায়ী। আর পৃথিবী হচ্ছে অস্থায়ী আবাস, যা এক সময় সকলকে ছেড়ে যেতে হবেই।

মালেক ইবনে দীনার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি তাদের অন্তর থেকে পৃথিবীর মোহ চিরতরে মুছে দিয়েছি, তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি পরকালের ভালোবাসা। এভাবে তাদেরকে করেছি আমার মনোনীত উত্তম স্বভাববিশিষ্ট বান্দাগণের অন্তর্ভূত। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— তাঁরা মানুষকে পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলতেন এবং আহ্বান জানাতেন এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের। সুদ্দী অর্থ করেছেন— পরকালের প্রতি ভয় রাখার

জন্য তাঁদেরকে বিশেষভাবে মনোনীত করা হয়েছিলো। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে বাক্যের উদ্দেশ্য বা প্রথমাংশ উহ্য রয়েছে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি পরকালের উৎকৃষ্ট বিষয়াবলী স্মরণের জন্য তাদেরকে বিশিষ্ট করে নিয়েছি।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, ইসমাইল, আল ইয়াসাআ ও যুলকিফ্‌লের কথা, এরা প্রত্যেকেই ছিলো সজ্জন'।

আল ইয়াসাআ ছিলেন আখতুবের পুত্র। বনী ইসরাইলেরা তাঁকে তাদের শাসনকর্তা নির্বাচিত করেছিলো। পরে আল্লাহ্‌পাক তাঁকে নবুয়ত দান করেছিলেন। আর যুলকিফল ছিলেন আল ইয়াসাআর চাচাতো ভাই এবং বিশর ইবনে আইয়ুবের পুত্র। তবে তিনি নবী ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি নবী। আবার কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন পুণ্যবান, আল্লাহ্‌র ওলী। যুলকিফল ছিলো তাঁর পদবী। তাঁর এরকম পদবী লাভের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, একবার বনী ইসরাইলের একশত জন লোক তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলো। আর তিনি তাদেরকে আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। আবার এরকমও বলা হয়েছে যে, একজন সৎলোক প্রতিদিন একশত বার নামাজ পাঠ করতেন। ফলে উপার্জনের ফুরসত তিনি পেতেন না। ওই লোকের উপজীবিকার ব্যবস্থাপনা তিনিই করেছিলেন। তাই সকলে তাঁকে বলতো যুলকিফল।

এর পরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস' একথার অর্থ— এ পর্যন্ত যে সকল নবী-রসুল ও পুণ্যবানগণের আলোচনা করা হলো, এগুলো হচ্ছে স্মরণীয় ঘটনা, অথবা তাঁদের বিবরণসমৃদ্ধ এই কোরআন হচ্ছে একটি উৎকৃষ্ট স্মরণিকা। আর ওই মহাত্মাগণের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আবাসস্থল।

এর পরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত'। এ কথার অর্থ চিরসুখময় বেহেশত, যার তোরণ রয়েছে তাদের জন্য সতত উন্মুক্ত। এখানে 'আদন' অর্থ চিরস্থায়ী। অথবা 'আদন' হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট এক বেহেশতের নাম। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'চিরস্থায়ী জান্নাত, যার অঙ্গীকার আল্লাহ্‌ তাঁর বিশেষ বান্দাগণের সঙ্গে করেছেন'। এখানেও 'আদন' অর্থ চিরস্থায়ী।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয় চাইবে'। একথার অর্থ— তারা সেখানকার তাকিয়াবিশিষ্ট আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসবে এবং পরিচারক-পরিচারিকাদেরকে আদেশ দিবে ইচ্ছে মতো। কখনো বলবে, ফলমূল আনো, কখনো বলবে, এবার আনো সুস্বাদু পানীয়।

এখানে 'শরাব' শব্দটির সঙ্গে তানভীন যুক্ত করায় একথাই প্রকাশ পায় যে, সেখানে সুপেয় পানীয়ের থাকবে অঢেল আয়োজন। প্রথমে 'ফাকিহাতিন কাছীরাতিন'

(বহুবিধ ফল) যেহেতু বলা হয়েছে, তাই পরে 'শারাবিন' এর পরে আর 'কাছীরাতিন'(বহুবিধ, অঢেল, সুপ্রচুর) এর ব্যবহার প্রয়োজন হয়নি। আর খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে কেবল ফলমূলের উল্লেখ করায় একথাও প্রতীয়মান হয় যে, সেখানে বলবর্ধকরূপে খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। বেহেশতবাসীগণ খাদ্যগ্রহণ করবেন কেবল আস্বাদগ্রহণের জন্য।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং তাদের পার্শ্বে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ (৫২)। এটা হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি (৫৩)। এটা তো আমার দেওয়া রিজিক যা নিঃশেষ হবে না (৫৪)'। একথার অর্থ— আর ওই বেহেশতবাসীদের সঙ্গিনী ও সহচরী হবে আয়তলোচনা হুরীগণ। তারা উভয়েই হবে যৌবনদীপ্ত ও যৌবনময়ী। হে বিশ্বাসীবৃন্দ! শোনো, এটাই হচ্ছে সেই অক্ষয় উপহার, মহাবিচারদিবসের আগমনে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে আমা কর্তৃক প্রদত্ত অনন্য অনুগ্রহ, যা অনিঃশেষ।

এখানে 'ক্বসিরাতুত্ ত্বরফি' অর্থ আয়তনয়না, যাদের দৃষ্টি কেবল তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি পতিত হবে না। 'আত্রাব' অর্থ সমবয়স্কা। শব্দটি 'তরব' এর বহুবচন। আর সমবয়স্কা অর্থ বেহেশতবাসীরা যেমন হবে তেত্রিশ বৎসরের যৌবনদীপ্ত পুরুষ, তেমনি তাদের আনতনয়না সঙ্গিনীরাও হবে তেত্রিশ বৎসরের উষ্ণবয়সিনী রমণী। মুজাহিদ বলেছেন, তাদের নিজেদের মধ্যে থাকবে সহোদরা ভগ্নির মতো সম্প্রীতি। সপত্নীদের মতো ঈর্ষাপরায়ণা তারা হবে না।

'ইয়াওমিল হিসাব্' অর্থ হিসাব দিবস, মহাবিচারের দিবস। এখানকার 'লাম' অক্ষরটি সময়নির্ধারক। অর্থাৎ বিচার দিবসেই নির্ধারণ করা হবে বর্ণিত অনুগ্রহসম্ভার। অথবা এখানে 'লাম' অর্থ 'ফী' (মধ্যে)। অর্থাৎ বিচার দিবসের মধ্যেই নির্ধারণ করা হবে কথিত নেয়ামতরাশি।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

❑ ইহাই। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্টতম পরিণাম—

❑ জাহান্নাম, সেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

❑ ইহা সীমালংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

❑ আরও আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।

❑ 'এই তো এক বাহিনী, তোমাদের সংগে প্রবেশ করিতেছে।' 'উহাদের জন্য নাই অভিনন্দন, ইহারা তো জাহান্নামে জ্বলিবে।'

❑ অনুসারীরা বলিবে, 'বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নাই। তোমরাই তো পূর্বে উহা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছ। কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!'

❑ উহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে ইহা আমাদের সম্মুখীন করিয়াছে, জাহান্নামে তাহার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।'

❑ উহারা আরও বলিবে, 'আমাদের কী হইল যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না।

❑ 'তবে কি আমরা উহাদিগকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করিতাম; না উহাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে?'

❑ ইহা নিশ্চিত সত্য— জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হাজা'। এর অর্থ— এটাই। অর্থাৎ এই যে পরকালের পুরস্কারসমূহ, এসকল পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে কেবল তাদের জন্য, যারা মুত্তাকী (সাবধানী, আল্লাহ্ভীরু)। কথাটি সম্পর্কযুক্ত ইতোপূর্বে বর্ণিত বেহেশ্তবিষয়ক আয়াতগুলোর সঙ্গে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম'। একথার অর্থ— পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্ভীরু নয়, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তাদের পরিণাম অত্যন্ত অশুভ। এখানে 'ত্বগীন' অর্থ সীমালংঘনকারী, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের। আর 'মাআব্' অর্থ পরিণাম, প্রত্যাবর্তনস্থল।

পরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কতো নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল'। এখানে 'মিহাদ' অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল, বিছানা। এখানে জাহান্নামকে 'বিছানা' বা 'শয্যা' বলা হয়েছে রূপকার্থে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এটা সীমালংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ (৫৭)। আরো আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি'(৫৮)।

এখানে 'হাজা' অর্থ এই শাস্তি, যা নির্ধারিত রয়েছে সীমালংঘনকারীদের জন্য। 'হামীম' অর্থ ফুটন্ত পানি। আর এখানকার 'গাস্সাক্ব' কথাটির অর্থ বিভিন্ন মনিষী করেছেন বিভিন্নভাবে। যেমন হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'গাস্সাক্ব' হচ্ছে বরফের চেয়ে অধিক হিম এমন এক বস্তু যা জাহান্নামীদেরকে এমনভাবে জ্বালিয়ে দিবে, যেমনভাবে জ্বালিয়ে দেয় আগুন। মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, যে বস্তুর শীতলতা চূড়ান্ত পর্যায়ের, তাকেই বলে গাস্সাক্ব। কেউ কেউ বলেছেন, এটা তুর্কী শব্দ। তুর্কী ভাষায় অত্যন্ত দুর্গন্ধদায়ক বস্তুকে বলে 'গাস্সাক্ব'। কাতাদা বলেছেন, 'গাস্সাক্ব' হচ্ছে বহমান তরল পদার্থ, যেমন বলা হয় 'গাসাকক্বাত্' (ওই বস্তু বয়ে গিয়েছে)। আর এখানে শব্দটির অর্থ হবে— সেই পুঁজ ও কাঁচা রক্ত, যা বয়ে যেতে থাকবে জাহান্নামীদের চামড়া, গোশত ও গোপনাঙ্গ থেকে।

আতিয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বায়হাকী বলেছেন, 'গাস্সাক্ব' অর্থ বয়ে যাওয়া কাঁচা রক্ত। ইব্রাহিম ও আবু রযীনের মন্তব্যও এরকম। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্দুন্ইয়া ও জিয়া বলেছেন, 'গাস্সাক্ব' হচ্ছে জাহান্নামের ভিতরের একটি ঝর্ণা যার মধ্যে থাকবে বিষাক্ত সরীসৃপসমূহ। ওই ঝর্ণায় জাহান্নামীদেরকে একবার চুবানো হলেই তাদের হাড় গোড় থেকে চামড়া গোশত আলাদা হয়ে পায়ের গোড়ালীর কাছে গিয়ে পড়বে এবং মানুষ যেভাবে লুটিয়ে পড়া কাপড় বারবার টেনে তুলতে থাকে, তেমনি তারাও চামড়া-গোশত টেনে তুলতে থাকবে বারবার।

'আরো আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি' অর্থ 'ফুটন্ত পানি' 'পুঁজ' ইত্যাদির মতো আরো অনেক রকম ভয়ংকর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে জাহান্নামীদের জন্য।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এই তো এক বাহিনী, তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, এরাতো জাহান্নামে জ্বলবে(৫৯)। অনুসারীরা বলবে, বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো পূর্বে এটা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছো। কতো নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল'(৬০)।

'হাজা ফাওজুম্ মুক্বতাহিমুম্ মাআকুম' অর্থ এই তো এক বাহিনী তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করেছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, জাহান্নামের ব্যবস্থাপকেরা জাহান্নামীদের দলপতিদেরকে লক্ষ্য করে এরকম বলবে। আর এরকম কথা তারা বলবে তখন, যখন জাহান্নামী নেতা-জনতা সকলেই প্রবেশ করতে থাকবে জাহান্নামে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটি হবে জাহান্নামী নেতাদের। তারা একজন আর একজনকে বলবে, এই দ্যাখো, তোমার অনুসারীরাও তোমার সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করছে। 'ইক্বতাহিম' অর্থ আতঙ্কিত হয়ে বাধ্যগতভাবে কোনোকিছুর মধ্যে প্রবেশ করা। কালাবী বলেছেন, তাদেরকে তখন গদা দিয়ে পেটানো হবে। পিটুনির ভয়ে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে নিক্ষেপ করবে জাহান্নামে।

আমি বলি, বক্তব্যটির মর্মার্থ হতে পারে এরকমও— রসুল স. ও তাঁর খলিফাগণ মানুষের কটিদেশ পশ্চাদ্দিক থেকে আকর্ষণ করে তাদেরকে দোজখে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু অনেকেই তা মানছে না। জোর করে ঢুকে

পড়ছে দোজখে এবং এমন সব কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে, যা দোজখগমনকে অবধারিত করে দেয়। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার ও তোমাদের উপমা এরকমঃ এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো। আগুন যখন প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠলো, তখন চতুর্দিক থেকে কীট পতঙ্গ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো ওই আগুনে। লোকটি তাদেরকে প্রাণপনে বাধা দিতে থাকলো কিন্তু সে বাধা তারা মানলো না। আমিও তোমাদেরকে এভাবে দোজখে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে বাধা দেই। বলি, হে মানুষ। দোজখাগ্নি থেকে দূরে থাকো। কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনতে চাও না। বোখারী, মুসলিম।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, 'এইতো এক বাহিনী তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে' এরকম কথা হয়তো একদল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের অন্য এক দলকে তৃতীয় আর একদল সম্পর্কে বলবে। অর্থাৎ বলবে, দ্যাখো দ্যাখো, ওই দলটিও তোমাদের শাস্তির অংশীদার হয়েছে। তোমাদের সঙ্গেই প্রবেশ করছে দোজখে। তারা আরো বলবে, সাধুবাদের উপযোগী এরা নয়। এরা দোজখে জ্বলবেই।

উল্লেখ্য, নেতাদের এরকম মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জনতাও পাল্টা বিবৃতি দিবে। তাদের কথা ফিরিয়ে দিবে তাদেরই দিকে। সেকথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে— অনুসারীরা বলবে, তোমরাও জ্বলবে দোজখে। অভিনন্দন পাওয়ার মতো কোনোকিছু তো তোমাদেরও নেই। তোমরাই তোমাদের নিজেদের ও আমাদের জন্য পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা করেছো দোজখবাসের। হায়! কতো নিকৃষ্ট এই আবাস— তোমাদের জন্য। আমাদের জন্যও।

'লা মারহাবা' অর্থ নেই কোনো অভিনন্দন, সাধুবাদ। একথাটি একটি অপপ্রার্থনা বা বদদোয়া, যা প্রথমে বলবে নেতারা তাদের অনুসারীদের সম্পর্কে। তারপর বলবে— এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে তাদের নিজেদের কর্মদোষে। অথবা কথাটি এখানে হবে 'ফাওজুন' এর বিশেষণ। অর্থাৎ এরকম অপপ্রার্থনা করা হবে দোজখে প্রবেশরত সেই দল সম্পর্কে। উল্লেখ্য, কারো শুভাগমনকে আরববাসীরা স্বাগত জানায় 'মারহাবা' বলে। আবার কারো অশুভ কামনায় বলে 'লা মারহাবা'। 'রহব' এর শাব্দিক অর্থ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত স্থান।

এরপরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে এটা আমাদের সম্মুখীন করেছে, জাহান্নামে তার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ করো'। এরকম বলে জাহান্নামী জনতা দ্বিগুণশাস্তি প্রার্থনা করবে তাদের নেতাদের জন্য।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'তারা আরো বলবে, আমাদের কী হলো যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে

পাচ্ছি না'। একথার অর্থ— ওই জাহান্নামীরা তখন একথাও বলতে থাকবে যে, কী ব্যাপার! ওই লোকগুলোকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না কেনো, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে মন্দ লোক বলে ভাবতাম।

এখানকার 'আশ্‌রর' শব্দটি 'শারীর' এর বহুবচন। এর অর্থ দুষ্ট লোক বা মন্দ মানুষ। শব্দটি 'খইর' (উত্তম) এর বিপরীত অর্থ বোধক। 'উত্তম' সর্বজনকাম্য এবং 'মন্দ' সর্বজনঘৃণ্য। উল্লেখ্য, তাদের 'আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম' কথাটির উদ্দেশ্য দরিদ্র সাহাবীবৃন্দ। যেমন হজরত আম্মার, হজরত সুহাইব, হজরত বেলাল, হজরত ইবনে মাসউদ প্রমুখ।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম; না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে'? বাক্যের প্রথম প্রশ্নটি (তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম) এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— তাহলে তো আমরা বিনা কারণেই তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বলে মনে করতাম। যারা বলেছেন, পরের প্রশ্নটি (না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে) তিরস্কারসূচক ও বিস্ময়প্রকাশক। আর এই বাক্যের একটি অংশ এখানে অনুক্তও রয়েছে। ওই অনুক্ত কথাটিসহ এখানকার পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কী বিস্ময়! ওই লোকগুলোকে আমরা এখানে দেখছি না কেনো, যাদেরকে আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম। তারা কি এখানে নেই? না কি আমরাই হয়েছি দৃষ্টিহীন, অথবা ভ্রমদৃষ্টিসম্পন্ন।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'এটা নিশ্চিত সত্য— জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ'। এখানে 'ইন্না জালিকা' অর্থ এ সকল বিবরণ। অর্থাৎ আমি এতক্ষণ ধরে দোজখবাসীদের কথোপকথন সম্পর্কে যে বিবরণ দিলাম, তা সন্দেহাতীতরূপে সত্য। 'হাক্কুন' অর্থ সত্য। আর 'তাখাসুমু' (বাদ-প্রতিবাদ) শব্দটি হচ্ছে 'সত্য' (হাক্কুন) এর অনুবর্তী, অথবা অন্য কোনো উহ্য 'উদ্দেশ্য' এর বিধেয়। উল্লেখ্য, দোজখীদের নিজেদের মধ্যকার আলাপচারিতা হবে বাদানুবাদের পর্যায়ের। তাই তাদের কথাবার্তাকে এখানে বলা হয়েছে 'বাদ-প্রতিবাদ'। আর ইতোপূর্বের আয়াতগুলোতেও বিবৃত হয়েছে তাদের বাদ-প্রতিবাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৬৫, ৬৬, ৬৭. ৬৮. ৬৯, ৭০

❑ বল, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোন ইলাহ্ নাই আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি এক, যিনি প্রবল প্রতাপশালী,
❑ 'যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি মহাক্ষমাশীল।'
❑ বল, 'ইহা এক মহাসংবাদ,
❑ 'যাহা হইতে তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইতেছ।
❑ 'ঊর্ধ্বলোকে তাহাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।
❑ 'আমার নিকট তো এই ওহী আসিয়াছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।'

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম নবী! আপনি মক্কার পৌত্তলিকদের কাছে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন এভাবে— হে মক্কাবাসী! আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি সেই এক, অবিভাজ্য মহাপ্রতাপশালী ও সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তির আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করণার্থে, যিনি ব্যতীত অন্য উপাস্যের অস্তিত্ব মাত্রই নেই। তিনি গগনমণ্ডল, মেদিনী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তীর সকল কিছুর সৃজয়িতা ও পালয়িতা, যিনি পাপীদের প্রতি পরাক্রম প্রকাশকারী এবং পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি মহাক্ষমাপরবশ।

এখানে 'ইন্নামা আনা মুনজির' অর্থ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। পৌত্তলিকদের কতিপয় অপমন্তব্যের সঙ্গে রয়েছে কথাটির যোগাযোগ। যেমন, তারা রসুল স. কে অভিহিত করতো 'যাদুকর'। আবার কখনো বলতো 'মিথ্যাবাদী', কখনো বলতো 'কবি' । তাদের ওই সকল অপবচনের জবাব দিতে বলা হয়েছে এখানে। তাঁকে বলতে বলা হয়েছে— হে আমার নবী! আপনি তাদেরকে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিন যে, তোমরা যে সকল বিশেষণে আমাকে বিশেষায়িত করে চলেছো, সেগুলোর কোনোটাই আমি নই। আমি হচ্ছি মহাপরাক্রমশালী এবং মহা ক্ষমাপরবশ আল্লাহ্র অসন্তোষ ও শাস্তি সম্পর্কে একজন সতর্ককারী মাত্র।

'ওয়ামা মিন ইলাহিন ইল্লাল্লহু' অর্থ এবং কোনো ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ব্যতীত। একথাটির সম্পর্ক রয়েছে পৌত্তলিকদের আর একটি অপবচনের সঙ্গে। যেমন, তারা বলেছিলো 'সে কি বহু ইলাহ্কে এক ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে' (আয়াত ৬৫)। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে—বহু ইলাহ্কে এক ইলাহ্ বানানোর প্রশ্ন আবার আসে কীভাবে? আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো 'ইলাহ্'র তো অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। আল্লাহ্ই একমাত্র, এক, একক ও অবিভাজ্য ইলাহ্। সত্তা গুণবত্তা-কার্যকলাপ সর্ববিষয়েই তিনি এক ও অংশীবিহীন।

'আল্কৃহ্হার' অর্থ প্রবল প্রতাপশালী। আল্লাহ্র এই নামটি উল্লেখ করে পৌত্তলিকদেরকে দেওয়া হয়েছে প্রচণ্ড ধমক। অর্থাৎ তারা যেনো একথা মনে রাখে যে, সকলের এবং সকল কিছুর উপরে তাঁর প্রতাপ অবশ্যম্ভাবী।

'আযীযুল গাফ্ফার' অর্থ পরাক্রমশালী, মহা-ক্ষমাশীল তিনি কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে তা প্রতিহত করার কেউ নেই। আর 'গাফফার' অর্থ এমন মহাক্ষমাপরবশ যে, যাকে খুশী তাকেই তিনি দান করতে পারেন মার্জনা। এ ব্যাপারেও বাধা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। এভাবে 'পরাক্রম' ও 'ক্ষমা' দু'টি গুণই এখানে প্রমাণ হয়েছে আল্লাহ্র এককত্বের এবং যুগপৎ হয়েছে কাফেরদের জন্য হুমকি এবং ইমানদারদের জন্য আশ্বাস।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বল, এটা এক মহাসংবাদ(৬৭), যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো'(৬৮)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি মক্কার অংশীবাদীদেরকে জানিয়ে দিন, এই কোরআনে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার এককত্ব ও গুণবত্তার সংবাদ, যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও মুজাহিদ।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'হুয়া' (এটা) সর্বনামটির উদ্দেশ্য শেষ বিচারের দিবস। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আম্মা ইয়াসাআ'লূনা আ'নিন্ নাবাইল আ'জীম' (তারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই

মহাসংবাদ বিষয়ে)। এখানেও 'নাবাইল আ'জীম' অর্থ শেষ বিচারের দিন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ হবে— আমি যে তোমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি এবং আল্লাহ্র যে গুণাবলীর কথা জানাচ্ছি, এটাই হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সংবাদ। এরকম ব্যাখ্যা করলে কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোনো ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ব্যতীত' (আয়াত ৬৫) এর সঙ্গে।

'যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো' অর্থ যারা জ্ঞানী, তাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত হবে না এই মহাসংবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, অথচ হে মক্কার গোত্রপতিরা, তোমরা তা-ই করছো। নিজেদেরকে নিমজ্জিত রেখেছো ঔদাসীন্যের অতল গহ্বরে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিলো না (৬৯)। আমার নিকট তো এই ওহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী'(৭০)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি তাদেরকে আরো বলুন, প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদম সৃষ্টির সূচনালগ্নে ফেরেশতারা মানুষ সৃজনের ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিলো। একথা আমাকে আগে জানানো হয়নি। আমাকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কেবল এই বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে প্রচার করতে বলা হয়েছে যে, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি প্রেরিত এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তাই তো আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে চলেছি বার বার।

এখানে 'আল্মালাইল আ'লা' অর্থ ঊর্ধ্বলোকবাসী ফেরেশতা। 'ইজ ইয়াখ্তাসিমূন' অর্থ যখন ওই ফেরেশতারা বাদানুবাদ করছিলো। উল্লেখ্য, অদৃশ্য

জ্ঞান ফেরেশতাদের নেই। মানুষ সৃষ্টির নেপথ্যে আল্লাহ্তায়ালার যে অনড় মহাঅভিপ্রায় ছিলো, তা-তারা জানতো না। তাই অজ্ঞতাবশতঃ তখন লিপ্ত হয়েছিলো বাদানুবাদে।

কোনো কোনো ধর্মজ্ঞ বলেছেন, এখানকার 'ইয়াখ্তাসিমূন' অর্থ বাদানুবাদ নয়, আলাপচারিতা। ফেরেশতারা ওই আলাপচারিতার মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ যখন বললেন, 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই' তখন ফেরেশতারা বললো, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কোনো সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবে, যারা ইতোপূর্বে সেখানে প্রতিষ্ঠিত জ্বিনদের মতো ঘটাবে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত?

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ হাজরামী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমি আমার মহামহিম প্রভুপালনকর্তাকে অতুলনীয় মনোহররূপে দেখলাম। তিনি শুধালেন, শোনো, ঊর্ধ্বলোকবাসীরা কোন প্রসঙ্গে বাদানুবাদ করছে। আমি নিবেদন করলাম, হে আমার পরম প্রভুপালক! তুমিই তা উত্তমরূপে জানো। তখন তিনি আমার স্কন্ধদেশের মধ্যবর্তী স্থলে তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হস্ত স্থাপন করলেন। ওই কর স্পর্শের শীতলতা আমি অনুভব করলাম আমার বক্ষাভ্যন্তরেও। খুলে গেলো অদৃশ্য জ্ঞানের তোরণ। আমি অবগত হলাম আকাশ-পৃথিবীর সকল ঘটিত, ঘটমান ও ঘটিতব্য বিষয়। এ পর্যন্ত বলার পর তিনি স. পাঠ করলেন 'ওয়া কাজালিকা নূরী.... মিনাল মু'ক্বিনীন' (এভাবেই আমি ইব্রাহিমকে দেখিয়েছিলাম নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য। যাতে সে হয় দৃঢ়বিশ্বাসীগণের দলভূত)। তারপর বললেন, তখন আল্লাহ্ প্রশ্ন করলেন, এবার বলো, ঊর্ধ্বলোকে কি নিয়ে বাদানুবাদ চলছে? আমি বললাম, কী করলে পাপমোচন হয়, সে বিষয়ে। তিনি বললেন, কোন কোন বিষয় পাপ মোচন করে। আমি বললাম, পায়ে হেঁটে নামাজের জামাতের দিকে ধাবমান হওয়া, এক নামাজ শেষে পরবর্তী নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা, হিমশীতল পানি দিয়ে ওজু করা কষ্টকর হলেও উত্তমরূপে ওজু সম্পন্ন করা। যারা এগুলো করবে, তারা কল্যাণের সঙ্গে বেঁচে থাকবে এবং মৃত্যুবরণ করবে শুভপরিণতির সঙ্গে। পাপ দূর করে তাদেরকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে, যেমন তারা ছিলো মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক্কালে। আবার পাপমোচনের পর মর্যাদা প্রাপ্তিরও আমল রয়েছে অনেক। যেমন নিরন্নকে অন্নদান, মুসলমানকে অগ্রে সালাম প্রদান, গভীর নিশিথের নামাজ পাঠ, যখন সকল মানুষ থাকে নিদ্রামগ্ন। আমার পরম প্রভুপালক তখন বললেন, বলো, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছ থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ প্রার্থনা করছি, সামর্থ্য প্রার্থনা করছি মন্দ ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিত্যাগের। আর আকাংখা পোষণ করছি দরিদ্র জনতার ভালোবাসা পাওয়ার, যাচনা করছি তোমার ক্ষমা ও দয়া। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করো ও অনুগ্রহ করো। যখন কোনো সম্প্রদায়কে তুমি পরীক্ষায় নিপতিত করতে চাও, তৎপূর্বেই ঘটিয়ো আমার জীবনাবসান। রসুল স. বলেছেন, শপথ সেই সত্তার যাঁর অধিকারে

রয়েছে আমার জীবন, এ সকল বিবরণ নিঃসন্দেহে সত্য। বাগবী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ও শরহে সুন্নাহ্'য়। দারেমীর বর্ণনায় তারপর রসুল স. পাঠ করলেন' ওয়া কাজালিকা..... মিনাল মু'ক্বিনীন' পর্যন্ত পাওয়া যায়। তিরমিজি এই হাদিস হাজরামির বরাত দিয়ে বাগবীর বর্ণনা থেকে উল্লেখ করেছেন এবং হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল সূত্রে কিছু শব্দের হের ফের সহ এরকমই বর্ণনা করেছেন।

পাপমোচনের উপায় সম্পর্কে ফেরেশতাদের বাদানুবাদের অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, তাদের একদল অন্য দলের সঙ্গে বর্ণিত পুণ্যকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করবার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে থাকে এবং কে আগে তা আল্লাহ্র দরবারে উপস্থাপন করতে পারে তাই নিয়ে করতে থাকে বাদ-প্রতিবাদ, যেমন হজরত রেফায়া ইবনে রাফে বলেছেন, আমরা রসুল স. এর পশ্চাতে নামাজ পাঠ করছিলাম। তিনি স. রুকু থেকে মস্তক উত্তোলনের প্রাক্কালে যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বললেন, সঙ্গে সঙ্গে মুসল্লীগণের একজন সশব্দে বলে উঠলেন 'রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাছীরান মুবারাকান ফীহ্'। নামাজ শেষ হলে রসুল স. বললেন, কে এরকম করে বললো? সেই ব্যক্তি বললেন, আমি। তিনি স. বললেন, আমি দেখলাম তিরিশজন ফেরেশতা এই নিয়ে ঠেলাঠেলি করছে যে, কে আগে এই বাণী লিপিবদ্ধ করবে। বোখারী।

'ইন্নামা আনা নাজীরুম্ মুবীন' কথাটি হয়তো 'ইউহা' এর কর্তার প্রতিনিধি। অর্থাৎ আমার কাছে এই প্রত্যাদেশ আসে যে, আমি যেনো আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করি। অথবা বর্ণিত বাক্যাংশ ক্রিয়ার কারণ এবং 'ইউহা' কর্মসম্পাদনকারীর প্রতিনিধি স্বরূপ সেই ক্রিয়ামূল যা কর্ম থেকে বোধগম্য হয়। অর্থাৎ আমার কাছে প্রত্যাদেশ আসে এই উদ্দেশ্যে যে, আমি হচ্ছি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। উল্লেখ্য, নবুয়ত প্রদানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, নবীগণ তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের অবাধ্য জনতাকে আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করবেন।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানকার 'মহাসংবাদ' কথাটির অর্থ হজরত আদম ও ইবলিসের ইতিবৃত্ত এবং কোনো কিছু না শুনেই সংবাদ প্রদান। আর 'মালাউল আ'লা' (ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ) অর্থ তাদের বেহেশতচ্যুত হওয়ার বিষয়ে বাদানুবাদ। ফেরেশতারা, হজরত আদম ও ইবলিস সকলেই একসময় ঊর্ধ্বলোকের অধিবাসী ছিলো এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিলো পারস্পরিক বাদানুবাদ।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত **৭১—৮৫**

❑ স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমি মানুষ সৃষ্টি করিতেছি কর্দম হইতে,

❑ 'যখন আমি উহাকে সুষম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহার প্রতি সিজ্‌দাবনত হইও।'

❑ তখন ফিরিশ্‌তারা সকলেই সিজ্‌দাবনত হইল—

❑ কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করিল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

❑ তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাহাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রতি সিজ্দাবনত হইতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?'

❑ সে বলিল, 'আমি উহা হইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে।'

❑ তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত।

❑ 'এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হইবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত।'

❑ সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন উত্থান দিবস পর্যন্ত।'

❑ তিনি বলিলেন, 'তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইলে—

❑ 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'

❑ সে বলিল, 'আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি উহাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করিব,

❑ 'তবে উহাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদিগকে নহে।'

❑ তিনি বলিলেন, 'তবে ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি—

❑ 'তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।'

এখান থেকে শুরু হয়েছে প্রথম মানুষ সৃষ্টির কাহিনী। তৎসঙ্গে বিবৃত হয়েছে ইবলিস ও তার দুর্বৃত্তপরায়ণতার বিবরণ। প্রথমে বলা হয়েছে— 'স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম থেকে'।

এখানে 'ইজ্ ক্বলা' (স্মরণ করো) বলে দেওয়া হয়েছে ওই বিষয়ের বিবরণ, যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে বলা হয়েছিলো 'ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিলো না'। সুরা বাকারার তাফসীরে বিষয়টির সবিস্তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে। আর এখানে বিষয়টি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য সেই বিস্তারিত ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মূল উদ্দেশ্য এই উপদেশটি দেওয়া যে— ইবলিস অহংকারবশতঃ হজরত আদমকে অস্বীকার করেছিলো, তেমনি মক্কার মুশরিকেরাও অহমিকা ভরে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে রসুল স.কে। সুতরাং তাদের পরিণতি হবে ইবলিসের মতোই। চিরদুর্দশাগ্রস্ত ও চিরঅপমানিত হওয়াই তাদের ললাট-লিখন।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে আল্লাহ্ কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে ফেরেশতাদের কথিত বাদানুবাদের কথা বলেছেন। অথবা 'মালাইল আ'লা' হচ্ছে কেবলই ঊর্ধ্বলোক। আর সেখানকার কথোপকথনে আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ সকলেই অন্তর্ভূত।

পরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'যখন আমি তাকে সুষম করবো এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রতি সেজদাবনত হয়ো (৭২)। তখন ফেরেশতারা সকলে সেজদাবনত হলো— (৭৩) কেবল ইবলিস ব্যতীত, সে অহংকার করলো এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো (৭৪)'।

এখানে 'ইজা সাওয়াইতুহু' অর্থ যখন আমি তাকে সুষম করবো, সম্পন্ন করবো তার গঠন প্রক্রিয়া। 'ইস্তাক্বারা' অর্থ সে অহংকার করলো। অর্থাৎ অহংকারবশতঃ হয়ে গেলো আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচারী। অথবা আল্লাহ্র আনুগত্যের চেয়ে নিজস্ব চিন্তাকে মনে করলো বড়। আর এখানকার 'কানা মিনাল কাফিরীন' (এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো) কথাটির 'কানা' একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র অনন্ত জ্ঞানে তার সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই সে ছিলো কাফের, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

এরপরের আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সেজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন'?

এখানে 'খলাক্বতু বিইয়াদাইয়া' অর্থ আমি সৃষ্টি করেছি নিজ হাতে। এখানকার 'হাত' কোরআন মজীদের অন্যান্য অসম(মুতাশাবিহ্) শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী যুগের আলেমগণ শব্দটির সরাসরি অর্থই গ্রহণ করেছেন। তবে বলেছেন, এর প্রকৃত অর্থ কী, তা আমরা জানি না। কেননা আল্লাহ্তায়ালা আনুরূপ্যবিহীন, আকার-প্রকারাতীত। সুতরাং আকারসম্ভূত শরীর, হাত তাঁর থাকতেই পারে না। পরবর্তী যুগের আলেমগণ অবশ্য 'নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি' কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— পিতামাতার মাধ্যমে মানব সৃজন হচ্ছে আমা কর্তৃক প্রদত্ত বিধান। কিন্তু সেই বিধানের অধীনে আমি আদমকে সৃষ্টি করিনি, সৃষ্টি করেছি সরাসরি, পিতামাতার মাধ্যম ব্যতিরেকে।

'ইয়াদাইয়া' এর শাব্দিক অর্থ দু'হাতে। এখানকার এই দ্বিত্বের কারক এ বিষয়টিই তুলে ধরেছে যে, আল্লাহ্পাক হজরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব নৈপুণ্য ও অপার ক্ষমতায়।

'আস্তাক্বারতা' (তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে) কথাটি এখানে ধমক প্রদায়ক, ভর্ৎসনামূলক ও নেতিবাচক প্রশ্ন। এর মর্মার্থ— কোনো অধিকার ছাড়াই তুমি হয়ে গিয়েছিলে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

'আম কুন্‌তা মিনাল আ'লীন' অর্থ না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? অর্থাৎ নাকি তুমি হয়ে গিয়েছো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?

এরপরের আয়াতে (৭৬) বলা হয়েছে— 'সে বললো, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো এবং তাকে সৃষ্টি করেছো কর্দম থেকে'। এখানে 'সে বললো' অর্থ ইবলিস বললো। অর্থাৎ ইবলিস তার অপকর্মের পক্ষে আবার যুক্তিও উত্থাপন করলো। বললো, আগুন মৃত্তিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই অনলজ আমি মৃত্তিকাজাত আদমের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাধারী। সে কারণেই আমি তাকে সেজদা করা থেকে বিরত থেকেছি। তার এমতো যুক্তি যে অসার, অচল ও অযথার্থ তা বলাই বাহুল্য। যথার্থ যুক্তি তো এই যে, যিনি সৃজয়িতা ও পালয়িতা, তাঁর নির্দেশ অবশ্যমান্য।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত (৭৭)। এবং তোমার উপর আমার লানত স্থায়ী হবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত' (৭৮)।

এখানে 'বের হয়ে যাও' অর্থ বের হয়ে যাও এই বেহেশত, অথবা এই আকাশ থেকে। হাসান ও আবুল আলিয়া কথাটির অর্থ করেছেন— এই সুন্দর পরিবেশ থেকে বের হয়ে যাও, যেখানে তোমাকে সৃজন করা হয়েছিলো। হাসান ইবনে ফজল বলেছেন, এই ব্যাখ্যাটিই উত্তম। উল্লেখ্য, ইবলিসের উপরে এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো বলেই বিতাড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা হয়ে গিয়েছিলো কালো ও কুৎসিত।

'ফা ইন্‌নাকা রজ্বীম' অর্থ নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত। অর্থাৎ আদমকে অসম্মান করার কারণেই তুমি এবার বিতাড়িত হলে।

'লা'নত' অর্থ অভিসম্পাত, অভিশাপ। আর এখানে তোমার উপর আমার লানত স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত কথাটির উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, মহাবিচারের দিবসের পরে ইবলিস আর অভিসম্পাতগ্রস্ত থাকবে না। বরং কথাটির প্রকৃত অর্থ হবে— মহাবিচার দিবস পর্যন্ত তুমিতো অভিসম্পাতগ্রস্ত অবস্থায় থাকবেই, তারপরেও অভিশপ্ত অবস্থায় ভোগ করতে থাকবে দোজখের অনন্ত শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত'। এখানে 'ফান্‌জির্‌নী' অর্থ অবকাশ দাও। কথাটি বলা হয়েছে আগের বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই কথাটির প্রথমে সংযোজিত হয়েছে 'ফা' অব্যয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে—(৮০) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত' (৮১)। এখানে 'ফা ইন্‌নাকা মিনাল মুন্‌জারীন' অর্থ তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে। এখানকার 'ফা' কার্যকারণ প্রকাশক। অর্থাৎ ইবলিসের নিবেদনের কারণেই দেওয়া হয়েছে এরকম জবাব। প্রকৃত কথা হচ্ছে তাকে অবকাশ প্রদানের বিষয়টি আল্লাহ্‌র অবগতিতে আগে থেকেই ছিলো। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটলো ইবলিসের প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে। আর এখানকার 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত' অর্থ হজরত ইস্রাফিলের শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত। সুরা হিজরের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

এর পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সে বললো, আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করবো (৮২), তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়' (৮৩)।

এখানকার 'ফা বিই'য্‌যাতিকা' (তোমার সম্মানের শপথ) কথাটির 'ফা'অব্যয়টি কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ ইবলিস বিভ্রান্ত করণের প্রবল বাসনা পূরণ করতে পারলো অবকাশপ্রাপ্তির কারণেই। অবকাশ না পেলে সে কিছুতেই এরকম সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে পারতো না। আর ইবলিস আল্লাহ্‌র মহাসম্মান অথবা মহাক্ষমতার শপথ করেছিলো একারণেই যে, সে যেনো আল্লাহ্‌র ওই অপার ক্ষমতা থেকে আহরণ করতে পারে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার সামর্থ্য।

'মুখলাসীন' অর্থ একনিষ্ঠ বান্দা, বিশুদ্ধচিত্ত দাস। যারা এধরনের মহাপুণ্যবান, তারা সুরক্ষিত। এদেরকে পথচ্যুত করার সাধ্য ইবলিসের নেই। সেকথা সে এখানে অকপটে স্বীকারও করেছে। বলেছে— তবে তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়। যাদেরকে তুমি স্বীয় আনুগত্যের জন্য মনোনীত করে নিয়েছো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তিনি বললেন, তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি— (৮৪) তোমার দ্বারা এবং তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই' (৮৫)। একথার অর্থ— ইবলিসের সঙ্গে আল্লাহ্‌ তাঁর কথোপকথনের

পরিসমাপ্তি টানলেন এভাবে— বললেন, আমার কথা অবশ্যই সত্য। আর আমি সত্যই বলছি হে ইবলিস! তুমি ও তোমার মতো যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, আমি তাদেরকে দিয়ে জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবোই।

এখানে 'ফাল্হাক্কুক্ক' অর্থ আমি সত্য, অথবা আমার প্রতিজ্ঞা সত্য। এখানে বাক্যের উদ্দেশ্য উহ্য রয়েছে। 'হাক্ব' হচ্ছে আল্লাহ্র একটি নাম। অথবা অর্থ হবে— সত্য আমার শপথ। সেক্ষেত্রে বিধেয় হবে উহ্য। আর এখানকার 'ওয়াল হাক্বক্বন আক্বলু' (আর আমি সত্যই বলি) বাক্যটি পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন একটি বাক্য।

'জাহান্নামা মিন্কা ওয়া মিম্মান্ তাবিয়াকা মিন্হুম আজ্মায়ীন' অর্থ তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবোই। তোমাদের একজনকেও ছাড়বো না। উল্লেখ্য, এই অনুজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সকল শয়তান জ্বিন ও প্রত্যেক শয়তান- স্বভাবী মানুষ।

সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৮৬, ৮৭, ৮৮

❑ বল, 'আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং যাহারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

❑ ইহা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।

❑ ইহার সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানিবে, কিয়ৎকাল পরে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বাণীবাহক! আপনি মক্কাবাসীদেরকে জানিয়ে দিন, হে আমার স্বজাতি! এই যে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করে চলেছি, এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় প্রত্যাশা করি না।

এর পর বলা হয়েছে— 'এবং যারা মিথ্যা দাবি করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই'। একথার অর্থ— এই কোরআন আমার নিজস্ব রচনা নয়। এরকম মিথ্যা দাবিও আমি করি না। আর যারা এরকম দাবি করে, তাদের দলভূতও আমি নই। আমি প্রকৃতই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত একজন রসুল।

হজরত ওমর থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, কপটতা ও মনগড়া সকল কিছু থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বাগবী লিখেছেন, মাসরুক

বলেছেন, একবার আমি হজরত ইবনে মাসউদের নিকটে গেলাম। তিনি বললেন, কেউ কোনো বিষয়ে অবহিত থাকলে যেনো তা বলে। নতুবা যেনো বলে 'আল্লাহ্ জানেন'। এরকম বলাও জ্ঞানের একটি শাখা। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন— বলো, আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই'।

আমি বলি, এখানকার দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যটির প্রতি গুরুত্বআরোপক। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কারো কাছে কোনো প্রতিদান চান না, মিথ্যা কোনো কিছু দাবি করা তার পক্ষে অসম্ভব।

পরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'এটাতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র'। একথার অর্থ— হে আমার বচনবাহক! আপনি তাদেরকে আরো জানিয়ে দিন, এই কোরআন মহামূল্যবান উপদেশে পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণতই প্রত্যাদেশিত। আর এই নির্ভুল বৈভবের প্রতিই আমি তোমাদেরকে অভিনিবেশী করে তুলতে চাইছি।

শেষোক্ত আয়াতে (৮৮) বলা হয়েছে— 'এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিয়ৎকাল পরে'। একথার অর্থ— এই কোরআনের সকল বিজ্ঞপ্তি অবশ্যই কার্যকর করা হবে। অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে কোরআন- কথিত পুরস্কার ও তিরস্কার। আর সেই দিন বেশী দূরেও নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা এখানকার 'বা'দা হীন' (কিয়ৎকাল পরে) কথাটির অর্থ করেছেন— মৃত্যুর পরে। ইকরামা অর্থ করেছেন— শেষ বিচারের দিনে। হাসান বলেছেন, মৃত্যু সমুপস্থিত হলেই মানুষের সামনে সত্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়।

আল্লাহ্র অসীম রহমতে সুরা সোয়াদের তাফসীর শেষ হলো আজ ৬ই রজব ১২০৭ হিজরী সনে। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন ওয়া সাল্লাল্লাহুতায়ালা আ'লা খইরি খল্‌ক্বিহী মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মায়ীন।

সূরা যুমার

এই সুরার রুকু সংখ্যা ৮ এবং আয়াত সংখ্যা ৭৫। সুরাখানি অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। কেবল ৫২, ৫৩ ও ৫৪ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪

❑ এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।

❑ আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া।

❑ জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে, 'আমরা তো ইহাদের পূজা এইজন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে।' উহারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিতেছে আল্লাহ্ তাহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

❑ আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বাছিয়া লইতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ্, এক, প্রবল পরাক্রমশালী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তান্‌যীলুল কিতাবি মিনাল্‌লাহিল্ আ'যীযিল হাকীম'। এর অর্থ— এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। এখানে 'তান্‌যীলুল কিতাব' কথাটির উদ্দেশ্য অনুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ এটা হচ্ছে অবতীর্ণকৃত কিতাব। অথবা এই অবতীর্ণকৃত এখানে উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'মিনাল্লহ্' (আল্লাহ্‌র নিকট থেকে)। 'তান্‌যীল' এখানে কর্মপদীয় ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ অবতরণকৃত, অবতারিত।

'আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, সকলের এবং সকল কিছুর উপরে শক্তিমান। 'হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, আপন প্রজ্ঞায় নিপুণ সৃজয়িতা। আর 'কিতাব' অর্থ এখানে কেবল এই সুরা, অথবা এই কোরআন।

পরের আয়াতে (২) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি'। এ কথার অর্থ— হে আমার বচনবাহক! এই মহাগ্রন্থ আমি আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি যথাযথ পদ্ধতিতে। এখানে 'বিল হাক্কুক্ব' অর্থ

সত্যের হিসেবে। 'বা' অব্যয়টি এখানে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ আমি এই মহাগ্রন্থ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে, প্রকাশ করতে এবং বিশদভাবে বর্ণনা করার নিমিত্তে। দৃশ্যতঃ মনে হয় এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের পুনরুক্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। প্রথম বাক্যে 'তান্‌যীলুল কিতাবি' 'গ্রন্থের অবতারণ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে গ্রন্থ অবতারণের উপক্রমণিকা। আর পরবর্তী বাক্যে বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থ অবতারণের নিমিত্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত করো তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে'। একথার অর্থ— কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি এ জন্যে যে, এর মাধ্যমে আপনি ও আপনার একনিষ্ঠ অনুসারীরা আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাহাত্ম্য ও বিধানাবলী সম্পর্কে জানবেন এবং কেবল তাঁর ইবাদত করবেন তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য'। এখানে 'লিল্লাহ্' শব্দটি এসেছে 'দ্বীন' এর পূর্বে। ফলে আল্লাহ্‌র সঙ্গে 'ধর্ম' বা আনুগত্যের সম্পর্কটি হয়েছে অধিকতর সুদৃঢ়। আর আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার বিশুদ্ধ ইবাদতের বিষয়টি এতো অধিক দলিল-প্রমাণ নির্ভর যে, বিষয়টিকে যেনো বলা যায় স্বতঃসিদ্ধ, অথবা সর্বজন-স্বীকৃত। সেকারণেই এ বাক্যের দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য কোনো অব্যয় ব্যবহার করা হয়নি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, উপাস্য হওয়ার সকল যোগ্যতা কেবল তাঁর মধ্যেই বর্তমান। আর তিনিই জানেন কেবল সকলের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত পরিদৃশ্যমান-অদৃশ্য সকল কিছু। সুতরাং সকলের অবিমিশ্র আনুগত্য লাভ করার অধিকার রয়েছে কেবল তাঁর।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দিবে'। একথার অর্থ— মক্কার পৌত্তলিকেরা বলে, আমরা আমাদের দেব-দেবীর প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্ ভেবে তো পূজা করি না। পূজা করি তাদেরকে সুপারিশকারী মনে করে। মনে করি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য আমরা পাবো তাদের মাধ্যমেই।

'যুলফা' এখানে ক্রিয়ামূল। এর অর্থ নৈকট্য, সান্নিধ্য। বাগবী লিখেছেন, শব্দটি নামপদ, যা ব্যবহার করা হয়েছে ক্রিয়ামূলের স্থলে। অর্থাৎ নৈকট্যের সম্পর্ক সম্পূর্ণ করা।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ্ তার ফয়সালা করে দিবেন'। একথার অর্থ— এখন মক্কার পৌত্তলিক ও মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাসগত যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, তা আল্লাহ্ মীমাংসা করে দিবেন অচিরেই, মহাবিচারের দিবসে। পৌত্তলিকদেরকে প্রবেশ করাবেন নরকাগ্নিতে এবং বিশ্বাসীদেরকে দান করবেন বেহেশত।

'হুম' অর্থ তারা। এখানে এই একটি সর্বনামের মাধ্যমেই বিশ্বাসী-নির্বিশ্বাসী সকলকে সচকিত করা হয়েছে। এরকমও হতে পারে যে, পূর্ববর্তী বাক্যের 'আল্‌লাজীনা' এর উদ্দেশ্য একই সঙ্গে হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের, ফেরেশতা, দেব-দেবীদের প্রতিমা। আর 'ইত্‌তাখাজু' এর পরে আলোচ্য বাক্যের 'হুম' সর্বনামটির ক্রিয়ার কর্ম রয়েছে উহ্য। অর্থাৎ তাদের সকল পূজনীয়রাই মিথ্যা উপাস্য, যাদেরকে তারা গ্রহণ করেছে তাদের সুপারিশকারী বা অভিভাবকরূপে।

জুয়াইবিরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, বনী আমর, বনী কেনানা ও বনী সালমা এই ত্রয়ী গোত্রকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। তারা ছিলো পৌত্তলিক। ফেরেশতাদেরকে তারা বলতো আল্লাহ্‌র কন্যা। আরো বলতো, তাদের পূজা করলেই তো আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যভাজন হতে পারবো।

বাগবী লিখেছেন, তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কে? তোমাদের এবং এই আকাশ-পৃথিবীর স্রষ্টা কে? তখন তারা বলতো, আল্লাহ্। তারপর যখন বলা হতো, তাহলে তোমরা প্রতিমা পূজা করো কেনো? তখন তারা বলতো, আল্লাহ্‌র মৈত্রী অর্জনার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যে মিথ্যাবাদী ও কাফের, আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না'। 'কাজিবুন' অর্থ মিথ্যাবাদী অর্থাৎ তার ধারণা করে আল্লাহ্ সন্তানবান ও তাদের আরাধ্যরা সুপারিশ করবে আল্লাহর সকাশে। এবং 'কুফ্‌ফার' অর্থ কাফের, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী, আল্লাহ্‌র নেয়ামতসম্ভারের অবমাননাকারী। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র সমান্তরালে অন্য কাউকে বা কোনো কিছুকে উপাস্য বলে ধারণা করাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুদানসম্ভারের অবমাননা। এ ধরনের মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসীদেরকে পথপ্রদর্শন করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়। যদি ইচ্ছা করতেন, তবে মিথ্যাবাদীরা যেমন মিথ্যার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হতো, তেমনি পৌত্তলিকেরাও বিচ্যুত হতো অংশীবাদিতা থেকে। কেননা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কোনো কিছুরই অস্তিত্ব অসম্ভব। আলোচ্য বাক্যটি সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাক্য। পূর্বাপর বাক্যের সঙ্গে এর বক্তব্যগত কোনো যোগাযোগ নেই।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনি আল্লাহ্, এক, প্রবল পরাক্রমশালী'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যদি সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন তবে ঈসা, উযায়ের অথবা ফেরেশতাগণ কেনো, তিনি যাকে খুশী তাকেই বানাতে পারতেন তাঁর সন্তান-সন্ততি। কেননা সকলে ও সকলকিছুই সর্বোতভাবে তাঁর মুখাপেক্ষী এবং অধিকারভূত। কিন্তু পিতা-পুত্র যে পরস্পরের সমান্তরাল ও একে অপরের ক্ষমতা ও যোগ্যতার অংশীদার হয়। সমগ্র সৃষ্টি যে সৃজন সূত্রভূত। সৃজিত ও সৃজয়িতার মধ্যে একমাত্র সম্পর্ক হতে পারে দাস-প্রভুর, যা পিতা-পুত্র হওয়ার অন্তরায়। অথবা বলা যায়— আল্লাহ্‌পাক যদি কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন তাহলে সে-ও স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে সৃষ্টি করতে

চাইতো। তাই আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় স্রষ্টার অস্তিত্ব অসম্ভব। অধিক সংখ্যক আল্লাহ্র বিদ্যমানতা বাস্তবের পরিপন্থী। কাজেই খোদ আয়াতটিই তার নিঃসন্তান হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।। সুতরাং এমতো অবাস্তব ও অযথার্থ ধারণা থেকে তিনি যে পবিত্র ও মহান, তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ্ হচ্ছেন তাঁর সত্তা-গুণবত্তা কার্যকলাপ সকল কিছুতে এক, অতুল, সাদৃশ্যহীন ও আনুরূপ্যহীন।

'আল্‌ক্বহ্হার' অর্থ প্রবল পরাক্রমশালী। অর্থাৎ তিনি এমন এক পরাক্রমশীলতার অধিকারী, যা সম্পূর্ণরূপে অংশীবাদিতানিরোধক। তিনি যে অজর, অমর, অক্ষয়, অব্যয়, চিরস্থায়ী।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৫, ৬

❑ তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করিয়াছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জানিয়া রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

❑ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন একই ব্যক্তি হইতে। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন আট প্রকার আন'আম। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের প্রতিপালক; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তবে তোমরা মুখ ফিরাইয়া কোথায় চলিয়াছ?

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন'। একথার অর্থ— তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর সুসমঞ্জস পরিকল্পনা অনুসারে এবং এমন শিল্পনৈপুণ্য সহকারে, যাতে করে এই সুবিশাল সৃষ্টি প্রমাণ হয় তাঁর এককত্বের, সর্বজ্ঞতার ও সর্বশক্তিধরতার।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা'। একথার অর্থ— যেমন মানুষ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হয় একটির উপর আরেকটি দিয়ে, তেমনি তিনি রাতের আঁধার দ্বারা দিবসকে এবং দিবসের আলো দ্বারা রাতকে ঢেকে দেন। ফলে পালাক্রমে আবর্তিত হতে থাকে দিন ও রাত। লেফাফা বা খাম যেমন ঢেকে রাখে তার অভ্যন্তরস্থিত বস্তুকে, তেমনি পালাক্রমে দিবস-রজনী আবৃত করে ফেলে পরস্পরকে। অথবা পাগড়ীর ভাঁজের মতো অবিরাম এক ভাঁজকে আবৃত করা হয় অপর ভাঁজ দ্বারা, এভাবেই রাত ও দিনকে ক্রমাগত একটি দ্বারা অপরটি আবৃত করা হচ্ছে। একটিকে আড়াল করে তদস্থলে প্রকাশ ঘটানো হচ্ছে অন্যটির। হাসান ও কালাবী এখানকার আচ্ছাদিত করাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— রাতকে হ্রাস করে দিনকে বৃদ্ধি করা হয় এবং দিনকে কমিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয় রাত্রিকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। জেনে রাখো, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল'। একথার অর্থ— সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপরিক্রমণের নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তিনিই। ওই নিয়মানুসারেই মহাপ্রলয় পর্যন্ত সূর্য-চন্দ্র আবর্তিত হতে থাকবে। জেনে রাখো, রাত্রি-দিবস, সূর্য-চন্দ্রসহ এই সুবিশাল সৃষ্টি যিনি নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণ ও পরিচালন করেন, তার পরাক্রম কতো প্রচণ্ড এবং তার ক্ষমতা কতো বিশাল।

এখানে 'আ'যীয' অর্থ অজেয়, সকল কিছুর উপর পরাক্রমশালী। আর 'গাফ্ফার' অর্থ বড়ই ক্ষমাশীল। সেকারণেই তো তিনি অপরাধীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না এবং ছিনিয়েও নেন না তাদেরকে প্রদত্ত পার্থিব বিত্ত-বৈভব।

পরের আয়াতে (৬)বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন'। একথার অর্থ— হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের জন্ম-ইতিহাস শোনো। তোমাদের সকলের আদি পিতা একজন। আমি তাকেই প্রথম সৃষ্টি করেছি। তারপর তার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততিদেরকে। এখানে 'এক ব্যক্তি থেকে' কথাটির দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয় পিতা-মাতা ব্যতিরেকেই।

এখানে 'অতঃপর তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন' কথাটির মাধ্যমে এমতো ধারণার অবকাশ থেকে যায় যে, তবে কি আল্লাহ্ হজরত আদমের সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করার পরে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পত্নী হজরত হাওয়াকে। যদি তা না-ই হবে, তবে প্রথমে 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন' এরকম বলার পর কেনো বলা হলো যে 'অতঃপর তিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন'? (ছুম্মা) শব্দটির ব্যবহার তো এরকম ধারণারই পরিপোষণা করে। এরকম ধারণা খণ্ডনার্থে আমি বলি—

১. এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটির সংযোগক্রিয়া রয়েছে উহ্য। তাই 'খলাক্বাকুম' (সৃষ্টি করেছেন) এর সঙ্গে কথাটি সরাসরি যুক্ত নয়। অর্থাৎ প্রথমোক্ত বাক্যটির মর্মার্থ হবে এখানে এরকম— আল্লাহ্ প্রথমে একজন মানুষ সৃষ্টি করেন এবং তার নিকট থেকে সৃষ্টি করেন তার জোড়া। ২. অথবা শব্দটি যুক্ত 'ওয়াহিদাতিন' (এক) এর অর্থের সঙ্গে। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে প্রথমে নিঃসঙ্গভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, পরে সৃষ্টি করা হয়েছিলো তার যুগল, তারপর সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদেরকে। ৩. কিংবা শব্দটি 'তোমাদেরকে 'সৃষ্টি করেছেন' এর সঙ্গেই সম্পর্কিত। কিন্তু এর দ্বারা পরবর্তী সম্পৃক্ততাকে বোঝানো হয়নি। বরং এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে দু'টো পৃথক বাক্যের বক্তব্যগত তারতম্যকে। অর্থাৎ প্রথম বাক্যে বিবৃত হয়েছে সৃষ্টির সাধারণ রীতিনীতি এবং পরের বাক্যে বলা হয়েছে পৃথক প্রকৃতির সৃষ্টির কথা। অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী সৃষ্টির কথা।

কোনো কোনো আলেমের মতে এখানকার 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে' কথাটির মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে আত্মার জগতে সম্পাদিত অঙ্গীকারানুষ্ঠানের প্রতি, যখন সকল আত্মাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছিলেন 'আমি কি তোমাদের প্রভুপালনকর্তা নই'? তখন সকলে সমস্বরে বলে উঠেছিলো, 'অবশ্যই'। তখন সকল আত্মাকে নির্গত করা হয়েছিলো হজরত আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে। তাদের মধ্যে একটিকে করা হয়েছিলো তাঁর জীবন সঙ্গিনী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকারের আন'আম'।

'আনযালা' এর শাব্দিক অর্থ তিনি অবতীর্ণ করেছেন। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'দিয়েছেন' অথবা 'সৃষ্টি করেছেন' অর্থে। সরাসরি 'অবতীর্ণ করেছেন' অর্থেও এখানে শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। যদি তাই হয় তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— লওহে মাহ্ফুজে সৃষ্টির আদি-অন্তের সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। সেখানকার নির্ধারণানুসারে পৃথিবীতে তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছেন আট প্রকারের পশু। অথবা কথাটির অর্থ হবে— যে সকল উপকরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণী সৃজন করা হয়, সে সকল উপকরণ তিনি আকাশ থেকেই অবতীর্ণ করেন। যেমন— উল্কা, বৃষ্টি, রৌদ্র ইত্যাদি। কথাটির এরকম অর্থও করা যেতে পারে যে— হজরত আদম সৃষ্টির পর বেহেশতেই তাঁর সাথে সৃজন করা হয়েছিলো গৃহপালিত পশুসমূহ। পরে তাদেরকেও তাঁর সাথে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর 'আট প্রকারের' অর্থ চার প্রকার নর এবং চার প্রকার নারী। যেমন উট-উটনী, গাভী-ষাঁড়, মেষ-মেষী ও ছাগ-ছাগী।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন'। একথার অর্থ— তিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুসহ অন্যান্য প্রাণীকে জন্মপূর্ব অবস্থায় মাতৃগর্ভে রাখেন

অন্ধকারে তিনটি পর্যায়ে— প্রথমে শুক্রকণা, পরে মাংসপিণ্ড এবং তারপরে অস্থিসম্পন্ন অবস্থায়। এরপর গোশতের আবরণ দিয়ে তাতে করা হয় প্রাণের সঞ্চার। অর্থাৎ কথিত ত্রিবিধ অন্ধকার হচ্ছে— মাতৃজঠর, জরায়ু ও ঝিল্লির আবরণের অন্ধকার। অথবা পিতৃপৃষ্ঠের অন্ধকার, গর্ভাশয়ের অন্ধকার এবং উদরের অন্ধকার। কিংবা পিতৃপৃষ্ঠ, মৃত্তিকা ও মাতৃজঠর— এই তিন রকমের অন্ধকার।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের প্রতিপালক; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছো'? একথার অর্থ— তিনিই হচ্ছেন তোমাদের আল্লাহ্, তোমাদের সৃজক, প্রতিপালক। সকলের এবং সকলকিছুর উপর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তাই তিনি ছাড়া উপাসনা গ্রহণের যোগ্য কেউ নয়। তাহলে হে

মানুষ! তাঁর অপার শক্তিমত্তা ও মহাসৃজনের যে সকল দলিল-প্রমাণ এতোক্ষণ ধরে বর্ণনা করা হলো, সে সকলকিছু জেনে শুনে বুঝে কীভাবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যত্র গমন করতে চাও?

এখানে 'জালিকুমুল্লহু রব্বুকুম' অর্থ এই সকল কাজ করার মালিক কেবলই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। 'লাহুলমুল্‌ক্' অর্থ সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। এখানে 'জালিকুম' উদ্দেশ্য, আর 'আল্লাহ্' প্রথম বিধেয়, দ্বিতীয় বিধেয় 'রব্বুকুম', তৃতীয় বিধেয় 'লাহুল মুল্‌ক্' এবং চতুর্থ বিধেয় হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাহুয়া' (তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই)।

'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' অর্থ এখানে— কেউ অথবা কোনোকিছুই যেহেতু তাঁর সৃজনকর্মের অংশীদার নয়, সেহেতু ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা তিনি ব্যতীত অন্য কারো নেই।

'ফাআন্না তুস্‌রাফুন' (তবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছো) কথাটির 'ফা' এখানে কারণপ্রকাশক এবং বিস্ময়প্রকাশক প্রশ্নবোধক। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, বিশদভাবে এতো সব দলিল-প্রমাণ প্রকাশ করার পরেও কী কারণে তোমরা মহাসত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো এবং প্রকৃতউপাস্য আল্লাহ্‌র উপাসনা পরিত্যাগ করে অভিমুখী হচ্ছো ভিত্তিহীন উপাস্যসমূহের দিকে?

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৭, ৮

❑ তোমরা অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি তাঁহার বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য ইহাই পসন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা অবহিত করিবেন। অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সম্যক অবগত।

❑ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তাহার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হইয়া যায় তাহার পূর্বে যাহার জন্য সে ডাকিয়াছিল তাঁহাকে এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল, 'কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করিয়া লও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন'। এখানে 'গনিউন্ আ'ন্‌কুম' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস ও উপাসনার মুখাপেক্ষী তিনি মোটেও নন। 'তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে' কথাটির মধ্যে কর্মফল অনুক্ত রয়েছে, আর 'আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন' কথাটি উল্লেখিত হয়েছে অনুক্ত কর্মপদের স্থলে। সেক্ষেত্রে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ (মূর্তিপূজক) হও, তবে তোমাদের অপবিশ্বাসের দায় তোমাদের উপরেই বর্তাবে, আল্লাহ্‌র উপরে নয়। কেননা আল্লাহ্ তোমাদের এবং তোমাদের বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী নন। বরং তোমরাই সর্বোতক্ষেত্রে তাঁরই মুখাপেক্ষী। অকৃতজ্ঞতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাস দ্বারা উপকৃত হবে তোমরাই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না'। একথার অর্থ— তোমাদের কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা সকল কিছুই তাঁর অভিপ্রায়ানুগত হওয়া সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞতা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং এরশাদ

করেছেন 'আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, ইসলামের জন্য তার বক্ষাভ্যন্তরকে করে দেন প্রশস্ত। আর যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষদেশকে করেন

সংকীর্ণ' (যাতে তার বক্ষে ইসলামের নূর প্রবেশ করতে না পারে)। আমাদের পূর্বসূরী বিদ্বজ্জন এরকমই অভিমত প্রকাশ করেছেন। এমতো বিশ্বাসই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ধর্মজ্ঞগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। কিন্তু পথভ্রষ্ট মুতাজিলাদের বিশ্বাস এর বিপরীত। তারা বলে, পাপ ও অকৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র অভিপ্রায়প্রসূত হয় না। আরো বলে, আল্লাহ্র আদেশ ও অভিপ্রায় একই।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস ও সুদ্দী আলোচ্য বাক্যের মর্মার্থ করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ তাঁর বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতাকে পছন্দ করেন না। আর তাঁর বিশুদ্ধচিত্ত বান্দা তাঁরাই, যাদের সম্পর্কে তিনি ইবলিসকে বলেছেন 'আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব নেই'। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্র 'সন্তোষ'কে রূপক অর্থে 'অভিপ্রায়' বলা যায়। অন্যথায় প্রকৃত কথা হচ্ছে, 'সন্তোষ' ও 'অভিপ্রায়' সমার্থক নয়। অর্থাৎ অভিপ্রায়ের সঙ্গে সন্তোষের সংযোগ অত্যাবশ্যক নয়। অভিপ্রায়ের সম্পর্ক তো ভালো-মন্দ উভয়ের সঙ্গেই হয়ে থাকে। আল্লাহ্র অভিপ্রায় অবশ্যবাস্তবায়নব্য। তিনি যা চান, তা হয়। যা চান না, তা হয় না। কিন্তু তাঁর 'সন্তোষ' ভালোর সঙ্গে। আর মন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর 'অসন্তোষ'। এক আয়াতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের অবশ্যবাস্তবায়নব্যতার কথা বলা হয়েছে এভাবে 'আমি যা করতে ইচ্ছা করি, সে সম্পর্কে শুধু বলি 'হও' অমনি তা হয়ে যায়'।

এরপর বলা হয়েছে— 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন'। একথার অর্থ— যদি তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের প্রতি ইমান আনো এবং তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহ মান্য করে চলো, তবে তিনি তার যথোপযুক্ত প্রতিফল তোমাদেরকে দিবেন। পছন্দনীয় বিষয়াবলীর জন্য পুরস্কার প্রাপ্তিই সঙ্গত। তাই কোনো কোনো আলেম এখানকার 'পছন্দ' অর্থ করেছেন পুরস্কার (সওয়াব)। অর্থাৎ তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তিনি তোমাদেরকে করবেন পুরস্কৃত।

এরপর বলা হয়েছে— 'একের ভার অন্যে বহন করবে না'। একথার অর্থ— একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না। অর্থাৎ তোমাদের অকৃতজ্ঞতাজনিত পাপের বোঝা বহন করবে তোমরাই, অন্য কেউ নয়। তোমরা যদি অকৃতজ্ঞই থেকে যাও, তবে তাতে আমার রসুলের কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি তো তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বার বার তোমাদেরকে সতর্ক করে চলেছেন। আহ্বান জানাচ্ছেন ইসলামের প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে, তিনি তোমাদেরকে তা অবহিত করবেন'। একথার অর্থ— হে মক্কার পৌত্তলিক জনগোষ্ঠী! ভুলে যেয়ো না যে, অবধারিত মৃত্যু শেষে তোমরা তোমাদের প্রভুপালকের সকাশে প্রত্যানীত হবেই। তখন তিনি অবশ্যই তোমাদের স্বস্তি অথবা শাস্তি বিধান করবেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অন্তরে যা আছে, তিনি তা সম্যক অবগত'। একথার অর্থ— সকলের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। তাঁর সর্বত্রব্যাপী জ্ঞানের বাইরে যাবার সাধ্য কারোই নেই। তাই যথাসময়ে তোমাদের কর্মফলের যথোপযুক্ত প্রতিদান তিনি তোমাদেরকে দিবেনই— নির্ধারণ করবেন তোমাদের জন্য চিরস্বস্তি, অথবা চিরশাস্তি।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে'। পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার পূর্বে যার জন্য সে ডেকেছিলো তাঁকে'। একথার অর্থ— মানুষ বিপদে পড়লে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্কে ডাকে, আবার বিপদ দূর হবার পর যে আল্লাহ্ তার বিপদ দূর করেন, সেই আল্লাহ্র কথাই ভুলে যায়। এভাবেই তারা হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ।

এখানে 'মুনীবান' অর্থ ডাকে, আহ্বান করে। 'ইজা খাওয়ালাহু' অর্থ যখন আল্লাহ্ তাকে অনুগ্রহ করেন, করেন বিত্তশালী বা দাস-দাসীর অধিকারী। 'খাওয়াল' অর্থ পরিচারক, সেবক। রসুল স. যাদের সম্পর্কে বলেছেন, এরা তোমাদের ভাই, তোমাদের সেবা করে, আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের করায়ত্ব করে দিয়েছেন। 'খাওয়ালাহু' অর্থ খবরাখবর রাখা, দেখাশোনা করা। এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। আরববাসীরা বলেন, অমুক ব্যক্তি ধনসম্পদের তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ সে ধনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ বা দেখাশোনা করে। নেহায়া, কামুস।

'মা কানা ইয়াদ্উ' ইলাইহি' অর্থ যে দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্কে ডেকেছিলো, সেই আল্লাহ্কেই ভুলে যায়। অথবা সে তার প্রভুপালককে ভুলে যায়, যার কাছে সে কাকুতি মিনতি করে পরিত্রাণপ্রার্থী হতো। 'মা' সাধারণতঃ বিবেকহীন সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও এখানকার 'মা কানা' এর 'মা' ব্যবহৃত হয়েছে 'মান' অর্থে, যা ব্যবহৃত হয়

বিবেকবুদ্ধিসম্পন্নগণের বেলায়। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'ওয়ামা খালাক্বজ্ জাকারা ওয়াল উনছা'। এখানেও 'মা' ব্যবহৃত হয়েছে 'মান' অর্থে।

এরপর বলা হয়েছে—'এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবার জন্য'। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করানোর অর্থই হচ্ছে নিজে বিপথগামী হওয়া ও অন্যের বিপথগামিতার পথ প্রশস্ত করা। এমতো বাকভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে অপর এক আয়াতেও। যেমন— 'মুসাকে ফেরাউনের লোকেরা নদীবক্ষ থেকে উঠিয়ে নিলো এবং মুসা হয়ে গেলো তাদের শত্রু ও দুঃখ-দুর্দশার কারণ'।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম'। একথার অর্থ— হে আমার

প্রিয়তম বচনবাহক! আপনি ওই অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে বলুন, ঠিক আছে। তোমরা অকৃতজ্ঞ অবস্থাতেই থাকো। কিছুকাল ধরে উপভোগ করো পৃথিবীর জীবন। কিন্তু জেনো, তোমাদের নরকগমন সুনিশ্চিত।

এখানে 'কিছুকাল উপভোগ করে নাও' অর্থ মৃত্যু পর্যন্ত আনন্দ স্ফূর্তি করে নাও। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে পৌত্তলিক উয়াইনা ইবনে রবীয়াকে লক্ষ্য করে। মুকাতিল বলেছেন, আবু হুজায়ফা ইবনে মুগীরা মাখজুমীকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৯

❑ যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন যামে সিজ্‌দাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তাহার সমান, যে তাহা করে না? বল, 'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

এখানে 'ক্বানিতুন' অর্থ যে ব্যক্তি নির্ধারিত ইবাদত পূর্ণ করে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, শব্দটির অর্থ কোরআন পাঠ ও নামাজে প্রলম্বিত দণ্ডায়মানতা।

'আম্মান' কথাটির 'আম' (কী) এখানে বিযুক্তক। সুতরাং এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— উৎসাহ-আগ্রহের সঙ্গে ইবাদতে মশগুল থাকে যে ব্যক্তি, সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করে রেখেছে? অথবা 'আম' এখানে সংযুক্তক এবং পদ্ধতিগতভাবে এখানে কিছু কথা রয়েছে অনুক্ত। ওই অনুক্ততাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ওই ব্যক্তি কি উত্তম, যে আল্লাহ্‌কে অংশীদার স্থির করে রেখেছে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; নাকি উত্তম ওই ব্যক্তি, যে রাত্রিকালে ব্যাপৃত থাকে ইবাদতে?

'আনাআল্ লাইলি' অর্থ রাতে, রাত্রির বিভিন্ন যামে। 'সাজ্বিদাঁও ওয়া ক্বয়িমান' অর্থ সেজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে। 'ইয়াহ্‌জারুল আখিরাতি' অর্থ নিজের পুণ্যকর্মের স্বল্পতাদৃষ্টে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে, পুণ্যকর্ম বেশী হলেও তার উপরে ভরসা না করে সর্বান্তঃকরণে ও সর্বোতভাবে প্রত্যাশী হয় কেবল আল্লাহ্‌র রহমতের। অর্থাৎ হৃদয়ে লালন করে যুগপৎ ভয় ও আশা। শুধুই ভয় করে না, কারণ তাতে করে নৈরাশ্য নিশ্চিত হয়, আর নৈরাশ্য নিষিদ্ধ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় তো কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা'।

আবার শুধু আশাকেও প্রশ্রয় দেয় না, কেননা এতে করে আল্লাহ্‌র শাস্তির প্রতি থাকে না কোনো সমীহ ও স্বীকৃতি। আর আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত ও নির্ভয়তাও অসিদ্ধ। তাই এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় নিশ্চিন্ত থাকে'।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশের ব্যাখ্যা এরকমই। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত কী ছিলো, সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিদ্বজ্জন বিভিন্ন কথা বলেছেন। যেমন— ১. জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কে। ২. আবু সালেহ সূত্রে কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস

বলেছেন, হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসারকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ৩. হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে জুয়াইবির বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আম্মার ও হজরত আবু হুজায়ফার মালিক সালেম সম্পর্কে। ৪. ইকরামা সূত্রে জুয়াইবির বর্ণনা করেছেন, হজরত আম্মারই আলোচ্য আয়াতের উপলক্ষ। ৫. বাগবী লিখেছেন, জুহাক বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর প্রসঙ্গে। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এই আয়াত হজরত ওসমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। ৬. কালাবীর এক বর্ণনায় এসেছে, এই আয়াত হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আম্মার এবং হজরত সালমান ফারসীর সমর্থনে অবতীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণনা-বৈষম্য সত্ত্বেও এমতোক্ষেত্রে একথা মেনে নিলে কোনো ক্ষতি নেই যে, যাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ছিলেন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ।

শেষাংশে বলা হয়েছে— 'বলো, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে'।

এখানে 'আল্লাজীনা ইয়া'লামূন' অর্থ যারা আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে জানে, স্বীকার করে তাঁর কোমল-কঠিন গুণাবলীর কথা। সে কারণে শাস্তির ভয় ও অনুগ্রহের আশায় বুক বেঁধে কেবল তাঁরই আনুগত্যে-উপাসনায় নিবেদিতপ্রাণ হয় এবং আত্মরক্ষা করে পাপ থেকে।

আলোচ্য প্রশ্নটি ঋণাত্মক, অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— জ্ঞানী ও অজ্ঞ কখনো সমান হতে পারে না। বাক্যটি পূর্বে আলোচিত বাক্যের সমার্থক ও বক্তব্যকে অধিকতর স্পষ্টকারক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বাক্যটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, উপরন্তু এটি একটি প্রকৃষ্ট উপমাও। অর্থাৎ জ্ঞানী ও মূর্খ যেমন সমান নয়, তেমনি সমান হতে পারে না অনুগত ও অবাধ্যরা। কেউ কেউ আবার বলেছেন, পূর্ববর্তী বাক্যে কর্মসম্পাদনের শক্তির দিক থেকে দু'দলের সমতাকে অস্বীকার করা হয়েছে, আর আলোচ্য বাক্যে অস্বীকার করা হয়েছে জ্ঞানগত দিকের সমতার। এভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে এক দলের উপরে অন্য দলের। কোনো কোনো বর্ণনাকারী মন্তব্য করেছেন, এখানকার 'আল্লাজীনা

ইয়া'লামূন'(যারা জানে) এবং 'আল্লাজীনা লা ইয়া'লামূন' (যারা জানে না) কথা দু'টোতে ইঙ্গিত রয়েছে যথাক্রমে হজরত আম্মার এবং আবু হুজায়ফা মাখজুমীর প্রতি।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

❑ বল, 'হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাহাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহ্র যমীন প্রশস্ত, ধৈর্যশীলদিগকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।'

❑ বল, 'আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি, আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার 'ইবাদত করিতে;

❑ 'আর আদিষ্ট হইয়াছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।'

❑ বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির।'

❑ বল, 'আমি 'ইবাদত করি আল্লাহ্‌রই তাঁহার প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রাখিয়া।

❑ 'আর তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহার ইচ্ছা তাহার ইবাদত কর।' বল, 'ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জানিয়া রাখ, ইহাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি আমার পক্ষ থেকে আপনার বিশ্বস্ত অনুচরদের নিকট আমার বক্তব্যকে উপস্থাপন করুন এভাবে— হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রভুপালনকর্তার অসন্তোষ ও আযাবকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ'। এখানে 'আহসানু' অর্থ কল্যাণকর কাজ করে। অর্থাৎ যে ইমানদার তার ইবাদত সম্পন্ন করে পরিপূর্ণ একাগ্রতা, নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে। যেমন রসুল স. বলেছেন, ইবাদতের সৌন্দর্য (ইহ্‌সান) এই যে, তুমি তোমার প্রভুপালকের ইবাদত এমনভাবে করবে, যেনো তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। যদি এরকম সম্ভব না হয় তবে যেনো মনে রাখতে পারো যে, তিনি তো তোমাকে দেখছেন।

আর 'হাসানাত' অর্থ এখানে কল্যাণ, উত্তম প্রতিদান, জান্নাত। সুদ্দী বলেছেন, এই দুনিয়ার কল্যাণ হচ্ছে সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য। কিন্তু কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। কেননা সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কেবল বিশ্বাসীরাই হয় না, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও হয়। আবার কখনো কখনো হয় এর বিপরীতও। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের, বিশ্বাসীদের থাকে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্‌র দুনিয়া প্রশস্ত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র এই পৃথিবী যেহেতু সুবিস্তৃত, তাই আল্লাহ্‌র ইবাদত কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে না। এখানে এই ইঙ্গিতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বাধার কারণে কোনো জনপদের মুসলমানেরা নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে না পারে, তবে তাদের জন্য দেশত্যাগ অত্যাবশ্যক। হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, মক্কা ছেড়ে অন্যত্র গমন করো— এই হচ্ছে আলোচ্য বাক্যের নির্দেশনা। মুজাহিদ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা হিজরত করো। পৃথক হয়ে যাও মক্কাভূমি থেকে। সাঈদ ইবনে যোবায়ের কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যে স্থানে পাপ করতে বাধ্য করা হয়, সে স্থান থেকে অন্যত্র গমন করো।

এরপর বলা হয়েছে— 'ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমেয় পুরস্কার দেওয়া হবে'।

এখানে 'আস্‌সবিরূন' অর্থ ওই সকল লোক, যারা অটুট ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ধর্মাধিষ্ঠিত থাকে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মচ্যুত হয় না। অথবা কথাটির উদ্দেশ্য— ওই সকল হিজরতকারী, যারা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জন্মভূমির বিচ্ছেদে ধৈর্যধারণ করেছে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য আয়াতাংশ অবতীর্ণ হয়েছে হজরত জাফর ইবনে আবু তালেব ও তাঁর সহগামীগণ সম্পর্কে, যাঁরা মক্কা থেকে হিজরত করে

আবিসিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা অকথ্য অত্যাচার সহ্য করা সত্ত্বেও সত্যচ্যুত হননি। কিন্তু এখানকার বক্তব্যটি ব্যাপকার্থক। অর্থাৎ কেবল হিজরতকারীগণ নয়, স্বভূমিতে প্রায়বন্দী অবস্থায় বহুবিধ অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও যারা স্বধর্মে অবিচল ছিলেন, তাঁরাও এখানকার 'ধৈর্যশীলগণ' এর অন্তর্ভূত।

হজরত আলী বলেছেন, সকল আনুগত্যকারীকে ওজনে মেপে মেপে প্রতিদান দেওয়া হবে। কেবল ধৈর্যশীলেরা হবে এর ব্যতিক্রম। তাদের উপরে তো প্রতিদান বর্ষিত হতে থাকবে বৃষ্টির মতো।

হজরত আনাস থেকে ইসপাহানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দাঁড়িপাল্লা বসানো হবে, নামাজীদের ডাকা হবে এবং ওজন অনুসারে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। এরপর ডাকা হবে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দানকারীদেরকে। তাদেরকেও প্রতিদান দেওয়া হবে ওজন অনুসারে। হাজীদের প্রতিদানও দেওয়া হবে এভাবেই। শেষে ডাকা হবে বিপদে ধৈর্যধারণকারীদেরকে। কিন্তু তাদের জন্য থাকবে না কোনো তুলাদণ্ড, পুণ্যকর্মের ফিরিস্তি, অথবা আমলনামা। তাদের উপরে বর্ষিত হতে থাকবে অপরিমেয় প্রতিদান। তখন পৃথিবীতে যারা স্বাস্থ্যবান ছিলো তারা কামনা করবে, হায় দুনিয়াতে যদি আমাদের শরীর কাঁচি দিয়ে কাটতে থাকা হতো (তাহলে আমরাও হতাম এমতো অপরিমেয় সৌভাগ্যের অধিকারী)।

নির্ভরযোগ্য সূত্রপরম্পরায় হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী ও আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে প্রতিদান প্রদানের জন্য একে একে ডাকা হবে শহীদ, জাকাতপ্রদানকারী ও দুঃখ-দুর্দশা ভোগকারীদেরকে। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিদের জন্য না কোনো তুলাদণ্ড স্থাপন করা হবে, না খোলা হবে তাদের আমলনামা। তাদের উপর প্রতিদান বর্ষিত হতে

থাকবে অবিশ্রান্ত ধারায়। ওই দৃশ্য দেখে অন্যরা মনে মনে আক্ষেপ করতে থাকবে, আহা! দুনিয়াতে যদি তাদের দেহ কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করা হতো।

হজরত জাবের থেকে তিরমিজি ও ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুঃখ-দৈন্য ভোগকারীদেরকে যখন পুরস্কৃত করা হবে, তখন পৃথিবীর জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগকারীরা মনে মনে এই ভেবে আফসোস করতে থাকবে যে, পৃথিবীতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বদলে যদি আমাদের গায়ের চামড়া কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হতো।

আমি বলি, এখানে 'ধৈর্যশীলগণ' অর্থ আল্লাহ্‌র প্রেমিকগণ। কেননা হাদিস শরীফে দুর্দশা গ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি শহীদগণকে, যদিও শহীদ হওয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক, শহীদেরা সে কষ্টে ধৈর্যও ধারণ করে থাকেন।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— **'বলো, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে (১১), আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেনো আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই' (১২)।**

এখানে **'মুখলিসাল লাহুদ ্দ্বীন'** অর্থ যেনো কেবল তাঁরই ইবাদত করি। **'লি আন্ আকুনা আউয়ালাল্ মুস্‌লিমীন'** অর্থ **'পৃথিবীতে ও পরবর্তী পৃথিবীতে যেনো হই আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী'**। অথবা এখানে **'আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী'** অর্থ— কুরায়েশ ও তাদের সমগোত্রীয়দের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। মুসলিম। এখানে দু'বার **'আদিষ্ট হয়েছি'** (উমিরতু) বলার কারণে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এক্ষেত্রে দু'টি— একনিষ্ঠ ইবাদতের এবং ধর্মীয় বিষয়াবলীতে অগ্রগামিতা অর্জনের। উল্লেখ্য, প্রবৃত্তির বিশুদ্ধতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়া যায় না। আবার এমতো বিশুদ্ধতা ধর্মাগ্রগণ্য হওয়ারও মূল শর্ত। তাছাড়া এখানকার **'লিআন্ আকুনা'** কথাটির **'লাম'** অক্ষরটি অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত। যেমন বলা হয় **'আরাদ্‌তু লিআন্ আফআ'লা কাজা'** (আমি এরকম করার ইচ্ছা করেছি)। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে, এখানে প্রথমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পূর্ণ মুসলমান হতে এবং পরে দেওয়া হয়েছে মুসলমানদের অগ্রনায়করূপে মহান ধর্ম ইসলাম প্রচারের আদেশ। বলাবাহুল্য, ইসলাম প্রচারই ছিলো রসুল স. এর মূল কর্তব্যকর্ম। আর ওই কর্তব্য সম্পাদনার্থেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অন্যকে আকর্ষণ করার এই বিশেষ বাকভঙ্গি। যেনো বলতে বলা হয়েছে, দ্যাখো, ইসলাম যদি উত্তম না হতো, তবে নিশ্চয় তা আমি নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতাম না।

এর পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— **'বলো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির'।**

এখানে **'ইন্ আ'সাইতু'** অর্থ তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির। অর্থাৎ তোমাদের মতো অংশীবাদিতা ও পাপাচরণের দিকে আমি যদি ঝুঁকে পড়ি, তবে আমার জন্যও রয়েছে শাস্তি ভোগের আশংকা। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতেও বিধৃত হয়েছে ইসলামের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করবার এক আকর্ষণীয় পদ্ধতি। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে ভয় দেখানোই এমতো বাকভঙ্গির উদ্দেশ্য। বাগবী লিখেছেন, রসুল স.কে যখন কুরায়েশ গোত্রপতিরা বাপদাদাদের ধর্মে ফিরে যাবার আহ্বান জানায়, তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— **'বলো আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌রই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে (১৪)। আর তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত করো। বলো, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রাখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি'(১৫)।**

ইতোপূর্বে রসুল স.কে বলতে বলা হয়েছিলো **'আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে'**। আর এখানে বলতে বলা হলো **'আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌রই তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে'**। এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবশ্য কুরায়েশ গোত্রপতিদের দুরাশা ধূলিসাৎ করণার্থে। অর্থাৎ বাপদাদাদের ধর্মে রসুল স. এর ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে

তারা যে ক্ষীণ আশা হৃদয়ে পোষণ করতো, তা সম্পূর্ণরূপে বিদূরণার্থে। সঙ্গে সঙ্গে রসুল স.কে এরকম বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে— **'আর তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত করো'**। একথা বলে তাদের আশাভঙ্গ করা হয়েছে সমূলে। ফলে সিদ্ধান্তটি হয়ে গিয়েছে চিরকালীন। এভাবে বক্তব্যার্থটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আপনি মক্কার গোত্রপতিদেরকে আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিন। বলুন, আমি আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ ইবাদত করি, আর তোমরা ইবাদত করো আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের। এর পরিণামে তোমরা অবশ্যই হবে শাস্তিগ্রস্ত। আর অচিরেই তা তোমাদের গোচরীভূতও হবে। এখানে **'ফা'বুদু'** হচ্ছে একটি অনুক্ত উদ্দেশ্যের বিধেয়। অথবা একটি উহ্য শর্তের প্রতিউক্তি।

এরপরে রসুল স.কে আরো বলতে বলা হয়েছে— 'বলো, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে'। এখানে 'খসিরূ আন্‌ফুসাহুম' অর্থ নিজেদের ক্ষতি সাধন করে। আর 'ওয়া আহলীহিম' অর্থ এবং ক্ষতিসাধন করে নিজেদের পরিজনবর্গের। 'পরিজনবর্গ' অর্থ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও পরিচারক-পরিচারিকা। কোনো ব্যবসায়ীর ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে গেলে আরববাসীগণ বলেন 'খসিরাত্ তাজির'। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও তাদের আখেরাতের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইমান-আমল বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তে জান্নাতে তাদের যে অংশ নির্ধারিত ছিলো, তা হারিয়ে গেলে তার অধিকারী হয়ে যায় জান্নাতীরা। পক্ষান্তরে বিশ্বাসীরা সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অবাধ্যতার শর্তে তাদের জন্য নির্ধারিত দোজখ পরিত্যাগ করে দোজখীদের জন্য। 'খসিরা' হচ্ছে অকর্মক ক্রিয়া। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সকর্মক ক্রিয়া হিসাবে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের জন্য জান্নাতে বিশেষ বাসস্থান ও পরিজনবর্গ নির্ধারিত করে রেখেছেন। বান্দা বিশ্বাসী ও অনুগত হলে ওই অংশ তারা পাবে। নতুবা তা দিয়ে দেওয়া হবে অন্য কোনো জান্নাতবাসীকে।

আমি বলি, বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে এখানকার 'খসিরূ' শব্দটির অর্থ হবে 'ফাওওয়াতু'। অর্থাৎ সেই সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত, যারা হারিয়েছে নিজেদের নন্দিত জীবন ও পরিজনবর্গকে। কেউ কেউ বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত লোক দু'ধরনের হয়, তারা পরিজনবর্গসহ দোজখবাসী হবে, এমতাবস্থায় সে-ই হবে পরিজনবর্গকে পথভ্রষ্টকারী, অথবা পরিজনবর্গ জান্নাতী হবে এবং সে নিজে হবে দোজখী। এমতাবস্থায় সে চিরদিনের জন্য পৃথক হয়ে যাবে তাদের কাছ থেকে। অর্থাৎ এক ধরনের ক্ষতি হচ্ছে পরিজনবর্গসহ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং আর এক ধরনের ক্ষতি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কেবল নিজে।

বলাবাহুল্য, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। তাই এখানে বলা হয়েছে 'আলা জালিকা হুয়াল খুসরানুম্ মুবীন' (জেনে রাখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি)।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

❑ তাহাদের জন্য থাকিবে তাহাদের ঊর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। এতদ্দারা আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

❑ যাহারা তাগূতের পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়, তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদিগকে—

❑ যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। উহাদিগকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।

❑ যাহার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হইয়াছে; তুমি কি রক্ষা করিতে পারিবে সেই ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে?

❑ তবে যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যাহার উপর নির্মিত আরও প্রাসাদ, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহা আল্লাহ্র ওয়াদা, আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

❑ তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ইহা শুকাইয়া যায়। ফলে তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে তিনি উহা খড়-কুটায় পরিণত করেন? ইহাতে অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে নিপতিত করা হবে মর্মন্তুদ শাস্তিতে। তাদের উপরে ও নিচে থাকবে জ্বলন্ত হুতাশনের আচ্ছাদন। ওই অগ্নিশাস্তি থেকে বেঁচে থাকবার জন্য আল্লাহ্ তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন নবী-রসুলগণের মাধ্যমে তাঁর সাধারণ বান্দাদেরকে বার বার সতর্ক করে দেন। বলেন, হে আমার উদাসীন বান্দাগণ। তোমরা সতর্ক হও। আমাকে ভয় করো।

এখানে 'জুলালুন' অর্থ আগুন ও ধোঁয়ার আচ্ছাদন, যা থাকবে নরকবাসীদের ঊর্ধ্বে ও নিম্নদেশে। নিম্নদেশের আচ্ছাদন আবার হবে তৎনিম্নের নরকবাসীদের উপরের আচ্ছাদন। তাই উপরের ও নিচের উভয় আচ্ছাদনকেই এখানে বলা হয়েছে 'জুলালুন' । অর্থাৎ ছাউনি।

এখানে 'জালিকা' অর্থ এতদ্বারা। অর্থাৎ ওই মহাশাস্তির বিজ্ঞপ্তি প্রচারের দ্বারা। 'ইয়ুখওবিফুল্লহু বিহী ই'বাদাহু' অর্থ তদ্দারা আল্লাহ্ সতর্ক করেন তাঁর বান্দাদেরকে, যাতে করে তারা পূর্বাহ্নেই বিজড়িত হয় শাস্তিবিদূরক কর্মকাণ্ডে। আর 'ফাত্তাক্বুন' অর্থ ভয় করো। অর্থাৎ এমন কাজ কোরো না, যা আমার অসন্তোষ ও শাস্তিকে করে অবধারিত।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'যারা তাগুতের পূজা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে—' একথার অর্থ— যারা মিথ্যা উপাস্যসমূহের পূজা অর্চনা না করে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত হয়, তারা শুভসংবাদ প্রাপ্তির যোগ্য। অতএব হে আমার রসুল! আপনি আমার ওই সকল বান্দাকে শুভসংবাদ শুনিয়ে দিন।

এখানে 'আতত্বাগুত' অর্থ উদ্ধত, সীমালংঘনকারী। ঔদ্ধত্যে সীমালংঘনকারীরা যেহেতু শয়তান প্রকৃতির হয়, তাই এখানে 'ত্বাগুত' অর্থ হতে পারে শয়তান। বাগবী লিখেছেন, 'ত্বাগুত' অর্থ প্রতিমাসমূহ। কেননা এখানকার 'আঁইয়াবুদূহা' কথাটিতে সংযুক্ত হয়েছে স্ত্রীলিঙ্গবাচক সর্বনাম। আর 'আনাবু' অর্থ এখানে সর্বোতরূপে আল্লাহ্-অভিমুখী হওয়া, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

'লাহুমূল বুশ্‌রা' অর্থ তাদের জন্য আছে সুসংবাদ, পৃথিবীতে নবী-রসুলগণের মুখ থেকে এবং মৃত্যুর সময়ে ফেরেশতাদের মুখ থেকে। হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'লাহা সাব্‌আ'তু আব্‌ওয়াব্'

(তার সাতটি দরজা আছে), তখন জনৈক আনসারী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমার সাতজন ক্রীতদাস ছিলো। আমি জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করার মানসে তাদের এক একজনকে পৃথক ভাবে মুক্ত করে দিয়েছি। তখন অবতীর্ণ হলো 'সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে—'।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম, তা গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন'। এ কথার অর্থ— যারা কোরআন শোনে এবং অন্যদের কথাও শোনে, তারপর অনুসরণ করে কোরআনের উপদেশের, আবার রসুল স. এর কথা যেমন শোনে, তেমনি শোনে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথাও, কিন্তু মেনে চলে রসুল স. এর নির্দেশ, তারাই সত্যিকারের বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। এমতো ব্যাখ্যার আলোকে এখানকার 'আলক্বওলা' এর অর্থ হবে সাধারণভাবে সকলের কথাবার্তা— আল্লাহ্র, রসুলের ও অন্যের। আর এখানকার 'আহ্‌সান' অর্থ হবে কেবল কোরআন মজীদ ও রসুল স. এর বাণী। এমতাবস্থায় 'আহ্‌সান' পার্থক্য-সূচক

বিশেষণ না হয়ে হবে ক্রিয়া বিশেষণ 'হাসান' অর্থবোধক। অর্থাৎ এমতোক্ষেত্রে 'আহ্সান' অর্থ 'অতিউত্তম' না হয়ে হবে কেবল 'উত্তম'। কেননা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথায় 'উত্তম' কোনোকিছু থাকেই না।

এখানকার বাকভঙ্গিটির দাবি হচ্ছে পূর্বোক্ত আয়াতের (১৭) 'ফাবাশ্শির ই'বাদি' কথাটিকে বলা যেতো 'ফাবাশ্শিরহুম'। কেননা এই সর্বনামটির লক্ষ্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে 'ই'বাদি' (বান্দাগণ) বলে এখানে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শয়তান থেকে তাদের দূরে থাকার ভিত্তি হচ্ছে এই যাচাই-বাছাই। অর্থাৎ তারা উত্তম ও অনুত্তম কথার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে, পৃথক করতে জানে ন্যায় ও অন্যায়কে। আর 'উত্তম' ও অত্যুত্তম' এর পার্থক্য সম্পর্কেও তারা সবিশেষ জ্ঞাত।

আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত আবু বকর যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্, হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ। তাঁরা জানতে চাইলেন, এ সংবাদ সত্য কিনা। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি এখন ইমানদার। একথা শুনে তাঁরাও মুসলমান হয়ে গেলেন। তখন তাঁদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। ইবনে জায়েদ বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তিন জন মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে, যাঁরা মূর্খতার যুগেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' কলেমায় বিশ্বাসী ছিলেন। তখনো তাঁরা দূরে ছিলেন প্রতিমাপূজা থেকে। তাঁরা হচ্ছেন, জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল অথবা সাঈদ ইবনে জায়েদ, আবু জর গিফারী ও সালমান ফারসী। আর আলোচ্য আয়াতের

তাফসীরে মাযহারী/২৩৮

'উত্তম কথা' অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' (আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য কেউ নেই)। সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'আহ্সান' এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যাদেশিত নির্দেশনাসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নির্দেশনানুসারে তারা চলে এবং সৎকাজ করে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কোরআনে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ অথবা ক্ষমাপ্রদর্শন দু'টোরই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'ক্ষমা'কেই বলা হয়েছে 'সর্বোৎকৃষ্ট' (আহ্সান)। আরো বলা হয়েছে মর্যাদা অথবা প্রত্যাখ্যানের কথাও। তবে মর্যাদাকে বলা হয়েছে উত্তম।

'উলুল আলবাব্' অর্থ বোধশক্তিসম্পন্ন। অর্থাৎ ওই সকল ব্যক্তি যাদের বিবেক অপবাদ ও প্রচলিত রীতিনীতির অপপ্রভাব থেকে মুক্ত। একথাটির মধ্যে এই তত্ত্বটিও নিহিত রয়েছে যে, হেদায়েত তো করেন আল্লাহ্ই, কিন্তু মানবপ্রবৃত্তি ওই হেদায়েতকে গ্রহণ করে। যদি এরকম না হতো, তবে মানুষ কিছুতেই সৎপথপ্রাপ্ত হতো না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'যার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে? যে জাহান্নামে আছে'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! বলুন তো দেখি, যে লোক চিরভ্রষ্ট, যার জন্য আল্লাহ্র চিরন্তন জ্ঞানে শাস্তি সুনির্ধারিত এবং যে আল্লাহ্র অবগতিতে দোজখের মধ্যেই আছে, তাকে রক্ষা করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব? এরকম বলেছেন হজরত ইবনে আব্বাস।

এখানে 'হাক্ক্বা আ'লাইহি কালিমাতুল আ'জাব' অর্থ যার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য আবু লাহাব ও তার পুত্র। এখানকার 'তুমি কি রক্ষা করতে পারবে' কথাটি সম্পর্কযুক্ত আর একটি অনুক্ত শর্তের সঙ্গে। ওই অনুক্ততা সহ পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তুমি কি তার কর্মের প্রভু এবং এমন ক্ষমতাশালী যে, যার জন্য দোজখের দণ্ডাদেশ অনিবার্য হয়েছে, তাকে রক্ষা করতে পারবে?— এমতো প্রশ্নের জবাব হতে পারে একটাই— না, কখ্খনো নয়। সুতরাং প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক।

এখানে 'ইউনক্বিজু' হচ্ছে প্রশ্নের পুনরুক্তি, যা অবাস্তবতার পক্ষে দৃঢ়তাসূচক। আর 'ইউনক্বিজুহুম' এর পরিবর্তে 'তুনক্বিজু মান ফীন্নার' কথাটি এই অস্বীকৃতিকে করেছে অধিকতর সুদৃঢ়। আর 'হাক্ক্ব'(অবধারিত) শব্দটি এখানে এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে, যার জন্য শাস্তি অনিবার্য, সে যেনো শাস্তির মধ্যেই আছে। কেননা আল্লাহ্তায়ালার সিদ্ধান্তের অন্যথা হওয়া অসম্ভব।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়টিও পরিস্ফুট হয়েছে যে, মানুষের পথপ্রদর্শনের জন্য রসুল স. এর চেষ্টা ও পরিশ্রম ছিলো প্রাণান্ত। তিনি স. মনে প্রাণে চাইতেন যে, সকলেই দোজখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাক। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে আর একটি সন্দেহ প্রশ্রয় পেতে পারে যে, তাহলে রসুল স. এর প্রচেষ্টা কি নিষ্ফল? তাঁর চেষ্টা-চরিত্র যদি একেবারেই কার্যকর না হয়, তবে তাঁর আর চেষ্টার প্রয়োজনই বা কী? এমতো সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে (২০) এভাবে—

তাফসীরে মাযহারী/২৩৯

'তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত আরো বহু প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এবার শুনুন তাদের কথা, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং আল্লাহ্র

চিরন্তন ও চিরস্থায়ী জ্ঞানে যাদের বেহেশতবাস সুনিশ্চিত। তাদের জন্য সেখানে রয়েছে সুরম্য প্রাসাদ। প্রাসাদ আর প্রাসাদ। আর সেগুলোর পাদদেশে বয়ে চলেছে জলবতী নদী।

এখানকার 'ইত্তাক্বু' (ভয় করে) অতীতকালসূচক ক্রিয়া। এর দ্বারা এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাদের সংযমী ও ধর্মভীরু হওয়া আল্লাহ্‌র সর্বত্রগামী জ্ঞান ও পূর্বসিদ্ধান্তপ্রসূত, তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করেই থাকে। এর অন্যথা হওয়া সম্ভবই নয়।

'গুরাফুন' অর্থ প্রাসাদ, বালাখানা। 'মিন ফাওক্বিহা গুরাফুন' অর্থ যার উপরে নির্মিত আরো প্রাসাদ। অর্থাৎ আরো উচ্চ ও উচ্চতর প্রাসাদমালা। আর 'মিন তাহ্‌তিহাল আন্‌হার' অর্থ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। অর্থাৎ ওই সকল প্রাসাদসমূহের নিম্নদেশে প্রবহমান রয়েছে সলিলশোভিত নদী।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদা; আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাদেরকে তিনি বেহেশত দিবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। আর তিনি কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। কেননা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা একটি দোষ। আর তিনি সকল দোষত্রুটি থেকে সতত মুক্ত, চিরপবিত্র।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বেহেশতবাসীরা তাদের ঊর্ধ্বস্থিত সুরম্য প্রাসাদ সমূহকে দেখবে নিশাকাশে প্রোজ্জ্বল তারকারাজির মতো। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! তাহলে তো নবী-রসুলগণের জন্য নির্ধারিত ঊর্ধ্বস্তরের বেহেশতে সাধারণ শ্রেণীর বিশ্বাসীরা কখনোই পৌঁছতে পারবে না। রসুল স. বললেন, কেনো পারবে না। শপথ তাঁর, যাঁর অধিকারে আমার জীবন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের উপরে ইমান এনেছে এবং সকল নবী-রসুলকে সত্য বলে জেনেছে, উচ্চস্তরের বেহেশত লাভ করবে তারাও। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক হাদিস রয়েছে। সেগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা ফোরকানের তাফসীরের যথাস্থানে।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'তুমি কি দেখো না, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, অতঃপর তা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা খড়কুটায় পরিণত করেন'।

এখানে 'আলাম তারা' (তুমি কি দেখো না) প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। তাই না-সূচক বার্তার অর্থ এখানে হাঁ-সূচক। সুতরাং 'তুমি কি দেখো না' অর্থ এখানে— তুমি তো নিশ্চয় দেখেছো। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি তো নিশ্চয় দেখেছেন, কীভাবে আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি নামাই, ওই বৃষ্টির পানিতে সিক্ত মৃত্তিকায় ঘটাই

ফল ও ফসলের প্রতুল সমারোহ। পরিপক্ক ফসল আহরণের পর সেগুলোর পরিত্যক্ত উদ্ভিদগুলো যায় শুকিয়ে। তার পর তা পরিণত হয় খড়কুটার মতো অনুল্লেখ্য বস্তুতে। আপনি তো জানেন, এমতো সৃজন প্রক্রিয়ার প্রবর্তক শুধুই আমি।

'ইয়ানাবীয়া ফীল্ আরদ্ব' অর্থ ভূমিতে নির্ঝররূপে। ঝর্ণা এবং ঝর্ণার পানি উভয়কে বলা হয় 'নাবীয়া'। শা'বী বলেছেন, পৃথিবীর সকল পানিই আকাশাগত।

'আলওয়ানুহু' অর্থ বিবিধ বর্ণের ফসল। অর্থাৎ গম, যব, ধান ইত্যাদি। অথবা বিভিন্ন রঙের শাক-সবজি। 'ইয়াহীজু' অর্থ শুকিয়ে যায়। 'ফাতারাহু মুস্‌ফাররা' অর্থ তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। আর 'হুত্বমা' অর্থ খড়-কুটা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য'।

এখানে 'ফী জালিকা' অর্থ এতে, এই নিখুঁত ও সুষম রূপান্তরশীল সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্যে। 'লা জিক্‌রা' অর্থ উপদেশ, যা স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ যা স্মরণ করিয়ে দেয় মহাসৃজয়িতা, মহাপ্রভুপালয়িতা, মহাশক্তিধর ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌কে। এই সঙ্গে একথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানুষের জীবনও মৃত্তিকায় উত্থিত শস্যান্যাসের মতো। প্রথমে প্রকাশ, পরে অন্তর্হিতি। প্রথমে জীবন, পরে মৃত্যু। সুতরাং পৃথিবীপ্রসক্তি অনভিপ্রেত।

'লি উলিল্ আলবাব্' অর্থ বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য। অর্থাৎ এমতো উপদেশ থেকে লাভবান হতে পারে কেবল তারা, যারা জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেকাধিকারী। বুদ্ধিহীনেরা এমতো উপদেশের মর্ম বুঝতে অসমর্থ। তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো। বরং তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

তাফসীরে মাযহারী/২৪১

❑ আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালক প্রদত্ত আলোতে রহিয়াছে, সে কি তাহার সমান যে এরূপ নহে? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহ্র স্মরণে পরাঙ্মুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

❑ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসমঞ্জস এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহমন বিনম্র হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাই আল্লাহ্র পথনির্দেশ, তিনি উহা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই।

❑ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাইতে চাহিবে, সে কি তাহার মত যে নিরাপদ? যালিমদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা অর্জন করিতে তাহার শাস্তি আস্বাদন কর।'

❑ উহাদের পূর্ববর্তীগণও অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে শাস্তি এমনভাবে উহাদিগকে গ্রাস করিল যে, উহারা ধারণাও করিতে পারে নাই।

❑ ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করাইলেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর। যদি ইহারা জানিত!

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণের জন্য যার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার ফলে যে তার প্রভুপালক কর্তৃক প্রদত্ত জ্যোতি দ্বারা সমাবৃত রয়েছে, সেকি ওই লোকের সমতুল, যার বক্ষ-প্রকোষ্ঠ রুদ্ধ? যাদের অন্তর আল্লাহ্র স্মরণমগ্ন নয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন দুর্ভোগ। তারা স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট।

'শারাহাল্লহু সদ্রহু' অর্থ আল্লাহ্ যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। 'নূরিম মির্‌রব্বিহী' অর্থ প্রভুপালক প্রদত্ত নূর, জ্যোতি বা আলো। উল্লেখ্য, এই আলোই সত্য ও মিথ্যার স্বরূপপ্রদর্শক। এই আলো যে পায়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি তার বিশ্বাস হয়ে যায় চিরঅক্ষয়। আর এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইমান বা বিশ্বাস ধারণ করে কলব বা অন্তর। মস্তিষ্ক বা অন্য কোনো অঙ্গ ইমানের আধার নয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই আলোর অধিকারীদেরকেই বলা যেতে পারে আলোকিত মানুষ। তাদের হৃদয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে ইসলামের নির্দেশাবলী।

হয়ে যায় অপরিমেয়রূপে প্রশস্ত, যেমন কোনো আধার তার আধেয়কে ধারণ করে বিনা আয়াসে প্রসারিত হয়ে। আর এখানকার 'নূর' শব্দটির প্রকৃত অর্থ দিব্যদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি।

আলোচ্য আয়াত উপস্থাপন করা হয়েছে জিজ্ঞাসার আকারে। তাই প্রথমেই উল্লেখিত হয়েছে 'আফামান্' এবং এর প্রবণতা রয়েছে 'ফা' সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তুর দিকে। এমতাবস্থায় বক্তব্যরূপটি হয়েছে এরকম— বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে যখন পার্থক্য প্রমাণিত হলো, তখন হে আমার নবী! তাদের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের বিষয়টিও শুনে রাখুন। প্রকৃত বিশ্বাসীদের অন্তরকে আল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। ফলে তারা বক্ষে ধারণ করে এক বিশেষ নূর, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। হয়ে যায় প্রকৃত অর্থে মুমিন ও সত্যাধিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাদের অবরুদ্ধ বক্ষকে উন্মোচিত করেননি, অন্তরে মেরে দিয়েছেন চিরভ্রষ্টতার মোহর, সত্যপ্রত্যাখ্যান তাদের জন্য স্বাভাবিক। তাদের বিভ্রান্তি সুস্পষ্ট। এখন আপনিই বলুন, বিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী কি তাহলে সমান? হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এই আয়াত পাঠ করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! বক্ষ উন্মুক্ত হয় কীভাবে? তিনি স. বললেন, অন্তরে প্রবেশ করে এক বিশেষ নূর, ফলে অন্তর হয়ে যায় উন্মুক্ত ও সুবিস্তৃত। আমরা বললাম, এর বাহ্যিক লক্ষণ কী? তিনি স. বললেন, পরকালের দিকে সর্বোতভাবে ঝুঁকে পড়া, প্রতারণা ও অহমিকাপূর্ণ পৃথিবী থেকে দূরে অবস্থান করা, মৃত্যু আগমনের পূর্বেই মৃত্যুর জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করা। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী ও হাকেম। আর বায়হাকী বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে।

'ফা ওয়াইলুল্ লিল্‌ক্বসিয়াতি ক্বুলুবুহুম মিন জিক্‌রিল্লাহ্' অর্থ দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরান্মুখ। এখানে 'ফাওয়াইলুন্' এর 'ফা' কারণ প্রকাশক। আর 'মিন জিকরিল্লাহ্' এর 'মিন' সময় নির্দেশক। অর্থাৎ যখন তাদের সম্মুখে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয়, অথবা পাঠ করা হয় আল্লাহ্‌র বাণী, তখন তাদের অন্তর হয়ে যায় আরো কঠোর। এভাবে দেখা যায় আল্লাহ্‌র স্মরণই তাদের অন্তর কঠোর-কঠোরতর হওয়ার কারণ।

আল্লাহ্‌র জিকির ইমানদার ও কাফেরের অন্তরে সৃষ্টি করে বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া। আর এরকম হয় তাদের সম্প্রসারিত ও সংকুচিত বক্ষের কারণেই। সেকারণেই কোরআন মজীদের যে স্থানে বক্ষসম্প্রসারণ সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে সে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ-ই নির্ণীত হয়েছেন বক্ষ সম্প্রসারণকারী। আর যেখানে উল্লেখিত হয়েছে অন্তরের কাঠিন্য প্রসঙ্গ, সেখানে ওই কঠোরতাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে কাফেরদেরই অন্তরের সঙ্গে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'বস্তুত যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তা তাদের কলুষতাকে অধিকতর বৃদ্ধি করে এবং তারা মৃত্যুবরণ করে কাফের অবস্থায়'।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানে 'জিকরিল্লাহ্' কথাটির পূর্বে 'তারকা' (পরিত্যাগ) শব্দটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সেই সকল লোকের জন্য রয়েছে অতীব দুর্ভোগ যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণ পরিত্যাগ করার কারণে কঠিন হয়ে গিয়েছে। মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, হৃদয়ের কাঠিন্য অপেক্ষা অধিক কোনো শাস্তি বান্দার জন্য নির্ধারণ করা হয়নি। আর কোনো জাতির উপর কেবল তখনই আল্লাহ্‌র গজব পড়ে, যখন হৃদয় থেকে বের হয়ে যায় মমতা-কোমলতা।

হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, রসুল স. এর উপরে দীর্ঘদিন ধরে কোরআন অবতীর্ণ হতে থাকে। তিনি স. তা সাহাবীগণের সম্মুখে পাঠ করে শোনাতে থাকেন। একদা মান্যবর সহচরবৃন্দ আবেদন করলেন— হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি (কোরআন ব্যতীত) অন্য কিছু যদি বলতেন। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত আউন ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, সাহাবীগণের জীবন হয়ে গিয়েছিলো কিছুটা একঘেয়েমিপূর্ণ। তাই তাঁরা একদিন নিবেদন জানালেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি যদি অন্য কিছু বলতেন। তখন অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত (২৩)।

বলা হলো— 'আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী-সম্বলিত কিতাব, যা সুসমঞ্জস এবং যা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়'। এই আয়াতাংশটি ইতোপূর্বের 'আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি' (আয়াত ২) এর সমার্থক অথবা পরিপোষক। আর এখানে 'অবতীর্ণ করেছি' এর পূর্বে 'আল্লাহ্' উল্লেখ করায় যা প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে— ১. কোরআনের অবতরণসূত্র হয়েছে নিঃসন্দিগ্ধ ও সুদৃঢ় ২. প্রকাশ পেয়েছে এই আকাশজ গ্রন্থটির অনন্য মর্যাদা ও মাহাত্ম্য ৩. আকাশাগত সকল বাণী, বিশেষতঃ এই কোরআনের বাণীই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট বাণী।

'কিতাবাম্ মুতাশাবিহা' অর্থ সুসমঞ্জস কিতাব। এখানে 'মুতাশাবিহা' হচ্ছে 'কিতাব' এর বিশেষণ এবং 'আহ্‌সানাল হাদীছ' (উত্তম বাণী-সম্বলিত) কথাটির সমঅর্থবোধক। আর 'সুসমঞ্জস' অর্থ কোরআনের সকল আয়াত গভীর তত্ত্ব ও নির্ভুল তথ্যসমৃদ্ধ, সুন্দর ও যথাযথ ভাবে ও ভাষায়। এর কোনো আয়াতের বক্তব্য অন্য আয়াতের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে না। বরং এর এক আয়াত হয়ে আছে অপর আয়াতের প্রত্যয়ক।

'মাছানী' (পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়) কথাটিও 'কিতাবে'র গুণপ্রকাশক। শব্দটি 'মাছানাত্' এর বহুবচন এবং 'মাছানাত্' হচ্ছে ক্রিয়ার আধার। শপথ, শাস্তি, ভীতিপ্রদর্শন, শুভ-অশুভ কর্মের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা, ইতিবৃত্তাবলী, নিদের্শনাবলী, সৃজন-নির্মাণ-নিরীক্ষা এ সকল প্রসঙ্গ কোরআনে বার বার এসেছে। তাই এখানে বলা হয়েছে 'যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়'। এরকমও বলা

যেতে পারে যে, কোরআনে রয়েছে বিভিন্ন সুরা ও বহুসংখ্যক আয়াত, যেমন মানুষের রয়েছে বিভিন্ন শিরা-উপশিরা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেগুলোকে বার বার কাজে লাগানো

হয়, তেমনি কোরআনের আয়াতাবলীও বার বার করে তোলা হয় আবৃত্তিযোগ্য। 'যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়' কথাটি বলা হয়েছে এখানে এমতো ভাবকে প্রকাশ করার জন্যই। অথবা 'মাছানী' বহুবচন 'মুছনিয়াতুন' এর। এর অর্থ প্রশংসাকারী। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— কোরআনের আয়াতসমূহ বর্ণনা করে আল্লাহ্‌র অবিভাজ্য সত্তা ও গুণবত্তার কথা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্‌র অপরিতোষ ও আযাবসম্বলিত কোনো আয়াত শুনলে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আর যখন তারা শুনতে পায় আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও দয়ার কথা, তখন তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে হয়ে যায় প্রশান্ত ও প্রসন্ন। উল্লেখ্য, এখানে 'আল্লাহ্‌র স্মরণের সঙ্গে' তাঁর রহমত বা দয়ার কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কেননা রহমতই তো মূল প্রাপ্তি। আর তাঁর রহমত তাঁর ক্রোধের উপরে জয়ী।

'ইলা জিকরিল্লাহ্' কথাটির 'ইলা'(প্রতি) এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'লাম'(জন্য) অর্থে। এভাবে কথাটির অর্থ দঁড়িয়েছে— আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার কারণে। কিন্তু প্রশান্তি ও প্রসন্নতা যেহেতু স্মরণসন্নিহিত, তাই এখানে 'লাম' এর বদলে বসানো হয়েছে 'ইলা'। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— কোরআনের ভীতিপ্রদর্শনমূলক আয়াত শুনলে বিশ্বাসীদের গায়ের পশম খাড়া হয়ে যায়, শিউরে ওঠে সারা শরীর, সংকুচিত হয় গাত্রত্বক। আবার ক্ষমা ও দয়ার আশাব্যঞ্জক আয়াত শুনলে তাদের ভয় দূর হয়ে যায়। হৃদয় ভরে যায় প্রশান্তিতে ও প্রসন্নতায়।

আগের বাক্যে 'কিতাবান' এর বিশেষণরূপে এসেছে 'মাছানী' শব্দটি। এভাবে সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোরআনে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের স্বস্তি-শাস্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে বার বার। আর বিশ্বাসীদের উপরে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কী হয়, তা প্রকাশ করা হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে যখন তাঁর কোনো বান্দার লোমকূপের পশম খাড়া হয়ে যায়, তখন তার পাপরাশি ঝরে যায় এমনভাবে, যেমনভাবে গাছ থেকে ঝরে শুকনো পাতা। শিথিল সূত্রপরম্পরায় হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাগবী ও তিবরানী। বাগবীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌র ভয়ে যখন বান্দার শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাকে দোজখের জন্য নিষিদ্ধ করে দেন।

একটি সন্দেহ ঃ কোনো কোনো আল্লাহ্‌প্রেমিক কোরআন তেলাওয়াত শুনে বেহুঁশ হয়ে যান। এটা কি কোনো পছন্দসই গুণ? ইমাম বাগবী তো একে খারাপ বলেছেন এবং এ সম্পর্কে কাতাদার উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, আল্লাহ্‌র ভয়ে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া ও শরীর শিহরিত হওয়া আল্লাহ্‌র ওলীগণের বৈশিষ্ট্য। তাদের এমতো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। তিনি এমন বলেননি যে, কোরআন শুনে তাদের বুদ্ধি লোপ পায় এবং তাঁরা অজ্ঞান হয়ে যান।

বরং এরকম অবস্থা হয় বেদাতী ও শয়তানের অনুচরদের। আমাদেরকে আরো বলা হয়েছে যে, হজরত আবুদল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আমি একবার আমার মা আসমা বিনতে আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলাম, কোরআন শুনলে রসুল স. এর সহচরবৃন্দের কী অবস্থা হতো? তিনি বললেন, তাঁদের অবস্থা হতো তেমনই, যেমন বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্ স্বয়ং। তাঁদের চোখ অশ্রুসজল হতো এবং খাড়া হয়ে যেতো তাঁদের শরীরের পশম। আমি বললাম এখানকার কিছু লোক তো এমনও রয়েছে, যারা কোরআন শুনলে বেহুঁশ হয়ে যায়। আমার একথা শুনেই তিনি উচ্চারণ করলেন, আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় যাচনা করি।

বাগবী আরো লিখেছেন, জনৈক ইরাকবাসী একস্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো। হজরত ইবনে ওমর সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। বেহুঁশ লোকটিকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তার? জবাব দেওয়া হলো, এ লোক কোরআন শুনলে বেহুঁশ হয়ে যায়। তিনি বললেন, আমিও আল্লাহ্‌কে ভয় করি। কিন্তু কোরআন শুনে বেহুঁশ হই না। আরো বললেন, কোনো কোনো লোকের ভিতরে শয়তান অনুপ্রেবশ করে। রসুল স. এর সহচরবর্গ তো এরকম করতেন না।

সংশয়ভঞ্জন ঃ আমি বলি, যখন কোনো সুফী সাধকের উপরে অত্যধিক মাত্রায় ফয়েজ ও নূর বর্ষিত হয় এবং তা আত্মস্থ করার শক্তি থাকে দুর্বল, তখন তাদের বেহুঁশ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। রসুল স. এর সান্নিধ্যধন্য হওয়ার কারণে সাহাবীগণের ধারণক্ষমতা ছিলো অত্যধিক। তাই বেহুঁশ হওয়ার অবস্থা তাঁদের হতো না। কিন্তু পরবর্তী পুণ্যবানেরা যেহেতু সাহাবী নন, তাই তাঁদের অনেকেই বেহুঁশ হওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন না। সুতরাং বুঝতে হবে দু'টি কারণে তাঁদেরকে বেহুঁশ হতে হয়— ১. ফয়েজ-নূরের বর্ষণ সুপ্রতুল না হলে ২. ফয়েজ-নূরের বর্ষণ ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত হলে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইমাম মুহীউস্‌সুন্নাহ্ এবং সুফী সাধকগণের বেহুঁশ হওয়াকে মন্দ বলেছেন বাগবী। অথচ তিনি বিস্মৃত হয়েছেন, নৈকট্যভাজন ফেরেশতারাও আল্লাহ্‌র নির্দেশ শ্রবণ করে সম্বিতহারা হয়ে যায়। প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর তারা একে অপরকে বলে, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা কী বললেন? অন্যজন জবাব দেয়, তিনি সত্য বলেছেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হজরত নাওয়াস ইবনে সামআনের উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত ইমাম বর্ণনা করেছেন এই হাদিস— যখন আল্লাহ্ কোনোকিছু করার ইচ্ছা করেন ও নির্দেশ প্রদান করেন, তখন তাঁর ভয়ে আকাশ কাঁপতে থাকে। আকাশবাসীরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে ও বেহুঁশ হয়ে যায়। হুঁশ ফিরে পাবার পর সর্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করেন জিবরাইল। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারীও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনার শব্দবিন্যাস এরকম— আল্লাহ্ যখন আকাশে কোনো কিছুর মীমাংসা করেন, তখন তাঁর বাণী শ্রবণ করে ফেরেশতারা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাদের পক্ষসঞ্চালন করতে থাকে। ওই পক্ষসঞ্চালনের আওয়াজ শুনে মনে হয় যেনো পাথরের চত্বরের উপরে বার বার বাড়ি খাচ্ছে

লোহার শিকল। যখন তাদের ভয় কেটে যায়, তখন তারা একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে, তোমার প্রভুপ্রতিপালক তোমাকে কী বলেছেন? জবাবে সে বলে, তিনি যা বলেছেন, তা সঠিক। অন্য এক হাদিসে হজরত মুসার বেহুঁশ হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে 'তারপর যখন তাঁর প্রভুপালক পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতির প্রকাশ ঘটালেন, তখন পাহাড় পুড়ে গেলো এবং মুসা বেহুঁশ হয়ে গেলেন'।

অবশিষ্ট রইলো হজরত ইবনে ওমরের কথা। তিনি বলেছেন, কোনো কোনো লোকের ভিতরে শয়তান অনুপ্রবেশ করে। হজরত আসমাও বেহুঁশ হওয়ার কথা শুনে পাঠ করেছিলেন 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির রজীম'। তাঁদের এমতো বচন থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, তাঁরা ছিলেন রসুল স. এর সাহচর্যালোকস্নাত। তাই তাঁদের আধার ছিলো প্রশস্ত। অপরিমেয় ছিলো উদ্যম। ফলে ফয়েজ ও নূরের প্রবলতম বর্ষণও তাঁদেরকে অচৈতন্য করতে পারতো না। তাই তাঁদের চোখে অচৈতন্য হয়ে যাওয়াকে মনে হয়েছিলো প্রতারণা। ইবনে সিরীনের ঘটনাতেও রয়েছে এরকম ধারণার প্রমাণ। যেমন তাঁকে একবার বলা হলো কতিপয় লোকের কথা, যারা কোরআন শুনে চেতনা হারিয়ে ফেলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওদেরকে ঘরের ছাদে নিয়ে গিয়ে নিচের দিকে পা ঝুলিয়ে বসিয়ে দেওয়া হোক। তারপর তাদের সামনে কোরআন পাঠ করা হোক। এরপর যদি তারা চেতনাশূন্য হয়ে নিচে পড়ে যায়, তবে বোঝা যাবে তাদের চেতনা হারিয়ে ফেলার বিষয়টি সত্যি।

সতর্কবাণী ঃ ফেরেশতাদের চেয়ে মানুষ অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন এবং তাদের সামর্থ্য অত্যন্ত উচ্চ। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে কোরআন মজীদেই। যেমন— 'যখন তোমার প্রভুপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বললো, তুমি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে, যে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো তোমার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি জানি, যা তোমরা জানো না'। অন্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে— 'আমি আকাশ-পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে এই আমানত পেশ করেছিলাম, তারা একে বহন করতে অস্বীকৃত হলো এবং এতে ভীত হলো। কিন্তু মানুষ তা বহন করলো'।

ফেরেশতারা তাই প্রত্যাদেশ শুনলে মুর্ছা যায়, কিন্তু মানুষের অবস্থা সেরকম হয় না। সুফী সাধকগণের মধ্যে যাঁদের আত্মিক আরোহণ (উরুজ) ও অবরোহণ (নুজুল) উভয়টি পূর্ণ ও পরিণত, অচৈতন্য হওয়ার বিপদ থেকে তাঁরা সাধারণতঃ রক্ষা পেয়ে থাকেন। আর যদি তাঁদের কারো ঊর্ধ্বারোহণের তুলনায় অবরোহণ হয় অসম্পূর্ণ অথবা আংশিক, তবে অচৈতন্য হওয়ার বিপদ থেকে তাঁরা রেহাই পান না। সে কারণে তাঁরা প্রায় সারাক্ষণ ভোগেন আধ্যাত্মিক মত্ততায়। শ্লোকে সঙ্গীতে আল্লাহ্‌র মহিমাধ্বনি শুনেও তাঁরা কখনো নাচেন, কখনো লুটিয়ে পড়েন, আবার কখনো যান মুর্ছা। এ ধরনের অপরিপক্ক সুফিগণের মধ্যেই প্রচলিত হয়েছে

সামা, কাসিদা ইত্যাদি। কিন্তু বুঝতে হবে কোরআন ওই সকল নৃত্যগীত অপেক্ষা অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে কোরআনের ফয়েজ ও নূর আহরণের যোগ্যতা সবাই অর্জন করতে পারে না। সেকারণেই দেখা যায়, কোরআন পাঠ শুনে নয়, তাদের হালের পরিবর্তন হয় সামা-সঙ্গীত ইত্যাদি শুনে। কিন্তু যে সকল সুফী সাধক আধ্যাত্মিকতায় সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা উপনীত হন 'দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা ক্বাবা ক্বওসানি আও আদনা' (নিকটবর্তী হলো, তখন ছিলো দুই ধনুকের জ্যাসমান ব্যবধান, অথবা তদপেক্ষা কম) পর্যায়ে, তাঁদের হাল হয় সাহাবীগণের মতো। কোরআন শুনে তাঁদের নয়ন অশ্রুসজল হয়, খাড়া হয় শরীরের পশম এবং অন্তরে আসে আল্লাহ্‌র স্মরণস্নাত প্রশান্তি ও প্রসন্নতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, তিনি এর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই'।

এখানে 'জালিকা' অর্থ এটাই। অর্থাৎ এই ভয় ও আশা, অথবা এই কোরআন। 'ওয়া মাঁই ইউদ্বলিলিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্ যাকে অসহায়রূপে পরিত্যাগ করেন, তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না ভ্রষ্টতা থেকে।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার মতো, যে নিরাপদ? জালেমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন করো'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে যে ব্যক্তি তার মুখাবয়বকে ঢাল করে সুকঠিন শাস্তি ঠেকাবার বৃথা চেষ্টা করবে, সে তো তখনকার নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তির মতো হতেই পারে না। ওই সকল নিরাপত্তাহীন স্বেচ্ছাচারীকে তখন বলা হবে, পৃথিবীতে যে সকল শাস্তিযোগ্য অপরাধ তোমরা করতে, এখন তার যন্ত্রণাদায়ক প্রতিফল ভোগ করো। এখানে 'সে কি তার মতো, যে নিরাপদ' কথাটি উহ্য রয়েছে। আর এখানকার 'আফামান্' হচ্ছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। এর সোজাসুজি অর্থ— যা হতেই পারে না। অর্থাৎ শাস্তিগ্রস্ত ব্যক্তি কখনো শাস্তিমুক্তদের মতো হতে পারে না।

'মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে' অর্থ শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুখকে বানাতে চাইবে ঢাল। মানুষ হামলা ঠেকায় সাধারণতঃ হাত দিয়ে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যখন দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তাদের হাত বাঁধা থাকবে গর্দানের সঙ্গে। তাই মুখ বাড়িয়ে দিয়ে শাস্তি থেকে বাঁচবার নিষ্ফল চেষ্টা করবে তারা। মুজাহিদ বলেছেন, তখন তাদের মুখের প্রতিরোধপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে আগুনের মধ্যে। সেকারণে সর্বপ্রথম আগুন লাগবে তাদের চেহারায়। মুকাতিল বলেছেন, কাফেরদের হাত গলায় বেঁধে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে এবং তখন তাদের গলায় ঝুলানো থাকবে বিরাট পাহাড়ের সমান গন্ধকের এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড, তাতে আগুন ধরে যাবে সঙ্গে সঙ্গে এবং তা জ্বলতে থাকবে অবিরাম।

এখানে সর্বনাম (তাদেরকে) ব্যবহার না করে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে 'জালেমদেরকে'। এভাবে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রমাণকে করা হয়েছে অধিকতর সুদৃঢ় এবং সঙ্গে সঙ্গে কেনো যে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, সুস্পষ্ট করা হয়েছে তার কারণটিকেও।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তাদের পূর্ববর্তীগণও অস্বীকার করেছিলো, ফলে শাস্তি এমনভাবে তাদেরকে গ্রাস করলো যে, তারা ধারণাও করতে পারেনি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, মক্কার মূর্তিপূজকেরাই কেবল আপনার বিরুদ্ধাচরণ করছে না। সকল যুগের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব এরকমই। ইতোপূর্বেও আমার প্রেরিত পুরুষগণকে অস্বীকার করেছিলো সেই জামানার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। তার জন্য যথোপযুক্ত প্রতিফলও তারা পেয়েছিলো। অকস্মাৎ একদিন মহাশাস্তি এসে পড়েছিলো তাদের উপর, যা ছিলো তাদের কল্পনার অতীত।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখেরাতের শাস্তি তো কঠিনতর। যদি তারা জানতো'। একথার অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পার্থিব শাস্তি ভোগ করতে হবেই। তদুপরি আখেরাতের শাস্তিও ভোগ করতে হবে তাদেরকে। আর আখেরাতের শাস্তি তো আরো বেশী ভয়ংকর। যদি তারা বুঝতো, তবে আমা কর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহকগণকে তারা মিথ্যাবাদী বলতোই না।

এখানে 'আলখিয্ইয়ুন' অর্থ লাঞ্ছনা, অপমান। যেমন চেহারা বিকৃত হওয়া, মাটি ধসে যাওয়া, মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকা, মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হওয়া, বীভৎস আওয়াজে হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া, প্রস্তরবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হওয়া ইত্যাদি। 'ওয়া লাআ'জাবুল আখিরাতি আকবর' অর্থ আখেরাতের শাস্তিতো কঠিনতর। আর 'লাওকানু ইয়া'লামূন' অর্থ যদি তারা জানতো। অর্থাৎ যদি তারা জ্ঞানী হতো, তবে নবীগণকে অস্বীকার করার ফল কতো ভয়াবহ, তা বুঝতে পারতো এবং তাদেরকে কিছুতেই মিথ্যারোপ করতো না। অথবা এখনকার মক্কাবাসী যদি বিষয়টির পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হতো, তবে নিশ্চয় পরিত্যাগ করতো তাদের স্বেচ্ছাচারিতা।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

❑ আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে,

❑ আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

❑ আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেনঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দুইজনের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আমি মানুষের সৎপথপ্রাপ্তির জন্য এই কোরআনে সব রকমের উত্তম বিষয় বর্ণনা করেছি, যাতে করে উপদেশ গ্রহণ করে। কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে আরবী ভাষায়, যাতে সামান্যতম বক্রতাও নেই, যাতে মানুষ এই কোরআনের বাণী শুনে সাবধান হয়ে যেতে পারে।

এখানে 'মিন কুললি মাছালিন' অর্থ সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত, সব রকমের উত্তম বিষয়, যা চিন্তাশীল ধর্মানুরাগীদের জন্য আবশ্যক। 'গইরা জী ইওয়াজ্' অর্থ বক্রতামুক্ত, প্রতিবন্ধকতাহীন। 'সরল' (মুসতাক্বিম) অপেক্ষা 'বক্রতামুক্ত' কথাটি অধিকতর শানিত। এতে করে সব ধরনের বক্রতা ও বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। সুতরাং সকল সন্দেহের অপসারণার্থে এমতো শব্দের ব্যবহারই যথাযথ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— কোনো অনৈক্যসূচক বিবরণ এতে নেই । মুজাহিদ এর অর্থ করেছেন, এর মধ্যে নেই কোনো সংশয় অথবা সন্দেহ। সুদ্দী অর্থ করেছেন— এটা সৃষ্টি নয়। যারা সৃষ্টি, তাদের কথাতেই তো থাকে মতানৈক্য, সংশয়। আর কোরআন তো সৃষ্টিই নয়। ইমাম মালেকও কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে। বাগবী লিখেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সত্তরজন তাবেয়ীর ঐকমত্যসঞ্জাত উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে, কোরআন স্রষ্টাও নয়, সৃষ্টিও নয়। অর্থাৎ কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র 'বাণী' নামক গুণ। আর এই গুণ স্বয়ং আল্লাহ্‌র সত্তা নয় যে, তাকে স্রষ্টা বলা যাবে, আবার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নও নয় যে, একে বলা যেতে পারবে সৃষ্টি।— এই বর্ণনা একথাই প্রমাণ করে যে, তাবেয়ীনগণের মতে আল্লাহ্‌র বাণীভুক্ত শব্দও অনাদি এবং তা আল্লাহ্‌তায়ালার একটি গুণ বিশেষ। প্রকৃত বাণী গোপন ও অনুচ্চারিত অবস্থাতেই থাকে। আর ভাষা হচ্ছে শব্দের গুণ। সুতরাং আল্লাহ্‌র বাণী কেবল আরবী হতে পারে না। কেননা আরব-অনারব হওয়া তো শব্দের গুণ। এরকম শব্দসম্ভার প্রয়োজন হয় সৃষ্টির জন্য। তাদের জন্যই অক্ষর ও শব্দকে বিন্যস্ত করতে হয় বিশেষ বিশেষ নিয়মে। আল্লাহ্‌র বাণী তো তাঁর সত্তাসন্নিহিত। তাঁর বাণীতে অক্ষরসংযোজনের কল্পনাও যে ভুল। যদি এরকম করা হয়, তবে তা হবে

অদৃশ্যকে পরিদৃশ্যমান বলে ধারণা করার মতো। আল্লাহ্ মানুষের দর্শনাতীত। তৎসত্ত্বেও আখেরাতে তিনি তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে দর্শনদানে ধন্য করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ দর্শন অসম্ভব জেনে ওই দর্শনকেও অস্বীকার করে থাকে। তারা বিষয়টিকে বিচার করে সৃষ্টির দর্শনের প্রেক্ষাপটে। সৃষ্টিকে দেখার জন্য স্থান, দূরত্ব, সময় ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তো এ সকল কিছু থেকে পবিত্র। তিনি যে আনুরূপ্যবিহীন— সত্তায়, গুণবত্তায় ও কার্যকলাপে। সকল মর্যাদা ও মহিমা কেবল তাঁর। সমূহ প্রশংসা ও পবিত্রতার অধিকারীও কেবল তিনি। তিনি যে মহা প্রতাপশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

এরপর বলা হয়েছে— 'যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে'। একথার অর্থ— বক্রতামুক্ত এই কোরআন শুনে যেনো মূর্তিপূজারীরা পরিত্যাগ করে তাদের পূজা-অর্চনা। যেনো বেঁচে থাকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা থেকে। উল্লেখ্য, এটা হচ্ছে কোরআন অবতীর্ণ করার দ্বিতীয় কারণ, যা প্রথম কারণ 'যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' এর ধারাবাহিকতা, ব্যাখ্যা, অথবা পরিপূরকতা।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেনঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দু'জনের অবস্থা কি সমান? এখানে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বহুত্ববাদী ও একত্ববাদীদের অবস্থানগত বৈপরীত্যকে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। যেমন অনেক মালিকের একজন ক্রীতদাস। এমতাবস্থায় মালিকেরা তো তাকে নিয়ে টানাটানি করবেই। বিভিন্ন জন দিবে বিভিন্ন কাজের হুকুম। ক্রীতদাসও তখন কোনটা ছেড়ে কোনটা পালন করবে, কাকে বাদ দিয়ে কাকে সন্তুষ্ট করবে, তা নিয়ে সারাক্ষণ থাকবে পেরেশান। পক্ষান্তরে একজন মালিকের দাসদের এরকম কোনো সমস্যাই নেই। সে এক ধ্যানে এক মনে প্রশান্তচিত্তে হতে পারে তার মালিকের ইচ্ছা ও নির্দেশাবলীর সতত সেবক।

'হাল ইয়াস্‌তাভিয়ানি মাছালা' অর্থ এই দু'জনের অবস্থা কি সমান? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— না। এ দু'জনের অবস্থা কখনোই সমান নয়। প্রশ্নটি একই সঙ্গে অব্যর্থ যুক্তিস্থাপকও বটে। যুক্তিটির দাবি এই যে— ওই দু'জনের অবস্থা যে সমান নয়, তা যেনো নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া হয়। এমতো দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের উদ্দেশ্য এটাই।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না'। একথার অর্থ— সমূহ স্তব-স্তুতি-প্রশস্তি-প্রশংসা কেবলই আল্লাহ্র। কেউ বা কোনোকিছু এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ অথবা অংশীদার নয়। হতে পারেইনা। কিন্তু মূর্তিপূজারীদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে অজ্ঞ।

এখানে 'বাল' (বরং) হচ্ছে প্রারম্ভিক শব্দ, যা অজ্ঞ-অসভ্যদের অবস্থা বর্ণনা করছে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক তাদের অনপনেয় মূর্খতার কারণে আল্লাহ্র অংশীদার অথবা সমকক্ষ নির্ধারণ করে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'প্রশংসা' (আলহামদ) এর পূর্বে উহ্য রয়েছে 'বলো' (কুল)। ওই উহ্য শব্দটিসহ এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, আল্লাহ্তায়ালাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর মহান এককত্বের (তওহীদের) ধারণা প্রত্যাদেশাকারে অবতীর্ণ করেছেন। তাই তিনি সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৩০, ৩১

❑ তুমি তো মরণশীল এবং উহারাও মরণশীল।

❑ অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা তো পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনাকে এক সময় নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করতেই হবে। তেমনি আপনার বিরুদ্ধবাদীদের মৃত্যুও সুনিশ্চিত। তারপর মহাবিচারের দিবসে সকলকে একত্র করা হলে আল্লাহ্ আপনার ও তাদের বিবাদ বিসম্বাদের চির অবসান ঘটাবেন। প্রদান করবেন যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত।

এখানে 'ইন্নাহুম মাইয়্যিতুন' অর্থ তারাও মরণশীল। অর্থাৎ সকলের মৃত্যু অনিবার্য। এই অনিবার্যতা বোঝাতেই এখানে ভবিষ্যতকালের ক্রিয়ার পরিবর্তে বসানো হয়েছে এমন শব্দ, যা চিরন্তনতা প্রকাশক। ফাররা ও কুসাইয়ের বক্তব্যে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় 'মাইয়্যিতুন' বলে ওই ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতে মৃত্যুবরণ করবে। অর্থাৎ এখনো যে মরেনি। আর 'মায়্যিত' বলে মরদেহকে। এজন্যই দু'টো শব্দেই ব্যবহৃত হয়েছে 'তাশদীদ'যুক্ত 'ইয়া'।

জালালুদ্দিন মাহাল্লী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা মনে প্রাণে কামনা করতো, রসুল স. এর মৃত্যু হোক। তাদের এমতো মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো 'তুমিতো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল'।

'ছুম্মা ইন্নাকুম' অর্থ অতঃপর তোমরা অর্থাৎ রসুল স. ও তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা। অথবা সকল মানুষ। 'ইয়াখ্তাসিমূন' অর্থ বাক-বিতণ্ডা করবে। অতীতের কার্যকলাপ নিয়ে শুরু করবে বচসা। যেমন— রসুল স. বলবেন, হে আমার প্রভুপালক! আমার স্বজাতি এই কোরআনকে মনে করতো প্রলাপবাক্য। তারা আমাকে মিথ্যাবাদী তো বলতোই, তদুপরি আমাকে তারা বানিয়েছিলো উপহাসের পাত্র, যদিও আমি ছিলাম ন্যায় ও সত্যের উপরে অটল। আমি তাদেরকে ডেকেছি তওহীদের দিকে। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তোমার বিধানাবলীর অনুগত করার জন্য ও শুভপথের পথিক হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা-

সাধনা আমি করেছি। কিন্তু তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। স্থির থেকেছে মিথ্যাচারিতার উপরেই। অংশীবাদীরা বলবে, যিনি আমাদের প্রভুপালনকর্তা, তাঁর

শপথ করে বলি, আমরা কখনো পৌত্তলিক ছিলাম না। আরো বলবে, আমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে কেউ আগমন করেনি। তাই তো আমরা আমাদের গুরুজন ও নেতৃবর্গের কথা শুনে চলেছি। অনুসরণ করেছি ওই সকল আচার আচরণের, যেগুলো করতো আমাদের পূর্বপুরুষেরা।

অন্যান্য লোকও তখন পারস্পরিক অধিকার ও দাবি প্রতিষ্ঠা নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিবে। সবার আগে মীমাংসা করা হবে হত্যাকাণ্ডের। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শেষ বিচারের দিনে খুনের বিচার করা হবে সর্বাগ্রে।

তিরমিজি, ইবনে মাজা, তিবরানী ও ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমরা রসুল স. এর কাছ থেকে শুনেছি, নিহত ব্যক্তি তখন এক হাতে তার কর্তিত মস্তক এবং অপর হাতে খুনীকে ধরে নিয়ে হাজির হবে বিচারস্থলে। তার গর্দানের শিরা-উপশিরা থেকে ঝরতে থাকবে তাজা খুন। সে আল্লাহ্র আরশের দিকে অগ্রসর হয়ে বলবে, এই লোকটি আমাকে খুন করেছিলো। আল্লাহ্ তখন খুনীকে বলবেন, তুই ধ্বংস হয়ে যা। এরপর খুনীকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি উত্তমসূত্রসম্বলিত। তিবরানী এই হাদিসের মধ্যভাগে হজরত ইবনে মাসউদের বক্তব্য

উপস্থাপন করেছেন এভাবে, রসুল স. বলেছেন, নিহত ব্যক্তি খুনীকে ধরে নিয়ে আসবে। তার কণ্ঠদেশের শিরা-উপশিরা থেকে ফিনকি দিয়ে বের হতে থাকবে রক্ত। সে বলবে, হে আমার প্রভুপালনকর্তা! তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো, কেনো সে আমাকে খুন করেছিলো? হত্যাকারী তখন বলবে, আমি তাকে খুন করেছিলাম অমুক ব্যক্তির সম্মান রক্ষার্থে। আল্লাহ্ বলবেন, সকল সম্মান তো আমার। হজরত ইবনে মাসউদ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হন্তারক ও নিহত ব্যক্তি দু'জনকেই হাজির করা হবে আল্লাহ্র দরবারে। আল্লাহ্ হত্যাকারীকে জিজ্ঞেস করবেন, কেনো তুমি তাকে হত্যা করেছিলে? যদি সে আল্লাহ্র জন্য হত্যা করে থাকে, তবে বলবে, ধর্মে আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি বজায়ার্থে আমি তাকে হত্যা করেছি। আল্লাহ্ বলবেন, নিশ্চয়ই প্রভুত্ব প্রতিপত্তি কেবল আমার। অন্যথায় জবাব দিবে, আমি এ লোককে হত্যা করেছি অমুক ব্যক্তির প্রতিপত্তি রক্ষার্থে। আল্লাহ্ বলবেন, তার তো কোনো প্রতিপত্তি নেই। এরপর হত্যাকারীকে দেওয়া হবে মৃত্যু-কষ্টের শাস্তি। ওই শাস্তি চলতে থাকবে ততোকাল পর্যন্ত, যতোকাল সে নিহত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেছিলো পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে।

আহমদ, তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন আমি রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আমাদের নিজেদের সংঘটিত বিষয়াবলী

কি পুনরায় আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে? তিনি স. বললেন, অবশ্যই। প্রত্যেক হকদারের কাছে তার হক পৌঁছানো হবেই। আমি বললাম, হায় আল্লাহ্। ব্যাপারটা তো হবে খুবই কঠিন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে হজরত আবু আইয়ুব থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, নারী-পুরুষের বাদানুবাদও উপস্থিত করা হবে সেদিন। আল্লাহ্র শপথ! পুরুষ মুখে কিছুই বলবে না। বরং নারীর হাত-পা তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, এই নারী তার স্বামীকে অমুক অমুক দোষে দোষী সাব্যস্ত করতো। আর পুরুষের হাত পা সাক্ষ্য দিবে, সে তার স্ত্রীর উপর অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ করতো। এভাবে গৃহস্বামী ও তার পরিচারক-পরিচারিকাদের মধ্যেও বাক-বিতণ্ডা চলবে। তারপর ডাকা হবে ব্যবসায়ীদেরকে। এভাবে তলব করা হবে অন্যান্যদেরকেও। শেষে সকল অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে মীমাংসা করা হবে এভাবে— অত্যাচার ও অধিকার খর্বের মাত্রানুসারে অত্যাচারীর পুণ্য দেওয়া হবে অত্যাচারিতদেরকে, অথবা অত্যাচারীর উপরে চাপানো হবে অত্যাচারিতদের পাপের ভার। এভাবে অত্যাচারীরা পুণ্যশূন্য ও পাপবাহী হয়ে গেলে তাদেরকে আবদ্ধ করা হবে লোহার সিন্দুকে এবং আদেশ করা হবে, এদেরকে দোজখে নামিয়ে দাও।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় হজরত উকবা ইবনে আমের থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে সর্বপ্রথম বিচারপ্রার্থী হবে দুই প্রতিবেশী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ভ্রাতৃত্বের দাবি যেনো দুনিয়াতেই পরিশোধ করা হয়। কেননা সেখানে (দাবি পরিশোধের জন্য) দীনার-দিরহাম থাকবে না। তখন তার পুণ্য থাকলে তাই দিয়ে পরিশোধ করা হবে তার পাওনাদার ভাইয়ের পাওনা। আর তা না থাকলে বহন করতে হবে পাওনাদারের পাপ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার সাহাবীগণের এক সমাবেশে বললেন, তোমরা কি জানো, দরিদ্র কে? সাহাবীগণ বললেন, যার টাকা-পয়সা জমি-জমা নেই। তিনি স. বললেন আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র সে-ই, যে মহাবিচারের দিবসে হাজির হবে অনেক নামাজ-রোজা-জাকাত ও অন্যান্য সৎকর্ম নিয়ে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো আমানত আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছে, অথবা কাউকে করেছে অন্যায়ভাবে প্রহার। কাজেই তাকে পাকড়াও করা হবে। আর তার পুণ্যসমূহ কিছু কিছু করে দিয়ে দেওয়া হবে তাদেরকে, যাদের অধিকার সে খর্ব করেছিলো। যদি এভাবে ক্ষতিপূরণ করার আগেই তার পুণ্য শেষ হয়ে যায়, তবে দাবিদারদের পাপ কিছু কিছু করে চাপানো হবে তার উপর। শেষে তাকে নিক্ষেপ করা হবে নরকানলে।

আমি বলি, অত্যাচারিত ব্যক্তি নিতে পারবে কেবল অত্যাচারীর পুণ্য, ইমান নয়। কেননা 'কুফর' (সত্যপ্রত্যাখ্যান) ছাড়া অন্য কোনো পাপের শাস্তি সীমাহীন সময়ের জন্য নয়। এক সময় তা শেষ হয়ে যাবে। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল

জামাতের মতাদর্শ। এই জামাতের অভিমত হচ্ছে, বৃহৎ পাপের (কবীরা গোনাহ্র) জন্যও কেউ চিরকাল দোজখে থাকবে না। আর ইমানের পুরস্কার হচ্ছে চিরস্থায়ী বেহেশত। সুতরাং বান্দার হক নষ্ট করার কারণে কোনো ইমানদার চিরকাল দোজখে থাকতে পারে না। মোট কথা ইমানদার ব্যক্তি কারো হক নষ্ট করলে তার আমলনামার পুণ্যসমূহ দেওয়া হবে কেবল দাবিদারকে। এভাবে তার সকল পুণ্য শেষ হয়ে গেলে বাকী থাকবে কেবল ইমান। এর পরেও অন্য কোনো দাবিদার যদি তাকে ক্ষমা করতে অস্বীকৃত হয়, তবে তাকে নিক্ষেপ করা হবে দোজখে এবং সেখানে রাখা হবে তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত। এভাবে তার পাপমোচন হয়ে গেলে তাকে দেওয়া হবে বেহেশতের প্রবেশাধিকার এবং তার ওই বেহেশতবাস হবে চিরকালীন। কেননা সে ইমানদার। বায়হাকীও বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শেষ বিচারের দিনে দাবিদারদের দাবি মিটিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি শিঙহীন ছাগলকেও দেওয়া হবে শিঙবিশিষ্ট ছাগলের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, শিঙহীন ছাগলকে শিঙবিশিষ্ট ছাগলের উপর, অত্যাচারিত লাল পিঁপড়াকে অত্যাচারী লাল পিঁপড়ার উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হবে সেদিন।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম বলেছেন, যখন 'তুমি তো মরণশীল' থেকে 'বাক-বিতণ্ডা করবে' পর্যন্ত আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা বলাবলি করেছিলাম, আমাদের নিজেদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হতে পারবে কীভাবে? আমাদের আল্লাহ্, ধর্ম, কিতাব সবই তো এক। এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের কারো কারো চেহারার উপর তরবারী মারা হচ্ছে। এখন বুঝতে পারি, এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল আমরাই।

হজরত আবু সাঈদ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম, আমাদের রব এক, আমাদের নবী এক এবং আমাদের কিতাবও এক। তাহলে আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হতে পারবে কীভাবে? কিন্তু যখন সিফফিন যুদ্ধের দিন এসে গেলো এবং আমাদের একজন আর একজনকে তরবারী দিয়ে আক্রমণ করলো, তখন আমরা অনুধাবণ করতে পারলাম, হ্যাঁ, এটাই সেই বিষয় যা আমরা আগে বুঝিনি।

ইব্রাহিম বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় বলতেন, আমরা তো ভাই ভাই। তাহলে আমাদের মধ্যে আবার ঝগড়া হবে কীভাবে? কিন্তু যখন হজরত ওসমান শহীদ হলেন, তখন আমরা বুঝলাম, এটাই আমাদের বাক-বিতণ্ডা।

এ সকল বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবীগণ মনে করতেন হত্যা ও খুন-খারাবীর সম্পর্ক হতে পারে কেবল মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে। মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে এরকম কিছু হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হলো, মুসলমানদের মধ্যে শুরু হলো কলহ-বচসা, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন শত্রুতা ও বিবাদ মুসলমানদের ভিতরেও হবে।

চতুর্বিংশতম পারা

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

❑ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসিবার পর উহা অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

❑ যাহারা সত্য আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে তাহারাই তো মুত্তাকী।

❑ ইহাদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই আছে ইহাদের প্রতিপালকের নিকট। ইহাই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার।

❑ যাহাতে ইহারা যেসব মন্দ কর্ম করিয়াছিল আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়া দেন এবং ইহাদিগকে ইহাদের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করেন।

❑ আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই।

❑ এবং যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন তাহার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নাই; আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নহেন?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরে মিথ্যা আরোপ করে এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর রসুলের মাধ্যমে সত্য কিতাবের বাণী প্রচারিত হবার পর তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? অগ্নিময় জাহান্নামই কি তাদের প্রকৃত বসবাসস্থল নয়?

এখানকার 'ফামান আজলামু' কথাটির 'ফা' কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ রসুল স. এর প্রতিবাদী হওয়াই তাদের জালেম বা সীমালংঘনকারী হওয়ার কারণ। এখানে উপস্থাপিত প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— এ ধরনের লোকের চেয়ে অধিক সীমালংঘনকারী কেউ নেই।

'কাজাবা আ'লাল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে। যেমন বলে 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা', 'প্রতিমাগুলো আল্লাহ্র সমীপে আমাদের জন্য সুপারিশকারী' ইত্যাদি। 'ওয়া কাজ্জাবা বিস্ সিদ্‌ক্বি ইজ জ্বাআহু' অর্থ সত্য আসবার পর তা অস্বীকার করে। বহু প্রমাণ-সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও চিন্তা-ভাবনা না করে অস্বীকার করে আল্লাহ্র বাণী। আর 'মাছওয়া' অর্থ আবাসস্থল, অপেক্ষাগার, অবতরণের স্থান।

উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয় ও এই আয়াতের মধ্যে রসুল স. এর জন্য রয়েছে প্রভূত প্রশান্তি। এই আয়াতত্রয়ে তাঁকে এই মর্মে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, হে আমার প্রিয়তম নবী! অংশীবাদীদের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান, অস্বীকৃতি ও উপহাস-পরিহাসের কারণে দুঃখ করবেন না। কামনা করবেন না তাদের জন্য তাৎক্ষণিক শাস্তিও। তাদের পরকালের শাস্তি যে অনিবার্য। আর সে শাস্তি হবে অন্তহীন।

পরের আয়াতে (৩৩) বলা হয়েছে— 'যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে, তারাই তো মুত্তাকী'।

রসুল স. সহ সকল নবী-রসুল ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীবৃন্দ সকলেই আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যভূত। অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সত্য এনেছেন এবং অন্যরা সেই সত্যকে সত্য বলে মেনেছেন। তাই বলা হয়েছে 'উলায়িকা হুমুল মুত্তাকুন' (তারাই তো মুত্তাকী)। হজরত ইবনে মাসউদ আয়াতখানি পাঠ করতেন এভাবে— 'ওয়াল্লাজীনা জ্বাউ বিস্‌সিদক্বি'। তাঁর এমতো পাঠভঙ্গিও বর্ণিত ব্যাখ্যাটির সমর্থক। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সিদক্ব' (সত্য) অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ', যা রসুল স. এনেছেন এবং তা জনসমক্ষে প্রচারও করেছেন।

এরকম ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে 'তারাই তো মুত্তাক্বী' কথাটির অর্থ হবে রসুল স. স্বয়ং এবং তাঁর উম্মতের একনিষ্ঠ অনুসারীবৃন্দ; অন্যান্য নবী অথবা অন্যান্য নবীর একনিষ্ঠ উম্মত আলোচ্য আয়াতসংশ্লিষ্ট হবেন না। এরকম বাকভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে অন্য এক আয়াতেও। যেমন— 'নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি

যেনো তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়'। (ওয়া লাক্বাদ আতাইনা মুসাল কিতাবা লাআ'ল্লাহুম ইয়াহ্তাদূন)। এখানে 'হুম ইয়াহ্তাদূন' (তারা যেনো হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়) কথাটির অর্থ যেনো হেদায়েত প্রাপ্ত হয় কেবল হজরত মুসার অনুগামীবৃন্দ।

সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'সত্য এনেছে' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত জিবরাইলকে এবং 'সত্যকে সত্য বলে মেনেছে' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। কালাবী ও আবুল আলিয়া বলেছেন, কোরআন এনেছেন রসুল স. এবং তাকে সত্য বলে মেনেছেন হজরত আবু বকর। জুজায হজরত আবু বকরের সঙ্গে হজরত আলীর নামও যুক্ত করেছেন। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনাতেও একথার সমর্থন বিদ্যমান।

কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, সত্য নিয়ে এসেছেন রসুল স. এবং তাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন বিশ্বাসীগণ। আতা বলেছেন, সত্য আনয়নকারী ছিলেন সকল নবী-রসুল এবং তা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসারীগণ।

'মাদারেক' রচয়িতা এবং বায়যাবী লিখেছেন, আরবী ভাষার রীতি অনুসারে 'জ্বাআ' ও 'সদ্দাক্বা' এর কর্তা একজনই। অর্থাৎ যিনি এনেছেন, তিনিই মেনেছেন। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাও করতে হবে এই রীতি অনুসারে। কেননা কর্তা অভিন্ন না হলে মেনে নিতে হয় যে, এখানকার 'সদ্দাক্বা'র আগে লুপ্ত রয়েছে আর একটি শব্দ 'আল্লাজী'(যে)। কিন্তু এমতো ধারণা বিধিসম্মত নয়। অথবা মেনে নিতে হবে কর্তার সর্বনাম এখানে রয়েছে উহ্য, আবার সে সর্বনামের নামপদও সুনির্দিষ্ট নয়।

আমি বিস্মিত হই, 'মাদারেক' রচয়িতা এবং বায়যাবী একথা লিখতে পারলেন কীভাবে যে, একটি যোজক (আল্লাজী) কে 'সদ্দাক্বা'র পূর্বে লুপ্ত ভাবা বিধিসম্মত নয়। কালাবী, কাতাদা, মুকাতিল ও আবুল আলিয়ার মতো বিজ্ঞ ব্যাখ্যাতাগণ তো এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। হজরত হাস্সানের কবিতাতেও তো যোজক (মাউসুল) কে বিলুপ্ত রাখার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—

আম্মাঁই ইয়াহজু রসুলাল্লাহি মিনহুম

ওয়া ইয়ামদাহুহু ওয়া ইয়ানসুরুহু সাওয়াউন।

'বাহরে মাওয়াজ' রচয়িতা লিখেছেন, এখানে শব্দাবলীর মাধ্যমে ভাবের প্রকাশ করা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে। অন্য আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন 'ইহুদী ও খৃষ্টানেরা বলে, তারাই জান্নাতে যাবে'। অর্থাৎ ইহুদীরা বলে, জান্নাতে যাবে কেবল ইহুদীরাই এবং খৃষ্টানেরা বলে জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল খৃষ্টান।

এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে 'আল্লাজী' এর উদ্দেশ্য পক্ষ। অর্থাৎ 'আল্লাজী জ্বাআ' অর্থ 'আলফারিক্বুল লাজী জ্বাআ'। কথাটির মধ্যে রয়েছে দু'টি পক্ষই। অর্থাৎ বুঝতে হবে রসুল স. এবং হজরত আবু বকর উভয় পক্ষই রয়েছেন ওই 'আল্লাজীর' মধ্যে। এরপর রসুল স. এর ব্যক্তিত্বকে সামনে রেখে 'জ্বাআ' এর সর্বনামকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে রসুল স. এর পক্ষে এবং হজরত আবু বকরের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'সদ্দাক্বা' এর সর্বনামকে প্রযুক্ত করা হয়েছে তাঁর পক্ষে। এভাবে উভয় সর্বনামের সংযোগ সাধিত হয়েছে 'আল্লাজী' এর সঙ্গেই।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'এদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই আছে এদের প্রতিপালকের নিকট। এটাই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার'। একথার অর্থ— ওই সকল মুত্তাকীদের আবাসস্থল হচ্ছে জান্নাত। সেখানে তারা যা চাবে, তাই পাবে। ওই চিরসুখময় জান্নাতই হচ্ছে তাদের পুণ্যকর্মপরায়ণতার প্রকৃষ্ট পুরস্কার।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'যাতে এরা যে মন্দ কর্ম করেছিলো, আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেন এবং এদেরকে এদের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করেন'। এখানে মন্দ কর্মকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে। অর্থাৎ মুত্তাকীগণের বৃহৎ পাপসমূহও আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং তিনি ক্ষুদ্র পাপ তো ক্ষমা করে দিবেনই। অথচ পথভ্রষ্টরা মনে করে বৃহৎ পাপ ক্ষমার অযোগ্য।

আর এখানকার 'আস্ওয়াল্লাজী আ'মিলু' (যে সব মন্দ কর্ম করেছিলো) কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁরা ছোট-বড় সকল পাপকেই বড় পাপ বলে ভাবেন। সকল প্রকার পাপই তাদের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ, তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক না কেনো? এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে 'আস্ওয়া' (মন্দ কর্ম) দ্বারা পাপের সম্পর্কগত পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি, নির্দেশ করা হয়েছে পাপের প্রকৃতিগত গুণকে। অর্থাৎ পাপের তারতম্য বুঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং একথা বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, প্রকৃতিগতভাবে সকল পাপই মন্দ।

'আজ্বরহুম' অর্থ পুরস্কার। 'বিআহ্সানিল্লাজী' অর্থ তাদের সৎকর্মের। অর্থাৎ আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাধারণ ভালো কাজের পুরস্কার দিবেন অসাধারণ ভালো কাজের মতো। কেননা তারা স্বল্প হলেও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে। কিংবা বলা যেতে পারে, 'আহ্সান' এখানে তুলনামূলক বিশেষণ হিসাবে সাধিত। অর্থাৎ এখানেও অধিক মাত্রায় সৎকর্ম বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রকৃতিগতভাবে যা সৎ ও উত্তম, তা-ই বুঝানো এখানে উদ্দেশ্য। একারণেই মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁদের ভালো কাজের প্রতিদান দিবেন, কিন্তু মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দিবেন না।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ই তাঁর বান্দার জন্য, অর্থাৎ তাঁর প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর জন্য যথেষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে— 'অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়'। একথার অর্থ— অথচ হে আমার রসুল! দেখুন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ভয় তারা প্রদর্শন করে আপনাকে। বলে, আপনি পড়বেন তাদের মিথ্যা উপাস্যসমূহের কোপানলে।

বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা রসুল স.কে এই বলে ভয় দেখাতো যে, তুমি আমাদের দেব-দেবীদের নিন্দা-মন্দ বলা থেকে বিরত যদি না হও, তবে তারা তোমাকে অজ্ঞান অথবা পাগল করে দিবে। আবদুর রাজ্জাকও এরকম বর্ণনা করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো পথপদর্শক নেই'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যাদেরকে সাহায্য করেন না, যারা তাঁর প্রিয়ভাজন নবীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে চায়, এমন বস্তুর ভয় দেখায়, যাদের উপকার-অপকার কোনোটাই করার সাধ্য নেই, তাদের জন্য এমন পথপ্রদর্শক থাকে না, যে তাদেরকে দেখাতে পারে সরল সঠিক পথ।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'এবং যাকে আল্লাহ্ হেদায়েত করেন, তার জন্য কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই'। একথার অর্থ— আর যাকে আল্লাহ্ স্বয়ং পথপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে, এমন সাধ্যও কারো নেই। কেননা আল্লাহ্র অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন'? এই প্রশ্নটিও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপরাক্রমের অধিকারী এবং তাঁর শত্রুদেরকে নির্মম দণ্ডদাতা।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১

❑ তুমি যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে?' বল, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।' নির্ভরকারিগণ আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করে।

❑ বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। শীঘ্রই জানিতে পারিবে—

❑ 'কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর আপতিত হইবে তাহার উপর স্থায়ী শাস্তি।'

❑ আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তাহা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি উহাদের তত্ত্বাবধায়ক নহ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি আপনার স্বজাতীয় অংশীবাদীদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন, গগনমণ্ডল ও মেদিনীর সৃজয়িতা কে? তবে দেখবেন, তারা এক কথায় জবাব দিবে, আল্লাহ্। তখন আপনি তাদেরকে বলে দিন, তাহলে তোমরা এই বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করো তো দেখি, যদি আল্লাহ্ আমাকে দুঃখকষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তোমাদের ভিত্তিহীন উপাস্যসমূহ সে দুঃখকষ্ট কি নিবারণ করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমাকে তাঁর অনুগ্রহধন্য করতে ইচ্ছা করেন, তবে তা প্রতিরোধ করার সামর্থ্যও কি তারা রাখে? দেখবেন, তারা আপনার এমতো প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম। তখন তাদেরকে আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিন এভাবে— আমার মঙ্গলামঙ্গল নিয়ে তাহলে তোমরা ভেবে মরছো কেনো? আমার জন্য তো আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আমি তো আমার সকল বিষয়ে তাঁর প্রতিই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি। নির্ভরকারীগণ এরকমই করে থাকে।

উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্কেই আকাশ পৃথিবীর স্রষ্টা বলে জানতো। তৎসত্ত্বেও পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুসরণে চালিয়ে যেতো প্রতিমাপূজা এবং বিশ্বাস করতো যে, প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করবে। এভাবে প্রতিমাগুলোকে তারা করতো আল্লাহ্র অপার ক্ষমতার সমকক্ষ এবং অংশীদার। অথচ এই মহাসত্যটি তারা অনুধাবন করতে

চাইতো না যে, আল্লাহ্‌কে সকল কিছুর স্রষ্টা মেনে নিলে সকল মঙ্গলামঙ্গলের নির্ধারণিয়তারূপে কেবল তাঁকেই মেনে নিতে হয়। নির্ভর করতে হয় কেবল তাঁরই উপর। বিশুদ্ধ বিশ্বাস এটাই। আর এই বিশুদ্ধতার প্রতিই বার বার তাদেরকে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন রসুলেপাক স.। এখানে আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নের মাধ্যমে একথাটিই তাদের উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্পূর্ণই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়নির্ভর। আর তাঁর অভিপ্রায় প্রতিহত করার সাধ্য যেহেতু কারো নেই, সেহেতু সকল বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করা ও তাঁর প্রতি নির্ভর করাই সমীচীন।

মুকাতিল বলেছেন, রসুল স. আয়াতের প্রথমাংশে উল্লেখিত প্রশ্ন উত্থাপন করলে অংশীবাদীরা তার জবাব দিতে পারেনি। তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো 'বলো, আমার জন্য আল্লাই যথেষ্ট। নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌র উপরেই নির্ভর করে'। উল্লেখ্য, যে প্রকৃত বিশ্বাসী, সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ক্ষতি যেমন করতে পারে না, তেমনি করতে পারে না উপকারও। আর বিশ্বাসের দাবি হচ্ছে, আল্লাহ্‌র উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়া। তাই বিশ্বাসীদেরকে এখানে সরাসরি অভিহিত করা হয়েছে 'নির্ভরকারী'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে—(৩৯) কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি, আর আপতিত হবে তার উপর স্থায়ী শাস্তি' (৪০)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে আরো বলুন, ঠিক আছে, তোমরা যখন আমার কথা মানতেই চাও না, তখন তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও, আমিও ব্যাপৃত থাকি আমার কাজে। তবে জেনো, সেদিন বেশী দূরেও নয়, যখন তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করতে পারবে, এই পৃথিবীতেই কার উপর নেমে আসছে অনিবারণীয় লাঞ্ছনা এবং পরকালের স্থায়ী শাস্তিই বা আপতিত হবে কার উপর।

'মাকানাতুন' অর্থ আবাসস্থল। এখানে শব্দটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে অবস্থা বুঝানোর জন্য। যেমন 'হাইছু' ও 'হুনা' কালকে বুঝায়। আবার কখনো কখনো এ দু'টো শব্দের দ্বারা রূপকার্থে স্থান, পাত্রকে ও বুঝানো হয়ে থাকে।

'ইন্নী আ'মিলুন' অর্থ আমি আমার অবস্থানুসারে কাজ করে যাচ্ছি। এখানে 'মাকানাতি' শব্দটি অনুল্লেখ থাকায় শাস্তির প্রতিজ্ঞাটি অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে। আমি আমার কাজে সফল হবো, তোমাদের কাজ হবে তোমাদের ইহ-পরকালের ধ্বংসের কারণ। 'মাকানাতি' শব্দটি এখানে লোপ করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, রসুল স. তাদের মতো বর্তমান অবস্থায় আবদ্ধ থাকবেন না, বরং যতো বেশী সময় অতিবাহিত হতে থাকবে, তিনি ততো বেশী করে অর্জন করতে থাকবেন শক্তি ও বিজয়। এ জন্যই এখানে 'আমিও আমার কাজ করছি' বলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে। দৃঢ়তার সঙ্গে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আমি আমার কাজে সফল হবোই।

এখানে 'আ'জাবুঁই ইউখ্যীহ্' অর্থ লাঞ্ছনাদায়ক পার্থিব শাস্তি। একথার মধ্যেই রয়েছে রসুল স. এর পার্থিব বিজয়ের সুসংবাদ। বদর যুদ্ধে সেরকমই ঘটেছিলো। আর 'আ'জাবুম মুক্বীম' অর্থ স্থায়ী শাস্তি। অর্থাৎ দোজখের শাস্তি।

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয়, সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই

ধ্বংসের জন্য এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও'। একথার অর্থ— হে আমার বাণীবাহক! মানুষ যাতে অক্ষয় কল্যাণের অধিকারী হতে পারে, সেজন্যই তো আমি আপনার উপরে অবতীর্ণ করেছি মহাসত্যের প্রতিভূ মহাগ্রন্থ আলকোরআন। এখন যে এই কোরআনের নির্দেশনাকে মান্য করবে, সে অবশ্যই হবে মহাকল্যাণের অধিকারী। আর যে বিমুখ থাকবে সে হয়ে যাবে ধ্বংস। এখন বিষয়টি তাদের উপরেই ছেড়ে দিন। দেখুন কে আপনাকে মান্য করে এবং কে করে না। কেউ যদি এখন স্বেচ্ছায় ধ্বংসের পথ ধরে, তবে তার কোনো দায় আপনার উপরে বর্তাবে না।

আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত ২৭ ও ২৮ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছে 'আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে, আরবী ভাষায় এই কোরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে'। এর মধ্যবর্তী আয়াতসমূহের প্রসঙ্গ ভিন্ন। আর এখানে 'মানুষের জন্য' কথাটির অর্থ মানুষের পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী উভয় ক্ষেত্রের কল্যাণ অর্জনের দিকনির্দেশনার জন্য। এখানে 'ফামানিহ্‌তাদা' অর্থ এ গ্রন্থের সহায়তায় যে সৎপথ অবলম্বন করে এবং 'মানদ্বল্লা' অর্থ যে বিপথগামী হয়েছে কল্যাণের পথ থেকে। আর 'ওয়ামা আন্‌তা আ'লাইহিম বি ওয়াকীল' অর্থ এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনার দায়িত্ব কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহের প্রচার। আপনি তা করেই চলেছেন। সুতরাং কারো বিপথগামিতার দায় আপনার উপরে নেই যে, আপনি তাদেরকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করবেন।

তাফসীরে মাযহারী/২৬৩

❑ আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাহাদের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদের মৃত্যু আসে নাই তাহাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর তিনি যাহার জন্য মুত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

❑ তবে কি উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরিয়াছে? বল, 'উহাদের কোন ক্ষমতা না থাকিলেও এবং উহারা না বুঝিলেও?'

❑ বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই, অতঃপর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।'

❑ শুধু এক আল্লাহ্র কথা বলা হইলে যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে উপাস্যগুলির উল্লেখ করা হইলে তাহারা আনন্দে উল্লসিত হয়।

❑ বল, 'হে আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তুমি তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবে।'

❑ যাহারা যুলুম করিয়াছে যদি তাহাদের থাকে, দুনিয়ায় যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ এবং ইহার সমপরিমাণ সম্পদও, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণস্বরূপ সেই সকলই তাহারা দিয়া দিবে এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট হইতে এমন কিছু প্রকাশিত হইবে যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই।

❑ উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণ ও নিদ্রার সময়'। একথার অর্থ—

আল্লাহ্ মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর স্থায়ী প্রাণ হরণ করলে তাদের মৃত্যু ঘটে, এবং সাময়িকভাবে তা করলে তারা হয়ে পড়ে নিদ্রামগ্ন। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে দেওয়া হয় বলে ওই দেহে আর কখনোই প্রাণের স্পন্দন জাগে না। এই অবস্থার নাম মৃত্যু। দ্বিতীয় অবস্থায় দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় কেবল বাহ্যিকভাবে। ফলে প্রাণের বাহ্যিক প্রভাব আর দৃষ্ট হয় না। স্থগিত হয়ে যায় বোধ-বুদ্ধি ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তার অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি উপমার জগতের (আলমে মেছালের) দিকে নিবদ্ধ করে দেন। ওই জগতেই রয়েছে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর ছবি-প্রতিচ্ছবি। এরকম অবস্থার নাম সুপ্তি বা নিদ্রা।

'তাওফ্ফা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ মৃত্যু। আর রূপক অর্থ নিদ্রা। 'ওয়াল্লাতি লাম তামুত্' অর্থ যাদের মৃত্যু আসেনি। কথাটির পূর্বে উহ্য রয়েছে অন্য একটি ক্রিয়া। ওই উহ্য ক্রিয়াটিসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ প্রাণগুলোকে সম্পূর্ণরূপে সংহার করেন, ফলে দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় চিরতরে এবং যাদের মৃত্যু ঘটানো হয় না, তাদেরকে তিনি সংহার করেন নিদ্রাকালে, ফলে তারা বাহ্যিক অনুভূতি ও গতিপ্রকৃতি থেকে হয়ে যায় সম্পূর্ণ অক্ষম।

কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছে আত্মা ও প্রাণ। নিদ্রাকালে আত্মা দেহের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। অবশিষ্ট থাকে কেবল প্রাণ। আর মৃত্যুর সময় প্রাণের সম্পর্কও হয়ে যায় চিরতরে বিচ্ছিন্ন। এখানে আত্মা অর্থ প্রকাশ্য জ্ঞান ও বোধশক্তি। নিদ্রাকালে এগুলো অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তখনো বর্তমান থাকে জীবনের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বোধ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ বের হয়ে যায়। তখন দেহাভ্যন্তরে থাকে কেবল প্রাণের কিরণ। সেকারণেই সে স্বপ্ন দেখে। আর হৃত প্রাণ ফিরে পায় জাগ্রত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। আমি বলি, বর্ণনাটি যদি যথাযথ হয় তবে ঘুমন্ত অবস্থায় প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার অর্থ হবে, সাধারণ আত্মার মধ্যে প্রাণ নিবিষ্ট হয়ে যায় উপমার জগতের দিকে। আর দেহে কিরণ থাকে অর্থ দেহে তখনও বজায় থাকে প্রাণের স্বাভাবিক সম্পর্ক, তাই শ্বাস-প্রশ্বাসও চলতে পারে স্বাভাবিক গতিতে। মোট কথা নিদ্রাকালে প্রাণ আলমে মেছালের দিকে ধাবিত হয় বলেই মানুষ স্বপ্ন দেখে এবং সে প্রাণ ফিরে আসে জেগে ওঠার পূর্বক্ষণে।

সালেম ইবনে আমেরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ওমর একবার বললেন, আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কোনো কোনো মানুষ স্বপ্নে এমন কিছু দেখে, যা ধারণা করা যায় না। হস্তধৃত কোনো বস্তুর মতো তাদের স্বপ্ন হয়ে যায় বাস্তব। আবার কারো কারো স্বপ্ন একেবারেই ফলে না। একথা শুনে হজরত আলী বললেন, আপনাকে আমি এর কারণ জানাচ্ছি। একথা বলে তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, সংহারকৃত প্রাণ আকাশে উঠিয়ে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করানো হলে ওই প্রাণধারীর দর্শিত স্বপ্ন সত্য হয়ে যায়। আর ওই প্রাণকে তার

দেহের প্রতি প্রেরণ করলে শয়তান তার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। জানিয়ে দেয় সত্য-মিথ্যা অনেক কিছু। ফলে তার স্বপ্নও হয় মিথ্যা। হজরত আলীর এমতো ব্যাখ্যা শুনে হজরত ওমর আরো বিস্মিত হলেন।

এরপর বলা হয়েছে 'অতঃপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন, তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ যার মৃত্যু ঘটাতে চান, তার প্রাণ আর ফিরিয়ে দেন না। আর যার মৃত্যু ঘটাতে চান না, তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত।

বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা ইবনে আজীব বলেছেন, রসুল স. শয্যাগ্রহণকালে ডান কাত হয়ে শুয়ে ডান হাত মুখমণ্ডলের নিচে রেখে বলতেন, 'আল্লাহুম্মা, বিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া' (হে আল্লাহ্, আমার জীবন-মরণ তোমারই হাতে)। এখানকার 'বিকা' শব্দের 'কাফ' অক্ষরটি ইঙ্গিত করছে সাহায্য ও আয়ত্তের দিকে। আর তিনি স. যখন জেগে উঠতেন তখন বলতেন, প্রশংসা করি সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে মৃত্যু দেওয়ার পর জীবন দান করলেন। তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাগমন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা শয্যাগ্রহণকালে পরিধেয় বস্ত্রের একাংশ দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নিয়ো, কেননা তোমরা জানো না সেখানে কে আছে না আছে (সাপ-বিচ্ছু পোকামাকড় আছে কিনা) এরপর বোলো 'হে আমার প্রভুপালক আল্লাহ্! আমি তোমারই নামের বরকত ও সাহায্য দ্বারা আমার পার্শ্বদেশ শয্যাসংলগ্ন রাখি এবং তোমারই নামের মহিমায় করি গাত্রোত্থান। আমার জীবনকে যদি তুমি স্তব্ধ করে দাও তবে তার উপরে তুমি অনুগ্রহ কোরো এবং তাকে

যদি তুমি মুক্ত করে দিতে চাও, তবে যে সকল উপকরণ দিয়ে তুমি তোমার পবিত্র বান্দাগণের হেফাজত করে থাকো, সে সকল উপকরণসহ তুমি আমার জীবনকেও করে দিয়ো নিরাপদ। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তোমরা ডান কাতে শুয়ে এই প্রার্থনা কোরো এবং বিছানা ঝাড়া সম্পর্কে বলেছেন, পরণের কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নিয়ো তিনবার।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য'। এ কথার অর্থ— এই প্রাণ হরণ, তারপর সেগুলোর কিছু কিছু আটকে রাখা ও কিছু কিছু ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র অপার ক্ষমতার বিস্ময়কর নিদর্শন। যারা চিন্তাশীল, কেবল তারাই বুঝতে চেষ্টা করে এর মহিমা ও রহস্য। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যে আল্লাহ্ তাঁর চিরস্বাধীন অভিপ্রায়ানুসারে মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর স্থায়ীভাবে ও সাময়িকভাবে প্রাণহরণ করেন, তিনি অবশ্যই সকলের মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থান ঘটাতে সক্ষম। তিনি যে আনুরূপ্যবিহীনরূপে এক, একক, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বের 'নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করে' কথাটির কারণ বিধৃত হয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

পরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরেছে? বলো, তাদের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন কতোই অজ্ঞ এই পৌত্তলিকেরা। মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে তারা সুপারিশকারী মনোনীত করেছে অপ্রাণ প্রতিমাসমূহকে। আপনি তাদেরকে বলুন, ক্ষমতা ও বোধবুদ্ধির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও কি তোমরা ওই প্রতিমাগুলোকে পরিত্যাগ করবে না?

এখানকার 'আমিত্তাখাজূ' কথাটির মধ্যে 'আম' ব্যবহৃত হয়েছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক 'হামযা' অর্থে এবং বাক্যটি এখানে সূচনামূলক। অথবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'বাল' অর্থে, যা দ্বিরুক্তিমূলক এবং এখানে যা রয়েছে অবলুপ্ত। পরের প্রশ্নটিও (আওয়া লাও কানূ) অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— যাদের ক্ষমতা ও চেতনা নেই, সুপারিশ করার যোগ্যতা তো তাদের থাকতেই পারে না।

পরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'বলো, সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে, আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে'। পৌত্তলিকদের পক্ষ থেকে এরকম জবাব আগমনের সুযোগ ছিলো যে, আমরা তো নিছক প্রতিমাপূজারী নই। আমরা পূজা করি ওই সকল শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তিবর্গের, যারা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন। ওই সকল মহান ব্যক্তিও কি তবে সুপারিশ করার যোগ্য নন? তাদের এমতো সম্ভাব্য অজুহাতের মূলোৎপাটনার্থে আলোচ্য আয়াতে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে— সকল সুপারিশ তো আল্লাহ্‌র অধিকারভূত। আর আকাশ-পৃথিবীর সর্বময় প্রভুত্বও তাঁর। সুতরাং পাপী-পুণ্যবান কারো মূর্তিই সুপারিশ করার যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না। সুতরাং সেই আল্লাহ্‌র দিকেই তো তোমাদের মুখ ফেরানো উচিত, যাঁর সকাশে তোমাদেরকে প্রত্যানীত হতে হবেই।

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'শুধু এক আল্লাহ্‌র কথা বলা হলে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উপাস্যগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়'।

মুজাহিদ ও মুকাতিলের বর্ণনানুসারে বাগবী লিখেছেন এবং কেবল মুজাহিদ সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, মক্কার পৌত্তলিকদের আনন্দে উল্লসিত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছিলো তখন, যখন রসুল স. তাদের এক সমাবেশে সুরা আন্‌নজ্‌ম পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ওই সময় রসুল স. এর আবৃত্তির সঙ্গে শয়তান প্রতিমা-প্রশস্তিমূলক কতিপয় শব্দের সংযোজন ঘটায়। ফলে তাদের আনন্দ উপচে পড়ে। বিশেষতঃ সেদিকে লক্ষ্য করেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে— আল্লাহ্‌র প্রসঙ্গ তাদের কাছে বিস্বাদপূর্ণ, আর প্রতিমা-প্রশস্তি চিত্তসুখকর।

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— বলো, 'হে আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতোবিরোধ করে, তুমি তাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দিবে'।

রসুল স. যখন পৌত্তলিকদের পুনঃপুনঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে বিচলিত হয়ে পড়েন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে শিখিয়ে দেন আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রার্থনাটি। এখানে 'আনতা তাহ্‌কুম' অর্থ মীমাংসা করে দিবে। অর্থাৎ যারা সত্যাধিষ্ঠিত, তাদেরকে করে দিবে বিজয়ী এবং প্রতিমাপূজারীদেরকে করে দিবে অসহায়।

আবু সালমা বলেছেন, আমি একবার জননী আয়েশার নিকটে জানতে চাইলাম, হে উম্মত জননী! রসুলুল্লাহ্ স. তাঁর রাতের উপাসনা শুরু করতেন কোন্ বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে। তিনি বললেন, তিনি স. পাঠ করতেন 'হে আল্লাহ্! হে জিবরাইল, মিকাইল ও ইস্রাফিলের প্রভুপালক! হে আকাশ-পৃথিবীর সৃজয়িতা! হে দৃশ্য-অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! মহাবিচারের দিবসে তুমি তোমার বান্দাদের ওই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়ো যেগুলো নিয়ে তারা বিভেদ সৃষ্টি করতো। আর আমাকে বিতর্কিত

বিষয়াবলীতে পরিচালিত করো তোমার আদেশ ও সন্তোষ সহকারে। তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকেই তো প্রদর্শন করো সরল সহজ পথ।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'যারা জুলুম করেছে যদি তাদের থাকে দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং এর সমপরিমাণ সম্পদও, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তিপণ স্বরূপ সেই সকলই তারা দিয়ে দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে যদি কোনো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর কাছে এই পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের দ্বিগুণ সম্পদও থাকে, তবে সে তার সমুদয় সম্পদ মুক্তিপণরূপে দিয়ে সেদিনের ভয়াবহ শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে চাইবে। কিন্তু তবুও সে রেহাই পাবে না। সম্মুখীন হবে এমন মহাশাস্তির, যা ছিলো তার কল্পনার অতীত।

মুকাতিল বলেছেন, পৃথিবীতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ধারণাও করতে পারে না যে, কতো ভয়ংকর শাস্তিভোগ করতে হবে তাদেরকে পরকালে। অথবা এখানকার 'যা তারা কল্পনাও করেনি' কথাটির অর্থ হতে পারে এখানে এরকম— তারা মনে করে তাদের পূজিত প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে সুপারিশ করবেই। কেউ কেউ মনে করে, মহাপ্রলয়-পুনরুত্থান-বিচার এগুলো কল্পনা মাত্র। আরো মনে করে, আখেরাত বলে কিছু যদি থেকেও থাকে, তবে ওই জগতে আমরা বিশ্বাসীদের চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকবো। বলা বাহুল্য, তাদের এধরনের অপবিশ্বাস ধুলিসাৎ হয়ে যাবে সেদিন এবং যে মহাশাস্তির প্রসঙ্গ তারা ধারণাতেও আনতে পারতো না, অতর্কিতে তাই তখন আপতিত হবে তাদের উপর।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'তাদের কৃতকর্মের মন্দফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে'। একথার অর্থ— সেদিন তাদের সামনে যখন তাদের আমলনামা হাজির করা হবে তখন তারা স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারবে তাদের মন্দ কর্মের বিস্তারিত বিবরণ। দেখবে, আমলনামা পরিপূর্ণ রয়েছে অংশীবাদিতা,

বিশ্বাসীপীড়ন ইত্যাকার নানাবিধ পাপে। আর আল্লাহ্র বাণী, আল্লাহ্র রসুল ও আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে যারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো, সে ঠাট্ট-বিদ্রূপের শাস্তিও তখন ঘিরে ফেলবে তাদেরকে। এখানে 'মা কানু' কথাটির 'মা' যদি মাউসুলা (যোজক) ধরা হয় তবে শেষ বাক্যটির অর্থ হবে এবং সেই শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে যা সম্পর্কে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো। আর 'মা' যদি ধরা হয় মাসদারী (ক্রিয়ামূল), তাহলে অর্থ হবে— পরিহাস করার শাস্তি তখন ঘিরে ফেলবে তাদেরকে।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২

❑ মানুষকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করিলে সে আমাকে আহ্বান করে; অতঃপর যখন আমি আমার কোন নিয়ামত দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করি তখন সে বলে, 'আমাকে তো ইহা দেওয়া হইয়াছে আমার জ্ঞানের কারণে।' বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই বুঝে না।

❑ ইহাদের পূর্ববর্তীগণও ইহাই বলিত, কিন্তু উহাদের কৃতকর্ম উহাদের কোন কাজে আসে নাই।

❑ উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদের উপর আপতিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যাহারা যুলুম করে উহাদের উপরও উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল আপতিত হইবে এবং উহারা ব্যর্থও করিতে পারিবে না।

❑ ইহারা কি জানে না, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা রিয্ক প্রশস্ত করেন অথবা যাহার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মানুষ বিপদে পড়লে আমার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়। এরপর আমি যখন তার বিপদ দূর করে দেই এবং অনুগ্রহ করে কিছু দেই, তখন সে বলে, আমি তো এসব পেয়েছি আমার জ্ঞান ও যোগ্যতা বলে। কিন্তু এভাবে যে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন, তা না বুঝতে পেরে তাদের অধিকাংশই হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ।

এখানে 'আল্ইন্সান' (মানুষ) এর 'লাম' অক্ষরটি লামে আহাদী বা নির্দিষ্টবাচক লাম। তাই এখানে 'আল ইন্সান' অর্থ হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ইনসান। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এখানকার 'আলিফ লাম' জাতিবাচক (জিনসী)। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে এখানে ঘটেছে এই জাতিবাচকতার ব্যবহার। অর্থাৎ এখানে অধিকাংশকে ধরা হয়েছে সামগ্রিক অর্থে।

'দুর্রুন' অর্থ বিপদ-আপদ। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত ৪৫ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কাজের বৈপরীত্য বোঝানোই এখানে উদ্দেশ্য। তারা যে আল্লাহ্র কথা শুনলে বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়, সেই আল্লাহ্র কাছেই আবার সাহায্যপ্রার্থী হয় বিপদে পড়লে। আবার বিপদ দূর হলে অথবা কোনো নেয়ামত পেলে বলে, আমি এটা পেয়েছি আমার জ্ঞান ও যোগ্যতা বলে।

এখানে 'খাওওয়াল্নাহু' অর্থ আমি কোনো নেয়ামত দ্বারা তাকে অনুগৃহীত করি। 'তাখভীল' অর্থ অনুগ্রহ করে কাউকে কিছু দেওয়া। 'আ'লা ই'লমিন' অর্থ আমার জ্ঞানের কারণে। অর্থাৎ এটা অর্জন করার বিদ্যা আমার জানা ছিলো। অথবা এটা পাওয়ার অধিকার আমার ছিলো। কিংবা আমি জানতাম যে, আমাকে এটা দেওয়া ছিলো আল্লাহ্র কর্তব্য। 'বাল্ হিয়া ফিত্নাতুন' অর্থ বস্তুত এটা এক পরীক্ষা। অর্থাৎ এই নেয়ামত ছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা যাচাইয়ের একটি পরীক্ষা। অথবা এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত এমন অবকাশ, যা হয়ে যেতে পারে তাদের শাস্তির কারণ। কেউ কেউ বলেছেন, এখানকার 'হিয়া' সর্বনামটি সংশ্লিষ্ট 'আমাকে তো এটা দেওয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের কারণে' কথাটির সঙ্গে। অর্থাৎ এই উক্তি এমন এক পরীক্ষা, যা অবশেষে হবে তার শাস্তির কারণ।

'ওয়া লাকিন্না আক্ছারাহুম লা ইয়া'লামূন' অর্থ কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না। বায়যাবী লিখেছেন, বাক্যটি একথাই প্রমাণ করে যে, এখানে 'আল্ইন্সান' অর্থ মানবজাতি। কেননা এখানকার 'লাকিন্না' হচ্ছে হরফে ইসতিদরাক' (গরিষ্ঠ সংখ্যক) যা প্রমাণ করেছে, মানুষের যে অজ্ঞতার ঘোষণা আল্লাহ্ দিয়েছেন, তা সকল মানুষের জন্য নয়, অধিকাংশ মানুষের জন্য।

আমি বলি, এখানে 'আল্ইন্সান' অর্থ যদি সকল মানুষ না-ও হয়, যদি এর অর্থ হয় কেবল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, তবুও 'অধিকাংশ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী' অর্থ এখানে 'সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী'ই হবে। আবার এরকমও বলা যেতে পারে, কোনো কোনো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জেনে বুঝেও কেবল জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ

ইমান আনতো না। আবার কেউ কেউ মনে করতো তাদের মতাদর্শই সত্য। এই শেষোক্তের সংখ্যাই অধিক। আর তাদেরকে লক্ষ্য করেই এখানে বলা হয়েছে— কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এদের পূর্ববর্তীগণও এরকমই বলতো, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসেনি (৫০)। তাদের মধ্যে যারা জুলুম করে তাদের উপরও তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা ব্যর্থও করতে পারবে না' (৫১)।

মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'আল্লাজীনা মিন ক্বব্লিহিম' (এদের পূর্ববর্তীগণ) বলে বুঝানো হয়েছে কারুন ও তার অনুচরদেরকে। কারুনই বলেছিলো, এই ধনসম্পদ আমি পেয়েছি স্ব-জ্ঞান ও স্ব-যোগ্যতাবলে। আর তার অনুচরেরা ছিলো তার একথার ঘোর সমর্থক।

'ফামা আগ্না আন্হুম মা কানূ ইয়াক্সিবূন' অর্থ কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসেনি। অর্থাৎ তার কোষাগারসমূহের চাবি বহন করতো যে শক্তিশালী দলটি, তারাও তার ভূপ্রোথিত সম্পদ উদ্ধারে কোনো কাজে আসেনি।

'তাদের কৃতকর্মের মন্দফল এদের উপরে আপতিত হয়েছে' কথাটির অর্থ মক্কার মুশরিকেরাও অহংকারী অকৃতজ্ঞ কারুনের দলের মতো। তাদের মন্দ ঐতিহ্য এরাও বহন করে চলেছে। ফলে এদের উপরেও আপতিত হয়েছে শাস্তি। যেমন— সাত বৎসরের প্রলম্বিত দুর্ভিক্ষ, বদরযুদ্ধ, ওই যুদ্ধে তাদের নেতৃস্থানীয়দের অনেকেই নিহত হয়েছিলো। অনেকে হয়েছিলো বন্দী। অন্যরা পলায়ন করেছিলো পরাজয়ের গ্লানি ঘাড়ে নিয়ে।

'ওয়ামা হুম বিমু'জ্বিযীন' অর্থ এবং তারা ব্যর্থও করতে পারবে না। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি ওই হতভাগ্যদেরকে একথা স্পষ্টবচনে জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ্ অজেয়, তাঁকে কখনো পরাস্ত করা যায় না।

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'এরা কি জানে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন অথবা যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— আল্লাহ্তায়ালা পরীক্ষা করবার জন্য কারো কারো উপজীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং কারো কারো উপজীবিকাকে করেন সংকীর্ণ। অহংকারী ও অকৃতজ্ঞ বিত্তপতিরা তখন বলতে থাকে, এই বিত্তবৈভব আমরা অর্জন করেছি আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও চেষ্টায়। কিন্তু অজ্ঞরা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর। রুজি-রোজগারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান তিনিই। তাই তো দেখা যায়, এমন সব লোক কপর্দকহীন, যারা উপার্জনের বহু পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। আবার এমন লোক বিত্তশালী, যারা উপার্জনের পন্থা সম্পর্কে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। নিজস্ব যোগ্যতা বলে যাদের কোনো কিছুই নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য'। একথার অর্থ— ওই সকল লোকের জন্য এখানে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যারা একথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ই রিজিকের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান।

তাফসীরে মাযহারী/২৭১

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, কিছু সংখ্যক মূর্তিপূজক ছিলো, যারা বহু মানুষকে হত্যা করেছিলো এবং লিপ্ত ছিলো ব্যভিচারসহ অন্যান্য অনেক অপকর্মে। তারা একবার রসুল স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললো, আপনি যা বলেন, তা সবই তো ভালো। কিন্তু একথা আপনি বলতে পারেন কি যে, তাতে করে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে কীভাবে? তাদের এমতো কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো সুরা ফোরকানের এই আয়াতগুচ্ছ— 'এবং তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো উপাস্যকে অংশীদার করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এসব করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বাড়ানো হবে এবং সেখানে তারা স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়, তারা নয় যারা তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ ক্ষয় করে দিবেন পুণ্য দিয়ে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু'। এর সঙ্গে আরো অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (৫৩)।

বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, সুরা যুমারের ৫৩ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মূর্তিপূজকদের সম্পর্কে। বাগবীও আতা সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই বর্ণনা করেছেন।

শিথিল সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর প্রিয় পিতৃব্য শহীদশ্রেষ্ঠ হজরত হামযার হন্তারক ওয়াহ্শীকে প্রতিনিধির মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। ওই প্রতিনিধির মাধ্যমে ওয়াহ্শী জানালেন, কীভাবে আমি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবো। আপনি প্রচার করেন 'যে খুন করবে, আল্লাহ্র অংশীদার নির্ধারণ করবে, ব্যভিচার করবে, কিয়ামতের দিনে তার শাস্তি হবে দ্বিগুণ'। আর আমি তো ওই সকল দোষে দোষী। তখন অবতীর্ণ হলো সুরা ফুরকানের আয়াত 'তারা নয়, যারা তওবা করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে'। ওয়াহ্শী এই আয়াত শুনে বলে পাঠালেন, বার্তাটি তো খুবই কঠিন। সম্ভবতঃ আমি তা পালন করতে পারবো না। এ ছাড়া আর কি কোনো উপায় আছে? তখন অবতীর্ণ হলো 'নিশ্চয় আল্লাহ্ কেবল তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে'। ওয়াহ্শী নতুন অবতীর্ণ আয়াত শুনে বলে পাঠালেন, আমি এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি যে, তওবা করলেও অংশীবাদিতার পাপ থেকে আমাকে মুক্ত করা হবে কিনা। কেননা বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার ৫৩ সংখ্যক আয়াত। বাগবীর বর্ণনায় অতিরিক্ত সংযোজিত কথাগুলো হচ্ছে— তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এ আয়াতের বিধান কি কেবল ওয়াহ্শীর জন্য প্রযোজ্য, না আমাদের জন্যও? তিনি স. বললেন, সকল মুসলমানদের জন্য।

তাফসীরে মাযহারী/২৭২

হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমরা বলতাম, মুসলমান হওয়ার পর কেউ দুঃখ-দুর্দশায় পড়ে ধর্মত্যাগ করলে তাকে আর ক্ষমা করা হয় না। কিন্তু রসুল স. যখন মদীনায় এলেন, তখন ওই ধরনের লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলো 'বলো, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছো— আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না....'। বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আয়াশ ইবনে রবীয়া, ওলীদ ইবনে ওলীদ এবং মুসলমানদের এমন এক দল সম্পর্কে, যারা মুসলমান হয়েছিলেন ইসলামের সূচনালগ্নে। পরে পৌত্তলিকদের অকথ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা নিরুপায় অবস্থায় ধর্মত্যাগ করেন। আমরা বলতাম, তাদের ফরজ-নফল কোনো কিছুই আল্লাহ্ কবুল করবেন না। তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় এই সুরার ৫৩ সংখ্যক আয়াত। হজরত ওমর তখন এই আয়াত লিখে মক্কায় আয়াশ ইবনে রবীয়া ও তাঁর মতো যারা তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা তখন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরত করে চলে আসেন মদীনায়।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৫৩

❑ বল, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছ— আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল। আমার কথা আপনি মানুষকে জানিয়ে দিন এভাবে— হে আমার বান্দাগণ! সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অংশীবাদিতাবিজড়িত হয়ে তোমরা এতোদিন ধরে যারা স্বীয় সত্তার উপরে অনাচার-স্বেচ্ছাচার করেছো, তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। ফিরে এসো। আল্লাহ্ তোমাদের সমুদয় পাপ মার্জনা করবেন। তিনি তো মহা ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ার্দ্র।

এখানে 'আস্‌রাফূ' অর্থ অবিচার, অনাচার, স্বেচ্ছাচার, বাড়াবাড়ি। বাগবী লিখেছেন এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, 'আস্‌রাফূ' অর্থ বৃহৎ পাপ (কবীরা গোনাহ)। 'লা তাক্বনাতু' অর্থ নিরাশ হয়ো না। অর্থাৎ যদি তুমি ইমান এনে থাকো এবং সর্বান্তঃকরণে তওবা করে থাকো, তবে আল্লাহ্‌র মার্জনাপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিরাশ হয়ো না। আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, ক্ষমাপ্রাপ্তির মূল শর্ত হচ্ছে ইমান। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন 'ইন্নাল্লহা লা ইয়াগফিরু আঁই ইউশরিকা বিহী' (নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরিক করার গোনাহ্

ক্ষমা করেন না)। এই আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যে সকল বর্ণনা এসেছে, তার সঙ্গেও আলোচ্য আয়াত সাদৃশ্যপূর্ণ। 'ইয়াগফিরুজ্ জুনূবা জ্বামীয়া' অর্থ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ তোমরা যদি অংশীবাদিতাকে চিরতরে পরিহার করে এক আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করো তবে আল্লাহ্ তোমাদের বিগত জীবনের বৃহৎ-ক্ষুদ্র সকল পাপ মার্জনা করে দিবেন। হজরত আমর ইবনে আস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইসলাম পেছনের পাপরাশিকে মুছে ফেলে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একটি বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। ঘটনাটি হচ্ছে— কিছু সংখ্যক প্রতিমাপূজারী বড় বড় অপকর্মে ডুবে ছিলো। এরপর তারা তওবা করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু এই আয়াতের শব্দগুলো সাধারণ। অর্থাৎ এর দ্বারা বুঝা যায়, কোনো বান্দা যদি ইমানদার হয় এবং ইসলাম গ্রহণের পরেও যদি বড় ধরনের পাপ করে থাকে, তবুও যেনো সে আশা করে যে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ক্ষমার বিষয়ে সে যেনো নিরাশ না হয়, এমনকি তওবা না করলেও। কেননা এক আয়াতে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন, শিরিক ব্যতীত অন্য যে কোনো পাপ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আবার এই আয়াতের শেষাংশে স্পষ্ট করে একথা বলাও হয়েছে যে 'ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহীম' (নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)।

এই আয়াতে অ-মূর্তিপূজক, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসীগণের সাধারণ ক্ষমা (আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ানুসারে) যে সকল কারণ ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়, সেগুলো হচ্ছে—

১. 'আলগফূর' হচ্ছে মূল ধাতু থেকে নির্গত আধিক্যপ্রকাশক শব্দরূপ। অর্থাৎ তিনি এমন ক্ষমাশীল, যার কোনো তুলনা নেই।

২. 'গফূর' এর পূর্বে 'আল'(আলিফ লাম) যুক্ত হওয়ায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, ক্ষমা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন কেবলই আল্লাহ্।

৩. 'আল গফূর' এর পরে 'আর রহীম' সংযোজন করে আবার 'রহমত' প্রদানের অঙ্গীকারও করা হয়েছে।

৪. 'ই'বাদী' (আমার বান্দাগণ) শব্দটি ইমানদারদের জন্য অসহায়তাপ্রকাশক এবং এখানে 'আমার' বলে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণকে তাঁর নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন, ফলে ইমানদারদের সাধারণ ক্ষমার বিষয়টি হয়েছে অধিকতর সুনিশ্চিত।

৫. যেহেতু বান্দা নিজের উপরে অবিচার করেছে, তাই সে বান্দা হিসেবে ক্ষমার পাত্র।

৬. মার্জনার কথা তো বলা হয়েছেই, তদুপরি নিষেধ করা হয়েছে রহমত থেকে নিরাশ হতে।

৭. সাধারণ ক্ষমার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন' কথাটিকে।

৮. সর্বনামের স্থলে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে 'আল্লাহ্' যাতে করে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের আনুগত্য ও অবাধ্যতা থেকে চির অমুখাপেক্ষী এবং তিনি শর্তহীন অনুগ্রহকারী ও পরম দয়ালু।

৯. 'পাপ' এর পূর্বে বসানো হয়েছে 'সমুদয়' শব্দটি। এতে করে বুঝা যায় সকল পাপই তিনি ক্ষমা করে দিবেন, কোনো কোনো পাপ নয়। এটাও সাধারণ ক্ষমার একটি অকাট্য প্রমাণ।

নাফে সূত্রে মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, প্রথমদিকে আমরা মনে করতাম, আমাদের সকল পুণ্যকর্ম নিশ্চয় কবুল করা হবে। এর পর যখন অবতীর্ণ হলো 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, তাঁর রসুলের আনুগত্য করো এবং নিজের আমলকে নষ্ট করে দিও না' তখন কাউকে বড় কোনো পাপ করতে দেখলে বলতাম, এ তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারপর অবতীর্ণ হলো এই আয়াত। তখন আমরা ইতোপূর্বের উভয় অভিমত থেকে সরে যাই। এরপর থেকে আমরা কাউকে কোনো পাপ করতে দেখলে আতংকিত হতাম এবং পাপ থেকে মুক্ত থাকতে দেখলে এমতো আশা করতাম যে, তার পুণ্যকর্ম গৃহীত হবে।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে মাসউদ একদিন মসজিদে গিয়ে দেখলেন, জনৈক বক্তা বক্তৃতা করছে দোজখ ও দোজখের জিঞ্জির সম্পর্কে। তিনি ওই বক্তার পশ্চাতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে বক্তৃতা প্রদানকারী! মানুষকে নিরাশ করছো কেনো? তারপর তিনি পাঠ করলেন 'কুল ইয়া ই'বাদী..... ইন্নাহু হুয়াল গফূরুর রহীম'।

হজরত আসমা বিনতে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে 'কুল ইয়া ই'বাদী' এই আয়াত পাঠ করতে শুনেছি। কিন্তু তিনি 'জ্বামীয়া' এর পরে উচ্চারণ করেছেন 'লা'
'ইয়ুবালী' (কারো পাপের পরওয়া করবেন না)। কাজেই বুঝা যায় ওই কথাটিও এই আয়াতে ছিলো। আহমদ, তিরমিজি। তিরমিজি এই হাদিসকে সনাক্ত করছেন 'উত্তম' ও 'দুস্প্রাপ্য' বলে। কিন্তু 'শারহে সুন্নাহ' গ্রন্থে 'পাঠ করেছেন' স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে 'বর্ণনা করেছেন'। সেকারণেই মনে হয় বাক্যটি 'জ্বামীয়া' শব্দেই শেষ হয়েছে। তার সঙ্গে 'তিনি কারো পাপের পরওয়া করবেন না' কথাটি আয়াতের অংশ নয়।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বনী ইসরাইলের এক লোক নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছিলো। তারপর তার অন্তরে ক্ষমাপ্রার্থনার ইচ্ছা জাগলো। তাই সে একজন সংসারত্যাগী দরবেশের কাছে গিয়ে ক্ষমাপ্রাপ্তির বিধান জানতে চাইলো। দরবেশ সব শুনে বললো, তোমার জন্য কোনো ক্ষমা নেই। একথা শুনে সে ওই দরবেশকেও হত্যা করলো। এরপর সে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ক্ষমার বিধান আমি কার কাছে পাবো? একজন বললো, তুমি অমুক বসতিতে যাও। সেখানে একজন বিজ্ঞ আলেম বাস

করেন। একথা শুনে সে ওই বসতির দিকে যাত্রা করলো। পথিমধ্যেই সে মৃত্যু বরণ করলো। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সে ওই বসতির দিকে বুক উঁচু করে তুললো। পরক্ষণেই ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। সেখানে একই সঙ্গে হাজির হলো রহমতের ও আযাবের ফেরেশতারা। তাদের মধ্যে শুরু হলো বচসা। আল্লাহ্ বসতির দিকের জমিনকে আদেশ দিলেন, তুমি তোমাকে নিকটবর্তী করো এবং বিপরীত দিকের জমিনকে বললেন, তুমি দূরবর্তী হও। ফেরেশতারা দু'দিকের দূরত্ব মাপলো। দেখলো, বসতির দিকের দূরত্ব বিপরীত দিকের দূরত্বের চেয়ে এক আঙ্গুল কম। তখন ওই ব্যক্তি ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো। বোখারী, মুসলিম।

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজও এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষ্য এরকম— ওই হত্যাকারীকে এক সন্ন্যাসীর ঠিকানা বলা হলো। সে খুশী হয়ে ওই সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বললো, আমি নিরানব্বই জনকে খুন করেছি। এখন তওবা করতে চাই। আমার তওবা কি কবুল হবে? সন্ন্যাসী বললো, না। একথা শুনে সে সন্ন্যাসীকেও হত্যা করলো। এভাবে তার দ্বারা নিহত হলো পুরো একশত জন। তারপর সে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, বর্তমান পৃথিবীতে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? একজন তাকে ঠিকানা বলে দিলো এক বিজ্ঞ ব্যক্তির। সে তৎক্ষণাৎ ওই বিজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হলো। বিজ্ঞ ব্যক্তিটি সব শুনে বললেন, তুমি যদি সর্বান্তঃকরণে তওবা করতে পারো তবে তোমার ক্ষমাপ্রাপ্তি ঠেকাতে পারে কে? তুমি অমুক স্থানে যাও। দেখবে সেখানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন। তুমিও তাদের সঙ্গে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাও। নিজের বসতিতে আর ফিরে যেয়ো না। কারণ তোমার বসতিটি পাপে পরিপূর্ণ। একথা শোনার পর সে যাত্রা করলো নির্দেশিত বসতিটির দিকে। অর্ধপথ অতিক্রম করতে না করতে পেলো মৃত্যুর সাক্ষাত। তার মৃত্যুর পর সেখানে উপস্থিত হলো অনুকম্পা ও শাস্তির ফেরেশতাদের দু'টো দল। তাদের মধ্যে ওই ব্যক্তির দাবি নিয়ে দেখা দিলো মতোবিরোধ। তখন আর একজন ফেরেশতা মীমাংসাকারীরূপে উপস্থিত হলো সেখানে। বললো, ঠিক আছে তার পেছনের ও সম্মুখের পথের দূরত্ব মাপো। সে তওবার দিকে ধাবিত হচ্ছিলো। সুতরাং যদি দেখো তার সম্মুখের পথের দূরত্ব কম, তবে বুঝবে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত। আর এর বিপরীত হলে বুঝবে, ক্ষমা তার ভাগ্যে জোটেনি। তাই করা হলো। দেখা গেলো, তার সামনের দিকের অর্থাৎ ইবাদতকারীদের যে বসতির দিকে সে যাচ্ছিলো, সেদিকের দূরত্ব তার আপন বসতির দিকের দূরত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিত কম। কাজেই অনুকম্পার ফেরেশতারা ওই ব্যক্তির রূহকে নিয়ে নিলো।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, এমন এক লোক ছিলো, যে জীবনে কোনো পুণ্যকর্ম করেনি। যখন সে মৃত্যুর সমীপবর্তী হলো তখন তার বাড়ির লোকজনকে ডেকে বললো, তোমরা আমার শেষ ইচ্ছাটি পূরণ

কোরো। মৃত্যুর পর আমার মরদেহকে পুড়িয়ে ফেলো। তারপর তার ছাই ভস্মগুলোর কিছু অংশ নিক্ষেপ কোরো সমুদ্রে এবং বাকী অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে

উড়িয়ে দিয়ো ডাঙায়। কেননা ওই আল্লাহ্র শপথ! তিনি আমাকে পেলে এমন শাস্তি দিবেন, যা আর কাউকে দেননি। কিছুকাল পর ওই ব্যক্তির মৃত্যু হলো। বাড়ির লোকেরা তার অন্তিম ইচ্ছাও পূরণ করলো। তারপর আল্লাহ্ সমুদ্রকে ও মাটিকে হুকুম করলেন, তার ভস্মগুলো একত্র করো। সমুদ্র ও স্থলভাগ হুকুম পালন করলো যথারীতি। তখন ওই লোককে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, কেনো তুমি তোমার বাড়ির লোকজনকে এমন করতে বলেছিলে? সে বললো, হে আমার প্রভুপালনকর্তা। আমি তাদের এরকম করতে বলেছিলাম তোমার ভয়ে ভীত হয়ে। তুমি তো সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্ তখন ওই ব্যক্তিকে মাফ করে দিলেন।

বাগবী লিখেছেন, জমজম ইবনে জওশ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার মদীনার মসজিদে প্রবেশ করে এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পেলাম। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন। সাবধান! কখনো এমন কথা বোলো না যে, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করবেন না এবং তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আমি বললাম, আপনার উপর বর্ষিত হোক আল্লাহ্র অজস্র করুণাধারা। দয়া করে আপনার পরিচয় বলুন। তিনি বললেন, আমি আবু হোরায়রা। আমি বললাম, রেগে গেলে তো অনেকেই বলে 'আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা না করুন'। যেমন রাগান্বিত গৃহস্বামী তার পরিবার পরিজনকে, এমন কি তার স্ত্রীকে ও পরিচারক-পরিচারিকাকে। তিনি বললেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, বনী ইসরাইলদের মধ্যে দু'জন লোক ছিলো পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। একজন পুণ্যবান এবং অপরজন পাপী। পুণ্যবান লোকটি তার পাপী বন্ধুকে প্রায়শই বলতো, এবার পাপ কর্ম থেকে বিরত হও। পাপী বন্ধু বলতো, আমি যা করি সে সম্পর্কে আমার মহান প্রভুপালক ভালো করেই জানেন। সুতরাং তুমি আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। একদিন পুণ্যবান বন্ধু তাকে একটি বড় পাপ চোখের সামনে করতে দেখে বললো, এবার ক্ষান্ত হও। জবাবে সে বললো, আমাকে আমার মতোই থাকতে দাও। তোমাকে কি আমার কাজের পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছে? পুণ্যবান বললো, আল্লাহ্র শপথ। তিনি কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করবেন না। তারপর একসময় দু'জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আল্লাহ্ দু'জনকে একত্র করে পাপীকে বললেন, তুমি জান্নাতবাসী। আর পুণ্যবানকে বললেন, তুমি কি আমার বান্দাদের রহমতপ্রাপ্তিকে প্রতিহত করতে পারো? সে বললো, না। আল্লাহ্ বললেন, তুমি জাহান্নামী। হজরত আবু হোরায়রা তাঁর বিবরণ এভাবে শেষ করার পর বললেন, সেই আল্লাহ্র শপথ! যার অধিকারে আমার জীবন, ওই পুণ্যবানের একটি মাত্র অপউক্তিই তার ইহ-পরকালের ধ্বংসকে অনিবার্য করেছিলো, হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইমাম আহমদ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত সাওবান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তু অপেক্ষা আমার কাছে প্রিয় এই আয়াত 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো— আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

বায়হাকীর বর্ণনায় এই হাদিসের সঙ্গে আরো যা যুক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে— এক লোক নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আর যারা শিরিক করেছে? তিনি স. কিছুক্ষণের জন্য মস্তক অবনত করে রইলেন। তারপর তিনবার বললেন, কিন্তু যারা শিরিক করেছে এবং পৃথিবী পরিত্যাগের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শিরিকে অটল থেকেছে, তারা ক্ষমা পাবে না।

হজরত জুনদুব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একবার এক লোক বললো, আল্লাহ্র কসম! অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ মাফ করবেন না। আল্লাহ্ তখন বললেন, ওই লোক কে, যে আমার শপথ করে বলে যে, অমুককে আমি ক্ষমা করবো না। আমি তো তাকে ক্ষমা করেই দিয়েছি। আর হে অপউক্তি উচ্চারণকারী! তোমার সমস্ত কর্ম আমি করে দিয়েছি নিষ্ফল।

হজরত ইবনে আব্বাস 'ইল্লাল্ লামাম' (ছোট ছোট পাপ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ 'লামাম' ক্ষমা করে দিবেন। সকল পাপই (অনুতপ্ত হলে) ক্ষমা করে দিবেন। হে আল্লাহ্! তোমার এমন কোন বান্দা আছে, যে পাপ করেনি? হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি এবং বলেছেন বর্ণনাটি উত্তম, বিশুদ্ধ ও দুষ্প্রাপ্য।

হজরত আবু জর কর্তৃক এক দীর্ঘ হাদিসে কুদসীতে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেন, আমি যা চাই, তাই করি। আমার অনুগ্রহ হচ্ছে আমার বাণী এবং শাস্তিও আমার বাণী। কোনো কিছুর অস্তিত্বদান করতে চাইলে আমি তাকে (তার অনস্তিত্বকে) কেবল বলি 'হও'। অমনি তা হয়ে যায়। আহমদ, ইবনে মাজা, তিরমিজি।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবরবাসীরা ডুবন্ত মানুষের মতো। উদ্ধারের আশায় তারা অপেক্ষা করতে থাকে মা-বাপ-ভাই-বন্ধুদের ক্ষমাপ্রার্থনার দোয়ার। এই দোয়া তাদের নিকট পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও শ্রেয়। আর পৃথিবীবাসীদের দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পাহাড় পরিমাণ পুণ্য দান করেন। জীবিতদের পক্ষ থেকে মৃতদের প্রতি উপহার হচ্ছে ক্ষমাপ্রার্থনার (মাগফিরাতের) দোয়া। বায়হাকী।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের গোনাহ্ অবশ্যই মাফ করে দেন, যদি না পর্দা পড়ে যায়। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! পর্দা কী? তিনি স. বললেন আল্লাহ্র এককত্বকে অস্বীকার করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা। আহমদ, বায়হাকী।

হজরত আবু জর আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে এমন মনোভাব নিয়ে মিলিত হবে যে, কাউকে অথবা কোনোকিছুকেই সে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির করেনি, তাহলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র রহমতের এক শত ভাগের এক ভাগ বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে মানুষ, জ্বিন ও অন্যান্য প্রাণীকুলকে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি দেখা যায় সে কারণেই। সে

কারণেই হিংস্র প্রাণীও ভালোবাসে তার শাবককে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ রহমত তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। ওই রহমত তিনি তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করে দিবেন শেষ বিচারের দিন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, রসুল স. এর কাছে একদিন কিছুসংখ্যক বন্দী ও বন্দিনীকে হাজির করা হলো। একজন সন্তানবতী নারী চঞ্চলা হয়ে মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যের কোনো কোনো শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলো এবং পান করাতে লাগলো তার দুধ। রসুল স. তাকে দেখিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, বলতো দেখি, ওই নারী কি তার উদরের সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে (যখন অন্যের সন্তানের প্রতিও সে এতো মমতাময়ী)? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! সে তো জীবন থাকতে তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করবে না। রসুল স. বললেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়ে অধিক মমতাপরবশ। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, যে ব্যক্তি তার প্রভুপালনকর্তার সামনে হাজির হওয়ার ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! যদি সে ব্যভিচার কিংবা চুরি করে? তিনি স. তখন এই আয়াত পাঠ করলেন। আমি পুনরায় বললাম, যদি সে ব্যাভিচারী ও অপহারক হয়? তিনি স. পুনরায় এই আয়াত পাঠ করলেন। আমি তৃতীয়বারেও বললাম, যদি সে ব্যভিচার ও অপহরণ করে? তিনি স. বললেন, তবুও। আবু দারদার নাসিকা ধূলিধূসরিত হলেও (সিদ্ধান্তটি তার পছন্দ না হলেও)।

হজরত আমের বলেছেন, আমরা একবার রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো চাদরাবৃত এক লোক। সে তার চাদরের এক প্রান্তে কিছু একটা জড়িয়ে ধরে রেখেছিলো। সে বললো, আমি যাচ্ছিলাম এক ঝোপের পাশ দিয়ে। পাখির ডাক শুনে আমি ঝোপের ভিতরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটি পাখির বাসা। সেখানে রয়েছে একটি পক্ষীশাবক। আমি সেটিকে ধরে চাদরে জড়িয়ে নিলাম। পক্ষীমাতা তখন ঘুরতে শুরু করলো আমার মাথার উপর। আমি চাদর উন্মোচন করে পক্ষীশাবকটিকে মাটিতে রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে পক্ষীমাতাটি ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের দু'জনকেই আমি চাদরাবৃত করে ফেললাম। এই যে, এখনো ওদু'টো রয়েছে আমার চাদরের প্রান্তে। রসুল স. বললেন, ও দু'টোকে মাটিতে রাখো। লোকটি তাই করলো। দেখা গেলো পক্ষীমাতাটি তার শাবককে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। তিনি স. বললেন, দেখেছো, পক্ষীমাতাটি তার ছানাটির প্রতি কতো মমতাময়ী (বাচ্চাকে ফেলে উড়ে যাচ্ছে না)। যার অধিকারে আমার প্রাণ, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলি, এই পক্ষীমাতা তার বাচ্চার প্রতি যতো দয়ালু, তার চেয়ে অনেক বেশী দয়ালু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি। এরপর তিনি স. লোকটিকে বললেন, যাও। যেখানে এদেরকে পেয়েছো, সেখানে গিয়ে রেখে এসো। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, এক যুদ্ধে আমরা রসুল স. এর সঙ্গী ছিলাম। এক স্থানে আমরা কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। রসুল স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বললো, আমরা মুসলমান। তাদের মধ্যে ছিলো এক রমণী। সে রান্নাবান্না করছিলো। তার পাশে বসেছিলো তার ছোট্টো শিশুটি। সে মাঝে মাঝেই খেলাচ্ছলে এগিয়ে যাচ্ছিলো উনুনের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে সরিয়ে নিচ্ছিলো তার মা। রসুল স. এর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সে তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে এগিয়ে এলো। রসুল স. এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনিই কি আল্লাহ্র রসুল? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। সে বললো, আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক আমার মাতা ও পিতা। আল্লাহ্ কি পরম দাতা ও দয়ালু নন? তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই। সে বললো, মা তার শিশুসন্তানের প্রতি যতোটা মেহেরবান, আল্লাহ্ কি তার বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশী মেহেরবান নন? তিনি স. বললেন, অবশ্যই। সে বললো, মা তো তার শিশুকে আগুনে ফেলে দেয় না। তার একথা শুনে রসুল স. মস্তক অবনত করলেন এবং কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুবর্ষণ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে শাস্তি দিবেন কেবল তাদেরকে, যারা অবাধ্য, উদ্ধত, অহংকারী ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমা অস্বীকারকারী। ইবনে মাজা।

হজরত আবু জর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্ বলবে এবং এই বিশ্বাস নিয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? তিনি স. বললেন, তবুও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদি তার দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে ব্যভিচার ও অপহরণ? তিনি স. বললেন, তথাপিও। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, যদি সে হয় ব্যভিচারী ও অপহারক? তিনি স. বললেন, তৎসত্ত্বেও। আবু জর তার নাক মাটিতে ঘষাঘষি করলেও। বোখারী, মুসলিম।

এ প্রসঙ্গের হাদিস রয়েছে আরো অনেক। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমানদারদের জান্নাতগমন সুনিশ্চিত। সুতরাং মুতাজিলাদের এই বক্তব্যটি ঠিক নয় যে, কবীরা গোনাহকারীরা তওবা না করলে তাদেরকে চিরকাল দোজখে থাকতে হবে। আবার এ বিষয়ে মুরজিয়া সম্প্রদায়ের ধারণাটিও অযথার্থ। তারা বলে, ইমানদারদের পাপ তাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। যেমন লাভজনক নয় কাফেরদের পুণ্যকর্ম। তারা আবার এতোক্ষণ ধরে বর্ণিত হাদিসগুলোকেই তাদের অভিমতের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু তাদের কথা মানলে কোরআনের বহুসংখ্যক আয়াত এবং অনেক হাদিসকে অস্বীকার করতে হয়।, যেগুলোতে বিভিন্ন পাপ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং সেগুলোর জন্য বিশেষ বিশেষ শাস্তিও নির্ধারণ করা হয়েছে। সে কারণে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ওই দুই পথভ্রষ্ট দলের মতবাদকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে— কাফের অবস্থায় কোনো পুণ্যকর্ম ফলদায়ক নয়। কেননা কর্মে তারা পুণ্যকর্মাভিলাষী হলেও বিশ্বাসগত দিক থেকে অবাধ্য। যে সকল পুণ্যকর্ম কেবল

আল্লাহ্র সন্তোষ সাধনার্থে সম্পাদিত হয়, সেগুলোই কেবল পুণ্যার্জক ও আল্লাহ্র সন্তোষার্জনের সহায়ক। অথচ কাফেরদের তো আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসই নেই। সুতরাং তাদের আনুগত্য বাহ্যিক ও অগ্রাহ্য, বিশুদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ আনুগত্যের শর্ত ইমান, যেমন বিশুদ্ধ নামাজের শর্ত ওজু। কিন্তু বিশ্বাসীদের পাপ এরকম নয়। কেননা মূল শর্ত ইমান তাদের আছে। এমতাবস্থায় সংঘটিত পাপের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন, অথবা করতে পারেন ক্ষমা। সে শাস্তিও আবার হবে সাময়িক, চিরকালীন নয়। কেননা তাদের ইমানই তাদের চিরকালীন শাস্তির অন্তরায়। আবার তাদের পাপ ক্ষমা হতে পারে তওবা করার কারণে, রসুল স. শাফায়াত করার কারণে, আল্লাহ্র কোনো ওলীর সুপারিশের কারণে, অথবা কেবল নিছক আল্লাহ্র দয়ায়। আল্লাহ্ ইমানদারদের প্রতিটি সৎকর্মের পুরস্কার দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। যেমন বলেছেন— 'অতঃপর কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে'। আর ইমান হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম। অর্থাৎ ইমানই হচ্ছে যাবতীয় সৎকর্মের সূচনা, কেন্দ্র অথবা মূল। আল্লাহ্র অঙ্গীকারবিরুদ্ধ কিছু হওয়া অসম্ভব। আর পুণ্যবানদের প্রকৃত আবাসস্থল হচ্ছে জান্নাত। সুতরাং ইমানদারেরা জান্নাতে প্রবেশ করবেই— শাস্তিভোগ ব্যতিরেকে, অথবা সাময়িক শাস্তিভোগের মাধ্যমে পাপক্ষয়ের পর। ইমানদার ও কাফেরের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি কখনো এক নয়। ইমানদারেরা পাপী হলেও পাপকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে। ভয়ও করে অত্যধিক। ঘটনাক্রমে তাদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হলে তাদের মনে হয় তাদের মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়েছে। আর কাফেরেরা পাপ করলে মনে হয়, যেনো তুচ্ছ কোনো মাছি বসেছে তাদের নাকের ডগায়। আর তারা তা উড়িয়ে দিতে পারে হাতের ইশারায়।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

❑ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে; তৎপর তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

❑ অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে উত্তম যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসিবার পূর্বে—

❑ যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, 'হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করিয়াছি তাহার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।'

❑ অথবা কেহ যেন না বলে, 'আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

❑ অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়, 'আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হইতাম!'

❑ প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে ও অহংকার করিয়াছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফিরদের একজন।

❑ যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাহাদের মুখ কালো দেখিবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

❑ আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহাদের সাফল্যসহ; তাহাদিগকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

❑ আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। আর যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— সুতরাং হে আমার বান্দাগণ! তোমরা অংশীবাদিতা ও অবিশ্বাস পরিত্যাগ করে প্রকৃত উপাস্য এক আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবদ্ধ করো এবং ইসলাম কবুল করার মাধ্যমে তাঁর আদেশ পালনে যত্নবান হও। তোমাদের প্রকৃত কর্তব্য এটাই। আর এ কর্তব্য তোমরা অবশ্যই বাস্তবায়ন করো তোমাদের প্রতি শাস্তি এসে পড়ার আগে। কর্তব্যে অবহেলা করতে করতে শাস্তি যদি এসেই পড়ে, তবে দেখবে তোমাদের আশেপাশে তোমাদের কোনো সুহৃদ-স্বজন অথবা কোনো সাহায্যকারী নেই।

এখানে 'আসলিমু' অর্থ আত্মসমর্পণ করো, ইসলাম গ্রহণ করো। আর এখানকার 'আ'জাব' (শাস্তি) অর্থ কবরের অথবা কিয়ামতের শাস্তি। অর্থাৎ কবরের অভ্যন্তরে অথবা কিয়ামতের দিনে শাস্তি বিজড়িত হওয়ার আগেই তোমরা কৃত পাপের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করো ও অনুগত হয়ে যাও। কেননা তখন তোমাদের সাহায্যে কেউই এগিয়ে আসবে না।

পরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'অনুসরণ করো তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপরে অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসবার পূর্বে'। একথার অর্থ— আর তোমাদের প্রভুপালনকর্তার পক্ষ থেকে যে উৎকৃষ্ট উপদেশাবলী তোমাদেরই পথপ্রদর্শনার্থে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা নিবিষ্টচিত্তে তার অনুসরণ করো। এমন যেনো না হয় যে, তোমরা সাবধান হওয়ার পূর্বেই অকস্মাৎ এসে পড়েছে শাস্তি।

'এখানে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে' অর্থ কোরআন মজীদ। অথবা ধর্মীয় বিধিনিষেধসমূহ। অর্থাৎ তোমরা যে কোনো সময় মৃত্যুবরণ করতে পারো, হতে পারো অতর্কিত শাস্তির সম্মুখীন, একথা মনে রেখে এই মুহূর্ত থেকে আনুগত্য করতে থাকো কোরআনের অনুশাসনের, অথবা ইসলামের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাবলীর।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'যাতে কাকেও বলতে না হয়, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম'। একথার অর্থ— মহাবিচারের দিবসে কাউকে যেনো এভাবে আক্ষেপ করতে না হয় যে, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি যথাকর্তব্য প্রতিপালনে আমি তো ছিলাম উদাসীন ও বিদ্রূপপ্রবণ।

এখানে 'আন তাকুলা' অর্থ এমন যেনো হয় যে কেউ বলুক। অর্থাৎ এমন কথা যেনো বলতে না হয়। 'নাফসুন' অর্থ কাউকে। শব্দটিতে তানভীন যুক্ত করা হয়েছে আধিক্য অথবা স্বল্পতা বোঝাতে। অর্থাৎ বিচার দিবসে কেউ কেউ এরকম বলবে।

'হাসরত' অর্থ আক্ষেপণ, বিলাপণ, বিলাপকারীদের বিলাপ বেড়ে যাওয়া। 'আ'লা মা ফাররাত্‌তু' (আমি যে শৈথিল্য করেছি) কথাটির 'মা' ধাতুমূল। 'ফী জামবিল্লাহ্‌' অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্যে, আল্লাহ্‌র বিষয়ে অথবা আল্লাহ্‌র প্রতি।

এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হাসান, মুজাহিদ ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের। কারো কারো মতে 'জামবিল্লাহ্‌' এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র একক সত্তা এবং এখানে কথাটির সম্বন্ধ পদ রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ কথাটির অর্থ হবে— আল্লাহ্‌র একক সত্তার আনুগত্যে অথবা আল্লাহ্‌র একক অস্তিত্বের নৈকট্য অর্জনে আমি কার্পণ্য করেছি, প্রদর্শন করেছি শৈথিল্য, ঔদাসীন্য।

'ওয়া ইন্‌কুন্‌তু লামিনাস্‌ সাখিরীন' অর্থ আমিতো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এখানকার 'ইন' শব্দটির 'নূন' অক্ষরটি সাকিনবিশিষ্ট। এমতাবস্থায় কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— নিশ্চয় পৃথিবীতে আমি ছিলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম, তাঁর অবতারিত মহাগ্রন্থ ও তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন বচনবাহকের প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ বর্ষণকারী।

এরপরের আয়াতে (৫৭) বলা হয়েছে— 'অথবা কেউ যেনো না বলে, আল্লাহ্‌ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমিতো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'। একথার অর্থ— অথবা শাস্তিগ্রস্ত হয়ে কেউ যেনো এরকম বলে আক্ষেপ না করতে থাকে যে, আল্লাহ্‌ আমাকে সৎপথ দেখালে আমিতো পৃথিবীতে হতে পারতাম পুণ্যবানদের মতো সতর্ক জীবন যাপনকারী। রক্ষা পেতে পারতাম এখনকার এই আযাব থেকে। এখানে 'আলমুত্তাক্বীন' অর্থ রক্ষাপ্রাপ্ত, অংশীবাদিতা ও অন্যান্য পাপ থেকে নিরাপদ।

এরপরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে 'অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেনো কাউকে বলতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটতো, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম'।

এখানে 'ফাআকূনা মিনাল মুহ্‌সিনীন' অর্থ তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসী হতাম।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিলো, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে, আর তুমিতো ছিলে কাফেরদের একজন'। এই আয়াতের দ্বারা ৫৭ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'আল্লাহ্‌ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাক্বীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম' কথাটিকে খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা ওই আয়াতে 'হেদায়েত' এর অর্থ যদি হয় পথপ্রদর্শন, তবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ অনুসারে বলতে হয়, পথপ্রদর্শন তো আল্লাহ্‌ করেছেনই। পথের নিদর্শনরূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর কিতাব ও রসুল। কিন্তু তোমরা পথের সেই নিদর্শনদ্বয়কে অহমিকা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছো। এভাবে হয়ে গিয়েছো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের একজন। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আবার পূর্বোক্ত বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে— আমাদের কাছে কোনো রসুল তো কিতাব নিয়ে আসেনি। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, মহাবিচারের দিবসে হজরত নুহকে ডেকে আল্লাহ্‌ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছো? তিনি বলবেন, হ্যাঁ।

তখন আল্লাহ্‌ তাঁর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কাছে কি আমার বার্তা পৌঁছানো হয়নি? তারা বলবে, না। আর 'হেদায়েত' অর্থ যদি হয় হেদায়েত রচনা করা, তাহলে 'আল্লাহ্‌ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— আমিতো ছিলাম দুর্বল ও অসহায়। আল্লাহ্‌ আমাকে হেদায়েত গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেননি। হৃদয়কে দান করেননি ইমান ও আনুগত্যকে আশ্রয় করবার যথোপযুক্ত সামর্থ্য। এমতো বক্তব্যকেও নাকচ করে দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। যেনো বলা হয়েছে— না, প্রকৃত ঘটনা তা নয়। আমিতো বিষয়টিকে করে দিয়েছিলাম তোমার অভিপ্রায়নির্ভর। তুমি চাইলে হেদায়েত গ্রহণ করবে, অথবা করবে না। কিন্তু হেদায়েত গ্রহণের ইচ্ছা তোমার আদৌ ছিলো না। তাইতো তুমি আমার কিতাব ও রসুলকে অবমাননা করেছিলে। দর্পিত প্রত্যাখ্যানের পথ ধরে হয়ে গিয়েছিলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের একজন।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস হচ্ছে বান্দার অভিপ্রায়ের উপরেও আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ের প্রভাব ও অধিকার ক্রিয়াশীল। তৎসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াত তাঁদের এমতো অভিমতের প্রতিকূল নয়।

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়'? একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা 'আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করছেন' 'ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা' ইত্যাদি বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, আপনি মহাবিচারের দিবসে তাদেরকে দেখতে পাবেন কৃষ্ণমুখবিশিষ্ট অবস্থায়। এবার আপনিই বলুন, যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও অহংকারী, তাদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়? শেষোক্ত প্রশ্নটি স্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— অবশ্যই উদ্ধত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আসল ঠিকানা জাহান্নাম।

এরপরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না'। এখানে 'মাফাযাহ্' অর্থ সাফল্য, সুখ। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন পরিত্রাণ। কেননা পরকালে পরিত্রাণপ্রাপ্তিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাফল্য। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য সৌভাগ্য ও সৎকর্ম। বলা বাহুল্য, উভয়টিই সাফল্য লাভের কারণ।

এরপরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সমস্তকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্তকিছুর কর্মবিধায়ক'। এখানে 'আল্লাহ্ সমস্তকিছুর স্রষ্টা' অর্থ এই বিশ্বের অনুকূল-প্রতিকূল সকলকিছুরই তিনি একক স্রষ্টা। যেমন ভালো-মন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস। সৃজন সম্পূর্ণতই তাঁর। আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ৪২ সংখ্যক আয়াতের 'আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের.........' এর সঙ্গে। মধ্যবর্তী বক্তব্যগুলি ভিন্ন প্রসঙ্গের।

'ওয়াকিল' অর্থ কর্মবিধায়ক, সংরক্ষক। অর্থাৎ সকলে ও সকলকিছুই তাঁর অভিপ্রায়ানুগামী ও বিধানানুগত।

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁরই নিকট। আর যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত'।

এখানে 'মাক্বালীদু' অর্থ কুঞ্জিকা, চাবির গুচ্ছ। শব্দটি 'মিক্বলাদ' অথবা 'মাক্বলীদ' এর বহুবচন। যেমন 'মিফ্‌তাহুন' এর বহুবচন 'মাফাতীহু' এবং 'মানাদীলু' বহুবচন 'মিনদীলুন্' এর। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'মাক্বালীদ' এর অর্থ জীবনোপকরণ ও অনুগ্রহ (রিজিক ও রহমত)। কালাবী বলেছেন, 'মাক্বালীদুস্ সামাওয়াতি' অর্থ বর্ষণজনিত সম্পদ এবং 'মাক্বালীদুল আরদ্ব' অর্থ খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার। হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, আমরা একবার রসুল স. এর কাছে 'মাক্বালীদ' এর অর্থ জানতে চাইলাম। তিনি বলেন, এর অর্থ— 'লা ইলাহা ইল্‌লা হুয়া ওয়াল্লাহু আকবর ওয়া সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী ওয়া আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লহা ওয়া লাহাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্‌লা বিল্লাহ্ হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ্ জহিরু ওয়ালবাতিন বিইয়াদিহিল খইর ইয়ুহ্ই ওয়া ইয়ুমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্‌লি শাইইন্ ক্বদীর।

হজরত ইবনে ওমর থেকে আবু ইয়ালা, ইবনে আবী হাতেম, উকাইলি, তিবরানী ও বায়হাকী যথাক্রমে তাঁদের মসনদ, তাফসীর, আদ্বদুয়াফা, আদ্ দুয়া ও আল আস্‌মা ওয়াস্ সিফাত্ গ্রন্থে হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনে জাওজী উল্লেখ করেছেন তাঁর মওজুয়াত গ্রন্থে।

জ্ঞাতব্য ঃ হজরত আবু হোরায়রা থেকেও হজরত ওসমান কর্তৃক বিবৃত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও। তবে তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে এই কথাগুলো ঃ যে ব্যক্তি এই দোয়া সকাল-সন্ধ্যায় দশবার করে পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে দান করবেন ছয়টি বিষয়— ১. ইবলিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গ থেকে তাকে রক্ষা করবেন ২. জান্নাতাভ্যন্তরে তাকে অঢেল পুরস্কার দানে ধন্য করবেন ৩. জান্নাতে স্ত্রী হিসেবে দান করবেন আয়তঅক্ষিণী কুমারী হুরীদের ৪. সে পরকালে থাকবে নবী ইব্রাহিমের সঙ্গে এবং ৬. মৃত্যুর সময় বারোজন ফেরেশতা এসে তাকে সুসংবাদ দিবে এবং পুনরুত্থান দিবসে তারা তাকে সসম্মানে কবর থেকে নিয়ে যাবে বিচারস্থলে এবং বলবে, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। তুমি যে শান্তির সঙ্গে থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরপর আল্লাহ্ তার হিসাব নিবেন সহজভাবে। তারপর হুকুম দিবেন জান্নাত গমনের। ফেরেশতারা তখন তাকে বিচারস্থল থেকে জান্নাতে এমন সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যাবে, যেমন সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় বরযাত্রীসহ বরকে।

আমি বলি, এখানে যে শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌র গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে চাবির গুচ্ছ (মাক্বালীদ)। অর্থাৎ যে সত্তা ওই গুণের সঙ্গে প্রশংসিত, তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল ধনভাণ্ডারের মালিক। ওই অপরিমেয় সম্পদরাজির

সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর এবং সেসকল কিছু ব্যয় করার বিষয়টি সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়নির্ভর। যে ব্যক্তি একথা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌র এই গুণের আলোচনা করে, তার জন্যই উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল সম্পদের দুয়ার।

'ওয়াললাজিনা কাফারু বি আয়াতিল্লাহি উলায়িকা হুমুল খসিরূন' অর্থ আর যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে 'আয়াতিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র এককত্ব ও মহিমা-মহত্বপ্রকাশক বাণীসম্ভার। অথবা মহামর্যাদাসম্পন্ন কোরআন। কিংবা তাঁর অক্ষয় প্রতাপ ও পরাক্রমের নিদর্শনরাজি।

'হুমুল খসিরূন' অর্থ তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে 'ক্ষতি'কে বিশেষভাবে কাফেরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কারণ এই যে, প্রকৃত অর্থেই ক্ষতিগ্রস্ত তারা। অন্যেরা তো আল্লাহ্র অনুকম্পা কিছু না কিছু পাবেই। পৃথিবীতে তাদের প্রাপ্তি কম হলেও ক্ষতি নেই। পরবর্তী পৃথিবীতে তারা এমন নেয়ামতরাজির অধিকারী হবে, যা কোনো কান শোনেনি, কোনো চোখ দেখেনি এবং যা কল্পনা করতে পারে না কোনো হৃদয়। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এই পৃথিবীর সম্পদের অংশ পায়, কিন্তু কৃতজ্ঞতার অংশ তারা পায় না। ফলে পরকালে করুণার অংশও তাদের ভাগ্যে জুটবে না। ফলে পৃথিবীর সম্পদ তখন তাদের কাছে মনে হবে বিশাল বোঝা। এরকমও হতে পারে যে, এই আয়াতের সংযোগ রয়েছে ৬১ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ'। মধ্যবর্তী বক্তব্য ভিন্ন প্রসঙ্গের। অর্থাৎ ওই আয়াত এবং এই আয়াতের মিলিতার্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রকাশ্য গোপন সকলকিছু সম্পর্কে সতত জ্ঞাত। তাঁর ওই অনাদি ও অনন্ত জ্ঞানের নিরীখেই তিনি প্রত্যেককে দিবেন তাদের কর্মকাণ্ডের যথোপযুক্ত প্রতিফল। ফলে মুত্তাক্বীরা হবে মহা সাফল্যাধিকারী এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হবে চিরক্ষতিগ্রস্ত। আর 'আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ' এই উক্তিটি একথাই প্রমাণ করে যে, তাদের এমতো সাফল্য লাভ সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র কল্যাণনির্ভর। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতির কথা বলা হয়েছে ভিন্ন ভঙ্গিতে। বলা হয়েছে 'যারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত'। এতে করে একথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ তাদের কর্মদোষ— সত্যপ্রত্যাখ্যান, অংশীবাদিতা, অহংকার ইত্যাদি। এভাবে পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকারকে করা হয়েছে সুস্পষ্ট এবং শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে করা হয়েছে কিছুটা পরোক্ষ।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, কুরায়েশরা রসুল স.কে এতো অধিক ধনসম্পদ দিতে চেয়েছিলো যে, তিনি ওই ধনসম্পদ নিতে চাইলে হতে পারতেন মক্কার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদপতি। সেই সঙ্গে তারা একথাও বলেছিলো যে, যে নারীকে তিনি পছন্দ

করবেন, তাকেই করে দেওয়া হবে তাঁর পত্নী। কিন্তু তাদের শর্ত ছিলো, তিনি তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলোর নিন্দা করতে পারবেন না। তারা আরো বলেছিলো, মোহাম্মদ! এই শর্ত যদি তুমি মানতে না চাও, তবে এরকম করো— একবছর তুমি ও আমরা সকলে পূজা করবো প্রতিমার। পরের বছর আবার সবাই মিলে ইবাদত করবো আল্লাহ্র। এভাবে পালাক্রমে আমরা সম্মান জানাতে থাকবো উভয় ধর্মাদর্শকে। রসুল স. তাদের কথা শুনে বললেন, এ ব্যাপারে আমি এখন কোনো মন্তব্য করবো না। দেখি আমার প্রভুপালনকর্তা আমাকে কীরূপ প্রত্যাদেশ করেন। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় সুরা কাফিরূন এবং পরবর্তী আয়াতগুচ্ছ।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৬৪, ৬৫, ৬৬

❑ বল, 'হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বলিতেছ?'

❑ তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে, 'তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং অবশ্য তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

❑ 'অতএব তুমি আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদের অপপ্রস্তাবের জবাব দিন এভাবে— বলুন, হে মূর্খের দল! তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে ধ্বংস হয়েছো, আবার আমাকেও জানাচ্ছো আহ্বান সেই ধ্বংসের দিকে?

হাসান বসরী সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, মূর্তিপূজকেরা রসুল স.কে বলেছিলো, মোহাম্মদ! তুমি তোমার বাপদাদাদের পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করছো। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত থেকে ৬৬ সংখ্যক আয়াতের 'শাকেরীন' পর্যন্ত। মুকাতিল সূত্রে বাগবী লিখেছেন, মক্কার মুশরিকেরা রসুল স.কে তাদের বাপদাদাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিলো। তখন অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এখানে 'আফা গইরা' এর 'হামযা' প্রশ্নটিকে করেছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং এখানে 'ফা' এর যোজ্য রয়েছে উহ্য। এরপরের 'গইরা' হচ্ছে 'আ'বুদ' এর

কর্মপদ। এরপরের 'তা'মুরুন্নী' ভিন্ন প্রসঙ্গের। আর অস্বীকৃতি প্রজ্ঞাপিত হয়েছে 'গইরুল্লহ্' সম্পর্কে। সেজন্য একে আনা হয়েছে ক্রিয়ার পূর্বে। অর্থাৎ গুরুত্বপ্রকাশার্থে এখানে কর্মপদকে উল্লেখ করা হয়েছে ক্রিয়ার আগে। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— কী, আমি মূর্তিপূজা করবো? আল্লাহ্কে ছেড়ে উপাসনা করবো অন্যের? তোমরা কি তাহলে এরকম মূর্খজনোচিত পরামর্শও দিতে চাও?

পরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে, তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্য তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনার প্রতি যেমন অংশীবাদ নিষিদ্ধ হওয়ার প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতিও তেমনই প্রত্যাদেশ করা হয়েছিলো। অতএব আপনি এই বলে মানুষকে সতর্ক করতে থাকুন যে, হে জনমণ্ডলী! তোমরা যদি আল্লাহ্র অংশীদার নির্ধারণ করো, তবে তোমাদের কর্মতো নিষ্ফল হবেই, তদুপরি তোমরা হবে চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত।

উল্লেখ্য, এই বাণীর ভিত্তি উপমানের উপর। এর দ্বারা যুগপৎ সতর্ক ও নিরাশ করা হয়েছে বিশ্বাসীগণ ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। এই আয়াতের আলোকে তাই আমরা বলি, কোনো মুসলমান ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে গেলে, তার অতীতের সকল পুণ্যকর্ম নিষ্ফল করে দেওয়া হয়। ইসলাম গ্রহণ করলে যেমন ইসলামপূর্ব জীবনের সকল পাপ মুছে যায়, তেমনি ইসলাম ত্যাগ করলে নিষ্ফল হয়ে যায় পূর্ববর্তী ইসলামী জীবনের সকল পুণ্য।

যদি কোনো ব্যক্তি ধর্মত্যাগী হওয়ার পর পুনরায় মুসলমান হয়ে যায় এবং তখনো যদি সেই ওয়াক্তের নামাজের সময় অবশিষ্ট থাকে, তবে তাকে পুনরায় ওই ওয়াক্তের নামাজ পড়ে নিতে হবে। মধ্যবর্তী ধর্মত্যাগ তার আগের নামাজকে বাতিল করে দিবে, যদি সে তা ধর্মত্যাগপূর্ব সময়ে পাঠ করে থাকে। এভাবে যদি সে আগে হজ্ব করে থাকে, তারপর ধর্মত্যাগ করে, তারপর মুসলমান হয়ে যায়, তবে তাকে ফরজ হজ্ব আবার সম্পাদন করতে হবে। ইমাম ইবনে হুম্মাম এরকমই বলেছেন।

বায়যাবী লিখেছেন, অতীতের পুণ্যকর্ম নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘোষণা সম্ভবতঃ নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট। কেননা নবীগণের অংশীবাদী হয়ে যাওয়া উম্মতের অংশীবাদী হয়ে যাওয়া অপেক্ষা অধিক গর্হিত। অথবা বলা যেতে পারে, ধর্মত্যাগ করার জন্য পূর্বের আমল বরবাদ হবে তখন, যখন সে ওই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্য এক আয়াতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে— 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তারপর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তার আমল হয়ে যাবে নিষ্ফল'।

বায়যাবীর বক্তব্যটি ভুল। ধর্মত্যাগ করার ফলে বিগত জীবনের ভালো কাজের ফল বাতিল হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু নবীগণের ক্ষেত্রে এরকম সম্ভাবনার ধারণা

একটি নিকৃষ্ট ধারণা। কেননা আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্যস্থল উম্মতগণ, নবীগণ নন। অর্থাৎ উম্মতকে সতর্ক করাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। নবীগণের শানে অংশীবাদিতার কথা তো কল্পনাই করা যায় না। অবশিষ্ট রইলো 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তারপর সত্যপ্রত্যাখ্যান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তার আমল হয়ে যাবে নিষ্ফল' এই আয়াতের প্রসঙ্গ। এই আয়াত দ্বারা কিন্তু একথা প্রমাণ করা যায় না যে, ধর্মত্যাগীর মৃত্যু যদি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় না হয়, তবে তার অতীতের সুকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে না। এই আয়াতে অবশ্য সুকর্মসমূহের নিষ্ফল হওয়া সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এরকম শর্তের উপস্থিতি নেই। সুতরাং যা শর্তের আওতা বহির্ভূত, তাকে শর্তভূত করা যায় না। শর্তহীনতার ব্যাপকতা তো তার নিজস্ব নিয়মেই বহমান।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি আল্লাহ্রই ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞ হও'। একথার দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে কুরায়েশ গোত্রপতিদের অপপ্রস্তাবকে। বলা হয়েছে 'বালিল্লাহা ফা'বুদ্' (অতএব তুমি আল্লাহ্রই ইবাদত করো)। এখানে 'আল্লাহ্' শব্দটি 'ফা'বুদ্' এর পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে সীমাবদ্ধতা বুঝানোর জন্য।

'ওয়া কুম মিনাশ্ শাকিরীন" অর্থ এবং কৃতজ্ঞ হও। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে সকল অনুগ্রহ দ্বারা তোমাকে সম্মানিত করেছেন, তার জন্য আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে প্রকাশ করো অকুণ্ঠচিত্ত প্রশংসা।

হজরত ইবনে মাসউদ সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, একবার এক ইহুদী রসুল স. এর কাছ দিয়ে যেতে যেতে বললো, হে আবুল কাসেম! আল্লাহ্ তো একসময় আকাশ-পৃথিবী-সমুদ্র-পাহাড় ইত্যাদিকে তাঁর একটি আঙ্গুলের উপরে রাখবেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তার একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত। বলা হয়—

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

❑ উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাঁহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তে। পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।
❑ এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হইয়া পড়িবে। অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে।
❑ বিশ্ব উহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে, আমলনামা পেশ করা হইবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হইবে ও তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।
❑ প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে। উহারা যাহা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আর এই সকল লোক আল্লাহ্ যেমন অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী, সেরকম যথোপযুক্ত ধারণা রাখে না। তারা আল্লাহ্‌র অংশীদার বানায়, বিশ্বাস করে না যে তিনি সত্তাগত, গুণগত, কার্যকলাপগত সকল বিষয়েই আনুরূপ্যবিহীন। ফলে তারা তেমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না, যেমন ইবাদত পাওয়ার তিনি অধিকারী, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না তাঁর দানের, যেমন কৃতজ্ঞ হওয়া ছিলো অত্যাবশ্যক। পুনরুত্থান পর্বের কথাও তারা প্রকারান্তরে অস্বীকার করে। হে আমার রসুল! তাহলে শুনুন, আল্লাহ্ মহাপ্রলয়কালে সমস্ত পৃথিবীকে রাখবেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন হাতের আওতায়, আর আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করা অবস্থায় রাখবেন তাঁর আনুরূপ্যহীন দক্ষিণ হস্তে। তিনি যে অতুলনীয়রূপে পবিত্র ও মহান। তাঁকে তুলনীয় কিছু ভেবে যারা তাঁর অংশীদার বানায়, তিনি তো তাদের সকল অপধারণার অতি ঊর্ধ্বে।

এখানে 'ওয়াল আরদ্বু জ্বামীয়া' অর্থ সমস্ত পৃথিবী। অর্থাৎ পৃথিবীর সাত স্তরসহ পৃথিবী-সংশ্লিষ্ট সকলকিছু।

'ক্বব্দ্বতুহু' অর্থ কবজায়, আয়ত্তে, মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় (ধাতুমূল কর্মপদী শব্দরূপ অর্থে)। অথবা এখানে সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ কথাটি দাঁড়ায়— তাঁর হাতের মুষ্টিতে বা তাঁর আওতাধীনে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, এটা এমন এক আয়াত যার প্রকৃত মর্ম জানেন কেবল আল্লাহ্, তাঁর রসুল এবং অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তিত্ব, যারা জ্ঞানে সুগভীর (ওলামায়ে রসিখীন)। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র অতুলনীয় মর্যাদা ও অপরিমেয় শক্তিমত্তা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রদান। আর একথাটিও জানিয়ে দেওয়া যে, এই বিশাল কর্মকাণ্ড মানুষের কল্পনার অতীত হলেও আল্লাহ্‌র জন্য তা অতি সহজ। কোনোকিছুই তাঁর অভিপ্রায় ও ক্ষমতাবহির্ভূত নয়। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ভাঁজ করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন কিছুও নয়। অলংকার শাস্ত্রজ্ঞরা বলেন, এই বাণী উপমা ও কল্পনামূলক। অর্থাৎ এর প্রকৃত অথবা অপ্রকৃত কোনো অর্থ নেই। যেমন আরববাসীরা বলেন 'রাতের কেশরাশি শাদা হয়েছে'।

এই আয়াত দৃষ্টে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, ওই ইহুদী আলেম আসমান-জমিন-পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে যা বলেছিলো, তা ছিলো তওরাতের ভাষ্য। এই আয়াত দ্বারা তা প্রত্যয়িতও হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হয়, আসমানী কিতাবসমূহ একে অপরের

প্রত্যয়নকারী, পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় হজরত ইবনে মাসউদের এই হাদিসটি এসেছে এভাবে— একবার এক ইহুদী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলে, পৃথিবীকে এক আঙ্গুলে, পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তরকে এক আঙ্গুলে এবং অন্য সকল সৃষ্ট বস্তুকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গুলে বর্ণিত বস্তুসমূহকে তিনি নাড়াচাড়া করবেন এবং বলবেন, আমিই প্রকৃত বাদশাহ্। আমিই আল্লাহ্। রসুলেপাক স. তার কথা শুনে মৃদু হাসলেন এবং পাঠ করলেন 'তারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না ......'। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত তিরমিজি, মুসলিম ও বোখারীর বিবরণে দৃশ্যত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, ওই ইহুদী আলেমের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর বোখারী-মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, ইহুদীর বক্তব্য শুনে রসুল স. এই আয়াত পাঠ করেন। এমতো বৈসাদৃশ্য নিরসনার্থে বলা যেতে পারে যে, ওই ইহুদীর বক্তব্যের পর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারপর তিনি স. ওই ইহুদীকে সদ্য অবতীর্ণ আয়াত পাঠ করে শোনান।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. জানিয়েছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পৃথিবীকে হাতের মুঠায় নিয়ে নিবেন এবং আকাশকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আজ আমি মহাসম্রাট। পৃথিবীর সম্রাটেরা আজ কোথায়?

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাপ্রলয়কালে আল্লাহ্ আকাশসমূহকে তাঁর ডান হাতে ধরে বলবেন, কোথায় আছে সব ক্ষমতাবান ও শক্তিধরেরা, কোথায় আছে অহংকারীরা। তারপর পৃথিবীকে বাম হাতে (অন্য বর্ণনায় অপর হাতে) নিয়ে বলবেন, আজ আমিই একমাত্র বাদশাহ্। কোথায় আছে ক্ষমতাশালীরা! কোথায় আছে অহংকারীরা! হজরত ইবনে ওমর থেকে আবু শায়েখ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যেদিন

মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে, সেদিন আল্লাহ্ পৃথিবীর সপ্তস্তর ও আকাশসমূহকে মুষ্টিবদ্ধ করে বলবেন, আমিই আল্লাহ্। আমি দয়ালু। আমি রাজাধিরাজ। আমি সকল অপবাদ থেকে মুক্ত, পবিত্র। আমি শান্তিদাতা, আমি সংরক্ষক। আমি মহাপ্রতাপশালী। আমি সর্বশক্তিধর। আমি মহান। আমিই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছি প্রারম্ভে, যখন তার অস্তিত্বই ছিলো না। আমিই আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবো (দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবো) আজ রাজ-রাজড়ারা সব কোথায়? কোথায় বিশাল ক্ষমতাদর্পীরা?

কাযী আয়াজ বলেছেন, 'কব্জ', 'ত্বই' ও 'আখজ' এই শব্দত্রয়ের অর্থ একত্রিত করা। যখন আকাশ আছে বিস্তৃত হয়ে এবং জমিন আছে বিছানো অবস্থায়, তখন এ শব্দের অর্থ হবে ওঠানো, সরানো অথবা পরিবর্তন করা। কুরতুবী বলেছেন, 'ত্বই' শব্দের অর্থ ধ্বংস করে দেওয়া।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বসরী বলেছেন, ইহুদীরা প্রথমে সৃষ্টবস্তুকে গণনা করে এবং তারপর চিন্তা করে আকাশ, পৃথিবী ও ফেরেশতার সৃষ্টির বিষয়ে। যখন ওই চিন্তা থেকে অবকাশ পায়, তখন ধারণা করতে থাকে আল্লাহ্ সম্পর্কে। তাদের এমতো অপধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, ইহুদীরা আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে এমন কথা বলে, যে সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। তাদের ওই সকল অযথার্থ জ্ঞান ও অপকথনের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, রবী ইবনে আনাস বলেছেন, যখন 'ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! কুরসির অবস্থাই যদি এরকম হয়, তবে আরশ না জানি কেমন হবে। তাঁদের এমতো বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

'সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আ'ম্মা ইউশরিকূন' অর্থ পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বহু ঊর্ধ্বে। অথবা— অংশীবাদের যে সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে করা হয়, তিনি তা থেকে পবিত্র ও সমুচ্চ।

পরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে'।

'ওয়া নুফিখা ফিস্ সূর' অর্থ এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ যখন উত্থিত হবে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারধ্বনি। 'ফাসায়িক্বা মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মান ফিল আরদ্ব' অর্থ ফলে মুর্ছিত হয়ে পড়বে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে। 'ইল্লা মান শাআল্লহু' অর্থ আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় তারা তখন মুর্ছিত হবে না, সেকথা এখানে স্পষ্ট করে বলা

হয়নি। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সুরা নমলের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। হাসান বলেছেন, এখানে 'মান শাআল্লহু' অর্থ আল্লাহ্র একক সত্তা। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া সকলেই সেদিন হয়ে যাবে বেহুঁশ।

'ছুম্মা নুফিখা ফিহি উখ্রা' অর্থ অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ পুনরায় শিঙ্গায় ফুৎকার ধ্বনিত হবে দ্বিতীয় বারের মতো। 'ফা ইজা হুম ক্বিয়ামুঁই ইয়ানজুরূন' অর্থ তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। অর্থাৎ তখন

সকল লোক তাদের নিজ নিজ কবরে দাঁড়িয়ে যাবে এবং বিস্ময়-বিস্ফোরিত নেত্রে তাকাতে থাকবে এদিকে ওদিকে। অথবা **'ইয়ানজুরূন'** অর্থ পরবর্তী নির্দেশ কী হয় তা বুঝবার জন্য তারা তখন ফ্যাল ফ্যাল চোখে চাইবে। উল্লেখ্য, প্রথম ও দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। সুরা নাজিয়ার তাফসীরে এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক হাদিসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে (৬৯) বলা হয়েছে— **'বিশ্ব তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না'**।

'ওয়া আশ্রাক্বাতিল আরদ্বু বিনূরি রব্বিহা' অর্থ সেদিন পৃথিবী তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে। বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্ যখন তাঁর বান্দাগণের বিচার-মীমাংসা করার জন্য আবির্ভূত হবেন, তখন দৃষ্ট হবে তাঁর নূর। উন্মুক্ত আকাশে সূর্য যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি সেদিন নিঃসন্দিগ্ধরূপে দৃষ্ট হবে আল্লাহ্র নূর।

হাসান বসরী ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'প্রভুপালকের নূর" অর্থ সুবিচার। যেমন জুলুম (অন্যায়) কে বলা হয় জুলমত (অন্ধকার)। অর্থাৎ সেদিন ন্যায়বিচারের নূর দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাগণকে দান করবেন তাদের যথাপ্রাপ্য। রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের প্রান্তরে মানুষের পুঞ্জীভূত জুলুম দাঁড়িয়ে থাকবে অন্ধকার হয়ে। হজরত ইবনে ওমর থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী ও মুসলিম।

'ওয়া উদ্বিয়াল কিতাব্' অর্থ আমলনামা পেশ করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের হাতে তখন দেওয়া হবে তাদের নিজ নিজ আমলনামা। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমলনামাসমূহ সুরক্ষিত আছে আল্লাহ্র আরশের নিচে। যখন সকলকে একত্র করা হবে, তখন আল্লাহ্ প্রবাহিত করবেন এক বাতাস। ওই বাতাস আমলনামাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে আসবে বিচারের ময়দানে এবং সেগুলোকে পৌঁছে দিবে প্রত্যেকের ডান অথবা বাম হাতে। আমলনামাগুলোর উপরে লেখা থাকবে 'আমলনামা পড়ো। তুমি নিজেই আজ তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট'। পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে আবু নাঈম এবং সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে দায়লামী বর্ণনা করেছেন, মহাবিচারের দিবসে বিশ্বাসীগণের আমলনামার শিরোনাম থাকবে **'হুসনু ছানাউন নাস্'** (প্রশংসনীয় তালিকা)।

'ওয়া জ্বীআ বিন্ নাবীয়্যিনা' অর্থ এবং নবীগণকে উপস্থিত করা হবে। সুয়ূতী লিখেছেন, আলেমগণের বর্ণনানুসারে নবীগণের সামনেই গ্রহণ করা হবে সকলের হিসাব। ইবনে মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই, যেদিন রসুল স. এর সম্মুখে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর উম্মতগণকে হাজির না করা হয়। সেকারণেই তিনি স. সকল উম্মতকে চিনেন। আর চিনেন বলেই বিচার দিবসে তিনি তাদের সম্পর্কে উপস্থাপন করবেন তাঁর সাক্ষ্য।

'ওয়াশ্ শুহাদায়ি' অর্থ সাক্ষীগণকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সাক্ষীগণ' অর্থ তারা, যারা রসুল স. এর একনিষ্ঠ অনুসারী ও প্রতিনিধিরূপে পৌঁছে দেন আল্লাহ্র নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ। আতা বলেছেন, এখানে 'সাক্ষীগণ' অর্থ আমললেখক ফেরেশতাগণ।

'সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না' অর্থ সেদিন যার যা প্রাপ্য, তাই দেওয়া হবে তাকে। যৎকিঞ্চিতও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো হবে না কারো পাপ অথবা পুণ্যের।

এর পরের আয়াতে (৭০) বলা হয়েছে— **'প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'**।

আতা বলেছেন, **'তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত'** অর্থ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। জ্ঞানাহরণে তিনি আমললেখক ফেরেশতা বা অন্য কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং ফেরেশতাসহ সকল সৃষ্টি সর্ববিষয়ে তাঁরই মুখাপেক্ষী। সুতরাং বুঝতে হবে আমলনামার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁর বান্দাদের সুবিধার্থে। তাদের পুণ্যকর্ম অথবা পাপ প্রত্যক্ষ করণার্থে।

সূরা যুমার ঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

❑ কাফিরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার প্রবেশদ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা উহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রাসূল আসে নাই যাহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করিত এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিত?' উহারা বলিবে, 'অবশ্যই আসিয়াছিল।' বস্তুত কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে।

❑ উহাদিগকে বলা হইবে, 'জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!'

❑ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে ও ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতি 'সালাম', তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।'

❑ তাহারা প্রবেশ করিয়া বলিবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করিব।' সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম!

❑ এবং তুমি ফিরিশ্‌তাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহারা আরশের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া উহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আর তাহাদের বিচার করা হইবে ন্যায়ের সহিত। বলা হইবে, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ওয়াসীক্বল লাজীনা কাফারু ইলা জাহান্নামা যুমারা'। একথার অর্থ— ওই সময় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। 'যুমারা' অর্থ দলে দলে, অসংখ্য ভাগে ভাগ করে, এক এক দলের পশ্চাতে আরেক দলকে। অর্থাৎ তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করা

হবে তারে পথভ্রষ্টতার তারতম্যানুসারে। আবু উবায়দা ও আখফাশ বলেছেন, 'যুমার' হচ্ছে 'যুমারাহ্' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ আওয়াজ। যে কোনো দলে শ্রুত হয় আওয়াজ অথবা গুঞ্জন। এই বিবেচনায় বলা হয়েছে, শব্দটির উৎসারণ ঘটেছে 'যুমারাহ' থেকে। আর এখানে 'যুমার' অর্থ একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশ। এরকমও হতে পারে যে, 'যুমারাহ্' (মানুষের ছোট দল) শব্দটি এসেছে 'শাতুন যামিরাতুন' থেকে। আবার স্বল্প পশমবিশিষ্ট ছাগীকে বলা হয় 'যামিরাতুন' এবং 'রজুলুন যামিরুন' বলে সেই লোককে, যার মানবতাবোধ কম। এই বিবেচনাতেই অল্পসংখ্যক লোকের দলকে বলে 'যুমারাহ্'।

এরপর বলা হয়েছে— 'যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে, তখন তার প্রবেশদ্বারগুলি খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে,
তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রসুল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের বাণী আবৃত্তি করতো এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতো'।

বায়যাবী এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ীর অভিমত প্রমাণার্থে বলেছেন, এই আয়াত একথাই প্রমাণ করে যে, নবী-রসুল প্রেরণ না করে কোনো সম্প্রদায়কে সত্যপ্রত্যাখ্যানের দায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। নতুবা ফেরেশতারা জাহান্নামীদেরকে বিশেষ করে নবী-রসুলের কথা উল্লেখ করতো না।

আমি বলি, এ আয়াতে সেরকম কোনো প্রমাণ নেই। অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায়ের নিকটে নবী-রসুল ও কিতাব না পৌঁছলেই সেই সম্প্রদায়ের জন্য সত্যপ্রত্যাখ্যান অথবা অংশীবাদিতা বৈধ হয়ে যায় না। এরকমও বলা যায় না যে, ওরকম অবস্থায় তাদেরকে শাস্তির উপযুক্ত গণ্য করা যাবে না। এখানে ফেরেশতাদের উক্তির মর্মার্থ হবে এরকম— নবী-রসুলগণ সতর্ক হওয়ার কথা বলা সত্ত্বেও তোমরা সতর্ক হওনি কেনো? অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধিবলেই তো তোমরা বুঝতে পারতে এই বিশাল সৃষ্টির স্রষ্টা কেউ একজন নিশ্চয়ই রয়েছেন। আর তিনি যে অদ্বিতীয়, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কেননা একাধিক স্রষ্টার পক্ষে এরকম সুশৃঙ্খলভাবে এই মহাবিশ্ব পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তার সাথে আবার তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিলো নবী-রসুলগণকে। ফলে তোমাদের অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতার সর্বশেষ অজুহাতের মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো পাকাপোক্তভাবে। বলো, তৎসত্ত্বেও তোমরা সাবধান হলে না কেনো?

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিলো। বস্তুত কাফেরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে'। একথার অর্থ— তারা জবাব দিবে, হ্যাঁ নবী-রসুল তো এসেছিলেন। আর আমরা স্বেচ্ছায় তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যানও করেছি। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যে শাস্তি অবধারিত করেছেন, তা বাস্তবায়িত হলো আজ আমাদেরই উপর। আল্লাহ্র ওই বাণীও আজ কার্যকর হলো আমাদেরই উপরে, যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবো'।

পরের আয়াতে (৭২) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে বলা হবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কতো নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল'।

এখানে 'ক্বীলাদ্খুলু' অর্থ তাদেরকে বলা হবে প্রবেশ কোরো। বক্তার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ এই যে, যে কথা তাদেরকে তখন বলা হবে, তা হবে খুবই ভীতিপ্রদ।

'আলমুতাকাব্বিরীন' অর্থ উদ্ধতরা। এখানে 'আলিফ লাম' হচ্ছে হরফে জিনসী বা জাতিবাচক অব্যয়। আর 'ফাবি'সা' (কতো নিকৃষ্ট)শব্দে 'ফা' অব্যয়টি হচ্ছে কারণপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— যারা উদ্ধত, তাদের জন্যই এই সর্বনিকৃষ্ট আবাস, জাহান্নাম। এতে করে আর একটি বিষয়ও প্রতীয়মান হয় যে, তাদের জন্য ওই নিকৃষ্টতম আবাস নির্ধারণ করা হয়েছে কেবল সত্যের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের কারণেই।

একটি সংশয় ঃ পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে আল্লাহ্র শাস্তির অঙ্গীকার পরিপূরণার্থে। আর এখানে বলা হলো, তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে তাদেরই ঔদ্ধত্যের কারণে। এরকম বৈপরীত্যের কারণ তাহলে কী?

সংশয়ভঞ্জন ঃ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের ঔদ্ধত্য ও পাপিষ্ঠদের পাপ তো সংঘটিত হয়ে থাকে আল্লাহ্র অঙ্গীকারের অনুকূলেই। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্য বাস্তবায়নব্য বলেই তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সত্যের বিরুদ্ধে চরম উদ্ধত হয়ে ওঠে, হয়ে যায় আল্লাহ্, তাঁর কিতাব এবং তাঁর প্রিয়ভাজনগণের শত্রু। সুতরাং বৈপরীত্যের অবকাশ এখানে নেই।

হজরত ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর এক দীর্ঘ বিবৃতির একস্থানে বলেছেন, আল্লাহ্ যে বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে দিয়ে পৃথিবীতেই জান্নাতের অনুকূল আমল করিয়ে নেন। ওই অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে এবং জান্নাতে প্রবেশ

করে। আর তাঁর যে বান্দাকে তিনি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে দিয়ে করান জাহান্নামের অনুকূল কাজ। ওই অবস্থায় সে মৃতুবরণ করে এবং জাহান্নামে চলে যায়।

এর পরের আয়াতে (৭৩) বলা হয়েছে— 'যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে'। এখানে 'ওয়াসীক্বাল লাজিনাত্ তাক্বাও রব্বাহুম' অর্থ যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে। 'ইলাল জান্নাতি যুমারা' অর্থ দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। 'দলে দলে' অর্থ পুণ্যের মর্যাদানুসারে বিভিন্ন দলে অন্তর্ভূত করে। কোনে কোনো আলেম বলেছেন, তাদের জান্নাতযাত্রা হবে অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন। কেননা তারা তখন প্রত্যেকেই থাকবে দ্রুতগামী বাহনে সওয়ার হয়ে।

'ওয়া ফুতিহাত আব্ওয়াবুহা' অর্থ এবং এর দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে। কথাটি অবস্থাপ্রকাশক। অর্থাৎ তারা যখন জান্নাতের দ্বারদেশে পৌঁছবে তখন দরোজাগুলো পাবে উন্মুক্ত অবস্থায়, দরোজা খোলা পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষাও করতে হবে না। বলা বাহুল্য, এরকম করা হবে তাদের সম্মানার্থে।

'সালামুন আলাইকুম' অর্থ তোমাদের প্রতি সালাম। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি এমন শান্তি বর্ষিত হোক, যার পরে আর কোনো অপ্রীতিকর অবস্থা আসবে না।

'ত্বিবতুম' অর্থ তোমরা সুখী হও। অর্থাৎ পাপপঙ্কিলতা থেকে হও চিরমুক্ত। উল্লেখ্য, জান্নাতীরা এরকম সুখ লাভ করবে একারণে যে, হয়তো তারা শাস্তিযোগ্য কোনো কোনো পাপ করেইনি। অথবা, সেরকম কিছু করলেও আল্লাহ্ তা মার্জনা করেছেন, কিংবা শাস্তি দিয়ে তাদেরকে করেছেন পবিত্র। কাতাদা বলেছেন— তারা জাহান্নামের স্থান অতিক্রমকালে তাদেরকে থামানো হবে একটি সেতুর কাছে। সেখানে মিটিয়ে দেওয়া হবে পারস্পরিক দাবি-দাওয়া। তারপর সকলে দায়মুক্ত হয়ে পৌঁছবে জান্নাতের উন্মুক্ত দরজার সামনে। দ্বাররক্ষী ফেরেশতা রেজওয়ান তখন তাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে বলবে 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য'।

হজরত আলী বলেছেন, তাদেরকে যখন জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা জান্নাতের দরোজার কাছে পাবে একটি গাছ। ওই গাছের তলদেশে থাকবে দু'টি প্রবহমান ঝর্ণা। এক ঝর্ণায় গোসল করার সঙ্গে সঙ্গে বিদূরিত হবে তাদের বাহ্যিক আবিলতা এবং অপরটিতে গোসল করলে মুক্ত হবে অভ্যন্তরীণ কলুষতা থেকে। এভাবে পরিপূর্ণ পবিত্রতাসহ যখন তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন ফেরেশতারা বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি সম্ভাষণ, তোমরা আনন্দিত হও এবং চিরদিনের জন্য প্রবেশ করো চিরসুখময় বেহেশতে। জুজায বলেছেন, এখানে 'ত্বিব্তুম' অর্থ তোমরা পৃথিবীতে পবিত্র ছিলে অংশীবাদিতা ও অবাধ্যতার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ— তোমাদের এই আবাসস্থল পবিত্র।

'ফাদ্খুলূহা' অর্থ প্রবেশ করো। এখানকার 'ফা' অক্ষরটি নৈমিত্তিক অব্যয়, যা থেকে এ বিষয়টিই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের পবিত্র হওয়াটাই জান্নাতে প্রবেশ করার এবং সেখানে চিরকাল বসবাস করার কারণ। যেমন দোজখবাসীদের দোজখে প্রবেশের কারণ ঠিক এর বিপরীত। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুযায়ী তাই এর মর্মার্থ হবে— যেহেতু বেহেশত পবিত্র স্থান, তাই পবিত্র মানুষেরাই সেখানে বসবাস করার উপযুক্ত। আর 'খলিদীন' অর্থ স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় তার সামগ্রীর জোড়া (একই রকমের দু'টি জিনিস) দান করবে, তবে জান্নাতের দরোজা থেকে স্বাগতম জানানো হবে। জান্নাতের দরোজা রয়েছে অনেক। নামাজীকে আহ্বান জানানো হবে নামাজের দরোজা থেকে, রোজাদারকে

রোজার দরোজা থেকে, দানশীলদেরকে দানের দরোজা এবং মুজাহিদদেরকে জেহাদের দরোজা থেকে। হজরত আবু বকর তখন বললেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! এমন ব্যক্তি কি হবে, যাকে আহ্বান জানানো হবে সকল দরোজা থেকে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আমি আশা করি তুমিও হবে তাদের একজন।

এরপরের আয়াতে (৭৪) বলা হয়েছে— 'তারা প্রবেশ করে বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির, আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো'।

এখানে 'সাদাক্বনা ওয়াদাহু' অর্থ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং এমন নেয়ামত দান করেছেন, যা দৃষ্টিনন্দন ও পরিতৃপ্তিপ্রদায়ক।

'ওয়া আওরাছানাল আরদ্ব' অর্থ এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির। অর্থাৎ করেছেন এই ভূমির ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী বা স্বত্বাধিকারী।

'নাতাবাওওয়াউ মিনাল জান্নাতি হাইছু নাশাউ' অর্থ আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের অংশে যেহেতু জান্নাতের সুবিস্তীর্ণ ভূমি দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা এই বিশাল এলাকার যে কোনো স্থানে

ইচ্ছামতো বসবাস করতে পারবো। ইচ্ছামতো গিয়ে দেখা সাক্ষাত করতে পারবো নবী, ওলী এবং অন্যান্য উচ্চ মর্যাদাধারী জান্নাতীদের সঙ্গেও। জননী আয়েশা থেকে তিবরানী, আবু নাঈম ও জিয়া বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি আমার কাছে আমার জীবন, পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য আপনজন অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আমি স্বগৃহে অবস্থানের সময়ও আপনার মহান সাহচর্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকি। আপনার দর্শন লাভ না করা পর্যন্ত শান্তি পাই না। আমার মৃত্যু ও আপনার মহাপ্রয়ানের কথা মনে হলেও আমি অস্থির হয়ে যাই। মনে হয় আমি জান্নাতে যেতে পারলেও হয়তো আপনার দেখা আর পাবো না। তখন আপনি তো থাকবেন উন্নততম জান্নাতে। রসুল স. তার কথার জবাব দিলেন না, যতোক্ষণ না অবতীর্ণ হলো এই আয়াত 'আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, তারা থাকবে সেই সকল নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও পুণ্যাত্মাগণের সঙ্গে, যাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কার দানে ধন্য করবেন। তারা সকলেই হবে উত্তম সঙ্গী'।

এরপর বলা হয়েছে— 'সদাচারীদের পুরস্কার কতো উত্তম'। একথার অর্থ— যারা ভালো কাজ করবে, তাদের জন্য রয়েছে কতোই না উত্তম প্রতিদান'।

শেষোক্ত আয়াতে (৭৫) বলা হয়েছে— 'এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি ওই সময় আরো দেখতে পাবেন, আরশকে বৃত্তাকারে ঘিরে তখন আরশের ফেরেশতারা মুহুর্মুহু ঘোষণা করছে তাদের প্রভুপালনকর্তার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা।

এখানে 'হাফ্ফীনা' অর্থ চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘিরে। 'ইউসাব্বিহুনা বিহাম্দি রব্বিহিম' অর্থ তাদের প্রভুপালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা। উল্লেখ্য, ফেরেশতাদের ওই আমল অত্যাবশ্যক ইবাদতমূলক হবে না। বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষিত আল্লাহ্র ওই প্রশংসা-পবিত্রতা-মহিমা হবে ফেরেশতাদের জন্য আনন্দ উৎসব।

এরপর বলা হয়েছে— 'আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সঙ্গে'। একথার অর্থ— তখন মানুষ ও জ্বিনদের বিচার সম্পন্ন করা হবে সম্পূর্ণতই ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে। একদলকে জাহান্নাম ও আর একদলকে জান্নাত দেওয়া হবে পুরোপুরি ইনসাফের নিরীখে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, একথা বলা হবে তখন ফেরেশতাদের সম্পর্কে। তাই কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াবে— নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে তখন ফেরেশতাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে যথাস্থানে। যথার্থ অধিকার থেকে কাউকেও বঞ্চিত করা হবে না।

শেষে বলা হয়েছে— 'বলা হবে, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য'। একথার অর্থ— এভাবে যখন আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে, তখন জান্নাতবাসীরা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বলে উঠবে, সকল প্রশংসা বিশ্বসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তাঁর মিত্রদেরকে জান্নাতে এবং শত্রুদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন ফেরেশতারা খুশীতে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলে উঠবে, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন।

জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. প্রতি রাতে সুরা বনী ইসরাইল ও সুরা যুমার পাঠ করতেন।

আলহামদুলিল্লাহি আ'লা জালিক। সুরা যুমারের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ পহেলা রমজান ১২০৭ হিজরী সনে।

সূরা মু'মিন

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরার রুকু-সংখ্যা ৯ এবং আয়াত-সংখ্যা ৮৫।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, কোরআনের উপমা এরকম ঃ এক ব্যক্তি তার পরিবার পরিজন ও স্বজনদের প্রয়োজনে বিশাল জনশূন্য প্রান্তরে পানির সন্ধানে বের হলো। চলতে চলতে একস্থানে দেখলো বর্ষণসিক্ত আদ্রতার চিহ্ন। সে বিস্মিত হলো। একটু এগিয়ে যেতেই আরো আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখতে পেলো একটি সুদৃশ্য বাগান। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাগানে প্রবেশ করলো সে। আপন মনে বলে উঠলো, আমি তো বর্ষণের চিহ্ন দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বাগানে ঢুকে তো আরো অবাক হয়ে গেলাম। হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, বর্ষণের চিহ্ন হচ্ছে কোরআন মজীদ। আর তার মধ্যের বাগান হচ্ছে কোরআন মজীদের 'হা-মীম'সম্বলিত সুরা সমূহ। তিনি আরো বলেন,
যখন আমি 'হা-মীম' চিহ্নিত সুরাসমূহ আবৃত্তিতে মগ্ন হই, তখন মনে হয়, আমি যেনো কোনো মনোহর বাগিচায় চিত্তবিনোদনের জন্য অবকাশ যাপন করছি।

বাগবী আরো লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ের সারবস্তু (মগজ) থাকে। আর কোরআনের সারবস্তু হচ্ছে 'হা-মীম' শিরোনাম সম্বলিত সুরাসমূহ। বাগবী একথাও লিখেছেন যে, ইব্রাহিম বলেছেন, 'হা-মীম' হচ্ছে নববধুদের পুষ্পালংকার সদৃশ। পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন 'হা-মীম' শিরোনামবিশিষ্ট সুরাগুচ্ছ হচ্ছে কোরআনের সৌন্দর্য।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত **১**, ২, ৩

❑ হা-মীম।

❑ এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে—

❑ যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।

প্রথমেই বলা হয়েছে— 'হা মীম'। এর উপক্রমণিকা বিবৃত হয়েছে ইতোপূর্বেই। সুদ্দীর বর্ণনা উল্লেখ করে বাগবী লিখেছেন, 'হা মীম' হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহানতম নাম (ইসমে আজম)। ইকরামা বলেছেন, 'আর রহমান' হচ্ছে মিশ্র যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শব্দ। পৃথকভাবে শব্দরূপটি এরকম— 'আর রহমান' (আলিফ লাম র হা মীম ও নূন)। সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও আতা খোরাসানী বলেছেন, 'হামীম' দ্বারা ইশারা করা হয়েছে আল্লাহ্‌র নামাবলীর দিকে। 'হা' অক্ষরটি রয়েছে আল্লাহ্‌র কয়েকটি নামের সূচনায়। যেমন— হাকীম, হামীদ, হাই ও হাইয়্যান (প্রজ্ঞাময়, উচ্চ প্রশংসিত, চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর)। আর 'মীম' রয়েছে তাঁর এই নামগুলোর শুরুতে— মালিক, মাজীদ, মান্নান (মহাসম্রাট, খ্যাতিমান, কল্যাণময়)।

ক্বারী কুসাই বলেছেন, 'হা মীম' এর অর্থ— অনাগতকালে যা কিছু ঘটবে, তার মীমাংসা হয়েই গিয়েছে। তাঁর বক্তব্যে সম্ভবত এমন ইঙ্গিতও রয়েছে যে, 'হামীম' 'হুম্মা'র সমঅর্থসম্পন্ন।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে (২) যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট '।

এখানে ‘তান্‌যীলুল কিতাব’ অর্থ এই কিতাবের অবতারণ। ‘মিনাল্লহ্’ অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। ‘আল আ’যীযুল আ’লীম’ অর্থ যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্‌তায়ালা অতুলনীয়রূপে পরাক্রমশালী তো বটেই, তদুপরি সকল বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত। আর কোরআন মজীদের বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনাবলী, বিভিন্ন রহস্যের বিচিত্র উপস্থাপনা তাঁর পরাক্রম ও জ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেকারণেই সম্ভবতঃ এখানে ‘আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব’ এর সঙ্গে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তাঁর এই দুই গুণ— পরাক্রম ও প্রজ্ঞা।

‘গাফিরিজ্ জাম্‌বি ও ক্বাবিলিত্ তাওবি’ অর্থ, যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী। ‘তাবা’ ও ‘ইয়াতুবু’ এর মূল শব্দ হচ্ছে ‘তাওবুন’। কারো কারো মতে এগুলো হচ্ছে ‘তাওবাতুন’ এর বহুবচন। যেমন ‘দা’ওমাতুন’ এর বহুবচন ‘দাওয়াম’ এবং ‘হাওমাতুন’ এর বহুবচন ‘হুউম’। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্’ কলেমায় বিশ্বাসী, তিনি তাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্’ এই বাণীতে আস্থাশীল তিনি তাদেরই তওবা কবুলকারী। ‘ক্ষমা’ ও ‘তওবা’ কথা দু’টোর পরস্পরসম্পৃক্ততা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আর কোনো বিশেষ কালের সঙ্গে আল্লাহ্‌র এই গুণ দু’টো সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ্‌র সত্তা ও অন্যান্য গুণের মতো এই দু’টো গুণও চিরন্তন। আর এখানে গুণ দু’টো বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা প্রকাশার্থে।

দু’টো কথার মধ্যে আবার সন্নিবেশিত হয়েছে সংযোজক অব্যয় ‘ওয়াও’ (এবং)। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র ক্ষমা করা ও তওবা কবুল করার এই গুণ দু’টো পৃথক বৈশিষ্ট্যসহ সদাবিদ্যমান। অথবা বলা যেতে পারে, কিছুসংখ্যক লোক ভাবে, ক্ষমা করা ও ক্ষমাপ্রার্থনাকে গ্রহণ করা একই জিনিস। কিন্তু তাদের এমতো ধারণা অসঠিক। আর সে কারণেই এদু’টো গুণের পার্থক্য নির্ণয়ার্থে মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘ওয়াও’ (এবং)। কিংবা বলা যেতে পারে, আল্লাহ্‌র এই গুণ দু’টোর প্রকাশ ঘটে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়। যে বিশ্বাসী তওবা করেনি এবং তওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ্ তার জন্য ‘গাফিরিজ্ জাম্‌বি’ (পাপ মার্জনাকারী), অর্থাৎ আখেরাতে তার পাপের উপরে আবরণ প্রদানকারী, তার অপরাধকে সকলের দৃষ্টি থেকে লোপনকারী। ‘গাফারা’ এর প্রকৃত অর্থ ঢেকে দেওয়া, গোপন করা। আর যে ব্যক্তি তওবা করে (কৃত পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে), তার তওবাও তিনি কবুল করে থাকেন। উল্লেখ্য, তওবাকারীরা নিরপরাধীদের মতো। এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মাজা, হজরত উবাই ইবনে কা’ব থেকে হাকেম, হজরত আলী থেকে ইবনে নাজ্জার এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আসাকের ও বায়হাকী কর্তৃক।

ইয়াজিদ ইবনে আসেম বর্ণনা করেছেন, সিরিয়াবাসী এক লোক ছিলো খুবই বীরপুরুষ। খলিফা হজরত ওমর তার সাহসিকতার জন্য তাকে পছন্দ করতেন।

কিছুকাল পরে লোকটি হঠাৎ হারিয়ে গেলো। হজরত ওমর লোকজন মারফত তার খোঁজখবর নিতে লাগলেন। শেষে লোকের মাধ্যমে সংবাদ পেলেন, লোকটি মদ্যপান নিয়েই সবসময় মেতে থাকে। হজরত ওমর তখন তাঁর পত্রলেখককে বললেন, ওই লোকের নামে লেখো। শুরুতে উল্লেখ করো ‘যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট’। এরপর তিনি উপস্থিত লোকজনকে নিয়ে তার জন্য এইমর্মে দোয়া করলেন যে, আল্লাহ্ যেনো তাকে তওবা করার সামর্থ্য দান করেন এবং তার তওবা কবুল করেন। ওই লোকের কাছে যখন পত্রটি পৌঁছানো হলো তখন সে তা বার বার পড়তে লাগলো এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, যিনি ‘পাপ ক্ষমা করেন’ অর্থ তিনি আমাকে আমার পাপ ক্ষমা করার সুসংবাদ ঘোষণা করছেন, ‘তওবা কবুল করেন’ অর্থ তিনি আমার তওবা কবুল করার অঙ্গীকার করছেন। ‘যিনি শাস্তিদানে কঠোর’ অর্থ তাঁর শাস্তি সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে সতর্ক করছেন। আর ‘প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট’ অর্থ আমার এখন তওবা করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। শেষে সে সর্বান্তঃকরণে তওবা করলো। পাপ থেকে মুক্তিলাভ করলো চিরদিনের জন্য। হজরত ওমর এ সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে বললেন, তোমরাও তোমাদের বিপদগ্রস্ত ভ্রাতাদের সঙ্গে এরকম নম্র আচরণ কোরো এবং দোয়া কোরো, যেনো আল্লাহ্ তাকে ক্ষমাপ্রার্থনা করার সামর্থ্য দেন। তার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী যেনো তোমরাও না হও। কাতাদা বর্ণনা করেছেন, মদীনায় বসবাস করতো এক নিবিষ্টচিত্ত ইবাদতকারী। হজরত ওমর তাকে খুব স্নেহ করতেন। ঘটনাক্রমে সে মিসরে চলে গেলো। সেখানে গিয়েই সে পড়লো শয়তানের খপ্পরে। ফলে সে কোনো খারাপ কাজ করতে পিছপা হতো না। হজরত ওমর তার এক নিকটাত্মীয়ের কাছে তার বিষয়ে জানতে চাইলেন। সে বললো, হে আমিরুল মু’মিনীন! তার কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। হজরত ওমর বললেন, কেনো? সে বললো, সে এখন পৌঁছে গিয়েছে চরিত্রহীনতার চরম পর্যায়ে। তিনি তখন তার নামে একটি চিঠি লিখলেন। শুরুতে উল্লেখ করলেন খলীফা ওমরের পক্ষ থেকে অমুকের নামে। তারপর উল্লেখ করলেন এই সুরার প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়। চিঠিটি পেয়ে ওই লোক বার বার তা পাঠ করতে লাগলো। শেষে আন্তরিক তওবা করে চিরদিনের জন্য ফিরে এলো শুভপথে। ইসহাক সাবেয়ী বর্ণনা করেছেন, এক লোক হজরত ওমরের কাছে এসে বললো, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! আমি খুনী। এখন আমার পরিত্রাণের কোনো পথ কি উন্মুক্ত আছে? তিনি তখন পাঠ করলেন এই সুরার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত। তারপর বললেন, পুণ্যকর্ম করে যেতে থাকো। নিরাশ হয়ো না।

‘শাদীদিল ই’ক্বব’ অর্থ যিনি শাস্তিদানে কঠোর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্’ কলেমায় বিশ্বাসী নয়, তাকে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন। ‘জিত্‌ত্বউলি’ অর্থ শক্তিশালী। মুজাহিদ বলেছেন, ‘ত্বওল’ অর্থ আরাম-আয়াশ, ধনদৌলত। কাতাদা

অর্থ করেছেন— অনুগ্রহরাজি। কেউ কেউ বলেছেন, 'জিত্‌ত্বওলি' অর্থ ক্ষমতাবান। হাসান বলেছেন, দানশীল। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, 'যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন' এবং 'যিনি শাস্তিদানে কঠোর' এই কথাগুলো গুণবাচক নয়। এগুলো হচ্ছে অনুবর্তী। এগুলোর তিনটিতেই রয়েছে অতিরিক্ত শব্দ-সমাহার, যা কেবলই প্রশংসাসূচক নয়। এমতো ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, 'জিত্‌ত্বওলি' কথাটিও অনুবর্তী, গুণপ্রকাশক নয়। কেননা শব্দটিকে গুণবাচক ধরা হলে এর পূর্বে অনুবর্তী না আসা জরুরী হয়ে পড়ে, যা রীতিসম্মত নয়। জমখ্‌শারী ও বায়যাবী লিখেছেন, এগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত 'আ'যীযিল আ'লীম' (পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ) এর বিশেষণ এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে অন্তর্গত সম্পর্ক এবং এ ধরনের বিশেষায়ণের মূল উদ্দেশ্য থাকে প্রশস্তি বর্ণনা। 'শাদীদিল ই'ক্বব' কথাটিকে এর অন্তর্গত সম্পর্কভূত বলে যদি ধরে নেওয়া হয়, তবে কেবল এককভাবে 'জিত্‌ত্বওলি'কেও অনুবর্তী মনে করা যাবে না। কেননা তাতে করে দেখা দিবে বিন্যাস-বৈষম্য। জুজায বলেছেন, 'শাদীদিল ই'ক্বব' হচ্ছে বদল, সিফাত বা গুণবাচক নয়। 'মাদারেক' প্রণেতাও এরকম বলেন। এমতাবস্থায় 'জিত্‌ত্বওলি'কেও অনুবর্তীই ধরতে হবে, গুণবাচক ধরা যাবে না। অর্থগত দিক থেকে অবশ্য বায়যাবীর ব্যাখ্যাই অধিকতর গ্রাহ্য। কেননা কথাগুলো হচ্ছে মূল কথার অনুগামী এবং এগুলোর মধ্যে সেসকল ভাবই প্রকাশ পেয়েছে, যা রয়েছে তাদের মূল কথায়। আর এসকল বিশেষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা, তাঁর প্রতি উৎসাহিত করা এবং তাঁর দিকে ধাবিত করা।

'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' অর্থ তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য যখন নেই-ই, তখন তো কেবল তাঁর উপাসনাতেই নিবেদিত হওয়া উচিত। 'মাদারেক' প্রণেতা লিখেছেন, এই বাক্যটিও 'জিত্‌ত্বওলি' এর মতো আর একটি বিশেষণ। কিন্তু বাহ্যত মনে হয় এটি একটি পৃথক বাক্য।

'ইলাইহিল মাসীর' অর্থ প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকটে। অর্থাৎ তাঁর নিকটে সকলের প্রত্যাবর্তন অতিনিশ্চিত। আর ওই প্রত্যাবর্তনের সময়েই তিনি সকলের জন্য নির্ধারণ করবেন যথোপযুক্ত প্রতিফল— স্বস্তি অথবা শাস্তি।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৪, ৫, ৬

❑ কেবল কাফিররাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাহাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

❑ ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাহাদের পরে অন্যান্য দলও অস্বীকার করিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল এবং উহারা অসার তর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য। ফলে আমি উহাদিগকে পাকড়াও করিলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!

❑ এইভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হইল তোমার প্রতিপালকের বাণী— ইহারা জাহান্নামী।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কেবল কাফেরেরাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে'। এখানে 'বিতর্ক করে' অর্থ আল্লাহ্‌র বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তা প্রত্যাখ্যান করা, অথবা তার মধ্যে বৈপরীত্য ও প্রভেদ সৃষ্টিতে অনড় থাকা, কিংবা রহস্যাচ্ছন্ন (মুতাশাবিহাত) আয়াতসমূহের এমন জটিল ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা, যা হয়ে যায় 'মুহকিমাত' (সুস্পষ্ট) আয়াত এবং সুবিদিত হাদিসের পরিপন্থী।

আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহের বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুল স. কিছুসংখ্যক লোককে কোরআন নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে দেখে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তোমাদের মতো এভাবে আল্লাহ্‌র কিতাবের আয়াতসমূহের দ্বান্দ্বিকতাদুষ্ট ব্যাখ্যা করতো বলেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। অথচ আল্লাহ্‌র কিতাবের এক আয়াত অন্য আয়াতের প্রত্যয়ক, সমর্থক, অথবা পরিপূরক। সুতরাং তোমরা কোরআনের কিছুসংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে অন্য কিছুসংখ্যক আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরো না। যা জানো তা বলো, আর না জানলে শরণাপন্ন হও ধর্মতত্ত্বজ্ঞদের। বাগবী।

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আমর ইবনে শোয়াইবের পিতামহ বলেছেন, রসুল স. এর দরবারে একদিন আমি উপস্থিত হলাম দ্বিপ্রহরে। তিনি স. দু'জন লোককে একটি আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে শুনে এগিয়ে এলেন। তাঁর পবিত্র

মুখমণ্ডলে তখন পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো রোষতপ্ততা। তিনি স. তৎসত্ত্বেও সংযত হয়ে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কিতাবে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোরআন নিয়ে ঝগড়া করার অর্থ কাফের হওয়ার নামান্তর। হাদিসটি বায়হাকী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে তায়ালাসীও বর্ণনা করেছেন এরকম। সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, কোরআন নিয়ে বিবাদ-বিভেদ করার অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যাওয়া।

বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্ ইতোপূর্বে প্রমানসিদ্ধ সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন 'এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট

থেকে'। তৎসত্ত্বেও যারা কোরআনের ব্যাখ্যা নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ করে এবং সত্যকে মিথ্যার মাধ্যমে হেনস্থা করতে চায়, তাদেরকে এখানে বলা হয়েছে কাফের। বায়যাবী বলেছেন, কথিত 'ঝগড়া' অর্থ ওই একদেশদর্শিতা, যা করা হয়ে থাকে বিদ্যা প্রদর্শন অথবা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থে। কিন্তু কোরআনের বাণীর মর্মোদ্ঘাটনে দ্বীনদার আলেমগণের মধ্যে উদ্ভূত মতোবিরোধ ও বিতর্ক দূষণীয় কিছু নয়। বরং তা প্রশংসার্হ। একারণেই হাদিস শরীফে 'জিদালান' শব্দটিকে অনির্দ্দিষ্ট বাচক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেটাকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে 'কুফর' বলে।

'ইনায়াহ্' প্রণেতা লিখেছেন, যে সকল আয়াতের বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য নিয়ে বিতর্ক করাকে এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যান (কুফরী) বলা হয়েছে, ওই সকল আয়াত হচ্ছে ভাগ্য ইত্যাদি বিষয়ক। ইলমে কালামের (আকিদা সম্পর্কিত বিষয়ের) আলেমগণ ও বেদাতীদের মধ্যে এসকল আয়াত নিয়ে বিস্তর তর্কবিতর্ক হয়ে থাকে। কিন্তু নির্দেশনা-নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতগুলো নিয়ে এরকম মতানৈক্য ও বিরোধ সাধারণত দৃষ্ট হয় না। মর্মোদ্ঘাটনে সংক্রান্ত বিতর্ক তো ছিলো সাহাবীগণের মধ্যেও। পরবর্তী যুগের আলেমগণও এমতো বিরোধ থেকে মুক্ত নন। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর বিজয়লাভ ও কৌশলে তাদেরকে কোনঠাসা করার মতো কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে তারা ভিন্নমত প্রকাশ করতেন না। ভিন্নমত প্রকাশ করতেন কোরআনের বক্তব্যের মূল তত্ত্ব উন্মোচনার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেনো তোমাকে বিভ্রান্ত না করে'। এখানে 'তাক্বল্লুবুহুম' অর্থ অবাধ বিচরণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ই পৃথিবীতে তাদেরকে অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাইতো তারা সিরিয়ায় ও ইয়েমেনে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের বিত্তার্জনকে করতে পেরেছে নির্বিঘ্ন। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! ওইসকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সাময়িকভাবে অবাধ চলাচল ও নির্বিঘ্ন বাণিজ্যাধিকার দিয়েছি আমিই। সুতরাং আপনি একথা ভাববেন না যে, তাদেরকে আমি ছেড়ে দিবো? সাময়িক অবকাশ শেষে তাদেরকে পাকড়াও তো আমি করবোই, যেমন পাকড়াও করেছিলাম অতীতের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

সুদ্দী ও আবু মালেকের বর্ণনানুসারে ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হারেছ ইবনে কায়েস সাহামী সম্পর্কে।

পরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায় এবং পরে অন্যান্য দলও অস্বীকার করেছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এখানকার মক্কার এই মুশরিকেরা যেমন আপনাকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে, তেমনই ইতোপূর্বে নবী নুহের অবাধ্য সম্প্রদায়ও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তার পরের জামানার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ও ছিলো একই স্বভাবের। তারাও তাদের নিজ নিজ নবীকে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধাবোধ করেনি। যেমন

আদ, ছামুদ ইতাদি জনগোষ্ঠী। অতএব আপনি ব্যথিত হবেন না। কী করবেন? মানবতার প্রকৃত সুহৃদ নবীগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা যে সত্যাপ্রত্যাখ্যান-কারীদের চিরাচরিত রীতি।

এরপর বলা হয়েছে— 'প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রসুলকে আবদ্ধ করবার অভিসন্ধি করেছিলো এবং ওরা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিবার জন্য'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তারা হত্যা বা বিনাশ করতে চেয়েছিলো তাদের নিজ নিজ পয়গম্বরগণকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তারা তাদের নবীগণকে করতে চেয়েছিলো বন্দী। আরববাসীরা কয়েদীকে বলেন 'আখীজ' (আবদ্ধকৃত)। এভাবে 'লিইয়াখুজূ' কথাটির দ্বারা আবদ্ধ করাই বুঝায়।

'ওয়া জ্বাদালূ বিল বাত্বিল' অর্থ এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিলো। যেমন বলেছিলো 'তুমি তো আমাদের মতো একজন মানুষ' 'তোমার কাছে ফেরেশতা আসে না কেনো' 'আমরা তোমার প্রভুপ্রতিপালককে দেখতে চাই' ইত্যাদি।

'লিইউদ্হিদ্বূ বিহিল হাক্ব' অর্থ তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিবার জন্য। অর্থাৎ দুরভিসন্ধি ও অসার তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তারা নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিলো মহাসত্যের অগ্রযাত্রাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফলে তাদেরকে আমি পাকড়াও করলাম এবং কতো কঠোর ছিলো আমার শাস্তি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! দেখুন তাদেরকে শেষে কতো ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে আমি বাধ্য করেছি। কঠোর শাস্তির মাধ্যমে

তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করেছি পৃথিবী থেকে, তাদের বিরাণ জনপদের ধ্বংসচিহ্ন তো মক্কার মুশরিকদের বাণিজ্যপথের পাশে এখনো পরিদৃশ্যমান। তবু কি তাদের চৈতন্যোদয় হবে না? সতর্ক হবে না কি তারা একথা ভেবে যে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তেমনি ভয়ঙ্কর পরিণাম।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'এভাবে কাফেরদের ক্ষেত্রে সত্য হলো তোমার প্রতিপালকের বাণী— এরা জাহান্নামী'। একথার অর্থ হে আমার রসুল! ওইসকল সত্যপ্রত্যাখানকারীদের বিনাশ সাধনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কার্যকর করা হলো আল্লাহ্‌র এই পূর্ব সিদ্ধান্ত যে— পরকালেও তারা হবে দোজখের বাসিন্দা।

এখানে 'কাজালিকা' অর্থ এভাবে। অর্থাৎ এভাবে সত্যপ্রত্যাখানকারীদেরকে ধ্বংস করা যেমন জরুরী ছিলো, সেভাবে পরকালেও তাদের জন্য অপেক্ষা করছে শাস্তি। অথবা— বিগত উম্মতদের উপরে শাস্তি যেভাবে কার্যকর করা হয়েছিলো, সেভাবে শাস্তি কার্যকর করা হবে এদের (মক্কার মুশরিকদের) উপরেও।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯

❑ যাহারা 'আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যাহারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।'

❑ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ 'এবং তুমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তো অনুগ্রহই করিবে; ইহাই তো মহাসাফল্য!'

আলোচ্য আয়াতত্রয়ে বিবৃত হয়েছে আরশবাহী এবং আরশকে পরিবেষ্টনকারী ফেরেশতাগণের কথা। প্রথমে বলা হয়েছে—'যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সঙ্গে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে'।

এখানে 'মান হাওলাহু' অর্থ আরশকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণরত ফেরেশতাগণ। উল্লেখ্য, আরশ বহনকারী ও আরশ প্রদক্ষিণরত ফেরেশতারা হচ্ছে ফেরেশতাদের নেতা। তাদেরকে বলা হয় নৈকট্যভাজন (মুকার্‌রবীন)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আরশ বহনকারীদের পায়ের গ্রন্থি থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত দূরত্ব পাঁচশ' বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। এক বর্ণনায় এসেছে, তাদের পা জমিনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং আকাশের উচ্চতা তাদের কোমর পর্যন্ত। তাদের সার্বক্ষণিক জিকির হচ্ছে 'সুবহানা যিল ইয্‌যাতি ওয়াল জ্বাবারুত সুবহানা জিল মুলকি ওয়াল মালাকুত সুবহানাল হাইয়্যিল্‌লাজী লা ইয়ামুতু - সুব্‌বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ও রব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ্ (পবিত্র ওই সত্তা, যিনি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী, পবিত্র ওই সত্তা, যিনি যাবতীয় সাম্রাজ্যের মালিক, পবিত্র ওই অস্তিত্ব, যিনি চিরঞ্জীব, অমর, মহাপবিত্র, ফেরেশতা ও আত্মাসমূহের প্রভুপালক)।

মাইসারা ইবনে আদুবিয়া বলেছেন, তাদের পা রয়েছে সর্বনিম্ন ভূমিতে এবং তাদের মস্তক ভেদ করেছে আরশকে। তারা সর্বক্ষণ বিনীত ও অবনতমস্তক। ঊর্ধ্বদেশের প্রতি তারা দৃষ্টিপাত করে না এবং তারা সপ্তম আকাশে অবস্থানকারীদের চেয়ে অধিক ভীত থাকে। আবার সপ্তম আকাশের ফেরেশতারা অধিক ভীত থাকে ষষ্ঠ আকাশের ফেরেশতাদের চেয়ে। এভাবে

প্রত্যেক দল সন্ত্রস্ত থাকে তাদের নিম্নে অবস্থিতদের চেয়ে। মুজাহিদ বলেছেন, ফেরেশতাগণ ও আরশের মধ্যে রয়েছে সত্তরটি নূরের পর্দা। হজরত জাবের থেকে মোহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের কোনো একজনের সামান্য অবস্থা বর্ণনা করার অনুমতি আমাকে দেওয়া হয়েছে। সেই ফেরেশতার কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্ব সাতশ' বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। বিশুদ্ধ সূত্রে জিয়া এবং আবু দাউদও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত জাফর ইবনে মোহাম্মদ তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর পিতামহের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, আরশের পায়াগুলোর একটি থেকে অপরটির ব্যবধান হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত উড্ডয়ন-ক্ষমতাসম্পন্ন পাখির তিন হাজার বৎসরের উড়ে যাওয়া পথের দূরত্বের সমান। আরশকে প্রতিদিন সত্তর হাজার রকম রঙের নূরানী পোশাক পরিধান করানো হয়। সে নূরের দিকে দৃষ্টিপাত করার সাধ্য কোনো সৃষ্টজীবের নেই। আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিকে আরশের আওতায় এভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে, এই মহাসৃষ্টি দেখে মনে হয় সুবিশাল প্রান্তরে পড়ে থাকা একটি আংটি। মুজাহিদ বলেছেন, সপ্তম আকাশ ও আরশের মধ্যে রয়েছে সত্তর হাজার সুবিন্যস্ত নূরের ও জুলমতের আবরণ। একটি আলোর, একটি অন্ধকারের। আবার আলোর, আবার অন্ধকারের— এভাবে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেছেন, আরশের চারিদিকে ফেরেশতাদের সত্তর হাজার কাতার রয়েছে। কাতারের পর কাতার, কাতারের পিছনে কাতার, সকলেই আরশের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত। যখন এক কাতার অন্য কাতারের সামনে চলে আসে, তখন এক কাতারের ফেরেশতারা বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্', সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাতারের ফেরেশতারা সমস্বরে বলে ওঠে 'আল্লাহু আকবার'। তাদের পরের কাতার তখন উচ্চস্বরে বলে ওঠে 'আমরা তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, তোমার সত্তা মহান, মহিমময়, তুমিই আল্লাহ্। তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমিই মহান। সকল সৃষ্ট জীব তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে'। পরের কাতারের ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান থাকে। তাদের হাত থাকে গর্দানের দিকে কাঁধের উপর। তাদেরও রয়েছে সত্তর হাজার কাতার। তাদের পিছনের ফেরেশতাদের এক লক্ষ কাতার। তারা দাঁড়িয়ে আছে জোড়হাত করে বিনয়াবনত অবস্থায়। তাদের কারো কারো বাম হাতের উপরে রক্ষিত আছে ডান হাত। সকলেই মশগুল থাকে আল্লাহ্র প্রশংসায় ও জয়গানে। ওই ফেরেশতাদের প্রত্যেকের দুই হাতের মধ্যবর্তী দূরত্ব তিনশ' বৎসরের রাস্তার ব্যবধানের সমান। আর কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্ব

হচ্ছে চারশ' বৎসরের পথের দূরত্বের সমান। যেসকল ফেরেশতা আরশের চারপাশে রয়েছে, তাদের ও আল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে সত্তরটি আগুনের, সত্তরটি নূরের, সত্তরটি অন্ধকারের, সত্তরটি শুভ্র মোতির, সত্তরটি লাল ইয়াকুতের, সত্তরটি সবুজ জমরুদের, সত্তরটি বরফের পাহাড়ের, সত্তরটি স্থির পানির এবং সত্তরটি বৃষ্টির পর্দা। এছাড়াও আরো এমন অনেক পর্দা রয়েছে, যার সংবাদ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আরশ বহনকারী ও আরশের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের গঠনাকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কারো চেহারা ষাঁড়ের মতো, কারো চেহারা বাঘের মতো, কারো চেহারা গাধার মতো এবং কারো চেহারা মানুষের মতো। প্রত্যেকের হাত রয়েছে চারটি করে। তাদের দুই পাখা দিয়ে তারা তাদের মুখমন্ডল এমনভাবে ঢেকে রাখে যেনো আরশের দিকে তাদের দৃষ্টি না যায় এবং তার ফলে যেনো তারা বেহুঁশ হয়ে না পড়ে। এই বিনয় প্রদর্শনের জন্য পাখা দু'টো রাখা আছে নিম্নমুখী করে। আর আল্লাহ্র প্রশংসা, জয়ধ্বনি ও পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা ছাড়া তাদের মুখে আর কোনো কথা নেই।

এখানে 'ইউসাব্বিহূনা' অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করে। 'বিহামদি রব্বিহীম' অর্থ প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সঙ্গে। বায়যাবী লিখেছেন, তসবীহ্কে মূল এবং হামদকে অভিব্যক্তি হিসেবে এজন্যই নির্ণয় করা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের সত্তা হচ্ছে প্রশংসারত থাকার উপযোগী। কিন্তু তসবীহ্ সেরকম নয়। অর্থাৎ হামদ বর্ণনা করা তাদের মৌলিক কর্তব্য।

'ওয়া ইউ'মিনূনা বিহী' অর্থ এবং তাতে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ তারা সর্বান্তঃকরণে এমতো বিশ্বাস রাখে যে, তুমি সতত বিদ্যমান, তুমি চিরঞ্জীব, তুমি সকল কিছুর স্রষ্টা, তুমি এক, একক, অবিভাজ্য ও চির অমুখাপেক্ষী। তুমি কারো পিতা অথবা পুত্র কোনোটাই নও। তোমার সমকক্ষ অথবা অংশীদারও কেউ নয়। উল্লেখ্য, 'তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে' বলে এখানে ফেরেশতাদেরকে অভিহিত করা হয়েছে বিশ্বাসী (মুমিন) বলে। আর এরকম করা হয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশার্থে। আর এই ইঙ্গিতটিকেও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, দাসত্ব (বন্দেগী), অসহায়ত্ব (আজিযি) ও অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাসের দিক থেকে তারাও অন্যান্য সৃষ্টির মতো। অর্থাৎ তারাও একথা বিশ্বাস করে আল্লাহ্ সন্তান-সন্ততি গ্রহণ থেকে পবিত্র। সুতরাং মক্কার মুশরিকদের এই ধারণাটি কিছুতেই ঠিক নয় যে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। আর একথার দ্বারা ওইসকল বিকৃত বিশ্বাসীদের ধারণাও অপসারিত হয়ে যায়, যারা মনে করে আল্লাহ্ আকৃতিবিশিষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষ করো'।

শহর ইবনে হাওশাব বলেছেন, আরশকে ধারণ করে আছে আটজন ফেরেশতা। তাদের মধ্যে চারজন বলে 'হে আল্লাহ্! আমরা তোমার পবিত্রতা

বর্ণনা করি, তোমার প্রশংসা বর্ণনা করি; তুমিই প্রশংসার যোগ্য এজন্য যে, স্বীয় সত্তার মহামহিমত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তুমি কার্যোদ্ধার করো কোমলতার সঙ্গে'। অন্য চারজন ফেরেশতা বলে 'হে আল্লাহ্! তুমি প্রশংসার দাবিদার একথার কারণে যে, সর্বশক্তিধর হয়েও তুমি ক্ষমা করে থাকো'। তিনি আরো বলেছেন, ওই সকল ফেরেশতা হয়তো আদম সন্তানের পাপরাশি অবলোকন করে। তাই তারা তাদের জন্য দয়া ও ক্ষমা কামনার্থে মুহুর্মুহু আল্লাহ্র প্রশংসা করে থাকে।

আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে এই বিষয়টি অবগত হওয়া যায় যে, মানুষ ও ফেরেশতা ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি হলেও 'মুমিন' হওয়ার সূত্রে তারা পরস্পরের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। সেকারণেই তারা মানুষের কল্যাণ কামনা করে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ সকাশে দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করে। এক আয়াতে তাই বলা হয়েছে 'বিশ্বাসীরা পরস্পরের ভাই'।

'তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী' কথাটির মধ্যে 'জ্ঞান' এর পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে 'দয়া'র কথা। এর কারণ হচ্ছে সৃষ্টির জন্য দয়াই অধিক প্রয়োজন। সর্ববিষয়ে দয়াপ্রাপ্তিই তাই তাদের প্রকৃত কাম্য।

'ফাগ্ফির' অর্থ ক্ষমা করো। শব্দটির 'ফা' অক্ষরটি কারণপ্রকাশক। অর্থাৎ আল্লাহ্র সর্বব্যাপী দয়াই হচ্ছে তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির মূল কারণ। 'তাবূ' অর্থ তওবা করে, অবিশ্বাস ও অংশীবাদিতা থেকে ফিরে আসে ইসলামের দিকে। 'ওয়াত্তাবাউ' সাবীলাকা' অর্থ তোমার পথ অবলম্বন করে। অর্থাৎগ্রহণ করে তোমার প্রেরিত পুরুষগণ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমত। 'ওয়াক্বিহিম আ'জাবাল জাহীম' অর্থ এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। একথার মাধ্যমে ইতোপূর্বে প্রার্থিত ক্ষমার দাবিকে করা হয়েছে অধিকতর সংহত। মাতরুফ বলেছেন, মুমিনদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক শুভাকাঙ্খী হচ্ছে ফেরেশতাবৃন্দ এবং সর্বাপেক্ষা অধিক অমঙ্গলকামী হচ্ছে শয়তান।

এরপরের আয়াতে (৮)বলা হয়েছে— 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে দাখিল করো স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছো'।

এখানে 'আদন' অর্থ চিরশান্তিময়। কাতাদা বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত ওমর হজরত কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, বলোতো কা'ব! 'আদন' কী? তিনি জবাব দিলেন আদন হচ্ছে বেহেশতের ভিতরের সোনার মহল, যেখানে চিরকাল বসবাস করবেন নবী ও সিদ্দীকগণ।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও'।

এখানে 'ওয়া মান সলাহা' অর্থ এবং যারা সৎকর্ম করেছে। 'সলাহ্' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় 'ইমান' অর্থে, আমলের শোধন বা শুদ্ধি অর্থে নয়। এখানেও 'যারা সৎকর্ম করেছে' কথাটির মর্মার্থ হবে— যারা ইমান এনেছে। আর ইমানদারেরা যতো বড় পাপীই হোক না কেনো, জান্নাতে প্রবেশ করার অধিকার রাখে। আল্লাহ্পাক তাদেরকে শাস্তি ব্যতীত ক্ষমা করে দিবেন। অথবা ক্ষমা করে

দিবেন তাদেরকে স্বল্পকালীন শাস্তিদানের পর। তখন তারা হবে পরিশুদ্ধ। এরকম পরিশুদ্ধতার কথাই রয়েছে এখানকার 'ওয়ামান সলাহ' কথাটির মধ্যে। আর যদি এখানে 'সলাহ' বলে পুণ্যবান ইমানদারদের কথা বলা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে বলতে হয়, তাদের কথা তো পূর্বের আয়াতের 'অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে' বাক্যটির মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছেই। পুনঃ পুনঃ তাদের কথা উল্লেখের প্রয়োজন তো নেই। সুতরাং বুঝতে হবে আগের আয়াতে বলা হয়েছে পুণ্যবান ইমানদারদের কথা, যারা শাস্তি ব্যতিরেকে অথবা শাস্তি ভোগসহ আল্লাহ্ কর্তৃক ক্ষমাপ্রাপ্ত।

বাগবী লিখেছেন, সা'দ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, বিশ্বাসী ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করবে, আমার পিতা কোথায়? আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়? কোথায় আমার স্ত্রী? ফেরেশতা বলবে, তারা তো আপনার মতো সৎকর্ম করেননি। তাই লাভ করতে পারেননি আপনার মতো সুউন্নত বেহেশত। সে বলবে, আমি তো সৎকর্ম করতাম আমার ও তাদের জন্য। তখন আদেশ ঘোষিত হবে, তাদেরকে এই বেহেশতে প্রবেশ করানো হোক। এই হাদিস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এখানকার 'সলাহ' অর্থ কেবল ইমান। হাদিসটি যেহেতু পরকালের পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট, তাই তা পরিণত পর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও সুপরিণত পদবাচ্য।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। এখানে 'আল আ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, সবার উপরে বিজয়ী ও প্রভাবশালী। অর্থাৎ যার অভিপ্রায় অপ্রতিরোধ্য। আর 'আল হাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করো। সেদিন তুমি যাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে; সেটাই তো মহাসাফল্য'।

এখানে 'আস্সাইয়্যিআত' অর্থ শাস্তি, দণ্ড, দুর্গতি, অথবা মন্দ কর্মের প্রতিফল। আর এখানকার 'তুমি যাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে' কথাটির অর্থ হতে পারে— তুমি যাকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ থেকে। এভাবে এখানকার 'ইয়াওমাইজিন' (সেদিন) কথাটির অর্থ দাঁড়াবে শেষ বিচারের দিন, অথবা এই পৃথিবীর জীবনে।

'ওয়া জালিকা হুয়াল ফাওযুল আ'জীম' অর্থ এটাই তো মহাসাফল্য। অর্থাৎ তোমার দয়া করা কিংবা তোমা কর্তৃক শাস্তি থেকে অব্যাহতি দান, অথবা এ দু'টোই হচ্ছে তোমার বান্দাদের জন্য মহাসফলতা।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ ফেরেশতারা জানে যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে বেহেশত দানের অঙ্গীকার করেছেন। একথাও ভালো করে জানে যে, তাঁর অঙ্গীকারের অন্যথা অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও তারা আবার বিশ্বাসীদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য দোয়া করে থাকে কেনো? প্রসঙ্গত এ প্রশ্নটিও জাগে যে, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর
প্রিয়তম রসুলকে 'মাকামে মাহমুদ' দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্বাসীরা একথা জানা সত্ত্বেও কেনো তাহলে এমতো প্রার্থনা করেন যে, 'হে আল্লাহ্! তুমি তাঁকে উন্নীত করো প্রশংসিত স্থানে'?

জিজ্ঞাসার জবাব ঃ ফেরেশতাদের অন্তরে রয়েছে বিশ্বাসীগণের জন্য ভালোবাসা। তাদের জন্য তারা প্রার্থনা করেন ওই ভালোবাসার টানেই। প্রিয়জনগণের জন্য এমতো কল্যাণকামনা ও প্রার্থনা অতি স্বাভাবিক। আর একথাও বলা বাহুল্য যে, বিশ্বাসীদের নিকটে তাদের প্রিয়তম রসুল প্রাণাধিক প্রিয়। তাঁর জন্য প্রার্থনা তাই তাদের হৃদয়োৎসারিত প্রেম-ভালোবাসাজাত। তাছাড়া আল্লাহ্র প্রিয়ভাজনগণের জন্য প্রার্থনা করলে প্রকৃত অর্থে উপকৃত হয় প্রার্থনাকারীরাই। আবার প্রার্থনা করার বিনিময়ে আল্লাহ্পাক প্রার্থনাকারীদেরকে বঞ্চিত করেন না তাঁর করুণা ও তুষ্টি থেকে। কারণ আল্লাহ্ তাদেরকে তো ভালোবাসবেনই, যারা ভালোবাসে তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩

❑ নিশ্চয় কাফিরগণকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হইবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক— যখন তোমাদিগকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হইয়াছিল আর তোমরা তাহা অস্বীকার করিয়াছিলে।'

❑ উহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রাখিয়াছ এবং দুইবার আমাদিগকে প্রাণ দিয়াছ। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি; এখন নিষ্ক্রমণের কোন পথ মিলিবে কি?'

❑ 'তোমাদের এই শাস্তি তো এইজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্কে ডাকা হইত তখন তোমরা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে এবং আল্লাহ্র শরীক স্থির করা হইলে তোমরা তাহা বিশ্বাস করিতে।' বস্তুত সমুচ্চ, মহান আল্লাহ্রই সমস্ত কর্তৃত্ব।

❑ তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হইতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিয্ক, আল্লাহ্-অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে মহাবিচারের দিবসে উচ্চস্বরে ডেকে বলা হবে, আজ নিজেদের প্রতি তোমরা যেভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছো, পৃথিবীতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অপ্রসন্নতা ছিলো এর চেয়ে বেশী, ওই সময়, যখন তোমাদেরকে বিশ্বাসী হতে বলা হয়েছিলো, আর তোমরা তা করেছিলে প্রত্যাখ্যান।

আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র রয়েছে ৪ সংখ্যক আয়াতের 'কেবল কাফেরেরাই আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে' কথাটির সঙ্গে। এর মধ্যবর্তী বাক্যসমূহ ভিন্ন প্রসঙ্গের।

এখানে 'ইউনাদাওনা' অর্থ উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলা হবে। অর্থাৎ দোজখের শ্রমিক ফেরেশতাগণ তখন উচ্চস্বরে ডেকে বলবে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তখন থাকবে দোজখের ভিতর। নিজ নিজ অপরাধের জন্য তখন তারা হতে থাকবে ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত।

'ইজ তুদ্আ'ওনা ইলাল ঈমানি' অর্থ যখন তোমাদেরকে ইমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিলো। এই বাক্যটির সঙ্গে 'মাক্বতুল্লহ্' (আল্লাহ্র অপ্রসন্নতা) এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা 'মাক্বতু' হচ্ছে এখানে মূল ও উদ্দেশ্য। আর 'আকবার' (সর্বাধিক) হচ্ছে এর বিধেয়। এভাবে বাক্যটি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এভাবে উদ্দেশ্য-বিধেয় মিলিতরূপে বাক্যটি হয়ে গিয়েছে পূর্ণ, তখন এ প্রসঙ্গের সম্পর্ক ওই মূলের সঙ্গে হতে পারে না, যা উল্লেখ করা হয়েছে স্বতন্ত্র যোজকরূপে। এমতাবস্থায় এ বাক্যের সম্পর্ক 'মিন মাক্বতিকুম আনফুসাকুম' (তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ) কথাটির সঙ্গেও হতে পারে না। কেননা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো নিজেদের প্রতি ক্ষোভিত হবে শাস্তিতে বিজড়িত হওয়ার পর, পরকালে। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অপ্রসন্ন পৃথিবীতে। এ কারণে 'যখন তোমাদেরকে ইমানের প্রতি আহ্বান করা হতো' বাক্যটির সম্পর্ক হবে একটি উহ্য

ক্রিয়ার সঙ্গে। যার প্রমাণ হচ্ছে 'মাক্বতুল্লাহ্' (আল্লাহ্র অপ্রসন্নতা) ও 'মাক্বতিকুম' (তোমাদের ক্ষোভ) এর সমকাল একই। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়, শাস্তিগ্রস্ত অবস্থায় তারা একই সঙ্গে শিকার হবে আত্মধিক্কারের এবং আল্লাহ্র অপরিতোষের, কেননা পৃথিবীতে ইমানের আহ্বান শোনা সত্ত্বেও তারা তা অহমিকাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছো এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছো। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন নিষ্ক্রমণের কোনো পথ মিলবে কী'?

হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও জুহাক এখানকার দুই মৃত্যু ও দুই জীবনের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ মানুষকে তাদের আপনাপন পিতার পৃষ্ঠদেশে রাখেন প্রাণহীনভাবে। তারপর মাতৃগর্ভে জীবনদান করে প্রেরণ করেন পৃথিবীতে। পুনরায় প্রাণহীন করেন পৃথিবীর আয়ু শেষ হলে। পুনরায় পুনর্জীবিত করবেন

মহাপুনরুত্থান দিবসে। ব্যাখ্যাটি সমর্থিত এ আয়াত দ্বারা— 'তোমরা ছিলে মৃত(শুক্রবিন্দু হিসাবে) অতঃপর তিনি জীবিত করলেন তোমাদেরকে (তোমাদের মাতৃজঠরে) অতঃপর তিনি মৃত্যু দিবেন তোমাদেরকে (আয়ুষ্কালের পরিসমাপ্তিতে) অতঃপর তিনি পুনর্জীবিত করবেন তোমাদেরকে (পরলোকে)'। সুদ্দী বলেছেন, এই পৃথিবীর জীবন শেষে হয় প্রথম মৃত্যু। তারপর কবরে জীবনদান করে সম্পন্ন করা হয় সওয়াল-জওয়াব পর্ব। তারপর পুনরায় রাখা হয় প্রাণহীন অবস্থায়। আবার সকলকে জীবনদান করা হবে পুনরুত্থানের দিন। এটাই হচ্ছে দুই মৃত্যু ও দুই জীবনের বয়ান। সুদ্দীর এই বিবরণ দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তিনি মনে করেন মৃত্যুর পূর্বে জীবন থাকা জরুরী। পিতৃপৃষ্ঠের শুক্রকণা যেহেতু জীবন্ত নয়, তাই জীবনের সূচনা হয় মাতৃগর্ভ থেকে। তাই তিনি প্রথম জীবন ধরেছেন পৃথিবীর জীবনকে। সুদ্দীর এই ধারণাটি ভুল। কেননা এখানে 'আমাত্তানা' অর্থ মৃত্যু নয়, প্রাণহীনতা। অর্থাৎ কাউকে নিষ্প্রাণ অবস্থায় রাখা, তা শুরুতেই হোক, অথবা জীবনদানের পর জীবন হরণ করে। যেমন বলা হয়— 'পবিত্র সেই আল্লাহ্, যিনি মশাকে ক্ষুদ্রাকারে এবং হাতীকে বৃহদাকারে সৃষ্টি করেছেন'। কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, প্রথমে মশা বৃহদাকারে এবং হাতী ক্ষুদ্রাকারে ছিলো, পরে মশাকে করে দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র এবং হাতীকে বৃহৎ। এখন অবশিষ্ট রইলো কবরে জীবিত করার বিষয়টি। কবরের জীবন তো পৃথিবী অথবা পরকাল কোনো জীবনের মতো নয়। বরং ওই জীবন হচ্ছে মধ্যবর্তী (বরজখী) জীবন। আর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সেখানকার জীবনকে যদি জীবন হিসেবে স্বীকারও করা হয়, তবে বুঝতে হবে ওই জীবন তো দেওয়া হবে কেবলই শাস্তি প্রদানের জন্য। আর তিনি যে বলেছেন, জিজ্ঞাসাবাদের পর পুনরায় কিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে রাখা হবে মৃত অবস্থায়— একথাটিও ঠিক নয়। কারণ তা প্রকৃত অবস্থার পরিপন্থী। হাদিস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, কবরে তাদের শাস্তি হতেই থাকবে।

'ফা'তারাফনা বিজুনূবিনা' অর্থ আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। এখানকার 'ফা' কারণসূচক। অর্থাৎ দ্বিতীয় মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবনকে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়ার কারণেই তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে তাদের অপরাধ।

'ফাহাল ইলা খুরূজিম্ মিন সাবীল' অর্থ এখন নিষ্ক্রমণের কোনো পথ মিলবে কী? অর্থাৎ কোনো রকমে একবার কোনো না কোনো উপায়ে আমরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবো কী? বক্তব্যটি হবে তাদের আক্ষেপ সূচক। অর্থাৎ আহা এমন যদি হতো।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তোমাদের এই শাস্তি তো এ জন্য যে, যখন এক আল্লাহ্কে ডাকা হতো তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহ্র শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে'। একথার অর্থ— তাদেরকে তখন আরো বলা হবে, না, এ শাস্তি থেকে তোমরা কখনোই মুক্ত হতে পারবে না। সুতরাং পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের কল্পনা পরিত্যাগ করো। আর

শোনো, এই অনন্ত শাস্তিতে তোমাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে এজন্য যে, যখন তোমাদের সম্মুখে মহাসত্যের বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' উচ্চারিত হতো, তখন তোমরা তা অমান্য করতে, অথচ সাদরে বরণ করে নিতে অংশীবাদিতাকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুত সমুচ্চ, মহান আল্লাহ্রই সমস্ত কর্তৃত্ব'। একথার অর্থ— হে দোজখীরা, ভালো করে শুনে নাও, আল্লাহ্ তোমাদের অংশীবাদিতাদুষ্ট অপবিত্র ধারণা অপেক্ষা অতি উচ্চ, অতীব মহান। সকলের এবং সকলকিছুর উপর সর্বময় কর্তৃত্ব কেবল তাঁর। সেকারণেই তো তিনি তোমাদেরকে নিপতিত করেছেন মর্মন্তুদ শাস্তিতে, যা পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্ ব্যতীত আর যদি কেউ উপাস্য থাকতো তাহলে সে তোমাদেরকে উদ্ধার করতো এ শাস্তি থেকে। কেউ অথবা কোনোকিছুই তোমাদেরকে এ শাস্তি থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ থেকে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিজিক'। একথার অর্থ— তাঁর এককত্বের যাবতীয় দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন তোমাদেরকে। আরো তিনি দেখিয়েছেন সেগুলিকে, যেগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। তিনিই তো তোমাদের আল্লাহ্, তোমাদের জীবনোপকরণদাতা। তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন। ফলে সঞ্জীবিত হয় মৃত্তিকা। উৎপন্ন হয় কতো বিচিত্র বর্ণের, গন্ধের ও স্বাদের ফল-মূল-শাক-সবজী ও ফসল। ওগুলোই তো তোমাদের অত্যাবশ্যক জীবনোপকরণ। এগুলোও তো তাঁর এককত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং স্বচক্ষে এসকল কিছু প্রত্যক্ষ করার পর আপত্তি উত্থাপন করতে পারবে কীভাবে?

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে'। একথার অর্থ— শুভ উপদেশকে মান্য করে সেই ব্যক্তিই, যে সতত মনোনিবদ্ধ রাখে কেবল আল্লাহ্র প্রতি। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জীবনোপকরণের আয়োজন ইত্যাকার নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে পথপ্রাপ্ত হতে পারে কেবল তারাই, যারা হঠকারিতা, একগুঁয়েমি ও অহংকারমুক্ত মনে মনোযোগী হয়ে যায় কেবল আল্লাহ্র দিকে।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

❑ সুতরাং আল্লাহ্কে ডাক তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া, যদিও কাফিররা ইহা অপসন্দ করে।

❑ তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, 'আরশের অধিপতি, তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে।

❑ যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে সেদিন আল্লাহ্র নিকট উহাদের কিছুই গোপন থাকিবে না। আজ কর্তৃত্ব কাহার? আল্লাহ্রই, যিনি এক, পরাক্রমশালী।

❑ আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে; আজ কোন যুলুম করা হইবে না। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

❑ উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ-কষ্টে উহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরংগ বন্ধু নাই, যাহার সুপারিশ গ্রাহ্য হইবে এমন কোন সুপারিশকারীও নাই।

❑ চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যাহা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

❑ আল্লাহ্ই বিচার করেন সঠিকভাবে। আল্লাহ্র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে তাহারা বিচার করিতে অক্ষম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল ও তাঁর উম্মত! তোমরা শুনলে তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম হবে কতো ভয়াবহ। সুতরাং তোমরা কোনোদিকে আর দৃকপাত না করে মগ্ন হও এক আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ইবাদতে, যদিও তা হয় তাদের কাছে তিক্ত, অনভিপ্রেত। অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদের নিবিষ্টচিত্ত উপাসনা সকল যুগের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যনকারীদেরকে করে ক্ষুব্ধ ও অপ্রসন্ন।

পরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে'।

'রফিউ'দ্ দারাজ্বাত' অর্থ তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ তাঁর মর্যাদার পূর্ণত্ব অত্যন্ত উন্নত, অতীব মহান, যার সমান্তরাল অন্য কারো পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, কথাটির অর্থ তিনি তাঁর নবী ও ওলীগণকে তাঁদের নৈকট্যের স্তরানুসারে বেহেশতে উচ্চ-উচ্চতর মর্যাদা প্রদান করবেন।

'জুল আ'রশ' অর্থ আরশের অধিপতি। 'ইউল্ক্বির রূহা' অর্থ ওহী বা প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, 'ওহীকে' এখানে বলা হয়েছে 'রূহ'। কেননা 'রূহ' বা আত্মা দ্বারা যেমন শরীর জীবিত হয়, তেমনি প্রত্যাদেশ দ্বারা জীবিত হয় মৃত আত্মা।

'মিন্ আম্‌রিহী' অর্থ স্বীয় আদেশে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'আদেশ' অর্থ 'অনুগ্রহ'। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তিনি নিজ অনুগ্রহে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন। এমতাবস্থায় এখানকার 'মিন্' হবে সূচনামূলক। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বর্ণনামূলক। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে আল্লাহ্‌র তিনটি বিশেষ গুণ— সমুচ্চ মর্যাদাধারী, আরশাধিপতি এবং প্রত্যাদেশপ্রদাতা। শেষোক্ত গুণটি আবার নবুয়তের পদমর্যাদার উপক্রমণিকাও বটে।

'লিইউন্‌জিরা ইয়াওমাত্ তালাক্ব' অর্থ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে। এখানে 'লিইউন্‌জিরা' এই কর্তৃকারক সর্বনামটি সম্পৃক্ত রয়েছে আল্লাহ্, ওহী অথবা 'যার প্রতি ইচ্ছা', অর্থাৎ নবীগণের সঙ্গে। শেষোক্তটিকে গ্রহণ করলে এখানকার বক্তব্যটি হতে পারে অধিকতর স্পষ্ট ও বোধগম্য। আর 'ইউন্‌জিরা' এর কর্মকারক এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ব্যাপকভিত্তিক আহ্বানকর্মের দিকে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীগণ যেনো সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানান।

'ইয়াওমাত্ তালাক্ব' অর্থ কিয়ামত দিবস। অর্থাৎ যেদিন আকাশ-পৃথিবীসহ সকল সৃষ্টিকে একত্র করা হবে। মুকাতিল ও কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ পরস্পর সাক্ষাতের দিন। অর্থাৎ সেই দিন, যেদিন সাক্ষাতকার ঘটবে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। মায়মুন ইবনে মেহরান বলেছেন, যেদিন সমবেত হবে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত এবং অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীরা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— যেদিন উপস্থিত করা হবে মূর্তিপূজকদেরকে তাদের মূর্তিগুলোর সঙ্গে। কেউ কেউ আবার অর্থ করেছেন—প্রত্যেককে মিলিত করা হবে সেদিন তাদের নিজ নিজ কর্মফলের সঙ্গে।

হাকেম, ইবনে যোবায়ের, যোবায়ের ইবনে আবী হাতেম এবং ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস একবার 'যেদিন আকাশসমূহ মেঘমালাসহ চৌচির হয়ে যাবে' এই আয়াত পাঠ করলেন। তারপর বললেন, মহাবিচারের দিবসে একটি সুবিশাল প্রান্তরে আল্লাহ্ তাঁর সকল সৃষ্টিকে সমবেত করবেন। ওই সমাবেশে থাকবে মানুষ, জ্বিন, জন্তু-জানোয়ার, পাখি-পতঙ্গ সকলেই। তারপর নিম্নতম আকাশ বিদীর্ণ হবে। ওই আকাশের বাসিন্দারা নিচে

নেমে যাবে। তাদের সংখ্যা হবে জ্বিন ও মানুষের সম্মিলিত সংখ্যার চেয়ে বেশী। হাদিসটি সুদীর্ঘ। এর পরে ওই হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে অন্যান্য আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, আল্লাহ্‌র আনুরূপ্যবিহীন দ্যুতিচ্ছটার প্রকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে। হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে সুরা বাক্বারার তাফসীরের যথাস্থানে।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না'। একথার অর্থ যেদিন মানুষ তাদের আপনাপন কবর থেকে পুনরুত্থিত হবে, সেদিন তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ্ সকাশে। আত্মগোপন করার উপায় তখন তাদের থাকবেই না। সামনে থাকবে না কোনো পাহাড়-পর্বত-টিলা-অট্টালিকার আড়াল। দেহের পর্দাও গোপন রাখতে পারবে না তার আত্মাকে। কথাটির উদ্দেশ্য এরকম হতে পারে যে, তখন গোপন থাকবে না অপরাধীদের ব্যক্তিক, অবয়বিক ও পরিস্থিতি সংক্রান্ত কোনো বিষয়। এখানে 'তাদের কিছুই গোপন থাকবে না' বাক্যটি পূর্বের বাক্যের (যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে) এর সমার্থকও বটে এবং এভাবে পৃথিবীবাসীদের গোপনীয়তা সংক্রান্ত ধারণাকেও বিদূরিত করা হয়েছে পুরোপুরিভাবে।

এরপর বলা হয়েছে— 'আজ কর্তৃত্ব কার? আল্লাহ্‌রই, যিনি এক, পরাক্রমশালী'। একথার অর্থ— সকল সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাঁর অতুলনীয় মহাপরাক্রমের প্রকাশ যখন তিনি ঘটাবেন, তখন বলবেন, কর্তৃত্ব আজ কার? যেহেতু জবাব দেওয়ার মতো তখন কেউই থাকবে না, তাই তাঁর এমতো প্রশ্নের জবাব দিবেন তিনি নিজে। বলবেন, আল্লাহ্‌রই, যিনি এক, মহাপরাক্রমশালী।

'আল ওয়াহিদ' অর্থ এক, একক, একাকী, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য। উল্লেখ্য, তিনি এক ও একক যেমন তাঁর সত্তায়, তেমনি গুণবত্তায়, তেমনি কার্যকলাপেও। কোনো কিছুতেই কেউ তাঁর অংশী অথবা সমকক্ষ নয়। আর 'ক্বাহ্‌হার' অর্থ মহাপরাক্রমশালী। অর্থাৎ তিনি সকলের ও সকলকিছুর উপরে প্রভাবশালী, বিজয়ী। তিনি সকলকিছুর উপরে যে কোনোভাবে শক্তিপ্রয়োগ করতে পারেন। সৃষ্টির অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়নির্ভর। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এ সম্পর্কে সুপরিণত পর্যায়ের একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন তিবরানী, আবুল আলিয়া ও বায়হাকী। আরো কিছুসংখ্যক ব্যক্তিও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

হজরত আবু সাঈদ থেকে আবু দাউদ তাঁর 'আল বাআ'স গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন জনৈক ঘোষক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবে, হে মানবজাতি! এখন তোমাদের উপর সেই সময় সমুপস্থিত। তার ওই ঘোষণা নিকটবর্তী দূরবর্তী সকলেই শুনতে পাবে। এরপর নিকটতম আকাশে মহাআড়ম্বরে অবতরণ করবেন আল্লাহ্। তখন আর এক ঘোষক ঘোষণা করবে, এখন কার আধিপত্য? কার শাসন? তারপর নিজেই জবাবে বলবে, কেবল আল্লাহ্র, যিনি আনুরূপ্যবিহীনরূপে এক এবং অতুলনীয়রূপে মহাপরাক্রমশালী।

'নুফিখা ফিস্সূর' আয়াতের ব্যাখ্যায় সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, তখন তিন জন ফেরেশতা বেহুঁশ

হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। তাঁরা হচ্ছেন— জিবরাইল, মিকাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও আজরাইলকে বলবেন, হে মৃত্যুদূত! এখন কে কে রয়েছে অবশিষ্ট? আজরাইল বলবেন, তোমার মহামহিম সত্তা। আর তোমার বান্দা জিবরাইল, মিকাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ আদেশ দিবেন, মিকাইলের প্রাণ সংহার করো। তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করবেন তিনি। আল্লাহ্ পুনঃ প্রশ্ন করবেন, এখন? আজরাইল বলবেন, তোমার পবিত্রতম সত্তা। আর তোমার বান্দা জিবরাইল ও আজরাইল। আল্লাহ্ বলবেন জিবরাইলের জীবনাবসান ঘটাও। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ কার্যকর করবেন তিনি। আল্লাহ্ বলবেন, এবার? আজরাইল উত্তর দিবেন, তোমার পাক জাত। আর তোমার মৃত্যুভয়ে তটস্থ বান্দা আজরাইল। আল্লাহ্ আদেশ করবেন, মরে যাও। সঙ্গে সঙ্গে আজরাইল মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আল্লাহ্ বলতে থাকবেন, আমিই মহাসৃষ্টির স্রষ্টা। পুনরায় সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করবো আমিই। আজ অত্যাচারী-অহংকারীরা সব কোথায়? আজ হুকুমত কার? জবাব দেওয়ার মতো তখন কেউই অবশিষ্ট থাকবে না। তাই তিনি নিজেই বলবেন, আল্লাহ্রই, যিনি এক, পরাক্রমশালী। পরে পুনরায় শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তখন পুনরুত্থিত হবে সকলে।

আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কবর থেকে সকলকে বের করার পর আল্লাহ্ বলবেন 'আজ কর্তৃত্ব কার'। অর্থাৎ তখন তাঁর সকল সৃষ্টির অসহায়ত্বকেই এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে এভাবে। অথবা বলা যেতে পারে, তখন সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ থাকবে ধ্বংসের আড়ালে। থাকবে না সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার যোগাযোগের কোনো মাধ্যমও। ফলে দৃশ্যত দণ্ডদাতা বা শাসকদের অস্তিত্বও হবে অবলুপ্ত। ওই অবস্থাকেই চিত্রিত করা হয়েছে এখানে। নতুবা এ জগতেও প্রকৃত কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই। তাঁর কর্তৃত্বমুক্ত কোনো সৃষ্টির অস্তিত্বই নেই। থাকা সম্ভবও নয়।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে, আজ কোনো জুলুম করা হবে না'।

এখানে 'আল ইয়াওমা' অর্থ আজ, এই দিনে, এই মহাবিচারের দিবসে, যখন আল্লাহ্ ছাড়া রূপকার্থক কর্তৃত্ব বলেও কারো কোনোকিছু থাকবে না। আর 'আজ কোনো জুলুম করা হবে না' অর্থ আজ কারো প্রতি যৎকিঞ্চিত অবিচারও করা হবে না। বিন্দুবৎ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো হবে না কারো পাপ-পুণ্যের।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র ইচ্ছায় এই দুনিয়ার অর্ধদিবস সময়কালের মধ্যেই সমাপ্ত হবে সেদিনের হিসাব-নিকাশ পর্ব, যদিও তিনি সবকিছু সম্পন্ন করার ক্ষমতা রাখেন মুহূর্তাংশের মধ্যে। কিন্তু এমন কোনো ব্যস্ততাও তাঁর নেই, যা তাঁর কর্মের প্রতিবন্ধক। তাই তিনি মুহূর্তমধ্যে নয়, সকলের হিসাব নিকাশ শেষ করবেন এই দুনিয়ার অর্ধদিবস পরিমাণ সময়-পরিসরের মধ্যে। আর তিনি অবসাদ-ক্লান্তি থেকে চিরমুক্ত, সেকথাটিকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর'।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখকষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে সেই ভয়ংকর দিবস সম্পর্কে সাবধান করে দিন, যেদিন কণ্ঠদেশে উঠে আসতে চাইবে হৃৎপিণ্ড। দম বন্ধ হবার উপক্রম হবে ভয়ে-আতংকে-দুশ্চিন্তায়। এখানে 'প্রাণ কণ্ঠাগত' অর্থ হৃৎপিণ্ড তার আপন স্থান ত্যাগ করে উঠে আসবে কণ্ঠদেশে। আটকে থাকবে সেখানেই। ফলে তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত অস্বস্তিদায়ক। হৃৎপিণ্ড নিচে নামবে না, যাতে তারা আরাম পায়, অথবা বাইরেও বেরিয়ে যাবে না, যাতে ঘটতে পারে মৃত্যু। আর এখানকার 'কাজিমীন' শব্দটির অর্থ দুঃখ-কষ্ট, অস্থিরতা-ভয়-দুশ্চিন্তা, যা অসহনীয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'জালেমদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোনো সুপারিশকারীও নেই'। এখানে 'জালেম' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফের।

'হামীম' অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এখানকার 'যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোনো সুপারিশকারীও নেই' কথাটির অর্থ এরকম নয় যে, তাদের জন্য কেউ তখন সুপারিশ করবে, অথচ তা গৃহীত হবে না। বরং কথাটির অর্থ হবে— তাদের জন্য

তখন সেখানে সুপারিশকারী থাকবেই না। সুতরাং এখানে 'ইউত্বউ' বিশেষণটির কোনো কার্যকারিতাই নেই। অথবা বলা যেতে পারে, এখানে বিশেষণটি বসানো হয়েছে অংশীবাদীদের লালিত বিশ্বাসের আনুকূল্য বজায়ার্থে। কেননা, পূজিত প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, এটাই ছিলো তাদের বিশ্বাস। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়বে— তাদের অপবিশ্বাসানুসারে যদি তখন তাদের পক্ষের কোনো সুপারিশকারী থাকেও, তবুও তাদের সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত'।

'খায়িনাতাত্ আয়য়ুনি' অর্থ চক্ষুর অপব্যবহার, দৃষ্টির চৌর্যতা। 'খায়িনাতা' হচ্ছে এখানে কর্তৃকারক, কর্তৃপদীয় শব্দরূপ। এর বিশেষ্য রয়েছে অনুক্ত। অর্থাৎ আত্মসাৎকারী দৃষ্টি। যেমন গোপনে নিষিদ্ধ কিছু অবলোকন করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত। অথবা ধাতু মূল 'খায়িনাহ্'। যেমন 'আ'ফীয়াহ্' অর্থাৎ চোখের কুদৃষ্টির কথাও আল্লাহ্ জানেন।

'ওয়ামা তুখ্ফিস্ সুদূর' অর্থ অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। কেউ কেউ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— কোনো সুন্দরী রমণীকে কুদৃষ্টিতে দেখার পর অন্তরে লালিত কাম-লালসার কথাও আল্লাহ্‌র অজানা নয়।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই বিচার করেন সঠিকভাবে। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা বিচার করতে অক্ষম'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই সকলের স্রষ্টা, পালক। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর, ন্যায়বিচারক।

সকলের ও সকলকিছুর প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুই তাঁর জানা। তাই সঠিকভাবে বিচার-মীমাংসা করতে পারেন কেবল তিনিই। অন্যদের এসকল গুণ যেহেতু নেই, তাই তারা সঠিক বিচার করতে অক্ষম। এখানে 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে' অর্থ প্রতিমা, শয়তান অথবা প্রবৃত্তিপূজক কোনো শাসক। বিচার করার যোগ্যতাই তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'। একথা আগের বাক্যের 'চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি জানেন' কথাটির পরিপোষক। তাছাড়া এ কথার মধ্যে রয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তিদানের প্রচ্ছন্ন অঙ্গীকারও। আর তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের শরণাপন্ন হয়, তাদের বিচার-যোগ্যতার অন্তরায়ও সৃষ্টি করা হয়েছে আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে। পরোক্ষভাবে একথা বলেই দেওয়া হয়েছে যে, তারা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা যেহেতু নয়, তাই বিচার করার যোগ্যতাও তাদের নেই।

সূরা মু'মিনঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭

❑ ইহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করিলে দেখিত— ইহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল। পৃথিবীতে উহারা ছিল ইহাদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন উহাদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহ্র শাস্তি হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

❑ ইহা এইজন্য যে, উহাদের নিকট উহাদের রাসূলগণ নিদর্শনসহ আসিলে উহারা তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

❑ আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম,

❑ ফির'আওন, হামান ও কারূনের নিকট। কিন্তু উহারা বলিয়াছিল, 'এই লোকটা তো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।'

❑ অতঃপর মূসা আমার নিকট হইতে সত্য লইয়া উহাদের নিকট উপস্থিত হইলে উহারা বলিল, 'মূসার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

❑ ফির'আওন বলিল, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাইবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে।'

❑ মূসা বলিল, 'যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি হইতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— মক্কার এই অংশীবাদীরা কি দেশ বিদেশে ভ্রমণ করে না? ভ্রমণ করলে তো স্বচক্ষে দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তী আদ-ছামুদ ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর বিরাণ জনপদসমূহ। তারা তো ছিলো এদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও কীর্তিমান। কিন্তু তারা তাদের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত নবীগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। সেই অপরাধে আল্লাহ্ তাদের উপরে আপতিত করেছিলেন ধ্বংসাত্মক শাস্তি। যেমন মহাপ্লাবন, জীবন-সংহারক মহানাদ, প্রস্তর-বৃষ্টি ইত্যাদি। ফলে পৃথিবী থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে তারা। বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাদের কীর্তিচিহ্নসমূহ। আল্লাহর ওই সকল মহাশাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে, এরকম ত্রাণকর্তাও তাদের ছিলো না। আল্লাহ্র মহা অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সেরকম কোনো ত্রাণকর্তার উপস্থিতি তো সম্ভবও নয়।

এখানে 'আওয়া লাম ইয়াসীরু ফীল আরদ্ব' অর্থ তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে না? বক্তব্যটির সংযোগ রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ততাসহ

পুরো অর্থ দাঁড়ায়— তারা কি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অশুভপরিণতির কথা অবিশ্বাস করে? তাহলে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলোর অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আসে না কেনো?

'কুওওয়াতা' অর্থ শক্তি, প্রতিপত্তি। 'আছারন ফীল আরদ্ব' অর্থ কীর্তিতে প্রবলতর। অর্থাৎ দুর্গ, প্রাসাদ, প্রাচীরবিশিষ্ট সুরক্ষিত শহর ইত্যাদি কীর্তিতে তারা ছিলো অত্যন্ত প্রতাপশালী। 'ফা আখজাহুমুল্লহু বিজুনুবিহিম' অর্থ অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের জন্য। আর 'ওয়ামা কানা লাহুম মিনাল্লহি মিঁউওয়াক' অর্থ এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করবার কেউ ছিলো না।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— এটা এজন্য যে, তাদের নিকট তাদের রসুলগণ নিদর্শনসহ এলে তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর। এখানে 'আল বাইয়্যিনাত' অর্থ অলৌকিক নিদর্শনসমূহ, সেই সকল নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাসমূহ, যা শুভ ও কল্যাণকর। 'ক্বিভিউন' অর্থ শক্তিশালী, পূর্ণ ক্ষমতাবান, অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম করতে পূর্ণরূপে সক্ষম।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি আমার স্পষ্ট প্রমাণসহ মুসাকে প্রেরণ করেছিলাম (২৩), ফেরাউন, হামান ও কারুনের নিকট। কিন্তু তারা বলেছিলো, এই লোকটা তো যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী'(২৪)।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণ বলেছেন, এখানকার 'আয়াতিনা' (নিদর্শন) অর্থ ওই নয়টি মোজেজা বা অলৌকিকত্ব, যা আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুসাকে দিয়েছিলেন। আর 'সুলত্বনিম্ মুবীন' (স্পষ্ট প্রমাণ) অর্থ বিশেষ কোনো অলৌকিকত্ব— যেমন তাঁর যষ্টি। প্রথম অবস্থায় 'আয়াত' ও 'সুলত্বনিম্ মুবীন' পৃথক এবং দ্বিতীয় অবস্থায় 'সুলতানিম্ মুবীন'ও 'আয়াতে'র অন্তর্ভূত।

যেহেতু তাঁর কোনো কোনো অলৌকিকত্ব (যেমন যষ্টি, শুভ্রোজ্জ্বল হাত) বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিলো, তাই প্রথমে সাধারণভাবে সবগুলোর কথা উল্লেখ করার পরে ঘটানো হয়েছে বিশেষ অলৌকিকত্বের সংযোজন।

'ফা ক্বলু সাহিরুন' অর্থ তারা বলেছিলো, লোকটা তো এক যাদুকর। আর 'কাজ্জাবুন' অর্থ মিথ্যাবাদী। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে রসুলেপাক স. এর জন্য রয়েছে সান্ত্বনার বাণী। জনান্তিকে যেনো বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা 'যাদুকর' 'মিথ্যাবাদী' ইত্যাদি বলে আপনাকে উত্যক্ত করে। এতে করে আপনি ব্যথিত হবেন না। কেননা সকল যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যাকারীদের স্বভাব এরকমই। ইতোপূর্বে আপনার পূর্বসূরী রসুল মুসাকে তারা এরকমই বলেছিলো। আর তারা ছিলো এদের চেয়ে অনেক বেশী প্রতাপশালী। তৎসত্ত্বেও তাদের পরিণতি হয়েছিলো অত্যন্ত অশুভ। সুতরাং আপনিও এব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আপনার প্রতিপক্ষীয়রাও যথাসময়ে হবে ভয়ংকর পরিণতির শিকার— ইহকালে ও পরকালে।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর মুসা আমার নিকট থেকে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা বললো, মুসার সঙ্গে যারা ইমান এনেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখো। কিন্তু কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই'। একথার অর্থ— অতঃপর যখন নবী মুসা তাদের কাছে সত্য ধর্মের মহান বাণী নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন ফেরাউনের অনুসারীরা হলো মহাক্ষিপ্ত। বললো, মুসার জন্মের প্রাক্কালে যেমন বনী ইসরাইলদের শিশুপুত্রদেরকে হত্যা করা হতো এবং খেদমতের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হতো তাদের শিশুকন্যাদেরকে, সেই নিয়মটি তোমরা আবার চালু করো। যাতে মুসার অনুসারীদের দল শক্তিশালী না হতে পারে। আমি বললাম, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কখনো সফল হয় না। কারণ তা আমার অভিপ্রায়ানুকূল নয়। সুতরাং তারা ব্যর্থ হবেই।

এখানে 'দ্বলাল' অর্থ ব্যর্থ, নিষ্ফল, অকৃতকার্য।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে, অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে'।

বাগবী লিখেছেন, ফেরাউন 'আমাকে ছেড়ে দাও' এরকম বলেছিলো এজন্য যে, নিশ্চয় তার মন্ত্রকদের কেউ তাকে একাজে বাধা দিয়েছিলো। কারণ সে বুঝেছিলো, সিদ্ধান্তটি ধ্বংসাত্মক। ফেরাউনকে সে একথাই বুঝাতে চেয়েছিলো যে, মুসা হচ্ছে মস্তবড় যাদুকর। আপনি যদি তাকে হত্যা করেন, তবে লোকে ভাববে যাদু প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হওয়ার ফলেই আপনি পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলবার জন্য অনর্থক মুসাকে হত্যা করেছেন। ফলে একারণে জনবিক্ষোভও তো দেখা দিতে পারে।

বায়যাবী লিখেছেন, ফেরাউনের উদ্ধৃত উক্তি দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, সে হজরত মুসাকে ভিতরে ভিতরে সত্য পয়গম্বর বলে জানতো। তাই সে তাঁকে হত্যা করতে ভয় পাচ্ছিলো। অথবা সে বুঝতে পেরেছিলো হজরত মুসাকে হত্যা করা তার পক্ষে সহজ নয়। এরকম উদ্যোগ ব্যর্থ হবেই। তাই সে একথাও বলেছিলো যে 'সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক'। এরকম বলে সে তার দ্বিধাদ্বন্দ্বকে কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলো। অর্থাৎ তার অন্তর্গত দুর্বলতা দূর করতেই সে এরকম বলতে চেয়েছিলো যে, মুসাকে তার প্রতিপালক সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেও আমি তার পরওয়া করি না। আর 'আমাকে ছেড়ে দাও' কথাটি ছিলো বাকচাতুর্য। সে জনসাধারণকে একথাই বুঝাতে চাইছিলো যে, তাকে তার সঙ্গীসাথীরাও বাধা দিচ্ছে। নতুবা মুসাকে বধ করা তার জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিলো ভিন্ন। হজরত মুসার হস্তধৃত যষ্টির অলৌকিকত্ব তাকে ভিতরে ভিতরে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ফেলেছিলো।

এখানে 'ইন্নী আখাফু আঁইইয়ুবাদ্দিলা দীনাকুম' অর্থ আমি আশংকা করি, সে তোমাদের ধর্মাদর্শের পরিবর্তন ঘটাবে। আর 'আও আঁই ইউজহিরা ফীল্ আরদ্বিল ফাসাদ' অর্থ অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'মুসা বললো, যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হচ্ছি'।

এখানে 'ইন্নী' (নিশ্চয়) শব্দটি গুরুত্বপ্রকাশক। বাক্যের শুরুতে একথা বসানো হয়েছে এই বিষয়টিকেই পরিস্ফুট করার জন্য যে, সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও পাপ পরিহার করার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে কায়মনোবাক্যে কেবল আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ। আর ওই সঙ্গিন অবস্থায় হজরত মুসার নিরাপত্তার উপরে নির্ভরশীল হওয়া তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য যেহেতু শিক্ষামূলকও ছিলো, তাই 'আমার' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে 'তোমাদের'। অর্থাৎ এখানে হজরত মুসার 'আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হচ্ছি' কথাটির মধ্যে তাঁর অনুসারীদের জন্য এই উপদেশটিও নিহিত রয়েছে যে, তোমরাও উদ্ভূত বিপদ থেকে মুক্তির জন্য এভাবে আমার সঙ্গে আল্লাহ্র শরণ গ্রহণ কোরো। উল্লেখ্য, এরকম সম্মিলিত প্রার্থনাই অধিক ফলপ্রসূ হয়।

উল্লেখ্য, হজরত মুসা এখানে ফেরাউনের নাম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি। বরং সাধারণভাবে পরকালে অবিশ্বাসী সকল অহংকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র শরণ যাচনা করেছেন। এতে করে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরাউনের ধ্বংসের কারণ দু'টি— পরকালে অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্য বা অহংকার। আবার এখানকার 'রব্বিকুম' (প্রতিপালক) অর্থ কেবল হজরত মুসা ও তাঁর অনুসারীদের প্রতিপালক নয়। বরং ফেরাউন ও তার অনুসারীদের প্রতিপালকও। অর্থাৎ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের প্রভুপালনকর্তা হচ্ছেন এক আল্লাহ, অন্য কেউ নয়, অবিশ্বাসীরা একথা না মানলেও।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

❑ ফির'আওন বংশের এক ব্যক্তি, যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখিত, বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্,' অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে

সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছে? সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হইবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদিগকে যে শাস্তির কথা বলে, তাহার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হইবেই।' নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আসিয়া পড়িলে কে আমাদিগকে সাহায্য করিবে?' ফির'আওন বলিল,'আমি যাহা বুঝি, আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। আমি তোমাদিগকে কেবল সৎপথই দেখাইয়া থাকি।'

❑ মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি—

❑ 'যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, 'আদ, ছামূদ এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে। আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করিতে চাহেন না।

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের,

❑ 'যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিতে চাহিবে। আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই।'

❑ পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ আসিয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে তোমাদের নিকট যাহা লইয়া আসিয়াছিল তোমরা তাহাতে বারবার সন্দেহ পোষণ করিতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'তাহার পরে আল্লাহ্ আর কোন রাসূল প্রেরণ করিবেন না।' এইভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদিগকে—

❑ যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তাহাদের এই কর্ম আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন।

❑ ফির'আওন বলিল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাহাতে আমি পাই অবলম্বন—

❑ 'অবলম্বন আসমানে আরোহণের, যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহ্‌কে; তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।' এইভাবে ফির'আওনের নিকট শোভনীয় করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে এবং তাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল সরল পথ হইতে এবং ফির'আওনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন যখন নবী মুসাকে হত্যা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো, তখন ফেরাউনের বংশের এক লোক ফেরাউন ও তার অন্ধ সমর্থকদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, একাজ করা ঠিক হবে না। তিনি ছিলেন মু'মিন। কিন্তু তখন পর্যন্ত তিনি প্রকাশ্যে তাঁর বিশ্বাসের ঘোষণা দেননি।

তিনি বললেন, একজন লোক বলছে যে, তার প্রভুপালক আল্লাহ্ এবং সে তার দাবির সমর্থনে সুস্পষ্ট প্রমাণও প্রদর্শন করেছে। অথচ তোমরা তাকে বলছো মিথ্যাবাদী। ঠিক আছে, মিথ্যাবাদী যদি সে হয়েই থাকে তবে সেজন্য তো সে-ই দায়ী হবে। তোমাদের তাতে কী? কিন্তু যদি সে সত্যবাদী হয়, তখন তোমাদের পরিণতি কী হবে, তা কি ভেবে দেখেছো? সে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু অংশও যদি তোমাদের উপরে নেমে আসে, তবুও তোমরা কেউই আত্মরক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা ক্ষান্ত হও। বাড়াবাড়ি কোরো না। যারা বাড়াবাড়ি করে এবং অসত্য কথা বলে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো সৎপথে পরিচালিত করেন না।

মুকাতিল ও সুদ্দী বলেছেন, ওই মুমিন ব্যক্তির নাম ছিলো কিবতী। তিনি ছিলেন ফেরাউনের পিতৃব্যপুত্র। সুরা আলকিসাসের একস্থানেও তাঁর প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন বলা হয়েছে 'এ সময় শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এলো'। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁর নাম ছিলো হাবীব। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, তিনি ছিলেন বনী ইসরাইল বংশোদ্ভূত এবং তাঁর নাম ছিলো 'জযইল'। হজরত ইবনে আব্বাস এবং অধিকাংশ আলেম এরকমই উল্লেখ করেছেন। ইবনে ইসহাক বলেছেন, তাঁর নাম ছিলো খবুল।

'রব্বিয়াল্লহ্' অর্থ আমার প্রভুপালক আল্লাহ্। এখানে 'আল্লাহ্' এর পূর্বে 'রব্বি' উল্লেখিত হয়ে বক্তব্যটির চূড়ান্ত সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউই আমার 'রব' নয়। যেমন 'সদিক্বী যায়দুন' (জায়েদ ব্যতীত আমার বন্ধু আর কেউ নেই)। 'বিল বাইয়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। 'মির্ রব্বিকুম' অর্থ প্রভুপালকের নিকট থেকে। অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বা অলৌকিকত্ব প্রদান করতে পারেন কেবল আল্লাহ্, যিনি সকলের ও সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তাদের উপরে পরিপূর্ণ ক্ষমতাশালী। আর 'রব' এর সঙ্গে 'কুম' যোগ করার মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, যিনি তোমাদের সৃজয়িতা ও পালয়িতা, তিনি কেবল তোমাদের উপরে শাস্তি অবতীর্ণ করার ক্ষমতাধারী।

'মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে' অর্থ মিথ্যাবাদীই যদি সে হয়, তবে তাকে আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ভেবে লাভ কী? কী দরকার একজন মিথ্যাবাদীকে হত্যা করে তাকে গুরুত্ব দেওয়ার? এরকম ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়াই তো উত্তম। এর পরের বাক্যটির অর্থ— আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে তো তার সম্পর্কে সতর্ক ও সংযত হওয়া তোমাদের জন্য জরুরী। কারণ তাকে না মানলে যে শাস্তি আপতিত হওয়ার কথা সে বলে, সেই শাস্তির অতিসামান্য অংশ তোমাদের ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এভাবে উপস্থাপিত নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত এই বাক্যটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃত ন্যায়ানুগতা, সুবিচার। কেননা এখানে 'যদি সে সত্যবাদী হয়' বলার আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 'সে মিথ্যাবাদী হলে'। শুভযুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার এটাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

'ইন্নাল্লহা লা ইয়াহ্দী মান্ হুয়া মুস্‌রিফুন্ কাজ্জাব' অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। এটা হচ্ছে তৃতীয়

সতর্কতা, যা করা হয়েছে দু'টি পন্থায়— ১. যদি সে সীমালংঘনকারী হতো, নবী না হয়েও নবুয়তের মিথ্যা দাবী করে বসতো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দান করতেন না, অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের উপায়ও তার জানা থাকতো না ২. আর মিথ্যাবাদী যদি সে হয়, তবে আল্লাহ্ই তো তাকে ধ্বংস করে দিবেন। সুতরাং তাকে হত্যা করার দরকারই বা কী? ওই ব্যক্তিটি হয়তো প্রথমোক্ত পন্থাকেই সতর্কীকরণ কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন। পরের পন্থাটি তো ছিলো ফেরাউন ও তার বশংধরদের ক্রোধ প্রশমনমূলক। আর একথাটি ফেরাউনের প্রতিও ছিলো প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ হুমকি। কারণ প্রকৃতপক্ষে সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী তো ছিলো সে-ই।

ওরওয়া ইবনে যোবায়ের বলেছেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আসকে বললাম, আমাকে বলুন, অবিশ্বাসীরা রসুল স.কে সবচেয়ে মারাত্মক নির্যাতন করেছিলো কখন? তিনি বললেন, তিনি স. একবার কাবা শরীফের চত্বরে নামাজ পাঠ করছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মুঈত এসে তাঁর দুই কাঁধ থাবা দিয়ে ধরলো এবং তাঁর গায়ের চাদর গলায় জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে শুরু করলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলেন আবু বকর। তিনি উকবার দুই কাঁধ ধরে সজোরে ছাড়িয়ে আনলেন রসুল স. এর কাছ থেকে। বললেন, 'তোমরা কি এই ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, তিনি বলেন, আমার প্রভুপালক আল্লাহ্'।

হজরত আলী একদিন এক জনসমাবেশে বললেন, উপস্থিত জনতা ! বলতো, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ কে? জনতা বললো, জানি না। তিনি বললেন, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ হচ্ছেন আবু বকর। আমি তাঁর বীরত্বের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। একদিন দেখেছি, কুরায়েশ পৌত্তলিকেরা রসুল স. এর উপর আক্রমণ করলো। একজন তাঁকে জোরপূর্বক অবনত করাতে চেষ্টা করছিলো, আর একজন তাঁকে নিয়ে করছিলো টানা হেঁচড়া। বলছিলো, কী, তুমি নাকি সকল উপাস্যকে এক উপাস্য বানাতে চাও? এ পর্যন্ত বর্ণনা করার পর হজরত আলী আবেগভরে বলে উঠলেন, আল্লাহ্র শপথ! তখন আমাদের কেউ তাঁকে সাহায্য করতে যায়নি। গিয়েছিলেন কেবল আবু বকর। তিনি তাদের একজনকে ধাক্কা দিয়ে একদিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং অন্যজনকে টেনে ধরে বলেছিলেন, তোমরা কি একজন লোককে কেবল এজন্যেই হত্যা করতে চাও, যে বলে, আমার প্রভুপালনকর্তা আল্লাহ্। এ পর্যন্ত বলার পর হজরত আলী পুনরায় থামলেন। চেহারা থেকে সরিয়ে ফেললেন চাদর। তারপর এমনভাবে কাঁদতে শুরু করলেন যে, ভিজে গেলো তার শ্মশ্রু। কান্না কিছুটা প্রশমিত হলে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, এবার তোমরা বলো, ফেরাউন বংশের ওই মুমিন ব্যক্তিটি উত্তম, না আবু বকর? জনতা নির্বাক। তিনি বললেন, তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেনো? আল্লাহ্র কসম! আবু বকরের জীবনের একটি মুহূর্ত ওই মুমিনের সমস্ত জীবন অপেক্ষা উত্তম। কেননা তিনি তাঁর ইমানকে গোপন রেখেছিলেন, আর আবু বকর তার ইমান প্রকাশ করেছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিতার সঙ্গে।

হজরত আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, একদিনের ঘটনা। রসুল স. মাত্র কাবা প্রদক্ষিণ শেষ করেছেন। এমন সময় কয়েকজন এসে আক্রমণ করে বসলো তাঁকে। তাঁর পবিত্র উত্তরীয়ের প্রান্ত আকর্ষণ করে বললো, তুমি নাকি আমাদের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে কথা বলো? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। হঠাৎ সেখানে হাজির হলেন হজরত আবু বকর। তিনি তাঁকে ছাড়িয়ে নিলেন দুর্বৃত্তদের কবল থেকে। উচ্চকণ্ঠে পাঠ করতে লাগলেন 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে, যে বলে, আমার প্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্'। তাঁর দু'চোখ থেকে তখন অশ্রু ঝরে পড়ছিলো।

হজরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, একবার লোকেরা রসুল স.কে এমনভাবে প্রহার করলো যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। অকস্মাৎ সেখানে আবু বকর উপস্থিত হয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত। তোমরা কি একজনকে কেবল একারণেই হত্যা করতে চাও, যে বলে, আমার প্রভুপালয়িতা আল্লাহ্। তাদের কেউ কেউ বললো, এ আবার কে? অন্যরা জবাব দিলো, আবু কোহাফার পুত্র।

পরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বললো, আমি যা বুঝি, আমি তোমাদেরকে তা-ই বলছি। আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি'।

এখানে 'জহিরীনা ফীল আরদ্ব' অর্থ দেশে তোমরাই প্রবল। অর্থাৎ এই মিসররাজ্য এখন তোমাদেরই করতলগত। তাই ক্ষমতা-মদমত্ততার কারণে দর্পান্ধ হয়ো না। ভেবে দেখো, আল্লাহ্র গজব যদি আসে তবে ছারখার হয়ে যাবে তোমাদের এই সাধের সাম্রাজ্য। বলো, তখন কে সাহায্য করবে আমাদেরকে?

'কে আমাদেরকে সাহায্য করবে' মুমিন ব্যক্তির একথায় বুঝা যায়, তিনিও ছিলেন ফেরাউন বংশের। অর্থাৎ কিবতী। তাই তিনি 'তোমাদেরকে' না বলে বলেছেন 'আমাদেরকে'।

'আমি যা বুঝি, আমি তোমাদেরকে তা-ই বলছি' ফেরাউনের একথার অর্থ— দ্যাখো হে মিসরবাসী! তোমরা এরকম মনে কোরো না যে, না বুঝেসুঝে আমি তোমাদেরকে এরকম বলছি। 'মুসাকে হত্যা করতে হবে' একথা বলছি আমি গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করে এবং ভালোভাবে বুঝেসুঝে। আর এখানে 'সাবিলার রাশাদ' অর্থ সৎপথ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'মুমিন ব্যক্তিটি বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি—(৩০) যেমন ঘটেছিলো নুহ, আদ, ছামুদ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে। আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোনো জুলুম করতে চান না (৩১)। একথার অর্থ— বিশ্বাসী ব্যক্তিটি তখন বললেন, হে আমার স্বজাতি! মুসাকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলছো, তাকে বধ করতে চাইছো, কিন্তু আমি তো

তোমাদের এরকম আচরণের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছি অতীত যুগের দুর্বিনীত জাতিগোষ্ঠীগুলোর। যেমন নবী নুহের সম্প্রদায়, আদ, ছামুদ ইত্যাদি। তারাও তো তাদের প্রতি প্রেরিত বার্তাবাহকগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো, হত্যা করতে চেয়েছিলো তাঁদেরকে। ফলে তাদের উপরে এসে পড়েছিলো আল্লাহ্র গজব। আমার তো আশংকা হচ্ছে, তোমরাও তাদের মতো গজব ডেকে আনতে চাও। মনে রেখো, আল্লাহ্ কখনো কারো উপরে জুলুম করতে চান না।

'ওয়া মাল্লহু ইউরীদু জুল্মাল্লিল্ ইবাদ' অর্থ আল্লাহ্ তো বান্দাদের উপর কোনো জুলুম করতে চান না। এখানে 'লিল্ ই'বাদ' এর 'লাম' অক্ষরটি অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত এবং 'আলই'বাদ' হচ্ছে এখানে ক্রিয়ার কর্ম। অতিরিক্ত 'লাম' অক্ষরটি 'জুলুম' এর শক্তি যোগানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ তার কোনো বান্দার উপরেই জুলুম করতে চান না, কেউ বিনা দোষে শাস্তি পাক এবং কোনো অত্যাচারী তার প্রাপ্য শাস্তি ছাড়াই রেহাই পেয়ে যাক, অথবা কারো লঘু পাপে গুরুদণ্ড, কিংবা কারো গুরুপাপে লঘুদণ্ড হোক, এরকম অভিপ্রায় তাঁর নেই।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের (৩২), যেদিন তোমরা পেছন ফিরে পলায়ন করতে চাইবে। আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবার কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই'(৩৩)।

এখানে 'ইয়াওমা তুওয়াল্লূনা মুদ্বিরীন' অর্থ সেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে। মুজাহিদ বলেছেন, এর অর্থ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, কিন্তু পালাতে না পারা। কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানে 'যেদিন' অর্থ শিঙ্গার অজ্ঞানকারী ফুৎকারের আগের ভীতিসঞ্চারক ফুৎকারের দিন। ওই দিনের শিঙ্গাধ্বনি শুনে লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তারপর ধ্বনিত হবে অজ্ঞানকারী ফুৎকার। তখন সকলে বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে। ইবনে জারীর তাঁর 'মোতাওয়ালাত্' গ্রন্থে, আবু ইয়া'লী তাঁর 'মুসনাদ' পুস্তকে, বায়হাকী তাঁর 'আল বা'ছ' কিতাবে, আবু শায়েখ তাঁর 'কিতাবুল উজমাহ'তে এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবদ ইবনে হুমাইদ এক দীর্ঘ হাদিসে বর্ণনা করেছেন, যাতে বলা হয়েছে শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনিত হবে তিনবার। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ ইস্রাফিলকে প্রথমবার আদেশ দিবেন, ভীতিসঞ্চারক ফুৎকার দাও। ইস্রাফিল তাই করবেন। ফলে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা ভয়ে আতঙ্কে কাঁপতে থাকবে থর থর করে। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন সে থাকবে আতঙ্কমুক্ত। ইস্রাফিল শিঙ্গায় ফুৎকার দিতে থাকবেন বিরতিহীনভাবে। মাঝে মাঝে থেমে দম নিবেন, এমনভাবে নয়। তখন ভয়ে-আতংকে অধীর হয়ে কোলের সন্তানকে দুধ পান করাতে ভুলে যাবে স্তন্য-দায়িনী জননীরা। ভয়ের চোটে গর্ভপাত ঘটবে গর্ভবতীদের। শিশুদের মাথার চুল হয়ে যাবে শাদা। শয়তান তখন ভয়ে অস্থির

হয়ে পালিয়ে বেড়াবে আড়ালে আবডালে। পৃথিবীর প্রান্তসীমায় পৌঁছলে ফেরেশতারা মুষ্টাঘাত করবে তার চেহারায়। মানুষজন পিছন ফিরে পালাতে থাকবে। শুরু করবে শোরগোল, হইহুল্লোড়।

কোনো কোনো ভাষ্যকার বলেছেন, এখানকার 'ইয়াওমাত্ তানাদ' অর্থ আহবান দিবস অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন, যখন সকল মানুষকে ডাকা হবে তাদের নেতাদের সঙ্গে। আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, আবু হাসেম আরাজ নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, আরাজ! বিচারের দিন যখন বলা হবে, হে অমুক অমুক পাপিষ্ঠ! তখন তুই দাঁড়াবি গিয়ে পাপিষ্ঠদের দলে। পুনরায় যখন ঘোষণা করা হবে, হে অমুক অমুক প্রকৃতির অপরাধী! তখন সে দলেও তো তুই ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বি। আমি তো দেখছি, তুই সব ধরনের অপরাধীদের দলভূত হতে চাস। হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে আবী আসেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে আল্লাহ্র দুশমনেরা! ওই সময় দোজখী ও বেহেশতীরা একে অপরকে ডাকবে। বেহেশত-দোজখের মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসীরাও ডাকাডাকি করতে থাকবে তাদেরকে। সুরা আ'রাফে এরকমই বর্ণনা করা হয়েছে। আর ওই সময়েই ঘোষণা করে দেওয়া হবে সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা কারা? বলা হবে, শোনো সকলে, অমুকের পুত্র অমুক সৌভাগ্যশালী। সে আর কোনো দিনও দুর্ভাগ্যকবলিত হবে না। আরো শোনো, অমুকের পুত্র অমুক হচ্ছে হতভাগা। সে আর কখনো সৌভাগ্যের দেখা পাবে না।

হজরত আনাস সূত্রে বায্যার ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শেষ বিচারের দিন আদম সন্তানদেরকে সমবেত করা হবে মীযানের দুই পাল্লার মাঝামাঝি জায়গায়। তাদের পাপ-পুণ্য ওজন করবার জন্য সেখানে নিযুক্ত করা হবে এক ফেরেশতাকে। সে ফলাফল ঘোষণা করবে এমন উচ্চস্বরে যে, তা কর্ণকুহরে পৌঁছবে সকল সৃষ্টির। কারো পুণ্যের পাল্লা

অধিকভারী হলে সে বলবে, অমুক ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী। সে আর কখনো দুর্ভাগ্যের শিকার হবে না। আর পাপের পাল্লা ভারী হলে বলবে, অমুক ব্যক্তি হতভাগা। আর কখনোই সে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে না। তখন অদৃশ্য থেকে ভেসে আসবে এই ঘোষণাটি— আমি তোমার জন্য একটি সম্পৃক্ততা প্রস্তুত রেখেছিলাম। অথচ তুমি গ্রহণ করেছো অন্য এক সম্পৃক্ততাকে। তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিনে আল্লাহ্ ঘোষণা করবেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা শোনো, আমি তোমাদের জন্য এক সম্পৃক্ততা স্থির করে রেখেছিলাম, অথচ তোমরা বেছে নিয়েছো ভিন্ন এক সম্পৃক্ততাকে। আমি পুণ্যবানগণকে করেছিলাম সবচেয়ে সম্মানার্হ। অথচ তোমরা তাদেরকে মান্য করোনি। বলেছিলে, অমুকের পুত্র অমুকই উত্তম। আজ আমি আমা কর্তৃক মনোনীত সম্পৃক্তিকে করবো সমুচ্চ। আর তোমাদের সম্পৃক্তিকে করবো অবনত। কোথায় আছো বিশ্বাসী ও ধর্মানুরাগীরা! এখন তো মৃত্যুর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।
সুতরাং হে বেহেশতবাসী! তোমাদের বেহেশতবাস হবে চিরকালীন। আর হে দোজখবাসী! তোমাদের দোজখবাসও চিরদিনের জন্য।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতে এবং দোজখবাসীরা দোজখে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে জবাই করা হবে বেহেশত-দোজখের মধ্যবর্তী স্থানে। তারপর এক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে বেহেশতের অধিবাসীরা, শোনো, আর কোনোদিন তোমাদেরকে মৃত্যু স্পর্শ করবে না। আর হে দোজখের বাসিন্দারা! তোমরাও শোনো, তোমরাও মৃত্যুমুখে পতিত হবে না আর কোনোদিন। ওই ঘোষণা শোনার পর বেহেশতবাসীদের আনন্দ যাবে বেড়ে এবং বেড়ে যাবে দোজখবাসীদের দুঃখ। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম এবং ইবনে হাব্বান এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে আব্বাস ও জুহাক এখানকার 'ইয়াওমাত্ তানাদ' কথাটিকে উচ্চারণ করতেন 'ইয়াওমাত্ তানাদ্দু'। অর্থাৎ তাঁরা শেষ অক্ষর 'দাল' কে উচ্চারণ করতেন 'তাশদীদ' সহযোগে। এভাবে পাঠ করলে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— বিক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটি করার দিন। অর্থাৎ দড়ি ছিঁড়ে উট যেমন তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে এদিক সেদিক ছুটে বেড়ায়, সেভাবে সেদিন লোকেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। ইবনে জারির ও ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, জুহাক বলেছেন, কিয়ামত আসন্ন হলে আল্লাহ্ প্রথম আকাশকে আদেশ করবেন, ফেটে যাও। সঙ্গে সঙ্গে তা ফেটে যাবে। ফেরেশতারা অবস্থান গ্রহণ করবে একপ্রান্তে। এরপর আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তারা ঘিরে ফেলবে পৃথিবীবাসীদেরকে। অন্যান্য আকাশ ও আকাশবাসীদেরকে সমবেত করা হবে এভাবে। অর্থাৎ তাদের আকাশও আল্লাহ্র আদেশে ফেটে যাবে এবং তাদেরকেও শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে অন্যান্যদের মতো। অবশেষে আবির্ভূত হবেন মহানতম প্রভুপালনকর্তা আল্লাহ্। দোজখ থাকবে বামদিকে এবং বেহেশত ডান দিকে। দোজখকে দেখে পৃথিবীবাসীরা সভয়ে ছুটে পালাতে থাকবে। কিন্তু যে প্রান্তেই তারা যাকনা কেনো সম্মুখীন হবে ফেরেশতাদের দুর্ভেদ্য বেষ্টনীর। অনন্যোপায় হয়ে তারা ফিরে আসবে পূর্বের স্থানে। এরকম পরিস্থিতির কথাই এখানে বলা হয়েছে এভাবে 'আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের, সেদিন তোমরা পেছন ফিরে পলায়ন করতে চাইবে। আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবার কেউ থাকবে না'। অন্যান্য আয়াতেও অবতারণা করা হয়েছে প্রসঙ্গটির। যেমন— 'এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন', 'হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! নভোমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের সীমানা অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম করো' এবং 'সেদিন আকাশ বিদীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হবে এবং ফেরেশতারা থাকবে আকাশের প্রান্তদেশে। অবস্থা এরকম হবে যে, লোকজন এক আওয়াজ শুনবে এবং চলতে থাকবে হিসাবের দিকে'। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এখানকার 'সেদিন তোমরা পেছন ফিরে পলায়ন করতে চাইবে' কথাটির অর্থ করেছেন— সেদিন লোকজন হিসাবের স্থান থেকে দোজখের দিকে ফিরে যাবে।

'মা লাকুম মিনাল্লহি মিন আ'সিম' অর্থ আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবার কেউ থাকবে না। অর্থাৎ তখন আল্লাহ্র শাস্তি প্রতিহত করবার ক্ষমতা কারো থাকবে না। আল্লাহ্র শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারে কেবল তাঁর অনুকম্পা (রহমত)। কিন্তু সে অনুকম্পা তোমাদের ভাগ্যে জুটবে না। আর 'ওয়া মাঁই য়ুদ্বলিলিল্লাহু ফামা লাহু মিন হাদ্' অর্থ আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

এরপরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'পূর্বেও তোমাদের প্রতি ইউসুফ এসেছিলো স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিলো, তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হলো, তখন তোমরা বলেছিলে, তার পরে আল্লাহ্ আর কোনো রসুল প্রেরণ করবেন না। এভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে—'। একথার অর্থ— মুসা তোমাদের প্রতি প্রেরিত প্রথম পয়গম্বর নন। এর আগেও তোমাদের নিকট আল্লাহ্র এককত্বের ও নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন নবী ইউসুফ। কিন্তু তোমরা সেগুলোকে সব সময়

সন্দেহের চোখে দেখতে। যখন তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলো, তখন তোমরা মনে করলে, বাঁচা গেলো। আর আমাদের কাছে কোনো প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করা হবে না। কিন্তু তোমাদের এমতো ধারণা বিভ্রান্তিমূলক। আর আল্লাহ্ই এভাবে বিভ্রান্ত হতে দেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়পন্থীদেরকে।

এখানে 'ইউসুফ' বলে যদি নবী ইয়াকুবের পুত্র ও নবী ইব্রাহিম তনয় নবী ইসহাকের প্রপৌত্র নবী ইউসুফকে মনে করা হয়, তবে বুঝতে হবে নবী ইউসুফের সমকালীন ফেরাউন নবী মুসার জামানাতেও জীবিত ছিলো। কিন্তু নবী ইউসুফের মহাতিরোধানের চারশ' বছর পর আবির্ভূত হয়েছিলেন নবী মুসা। সুতরাং তথ্যটি ইতিহাসসম্মত নয়। সেকারণেই কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে নবী ইউসুফ তনয় আফরাইমের পুত্র ইউসুফের কথা। এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে ইয়াকুবপুত্র ইউসুফের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পূর্বপুরুষদের উপযুক্ত উত্তরপুরুষকেও তাদের স্বনামধন্য পূর্বপুরুষদের অভিধায় সম্বোধন করার রীতিটি সুপ্রচল, তাই বুঝতে হবে, এখানে তোমাদের নিকট কথাটির অর্থ হবে তোমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট।

এখানে 'মিন ক্বাবলু' অর্থ পূর্বেও। 'বিল্বাইয়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। 'মিম্মা জ্বাআকুম বিহী' অর্থ তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিলো। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন, তিনি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন বিশুদ্ধভাবে এক আল্লাহ্র ইবাদত করার যে আদেশ। 'হাত্তা ইজা হালাক' অর্থ নবী ইউসুফের মহাপ্রয়াণের পর। 'মুসরিফুন' অর্থ সীমালংঘনকারী এবং 'মুরতাব্' অর্থ সংশয়বাদী।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'যারা নিজের নিকট কোনো দলিল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তাদের এই কর্ম আল্লাহ্ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও

স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কোনো প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্র বাণীর বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা শুরু করে দেয়, আল্লাহ্ তাদের এমতো স্থূল তর্ক-বিতর্ককে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। বিশ্বাসীগণও ঘৃণা করেন তাদের এ ধরনের অপকর্মকে। এভাবেই আল্লাহ্ অবশেষে মোহরাঙ্কিত করে দেন প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীদের হৃদয়।

এখানে 'আল্লাজিনা ইউজ্বাদিলূনা' (বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়) হচ্ছে প্রথমোক্ত যোজকের পরিবর্ত। কেননা পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত প্রথম যোজক 'মানহুয়া' (কে সে) বহুবচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'সুলত্বন' অর্থ দলিল-প্রমাণ।

'কাবুরা মাকৃতান' (অতিশয় ঘৃণার্হ) কথাটির 'কাবুর' এর সর্বনাম কেবল 'মান' এর দিকে সংযোজিত। কেননা 'মান' শব্দটি বহুবচনার্থক হলেও একবচন। এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'আল্লাজীনা ইউজ্বাদিলূনা' এর পূর্বে একটি সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। আর 'কাবুর' এর সর্বনাম ওই উহ্য কথাটির সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— জ্বিদালুল্ লাজীনা ইউজ্বাদিলূনা'। বক্তব্যটির অনুবাদ করা হয়েছে অবশ্য সেভাবেই।

'এভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন' কথাটির অর্থ এভাবে অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর করে দেন বলেই তাদের অন্তরে সত্যের আলো প্রবেশের পথ হয়ে যায় রুদ্ধ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ফেরাউন বললো, হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ করো এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন—(৩৬) অবলম্বন আসমানে আরোহণের। যেনো দেখতে পাই মুসার ইলাহ্কে, তবে আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি'। এভাবে ফেরাউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিলো তার মন্দ কর্মকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিলো সরল পথ থেকে এবং ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিলো সম্পূর্ণরূপে'(৩৭)।

এখানে 'সারহা' অর্থ সুউচ্চ প্রাসাদ, মিনার— যা বহুদূর থেকেও দৃষ্ট হয়। এই হিসেবে 'তাসরীহ' অর্থ 'প্রকাশিত'ও হয়। 'আস্বাবাস্ সামাওয়াত্' অর্থ আকাশে আরোহণের অবলম্বন, আকাশের দরোজা। অর্থাৎ এক আকাশ থেকে অন্য আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানের পথ। 'সবব' বলা হয় কোনো বস্তু পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যমকে। পানি পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম বলে রশি ও বালতিকে 'সবব' বলা হয় একারণেই। উল্লেখ্য, নমরুদও ফেরাউনের মতো এরকম সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলো। তার সেই প্রাসাদ নির্মাণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সুরা নমলের তাফসীরে।

বায়যাবী লিখেছেন, অনেক উপরে উঠে নক্ষত্ররাজির অবস্থান ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্যই হয়ত সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলো ফেরাউন। কেননা নক্ষত্র সমূহের গতিবিধির অবস্থাই হচ্ছে 'আস্বাবাস্ সামাওয়াত্' (আকাশ সম্পর্কীয় উপকরণ), যা ভূপৃষ্ঠের ঘটনাসমূহকে সুস্পষ্ট করে। আকাশের উপকরণসমূহ দেখে সে হয়তো জানতে চেয়েছিলো, হজরত মুসাকে কি সত্যি

সত্যি আল্লাহ্ই পাঠিয়েছেন, না অন্য কেউ। এরকমও হতে পারে যে, সে জনসমক্ষে হজরত মুসার উক্তিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলো। কেননা সে হয়তো মনে করতো, এভাবে আকাশে না উঠে আকাশের আল্লাহ্র সংবাদ কোনো মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, এসকল কিছুই ছিলো তার মূর্খজনোচিত চিন্তা। অর্থাৎ সে ছিলো নিরেট স্থূলদর্শী। সে না জানতো আল্লাহ্কে, না জানতো নবুয়তপ্রাপ্তির নিয়মাবলী।

'এভাবে ফেরাউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিলো তার মন্দ কর্মকে' কথাটির অর্থ— যেভাবে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে আল্লাহকে দেখার হাস্যকর চিন্তাকে তার দৃষ্টিতে শোভন করা হয়েছিলো, সেভাবে তার চোখে সুন্দর করে দেওয়া হয়েছিলো তার সকল অপকর্মকে। অর্থাৎ ফেরাউনের দৃষ্টিভঙ্গিকেই আল্লাহ্ পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন। তাই তার মন্দ কাজগুলোও তার দৃষ্টিতে মনে হতো ভালো।

'এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিলো সরল পথ থেকে' কথাটির অর্থ সত্য সরলপথাভিসারী হওয়া থেকে আল্লাহ্ই তাকে নিরস্ত রেখেছিলেন। তাই সে পুরোপুরিভাবে ছিলো সৎপথপ্রাপ্তির চিন্তাচ্যুত। এতে করে একথাটিও প্রমাণিত হয় যে, সৎপথ প্রাপ্তি ও বিভ্রান্তি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র চিরস্বাধীন ও চিরঅমুখাপেক্ষী অভিপ্রায়নির্ভর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন পথ দেখান। যাকে ইচ্ছা করেন না সে থেকে যায় পথভ্রষ্ট। একথাটিও এখানে সুপ্রমাণিত যে, পথভ্রষ্টদের সকল প্রচেষ্টা অবশ্যই অসফল হয়। তাই শেষে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে— এবং ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিলো সম্পূর্ণরূপে।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

❑ মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব।

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস।

❑ 'কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাইবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যাহারা মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহারা দাখিল হইবে জান্নাতে, সেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

❑ 'হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছ অগ্নির দিকে!

❑ 'তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিতে এবং তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে, যাহার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে আহ্‌বান করিতেছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে।

❑ নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহ্‌বান করিতেছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্‌বানযোগ্য নহে। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌র নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

❑ 'আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তোমরা তাহা অচিরেই স্মরণ করিবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌তে অর্পণ করিতেছি; আল্লাহ্‌ তাঁহার বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।'

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— বিশ্বাসী ব্যক্তিটি তখন ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃ-ভগ্নিবৃন্দ! তোমরা আমার কথা শোনো। অনুসরণ করো আমার শুভ উপদেশের। আমি তোমাদেরকে মুসা-হারুন নবী ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুসরণের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। এই পথই সরল সঠিক পথ। হে আমার জাতিগোষ্ঠী! এই পৃথিবীর সাময়িক সাফল্যের প্রতি দৃকপাত কোরো না। পার্থিব জীবন ও ভোগসম্ভার তো মাত্র কিছুদিনের জন্য। পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। সুতরাং পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হও। মন্দ কর্মের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ। যারা মন্দ কর্ম করবে তারা তাদের কর্মানুপাতে শাস্তি পাবেই। আর যে সকল নারী-পুরুষ বিশ্বাসী হয়ে পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হবে, তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে। সেখানে তাদেরকে দেওয়া হবে অপরিমেয় সম্ভোগসম্ভার।

এখানে 'সাবিলার রাশাদ' অর্থ সরল সঠিক পথ, যে পথের শেষে রয়েছে সফল গন্তব্য। 'মাতাউ'ন' অর্থ অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। 'দারুল কুরার' অর্থ চিরস্থায়ী আবাস। 'ওয়া হুয়া মু'মিনুন' অর্থ বিশ্বাসী হয়ে। ইমান বা বিশ্বাসই হচ্ছে সকল পুণ্যকর্মের পুরস্কারপ্রাপ্তির শর্ত। কেননা আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সকল কর্মের প্রতিফলপ্রদাতা। কাজেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী না হয়ে পুণ্যকর্মের প্রতিদান আশা করা যায় না। আর পুণ্যকর্মসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তোষসাধন। সুতরাং পুণ্যকর্ম সম্পাদনের পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তো করতেই হয়। আর 'বি গইরি হিসাব' অর্থ অপরিমিত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগ্রহে জান্নাতবাসীদেরকে দেওয়া হবে অফুরন্ত সম্ভোগোপকরণ।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হে আমার সম্প্রদায়! কী আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে আহবান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছো অগ্নির দিকে (৪১)! তোমরা আমাকে বলছো আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে' (৪২)।

এখানে 'মালী' অর্থ কী আশ্চর্য! অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধির পরিপন্থী অপবিশ্বাস তোমরা এখনো আঁকড়ে ধরে রয়েছো, আশ্চর্য! 'ইলান্‌ নাজাতি' অর্থ মুক্তির দিকে। 'ইলান্‌ নার' অর্থ অগ্নির দিকে। আর এখানকার 'তাদ্‌উনানী লিআক্‌ফুরা বিল্লাহ্‌ (তোমরা আমাকে বলছো আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে) কথাটি পূর্বের বাক্যের 'তাদউনানী ইলান্‌ নার' (আমাকে ডাকছো অগ্নির দিকে) কথাটির অনুবর্তন। অথবা বিবরণ। শুভপ্রার্থনার অভিপ্রায় প্রকাশের ক্ষেত্রে আরবী ভাষায় সাধারণতঃ 'ইলা' এবং 'লাম' অব্যয় ব্যবহৃত হয়। হেদায়েত শব্দ এবং তার থেকে উদ্‌গত শব্দাবলীও সাধারণতঃ এভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

'মা লাইসা লি বিহী ই'লম' অর্থ যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। অর্থাৎ অংশীবাদিতার পক্ষের কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই। বরং আমার হাতে রয়েছে এর বিপরীত অকাট্য প্রমাণ। ইমানের পক্ষে এমন প্রমাণ থাকবে যা, যার উপরে ইমান আনতে হবে তার উপাস্য ও প্রভুপালক হওয়াকে সুস্পষ্ট করতে পারে। কেননা প্রমাণ ব্যতিরেকে বিশ্বাস জন্মাতে পারে না এবং সে বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া বিশ্বাসও বিশুদ্ধ হয় না।

'আলআ'যীয' অর্থ পরাক্রমশালী, যিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তি দিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। আর 'আল গাফ্‌ফার' অর্থ ক্ষমাশীল, যিনি তাঁর ইচ্ছামতো বিশ্বাসীদের পাপ মার্জনা করেন। অর্থাৎ সর্বময় প্রভুত্ব ও প্রতিপালকত্বের সকল গুণাবলীই তাঁর রয়েছে। তিনি যেমন পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, তেমনি জ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অভিপ্রায় প্রয়োগের ব্যাপারেও সম্পূর্ণ স্বাধীন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহ্বান করছো এমন একজনের দিকে, যে দুনিয়া ও আখেরাত কোথাও আহবানযোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌র নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই

জাহান্নামের অধিবাসী (৪৩)। আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌তে অর্পণ করছি; আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন' (৪৪)।

'লা জ্বারমা' অর্থ নিঃসন্দেহে। 'লা' হচ্ছে না সূচক। অর্থাৎ সন্দেহ নেই যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের আমন্ত্রণ অযৌক্তিক। এভাবে প্রথমোক্ত বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়ায়— তোমরা আমাকে যে মূর্তিপূজার দিকে আহ্বান জানাচ্ছো, ইহ-পরকালে তার

ভিত্তিহীন ও তুচ্ছ হওয়া অনিবার্য। কেননা তা অপ্রাণ, জড়পদার্থ, সে না পৃথিবীতে কাউকে তার উপাসনার দিকে আহ্বান করে, না পরকালে সে তার উপাসকদের পক্ষে থাকবে, বরং তাদের প্রতি সে তখন প্রকাশ করবে তার ঘোর অসন্তোষ। অর্থাৎ অংশীবাদিতার পক্ষের আমন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। সুদ্দী বলেছেন, বক্তব্যটির অর্থ— প্রতিমারা পৃথিবীতে কারো প্রার্থনা যেমন পূরণ করতে পারে না, তেমনি পূরণ করতে পারবে না আখেরাতেও।

এরকমও বলা হয়ে থাকে যে, 'জারমা একটি ক্রিয়াপদ। এর ক্রিয়ামূল 'জ্বারমুন'। এর অর্থ— বিসংবাদ, খণ্ডন। 'লা' যুক্ত হয়েছে এখানে না-সূচক অর্থে। এমতোক্ষেত্রে 'লা জ্বারমা' বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়— অখণ্ডনীয়, অবিসংবাদিত, অবশ্যই। যেমন 'লা বুদ্দা বাক্যে 'লা' অর্থ না। আর 'তাব্দীদ ক্রিয়ামূল থেকে সাধিত 'বুদ্দা' ক্রিয়াপদের অর্থ সংশয়, সন্দেহ। আর 'লা বুদ্দা' অর্থ— নিঃসংশয়ে, নিঃসন্দেহে। কামুস। এছাড়াও বক্তব্যকে সুদৃঢ় করবার জন্য শপথ অর্থেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সেজন্যই এর জবাবে 'লাম' এর উল্লেখ জরুরী বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে 'লা জ্বারমা লা আতিইয়ান্নাকা' (আমি অবশ্য অবশ্যই তোমার কাছে যাবো)।

'বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌র নিকট' অর্থ আমাদের সকলকেই একদিন আল্লাহ্ সকাশে আপনাপন কর্মফলের জবাবদিহি করবার জন্য দাঁড়াতেই হবে। তখন তিনি প্রদান করবেন আমাদের যথাযথ প্রাপ্য— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। 'সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী' অর্থ যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অসংখ্য নিরপরাধ শিশুর হত্যাকারী এবং নবী-রসুলগণের শত্রু, তারা অবশ্যই জলন্ত নরকের বাসিন্দা।

'আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তা অচিরেই স্মরণ করবে' অর্থ সেদিন বেশী দূরেও নয়, যেদিন তোমরা হাড়ে হাড়ে একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত আমার এই উপদেশাবলী কতো সত্য, কতো অমোঘ। কিন্তু তখন তো তোমাদের সামনে প্রতিকারের পথ আর খোলা থাকবে না, এবং 'আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌তে অর্পণ করছি; আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন' অর্থ আমি আমার সত্তা ও সত্তাসম্পৃক্ত সকল কিছু আল্লাহ্‌কে সোপর্দ করলাম, তিনি নিশ্চয় আমাকে রক্ষা করবেন তোমাদের অনিষ্ট ও জিঘাংসা থেকে।

কেননা আমি একথা জানি ও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। তিনি যে সর্বদ্রষ্টা। উল্লেখ্য, বিশ্বাসী ব্যক্তিটির এমতো স্পষ্ট ভাষণ শুনে ফেরাউন ও তার সঙ্গী-সাথীরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো। ভয় দেখালো কঠোর শাস্তির। তখনই তিনি বলে উঠলেন— আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ একথা ভালো ভাবেই জানেন যে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে কে সত্যাশ্রয়ী এবং কে মিথ্যানুরাগী। একথা বলার পর তিনি ফেরাউনের দরবার থেকে চলে গিয়েছিলেন। কেউ তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

❑ অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে উহাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করিল ফির'আওন সম্প্রদায়কে।

❑ উহাদিগকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটিবে সেদিন বলা হইবে, 'ফিরআওন-সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।'

❑ যখন উহারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হইবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদিগকে বলিবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদিগ হইতে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করিবে?'

❑ দাম্ভিকেরা বলিবে, 'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার তো করিয়া ফেলিয়াছেন।'

❑ অগ্নিবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদিগ হইতে লাঘব করেন এক দিনের শাস্তি।'

❑ তাহারা বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসে নাই?' জাহান্নামীরা বলিবে, 'অবশ্যই আসিয়াছিল।' প্রহরীরা বলিবে, 'তবে তোমরাই প্রার্থনা কর; আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ওই মুমিনকে হত্যা করতে চাইলো। তখন তিনি আত্মগোপন করলেন। ফেরাউন তার লোকদেরকে হুকুম দিলো তাঁকে ধরে আনতে। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে নিরাপদে রাখলেন। এর পর ফেরাউনের সম্প্রদায়ই নিপতিত হলো কঠিন শাস্তিতে।

এখানে বলা হয়েছে 'কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করলো ফেরাউনের সম্প্রদায়কে'। ফেরাউনের কথা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অবশ্য তার দরকারও ছিলো না। কেননা অপরাধীরা শাস্তিগ্রস্ত হলে তাদের নেতা তো হবে আরো অধিক শাস্তিগ্রস্ত। তাই এমতো ক্ষেত্রে নেতার উল্লেখ না করলেও চলে। আর এখানে 'কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করলো' অর্থ ইহকালের সমুদ্রসমাধি ও পরকালের দোজখবাস। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা আবার বলেছেন, ঘটনাটি ছিলো এরকম— ফেরাউন তার লোকজনকে আদেশ দিলো, যেখানে পাও, সেখান থেকে তাকে ধরে আনো। তারা খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে পেয়ে গেলো এক পাহাড়ের উপর। দেখলো, তিনি নামাজে মশগুল। আর তাঁর চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে তাঁর নিরাপত্তা রক্ষা করছে জঙ্গলের হিংস্রপশুরা। অনন্যোপায় হয়ে তারা ফিরে গেলো। রাগে ক্ষোভে ফেরাউন তখন তাদেরকেই হত্যা করে ফেললো। এই ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করলে এখানকার 'কঠিন শাস্তি' কথাটির অর্থ হবে মৃত্যুদণ্ড, যা ফেরাউন কার্যকর করেছিলো তার লোকদের উপর।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে'। একথার অর্থ— ফেরাউন ও তার অনুসারীরা এখন শাস্তিগ্রস্ত অবস্থায় আছে আলমে বরজখে। সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে হাজির করা হয় আগুনের সামনে। বিচার দিবসে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, এবার তাদেরকে প্রবেশ করাও দোজখের আগুনে।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন, ফেরাউন ও তার লোকদের আত্মাগুলোকে কালো পাখির উদরে প্রবেশ করিয়ে তাদেরকে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় হাজির করানো হয় দোজখের দ্বারপ্রান্তে। বলা হয়, এটাই তোমাদের আসল

ঠিকানা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের কারো মৃত্যু হলে তার আবাসস্থলকে সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে নিয়ে আসা হয়— জান্নাতীদের সামনে জান্নাত এবং জাহান্নামীদের কাছে জাহান্নাম এবং তাকে বলা হয়, এখানেই তোমাকে থাকতে হবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

আলোচ্য আয়াত থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর সকলকে বেঁচে থাকতে হয় কবরে। ওই জীবনের নাম বরজখী জীবন। সেখানেও চলতে থাকে শাস্তি অথবা শান্তি। এরকম বিবরণ এসেছে বহুসংখ্যক হাদিসে। আলেমগণের ঐকমত্যও এরকম।

'ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে' এরকম হুকুম করা হবে আযাবের ফেরেশতাদেরকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'কঠিন শাস্তি' অর্থ এমন শাস্তি, যা ইতোপূর্বের শাস্তির চেয়ে পরিমাণগত ও প্রকারগত দিক থেকে হবে অধিকতর।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে (৪৭) দাম্ভিকেরা বলবে, আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার তো করে ফেলেছেন'(৪৮)।

এখানে 'তাবয়ান' অর্থ অনুসারী। শব্দটি ব্যবহৃত হয় একবচন বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে। যেমন 'খাদামা' হচ্ছে 'খাদেম' এর বহুবচন। এমতো অভিমতের প্রবক্তা বসরার বিদ্বানগণ। আর কুফার ধর্মজ্ঞগণের মতে এটা বহুবচনের রূপ। কিন্তু এর বহুবচন হয় না। বরং বহুবচনার্থক শব্দরূপ হচ্ছে 'আত্বাউন'।

'ফাহাল' আনতুম মুগ্নূনা' অর্থ তোমরা কি নিবারণ করবে? কথাটি প্রশ্নবোধক হলেও এখানে এটা ব্যবহৃত হয়েছে আদেশার্থে। 'নাসীবাম মিনান্ নার' (আগুনের কিয়দংশ) কথাটি এখানে 'মুগ্নূন' (নিবারণ করবে) ক্রিয়ার কর্ম, অথবা মূল শব্দ। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এক আয়াতে উল্লেখিত 'শাইয়ান' শব্দটির ব্যবহার রীতিতে। যেমন— 'লান তুগ্নী আ'নহুম আম্ওয়া.....মিনাল্লাহি শাইয়া'।

'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি' অর্থ দাম্ভিকেরা দুর্বলদের প্রশ্নের জবাবে বলবে, কী যে বলো তোমরা, দেখছো আমরা সকলেই এখন বিপন্ন। এ দূরবস্থায় কেমন করে সাহায্য করবো তোমাদেরকে। সেরকম ক্ষমতা থাকলে আমরা নিজেদেরকেই তো শাস্তিমুক্ত করতাম সর্বাগ্রে। 'নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের বিচার তো করেই ফেলেছেন' অর্থ আল্লাহ্ তো জান্নাত ও জাহান্নামের স্থায়ী সিদ্ধান্ত দিয়েই ফেলেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'অগ্নিবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো তিনি যেনো

আমাদের থেকে লাঘব করেন এক দিনের শাস্তি'। একথার অর্থ— দুঃখ কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নামীরা জাহান্নামের প্রহরীদের কাছে কাকুতি মিনতি করে নিবেদন করবে, তোমরা আমাদের প্রতি একটু কৃপাপ্রদর্শন করো। তোমাদের প্রভুপালকের কাছে অন্তত এই নিবেদনটি কোরো, যেনো তিনি আমাদেরকে একদিন অথবা একদিনের কিছুটা সময়ের জন্য হলেও শাস্তিমুক্ত রাখেন।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রসুলগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবে, অবশ্যই এসেছিলো। প্রহরীরা বলবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা করো, আর কাফেরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়'।

প্রথমোক্ত প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর মাধ্যমে ধমকের সুরে জাহান্নামীদেরকে একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেরাই তো প্রার্থনার উপযুক্ত সময় ও প্রার্থনা গৃহীত হওয়ার উপকরণাদি বিনষ্ট করে ফেলেছো। এখন অপেক্ষা করলে আর কী হবে? 'তোমরাই প্রার্থনা করো' কথাটি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে বিদ্রূপার্থে। অর্থাৎ জাহান্নামের দৌবারিকেরা তখন তাদের

প্রতি বিদ্রূপবান ছুঁড়ে দিবে যে, তবে তোমরাই প্রার্থনা করে দেখো না, কী হয়? 'আর কাফেরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়' কথাটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র। অর্থাৎ আল্লাহ্ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের দোয়া কবুল করা হয় না। আবার এরকমও হতে পারে যে, কথাটি জাহান্নামের দ্বারওয়ানদের বক্তব্যাংশ।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

তাফসীরে মাযহারী/৩৪৫

❑ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদিগকে ও মু'মিনদিগকে সাহায্য করিব পার্থিব জীবনে এবং যেই দিন সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হইবে।

❑ যেদিন যালিমদের 'ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না, আর উহাদের জন্য রহিয়াছে লা'নত এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট আবাস।

❑ আমি অবশ্যই মূসাকে দান করিয়াছিলাম পথনির্দেশ এবং বনী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম সেই কিতাবের,

❑ পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য।

❑ অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

❑ যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, উহাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যাহারা এই ব্যাপারে সফলকাম হইবে না। অতএব আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আমি অবশ্যই আমার বার্তাবাহক ও তাদের বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে তাদের পার্থিব জীবনে সাহায্য করে থাকি। তাদেরকে আমি বিশেষভাবে সাহায্যদানে ধন্য করবো সেইদিনও, যেদিন সারিবদ্ধভাবে হয়ে সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে থাকবে সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতারা, যেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কোনো বাহানা অজুহাত ফলদায়ক হবে না। তারা তখন হবে আল্লাহ্‌র অনুকম্পাচ্যুত। তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং নিকৃষ্টতম আবাস— জাহান্নাম।

জুহাক বলেছেন, এখানে 'পার্থিব জীবনে সাহায্য করা'র অর্থ দলিল প্রমাণ দ্বারা সাহায্য করা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সাহায্য করবো' অর্থ প্রতাপশীল করবো। বায়যাবী লিখেছেন, যদিও পার্থিব জীবনে কখনো কখনো দৃশ্যত সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বিজয়ী করা হয়, কিন্তু প্রকৃত বিজয় দেওয়া হয় নবী-রসুল ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকেই, কিন্তু তা ধর্তব্য হয় কর্মের শেষ পরিণাম ও আধিক্য হিসাবে। কেউ কেউ বলেছেন, নবীগণকে বিজয়ী করার অর্থ আল্লাহ্‌র শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ কার্যকর করা।

'যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে' অর্থ মহাবিচারের দিবসে আমল লেখক ফেরেশতারা এই মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, সকল পয়গম্বর তাঁদের আপনাপন উম্মতের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং অবাধ্যরা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে। 'জালেম' অর্থ এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। 'লা'নাত' অর্থ অভিসম্পাত, অভিশাপ, আল্লাহ্‌র অনুকম্পাচ্যুত। আর 'সূউদ্‌দার' অর্থ নিকৃষ্ট আবাস, জাহান্নাম।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই মুসাকে দান করেছিলাম পথনির্দেশ এবং বনী ইসরাইলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের (৫৩), পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য'। আলোচ্য

আয়াতদ্বয়ের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে বর্ণিত নবী মুসার প্রসঙ্গের সঙ্গে। মধ্যবর্তী আয়াতগুলোর অনুসঙ্গ ভিন্ন। উল্লেখ্য, হজরত মুসাকে তওরাত দেওয়া হয়েছিলো উদ্ধত ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সমুদ্রসমাধিপ্রাপ্তির পর।

এখানে 'হুদাঁও ওয়া জিকরা' অর্থ— পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ। অথবা শব্দটি ধাতুমূল, ব্যবহৃত হয়েছে কতৃকারকার্থে এভাবে— সত্যপথপ্রদর্শনকারী ও উপদেশাত্মক।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— 'অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো; নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ক্রটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করো সকাল সন্ধ্যায়'। একথার অর্থ— অতএব হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আপনার প্রতিপক্ষীয়দের অশিষ্ট আচরণে ধৈর্য অবলম্বন করুন। জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হওয়া অনিবার্য। সুতরাং আপনি ক্রটিমগ্ন যাতে না হন, সেজন্য আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন এবং আপনার প্রভুপালকের প্রশংসায়িত পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন প্রত্যুষে ও সায়াহ্নে।

এখানে 'আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য' একথার দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে হজরত মুসা ও ফেরাউনের কাহিনী। এভাবে ইঙ্গিতে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফেরাউন যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো, তেমনি বিনাশপ্রাপ্ত হবে আপনার প্রতিপক্ষীয়রাও। কেননা আল্লাহ্ তাঁর এবং তাঁর প্রিয়ভাজন বার্তাবাহকগণের শত্রুকে ধ্বংস করবার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

'ওয়াস্‌তাগফির লিজাম্‌বিকা' অর্থ তুমি তোমার ক্রটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রসুল স. তো সকল প্রকার গোনাহ থেকে সতত সুরক্ষিত, নিষ্পাপ। তাহলে তাঁকে এখানে এভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলা হলো কেনো? এমতো প্রশ্নের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, এ আদেশ দেওয়া হয়েছে যুক্তিতর্ক ব্যতিরেকে, কেবল মেনে নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও কেবল নির্দেশ মেনে নেওয়ার ফলস্বরূপ তিনি স. যেনো হতে পারেন আরো অধিক প্রিয়ভাজন। এমতো নির্বিবাদ মান্যতার নামই দাসত্ব, যা সৃষ্টিকুলের জন্য সর্বোচ্চ বিষয়ে অনুসরণীয়, তাই উম্মতের জন্য প্রকৃষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পেও কথাটি এভাবে এখানে বলা হয়ে থাকতে পারে।

'ওয়া সাব্‌বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা বিল আ'শিয়্যী ওয়াল ইব্‌কার' অর্থ তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সকাল ও সন্ধ্যায়। অর্থাৎ আপন প্রভুপালকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহসম্ভারের প্রতি যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে নামাজ পাঠ করো। হাসান বলেছেন, এখানে সকাল ও সন্ধ্যায় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার অর্থ আসর ও ফজরের নামাজ পাঠ করা। হজরত ইবনে আব্বাসের মতে এর অর্থ পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— 'যারা নিজের নিকট কোনো দলিল না থাকলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যারা এ ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'।

এখানে 'কিবরুন' অর্থ অহংকার। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স.কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে তারা তাদের অন্তরে লালন করতো চরম ঔদ্ধত্য ও তীব্র অহংকার। নিজেদেরকে তারা রসুল স. এর চেয়ে বড় মনে করতো। সেকারণেই তাঁর অনুগামী হতে চাইতো না।

'মা হুম বিবালিগীহি' অর্থ যারা এ ব্যাপারে সফলকাম হবে না। মুজাহিদ বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা নিজেদের বড় হওয়ার যে দাবি করে, সেই দাবির স্তরে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ্ তাদেরকে অপদস্থ করবেনই। ইবনে কুতাইবা অর্থ করেছেন— তাদের অন্তরে যার অহংকার ছিলো এবং রসুল স. এর উপরে প্রভাব বিস্তার করার যে অপবাসনাকে তারা প্রশ্রয় দিতো, সেই অপবাসনা পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পারবে না।

'ফাস্‌তায়িজ বিল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য কেবল আল্লাহ্‌র শরণ গ্রহণ করুন। 'ইন্নাহু হুয়াস্ সামীউ'ল বাসীর' অর্থ তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ হে আমার রসুল! নিঃসন্দেহে আপনি ও আপনার বিরুদ্ধবাদীরা সতত রয়েছে আল্লাহ্‌র শ্রুতি ও দৃষ্টির আওতায়। তিনি সকলের সব কথাবার্তা যেমন শোনেন, তেমনি দেখেন সকলের সব রকমের কার্যকলাপ।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০

❑ মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।

❑ সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।

❑ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

তাফসীরে মাযহারী/৩৪৮

❑ তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যাহারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদতে বিমুখ, উহারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই যে, মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করে না। যদি করতো তবে, পুনরুত্থান দিবসকে তারা অস্বীকার করতে পারতো না। বিনা নমুনায় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মতো বিশাল সৃষ্টিকে যিনি অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম, তিনি তো মৃত্যুর পর মানুষকে পুনর্জীবিত করতে আরো অধিক সক্ষম। সে কারণেই তো কোরআন পুনরুত্থান দিবসকে বিশ্বাস করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বোধবুদ্ধি বিবর্জিত বলেই পুনরুত্থান দিবসকে করে চলেছে অস্বীকার। উল্লেখ্য, পুনরুত্থান দিবসের প্রতি সন্দেহের অপনোদন ঘটানো হয়েছে আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ, অহংকারী ও স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন বলেই বিষয়টি বুঝতে সমর্থ হয় না।

আবুল আলিয়া সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, একবার এক ইহুদী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে দাজ্জালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো এবং দাজ্জালের খুব প্রশংসা করে বললো, সে আমাদের মধ্যেই কেউ হবে। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য সুরার ৫৬ ও ৫৭ সংখ্যক আয়াত। আর আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে এই আদেশও করলেন যে, 'আল্লাহ্র শরণাপন্ন হোন'। হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, ৫৬ ও ৫৭ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ওই ইহুদীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যে দাজ্জালের আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলো।

হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, আদম সৃষ্টির পর থেকে কোনো দুর্ঘটনা দাজ্জালের ঘটনার গুরুত্বকে অতিক্রম করবে না। মুসলিম। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের কাছে একথা গোপন থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ্ এক চোখ বিশিষ্ট নন, কিন্তু দাজ্জালের এক চোখ কানা। তার ডান চোখে আঙ্গুরের মতো ফুলে থাকা পাতলা চামড়ার আবরণ থাকবে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, এমন কোনো নবী ছিলেন না যিনি তাঁর অনুসারীদেরকে একচক্ষুবিশিষ্ট মিথ্যাবাদী দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে যাননি। ভালোভাবে জেনে নাও, সে হবে এক চক্ষুবিশিষ্ট। আর তোমাদের প্রভুপালক সেরকম নন। তার দু'চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফের'। বোখারী, মুসলিম। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটা কথা জানাবো না? প্রত্যেক নবী তাঁদের উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে কিছু না কিছু বলেছেন। নিঃসন্দেহে সে হবে কানা। তার সঙ্গে থাকবে বেহেশত ও দোজখ। সে যেটাকে বেহেশত বলবে, সেটাই দোজখ। আর যেটাকে বলবে দোজখ, সেটাই বেহেশত। আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের হাঙ্গামা থেকে সতর্ক করছি, যেমন এ ব্যাপারে নবী নুহ সতর্ক করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়কে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত হুজায়ফা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দাজ্জাল আবির্ভূত হবে পানি ও আগুন নিয়ে। লোকেরা যেটাকে আগুন মনে করবে সেটাই হবে শীতল সুপেয় পানি। তোমরা যদি তাকে পাও, তবে তোমাদের উচিত হবে তার আগুনের মধ্যে পড়ে যাওয়া। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, দাজ্জালের চোখ হবে ধূসর বর্ণের এবং তার উপরে থাকবে একটি মোটা দাগ। তার দু'চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফের'। নিরক্ষর হলেও প্রত্যেক বিশ্বাসী সে লেখা পড়ে নিতে পারবে। হজরত হুজায়ফা কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দাজ্জালের বাম চোখ হবে কানা। কেশ হবে কুঞ্চিত। তার সঙ্গে জান্নাত থাকবে, থাকবে জাহান্নামও। যেটা তার জাহান্নাম, সেটাই হবে আসলে জান্নাত। মুসলিম।

হজরত নাওয়াজ ইবনে সাময়া'ন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর সম্মুখে একবার দাজ্জালের আলোচনা উত্থাপন করা হলো। তিনি স. বললেন, যদি আমার জীবদ্দশায় তার আবির্ভাব ঘটে, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আমি তাকে প্রতিহত করবো। আর আমার পৃথিবী পরিত্যাগের পর যদি সে আসে, তাহলে আল্লাহ্ হবেন তোমাদের রক্ষক। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে তার সঙ্গে যুঝবে। সে হবে ছন্নছাড়া ভবঘুরে এক যুবক। তার চোখ হবে স্ফীত। আমার ধারণায় তার চেহারা হবে আবুল উজ্জা ইবনে কাতানের চেহারার মতো। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার সাক্ষাত পায়, তবে সে যেনো সুরা কাহাফের প্রথম আয়াত পড়ে তার প্রতি ফুঁ দেয়। এই আয়াত দাজ্জালের হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম। সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী এক উপত্যকা অথবা শ্যামল প্রান্তর থেকে তার আবির্ভাব ঘটবে এবং সে তার বামে ও দক্ষিণে ঘটাবে অনেক ধ্বংসাত্মক কর্ম। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমরা তখন দৃঢ়চেতা থেকো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! পৃথিবীতে সে কতোদিন থাকবে? তিনি স. বললেন, চল্লিশ দিন। যার প্রথম এক দিনের ব্যবধান হবে এক বৎসরের সমান। দ্বিতীয় দিন হবে এক মাসের সমান। তারপরের দিন এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিবসের মতো। আমরা বললাম, যে দিন এক বৎসরের সমান হবে, সেদিনে কি আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই পড়বো? তিনি স. বললেন, না। তোমরা নামাজের সময় অনুমান করে নিয়ো। মুসলিম।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দাজ্জাল বের হলে এক ইমানদার ব্যক্তি তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাবে। তাকে প্রথমে আটকাবে দাজ্জালের দেহরক্ষীরা। জিজ্ঞেস করবে? কোথায় যেতে চাও। সে বলবে, ওই ব্যক্তির কাছে, যে সদ্যআবির্ভূত। দেহরক্ষী বলবে, তিনিই তো প্রতিপালক। তার প্রতি কি তোমার বিশ্বাস নেই? সে বলবে, আমার

প্রভুপালকের কাছে কোনো কথাই গোপন নেই। এক দেহরক্ষী বলবে, একে কতল করো। অন্যজন বলবে, আমাদের প্রতিপালক তার আদেশ ব্যতীত কাউকে কতল করতে কি নিষেধ করেননি? একথা শুনে প্রথম জন নিরস্ত হবে। তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির হবে

দাজ্জালের সামনে। সে দাজ্জালকে দেখেই বলে উঠবে, হে জনতা! এ হচ্ছে সেই দাজ্জাল, যার কথা রসুল স. বলেছেন। দাজ্জাল বলবে, একে হত্যা করো। তার প্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে চিরে ফেলবে তার পেট ও পিঠ। দাজ্জাল বলবে, এখনো কি তুমি আমার উপরে ইমান আনবে না? সে বলবে, তুমি প্রতারক, মিথ্যাবাদী। দাজ্জাল বলবে, একে করাত দিয়ে চিরে ফেলো। প্রহরীরা তার মস্তকের মাঝখান থেকে দু' পায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত চিরে ফেলবে। দাজ্জাল তার চিরে ফেলা দুই অংশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবে, উঠে পড়ো। সে জীবিত হয়ে উঠবে। দাজ্জাল বলবে, এখনো কি তুমি আমার উপরে ইমান আনবে না? সে বলবে, এখন তো তোমার বিষয়ে আমার অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয়েছে। এরপর সে সমবেত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, হে জনতা! সে আমার পরে আর কারো সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারবে না। দাজ্জাল তাকে ধরে জবাই করার অনেক চেষ্টা করবে। কিন্তু পারবে না। আল্লাহ্ তার স্কন্ধদেশ করে দিবেন তাম্রআবৃত। ব্যর্থ দাজ্জাল তখন তার লোকদেরকে হুকুম করবে, একে হাত পা বেঁধে আগুনে ফেলে দাও। তারা হুকুম মতো আমল করবে। মনে করবে তাকে আগুনে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু সে গিয়ে পড়বে জান্নাতে। আল্লাহ্র কাছে সে গৃহীত হবে শ্রেষ্ঠ শহীদ হিসেবে। মুসলিম।

হজরত আনাস থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দাজ্জালের সঙ্গে থাকবে ইসপাহানের সত্তর হাজার ইহুদী। তাদের সকলের পরনে থাকবে রাজকীয় উত্তরীয়। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, দাজ্জাল গিরিপথ ধরে মদীনায় প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু মদীনায় তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই সে অবস্থান করবে মদীনার নিকটবর্তী এক গোলোযোগপূর্ণ স্থানে। মদীনা থেকে এক উত্তম ব্যক্তি তার কাছে সাক্ষাত করতে যাবে। দাজ্জাল উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমি যদি এই লোকটিকে হত্যা করার পর পুনরায় জীবিত করি, তবে তোমরা কি আর আমার কথায় সন্দেহ করতে পারবে? জনতা বলবে, না। দাজ্জাল তখন ওই উত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করার পর পুনরায় তাকে জীবিত করবে। ওই ব্যক্তি তখন উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠবে, শপথ আল্লাহ্র! তুমি কাফের। তোমার বিষয়ে আগে আমি এতো সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারিনি। দাজ্জাল তাকে আবার হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু পারবে না। হজরত আবু বকর থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, দাজ্জাল ভয়ে মদীনায় প্রবেশ করবে না। তখন মদীনার সাতটি প্রবেশপথের প্রতিটিতে প্রহরীরূপে নিযুক্ত থাকবে দু'জন করে ফেরেশতা।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পূর্ব দিকের খোরাসান নামক এক দেশ থেকে দাজ্জালের আগমন ঘটবে। বহু লোক থাকবে তার পশ্চাতে। তাদের চেহারা হবে এমন, যেনো হাতুড়ি দিয়ে পেটানো কোনো ঢাল। হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ ইবনে সাকান থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন— দাজ্জাল পৃথিবীতে চল্লিশ বৎসর থাকবে, যার প্রতিটি

বৎসর হবে এক মাসের সমান, এক মাস হবে এক সপ্তাহের সমান এবং প্রতিটি দিন হবে খেজুর গাছের ডাল সদৃশ, যা পুড়ে যায় স্বল্প সময়ের মধ্যে। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার তাজবিশিষ্ট লোক (রাজা, নবাব) তার পেছনে থাকবে। হজরত আবু উমামা থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেদিন সত্তর হাজার মুকুটশোভিত ইহুদী সুদৃশ্য তরবারীসজ্জিত অবস্থায় অবস্থান গ্রহণ করবে দাজ্জালের পশ্চাতে।

হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনসারিয়া বর্ণনা করেছেন, একদিন আমার গৃহে রসুল স. এর শুভ পদার্পণ ঘটলো। তখন দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, তার আবির্ভাবের পর পরস্পরলগ্ন তিনটি বৎসর হবে এরকম— প্রথম বৎসর বৃষ্টির এক তৃতীয়াংশ আটকে রাখবে আকাশ এবং ফল-ফসল উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ আটকে রাখবে মাটি। পরের বৎসরে তারা বৃষ্টি ও ফল-ফসল আটকে রাখবে দুই তৃতীয়াংশ করে। এর পরের বৎসর বৃষ্টিপাত একেবারেই হবে না। মাটিতে উৎপাদিত হবে না কোনো শস্য। ফলে দেখা দিবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। খুর ও শ্মশ্রুবিশিষ্ট পশুরা সকলেই মরে যাবে। দাজ্জাল শুরু করবে প্রতারণা। সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে এক আরববাসীর সঙ্গে। তাকে গিয়ে বলবে, আমি যদি তোমার মৃত উটগুলোকে জীবিত করে দেই তবে কি তুমি আমাকে প্রতিপালক বলে স্বীকার করবে না? আরববাসী জবাব দিবে, অবশ্যই করবো। সে তখন শয়তানদেরকে উটের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেখাবে। সেই উটগুলোর থাকবে বড় বড় ওলান ও কুঁজ। পিতা ও ভাই হারানো আর এক লোকের কাছে গিয়ে সে বলবে, তোমার মৃত পিতা ও ভাইকে যদি আমি পুনর্জীবিত করি, তবুও কি তুমি আমাকে প্রতিপালক বলে মানবে না? লোকটি বলবে, নিশ্চয় মানবো। দাজ্জাল তখন দু'জন শয়তানকে তার পিতা ও ভ্রাতার আকৃতিতে হাজির করবে। এ পর্যন্ত বলবার পর রসুল স. কোনো এক কাজে বাইরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এসে দেখলেন, সমবেত সাহাবীগণ বিষণ্ন ও মৌন হয়ে বসে আছেন। তিনি স. দরজার দুই প্রান্ত ধরে বললেন, আসমা! কী ব্যাপার, সকলে এরকম চুপচাপ কেনো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি যা বললেন, তা শুনে আমরা ভয়ে-আতংকে স্তম্ভিত।

তিনি স. বললেন, আমার পৃথিবীবাসের সময়ে সে এলে আমি তাকে প্রতিহত করবো। অন্যথায় বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছেন আল্লাহ্। আমি না থাকলেও আল্লাহ্ তো থাকবেন। আমি বললাম, হে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ! আমরা আটা দিয়ে খামির তৈরী করি। রুটি পাক হওয়ার আগেই হয়ে পড়ি ক্ষুধার্ত। তাহলে মুমিনদের তখন কী হাল হবে? তিনি স. বললেন, তখন আল্লাহ্র স্মরণ ও তসবীহ পাঠই হবে তাদের জন্য যথেষ্ট, যেমন তা যথেষ্ট হয় আকাশবাসীদের জন্য। আহমদ, বাগবী।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত মুগীরা ইবনে শোবা বলেছেন, আমিই রসুল স.কে দাজ্জাল সম্পর্কে সর্বাধিক প্রশ্ন করেছি। তিনি স. বলেছেন, সে তোমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। আমি একবার বলেছিলাম, হে

আল্লাহ্র বার্তাবাহক! লোকে বলে, তার সঙ্গে নাকি থাকবে রুটির পাহাড় ও পানির সমুদ্র? তিনি স. বলেছিলেন, এ বিষয়টি তো আল্লাহ্র কাছে আরো বেশী সহজ (রুটি-পানির প্রয়োজন থেকে যিনি চিরঅমুখাপেক্ষী)।

পরের আয়াতে (৫৮) বলা হয়েছে— 'সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো'।

এখানে 'আ'মা' অর্থ অন্ধ, মূর্খ। 'বাসীর' অর্থ চক্ষুষ্মান, জ্ঞানী। 'ওয়াল্লাজীনা আমানু ওয়া আ'মিলুস সলিহাতি' অর্থ যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে। আর 'মুসীউ' অর্থ দুষ্কৃতিপরায়ণ। এভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায়— দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিসম্পন্নরা যেমন সমান নয়, তেমনি সমমর্যাদা সম্পন্ন নয় পুণ্যবান— বিশ্বাসী ও দৃষ্কৃতিকারীরা। কিন্তু এই দৃষ্টান্তটি থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে চাও না। দূর করতে চাও না দৃষ্টিহীনতা ও অবিশ্বাস।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না'।

এখানে 'আতিয়াতুন' অর্থ অবশ্যম্ভাবী। 'লা রইবা ফীহা' অর্থ এতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন বলেছেন কিয়ামত হবে, তখন তা হবেই। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব। 'ওয়া লাকিন্না আকছারান্ নাসি লা ইউ'মিনূন' অর্থ কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক অজ্ঞ, পাপিষ্ঠ। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা আড়ষ্ট ও সীমাবদ্ধ। সে কারণেই তারা আল্লাহ্র বাণীর মাহাত্ম্য, অনিবার্যতা ও মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহংকার বশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে'।

কোনো কোনো ধর্মজ্ঞ বলেছেন, এখানে 'তোমরা আমাকে ডাকো' অর্থ তোমরা আমার ইবাদত করো। এখানে 'উদ্উ'নী' অর্থ 'দোয়া' 'প্রার্থনা' বা ডাক, ব্যবহৃত হয়েছে 'ইবাদত' অর্থে। সেকারণেই পরক্ষণে 'পুণ্যদান করবো' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'আস্তাজিব্ লাকুম'। অর্থাৎ এখানে 'আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো' অর্থ আমি দান করবো তোমাদের ইবাদতের সওয়াব। এরকম অর্থকেই পরবর্তী বাক্যে স্পষ্ট করা হয়েছে এভাবে 'যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ' বাক্যে 'ইবাদত' শব্দটির দ্বারা।

তবে এ বিষয়টিও অস্পষ্ট নয় যে, প্রার্থনা ও ইবাদতের উদ্দেশ্য অভিন্ন। প্রার্থনা হচ্ছে নিজেকে দীনহীন ভেবে আল্লাহ্র কাছে চাওয়া, আর ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্র স্মরণমগ্ন হয়ে নিজের মুখাপেক্ষিতাকে প্রকাশ করা। দু'টোতেই ঘটে দাসত্বের বহির্প্রকাশ। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের সকল প্রয়োজনে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থী হয়, এমনকি তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও। ছাবেত বুনানীর বর্ণনায়

একথাগুলিও এসেছে— এমনকি তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে লবনটিও চেয়ে নিয়ো। জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তার জন্য প্রার্থী হয়ো আল্লাহ্র নিকট। হজরত নোমান ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, প্রার্থনাই ইবাদত। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহংকার বশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়'। আহমদ, হাকেম, আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান, তিরমিজি, নাসাঈ।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত নোমান বলেছেন, রসুল স. মিম্বরে আসীন ছিলেন। আমি স্বকর্ণে শুনলাম, তিনি স. বললেন 'ইন্নাদ্ দুয়া হুয়াল ইবাদাহ্'। এখানে 'হুয়া' হচ্ছে সর্বনাম। 'আল ইবাদাত' হচ্ছে বিধেয়, এর সঙ্গে 'আলিফ লাম' (আল) যুক্ত হওয়ায় বিষয়টি হয়ে পড়েছে সীমাবদ্ধ। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যবর্তীতে সর্বনাম যদি থাকে এবং বিধেয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে 'আলিফ লাম' তবে ওই বাক্যের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বিধেয়ের সীমাবদ্ধতা বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন 'ইন্নাল্লহা হুয়ার রাজ্জাক' অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো রিজিকদাতাই নেই। রিজিকদাতা কেবল তিনিই। কখনো কখনো আবার বিধেয়ের ক্ষেত্রে বুঝানো হয় উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতাকে। যেমন এক হাদিসে এসেছে, 'আল করম হুয়াত্ তাক্বওয়া ওয়াল হাসাবু হুয়াল ইমান'। অর্থাৎ তাক্বওয়াই হচ্ছে ইজ্জত, তাক্বওয়া ছাড়া কোনো ইজ্জত নেই এবং ইমানই হচ্ছে মূল কৌলিন্য, ইমান

ব্যতীত কোনো সম্পদ নেই। সুতরাং আলোচ্য হাদিসটি উভয় অর্থেই প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন— ১. দোয়াই ইবাদত এবং ২. ইবাদতই দোয়া। এই সীমাবদ্ধতা আধিক্য পর্যায়ের। হয়তো এর উদ্দেশ্য একথা বলা যে— দোয়া ও ইবাদতের মূলতত্ত্ব একই। প্রতিটি দোয়াই ইবাদত। প্রতিটি প্রার্থনাই দাসত্ব। প্রার্থনার মধ্যে প্রকাশ পায় প্রার্থনাকারীর বিনয়, অসহায়তা ও মুখাপেক্ষিতা। অভিধানে দাসত্ব বলা হয়েছে বিনয়, অসহায়তা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশকেই। আর 'ইবাদত' শব্দটি 'উবুদিয়াত' এর চেয়ে অধিক ব্যঞ্জনাময়। নম্রতা, উপায়বিহীনতা ও মুখাপেক্ষিতার চূড়ান্ত প্রকাশই হচ্ছে ইবাদত। আর এমতো ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেবলই আল্লাহ্। আল্লাহ্ স্বয়ং এরশাদ করেছেন 'তোমার পালনকর্তা স্বয়ং আদেশ করছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কোরো না'। আবার একথাও ঠিক যে, সকল দাসত্বই প্রার্থনা পদবাচ্য। রসুল স. বলেছেন, নবীগণের এবং অধিকাংশ প্রার্থনাকারীর আরাফাতের প্রার্থনা ছিলো এরকম— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহ্দাহু লা শরীকা লাহু লাহুল মুল্‌ক্ ওয়া লাহুল হামদ্ ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বদীর'। (তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, সাম্রাজ্য কেবল তাঁর, প্রশংসাপ্রাপ্তিও তাঁর এবং সকল ক্ষমতাও তাঁর)। ইবনে আবী শাইবা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' (তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি ঘটে সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র, এই বলে)।

'নেহায়া' গ্রন্থে জযরী লিখেছেন, তাহলীল (লাইলাহা ইল্লাল্লহ্) ও তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ্) পাঠকেও দোয়া বলা হয়েছে এজন্য যে, এর দ্বারাও সওয়াব লাভ হয়। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, বান্দা যখন দোয়া করার বদলে আমার প্রশংসায় রত থাকে, তখন আমি প্রার্থনাকারীর চেয়ে বেশী দান করি প্রশংসাকারীকে। তিরমিজি ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, কোরআনপাঠ যাকে আমার জিকির ও আমার কাছে দোয়া করা থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে দান করি যাঞ্চাকারীর চেয়েও বেশী। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ বলেন, কোরআনপাক ও জিকির, যা আমার কাছে যাঞ্চা করা থেকে বিরত রাখে, তাই-ই উত্তম।

দোয়ার ব্যাখ্যাঃ কোনো কোনো দোয়া অত্যাবশ্যক (ফরজ) কর্তব্যরূপে পালনীয়। যেমন নামাজে সুরা ফাতেহার 'ইহ্দিনাস্ সিরত্বল মুসতাক্বীম' (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো)। কোনো কোনো দোয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা পর্যায়ভূত। যেমন নামাজের শেষ বৈঠকে পঠিতব্য দোয়া। অথবা হজ পালনরত অবস্থায় পঠিতব্য দোয়াসমূহ। আবার কোনো কোনো দোয়া হারাম। যেমন দুনিয়ার আনন্দফূর্তির উপকরণাদি প্রাপ্তির দোয়া, অথবা এমন কিছু চাওয়া, যা পাপ কিংবা অসম্ভব। যেমন আল্লাহ্ বলেন, কিছু কিছু লোক বলে 'রব্বানা আ'তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও'— এ ধরনের প্রার্থনাকারীদের জন্য আখেরাতে কোনো অংশ থাকে না। আল্লাহ্ এরকমও বলেন, কোনো কোনো ব্যক্তিকে কোনো কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে, তোমরা সকল শ্রেষ্ঠত্বের আশা কোরো না।

অভাবী ব্যক্তি তার প্রয়োজন পূরণার্থে এবং কেউ পাপ থেকে আশ্রয় যাচনার্থে প্রার্থনা করলে তা হবে মোস্তাহাব। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু কোনো কোনো সুফীসাধক বলেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে কিছু না চাওয়াই উত্তম। এতে করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি এবং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার দৃঢ়তা প্রকাশ পায় অধিক। আবার বিদ্বানগণের আর এক দল এরকমও বলেন যে, অন্যের জন্য দোয়া করা উত্তম। নিজের জন্য নয়। আমাদের দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসুল স. এর হাদিস এবং উম্মতের ঐকমত্য। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাসান বসরী ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোয়া অপেক্ষা অন্য কোনো কিছু আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয় নয়। ইবনে মাজা এবং হাকেমও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদতের নির্যাস।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য যাচনা করো। কেননা এরকম যাচনা তাঁর পছন্দ। সুতরাং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক্ষা হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থী হয় না, আল্লাহ্ তাঁর উপর অতুষ্ট হন। তিরমিজি, ইবনে হাব্বান, হাকেম।

তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর। এধরনের হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দম্ভবশতঃ যারা প্রার্থনা থেকে বিমুখ থাকে আল্লাহ তাদের প্রতি নারাজ। সে কারণেই তিনি এরশাদ করেছেন 'যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে'।

হজরত আনাস থেকে ইবনে হাব্বান ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, প্রার্থনা করতে কার্পণ্য কোরো না। প্রার্থনারত অবস্থায় আল্লাহ্ কাউকে ধ্বংস করেন না। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোয়া হচ্ছে বিশ্বাসীর আত্মরক্ষাস্ত্র, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ-পৃথিবীর আলোকবর্তিকা। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল

স. বলেছেন, যার জন্য যাচনার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে, তার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে অনুগ্রহের দরোজাও। আর নিরাপত্তা যাচনাই আল্লাহ্‌র কাছে যাচিত বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। তিরমিজি। হাকেমের 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে 'অনুগ্রহের দরোজা'র পরিবর্তে বলা হয়েছে 'জান্নাতের দরোজা'।

প্রার্থনা পূরণের অঙ্গীকার ঃ হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার জন্য অনুগ্রহের দুয়ার উন্মোচন করা হয়েছে তার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে দোয়া কবুল হওয়ার দুয়ারও। ইবনে আবী শায়বা।

হজরত সালমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রভুপালনকর্তা বড়ই ব্রীড়াশীল ও মমতাময়। প্রার্থনাকারীর প্রসারিত শূন্য হস্ত ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জা পান। তিরমিজি, আবু দাউদ, বায়হাকী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে মুসলমান এমন দোয়া করে যাতে নেই কোনো পাপপ্রবণতা, নেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী কোন বিষয়,— আল্লাহ্ তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি অবশ্যই করেন— ১. তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থনা পূরণ করেন ২. প্রার্থনাকে স্থগিত রাখেন পরকালের জন্য ৩. বিলোপ করে দেন প্রার্থনার সমপরিমাণ পাপ। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমরা যদি অত্যধিক প্রার্থনা করি। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে অনেক কিছু আছে। আহমদ।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রার্থনায় যদি পাপ না থাকে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যদি ছিন্ন না করা হয়, তবে বান্দার প্রার্থনা অবশ্যই কবুল করা হয়, যদি প্রার্থনাকারী তার প্রার্থনা পূরণের ব্যাপারে ত্বরাপ্রবণ না হয়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! ত্বরাপ্রবণতা আবার কী রকম? তিনি স. বললেন, যেমন প্রার্থনাকারী বলে, আমি এতো দোয়া করছি, কিন্তু কবুল হচ্ছে না। শেষে সে ক্লান্ত হয়ে দোয়া করাই ছেড়ে দেয়। মুসলিম।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দোয়া সেই সকল বিপদাপদ থেকে বাঁচায়, যেগুলো ইতোমধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে এবং পরিত্রাণ দিয়ে থাকে ওই সকল বিপদ-মুসিবত থেকে, যা অদূর ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হতো। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! প্রার্থনার প্রতি মনোযোগী হও। তিরমিজি।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং হজরত জাবের থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কেউ আল্লাহ্‌র কাছে চাইলে আল্লাহ্ তা মঞ্জুর করেন। অথবা তার চাহিদা মতো স্থগিত করে দেন তার দুঃখ-কষ্ট, অবশ্য তার ওই প্রার্থনা যদি হয় পাপমুক্ত ও আত্মীয়তার বন্ধনছিন্নবিবর্জিত। তিরমিজিও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

কারো প্রার্থনাই অগ্রাহ্য হয় না ঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন রকম প্রার্থনা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই— ১. পিতার ২. শোষিতের এবং ৩. মুসাফিরের। তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা। হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের প্রার্থীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয় না— ১. ইফতারের সময় রোজাদারের প্রার্থনা ২. ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের প্রার্থনা ৩. অত্যাচারিতের প্রার্থনা। অত্যাচারিতের অপপ্রার্থনা আকাশে উঠে যায় এবং তার জন্য খুলে দেওয়া হয় আকাশের দরোজা। মহান প্রভুপালনকর্তা তখন তার সম্মানের শপথ করে বলেন, আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো, কিছুটা বিলম্ব হলেও। তিরমিজি।

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অনুপস্থিত মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভ্রাতার দোয়া কবুল করা হয়। সে যখন তার ভ্রাতার কল্যাণ প্রার্থনা করে, তখন ফেরেশতারা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলে 'আমিন' (তাই হোক)। মুসলিম।

হজরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. শুভ সংবাদ দিয়েছেন, পাঁচ ধরনের প্রার্থনা কবুল করা হয়ে থাকে— ১. অত্যাচারিতের প্রার্থনা, যে পর্যন্ত তার প্রতিশোধ পূর্ণ না হয় ২. হাজীর প্রার্থনা, যে পর্যন্ত না গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ৩. রোগীর প্রার্থনা, যতক্ষণ না সে সুস্থ হয় ৪. অনুপস্থিত মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভ্রাতার প্রার্থনা ৫. এর পরেই তিনি স. বললেন সবচেয়ে দ্রুত যে প্রার্থনা কবুল করা হয়, তা হচ্ছে মুসলমান ভ্রাতার জন্য মুসলমানের দোয়া, যা করা হয় তার অসাক্ষাতে। তিরমিজি, আবু দাউদ।

দোয়া কবুল হওয়ার শর্তসমূহ ঃ ১. পানাহার ও পরিধেয় পবিত্র হতে হবে। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দীর্ঘ সফরের ধুলিধূসরিত কেশযুক্ত মুসাফির যদি আকাশের দিকে হস্ত উত্তোলনে চিৎকার করে প্রার্থনা করতে থাকে 'হে আমার প্রভুপালনকর্তা' 'হে আমার প্রভুপালক' তবু তার প্রার্থনা কবুল করা হবে না, যদি তার পানাহারের সামগ্রী ও পরিধেয় বস্ত্র হয় হারাম উপার্জনের। মুসলিম। ২. প্রার্থনা হতে হবে নিবিষ্টচিত্ত ও একাগ্র। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা রেখে প্রার্থনা কোরো। এ বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা কোরো যে, মনোযোগবিহীন প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেন না। ৩. প্রার্থনা উপস্থাপন করতে হয় দৃঢ়তার সঙ্গে। হজরত আবু হোরায়রা বলেন— রসুল স. বলেছেন, কেউ

যেনো তার প্রার্থনায় এরকম না বলে যে, হে আল্লাহ্! তুমি যদি চাও, তবে আমাকে ক্ষমা করো। বরং সে যেনো অন্তরে দৃঢ় আশা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তাকে বিমুখ করবেন না। কেননা বান্দাকে কিছু দান করা তাঁর জন্য অতি সহজ। মুসলিম।

প্রার্থনার শিষ্টাচার ঃ হজরত ফুজালা ইবনে উবাইদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একদিন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক লোক সেখানে ঢুকে নামাজ পাঠ করতে শুরু করলো। নামাজ সমাপনের পর সে দোয়া করতে শুরু করলো, হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার উপর অনুগ্রহ করো। রসুল স. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে নামাজী! তুমি তোমার প্রার্থনায় তড়িঘড়ি করছো। প্রথমে উচ্চারণ করো ওই সকল বাক্য যেগুলোতে রয়েছে আল্লাহ্র প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমার ঘোষণা, এরপর আমার উপরে দরূদ পাঠ করো, তারপর চাও, যা চাওয়ার। কিছুক্ষণ পর আর এক লোক মসজিদে ঢুকে নামাজ পাঠ করলো। তারপর আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা এবং রসুল স. এর প্রতি দরূদ পাঠের পর শুরু করলো তার দোয়া। রসুল স. তা দেখে মন্তব্য করলেন, এবার তোমার প্রার্থনা গৃহীত হবে। তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ।

হজরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, একবার আমি রসুল স. এর সন্নিকটে নামাজ পাঠ করলাম। এরপর সম্পন্ন করলাম আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা ও দরূদ পাঠ পর্ব। তারপর শুরু করলাম প্রার্থনা। রসুল স. বললেন, হ্যাঁ, চেয়ে নাও। তোমাকে দেওয়া হবে। তিরমিজি।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, দোয়াকে আটকে রাখা হয় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে, প্রার্থনাকারী দরূদ শরীফ পাঠ না করা পর্যন্ত তার দোয়া উর্ধ্বলোকে উত্থিত হয় না। তিরমিজি। হজরত মালেক ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, প্রার্থনার সময় তোমরা হাতের তালুদ্বয়কে আকাশের দিকে প্রসারিত অবস্থায় রেখো। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, তোমরা হাতের তালু প্রসারিত করে প্রার্থনা উপস্থিত করো, হাতের বিপরীত দিক প্রসারিত কোরো না এবং প্রার্থনা শেষে হাতের তালুদ্বয় বুলিয়ে নিয়ো মুখমণ্ডলের উপর।

হজরত ওমর বলেছেন, রসুল স. প্রার্থনার সময়ের উত্তোলিত হাত মুখমণ্ডলে বুলিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত নিচে নামাতেন না। তিরমিজি। জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. প্রার্থনাকালে পছন্দ করতেন গভীর অর্থবহ শব্দসমূহকে। অন্যান্য শব্দাবলীর দিকে দৃকপাত করতেন না। আবু দাউদ।

হজরত আনাস বলেছেন, রসুল স. প্রার্থনার সময় তাঁর দু'হাত এতোদূর পর্যন্ত ওঠাতেন, তাঁর পবিত্র বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হতো। সায়েব ইবনে ইয়াজিদ বলেছেন, রসুল স. দোয়া করার পর দুই হাত মুখের উপর বুলিয়ে নিতেন। বায়হাকী। ইকরামার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস আমাকে বলেছেন, তুমি দোয়া করার সময় তোমার দুই হাত তুলবে কাঁধ পর্যন্ত, অথবা কাঁধের

কাছাকাছি। আবু দাউদ। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, দোয়া করার সময় অধিক উপরে হাত ওঠানো বেদাত। রসুল স. বুকের চেয়ে বেশী উপরে হাত ওঠাতেন না। আহমদ। হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, রসুল স. যখন কারো কথা বলতেন ও তার জন্য দোয়া করতেন, তখন তিনি দোয়া শুরু করতেন নিজের থেকে। তিরমিজি।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮

তাফসীরে মাযহারী/৩৫৯

❑ আল্লাহ্ই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রিকে এবং আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন দিবসকে। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

❑ তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং তোমাদিগকে কোথায় ফিরাইয়া নেওয়া হইতেছে?

❑ এইভাবেই বিপথগামী করা হয় তাহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

❑ আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করিয়াছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন এবং

তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুন্দর এবং তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক; তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ কত মহান!

❑ তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং তোমরা তাঁহাকেই ডাক, তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই।

❑ বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে যখন আমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে।

❑ 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর 'আলাকাঃ হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হইয়া যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটে ইহার পূর্বেই! যাহাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

❑ 'তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি উহার জন্য বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ্ই তো রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন তোমাদের উপকারের জন্য, যেনো রাতে তোমরা আরাম করতে পারো এবং আলোকিত দিবসে সম্পন্ন করতে পারো পার্থিব কাজকর্ম। দ্যাখো, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কতো অনুকম্পাপরবশ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র অনুকম্পায় শ্রদ্ধাবনত নয়। তাই তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অত্যাবশ্যকতা পরিত্যাগ করে হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ।

এখানে 'লা ইয়াশ্কুরূন' অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র দানের গুরুত্ব ও মহিমা বুঝতে পারে না। 'মানুষ' (আন্নাস) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে এখানে দু'বার। এখানে অধিকাংশ মানুষের অকৃতজ্ঞ হওয়ার বিষয়টিকে অধিকতর

গুরুত্ববহ ও নিন্দার্হ করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন 'ইন্নাল ইন্সানা লা জলুমুন কাফ্ফার' (নিশ্চয় মানুষ অত্যধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ)।

পরের আয়াতে (৬২) বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই; সুতরাং তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে'? একথার অর্থ— তোমাদের প্রভুপালনকর্তা আল্লাহ্ই সকল কিছুর সৃজক। তিনি ব্যতীত উপাস্য আর কেউই নেই। অথচ হে অংশীবাদী জনগোষ্ঠী! তোমরা তাঁর ইবাদতে সমর্পিত না হয়ে প্রতিমাপূজাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছো কেনো? কেনো হয়ে যাচ্ছো বিপথগামী?

এরপরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে— 'এভাবেই বিপথগামী করা হয় তাদেরকে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে'। একথার অর্থ— এভাবেই মক্কার মুশরিকেরা তাদের অধীনস্থ ও অনুগতদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। অস্বীকার করে আল্লাহ্র বাণীসম্ভারকে।

এরপরের আয়াতে (৬৪) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিজিক; তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ কতো মহান'।

এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে আল্লাহ্র সৃজন ও প্রতিপালনের কয়েকটি প্রমাণ। যেমন— পৃথিবীকে বাসোপযোগী করা, আকাশকে ছাদস্বরূপ করা, মানুষের আকৃতি নির্ণয় এবং সে আকৃতিকে সুন্দর করা এবং তাদেরকে জীবনোপকরণ দান করা। শেষে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দ্যাখো, যিনি এতোকিছু করেন, তিনি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ নন। তিনিই সকলকিছুর একমাত্র সৃজয়িতা ও পালয়িতা। সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং তোমরা বোঝো এবং স্বীকার করো যে, তিনিই মহান এবং তিনিই উপাস্য।

এখানে 'কৃরর' অর্থ বাসস্থান, বাসোপযোগী স্থান। 'বিনাআন 'অর্থ ছাদ। 'ফা আহসানা সুওয়ারা কুম' অর্থ তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর। করেছেন পরিমিত উচ্চতা, সুসঙ্গত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৃষ্টিনন্দন গাত্রচর্ম, সুঠাম ও সৌকর্যমণ্ডিত অবয়ববিশিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ মানুষকে করেছেন আকর্ষণীয় দেহ-সৌষ্ঠব ও সুষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী। সে হাত দিয়ে খাবার গ্রহণ করে। আর অন্যান্য প্রাণী আহার গ্রহণ করে মুখ দিয়ে। 'রযাক্বাকুম্ মিনাত্ ত্বইয়্যিবাত্' অর্থ উৎকৃষ্ট রিজিক, সুস্বাদু পানাহারের সামগ্রী।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— 'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা তাকেই ডাকো, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই'।

এখানে 'হাইউ' অর্থ চিরঞ্জীব, আনুরূপ্যবিহীন, শাশ্বত ও স্বতিষ্ঠরূপে আয়ুষ্মান, যা সত্তাগত, স্বভাবজ ও অনিবার্য।

'ফাদ্উ'হু মুখলিসীনা লাহুদ্ দীন' অর্থ সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাকো, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। এখানে 'ফাদ্উ'হু' এর 'ফা' হচ্ছে নৈমিত্তিক। অর্থাৎ এর পূর্ববর্তী বাক্য পরবর্তী বাক্যের নিমিত্ত। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্র বর্ণিত গুণাবলীতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁর ইবাদত করো। 'আদ্দীন' অর্থ এখানে বশ্যতা, ভক্তি। আর বশ্যতা ও ভক্তিকে একনিষ্ঠ করার অর্থ হচ্ছে অংশীবাদিতা ও কপটতা থেকে ইবাদতকে পবিত্র করা।

'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' অর্থ সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ— তোমরা এই বাক্যটি উচ্চারণ করে আল্লাহ্কে আহ্বান করো। ফাররা বলেছেন, বাক্যটি বিধেয় এবং এই বিধেয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে আদেশ। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি জগতসমূহের প্রভুপালক।

মুজাহিদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু' পাঠ করার পর বলা উচিত 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন'। আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থ এটাই। হজরত ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, একবার ওলীদ ইবনে মুগীরা, শায়বা ইবনে রবীয়া প্রমুখ রসুল স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, মোহাম্মদ! তুমি তোমার কথা পরিত্যাগ করো এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমতানুসারী হও। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত (৬৬)।

বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করো, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম বার্তাবাহক! আপনি তাদের অপপ্রস্তাবের জবাব দিন এভাবে— বলুন, না। আমি তোমাদের প্রস্তাব মান্য করতে পারি না। কেননা আমি এই মর্মে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি যে, প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণও রয়েছে আমার কাছে। আর আমাকে এরকম প্রত্যাদেশও করা হয়েছে যে, আমি যেনো পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত হই কেবল বিশ্বসমূহের প্রভুপ্রতিপালকের প্রতি।

এখানে 'আলবাইয়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ, নির্দশন— যার সমর্থন পাওয়া যায় জ্ঞানবুদ্ধির সহায়তায় এবং যা বিরত রাখে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা থেকে। 'আন উসলিমা' অর্থ আত্মসমর্পণ করতে, আনুগত্য ও ইবাদতকে অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র রাখতে।

এরপরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর 'আলাক' থেকে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যেনো উপনীত হও

তোমাদের যৌবনে, তারপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে এর পূর্বেই। যাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও; এবং তোমরা অনুধাবন করতে পারো'।

এখানে 'ত্বিফলান্' অর্থ শিশু। শব্দটি এখানে একবচনরূপে উল্লেখ করে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে 'শিশু জাতি'দের। 'ইউখরিজুকুম' অর্থ বের করেন। অর্থাৎ তোমাদেরকে বহির্গত করেন মায়ের পেট থেকে। 'ছুম্মা লিতাবলুগূ' এর 'লাম' এর সম্পর্ক রয়েছে এখানে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তারপর তোমাদেরকে জীবিত রাখা হয়, যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হতে
পারো। 'মিন ক্বলূ' অর্থ এর পূর্বেই। অর্থাৎ যৌবনকাল, অথবা বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বেই। 'আজ্বালাম্ মুসাম্মা' অর্থ নির্ধারিত কাল, আয়ুষ্কাল। আর 'লাআ'ল্লাকুম তা'ক্বিলূন' অর্থ যেনো তোমরা অনুধাবন করতে পারো।

এরপরের আয়াতে (৬৮) বলা হয়েছে— 'তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন, তখন তিনি তার জন্য বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়'। এখানে 'ফা ইজা ক্বদ্বা' অর্থ যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন। এখানে 'ফা ইজা' এর 'ফা' এটাই প্রমাণ করে যে, এই বাণী পূর্বোক্ত বাণীর ফল। পূর্বে বলা হয়েছে— তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করতে সক্ষম। কোনো কিছুর সৃজন তাঁর পক্ষে অতি সহজ। 'কুন্' অর্থ হও। আর 'ফা ইয়াকুন' অর্থ আর তা হয়ে যায়। কোনো উপকরণ বা মৌলের কোনো প্রয়োজন হয় না।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮

❑ 'তুমি কি লক্ষ্য কর না উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে উহাদিগকে বিপথগামী করা হইতেছে?'

❑ যাহারা অস্বীকার করে কিতাব ও যাহা সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা; শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে—

❑ যখন উহাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকিবে, উহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে

❑ ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর উহাদিগকে দগ্ধ করা হইবে অগ্নিতে।

❑ পরে উহাদিগকে বলা হইবে, 'কোথায় তাহারা যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে,

❑ 'আল্লাহ্ ব্যতীত?' উহারা বলিবে, 'উহারা তো আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়াছে; বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহ্বান করি নাই।' এইভাবে আল্লাহ্ কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করেন।

❑ ইহা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে, তোমরা দম্ভ করিতে।

❑ তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিয়া প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!

❑ সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দেই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই— উহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

❑ আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমি তাহাদের কাহারও কাহারও কথা তোমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং কাহারও

কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নাই। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। আল্লাহ্‌র আদেশ আসিলে ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হইয়া যাইবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

প্রথমোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আল্লাহ্‌র বচনসম্ভারের বিষয়ে যারা কুটতর্কের অবতারণা করে, আপনি তাদের অবস্থা কি পর্যবেক্ষণ করেননি? দেখেননি কি যে, কীভাবে তারা আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত গ্রন্থাবলী ও আমার বার্তাবাহকগণের পথনির্দেশনাকে অগ্রাহ্য করে। ক্রমশঃ তলিয়ে যায়, যেতে থাকে বিপথগামিতার অতলে? কিন্তু তাদের এ অবস্থা তো চিরকালীন নয়। বরং এ পৃথিবীতে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে উপভোগের সাময়িক অবকাশ। শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে সত্যের স্বরূপ, যখন দেখবে তাদের গলায় পরানো হয়েছে লোহার বেড়ি ও শিকল। তাদেরকে তখন জোরপূর্বক টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে। তারপর করা হবে অগ্নিদগ্ধ।

এখানে 'আলাম তারা' (তুমি কি লক্ষ্য করো না) প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও বিস্ময়বোধক। এভাবে প্রশ্নটির সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! দেখুন তারা কতো অপরিণামদর্শী! তাই তো আল্লাহ্‌র বাণীসম্ভার নিয়ে শুরু করে কুটতর্ক। কী বিস্ময়! অথবা তারা বিরোধিতা করে আল্লাহ্‌র, রসুলের ও বিশ্বাসীগণের। পরের প্রশ্নটি (কীভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা) হচ্ছে ভীতিপ্রদর্শনমূলক ও তিরস্কারসূচক। কুটতর্কের কুফলকে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে এই প্রশ্নটির মাধ্যমে। অথবা ওই কুটতর্ককারীরা ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রশ্নও করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন করে। মোহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেছেন, এখানকার ৬৯ এবং ৭০ সংখ্যক আয়াত দু'টো অবতীর্ণ হয়েছে যথাক্রমে প্রতিমাপূজক ও কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। উল্লেখ্য পথভ্রষ্ট কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় মানুষকে মনে করে সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতাধর ও স্বাধীন।

একটি জিজ্ঞাসা ঃ কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় তো আল্লাহ্‌র কিতাব মানে এবং সকল পয়গম্বরকে সত্য বলে মানে, তাহলে তাদের সম্পর্কে এরকম বলা যায় কীভাবে যে তারা বিতণ্ডাকারিদের অন্তর্ভুক্ত?

জবাব ঃ কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় এই উম্মতের অগ্নিপূজকতুল্য। আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসুল স. এর বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সকল কিছুর স্রষ্টা, তিনি সর্বশক্তিধর। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তার অপরাধ মার্জনা করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তার অপরাধের কারণে শাস্তি দেন। ছোট বড় সব ধরনের পাপই তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন। তিনি যেমন চান, তেমনই করেন, যেমন আদেশ করতে চান, তেমনই আদেশ প্রবর্তন করেন। তিনি সকলের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর কাজের বিশ্লেষণ করার অধিকার ও সামর্থ্য কারোই নেই। অথচ কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায় এসকল কথা বিশ্বাস করে না। তদুপরি তারা পুলসিরাত, মিজান, শাফায়াত ইত্যাদিকেও অস্বীকার করে। সেকারণেই এখানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমার রসুলগণকে প্রেরণ করেছিলাম তা'।

এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'আল্‌লাজিনা কাজ্জাবু' (যারা অস্বীকার করে) থেকে শুরু হয়েছে পৃথক বাক্য। অর্থাৎ এটা বাক্যের উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'ফা সাওফা ইয়া'লামূন' (তারা খুব শীঘ্র জানতে পারবে)।

'ইউস্‌হাবূন' অর্থ শিকল থাকবে। অর্থাৎ শিকল দিয়ে বেঁধে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। 'ফীল্ হামিম' অর্থ ফুটন্ত পানিতে। 'ফীন্ নারি ইউস্‌জারুন' অর্থ তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। 'সাজার' অর্থ জ্বলন্ত চুল্লী।

মুকাতিল বলেছেন, তাদেরকে দিয়ে আগুনকে করা হবে অধিকতর তেজোদীপ্ত। মুজাহিদ বলেছেন তাদেরকে করা হবে জ্বালানী। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে বিভিন্নভাবে। কখনো ফুটন্ত পানির শাস্তি, কখনো প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তি। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার মাথার উপরের দিকে ইশারা করে বললেন, সীসার কোনো গোলা প্রথম আকাশ থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হলে তা রাত ভোর হওয়ার আগেই পৃথিবীতে পতিত হবে। কিন্তু দোজখের কিনার থেকে শিকলের কোনো গোলা নিক্ষেপ করলে তা দোজখের তলদেশে পৌঁছতে সময় লাগবে চল্লিশ বছর। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'পরে তাদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে (৭৩), আল্লাহ্ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা তো আমাদের নিকট থেকে উধাও হয়েছে; বস্তুত পূর্বে আমরা এমনকিছুকে আহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ্ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন (৭৪)। এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এজন্য যে, তোমরা দম্ভ করতে (৭৫)। তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরোজা দিয়ে প্রবেশ করো তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতোইনা নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল'(৭৬)।

‘দ্বল্লু’ অর্থ উধাও হয়েছে আমাদের দৃষ্টির বাইরে। এ প্রত্যুৎত্তর তারা করবে তখন, যখন তাদের উপাস্যগুলো তাদের সাথে থাকবে না । অথবা অর্থ হবে— তাদের নিকট থেকে আশাহত হলাম আমরা। হারিয়ে গেলো তারা।

কোনো কোনো আলেম এখানকার ‘বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহ্বান করিনি’ কথাটির অর্থ করেছেন— প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করিনি। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ‘আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না’। আবার কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য হবে এরকম— আমরা এমন কোনোকিছুর উপাসনা করিনি, যা না পারে আমাদের কোনো উপকার করতে, না পারে কোনো কষ্ট লাঘব করতে। হাসান ইবনে ফজল এর অর্থ করেছেন— আমাদের পূর্বের সকল উপাসনা হয়েছে নিষ্ফল।

‘এভাবে আল্লাহ্ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন’ অর্থ যে রীতিতে আল্লাহ্ মূর্তিপূজারী ও কাদ্‌রিয়া সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেন, সেই রীতিতেই বিভ্রান্তিতে নিপতিত করেন অন্যান্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে, যাতে তারা নির্দিষ্ট গন্তব্যে

পৌঁছানোর পথ না পায়। পেলেও সে পথে যেনো তারা না চলে। এর কারণ কী, তা-ও এখানে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে— এটা একারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এজন্য যে, তোমরা দম্ভ করতে। অর্থাৎ পৃথিবীর ভোগোন্মত্ততা ও অহংকারই হচ্ছে তোমাদের এমতো সর্বনাশের কারণ।

‘উদ্‌খুলু আব্‌ওয়াবা জাহান্নাম’ অর্থ তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরোজা দিয়ে প্রবেশ করো। ‘খলিদীনা ফীহা’ অর্থ স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। আর এখানকার ‘আর কতোই না নিকৃষ্ট জাহান্নামীদের আবাসস্থল’ অর্থ জাহান্নামে প্রবেশ করাটাই হবে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করার কারণ। তাই জাহান্নাম হচ্ছে অতীব নিকৃষ্টতম আবাসস্থল।

এরপরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— ‘সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য’। একথার অর্থ— সুতরাং হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি অংশীবাদীদের অপমন্তব্য ও অপব্যবহার প্রতিহত করুন ধৈর্য দিয়ে। তাদের উপরে বিজয়ী করার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ আপনাকে দিয়েছেন, তা যথাসময়ে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই— তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট’। এখানে ‘ফাইম্‌মা’ এর ‘ইম্‌মা’ এর মূলরূপ ছিলো ‘ইন্ মা’। ইন্ হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ এবং ‘মা’ অতিরিক্ত। শর্তকে বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ করার জন্যই গুরুত্ববহ ‘নুন’ (নুনে তামীজ)কে এখানে ক্রিয়াসন্নিহিত করা হয়েছে। ‘তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই’ অর্থ তাদের নিধনপর্ব ও বন্দীত্ব যদি এখনই আপনাকে দেখিয়ে দেই। ‘অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই’ অর্থ তাদেরকে শাস্তিগ্রস্ত করার আগেই যদি আপনার জীবনাবসান করা হয়। ‘তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট’ অর্থ তাদের পার্থিব শাস্তি দানে যদি আমি ত্বরা করি, অথবা ঘটাই প্রলম্বায়ন, তবুও শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন? তখন তো তাদেরকে যথোপযুক্ত প্রতিফল দেওয়াই হবে। অর্থাৎ হে আমার নবী! আপনার পার্থিব জীবনে আপনি তাদের শাস্তি দেখতে পান, অথবা না-ই পান, শাস্তি তাদের হবেই।

এরপরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— ‘আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসুল প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি’। এখানে ‘রসুলান’ শব্দের তানভীন আধিক্যপ্রকাশক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনপদবাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে আমি বহুসংখ্যক নবী-রসুল প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু তাদের সকলের কথা আমি আপনাকে জানাইনি। জানিয়েছি কিছুসংখ্যকগণের কথা।

‘রসুলান’ শব্দে তানভীন যুক্ত হয়েছে সংখ্যাধিক্যের কারণে। হজরত লুবাবা থেকে আহমদ ও ইবনে রহওয়াই্ তাঁদের মসনদে, ইবনে হাব্বান তাঁর ‘সহীহ্’তে এবং হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছেন, রসুল স.কে একবার নবী-রসুলগণের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন এক লাখ চব্বিশ হাজার। তাঁদের মধ্যে রসুল কতোজন ছিলেন জানতে চাইলে বলেছিলেন, তিনশত তেরো জন। হজরত আবু জর গিফারী থেকেও ইবনে হাব্বান এরকম বর্ণনা করেছেন। অবশ্য কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল সাতাশ জন নবী-রসুলের কথা।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা কোনো রসুলের কাজ নয়’। একথার অর্থ নবী-রসুলগণ অলৌকিক নিদর্শন বা মোজেজা প্রদর্শন করেন আল্লাহ্‌র অনুমোদনক্রমে। স্বেচ্ছায় ও স্বশক্তিতে মোজেজা প্রদর্শন করার অধিকার অথবা ক্ষমতা তাদের নেই।

এরপর বলা হয়েছে— ‘আল্লাহ্‌র আদেশ এলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে’। একথার অর্থ— আল্লাহ্‌র শাস্তির আদেশ যখন অবতীর্ণ হবে তখন সবকিছুরই মীমাংসা হয়ে যাবে। আর তখন মিথ্যাধিষ্ঠিতরা

হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। সে ক্ষতি থেকে আর কোনোদিনও তারা পরিত্রাণ পাবে না। এখানে 'আম্রুল্লহ্' বলে বুঝানো হয়েছে নবীগণ এবং তাদের উম্মতের মধ্যেকার শেষ সিদ্ধান্তকে। আর 'বিলহাক্ব' অর্থ— অবিশ্বাসীদের শাস্তি হচ্ছে নবীগণ ও বিশ্বাসীদের বিজয় ও সহায়তা। 'মিথ্যাশ্রয়ী' বা মিথ্যাধিষ্ঠিত (মুব্‌ত্বিলূন) অর্থ ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, যারা যখন তখন বিভিন্ন প্রকার মোজেজা দেখতে চায়, কিন্তু মোজেজা দেখালেও ইমান আনে না।

সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫

❑ আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য আন'আম সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে উহাদের কতকের উপর তোমরা আরোহণ কর এবং কতক তোমরা আহার কর।

❑ ইহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার। তোমরা অন্তরে যাহা প্রয়োজন বোধ কর, ইহা দ্বারা যেন তাহা পূর্ণ করিতে পার, আর ইহাদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদিগকে বহন করা হয়।

❑ তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?

❑ উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হইয়াছিল? পৃথিবীতে তাহারা ছিল উহাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তাহারা যাহা করিত তাহা তাহাদের কোন কাজে আসে নাই।

❑ উহাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূল আসিত তখন উহারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করিত। উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহাই উহাদিগকে বেষ্টন করিল।

❑ অতঃপর উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন বলিল, 'আমরা এক আল্লাহ্তেই ঈমান আনিলাম এবং আমরা তাঁহার সহিত যাহাদিগকে শরীক করিতাম তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম।'

❑ উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদের ঈমান উহাদের কোন উপকারে আসিল না। আল্লাহ্র এই বিধান পূর্ব হইতেই তাঁহার বান্দাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু সমূহকে। তোমরা সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনো গুলোকে ব্যবহার করো বাহনরূপে। যেমন উট, ঘোড়া, গাধা। আবার কোনো কোনো গুলো হয় তোমাদের আহারের আমগ্রী। যেমন উট, গাভী, ভেড়া, ছাগল। ওগুলো থেকে তোমরা পাও আরো অনেক ধরনের উপকারী সামগ্রী।

যেমন দুধ, পনির, মাখন, ঘি, পশম, চুল, চামড়া, শিঙ। তোমরা যেভাবে চাও সেভাবেই তো ব্যবহার করতে পারো সেগুলোকে। ইচ্ছা মতো পূর্ণ করতে পারো তোমাদের প্রয়োজন। আবার জলপথের বাহনরূপে তোমাদের জন্য রয়েছে নৌকা, জাহাজ। এগুলোর নির্মাণ কৌশল তো তোমরা আয়ত্ত করেছো আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞান-বুদ্ধি থেকেই।

ভ্রমণ কখনো কখনো করা হয় ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থে। এরকম ভ্রমণ ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। আবার কখনো সফর হয় মোস্তাহাব পর্যায়ের। অর্থাৎ যা করলে পুণ্য সঞ্চিত হয়, না করলে পাপ হয় না। আর পানাহার করতে হয় কখনো জীবনধারণের অত্যাবশ্যক তাগিদে, আবার কখনো তা হয় কেবল আস্বাদনের ব্যাপার । সেজন্য এখানে শব্দব্যবহারে ঘটানো হয়েছে তারতম্য। আরোহণ করা ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে 'লি তারকাবু' ও 'লিতাব্লুগু' এবং আহার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'ওয়া মিনহা তা'কুলুন'।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। সুতরাং সোজাসুজি বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপের অসংখ্য নিদর্শন সতত পরিদৃশ্যমান করে রেখেছেন এই মহানিসর্গের পরতে পরতে। তদুপরি তিনি বিশেষ বিশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করেন তাঁর বচনবাহকগণের মাধ্যমে। অতএব হে মানুষ! তোমরা এই বিপুল নিদর্শনসম্ভারের কোনো একটিকেও তো প্রত্যাখ্যান করতে পারো না।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি, তাদের পূর্ববর্তীদের কী অবস্থা হয়েছিলো? পৃথিবীতে তারা ছিলো এদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক এবং কীর্তিতে ও শক্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করতো তা তাদের কাজে আসেনি'। একথার অর্থ— মক্কার অংশীবাদীরা তো নিতান্তই
অপরিণামদর্শী ও একদেশদর্শী। নতুবা তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে পূর্ববর্তী অংশীবাদীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলো দেখে সতর্ক হতে পারতো। সহজেই একথা বুঝতে পারতো যে, ওই সকল অবাধ্য জাতিগোষ্ঠীগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ, কীর্তিমান, শক্তিমান, দুর্ধর্ষ ও প্রতাপশালী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ ও তাঁর নবী রসুলগণকে অমান্য করে নিপাত হয়েছিলো। সুতরাং এদের সামনেও রয়েছে ভয়ংকর বিপদ। এরাও তো আত্মরক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং সত্যের আহ্বানকে উপেক্ষা করা অনুচিত। কিন্তু তাদের মতো এরাও যে চিরহতভাগা।

এখানে 'আফালাম্ ইয়াসীরু ফীল্ আরদ্ব' অর্থ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? অর্থাৎ মক্কাভূমির বাইরে বের হয়ে পূর্ববর্তী জামানার আদ, ছামুদ ইত্যাদি অবাধ্য জনগোষ্ঠীর বিনাশপ্রাপ্ত জনপদের ধ্বংসচিহ্নগুলো কি স্বচক্ষে অবলোকন করেনি? 'আকছারা মিনহুম' অর্থ সংখ্যায় অধিক। 'আশাদ্দা কুওয়া'তাও ও আছারা' অর্থ শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। 'কীর্তি' অর্থ তাদের দুর্ভেদ্য অট্টালিকাবিশিষ্ট শহর, নগর প্রাকার, দুর্গ ইত্যাদি। 'ফামা আগ্না আনহুম' অর্থ তা তাদের কোনো কাজে আসেনি। কথাটির 'মা' অংশটুকু না সূচক, অথবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন।

এরপরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসুল আসতো, তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করতো। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করলো'।

এখানে 'জ্ঞানের দম্ভ করতো' অর্থ তারা মনে করতো তাদের অংশীবাদিতাপূর্ণ ধর্মমতই শ্রেষ্ঠ। এই নিয়ে তাদের অহংকারেরও সীমা-পরিসীমা ছিলো না। অথচ তারা

ছিলো এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। সুস্থ ও শুভ বিবেক-বুদ্ধি বিবেচনা তাদের ছিলোই না। আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা কার্যকলাপ সম্পর্কে, প্রকৃতি সম্পর্কে, নক্ষত্ররাজির গতিবিধি ও প্রভাব সম্পর্কে তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো সীমাহীন কুসংস্কার ও অপবিশ্বাস। যেমন মক্কার মুশরিকদের বাপ-দাদা থেকে প্রাপ্ত বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিলো, পুনরুত্থান অসম্ভব। বিভ্রান্ত ইহুদীদের ধারণা ছিলো, বেহেশতে যাবে কেবল তারাই, খৃস্টানেরা বলতো, তারাই বেহেশতী ইত্যাদি। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ।

এরকমও হতে পারে যে, তারা বড়াই করতো পার্থিব বিষয়সমূহের জ্ঞানের। মনে করতো দৈহিক শক্তি, স্থাপত্য, বিভিন্ন সম্ভোগোপকরণ— এগুলোই আসল। নবীগণ তাদেরকে আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হতে বলতেন। এই বলে উপদেশ দিতেন যে, সাময়িক সম্ভোগাকর্ষণ ছিন্ন করে মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতার প্রতি মনোযোগী হও। নতুবা তোমাদের উপরে নেমে আসবে সর্বনাশা শাস্তি। কিন্তু তারা তাদের সদুপদেশাবলীর প্রতি দৃকপাত মাত্র করতো না । তাঁদেরকে মনে করতো তুচ্ছ ও বিদ্রূপের পাত্র। মনে করতো পার্থিব সাফল্যই মানুষের মূল আরাধ্য হওয়া সমীচীন, মনে করতো তাদের জ্ঞানই সঠিক। আবার কথাটির অর্থ এরকম হওয়াও সম্ভব যে, তারা এমন সব বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে অহমিকা প্রদর্শন করতো, যে জ্ঞান পরকালে কোনো কাজে আসবে না। যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, যাদুবিদ্যা এবং এমন সব আধিভৌতিক বিদ্যা যেগুলোর চর্চা করে গ্রীক দার্শনিকেরা, অথবা হিন্দুস্তানের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। কোনো এক কাহিনীতে বলা হয়েছে, আফ্লাতুন নামের গ্রীক দর্শনের এক পণ্ডিত হজরত ঈসাকে পরীক্ষা করার জন্য একবার প্রশ্ন করলো, যদি আকাশ ধনুক হয়, কালের বিপর্যয়সমূহ যদি হয় সেই ধনুকের তীর, মানুষ যদি হয় লক্ষ্যবস্তু এবং আল্লাহ্ যদি হন তীর নিক্ষেপকারী; তাহলে পালাবে কোনদিকে? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র দিকেই। এ জবাব শুনে সে বুঝলো যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্‌র

রসুল। তৎসত্ত্বেও সে ইমান আনলো না। অধিকন্তু সে মন্তব্য করলো, নবীগণ তো প্রেরিত হয় দরিদ্র বুদ্ধিহীনদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা তো মুক্তবুদ্ধির অধিকারী।

এক বর্ণনায় এসেছে, সাকরাত নামের গ্রীক দার্শনিককে একবার বলা হলো, রসুল মুসার নিকট যাও না কেনো? সে জবাব দিলো, আমি তো পথপ্রাপ্ত। আমার জন্য কোনো পথপ্রদর্শনকারীর প্রয়োজন নেই।

কোনো কোনো আলেম 'তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করতো' কথাটির ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, পয়গম্বরগণের কাছে আল্লাহ্ প্রদত্ত যে জ্ঞান ছিলো, তা নিয়ে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হাসি-তামাশা করতো, ভাবতো, তাদের ওই জ্ঞান অতি তুচ্ছ। এরকম ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে বলতে হয় এখানকার 'ফারিহু' (দম্ভ করতো) অর্থ 'দ্বাহিকু' (হাস্য-তামাশা) এবং 'ইয়াস্তাহ্যিয়ূ' অর্থ উপহাস এবং 'ইন্দাহুম' এর 'তারা' সর্বনাম 'রসুল' এর। পরের বাক্যটি (তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করলো) এ কথাকেই সমর্থন করে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার মনে করেন, এখানকার 'ফারিহু' সন্নিহিত সর্বনামও রসুলগণের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ রসুলগণ যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অজ্ঞতা, পথভ্রষ্টতা ও মন্দপরিণাম লক্ষ্য করেন, তখন তাঁরা এই ভেবে প্রীত ও কৃতজ্ঞ হন যে, আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় তাঁদেরকেই দান করেছেন প্রকৃত জ্ঞান। নবুয়তরূপ অনুগ্রহ সম্ভার। তখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের হাসি-ঠাট্টা তাদেরকেই বেষ্টন করে ফেলে।

এরপরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন বললো, আমরা এক আল্লাহ্তেই ইমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম'। একথার অর্থ— যখন তারা শাস্তির মুখোমুখি হলো, তখন তারা শাস্তির ভয়াবহতা দেখে আঁতকে উঠে বললো, আমরা স্বীকার করছি আমাদের জ্ঞান ছিলো মিথ্যা অহমিকায় ভরা, রসুলগণই সত্য বলেছেন, তাঁদের কথামতো আমরা এবার এক আল্লাহ্র উপরে ইমান আনলাম, পরিত্যাগ করলাম অপবিত্র অংশীবাদিতাকে।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো, তখন তাদের ইমান তাদের কোনো উপকারে এলো না'। একথার অর্থ— শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার সময় বিশ্বাস স্থাপনের সময় নয়। সে সময় তো মৃত্যুর পূর্বক্ষণে শেষ হয়ে যায়। তাই ওই সকল মৃত্যুপথযাত্রী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অসময়ের ইমান তখন তাদের কোনো কাজে আসেনি।

এরপর বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র এই বিধান পূর্ব থেকে চলে আসছে তাঁর বান্দাদের মধ্যে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফেরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়'। একথার অর্থ— মৃত্যু আগমনের পূর্বে তওবা করলে সে তওবা আল্লাহ্ গ্রহণ করেন এবং তওবা (সানুতপ্ত ও সলজ্জিত প্রত্যাবর্তন) ব্যতিরেকে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সময়ের ক্ষমাপ্রার্থনা তিনি কিছুতেই গ্রহণ করেন না। এটা হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাশ্বত রীতি। আর এ রীতি অনুসৃত হয়ে আসছে আবহমানকাল থেকে। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এই রীতিটিকে যথাযথরূপে মান্য করে না বলেই চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এখানে 'সুন্নাতাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্র এই বিধান বা রীতি। জুজায বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা সব সময় ক্ষতির মধ্যেই থাকে। কিন্তু সেই ক্ষতির স্বরূপ তাদের কাছে উদ্ভাসিত হয় তখন, যখন তারা দাঁড়ায় মৃত্যুর মুখোমুখি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। সকল উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর নবী-রসুল ভ্রাতৃবৃন্দ, পবিত্র বংশধর পরিবার-পরিজন ও সম্মানিত সহচরবৃন্দের প্রতি। আমিন।

সূরা হা-মীম, আস্-সাজ্বদা

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরা ৬ রুকু ও ৫৪ আয়াতবিশিষ্ট।

সূরা হা-মীম, আস্সাজ্বদাঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

❑ হা মীম!
❑ ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ।
❑ এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য,
❑ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সুতরাং উহারা শুনিবে না।
❑ উহারা বলে, 'তুমি যাহার প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।'
❑ বল, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। অতএব তোমরা তাঁহারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য—
❑ যাহারা যাকাত প্রদান করে না এবং উহারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।
❑ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে 'হা-মীম, তানযীলুম্ মিনার রহমানির রহীম'। এখানে 'হা-মীম' হচ্ছে উদ্দেশ্য এবং 'তানযীল' (অবতীর্ণ) হচ্ছে বিধেয়। কিন্তু 'হা-মীম' যদি হয় বর্ণের বিন্যাস, তবে এখানকার 'তানযীল' হবে একটি উহ্য উদ্দেশ্য এর বিধেয়। আখফাশ এর মতে 'তানযীল' যেহেতু বিশেষ্য; তাই তা অনির্দিষ্টবাচক হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'কিতাব'।

'হা-মীম' দিয়ে শুরু হয়েছে, কোরআন মজীদের এরকম সুরার সংখ্যা সাতটি। সেগুলোর সব কয়টিতে 'হা-মীম' উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে কোরআন

অবতীর্ণ হওয়ার কথা। সেগুলোর মধ্যে প্রারম্ভিক মিল যেমন রয়েছে, তেমনি মিল রয়েছে বাক-ভঙ্গির দিক থেকেও। অর্থগত দিক থেকেও তা সম্মিল। আর এখানে বলা হয়েছে— এই বাণী অবতীর্ণ হয়েছে সেই পবিত্রতম সত্তার পক্ষ থেকে, যিনি 'দয়াময়' (রহমান) এবং পরম দয়ালু (রহীম)।

'মুসতাদরাক' গ্রন্থে হাকেম এবং হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুসার ফলক থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে 'তোয়াহা' 'ত্ব সীন মীম'সম্বলিত সুরা এবং 'হা-মীম' শিরোনামসম্বলিত সুরাসমূহ।

আর আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের শেষাংশে 'রহমান' ও 'রহীম' আল্লাহ্র এই দুই নাম উল্লেখিত হওয়ায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, কোরআন হচ্ছে পার্থিব ও ধর্মীয় কল্যাণসমূহের কেন্দ্র। অর্থাৎ দ্বীন-দুনিয়ার সকল মঙ্গলের নির্যাস।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এই কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কোরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য (৩), সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সুতরাং তারা শুনবে না (৪)।

এখানে 'বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ' অর্থ এই কোরআনে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি, অতীত যুগের গুরুত্বপূর্ণ ইতিবৃত্তসমূহ ও অন্যান্য উপদেশাবলী। 'আরবী ভাষায় কোরআন' অর্থ যাঁর উপরে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই রসুল ও তাঁর সম্প্রদায় যেহেতু আরবীভাষী, তাই কোরআনও অবতীর্ণ হয়েছে আরবীতেই, যাতে করে আরবীয়রা এই কোরআনকে 'অবোধ্য' 'অস্পষ্ট' ইত্যাদি বলার অজুহাত খুঁজে না পায়। সহজে যেনো এর অর্থ বুঝতে পারে এবং সাদরে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে যেনো এর যথাঅনুসরণ । অর্থাৎ এটা আরবীয়গণের জন্য আল্লাহ্তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ। 'জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য' অর্থ কোরআন থেকে মহাকল্যাণ অর্জন করতে পারে কেবল

তারাই যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনা সুস্থ, শুভ ও স্বাভাবিক। যারা এরকম নয়, কোরআনের মূল্যায়ন তাদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব।

'সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী' অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্যই এই কোরআন উপকারী। তাঁরাই কল্যাণায়িত হতে পারেন এর শুভসংবাদ ও সতর্কবাণী থেকে। অন্যেরা নয়। তাই শেষে বলে দেওয়া হয়েছে— অনেকেই এই কোরআনের প্রতি বিমুখ। এর শুভ উপদেশাবলী শ্রবণের যোগ্যতাও তাদের নেই। এখানে 'সুতরাং তারা শুনবে না' অর্থ অন্ধ কুসংস্কারজনিত জেদ ও বিদ্বেষের কারণে তারা কোরআনের বক্তব্যব্যঞ্জনার প্রতি শ্রুতিবিমুখ। অথবা এখানে 'শুনবে না' অর্থ গ্রহণ করবে না বা মানবে না। যেমন আরবী প্রবাদবচনরূপে বলা হয় 'আমি অমুক লোকের জন্য অমুকের কাছে সুপারিশ করি, কিন্তু সে শোনে না। অর্থাৎ সে আমার কথা মানে না।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি'।

এখানে 'ক্বুলূবুনা ফী আকিণ্নাত্' অর্থ আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত। 'আকিন্নাত্' অর্থ পর্দা। শব্দটি 'কিনান' এর বহুবচন। 'মিম্মা তাদ্‌উ'না ইলাইহি' অর্থ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো। 'ফী আজানিনা ওয়াক্বরুন' অর্থ আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা। অর্থাৎ তোমার কথা যে আমরা শুনতেই পাই না। 'মিম্ বাইনিনা ওয়া বাইনিকা হিজাব্' অর্থ তোমার ও আমাদের
মধ্যে আছে অন্তরাল। শেষে বলা হয়েছে 'সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি'। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, সুতরাং হে মোহাম্মদ! তুমি তোমার বিশ্বাস নিয়ে থাকো, আর আমাদেরকে থাকতে দাও আমাদের বিশ্বাস নিয়ে। অযথা আমাদেরকে উত্যক্ত কোরো না। অথবা অর্থ— তুমি তোমার ধর্ম প্রচার করতে চাও করো, আমরাও তোমার প্রচেষ্টাকে প্রাণপনে বাধা দিয়ে যাব। তোমাকে বিজয়ী হতে আমরা দিবোই না। উল্লেখ্য, ইসলামের প্রতি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চূড়ান্ত অস্বীকৃতি ঘোষিত হয়েছে এই আয়াতের বক্তব্যে।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার কিছুসংখ্যক কুরায়েশ গোত্রপতিকে রসুল স. জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছো না কেনো? ইসলাম গ্রহণ করলে তো সমগ্র আরবের নেতৃত্ব এসে পড়বে তোমাদেরই হাতে। তারা বললো, আমরা তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না, বুঝতেও পারছি না। আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত। আবু জেহেল আবার একটি বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তার নিজের এবং রসুল স. এর মধ্যে পর্দা তৈরী করলো এবং বললো, মোহাম্মদ! তুমি যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর পর্দা-আচ্ছাদিত, আমাদের শ্রুতি এ বিষয়ে বধির, আর তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে আড়াল। রসুল স. বললেন, আমি চাই, তোমরা কেবল আমার দুটি কথা মেনে নাও— বলো, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রসুল। একথা শুনে তারা পশ্চাদপসরণ করলো। যেতে যেতে বলতে লাগলো, সে কি সকল উপাস্যের অধিকার দিতে চায় একজনকে। আশ্চর্য তো! এমন কথা তো আমরা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কখনোই শুনিনি। আর আমাদের মধ্যে এতো এতো গুরুত্বপূর্ণ লোক থাকতে তার কাছেই বা এসকল কথা অবতীর্ণ হবে কেনো? চলো চলো, আমরা আমাদের উপাস্য সমূহের বন্দনা-অর্চনা নিয়েই থাকি। এমন সময় রসুল স. সকাশে আবির্ভূত হলো জিবরাইল। বললো, ভ্রাতঃ মোহাম্মদ! আল্লাহ্ আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। আরো বলেছেন, ওরা বলে, ওরা নাকি বধির। যদি তাই হবে, তবে তারা কোরআন শুনে পালাবে কেনো? নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। তারা সবকিছু শুনেও না শোনার ভান করে। কেননা কোরআনের প্রতি এবং আপনার উপরে কোরআন অবতীর্ণ হয় বলে আপনার প্রতিও রয়েছে তাদের সীমাহীন অবজ্ঞা। পরের দিন তাদের দলের সত্তর জন লোক মিলে হাজির হলো রসুল স. সকাশে। বললো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করুন। রসুল স. তাদেরকে ইসলামের দীক্ষা দিলেন। পরে মৃদু হেসে বললেন, গতকাল তোমরা যে বললে, তোমাদের অন্তর

আবরণ-আচ্ছাদিত? তারা বললো, কাল আমরা ঠিক কথা বলিনি। যদি তাই হতো, তবে কি আমরা মহান ইসলাম ধর্মের আশ্রয় লাভ করতে পারতাম। আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি, আল্লাহ্‌র বাণী সত্য। আর আমাদের কথা ছিলো অসত্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অপরিসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী, আমরা নিঃস্ব এবং সর্ববিষয়ে তাঁরই অনুকম্পাপ্রার্থী।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বলো, আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। অতএব তোমরা তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো এবং তাঁরই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য— (৬) যারা জাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখেরাতেও অবিশ্বাসী' (৭)।

হাসান বসরী বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম রসুলকে বিনয় শিক্ষা দিয়েছেন। তাই এখানে বলতে বলেছেন, হে আমার প্রেমাস্পদ! আপনি তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদের মতোই তো মানুষ। কিন্তু আমি মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছি একারণে যে, আমাকে এ সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হয়েছে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। সুতরাং তোমরা জাগতিক ও পারত্রিক কল্যাণ অর্জনের জন্য আমার প্রতি প্রত্যাদেশিত নিদর্শনকে মান্য করো। এটা তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। অথবা এখানকার 'আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই' কথাটির অর্থ হবে— আমি মানব সম্প্রদায়ভূত, জ্বিন অথবা ফেরেশতাদের মধ্য থেকে কেউ নই যে, তোমরা সহজে মহাসত্যের শিক্ষা নিতে পারবে না। এরকমও নয় যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত কোনো বিশ্বাসের দিকে আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তো আহ্বান জানাচ্ছি সহজ সরল পথের দিকে, একমাত্র উপাস্য মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা এক আল্লাহ্র দিকে, যা সম্পূর্ণতই স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত ও বিধিসম্মত।

'অতএব তোমরা তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো এবং তাঁরই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করো' অর্থ কাজেই যিনি তোমাদের সৃজক ও পালক, তাঁর মনোনীত ধর্মাদর্শকেই তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং ইতোপূর্বের অংশীবাদিতা ও পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হও কেবল তাঁর সকাশে।

'ওয়াইলুল্ লিল্‌মুশরিকীন' অর্থ দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য। 'ওয়াইলুন' হচ্ছে শাস্তিবাচক শব্দ। এখানকার 'যারা জাকাত প্রদান করে না' কথাটিকে হজরত ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' কলেমায় বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ এই কলেমায় বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে নফসের জাকাত বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধতা। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— তারা আল্লাহ্র এককত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করে না। হাসান ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'জাকাত' অর্থ শরিয়ত নির্ধারিত ফরজ জাকাত, অংশীবাদীরা যার অপরিহার্য হওয়াকে স্বীকার করে না। এক বর্ণনায় এসেছে, জাকাত হচ্ছে ইসলামের সাঁকো। এই সাঁকো যে অতিক্রম করতে পেরেছে সে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে পতন থেকে এবং যে তা পারেনি, সে হয়ে গিয়েছে বরবাদ। মুকাতিল ও

জুহাক কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— তারা আল্লাহ্র পথে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে না। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'জাকাতে'র উদ্দেশ্য আসলে পবিত্রতা। অর্থাৎ তারা তাদের কর্মকাণ্ডকে পবিত্র করে না।

বায়যাবী লিখেছেন, ৭ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যে একথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য মূল বিশ্বাস যেমন অপরিহার্য, তেমনি অপরিহার্য শাখাগত আমলসমূহও। সুরা মুদ্দাছ্ছিরের 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না' আয়াতের ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে বলাও হয়েছে। অর্থাৎ জাকাত না দেওয়ার অর্থই হচ্ছে পরকালকে অস্বীকার করা। সেকারণেই পরকালে অবিশ্বাসী ও জাকাত প্রদানে অনীহ ব্যক্তিরা দুঃস্থ জনতাকে সাহায্য করাকে মনে করে অপচয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করা ও পরকালের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করার সঙ্গে জাকাত না দেওয়ার প্রসঙ্গটিকে একারণেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, স্বভাবতই ধনসম্পদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে প্রবল। সুতরাং আল্লাহ্র পথে অর্থব্যয় হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর ইমানের লক্ষণ। তাই বুঝতে হবে এখানে 'যারা জাকাত প্রদান করে না' বলে পরোক্ষভাবে ইমানদারদেরকেই জাকাত প্রদানের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং জাকাত না দেওয়াকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার'।

এখানে 'আজ্‌রুন্ গইরু মাম্‌নূন' অর্থ নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— যা অপ্রতুল নয়। মুকাতিল বলেছেন— যা অপূর্ণ নয়। মুজাহিদ বলেছেন— যা অগণন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন— যা পর্যাপ্ত।

সুদ্দী বলেছেন, যারা পঙ্গু, বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ, যারা যৌবনকালে ইবাদত করতো তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। বলা হয়েছে, যৌবনকালের মতো ইবাদত না করতে পারলেও তাদেরকে আগের মতোই সওয়াব দেওয়া হবে। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যৌবনে উত্তম আমলকারীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাকে হুকুম দেওয়া হয়, তারা যেনো তাদের জন্য সেরকমই নেক আমল লিখতে থাকে, যা তারা করতো সুস্থ অবস্থায়। এই আদেশ বলবৎ থাকে ততোদিন পর্যন্ত, যতোদিন তারা রোগমুক্ত না হয়।

হজরত আবু মুসা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কোনো বান্দা পীড়িত হয়ে পড়লে অথবা সফররত অবস্থায় থাকলে তার জন্য ওই সকল পুণ্যকর্মের প্রতিফল লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে, যা তারা করতো সুস্থ অথবা গৃহবাসী অবস্থায়।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান শারীরিক দুঃখকষ্টে পতিত হয়, তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাকে আদেশ করেন ওই সকল পুণ্য তাদের আমলনামায় লেখার জন্য, যেগুলো তারা অর্জন করতো সুস্থ অবস্থায়। এরপর যখন সে সুস্থ হয়, তখন আল্লাহ্ তার পাপসমূহও ধুয়ে মুছে

পবিত্র করে দেন। আর জীবন হরণ করলে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাকে করেন পুরস্কৃত। হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অসুস্থ অবস্থায় বান্দার জন্য সেই সকল পুণ্যকর্ম লেখা হয়, যা তারা করতো সুস্থ অবস্থায়।

সূরা হা-মীম, আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

❑ বল, 'তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতেছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক!

❑ তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারি দিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।

❑ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল, 'আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।'

❑ অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

❑ তবুও ইহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, 'আমি তো তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, 'আদ ও ছামুদের শাস্তির অনুরূপ।'

❑ যখন উহাদের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল উহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে এবং বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও 'ইবাদত করিও না।' তখন উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি অবশ্যই ফিরিশতা প্রেরণ করিতেন। অতএব তোমরা যাহা-সহ প্রেরিত হইয়াছ, আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম।'

❑ আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত এবং বলিত, 'আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?' উহারা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ্, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ উহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিত।

❑ অতঃপর আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইবার জন্য উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

❑ আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তো এই যে, আমি উহাদিগকে পথনির্দেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিয়াছিল। অতঃপর উহাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানিল উহাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ।

❑ আমি রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে, যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিত।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, তোমরা কি সেই সার্বভৌম ও একক সত্তাকে অস্বীকার করতে চাও, এবং নির্ধারণ করতে চাও তার সমকক্ষ, যিনি এই বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে? অথচ তিনি কেবল এই পৃথিবীরই সৃজনকর্তা নন, তিনি সৃজনকর্তা সমগ্র সৃষ্টির।

এখানকার প্রশ্নটি উপস্থাপন করা হয়েছে অংশীবাদীদেরকে ধমক দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে। বক্তব্যটি একটি অনুক্ত প্রশ্নের জবাব। ওই অনুক্ত প্রশ্নটি হচ্ছে— রসুল স. যখন এই মর্মে জানতে চাইলেন যে, হে আমার প্রভুপালক! ওরা যদি সত্য গ্রহণ করতে অনীহ হয়, পাপসমূহ থেকে তওবা না করে, তবে আমি তাদেরকে কী বলবো?

'ফী ইয়াওমাইন' অর্থ দুই দিনে। ওই দুই দিন হচ্ছে রবিবার ও সোমবার। 'রব্বুল আ'লামীন' অর্থ জগতসমূহের প্রতিপালক। অর্থাৎ অস্তিত্বশীল সকল সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা। বিশ্বজগতের জাতিগোষ্ঠী, শ্রেণী বহুপ্রকারের। সেকারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে মূল ধাতুর বহুবচন 'আ'লামীন' এবং এর বর্ণনায় বিবেকহীন সৃষ্টি অপেক্ষা বিবেকবান সৃষ্টিকেই দেওয়া হয়েছে অধিকতর প্রাধান্য।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'তিনি স্থাপন করেছেন পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং এতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন— খাদ্যের সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য'। একথার অর্থ— আর তিনি ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শৈলশ্রেণী, ভূমিতে রেখে দিয়েছেন উপকারপ্রদায়ক সামগ্রীসমূহ। পৃথিবীবাসীদের জন্য আহার্যের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। আর এ সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা তিনি সম্পন্ন করেছেন চারদিনে। সৃষ্টিরক্ষার এই সুষম ব্যবস্থার রহস্য জানতে পারে কেবল তারা, যারা অনুসন্ধিৎসু।

এখানে 'এতে রয়েছে কল্যাণ' অর্থ এই ভূপৃষ্ঠেই রয়েছে কতো গ্রাম-জনপদ-সাগর-নদী-ফল-ফসল-পশু-পাখি, যা মানুষের জন্য কল্যাণকর। 'এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের' অর্থ এই পৃথিবী সকল প্রাণীর খাদ্য ও পানীয়ের উৎপাদন ক্ষেত্র। হাসান বলেছেন, আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর আহারের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন পৃথক পৃথক রীতিতে। ইকরামা ও জুহাক বলেছেন, আল্লাহ্ বিভিন্ন স্থানকে উপযোগী করেছেন বিভিন্ন প্রকার আহার্যবস্তুর উৎপাদনস্থলরূপে। ফলে এক স্থানের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চলে অন্য অঞ্চলের মানুষের পণ্যবিনিময়। এই পণ্যবিনিময়ই আবার হয় বহুসংখ্যক লোকের জীবিকার্জনের মাধ্যম। কালাবী বলেছেন, বিভিন্ন জনপদের মানুষের খাদ্যাভ্যাসও একরকম নয়। তাই কেউ ভক্ষণ করে যব, গম, ধান, কেউবা খেজুর, অথবা অন্য কোনো খাদ্যবস্তু। 'চার দিন' অর্থ আগের দুই দিন যোগ এই দুই দিন। আগের

দুই দিন ছিলো রবিবার ও সোমবার। আর এই দুই দিন হচ্ছে মঙ্গলবার ও বুধবার। এভাবে হিসাব করলে মোটমাট সময় লাগে চারদিন। যেমন বলা হয়ে থাকে— আমরা বসরা থেকে বাগদাদ যেতে সময় লাগে দু'দিন এবং কুফা যেতে লাগে তিনদিন। অর্থাৎ প্রথম দুই দিন যোগ আর একদিন। আর 'সায়িলীন' অর্থ এখানে যাচনাকারী, অনুসন্ধানকারী। অর্থাৎ পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল কিছুর নির্মাণে ও ব্যবস্থাপনায় কতোদিন সময় লেগেছে, এ সম্পর্কে যদি কেউ অনুসন্ধিৎসু হয়, তবে তার জন্য জবাব হচ্ছে— মোটমাট চার দিন। অথবা কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত শব্দ 'ক্বদ্দারা' এর সঙ্গে। যদি তাই হয়, তবে অনুসন্ধিৎসুদেরকে জবাব দেওয়া যেতে পারে, পৃথিবীর প্রাণীকুলের খাদ্য ব্যবস্থাপনাতেই সময় লেগেছে চারদিন।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিলো ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বললো, আমরা এলাম অনুগত হয়ে'।

এখানে 'ছুম্মাস্ তাওয়া' অর্থ অতঃপর মনোনিবেশ করেন। এখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দটি কালক্ষেপণের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, ব্যবহৃত হয়েছে পৃথিবী ও আকাশ এই দুই সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য।

'দুখান' অর্থ ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। বাগবী লিখেছেন, আকাশ সৃষ্টির মূল উপকরণ ছিলো বাষ্প, অর্থাৎ জলীয় বাষ্প। গ্রীক দার্শনিক ও শরীরবিজ্ঞানীদের মতে মাটি ও আগুনের মূল মিশ্রণের নাম 'দুখান' এবং পানি ও বাতাসের মূল মিশ্রন হচ্ছে 'বুখার'। কিন্তু বাগবী 'দুখান' বলেছেন জলীয় বাষ্পকেই।

'তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়' অর্থ আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবী উভয়কে নির্দেশ দিলেন, তোমরা চাও বা না চাও, নিকটবর্তী হও তোমাদের সকল প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও বৈচিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে, যেগুলো আমি গচ্ছিত রেখেছি তোমাদের অভ্যন্তরে। অথবা কথাটির অর্থ হবে— তোমাদের ভিতর থেকে আমি যা কিছু সৃষ্টি করতে চাই, তা তোমরা প্রকাশ করো। তাউসের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি আমার বান্দাদের জন্য যে সকল কল্যাণকর বস্তু তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছি, সেগুলোকে প্রকাশ করো। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তখন আকাশকে আদেশ দিলেন, হে আকাশ! তুমি প্রকাশ করো তোমার সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জকে। আর পৃথিবীকে নির্দেশ দিলেন, আর হে পৃথিবী! তুমি তোমার সমুদ্রসমূহকে সলিলিত ও তরঙ্গময় করো এবং স্থলভাগকে করো বৃক্ষময়, পুষ্পময়, শস্যময় ও তৃণগুল্মবিশিষ্ট।

'ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়' অর্থ তোমরা স্বেচ্ছায় যদি আসতে চাও তো এসো, আর অনিচ্ছুক যদি হও, তবে তোমাদেরকে আমি আসতে বাধ্য করবো। আর 'ত্বয়িয়ীন' অর্থ অনুগত হয়ে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গবাচক বহুবচন। দ্বিবচনের স্ত্রীলিংঙ্গবাচক শব্দরূপ এখানে ব্যবহার করা হয়নি। এর কারণ হচ্ছে

নির্দেশানুগত হওয়ার সম্মতি প্রদানের মধ্যে শামিল ছিলো আকাশ-পৃথিবীসহ অন্যান্য জগতও। তাছাড়া এখানে উল্লেখ করা হয়েছে 'তারা বললো'। বলা কওয়া করতে পারে কেবল বিবেকবান সৃষ্টি। অথচ এখানে কথা বলার সম্পর্ক করা হয়েছে আকাশ-পৃথিবীর সঙ্গে, যারা বাহ্যত বিবেকবান নয়। অতএব বুঝতে হবে এখানে আকাশ-পৃথিবীকে বিবেকবান বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আকাশ-পৃথিবীর কথা বলাকে এখানে বুঝতে হবে রূপকার্থে, প্রকৃতার্থে নয়। আর আকাশ-পৃথিবীর 'আতাইনা' (আমরা এলাম) কথাটির মধ্যে ঘটেছে আল্লাহ্তায়ালার অপার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ তাঁর সকল সৃষ্টিই তাঁর নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে বাধ্য। এরকম তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশ কার্যকর হওয়ার কথা এসেছে 'কুন্ ফা ইয়াকুন' আয়াতে।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে এর বিধান ব্যক্ত করলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা'।

এখানে 'ফা ক্বদ্বা হুন্না সাবআ' সামাওয়াতিন ফী ইয়াওমাইন' অর্থ অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুইদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন। এখানে 'হুন্না' সর্বনামটির দ্বারা ইশারা করা হয়েছে আকাশের দিকে। কেননা 'সামাআ' অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। আর এর সর্বনাম রয়েছে এখানে প্রচ্ছন্ন। 'সাবআ' সামাওয়াতি' (সপ্তাকাশ) হচ্ছে এর পরিষ্কার ব্যাখ্যা। এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্ই সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ সাত আকাশকে অস্তিত্বায়িত করেছেন অনস্তিত্ব থেকে। আর এখানকার 'দুইদিনে' অর্থ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। জালালুদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, শুক্রবারের অন্তিম সময়ে আল্লাহ্তায়ালা আকাশ সৃজন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ওই অন্তিম সময়ে তিনি সৃষ্টি করেন হজরত আদমকে। সেকারণেই এখানে 'সৃজন পূর্ণ করেন' এরকম বলা হয়নি। আমি বলি, জালালুদ্দিন মাহাল্লীর এমতো উক্তির ভিত্তি সম্ভবতঃ ওই হাদিস, যা বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ্ মাটি সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পাহাড় সৃষ্টি করেছেন রবিবারে, গাছপালা সৃষ্টি করেছেন সোমবারে, দুঃখকষ্ট ও বিপদাপদ সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবারে, নূর সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, চতুষ্পদ জন্তু সমূহ বৃহস্পতিবারে এবং আদম সৃষ্টি করেছেন শুক্রবারের বিকেলে, আসরের পর, সকলের শেষে। অন্তিম ক্ষণ হচ্ছে আসর-মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। প্রকাশ থাকে যে, এই হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারী অনবধান

হয়েছেন। কোরআনের ভাষ্য হচ্ছে— আল্লাহ্ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অথচ এখানে বর্ণনাকারী বলেছেন সাতদিনের কথা। প্রকৃত কথা হচ্ছে সৃজনপর্ব শুরু হয়েছে রবিবার থেকে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে শনিবারের কথা। আবার কোরআনে বলা হয়েছে পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সৃজিত হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে (মঙ্গল ও বুধবারে)। অথচ এই

হাদিসে বলা হয়েছে, পাহাড় সৃষ্টি করা হয়েছে রবিবারে এবং গাছপালা সোমবারে। আবার কোরআনে বর্ণিত আদম সৃষ্টির কাহিনী একথাই প্রকাশ করে যে, হজরত আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির বহুকাল পরে। যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন— যখন আপনার প্রভুপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করবো। এছাড়া আদম সৃষ্টি সম্পর্কিত অন্য এক বিবরণে পাওয়া যায়, তাঁর শরীর নির্মাণের মাটিকে মালিশ করা হয় চল্লিশ দিন ধরে।

এখানে 'এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন' কথাটির অর্থ— এবং তিনি প্রত্যেক আকাশে প্রবর্তন করলেন ফেরেশতাদের মানোপযোগী আদেশ। আতার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ প্রতিটি আকাশে ফেরেশতা, সাগর, পর্বত, বায়ুপ্রবাহের স্তর ইত্যাদি কতোকিছু যে সৃষ্টি করে রেখেছেন, তার প্রকৃত সংবাদ তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। কাতাদা ও সুদ্দী বলেছেন, আকাশে তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও অসংখ্য তারকা। মুকাতিল বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি প্রথম অবতীর্ণ করেন আকাশে। কেউ কেউ বলেছেন, আকাশের সকল সৃষ্টিকে তিনি আনুগত্যের আদেশ দেন। আর 'আমি নিকটবর্তী আকাশকে করলাম সুশোভিত প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত' একথাটির মধ্যে ঘটেছে আল্লাহ্র অপরিসীম পরাক্রমের বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ নিকটবর্তী আকাশকে তিনি করেছেন সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রালোক শোভিত, যা করার সাধ্য অন্য কারো নেই। আবার ফেটে যাওয়া, ক্ষয় হওয়া, ভেঙে যাওয়া অথবা অন্য কোনোরকম দুর্ঘটনাকবলিত হওয়া থেকে তিনি আকাশকে করেছেন সুরক্ষিত। এরকম করার সামর্থ্যও অন্য কেউ রাখে না।

শেষে বলা হয়েছে 'জালিকা তাক্বদীরুল্ আ'যীযিল আ'লীম' (এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থাপনা)। এখানে 'আ'যীয' অর্থ মহাপরাক্রমশালী, আপন সৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় পরিপূর্ণরূপে প্রভাবশালী। আর 'আ'লীম' অর্থ সর্বজ্ঞ, আপন সৃষ্টির সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তবুও এরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলো, আমিতো তোমাদেরকে সতর্ক করেছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও ছামুদের শাস্তির অনুরূপ'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এতোক্ষণ ধরে আলোচিত আল্লাহ্র একক সত্তা এবং তাঁর সর্বজ্ঞতা-সর্বশক্তিধরতা ও সৃজননৈপুণ্যের অভাবিতপূর্ব বিবরণ শোনার পরেও যদি আপনার স্বজাতীয় অংশীবাদীদের চৈতন্যোদয় না ঘটে থাকে, তবে তাদেরকে চূড়ান্তকথাটি জানিয়ে দিন এভাবে— আমি তাহলে তোমাদেরকে সতর্ক করতে বাধ্য হচ্ছি এমন ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক শাস্তি সম্পর্কে, যেরকম শাস্তি আপতিত হয়েছিলো অবাধ্য আদ ও ছামুদ জাতির উপর।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'যখন তাদের নিকট রসুলগণ এসেছিলো তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে এবং বলেছিলো, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত কোরো না। তখন তারা বলেছিলো, আমাদের প্রতিপালকের এরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম'।

এখানে 'তাদের নিকট তাদের রসুল এসেছিলো তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে' কথাটির অর্থ— তাদের প্রতি প্রেরিত রসুলগণ তাদের পথপ্রদর্শনার্থে অবলম্বন করেছিলেন সর্ববিধ উপায়, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। অথবা এখানে 'সম্মুখ' ও 'পশ্চাৎ' অর্থ অনাগতকাল ও অতীতকাল। অর্থাৎ অতীতের অবাধ্য উম্মতের পরিণতি কী হয়েছিলো, সেকথা যেমন তাদেরকে বার বার বলা হয়েছিলো, তেমনি তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো ভবিষ্যতে অবাধ্যতা করলে কী ঘটবে, সে সম্পর্কে। এভাবে তাদেরকে সাবধান করার কোনো প্রচেষ্টাই তাদের নবীগণ বাকী রাখেননি। কিংবা 'সম্মুখ' ও 'পশ্চাৎ' অর্থ এখানে পূর্বাপর। অর্থাৎ আগের যুগের লোকদের সংবাদ আদ ও ছামুদ জাতি জানতো। আবার হজরত হুদ ও হজরত সালেহ তাদেরকে জানিয়েছিলেন পরবর্তী যুগের লোকদের অবস্থা সম্পর্কেও। এভাবে তারা হৃদয় গলানো ভাষায় তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন সত্যধর্মের দিকে। কিংবা 'সম্মুখ' ও 'পশ্চাৎ' অর্থ এখানে সুপ্রচুর, অনেক। অর্থাৎ অনেক নবীই আ'দ, ছামুদ ও তাদের মতো দুর্বিনীত সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শণার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে— 'তাদের কাছে তাদের রিজিক পর্যাপ্ত পরিমাণে আসতো প্রত্যেক স্থান থেকে'।

'আমাদের প্রতিপালকের এরকম ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম' কথাটির অর্থ— ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের প্রতি নবীগণকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করতো যে, আমরা যেমন, তেমনি তোমরাও। সমমর্যাদাসম্পন্ন যারা, তারা কেউ কারো পথপ্রদর্শক হতে পারে না। সুতরাং তোমাদেরকে এবং তোমরা যে প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছো বলছো, তাকে আমরা অমান্য করলাম। আমাদেরকে হেদায়েত করাই যদি আমাদের প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো, তবে তিনি অবশ্যই আমাদের কাছে পাঠাতেন কোনো ফেরেশতাকে। কিন্তু ফেরেশতা তো তোমরা নও। তোমরা তো আমাদেরই স্বগোষ্ঠীভূত।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, একবার আবু জেহেল কতিপয় কুরায়েশ গোত্রপতিকে বললো, মোহাম্মদের ব্যাপারটা তো আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। তোমরা বরং তাকে পরীক্ষা করবার জন্য এমন একজন লোককে ঠিক করো যে কাব্য, ভবিষদ্বাণী ও যাদুবিদ্যা সম্পর্কে পারদর্শী। সে মোহাম্মদের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করবে, তারপর আমাদের কাছে এসে সব বুঝিয়ে বলবে। একথা শুনে উত্‌বা ইবনে রবীয়া বলে উঠলো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তো কবিতা, ভবিষ্যদ্বাণী ও যাদু সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। আমিই বরং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা করে দেখি। সেরকম কিছু হলে আমার কাছে তার প্রকৃত রহস্য অনুদঘাটিত থাকবে না। এই বলে সে গিয়ে সাক্ষাত করলো রসুল স. এর সঙ্গে। বললো, মোহাম্মদ! তুমি না অভিজাত হাশেমী কুলোদ্ভব। বলো, তুমি উত্তম, না উত্তম তোমার শ্রদ্ধার্হ পিতামহ আবদুল মুত্তালিব? অথবা শ্রেষ্ঠ কি তুমি, না শ্রেষ্ঠ তোমার সম্মানার্হ পিতা আবদুল্লাহ্?

তাফসীরে মাযহারী/৩৮৪

তাহলে বলো, কেনো তুমি তোমার শ্রদ্ধাভাজন পিতৃপুরুষদের ধর্মমতকে ভ্রান্ত বলছো? নেতা হওয়ার আকাংখা যদি তোমার থাকে, তাহলে বলো, আমরা আমাদের নেতৃত্বের পতাকা তোমাকেই দিয়ে দেই। আর যদি বাসনা থাকে নারীর, তবে তা-ও খুলে বলো। তোমার পছন্দমতো দশজন পরমাসুন্দরী কুরায়েশ নারীর সঙ্গে আমরা তোমার বিবাহ দিয়ে দেই। আর যদি কামনা করো ধন-সম্পদ, তবে তোমাকে আমরা করে দেই সর্বাপেক্ষা অধিক ধনাঢ্য, যাতে করে তোমার উত্তরপুরুষেরাও হয়ে যেতে পারে শ্রেষ্ঠ বিত্তপতি, উত্‌বার কথা রসুল স. নীরবে শুনে যেতে থাকলেন। জবাব দিলেন তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর। প্রথমে পড়তে শুরু করলেন 'হা-মীম। এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ, এক কিতাব বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াত সমূহ, আরবী ভাষায় কোরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য.....'। এভাবে পাঠ করতে করতে এসে শেষ করলেন ১৩ সংখ্যক আয়াতের— 'আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আ'দ ও ছামুদের শাস্তির অনুরূপ' পর্যন্ত। এ পর্যন্ত শুনেই উত্‌বা ভয় পেয়ে গেলো। রসুল স. এর মুখে হাত দিয়ে আত্মীয়তার কসম দিয়ে অনুরোধ করলো চুপ থাকতে। তারপর সোজা চলে গেলো তার নিজের বাড়িতে। সঙ্গী সাথীদের কাছে না গিয়ে ঘরের মধ্যে বসে রইলো চুপচাপ। তার এরকম ভাবান্তর দেখে আবু জেহেল তার সঙ্গীদেরকে বললো, হে কুরায়েশ গোত্রাধিনায়কেরা! আল্লাহ্‌র কসম! আমার তো মনে হয়েছে উত্‌বা মোহাম্মদের অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। এর কারণ কেবল এই-ই হতে পারে যে, সে মোহাম্মদের বাকচাতুর্যের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। চলো, তার সঙ্গে সকলেই গিয়ে একটু দেখা করে আসি। সকলে তখন গিয়ে হাজির হলো উত্‌বার বাড়িতে। আবু জেহেল বললো, উত্‌বা। আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের তো মনে হচ্ছে তুমি এখন মোহাম্মদাসক্ত। সেজন্যই তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা করোনি। তোমার যদি ধনসম্পদের প্রয়োজন থাকে তো বলো, আমরা তোমাকে এতো ধনসম্পদ দিবো, যা তোমার মোহাম্মদাসক্তিকে দূর করতে সমর্থ। উত্‌বা একথা শুনে রেগে গেলো এবং শপথ করে বললো, ভবিষ্যতে মোহাম্মদের সঙ্গে আমি আর কথাই বলবো না। আরো বললো, তোমরা তো জানোই কুরায়েশদের মধ্যে আমি একজন সম্পদপতি। কিন্তু আসল ব্যাপার শোনো, আমি তো তার কাছে গিয়ে অনেক কিছু বললাম। প্রত্যুত্তরে সে আমাকে এমন কথা শোনালো যে আমি অভিভূত না হয়ে পারিনি। তবে এ ব্যাপারে আমি এখন নিঃসন্দিগ্ধ যে, সে কবি, ভবিষ্যদ্বক্তা বা যাদুকর কোনোটাই নয়। শোনো তাহলে— একথা বলে সে রসুল স. এর কাছ থেকে যা শুনেছিলো তা সবাইকে আবৃত্তি করে শোনালো। তারপর বললো, এ পর্যন্ত শুনে আমি তার মুখে হাত রেখে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তার পাঠ বন্ধ করিয়েছি। তোমরা তো জানোই, মোহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলে না। সে কারণেই আমি আশংকা করছি, তোমাদের উপর কখন জানি শাস্তি আপতিত হয়।

তাফসীরে মাযহারী/৩৮৫

মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, আমার কাছে এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, উত্‌বা ছিলো খুব বুদ্ধিমান জননেতা। একদিন সে তার লোকজনদেরকে নিয়ে কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে বসেছিলো। এমন সময় রসুল স. সেখানে একাকী আগমন করলেন। উত্‌বা বললো, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! আমি কি মোহাম্মদের সঙ্গে কিছু বাক্যালাপ করবো? হতে পারে সে হয়তো আমাদের কোনো প্রস্তাবকে গ্রাহ্য করবে। আমরাও হয়তো তার কোনো কথা মেনে নিতে পারবো। ফলে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিসম্বাদ আর থাকবে না। ঘটনাটি সেই সময়ের যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন রসুল স. এর প্রিয় পিতৃব্য বীরকেশরী হামযা এবং রসুল স. এর বিশ্বাসী অনুচরবর্গের সংখ্যাও তখন ক্রমবর্ধমান। কুরায়েশরা বললো, হে আবুল ওয়ালিদ! তাই করো। মোহাম্মদের কাছে যাও এবং তার সঙ্গে কথা বলো। উত্‌বা এগিয়ে গেলো। কিছু দূরে উপবিষ্ট রসুল স. এর সামনে গিয়ে সে-ও বসে পড়লো। বললো, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমাদের গোষ্ঠী সুবিস্তৃত। তোমাদের কৌলিন্যও বিশেষ পর্যায়ের। কিন্তু তুমি এমন কথা বলতে শুরু করেছো যে, তোমার আপনজনদের মধ্যেই সৃষ্টি হচ্ছে বিভেদ। তুমি সবাইকে মূর্খ সাব্যস্ত করছো। তাদের উপাস্য প্রতিমাগুলোর নিন্দা করছো এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে বলছো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। এবার আমার কথা একটু কান লাগিয়ে শোনো। আমি তোমার সম্মুখে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। সেগুলো ভালো করে শোনো। তারপর চিন্তা-

ভাবনা করে দ্যাখো। রসুল স. বললেন, আবুল ওয়ালিদ! বলো, কী বলতে চাও? উত্‌বা বললো, দ্যাখো ভাতিজা! তুমি যা বলছো, তার দ্বারা সম্পদার্জন যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করতে রাজী। আমরা তোমাকে এতো ধনদৌলত দিব, যাতে করে তুমি হতে পারবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ধনী। আর যদি হতে চাও দলপতি, তবে আমরা তোমাকে সাদরে বরণ করে নিবো আমাদের প্রধান দলপতিরূপে। একথাও তুমি খুলে বলোতো দেখি, তুমি জ্বিন বা প্রেতাত্মা জাতীয় কিছু দ্যাখো কিনা। যদি সেরকম কিছুর প্রভাব তোমার উপর থেকেই থাকে, তবে তোমার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করতেও আমরা অরাজী নই। সেরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। কারণ তুমি তোমার বক্ষ্যাভ্যন্তর থেকে উদগীরিত কবিতার মতো কথাগুলো রুখতে পারো না কেনো? অতএব হে আবদুল মুত্তালিবের প্রিয় পৌত্র। তুমি নিঃসন্দেহে কাব্যনির্মাণে হতে পারবে সফল। অন্যদের মধ্যে এরকম যোগ্যতাই যে নেই।

রসুল স. বললেন, তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? উত্‌বা বললো, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, এবার শোনো আমার কথা। এই বলে তিনি স. পাঠ করতে শুরু করলেন আলোচ্য সুরা। উত্‌বা পেছনের দিকে দু'হাতে ভর দিয়ে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে লাগলো। সেজদার আয়াত (৩৮) পর্যন্ত পাঠ করে তিনি স. সেজদা করলেন। তারপর বললেন, হে আবুল ওয়ালিদ! এই হচ্ছে তোমার কথার জবাব। উত্‌বা আর দেরী না করে উঠে পড়লো। এগিয়ে গেলো তার সঙ্গী সাথীদের

দিকে। তাদের মধ্যে একজন দূর থেকে তাকে দেখে মন্তব্য করলো, আবুল ওয়ালিদ তো মনে হয় বিপরীত ধারণা নিয়ে ফিরে আসছে। উত্‌বা তাদের বৈঠকে গিয়ে বসলো। সঙ্গীরা বললো, কী খবর? সে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! যা শুনলাম, তা আমি জীবনেও শুনিনি। ওই বাণী অভূতপূর্ব। তা না কাব্য, না গণকের বাণী, না যাদু। শোনো হে কুরায়েশ ভ্রাতৃবর্গ! মোহাম্মদকে তোমরা আর ঘাঁটিয়ো না। তার কাছ থেকে তোমরা দূরে দূরেই থাকো। যে সকল কথা আমি তার মুখ থেকে শুনলাম, তা কিছু না কিছু বাস্তবে প্রতিফলিত না হয়েই পারে না। জানি না কার ভাগ্যে রয়েছে বিজয়। তোমরা সফল যদি হও তো হলেই। আর যদি মোহাম্মদ বিজয়ী হয়, তবে মনে কোরো তার রাজত্বই তোমাদের রাজত্ব, তাঁর মর্যাদাই তোমাদের মর্যাদা। স্বগোত্রীয় বলে তার সৌভাগ্যে তোমরাও নিজেদেরকে করতে পারবে সৌভাগ্যশালী। লোকেরা বললো, মোহাম্মদ তো দেখছি তোমাকে যাদু করেছে। উত্‌বা বললো, এটাই তোমাদের প্রতি আমার পরামর্শ। এখন তোমরা যা খুশী তা-ই করতে পারো।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আর আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করতো এবং বলতো, আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ্‌, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতো'।

এখানে 'ফাস্‌তাক্‌বারু ফীল আরদ্বি বি গইরিল হাক্কি' অর্থ তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ প্রকাশ করতো। 'মান্‌ আশাদ্দু মিন্‌না ক্যুওয়াতা' অর্থ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে? উল্লেখ্য, আ'দ সম্প্রদায় দৈহিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ছিলো। তারা পাহাড়ের বড় বড় পাথর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারতো। এটাই ছিলো তাদের গর্বের কারণ। তাদের নবী যখন তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখালেন, তখন তারা মনে করলো দৈহিক শক্তি দিয়েই তারা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ঠেকাতে পারবে। আল্লাহ্‌র শাস্তি যে অপ্রতিরোধ্য, সে কথা তারা স্বীকার করতে চাইতো না। তাই এখানে বলা হয়েছে, তাদের শক্তির দর্প নিরর্থক। তাছাড়া যৌবনকালের পর দৈহিক শক্তি এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। তারপর একসময় হারিয়ে যায় জীবন। সুতরাং দৈহিক, বৈত্তিক, বৌদ্ধিক কোনো প্রকার শক্তির অহংকারই মানুষ করতে পারে না। অর্থাৎ মানুষের সকল দম্ভই অসার, অনর্থক ও অযথার্থ।

'আওয়া লাম ইয়ারাও' অর্থ তারা কি তবে লক্ষ্য করেনি? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ তারা ভালো করেই জানে। কথাটির সংযোগ রয়েছে অন্তরালবর্তী এক ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই আন্তরিক ক্রিয়া সহযোগে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— কী! তারা এমন করে বলে, অথচ তারা একথা জানে না যে, তাদের সৃজয়িতা আল্লাহ্‌ তাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী।

শেষে বলা হয়েছে 'ওয়া কানূ বিআয়াতিনা ইয়াজ্‌হাদূন' (অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করতো)। একথার অর্থ— তারা ছিলো দম্ভান্ধ। তাই আল্লাহ্‌র সত্য নিদর্শনাবলীকে জেনে বুঝেও হয়ে যেতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝন্‌ঝাবায়ু অশুভ দিনে'।

এখানে 'রীহান সার্‌সারা' অর্থ ঝঞ্ঝাবায়ু, যা হয় ভয়ংকর ঠাণ্ডা এবং বিকট আওয়াজবিশিষ্ট। 'সার্‌সারা' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'সার্‌' থেকে। এর অর্থ ঠাণ্ডা। অথবা শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে 'সার্‌তুন' থেকে, যার অর্থ বিকট চিৎকার, বীভৎস আওয়াজ।

'আইয়ামিন নাহিসাত্' অর্থ অশুভ দিনে। অর্থাৎ ওই দিনটি ছিলো তাদের জন্য ভয়ানক অমঙ্গলের দিন। জুহাক বলেছেন, তিন বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন এবং তখন বৃষ্টিহীন বায়ুপ্রবাহ অব্যাহত ছিলো। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, ওই তুফান শাওয়াল মাসের শেষ দিকের বুধবার শুরু হয়ে তার পরের বুধবার পর্যন্ত ছিলো। আর তাদের অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি নেমে এসেছিলো বুধবারেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'আখেরাতের শাস্তি অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না'। এখানে 'আখযা' অর্থ লাঞ্ছনাদায়ক। আর 'ওয়াহুম লা ইউন্সরূন' অর্থ এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অর্থাৎ তখন তাদের কাছে এমন সাহায্য আসবে না, যা তাদেরকে ওই অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে।

এরপরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'আর ছামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিলো। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ'। একথার অর্থ— আর আমি ছামুদ সম্প্রদায়কেও আমা কর্তৃক প্রেরিত নবীর মাধ্যমে সরল সত্য পথের সন্ধান দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই পথনির্দেশনাকে তারা মান্য করেনি। পূর্ববৎ আঁকড়ে ধরে রয়েছিলো অন্ধত্ব ও অজ্ঞানত্বকে। ফলে তাদের উপরে পতিত হয়েছিলো বীভৎস বজ্রনিনাদ। সেটা ছিলো তাদের কুকীর্তিরই অনিবার্য পরিণাম।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'পথ নির্দেশ করেছিলাম' অর্থ তাদের সামনে উন্মোচন করেছিলাম ভালো-মন্দ উভয় পথের স্বরূপ। সেই সঙ্গে বলেছিলাম, আমার পয়গম্বরের অনুসারী হতে। আর এখানকার 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানলো' অর্থ তাদেরকে আঘাত করলো অন্তরীক্ষ থেকে আগত ক্রমবর্ধমান এক ধ্বংসাত্মক মহানাদ।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'আমি রক্ষা করলাম তাদেরকে, যারা ইমান এনেছিলো এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করতো'। একথার অর্থ— ওই লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি থেকে আমি রক্ষা করেছিলাম কেবল তাদেরকে যারা ছিলো বিশ্বাসী ও সাবধানী।

সূরা হা-মীম, আস্সাজ্দা ঃ আয়াত ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

❑ যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন দলে,

❑ পরিশেষে যখন উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছিবে তখন উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক উহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে, উহাদের বিরুদ্ধে।

❑ জাহান্নামীরা উহাদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন?' উত্তরে উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্, যিনি আমাদিগকে বাকশক্তি

দিয়াছেন তিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার এবং তাঁহারই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।'

❑ 'তোমরা কিছু গোপন করিতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না— উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।'

❑ 'তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস আনিয়াছে। ফলে তোমরা হইয়াছ ক্ষতিগ্রস্ত।'

❑ এখন উহারা ধৈর্য ধারণ করিলেও জাহান্নামই হইবে উহাদের আবাস এবং উহারা অনুগ্রহ চাহিলেও উহারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে না।

❑ আমি উহাদের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সহচর, যাহারা উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে তাহা উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল এবং উহাদের ব্যাপারেও উহাদের পূর্ববর্তী জিন্ন ও মানুষদের ন্যায় শাস্তির বাণী বাস্তব হইয়াছে। উহারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহ্‌র অরিকুলকে নরকে নিক্ষেপ করবার উদ্দেশ্যে একত্র করা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে-উপদলে। এভাবে সকলকে একসঙ্গে হাঁকিয়ে যখন নরকের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করানো হবে, তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও গাত্র-ত্বক তাদেরই বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্মের বিবরণ দিতে শুরু করবে।

এখানে 'ইউযাউন' অর্থ নরকের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে ধাক্কাতে ধাক্কাতে, হাঁকিয়ে। কাতাদা ও সুদ্দী বলেছেন, তাদের প্রথম দলকে থামিয়ে দেওয়া হবে, যাতে করে তাদের পরবর্তী দল এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এভাবে সকলকে একত্র করে নিক্ষেপ করা হবে নরকে। বায়যাবী লিখেছেন, এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে নরকবাসীদের সংখ্যাধিক্যকে। 'জ্বাউহা' অর্থ এর সন্নিকটে। অর্থাৎ জাহান্নামের সন্নিকটে।

'জুলূদুহুম' অর্থ গাত্র-ত্বক। সুদ্দী ও একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, কথাটির উদ্দেশ্য এখানে লজ্জাস্থান। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'ত্বক সাক্ষ্য দিবে' অর্থ সাক্ষ্য দিবে তাদের হাত পা। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বলেছেন, আমরা রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো আমি হাসলাম কেনো? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলই ভালো জানেন। তিনি স. বললেন, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে তাঁর এক বান্দা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি কি আমাদেরকে জুলুম থেকে অব্যাহতি দাওনি? আল্লাহ্ বলবেন, নিশ্চয়ই। সে বলবে, তাহলে আমরা আজ আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাক্ষ্য দিতে দিবো না। আল্লাহ্ বলবেন, আজ তো তোমাদের সত্তাই তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। আরো সাক্ষ্য দিবে তোমাদের আমল লেখক ফেরেশতারা। এরপর আল্লাহ্ তাদের

মতো অন্যদের মুখে লাগিয়ে দিবেন সীলমোহর। বাকশক্তি খুলে দিবেন তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের। তখন তাদের হাত পা তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। পরে তাদের মুখের সীলমোহর উঠিয়ে নেওয়া হলে তারা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে বলবে, দূর হও। ধ্বংস হও। তোমরাও তো ছিলে আমাদের কৃতকর্মসমূহের অংশীদার। মুসলিমের বর্ণনায় আরো এসেছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আল্লাহ্ তখন তাদের মুখে সীলমোহর করে বন্ধ করে দিবেন এবং সাক্ষ্য দিতে বলবেন তাদের উরুদেশকে। সাথে সাথে তাদের উরুদেশের গোশত্, হাড় দিতে শুরু করবে তাদের কার্যকলাপের বিবরণ।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছো কেনো? তারা উত্তরে বলবে, আল্লাহ্, যিনি আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন'। এভাবেই তখন প্রশ্নোত্তরপর্ব সম্পন্ন হবে নারকী ও তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথম বার এবং তারই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'। এই বাক্যটি তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও হতে পারে। অথবা এটা হতে পারে নতুন এক বাক্য।

বোখারী ও মুসলিমের গ্রন্থের বরাত দিয়ে এবং হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বাগবী লিখেছেন, একবার কাবাপ্রাঙ্গণে সমবেত হলো দু'জন কুরায়েশ এবং একজন সাক্বাফী। অথবা একজন কুরায়েশ, দু'জন সাক্বাফী। তারা তিনজনই ছিলো স্ফীত উদরবিশিষ্ট। উদরের স্তরে স্তরে তাদের জমে উঠেছিলো চর্বির স্তূপ। জ্ঞানবুদ্ধিও ছিলো তাদের স্বল্প। তাদের একজন বললো,

বলতে পারো, আল্লাহ্ আমাদের কথা শুনতে পান কিনা? দ্বিতীয় জন বললো, চীৎকার করে বললে শোনেন, কিন্তু আস্তে কথা বললে শোনেন না। তৃতীয় জন বললো, চীৎকার করে কথা বললে যদি তিনি শুনতে পান, তবে আস্তে বললেও নিশ্চয় শুনবেন। বাগবী লিখেছেন, কুরায়েশ দু'জনের নাম ছিলো রবীয়া ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং সাক্বাফীর নাম ছিলো আবদ অথবা লাইল। তাদের কথোপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এরপরের আয়াত (২২)।

বলা হয়— 'তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ চক্ষু ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না — উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না'।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ বিদ্বান এখানকার 'তোমরা কিছু গোপন করতে না' কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা কিছুই গোপন করতে সক্ষম হতে না। মুজাহিদ অর্থ করেছেন— তোমরা ভয় করতে না। কাতাদা বলেছেন, কথাটির মর্মার্থ হবে— তোমরা ধারণাও করতে পারোনি যে, তোমাদের হাত-পা তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। মনে করো, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কাজ কর্মের খবর রাখেন না। সে কারণেই তোমরা নির্ভয়ে চালিয়ে যেতে তোমাদের অপকর্মসমূহ।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছো ক্ষতিগ্রস্ত'। একথার অর্থ— তোমরা তোমাদের প্রভুপালককে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অজ্ঞ মনে করতে বলেই আজ তোমাদের উপরে নেমে এসেছে শাস্তি এবং তোমরা হয়েছো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও জাহান্নামাই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও তারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না'। একথার অর্থ— নরকবাসীরা নরকে যদি ধৈর্য ধারণ করেও তবুও সেখানে ধৈর্যের সুফল তারা পাবে না। কেননা নরকই হচ্ছে তাদের স্থায়ী ঠিকানা। আর যদি তারা ক্ষমাপ্রার্থনাও করতে থাকে, তবুও হতে পারবে না ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূত।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর, যারা তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিলো এবং তাদের ব্যাপারেও তাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের ন্যায় শাস্তির বাণী বাস্তব হয়েছে। তারা তো ছিলো ক্ষতিগ্রস্ত'। একথার অর্থ— তাদের পৃথিবীর জীবনে আমি তাদের জন্য সহচররূপে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম কতিপয় শয়তানকে। ওই শয়তানেরাই তাদের সকল কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে মনোহররূপে প্রতিভাত করতো। পূর্ববর্তী যুগের ওই জ্বিন ও মানব বংশোদ্ভূত শয়তানগুলোকেও আমি প্রবেশ করাবো নরকে। আর তাদের প্ররোচিত ও প্ররোচক সকলেই ছিলো ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূত।

এখানে 'ক্বয়্যাদ্বনা' অর্থ নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। মুকাতিল এর অর্থ করেছেন— মিলিয়ে দিয়েছিলাম। 'ক্বুরনাআ' অর্থ সহচর। শব্দটি 'ক্বরীন' এর বহুবচন। যেমন 'কুরামাআ' এর বহুবচন 'কারীম'। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে শয়তান এমনভাবে পরিবেষ্টন করে রাখে, যেমন ডিমের উপরে থাকে আবরণ। 'ক্বয়্যাদ্ব' বলে ডিমের আবরণ বা খোসাকে। কেউ বলেছেন, এখানে শব্দটির প্রকৃত অর্থ— প্রভাবশীল ও পরিবেষ্টনকারী। যেমন 'বাইউ'ন মাক্বইদ্বাহ্ অর্থ বস্তুর বিনিময় দেওয়া হয় বস্তুর দ্বারা। 'সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিলো' অর্থ লালসা পরিবেষ্টিত অস্থায়ী পার্থিব ভোগসম্ভারকে ওই শয়তানেরা করে দিয়েছিলো তাদের বাসনার অনুকূল। অর্থাৎ তারা তাদেরকে বানিয়ে দিয়েছিলো ঘোর পৃথিবীপ্রসক্ত। আর 'তারা তো ছিলো ক্ষতিগ্রস্ত' অর্থ তারা অর্জন করেছে ওই সকল বিষয় যা অনিবার্য করে শাস্তিকে এবং পরিত্যাগ করেছে ওই সকল কিছু যা তাদেরকে করতে পারতো অনুগ্রহের পাত্র। আর 'মা খলফাহুম' অর্থ— যা তাদের পশ্চাতে অর্থাৎ আখেরাতে। শয়তানই তাদেরকে অস্বীকার করতে শিখিয়েছিলো পরলোককে।

সূরা হা-মীম, আস্ সাজদা ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

❑ কাফিররা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার।'

❑ আমি অবশ্যই কাফিরদিগকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব এবং নিশ্চয়ই আমি উহাদিগকে উহাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব।

❑ জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল; সেথায় উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ।

❑ কাফিররা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যেসব জিন্ন ও মানব আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল উহাদের উভয়কে দেখাইয়া দাও, আমরা উভয়কে পদদলিত করিব, যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— কোরআনের ধ্বনিব্যঞ্জনা সহজেই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। সরে যেতে শুরু করে সন্দেহ-অবিশ্বাসের জমাট অন্ধকার। একথা মক্কার পৌত্তলিকেরা জানতো। তাই তারা কোরআনের আবৃত্তি শুনতে চাইতো না। তারা একে অপরকে বলতো, খবরদার! কোরআন আবৃত্তির প্রতি তোমরা কখনো আকৃষ্ট হয়ো না। মোহাম্মদ যখন কোরআন পাঠ করতে থাকে, তখন তোমরা শুরু করে দিয়ো শোরগোল। এরকম করতে পারলেই তোমরা জয়ী হতে পারবে। না করতে পারলে হবে পরাজিত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কার মুশরিকেরা একে অপরকে বলতো, মোহাম্মদকে কোরআন পাঠ করতে দেখলেই তোমরা উচ্চস্বরে শুরু করে দিয়ো কবিতা পাঠ ও আজে বাজে কথাবার্তা। মুজাহিদ বলেছেন, রসুল স. কোরআন পাঠ শুরু করলে তারা সিটি বাজাতো ও হাততালি দিতো। জুহাক বলেছেন, তারা

বলতো, তোমরা তখন শুরু করে দিয়ো হৈ-হট্টগোল, গোলমাল। সুদ্দী বলেছেন, তারা বলতো, তোমরা তখন শুরু করে দিয়ো হৈ-চৈ, চীৎকার ও চেঁচামেচি।

পরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবো এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিবো'।

এখানে বলা হয়েছে— 'আল্‌লাজীনা কাফারূ' (কাফেরদেরকে)। এভাবে সর্বনামের পরিবর্তে নামবাচক বিশেষ্য প্রয়োগ করা হয়েছে দুই কারণে— প্রথমতঃ তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে এবং দ্বিতীয়তঃ অঙ্গীকারটিকে করতে সাধারণ পদবাচ্য। অর্থাৎ মক্কার এই কাফেরদেরকে এবং সকল যুগের সকল কাফেরদেরকে আমি আস্বাদন করাবো কঠিন শাস্তি। 'আর আমি তাদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিবো' অর্থ পৃথিবীর জীবনে কুফরী বা সত্যপ্রত্যাখ্যানই ছিলো সর্বনিকৃষ্ট কার্য। আর ওই কার্যের যথোপযুক্ত প্রতিফল আমি তাদেরকে দিবোই।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'জাহান্নাম, এটাই আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল, সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস; আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ'। এখানে 'আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অস্বীকৃতি' অর্থ কোরআনের বাণীসম্ভারের প্রতি অবজ্ঞা। অর্থাৎ কোরআন পাঠের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। যারা এরকম করে, তারাই আল্লাহ্‌র শত্রু এবং তাদের জন্যই রয়েছে স্থায়ী নরকবাস।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'কাফেরেরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে সকল জ্বিন ও মানব আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো, তাদের উভয়কে দেখিয়ে দাও, আমরা উভয়কে পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়'। একথার অর্থ— নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আবেদন জানাবে, হে আমাদের প্রভুপালক! জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পাপের প্রতি প্ররোচিত করে আমাদের বিপথগামিতাকে সুগম করেছিলো, তাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে এসো। আমরা তাদেরকে পদপিষ্ট করবো, যাতে তারা হয় অধিকতর অবমানিত।

কেউ কেউ বলেছেন, 'যে সকল জ্বিন ও মানব আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো' বলে এখানে প্রধানতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে ইবলিস ও আদমপুত্র কাবিলের দিকে। তারাই হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যান ও পাপের ভিত্তি স্থাপয়িতা। আর এখানকার 'যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়' কথাটির অর্থ যাতে তারা হয়ে যায় নরকের সবচেয়ে নিম্নস্তরের অধিবাসী। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— যাতে তাদের শাস্তি হয় আমাদের শাস্তির চেয়ে অনেক বেশী।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৩০, ৩১, ৩২

❑ যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্', অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশ্তা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও।

❑ 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা কিছু তোমাদের মন চাহে এবং সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফর্মায়েশ কর।'

❑ ইহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই সকল বিশ্বাসীর অবস্থা তখন হবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিপরীত, যারা বলে, আমাদের একমাত্র নির্ভর হচ্ছেন আমাদেরই প্রভুপালক আল্লাহ্, অতঃপর এমতো বিশ্বাসেই যারা থাকে অটল, তাদের জীবনাবসানকালে অবতীর্ণ হয় রহমতের ফেরেশতা। ওই ফেরেশতা তাদেরকে তখন এই বলে সান্ত্বনা দিতে থাকে যে, ভয় কোরো না, দুঃখ কোরো না। এখন তোমরা পেতে যাচ্ছো প্রতিশ্রুত জান্নাত। সুতরাং আনন্দিত হও।

জালালুদ্দিন মাহাল্লী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কে। এখানে 'ছুম্মাস্ তাক্বামু' অর্থ অতঃপর অবিচলিত থাকে। 'ছুম্মা' এখানে কালপরম্পরা প্রকাশক নয়, বরং শব্দটি এখানে প্রকাশ করেছে শৃঙ্খলাবিন্যাসের অনুক্রমনিকা। 'ইস্তিক্বামাত' অর্থ এখানে চিত্তের অবিচলতা, কোনোক্রমেই সত্যচ্যুত না হওয়া। বিশ্বাসে, অভিব্যক্তিতে ও কাজেকর্মে বাঁকা পথ অবলম্বন না করা। 'কামুস' অভিধানে বলা হয়েছে 'ইস্তিক্বম' হচ্ছে মধ্যম পথ। 'ক্বওয়ামতুহু' অর্থ আমি তাকে সরল করে দিয়েছি। 'ক্বভীম' ও 'মুস্তাক্বীম' সমার্থক। এর অর্থ সেই সুমসৃণ পথ, যা তার পথিককে পৌঁছে দেয় সফল গন্তব্যে। এই হিসেবেই 'সিরত্বল মুসতাক্বীম' এর অর্থ করা হয় সরল পথ। 'ইস্তিক্বামাত' শব্দটি সংক্ষিপ্ত ও সমাবদ্ধ; এর অর্থ ধর্মীয় বিধি-বিধানের আবেষ্টক— আদিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদনার্থেই হোক, অথবা নিষিদ্ধ ও রহিত বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে হোক। এ সকল দায়িত্ব নিয়মানুবর্তীতা ও

দৃঢ়তার সঙ্গে করা হলেই তাকে বলা যাবে 'ইস্তিক্বামাত'। অর্থাৎ ইস্তিক্বামাত' বলতে এর সবকিছুই বোঝায়। হজরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সাক্বাফী একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! ইসলামের বিষয়ে আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন, যাতে করে আপনার পরলোকগমনের পরে আমাকে আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি স. বললেন, বলো 'আমি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করলাম' তারপর এতে অবিচল থাকো। মুসলিম।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীককে একবার 'ইস্তিক্বামাত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, 'ইস্তিক্বামাত' হচ্ছে— কোনোকিছুতেই আল্লাহ্র অংশীদারিত্ব স্থির না করা। একই বিষয়ে হজরত ওমরকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এর অর্থ তোমরা মেনে চলো নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞার নিয়মানুবর্তীতাকে, খেঁকশিয়ালের মতো এদিকে ওদিকে মোড় নিয়ো না।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক একবার উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এই দুই আয়াত সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী— 'যারা বলে, আমাদের প্রভুপালক আল্লাহ্; অতঃপর অবিচলিত থাকে' এবং 'যারা ইমান এনেছে ও ইমানের সঙ্গে জুলুমকে বিজড়িত করেনি'? লোকেরা বললো, প্রথমটির অর্থ বিশ্বাসাধিষ্ঠিত থাকা, আদেশ-নিষেধের অনুবর্তী হওয়া এবং পাপ না করা। আর দ্বিতীয়টির অর্থ ইমান আনার পর ইমানকে গোনাহ্ থেকে মুক্ত রাখা। হজরত আবু বকর বললেন, তোমরা আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট শ্রমদান করেছো। এবার আমার ব্যাখ্যা শোনো। প্রথমোক্ত বাণীর অর্থ, যারা আল্লাহ্র এককত্বকে মনে প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। তারপর মূর্তিপূজার দিকে আর ফিরে যায়নি। আর দ্বিতীয় বচনের অর্থ, যারা ইমান আনার পর তাদের ইমানকে অংশীবাদিতার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেনি। এরকম উল্লেখ রয়েছে শাহ্ওয়ালীউল্লাহ্র 'ইযালাতুল খাফা' গ্রন্থে। নাসাঈ, বাযযার ও আবুল আলিয়া হজরত আনাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার এই আয়াত পাঠ করার পর বললেন, কেউ কেউ ভয়ে অথবা চাপে পড়ে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, পরে তাদের অধিকাংশই হয়ে যায় অবিশ্বাসী। যারা মৃত্যু পর্যন্ত এক আল্লাহ্র বিশ্বাসে অটল থাকে, তারাই 'সাহেবে ইস্তিক্বামাত' বা অবিচল বিশ্বাসী।

হজরত ওসমান ইবনে আফ্ফান বলেছেন, এখানকার 'অতঃপর অবিচল থাকে' অর্থ যারা বিশুদ্ধ চিত্তে কেবল আল্লাহ্র জন্যই আমল করে। হজরত আলী অর্থ করেছেন— যারা আল্লাহ্র অবশ্যপালনীয় বিধি-বিধান পালন করে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— যারা ফরজ দায়িত্বসমূহ পালনে থাকে অটল। হাসান অর্থ করেছেন— যারা আল্লাহ্র বিধানে সুস্থির থাকে, বরণ করে আনুগত্যকে এবং বর্জন করে অবাধ্যতাকে। মুজাহিদ ও ইকরামা বলেছেন, কথাটির অর্থ এরকম— যারা মৃত্যু পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কলেমার সাক্ষ্যের উপরে কায়েম থাকে। মুকাতিল এর অর্থ করেছেন— যারা মারেফতের উপরে অচঞ্চল থাকে এবং কিছুতেই সেখান থেকে সরে না আসে।

এসব অভিমত উপরোক্ত ব্যাখ্যারই বিভিন্ন দৃষ্টিপট। হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ইবনে আব্বাস এবং হাম্মাদের অভিমত এই সকল বিধিবিধানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক (ফরজ) করে দিয়েছেন আল্লাহ্পাক। আবার ওই সব বিধিবিধানকেও সীমাবদ্ধ করেছে— যা থেকে বিরত থাকা আল্লাহ্রই আদেশ। সে বিধি-নিষেধগুলো বিশ্বাসবিষয়ক হোক বা চরিত্রগত হোক অথবা হোক আনুষ্ঠানিক।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হজরত ওসমানের বক্তব্য থেকে একথাই অনুমিত হয় যে, তাঁরা প্রচার ও লোক দেখানো আমল করতেনই না। মুজাহিদ ও ইকরামার উক্তিতেও একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত কথা হচ্ছে, হৃদয়ের প্রশান্তি ও অপপ্রবৃত্তির ধ্বংসসাধন ছাড়া কিছুতেই অচঞ্চল ইমানের অধিকারী হওয়া যায় না। আর শান্ত হৃদয় (ক্বলবিন সালিম) এবং প্রশান্ত প্রবৃত্তি (ইত্মিনানে নফস) অর্জনের শিক্ষা রয়েছে কেবল পীর মাশায়েখগণের শিক্ষায়। কাতাদা বলেছেন, হাসান বসরী যখন এই আয়াত পাঠ করতেন তখন বলতেন, হে আমার প্রভুপালক! আমাকে ইস্তিক্বামাত দান করো। তিনি ছিলেন আউলিয়াকুল শিরোমণি। তাঁর সঙ্গে রয়েছে বহুসংখ্যক আধ্যাত্মিক সূত্রপরম্পরার সংযোগ।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো, তার জন্য আনন্দিত হও'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা' অর্থ তাদের কাছে ফেরেশতা নেমে আসে তাদের মৃত্যুর সময়। কাতাদা ও মুকাতিল বলেছেন, যখন তাদেরকে কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে তখন। ওয়াকী ইবনে জাররাহ বলেছেন, তারা ফেরেশতা কর্তৃক সুসংবাদ পাবে তিনবার— মৃত্যুর প্রাক্কালে, কবরে এবং পুনরুত্থান দিবসে— কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়।

'আল্লা তাখাফু' অর্থ ভীত হয়ো না। কথাটি বর্ণনামূলক। কেননা এর অর্থ নিহিত রয়েছে 'তাতানায্যাল' (অবতরণ) এর মধ্যে। অথবা 'আল্লা' এর 'আন্' (যে) হচ্ছে মূল শব্দ। অর্থাৎ পরকালের যে পরিস্থিতি তোমাদের সন্নিকটবর্তী হচ্ছে, সে ব্যাপারে ভয় কোরো না।

'ওয়া লা তাহ্যানু' অর্থ চিন্তিত হয়ো না। অর্থাৎ স্বজন-বিচ্ছেদের কারণে দুঃখ কোরো না। এখন তাদের স্থান পূরণ করবো আমরা। 'ভয়' যেমন সৃষ্টি হয় আসন্ন বিপদকে কল্পনা করে, তেমনি 'দুঃখ' জাগে কল্যাণকর কোনো কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে, অথবা ক্ষতিকর কোনো কিছুর সম্মুখীন হলে। আতা ইবনে রেবাহ্ বলেছেন, এখানে 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না' অর্থ আপন পাপের জন্য ভীত-বিমর্ষ হয়ো না এবং শাস্তির ভয়ে দুশ্চিন্তিতও হয়ো না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর এখানকার 'তোমাদেরকে জান্নাতের যে

তাফসীরে মাযহারী/৩৯৭

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো তার জন্য আনন্দিত হও' অর্থ পৃথিবীতে পয়গম্বরগণের জবানীতে যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিলো, সে প্রতিশ্রুতি এখন বাস্তবায়নের পথে, এ কথা ভেবে আনন্দ প্রকাশ করো।

আবু নাঈম লিখেছেন, সাবেত বুনানী একবার এই সুরা পাঠ করতে শুরু করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে তিনি বললেন, আমি এক হাদিসে পেয়েছি, বিশ্বাসী বান্দাকে যখন কবর থেকে ওঠানো হবে, তখন তার পৃথিবীর জীবনের সহচর ফেরেশতারা সেখানে তার সাথে মিলিত হবে এবং বলবে, 'ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে বেহেশতের যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিলো তার জন্য আনন্দিত হও'। এরপর আল্লাহ্ তাকে ভয় থেকে চিরমুক্ত করবেন এবং তার নয়নযুগলকে করবেন শীতল।

এরপরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে', একথার অর্থ— ওই সকল ফেরেশতা তাদেরকে আরো বলবে, পৃথিবীতে যখন তোমরা ছিলে, তখন আমরা ছিলাম তোমাদের সুহৃদ-সহচর। তোমাদের হৃদয়ে আমরা প্রক্ষেপ করতাম শুভচিন্তা, রক্ষা করতাম তোমাদেরকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে। আর এখনও আমরা তোমাদেরকে দান করবো অন্তরঙ্গ সাহচর্য, যতোক্ষণ না তোমরা প্রবেশ করো বেহেশতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ করো'। একথার অর্থ— আর বেহেশতে তোমরা যা চাইবে, তা-ই পাবে। সেখানে রয়েছে তোমাদের কাম্য বস্তুসমূহের সুপ্রচুর সমাহার।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপ্যায়ন'। একথার অর্থ বেহেশতের ওই সুপ্রচুর সম্ভোগসম্ভার হচ্ছে মহাক্ষমাপরবশ এবং মহান দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রীতিকর আতিথেয়তা। অর্থাৎ তোমরা সেখানে হবে আল্লাহ্‌র অতিথি।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বায্যার, ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীরা সেখানকার পাখি দেখে গোশত খেতে ইচ্ছা করলে সঙ্গে সঙ্গে ওই পাখির গোশত ভূনা করা অবস্থায় হাজির করানো হবে তাদের সামনে। হজরত আবু উমামা থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, জান্নাতের পাখিরা হবে হৃষ্টপুষ্ট উটের মতো তাজা। তারা ওই সকল পাখির গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করলে সঙ্গে সঙ্গে ওইগুলোর রান্না করা গোশত আহার্যাকারে উপস্থিত করা হবে তাদের সম্মুখে। তাতে তারা না পাবে ধোঁয়ার গন্ধ, না পাবে আগুনের আঁচ। তারা পরিতৃপ্তির সঙ্গে ওই গোশত খাবে। তারপর পাখিরাও তাদের পূর্বের অবয়ব নিয়ে উড়ে চলে যাবে। বায়হাকী ও তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং তিরমিজি কর্তৃক 'উত্তম' আখ্যায়িত এক হাদিসে এসেছে, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতীদের কেউ সন্তানাকাংখা করলে সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিবে তার বাসনাজাত সন্তান। ওই সন্তানের গর্ভাবস্থা থেকে জন্মকালীন সময় সুসম্পন্ন হবে মুহূর্তমধ্যে।

তাফসীরে মাযহারী/৩৯৮

হান্নাদ তাঁর 'আজজুহুদ' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আবু সাঈদ বলেছেন, আমি একবার নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! শিশুসন্তান তো চোখের শান্তি। জান্নাতে কি কেউ সন্তানাধিকারী হবে? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যখন সে কামনা করবে। হজরত আবু সাঈদ থেকে ইসপাহানী সুপরিণত নয়, এমন এক হাদিস বর্ণনা করেছেন তাঁর আত্তারগীব গ্রন্থে, যেখানে বলা হয়েছে, জান্নাতীরা যখনই বাচ্চা চাইবে, তখনই পেয়ে যাবে ফুটফুটে বাচ্চা। গর্ভমেয়াদ, দুধপান, দুধপানত্যাগ সবকিছুই সম্পন্ন হবে এক মুহূর্তের মধ্যে। সুপরিণত সূত্রে এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন বায়হাকীও। তবে তাঁর বর্ণনায় 'যখনই বাচ্চা চাইবে' এর স্থলে উল্লেখিত হয়েছে 'যখনই তারা সন্তান কামনা করবে'।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

❑ কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।'

❑ ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে, সে হইয়া যাইবে অন্তরংগ বন্ধুর মত।

❑ এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকেই, যাহারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকেই, যাহারা মহাভাগ্যবান।

❑ যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

❑ তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করিও না, চন্দ্রকেও নহে; সিজ্‌দা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁহার ইবাদত কর।

❑ উহারা অহংকার করিলেও যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা তো দিবস ও রজনীতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাহারা ক্লান্তি বোধ করে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কেউ-ই নয়, যে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে, নিজে পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদের অন্তর্গত।

এখানে 'ক্বওলান্' অর্থ গর্ব করা, অথবা ইসলামকে ন্যায়নীতির ধর্ম বানানো। অর্থাৎ এর প্রকৃত অর্থ হবে ধর্ম ও বিশ্বাস। মোহাম্মদ ইবনে সিরীন ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'যে আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে ডাকে' বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স.কে। হাসান বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে ওই সকল মুসলমানের কথা, যারা আল্লাহ্‌র রসুলের আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে।

উম্মত জননী হজরত আয়েশা বলেছেন, আমি মনে করি, এই আয়াতে প্রশংসা করা হয়েছে মুয়াজ্জিনদের। হজরত আবু উমামা বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র দিকে
মানুষকে আহ্বান করে' অর্থ আজান দেয় এবং 'সৎকর্ম করে' অর্থ ফরজ নামাজে
দণ্ডায়মান হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নেয়। কায়েস ইবনে হাযেম বলেছেন, এখানে 'সৎকাজ' অর্থ আজান ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তীতে নামাজ পাঠ। হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তিনবার বলেছেন, প্রতি দুই আজানের মধ্যবর্তীতে নামাজ রয়েছে তার জন্য, যে তা পাঠ করতে চায়। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, আমি এরকম শুনিনি। তবে একথা ঠিক যে, আজান ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তী নামাজের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয় না। আবু দাউদ, তিরমিজি।

আজানের মাহাত্ম্য ঃ হজরত মুয়াবিয়া বর্ণনা করেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মহাবিচারের দিবসে মুয়াজ্জিনদের গ্রীবাদেশ হবে অন্যাপেক্ষা দীর্ঘ। মুসলিম। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মুয়াজ্জিনদের

আজানের ধ্বনি যারা শুনবে, শেষ বিচারের দিনে তারা হবে তার পক্ষের সাক্ষ্যদাতা— মানুষ, জ্বিন, প্রাণী-পাখি যেই হোক না কেনো।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইমাম জিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামদের হেদায়েত করো এবং মুয়াজ্জিনদের মার্জনা করো। আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি, শাফেয়ী। হজরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যের আশায় সাত বছর ধরে আজান দিবে, তাকে দেওয়া হবে দোজখমুক্তির সনদ। তিরমিজি, ইবনে মাজা, আবু দাউদ।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তিন ধরনের মানুষ জান্নাতের উচ্চ স্তরে অবস্থান করবে— ১. সেই ক্রীতদাস, যে আল্লাহ্র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে, সাথে সাথে অনুগত থাকে তার মনিবের ২. সেই ইমাম যার ইমামতির প্রতি জনসাধারণ সন্তুষ্ট ৩. সেই মুয়াজ্জিন যে দিবস-রজনীতে আজান দেয় পাঁচবার। তিরমিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বর্ণনাটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যতোদূর পর্যন্ত মুয়াজ্জিনের আজানের আওয়াজ যায়, ততোদূর পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা হতে থাকে। আর সিক্ত-শুষ্ক সকলেই তার পক্ষে সততার সাক্ষ্য প্রদান করে। তার ডাক শুনে যারা নামাজের জামাতে উপস্থিত হয়, তাদেরকে দেওয়া হয় পঁচিশ গুণ বেশী পুণ্য এবং ক্ষমা করে দেওয়া হয় তাদের দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের পাপ। আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

হজরত সহল ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, দুইটি বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হয় না, অথবা বলেছেন, খুব কমই প্রত্যাখ্যান করা হয়— আজানের সময়ের এবং জেহাদের সময়ের প্রার্থনা, যখন আমাদের এক হাত মিলিত হয় অন্য হাতের সঙ্গে।

হজরত ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে বারো বৎসর পর্যন্ত আজান দিয়েছে, তার জন্য জান্নাত অবশ্য প্রাপ্য। প্রতি ওয়াক্তে আজান
দেওয়ার কারণে প্রতিদিন তার জন্য পুণ্য লেখা হয় ষাটটি এবং প্রতি বারের ইকামতের জন্য পুণ্য দেওয়া হয় তিরিশটি। ইবনে মাজা।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, যদি খেলাফতের গুরুদায়িত্ব আমার স্কন্ধে না থাকতো, তবে আমি আজান দিতাম। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মাগরিবের আজানের সময় আমাদেরকে দোয়া করার জন্য আদেশ দেওয়া হতো।

আজানের জবাব ঃ হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, মুয়াজ্জিন যা উচ্চারণ করে, তোমরাও তা-ই বোলো। তারপর আমার উপর পাঠ কোরো দরূদ। যে আমার জন্য দোয়া করবে, আল্লাহ্ তার উপর রহমত অবতীর্ণ করবেন দশটি। আর আমার জন্য তোমরা আল্লাহ্র কাছে 'অসিলা'র প্রার্থনা কোরো। জান্নাতের মধ্যে 'অসিলা' হচ্ছে এক বিশেষ স্তর। ওই স্তরের অধিকারী হবে আল্লাহ্র এক বান্দা। আমি আশা করি, সে বান্দা আমিই। যে আমার জন্য 'অসিলা' প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাবে, তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে আমার শাফায়াতের দরোজা। মুসলিম।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের কথার প্রতিধ্বনি করবে, বলবে মুয়াজ্জিনের কথার অনুরূপ কথা এবং 'হাইয়্যা আ'লাস্সলাহ্' ও 'হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ' বলার পর কেবল বলবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্', সে গমন করবে জান্নাতে। মুসলিম।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আজানের ফযীলতের কথা শুনে একবার এক লোক রসুল স. এর নিকটে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! মুয়াজ্জিন তো তাহলে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাবে। তিনি স. বললেন, তোমরাও তার কথার পুনরাবৃত্তি কোরো এবং আজান শেষে দোয়া কোরো। তারপর যা চাও, তা-ই পাবে। আবু দাউদ।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না'। একথার অর্থ সৎকর্ম ও অসৎকর্মের প্রতিফল কখনো একরকম নয়। এখানে দ্বিতীয় 'লা' (নয়) না সূচকের গুরুত্ব প্রকাশক। এভাবে এখানে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত শুভকে আশ্রয় করা অশুভকে পরিহার করা, অবলম্বন করা ক্রোধের বদলে সহিষ্ণুতা, প্রতিশোধের বদলে ক্ষমা, অজ্ঞতার বদলে জ্ঞান, গোড়ামির বদলে সুবিবেচনা, ঔদ্ধত্যের বদলে বিনয়, কৃপণতার পরিবর্তে বদান্যতা, দোদুল্যমানতার বদলে দৃঢ়তা এবং কাপুরুষতার বদলে পৌরুষ।

এরপর বলা হয়েছে— 'মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সঙ্গে যাদের শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো'। এখানকার 'আহ্সান' (উৎকৃষ্ট) শব্দটি তুল্যমূল্যার্থে ব্যবহৃত হয়নি। অর্থাৎ মন্দের তুলনায় অধিক হওয়া শব্দটির

উদ্দেশ্য নয়। কেননা মন্দের মধ্যে কম অথবা বেশী কোনোরকম ভালো থাকে না। বরং 'আহ্সান' অর্থ এখানে বিশুদ্ধ প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তির অভ্যন্তরস্থিত উত্তম স্বভাব।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার নির্দেশনাটি এরকম— ক্রোধকে প্রতিহত করো ধৈর্যের দ্বারা, মূর্খতাকে প্রতিহত করো ক্ষমার দ্বারা, আর কেউ
খারাপ আচরণ করলে তাকে মাফ করে দাও। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, আলোচ্য বক্তব্যের উদ্দেশ্য এরকম— সব মন্দ কাজ সমপর্যায়ের নয়, তেমনি সব ভালো কাজও সমমর্যাদাবিশিষ্ট নয়। শত্রুর মন্দ কাজের মোকাবিলা করতে হবে সর্বোৎকৃষ্ট কাজের দ্বারা। যেমন— কেউ তোমার সঙ্গে মন্দ আচরণ করলে তুমি তাকে উপেক্ষা করো, অথবা ক্ষমা করে দাও। এটাও এক পর্যায়ের ভালো কাজ। কিন্তু তার মন্দ ব্যবহারের বিপরীতে তুমি যদি তার সঙ্গে উত্তম আচরণ প্রকাশ করো, তবে তা হবে 'আহ্সান' (অত্যুত্তম কর্ম)।

'ফা ইজাল্লাজী বাইনাকা ওয়া বাইনাহু আ'দাওয়াতুন্ কাআন্নাহু ওয়ালীয়্যুন হামীম' অর্থ— ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এখানকার 'ইজা' পরিণামসূচক। অর্থাৎ যখনই তুমি উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত করবে, তখনই অকস্মাৎ দেখতে পাবে তোমার শত্রু পরিণত হয়েছে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আবু সুফিয়ানের পক্ষে। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। কেননা এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো রসুল স. এর মক্কাবাসের সময়। আর আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটেছিলো মক্কাবিজয়ের পর।

এরপরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা মহাভাগ্যবান'। একথার অর্থ— শত্রুকে বন্ধু বানানোর এই দুর্লভতম গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই, যারা ধীর, স্থির-শান্ত স্বভাববিশিষ্ট এবং যারা মহাসৌভাগ্যবান। অর্থাৎ যারা অপপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অনড় অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম, তারাই উৎকৃষ্ট দ্বারা প্রতিহত করতে পারে মন্দকে। অপস্বভাবের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে তারা তখন চলে আসতে পারে বিশুদ্ধতার অমল আলোয়।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্র শরণ নিবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। এখানকার 'ইন্নামা' (যদি) কথাটির 'ইন্' শর্তপ্রকাশক এবং 'মা' হচ্ছে অতিরিক্ত।

'নায্গুন' অর্থ কুমন্ত্রণা। শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে এবং প্ররোচিত করে পাপের দিকে। কামুস গ্রন্থে রয়েছে, 'নাযাগ্' অর্থ তীর বা বর্শা বিদ্ধ করা।'নাযাগ্' অর্থ দূরত্ব সৃষ্টিকারী, বিশৃঙ্খলা আরোপকারী, সন্দেহ সৃষ্টিকারী। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনাকে প্ররোচিত করবার চেষ্টা করা হয়, মন্দ দিয়ে মন্দকে প্রতিহত করার জন্য যদি শয়তান আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আপনি তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয় যাচনা করবেন। তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে নিরাপদ রাখবেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। সুতরাং আপনার ও অন্য সকলের প্রার্থনা তিনি শোনেন এবং জানেন সকলের প্রার্থনার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও।

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা কোরো না, চন্দ্রকেও নয়। সেজদা করো আল্লাহ্কে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদত করো'। একথার অর্থ— হে মানুষ! তোমাদেরকে যেমন আমি সৃষ্টি করেছি, তেমনি সৃষ্টি করেছি দিবস-রজনী-সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদিকেও। সুতরাং তোমরা সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদত কোরো না। ইবাদত করো কেবল আল্লাহ্র, যিনি সকলের এবং সকলকিছুর একক সৃজক।

আলোচ্য আয়াতে বিধৃত হয়েছে আল্লাহ্র একক সত্তা ও গুণবত্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উত্তমরূপেও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যা অন্যের সৃজন-মুখাপেক্ষী, তা কখনো উপাসনার যোগ্য নয়। উপাসনা করতে হবে কেবল তাঁর, যিনি চিরঅমুখাপেক্ষী ও সকলকিছুর একক স্রষ্টা। উল্লেখ্য, এখানে সেজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে কেবল সূর্য ও চন্দ্রকে। অথচ বলা হয়েছে 'যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন'। অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন দিবস-রজনী-সূর্য-চন্দ্রকে। দিবস-রজনীকে কেউ সেজদা করে না। তাই নিষেধ করা হয়েছে কেবল সূর্য ও চন্দ্রকে সেজদা করতে। আবার এর মধ্য দিয়ে এই যুক্তিটিকেও স্পষ্ট করা হয়েছে যে,

দিবস-রজনীও তো আল্লাহ্তায়ালারই সৃষ্টি এবং এদু'টোকে যখন কেউ সেজদা করে না, তখন সূর্য-চন্দ্রকে সেজদা করবে কেনো? মুখাপেক্ষিতার দিক দিয়ে সূর্য-চন্দ্রও তো দিবস-রজনীর অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ীর মতে আলোচ্য আয়াত পাঠ করে সেজদা করতে হবে। কেননা এখানে বলা হয়েছে 'সেজদা করো আল্লাহ্কে'। হজরত ইবনে মাসউদ ও হজরত ইবনে ওমর থেকেও এরকম অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে

ইয়াজিদ সূত্রে তাহাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ 'হা-মীম' সুরার প্রথম আয়াত পাঠ করে সেজদা করতেন। নাফে সূত্রে তাহাবী উল্লেখ করেছেন, হজরত ইবনে ওমরও এরকম করতেন।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'তারা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা তো দিবস-রজনীতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এরকম প্রকৃষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদানের পরেও যদি মানুষ ঔদ্ধত্য প্রকাশার্থে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে চিরঅমুখাপেক্ষী। সৃষ্টির ইবাদত ও প্রশংসা বর্ণনার প্রয়োজন থেকে তিনি সতত মুক্ত। তাছাড়া আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন ফেরেশতারা তো দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে চলেছেই। আর এ ব্যাপারে তাদের ক্লান্তি-শ্রান্তিও নেই।

এখানে 'ফাল্লাজীনা' কথাটির 'ফা' শার্তিক। আর শর্তের প্রতিফল এখানে রয়েছে উহ্য। তাই প্রতিফলের স্থলে এখানে প্রকাশিত হয়েছে প্রতিফলের নিমিত্ত। অর্থাৎ ওই সকল লোক যদি দম্ভ প্রকাশ করে, তবে তাতে করে আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কেননা তাঁর সান্নিধ্যধন্য ফেরেশতাদের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা চলতে থাকে নিরবচ্ছিন্নরূপে। আর এ ব্যাপারে তাদের শ্রান্ত-ক্লান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

'ইন্দা রব্বিকা' অর্থ প্রভুপালকের সান্নিধ্যে। উল্লেখ্য, এরূপ সান্নিধ্যের স্বরূপ অজ্ঞাত। কেননা আল্লাহ্ আনুরূপ্যবিহীন। সুতরাং তাঁর সান্নিধ্যও সকল অনুরূপতার অতীত। তাই এর প্রকৃতি নির্ণয়ে জ্ঞান অসহায়। আর এখানে 'যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতা, আম্বিয়া ও আউলিয়া সম্প্রদায়কে।

'লা ইয়াস্‌আমূন' অর্থ তারা ক্লান্তি বোধ করে না। কেননা ফেরেশতাদের ক্লান্তি-শ্রান্তি নেই। তাছাড়া আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণন তাদের জন্য অতীব আনন্দদায়ক। রসুল স.ও এরকম আনন্দের কথা প্রকাশ করতেন। বলতেন! বেলাল আমাকে আনন্দ দাও (আজান দাও, আমি নামাজ পাঠ করি)।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, এই আয়াত পাঠ করলে তেলাওয়াতের সেজদা করতে হবে। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এরকমই অভিমত এসেছে। ইবনে
আবী শায়বা তাঁর গ্রন্থে এবং মুজাহিদ সূত্রে তাহাবী উল্লেখ করেছেন, হজরত

ইবনে আব্বাস 'হা-মীম' সুরার শেষ আয়াত পাঠ করে সেজদা করতেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস একবার এক লোককে 'যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদত করো' পড়বার পর সেজদা করতে দেখে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি করলে। সেজদার আয়াত আসার আগেই সেজদা করে নিলে।

তাহাবীর বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ বলেছেন, আমি একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে 'হা-মীম' বিশিষ্ট সুরার সেজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, দু'টি আয়াতের মধ্যে শেষ আয়াতে সেজদা কোরো। স্বসূত্রে তাহাবী একথাও বলেছেন যে, হজরত আবু ওয়ায়েল 'হা-মীম' এর শেষ আয়াতে সেজদা করতেন। ইবনে সিরীনের বর্ণনা এবং কাতাদার উদ্ধৃতিও এরকম। 'হেদায়া' প্রণেতা লিখেছেন, হজরত ওমরও এরকম বলতেন। ইবনে হুম্মাম লিখেছেন, হজরত ওমরের উদ্ধৃতিটি দুস্প্রাপ্য শ্রেণীর । ইমাম আবু হানিফার মন্তব্যটি যথেষ্ট সতর্কতাশোভিত। কেননা সেজদা যদি 'তা'বুদূন' (ইবাদত করো) বলার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াজিব হয়, তবে পরের আয়াত পাঠ করার পর সেজদা করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু 'লা ইয়াস্‌আমূন' (ক্লান্তিবোধ করে না) বলার পর যদি সেজদাকে আবশ্যিক মনে করা হয়, তবে আগের আয়াত পাঠের পর সেজদা করলে তা যথেষ্ট হবে না।

তাহাবী লিখেছেন, তেলাওয়াতের সেজদা আদায় কোন স্থলে জরুরী সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। সর্বসম্মত অভিমতানুসারে কোরআনে সেজদার আয়াত রয়েছে দশটি। ওই দশটি আয়াত রয়েছে এসকল সুরায়— ১. আরাফ ২. রা'দ ৩. নহল ৪. বনী ইসরাইল ৫. মারিয়াম ৬. হাজ্জ ৭. ফোরকান ৮. নমল ৯. আলিফ লাম তানযীল ১০. হা-মীম। আস্‌সাজ্দা। এসকল সুরায় উল্লেখিত সেজদার আয়াতগুলোর কোনোটাই আদেশমূলক নয়, বরং
বিজ্ঞপ্তিমূলক। সেগুলোতে দেওয়া হয়েছে অহংকারীদের অহংকার এবং বিনয়ীদের বিনয়ের সংবাদ। অবশ্য অহংকারীদের বিরুদ্ধতা এবং বিনয়ের সম্মান আমাদের জন্যও জরুরী। আর যে সকল আয়াতে সেজদার আয়াত হওয়া সম্পর্কে বিদ্বানগণের মিলিত মত নেই, সেগুলোতে দেওয়া হয়েছে সেজদার আদেশ এবং সেগুলো নামাজের রুকু-সেজদা সম্পর্কিত। আর যেখানে বলা হয়েছে কেবল মস্তক অবনত করার কথা, সেখানেও কেউ কেউ সেজদা করার কথা বলেছেন। নামাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সেজদা ওয়াজিব হয় না— এটাকেই যদি সাধারণ রীতি বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে প্রশ্ন জাগে, তাহলে সুরা হাজ্জ এর 'তোমার প্রভুপালককে রুকু করো, সেজদা করো ও তার ইবাদত করো' এই আয়াতকে সেজদার আয়াত বলা হবে কেনো? কেননা এগুলো তো সবই আদেশ। আর এখানে পৃথকভাবে সেজদা করার হুকুমও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা বলেন, পৃথক ভাবে সেজদা করার কথা বলা হলেও সেখানকার 'সেজদা করো' অর্থ নামাজে সেজদা করো। বক্তব্যের

পদ্ধতিগত দাবিও সেরকমই। কেননা পূর্বের 'রুকু করো' নির্দেশটি সর্বসম্মতিক্রমে নামাজে রুকু করো। সুতরাং পরক্ষণে উল্লেখিত 'সেজদা' নামাজের সেজদা হওয়াই সমীচীন। আর এটাও বিবেচনাভূত

হওয়ার দাবি রাখে যে, আলোচ্য সুরার প্রথম আয়াতে তেলাওয়াতের সেজদার হুকুম বিদ্যমান। কাজেই মর্মার্থ হবে নামাজের সেজদা। আর পরবর্তী আয়াত বিজ্ঞপ্তিমূলক। কাজেই তেলাওয়াতে সেজদা দিতে হবে। আবার সুরা সোয়াদের আয়াতটিও সেজদার আয়াত হওয়া উচিত। কেননা সেখানেও রয়েছে বিজ্ঞপ্তিমূলক সেজদার কথা। এসকল বিষয় লক্ষ্য করে তাই ইমাম আবু হানিফা উক্ত আয়াতকে সেজদার আয়াত বলে চিহ্নিত করেছেন। সুরা ইনশিকাকের ২১ সংখ্যক আয়াত পাঠ করেও তাই সেজদা করা জরুরী। কেননা ওই আয়াতটি বিজ্ঞপ্তিমূলক। অবশ্য এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, ইমাম আবু হানিফা তাহলে সুরা আন্‌নজম এর ৬২ সংখ্যক আয়াত এবং সুরা আলাক এর শেষ আয়াতকে সেজদার আয়াত বলেন কেনো? ওই আয়াত দু'টি বিজ্ঞপ্তিমূলক নয়, বরং আদেশমূলক। এই আপত্তিটির জবাবে বলতে হয়, এই দুই আয়াত সম্পর্কে তিনি প্রমাণ পেয়েছেন, রসুল স. স্বয়ং এই দুই আয়াত পাঠ করে সেজদা করেছেন। যথাসূত্রসম্বলিত হাদিসের উপরে সাধারণ রীতিটি তিনি পরিহার করেছেন সেকারণেই। আমার মতে সুরা হাজ্জ এ রয়েছে দু'টি সেজদা। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ওই সুরার তাফসীরেই।

নির্দেশনা ঃ যারা এই আয়াত আরবীতে পাঠ করেছেন, তাঁরা তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করে নিবেন।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দা ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪

❑ এবং তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক উষর, অতঃপর যখন আমি উহাতে বারি বর্ষণ করি তখন উহা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই তো মৃতের জীবনদানকারী। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ যাহারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তাহারা আমার অগোচর নহে। শ্রেষ্ঠ কে— যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকিবে সে? তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর; তোমরা যাহা কর তিনি তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

❑ যাহারা উহাদের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে; ইহা অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ—

❑ কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিতে পারে না— অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

❑ তোমার সম্বন্ধে তো তাহাই বলা হয়, যাহা বলা হইত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

❑ আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করিতাম তবে উহারা অবশ্যই বলিত, 'ইহার আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয় নাই কেন?' কি আশ্চর্য যে, ইহার ভাষা আজমী, অথচ রাসূল আরবীয়! বল, 'মু'মিনদের জন্য ইহা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার।' কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদের জন্য অন্ধত্ব। ইহারা এমন যে, ইহাদিগকে যেন আহ্‌বান করা হয় বহুদূর হইতে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— তাঁর সর্বময় এককত্বের আর একটি নিদর্শন এই যে, তোমরা অহরহ অবলোকন করছো, বিশুষ্ক মৃত্তিকায় আমি যখন বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা হয় প্রাণবন্ত এবং শস্য-শ্যামল। যিনি মৃত ভূমিকে এভাবে জীবন্ত করতে সক্ষম, তিনিই মৃত মানুষকে পুনর্জীবিত করবেন পুনরুত্থান দিবসে। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিধর।

এখানে 'মিন আয়াতিহী' অর্থ তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে। অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যে রয়েছে তাঁর অপার ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'খশিয়াতা' অর্থ শুষ্ক উষর। 'রবাত' অর্থ স্ফীত। 'আহ্ইয়া হা' অর্থ জীবিত করেন। আর 'আ'লা কুল্লি শাইইন' অর্থ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

পরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে, তারা আমার অগোচর নয়'।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে আয়াতসমূহকে বিকৃত করার অর্থ কোরআন পাঠকালে শিস দেওয়া, তালি বাজানো, আজে বাজে কথা বলা অথবা শোরগোল করা। কাতাদা বলেছেন 'আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে' অর্থ আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে। সুদ্দী বলেছেন, শত্রুতা ও বিরোধিতা করে। মুকাতিল বলেছেন, একথা বলা হয়েছে আবু জেহেলকে লক্ষ্য করে। 'ইউল্‌হিদূন' এর সাধারণ অর্থ মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, অনর্থক বিতর্ককারী, কোরআন পাঠ করার সময় শিস বাজানো, কোরআনের শব্দ অথবা অর্থের বিকৃতি সাধনকারী। আর 'তারা আমার অগোচর নয়' অর্থ— সকলের সকল কিছুই রয়েছে আমার অবলোকনের আওতায়। কেননা আমি সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং আমার অসন্তোষ ও শাস্তির ব্যাপারে তোমরা নির্ভয় থেকো না।

এরপর বলা হয়েছে— 'শ্রেষ্ঠ কে যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে সে'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— দোজখীদের চেয়ে ওই সকল ব্যক্তি অবশ্যই উত্তম, যারা কিয়ামতের মহাশাস্তি থেকে থাকবে নিরাপদ। বশীর ইবনে ফতেহ সূত্রে ইবনে মুনজির বলেছেন, এই বাক্যটি অবতীর্ণ হয়েছে আবু জেহেল ও হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের পক্ষে। কেউ কেউ হজরত আম্মারের স্থলে বলেছেন হজরত হামযা অথবা হজরত ওসমানের নাম। তবে এখানকার বক্তব্যটি ব্যাপকভিত্তিক। তাই বলা যেতে পারে, আবু জেহেলের মতো সকল দোজখী এবং হজরত আম্মারের মতো সকল জান্নাতী ব্যক্তিই আলোচ্য বক্তব্যভূত।

প্রকাশ্যতঃ বক্তব্যটি উপস্থাপিত করা যেতো এভাবে— কী? জাহান্নামে যে পতিত হবে সে উত্তম, না উত্তম ওই লোক যে শাস্তিমুক্ত হয়ে প্রবেশ করবে জান্নাতে। এভাবে বললে অবশ্য জাহান্নামী জান্নাতীর পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়। কিন্তু বক্তব্যটি জোরালো হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে বক্তব্যকে শানিত ও শক্তিশালী করবার জন্যই বাক্যটি এখানে বিন্যস্ত করা হয়েছে এভাবে। ফলে এর মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— জাহান্নামী ব্যক্তি যখন কিয়ামতের ভয়াবহতামুক্ত ব্যক্তিরই সমতুল নয়, তখন জান্নাতে যে প্রবেশ করেছে তার সঙ্গে তার তুলনা করার কথা তো চিন্তাই করা যায় না।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদের যা ইচ্ছা করো; তোমরা যা করো, তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা'। একথার অর্থ— অতএব হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনগোষ্ঠী! তোমরা যা খুশী তা-ই করো। কিন্তু একথাটিও জেনে রেখো যে, তোমরা যা করো, তিনি তা দেখেন। সুতরাং তোমাদের কর্মফলের শাস্তি তিনি তোমাদেরকে দিবেনই। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ এভাবে এখানে প্রকাশ করেছেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে শাস্তিদানের দৃঢ় অঙ্গীকার।

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'যারা তাদের নিকট কোরআন আসবার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে'। বাক্যটির বিধেয় এখানে রয়েছে উহ্য। ওই উহ্য বিধেয় সহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা তাদের কাছে কোরআনের আহ্বান উপস্থাপিত হবার পর, সেই আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে, তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। ওই অপরাধের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন, অথবা আস্বাদন করাবেন কঠিন শাস্তি। কারো কারো মতে এখানকার উহ্য বিধেয়টি এরকম— তাদেরকে আহবান করা হবে দূরবর্তী স্থান হতে।

এরপর বলা হয়েছে— 'ওয়া ইন্নাহু লা কিতাবুন আযীয' এর অর্থ 'নিঃসন্দেহে এই কোরআন হচ্ছে এক মহিমময় গ্রন্থ'। কালাবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট এই কিতাব মর্যাদার্হ। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— আল্লাহ্ এই গ্রন্থকে এমতো মর্যাদামণ্ডিত করেছেন যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তা স্পর্শ করতে পারে না।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না— সম্মুখ থেকেও নয়, পশ্চাৎ থেকেও নয়'। এ কথার অর্থ— সম্মুখ-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকেই শয়তান এই কোরআনের সন্নিকটবর্তী হতে পারে না।

কাতাদা ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'মিথ্যা' অর্থ শয়তান। আর 'অনুপ্রবেশ করতে পারে না' অর্থ শয়তান কোরআনে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে বা একে রূপান্তরিত করতে পারে না, সে শয়তান জ্বিনরূপী হোক, অথবা ভ্রষ্টতারূপী। পথভ্রষ্ট শিয়ারা কোরআনের তিরিশ পারার সঙ্গে আরো দশ পারা যোগ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তাদের সে অপচেষ্টা সফল হয়নি। সুতরাং তাদের কাছে এখন যে কোরআন আছে, তা তিরিশ পারাতেই আছে।

জুজায বলেছেন, এখানে 'সম্মুখ থেকে অনুপ্রবেশ করতে পারে না' অর্থ কোরআনে ঘটাতে পারে না কোনো বিয়োজন। আর 'পশ্চাতে থেকে অনুপ্রবেশ করতে পারে না' অর্থ কোরআনের সঙ্গে করতে পারে না নতুন কোনো কিছুর যোজনা। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এখানকার 'সম্মুখ-পশ্চাৎ' অর্থ দাঁড়ায় হ্রাস-বৃদ্ধি। মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— পূর্বের কোন কিতাবের দ্বারা যেমন কোরআনকে মিথ্যা প্রত্যয়ন করা যায় না, তেমনি পরবর্তীতেও এমন কোনো কিতাব অবতীর্ণ হবে না, যার দ্বারা হতে পারে কোরআনের অপ্রত্যয়ন।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা প্রশংসার্হ আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ'। একথার অর্থ— যিনি মহাপ্রজ্ঞাময় স্বয়ংপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, যিনি সৃষ্টির সকলকিছু থেকে চির-অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অনুকম্পা দ্বারা পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট সৃষ্টি যার প্রশংসা করে কৃতার্থ হয়, সেই মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতাই এই কোরআনের অবতরণকারী।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'তোমার সম্বন্ধে তো তা-ই বলা হয়, যা বলা হতো পূর্ববর্তী রসুলগণ সম্পর্কে'। এখানে রসুল স.কে এই মর্মে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের রূঢ় ও অনন্দিত আচরণ নতুন কোনো ঘটনা নয়। সত্যের প্রতি তারা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এসেছে আবহমান কাল থেকে। আপনাকে যেমন তারা 'যাদুকর' 'উন্মাদ' ইত্যাদি অপ-অভিধায় অভিহিত করে, তেমনি পূর্ববর্তী যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও তাদের নবীদেরকে বিভিন্ন অপমন্তব্য দ্বারা আঘাত করতো। ওই নবীগণ তখন ধৈর্যধারণ করতেন। প্রার্থনা করতেন তাদের চৈতন্যোদয়ের জন্য। আপনিও তেমনই করুন। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! আপনার পূর্বসূরীদের উপর যেমন আল্লাহ্র এককত্ব এবং ধর্মের মূলনীতি সম্পর্কিত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হতো, আপনার উপরেও প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়ে চলেছে সেভাবেই। এটা কোনো নতুন নিয়ম নয়। একথাটিকেও সকল যুগের সকল নবীগণের মাধ্যমে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্ ক্ষমাপরবশ এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠিন শাস্তিদাতা। কেউ কেউ বলেছেন, পরবর্তী বাক্যে কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে 'তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল ও কঠিন শাস্তিদাতা'।

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একবার তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বললো, আসমানী কিতাব তো অবতীর্ণ হয়ে থাকে আজমী ভাষায়। যেমন তওরাত ও ইঞ্জিল। কোরআন যদি আসমানী কিতাবই হয়, তবে তা আজমী ভাষায় অবতীর্ণ না হয়ে আবার আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলো কেনো? তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এরপরের আয়াত (৪৪)।

বলা হয়েছে— 'আমি যদি আজমী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করতাম, তবে তারা অবশ্যই বলতো, এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেনো? কী আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রসুল আরবীয়'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! কুটতর্কপ্রবণ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের মন্তব্য অযৌক্তিক ও সরলতার পরিপন্থী। তাই তারা বলে, অন্যান্য কিতাবের মতো কোরআন আজমী ভাষায় না হয়ে আরবী ভাষায় হলো কেনো? আজমী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করলে তারা উত্থাপন করতো আরো অনেক অজুহাত। বলতো, আমরা আরবীভাষী জেনেও আমাদের কাছে আজমী ভাষায় কোরআন দেওয়া হলো কেনো?

বিদেশী ভাষা বলেই তো আমরা কোরআনের বিবরণ বিশদভাবে অনুধাবন করতে পারছি না। আরো বলতো, দ্যাখো, দ্যাখো, কী আশ্চর্যের ব্যাপার! কোরআন নাজিল হচ্ছে অনারব ভাষায়, আর যার উপর নাজিল হচ্ছে সে আবার আরবীয়।

মুকাতিল বলেছেন, আমের হাজরামীর এক ইহুদী আজমী গোলাম ছিলো। তার নাম ছিলো ইয়াসার এবং পদবী ছিলো আবু ফাকীহা। রসুল স. তার কাছে যাওয়া আসা করতেন দেখে মুশরিকেরা বলাবলি করতে লাগলো, ইয়াসিরই

মোহাম্মদকে শিক্ষা দেয়। তার মনিব একদিন তাকে খুব মারধোর করলো।
বললো, তুই-ই মোহাম্মদকে কুশিক্ষা দিস। ইয়াসার বললো, না, তিনিই আমাকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, কুরায়েশেরা বলাবলি করতে লাগলো, এই কোরআন আরবী ও আজমী উভয় ভাষায় অবতীর্ণ হলো না কেনো? তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। ইবনে জারীর আরো বলেছেন, অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নাকারবর্জিত অবস্থায় এই আয়াতের পাঠভঙ্গি প্রচলিত।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, মুমিনদের জন্য এটা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কোরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব'।

এখানে 'শিফাউন' অর্থ ব্যাধির প্রতিকার, পীড়ার নিরাময়ক। শব্দটির সঙ্গে 'তানভীন' যুক্ত করা হয়েছে বিরাটত্ব বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ কোরআন হচ্ছে বড় ধরনের আরোগ্য, যা দূর করে অন্তর ও বাহিরের সকল পীড়া। কেউ কেউ বলেছেন, কোরআন আরোগ্য কেবল শারীরিক রোগের।

'আ'মা' অর্থ অন্ধত্ব, বোধহীনতার অন্ধকার। কাতাদা বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কোরআনের স্বরূপদর্শন থেকে অন্ধ এবং এর মর্মবাণী শ্রবণ থেকে বধির। তাই কোরআন পঠন ও শ্রবণ তাদের কোনো উপকারে আসে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'এরা এমন যে, তাদেরকে যেনো আহ্বান করা হয় বহুদূর থেকে'। একথার অর্থ— বহুদূর থেকে কাউকে কিছু বললে সে যেমন শুনতে পায় না, কিছুটা আওয়াজ শুনতে পেলেও যেমন সে তা বুঝতে পারে না, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দেখে সেরকমই মনে হয়। তাদের সামনে কোরআন পাঠ করলেও মনে হয় তারা যেনো শুনছে বহুদূর থেকে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৪৫, ৪৬

❑ আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

❑ যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। তোমার প্রতিপালক তাঁহার বান্দাদের প্রতি যুলুম করেন না।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে তাদের মতভেদ ঘটেছিলো'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনাকে আমি যেমন কোরআন দিয়েছি, তেমনি মুসাকে দিয়েছিলাম তওরাত। আবার কোরআন সম্পর্কে যেমন আপনার স্বজাতির মধ্যে তীব্র মতপ্রভেদ দেখা দিয়েছে, কেউ মানছে, কেউ মানছে না, তেমনি মুসার উম্মতের মধ্যেও ঘটেছিলো। সশ্রদ্ধচিত্তে কেউ কেউ তওরাতকে গ্রহণ করেছিলো, আবার কেউ কেউ করেছিলো প্রত্যাখ্যান।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মীমাংসা হয়ে যেতো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ আখেরাতে সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তিতে নিপতিত করবেন— এই বিধানটি পূর্বস্থিরীকৃত। আর নির্ধারিত সময়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্র অভিপ্রায় নয়। এরকম যদি না হতো, তবে তাদেরকে এই মুহূর্তে ধ্বংস করে দিয়ে আল্লাহ্ বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটাতেন। পৃথিবীর জীবনে অবকাশ পেয়ে যাচ্ছে তারা একারণেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তারা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে'। একথার অর্থ— আবার আল্লাহ্র রসুলের বিরুদ্ধে তথা কোরআনের বিরুদ্ধে এতো শত্রুতা করা সত্ত্বেও তাদের উপরে তাৎক্ষণিক শাস্তি নেমে না আসার কারণেই তারা এমতো বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত হয়েছে যে, হয়তো এই কোরআনের বাহক অথবা এই কোরআন সত্য নয়। যদি তা-ই হতো তবে অবশ্যই আপতিত হতো কথিত শাস্তি।

পরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'যে সৎকর্ম করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না'। একথার অর্থ— সৎকর্মশীলেরা সৎকর্মাবলী করে যেতে থাকে তাদের নিজেরই মঙ্গলের জন্য। আর মন্দকর্ম সম্পাদনকারীরা তাদের মন্দ কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে নিজেরাই। কেউ কারো কর্মের দায় অন্যের উপরে চাপাতে পারবে না। আর একথাও শুনে রাখুন হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার প্রভুপালক হচ্ছেন প্রকৃত ন্যায়বিচারক। তিনি তাঁর কোনো বান্দার উপরেই জুলুম করেন না। পুণ্য কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে কারো প্রতি করেন না সামান্যতম অবিচার।

একটি সংশয় ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে জুলুম বা অত্যাচার-অবিচারের কথা তো কল্পনাও করা যায় না। জুলুম বলে অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করাকে। আল্লাহ্
সম্পর্কে অন্যের মালিকানার হস্তক্ষেপের বিষয়টি তো কল্পনার অতীত। কেননা সমগ্র সৃষ্টির তিনিই মালিক। তাহলে এখানে তাঁর সম্পর্কে 'জল্লামিল্ লিল্ আ'বীদ' (বড় জালেম নন) এরকম বলা হলো কেনো? এর অর্থ কি এই-ই দাঁড়ায় না যে, তিনি অল্পমাত্রার জালেম?

সংশয় খণ্ডন ঃ এখানে 'বড় জালেম নন' বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চরম জুলুমবাজ প্রমাণ করার জন্য। অর্থাৎ একথা বলার জন্য যে, বড় জুলুমবাজ হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। আল্লাহ্ কখনোই সেরকম নন।

পঞ্চবিংশতিতম পারা

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১

❑ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্তেই ন্যস্ত, তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হইতে বাহির হয় না, কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ উহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, 'আমার শরীকেরা কোথায়?' তখন উহারা বলিবে, 'আমরা আপনার নিকট নিবেদন করি যে, এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।'

❑ পূর্বে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা উধাও হইয়া যাইবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করিবে যে, উহাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।

❑ মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাহাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ে;

❑ দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগ্রহের আস্বাদন দেই তখন সে অবশ্যই বলিয়া থাকে, 'ইহা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাঁহার নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকিবে।' আমি কাফিরদিগকে উহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইবই কঠোর শাস্তি।

❑ যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্তেই ন্যস্ত। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো ফল আবরণ থেকে বের হয় না, কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না'। একথার অর্থ— কিয়ামত সংঘটিত হবে কবে, তা জানেন কেবলই আল্লাহ্। সুতরাং এরকম কথাই বলতে হবে তাকে, যে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোনোকিছুই ঘটে না। যেমন আবরণ মুক্ত হয় না কোনো ফল। গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করে না কোনো নারী।

এখানে 'আক্মাম' অর্থ ফল, ফলের খোসা। আর এখানকার 'মা তাহ্মিলু মিন উন্ছা' অর্থ গর্ভধারণ করে না কোনো নারী। এখানে 'মা' না-সূচক এবং 'মিন' হচ্ছে অতিরিক্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকেরা কোথায়? তখন তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করি যে, এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না'। একথার অর্থ— যেদিন আল্লাহ্ প্রতিমাপূজারীদেরকে ডেকে বলবেন, বলো, পৃথিবীতে তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বানিয়েছিলে তারা আজ কোথায়? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! এখন আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা কেউ-ই এখন অংশীবাদিতায় বিশ্বাস করি না।

মহাবিচারের দিবসে অংশীবাদীদেরকে ডেকে আল্লাহ্ 'আমার শরীকেরা কোথায়' এরকম বলবেন তাদেরকে উপহাস করে। 'আজান্নাকা' অর্থ নিবেদন করি। 'মা মিন্না মিন শাহীদ' অর্থ আমাদের মধ্যে অংশীবাদিতার পক্ষের কোনো সাক্ষ্যদাতা এখন কেউ-ই নেই। অর্থাৎ এখন আমরা এ ব্যাপারে কোনো কিছু জানিই না। উল্লেখ্য, চোখের সামনে ভয়াবহ শাস্তি দেখতে পেয়েই তারা তখন এভাবে অংশীবাদিতার প্রতি প্রকাশ করবে চরম অসন্তোষ। অথবা এখানে কথাটির অর্থ হবে— আমাদের মধ্যে এখন কেউ-ই তো ওই সকল শরীককে দেখতে পাচ্ছি না। তারা সকলেই তো এখন অদৃশ্য। সুতরাং এ ব্যাপারে এখন কিছু বলতেও পারবো না।

পরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'পূর্বে তারা যাদেরকে আহ্বান করতো, তারা উধাও হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই'। একথার অর্থ— পৃথিবীতে তারা যে সকল প্রতিমার পূজা করতো, তারা তখন উধাও হয়ে যাবে। ফলে তারা ভালোভাবেই বুঝতে পারবে যে, শাস্তি থেকে বাঁচবার কোনো রাস্তাই এখন তাদের জন্য উন্মুক্ত নেই।

এখানে 'দ্বল্লা আন্হুম' অর্থ উধাও হয়ে যাবে। অথবা উপকার করতে পারবে না। 'ইয়াদ্উ'না' অর্থ আহ্বান করতো। 'ওয়া জন্নূ' অর্থ উপলব্ধি করবে। আর 'মাহীস্' অর্থ উপায়, আশ্রয়স্থল, পালাবার জায়গা।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'মানুষ ধনসম্পদ প্রার্থনায় কোনো ক্লান্তিবোধ করে না, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে'।

এখানে 'ক্লান্তি বোধ করে না' অর্থ বিপুল বিত্তবৈভবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীপূজকদের মন ভরে না। বরং এতে করে তাদের বিত্ত-তৃষ্ণা আরো বাড়ে। আল্লাহ্র কাছে তারা আয়ু, শারীরিক সুস্থতা ও ধনদৌলত চাইতেই থাকে। 'নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে' অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা হয়ে যায় নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত, যখন তারা পতিত হয় দুঃখ-কষ্টে। এখানে 'মাস্সাহুশ শার্রু' অর্থ দুঃখ-কষ্টে পড়ে।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করবার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদন দেই, তখন সে অবশ্যই বলে থাকে, এটা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও, তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে'।

এখানে 'অনুগ্রহ' অর্থ স্বাস্থ্য, সম্পদ। 'হাজা লী' অর্থ এটা আমার প্রাপ্য। অর্থাৎ এই স্বাস্থ্য ও সম্পদ আমি পেয়েছি আমারই প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা বলে। অথবা এরকম স্বাস্থ্য-সম্পদ তো আমি পেতেই থাকবো। 'তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে' অর্থ এখানে যদি আমি সবদিক থেকে ভালো থাকতে পারি, তবে সেখানে এরকম থাকতে পারবো না কেনো? প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা কি কারো হস্তচ্যুত হয়? অধিকার কি কেউ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে?

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে আস্বাদন করাবোই কঠোর শাস্তি'। এখানে 'বিমা আ'মিলু' অর্থ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করবো। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— আমি অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের দুর্ভোগ তাদের উপরেই চাপিয়ে দিবো। আর 'আস্বাদন করাবোই কঠোর শাস্তি' অর্থ তাদেরকে আমি এমন কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করবো, যার থেকে পরিত্রাণপ্রাপ্তি অসম্ভব।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়'।

একথার অর্থ— হে আমার রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্বভাব কী বিচিত্র! তারা আমার অনুগ্রহ পেলে আমার আদেশ নিষেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দম্ভভরে দূরে সরে যায়। আবার বিপদে পড়লে রত হয় প্রলম্বিত প্রার্থনায়।

এখানে 'আল্ইনসান' (মানুষ) অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। 'আ'রদ্ব' অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়। 'ওয়া নাআ বিজ্বানিবিহী' অর্থ দূরে সরে যায়, পার্শ্বপরিবর্তন করে। অর্থাৎ বের হয়ে যায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অত্যাবশ্যক দায়িত্ব থেকে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে 'জ্বানিবি' (পার্শ্ব, দিক) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে। অর্থাৎ এখানে এর অর্থ সত্তা। যেমন বলা হয় 'জ্বানিবিল্লাহ্' (আল্লাহ্র দিকে)। এভাবে এখানকার 'পার্শ্বপরিবর্তন করে' অথবা 'দূরে সরে যায়' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তারা বিপদে পড়লে তাদের সত্তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

'আ'রীদ্ব' অর্থ দীর্ঘ, লম্বা-চওড়া, প্রচুর, প্রলম্বিত। আরববাসীরা লম্বা-চওড়াকে ''অধিক' অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন বলা হয়ে থাকে 'আত্বলা ফীল্ কালাম ওয়া দাআ' ওয়া আয়রাদ্ব' (সে অনেক কথা বলেছে এবং অনেক প্রার্থনা করেছে)। তাই শব্দটি অনেক অথবা সুবিস্তৃত অর্থপ্রকাশক। কেননা দীর্ঘ বলা হয় সবচেয়ে বেশী দূরত্বকে এবং যখন তার প্রস্থ বা বিস্তার সমপরিমাণ হয় তখন তার আকৃতি হয়ে যায় সুবৃহৎ চতুর্ভুজের মতো। তখন তার বিস্তারণের বিরাটত্ব সম্পর্কে আর সন্দেহ মাত্র থাকে না। সেকারণেই এক আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'আ'রদ্বুহাস্ সামাওয়াত্' (আকাশের মতো বিস্তৃত)।

একটি সংশয় ঃ ৪৯ সংখ্যক আয়াতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে'। আর এই আয়াতে বলা হলো 'সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়'। কথা দু'টো বিপরীতার্থক নয় কি? নৈরাশ্যজনক অবস্থায় দীর্ঘ প্রার্থনার বিষয়টিকে কীভাবে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যায়?

সংশয় খণ্ডন ঃ উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যদু'টো ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত। সম্ভবতঃ ৪৯ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কথা। কেননা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া তাদেরই স্বভাব। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয় কেবল কাফেরেরা। আবার উদাসীন বিশ্বাসীদের নিরাশ হওয়ার কথাও এসেছে অন্য এক আয়াতে। যেমন 'গাফেল মুমিনেরাই আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে থাকে'। সুতরাং বলা যেতে পারে, প্রথমোক্ত ব্যক্তব্যটি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং শেষোক্তটি সম্পৃক্ত উদাসীন বিশ্বাসীদের সঙ্গে।

এরকম হওয়াও সম্ভব যে, উভয় বক্তব্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এমতাবস্থায় পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে, তখন তারা আল্লাহ্র দিকে পূর্ণ মনোযোগী হয়ে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। কিন্তু কোনো বিশেষ উপযোগিতার কারণে যদি তাদের প্রার্থনা কবুল করতে বিলম্ব হয়ে যায়, তবে তারা হয়ে পড়ে নিরাশ ও হতাশ। প্রকৃত বিশ্বাসীগণের অবস্থা এর বিপরীত। তারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহ্র রহমতের দৃঢ় আশা বুকে নিয়ে প্রার্থনা করে যেতে থাকে। প্রার্থনা কবুল হতে বিলম্ব ঘটলেও তারা নিরাশ হয় না। মনে করে নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিহিত রয়েছে পারলৌকিক কল্যাণ। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ প্রার্থনাকারীকে তার প্রার্থিত বস্তু তো দুনিয়াতেই দান করেন, অথবা তা জমা রেখে দেন আখেরাতের জন্য।

আবার এরকম হওয়াও অসম্ভব নয় যে, বিপদগ্রস্ত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হয়তো মনে মনে লালন করে নৈরাশ্য এবং মুখে মুখে করতে থাকে লম্বা-চওড়া প্রার্থনা। অথবা পূজিত প্রতিমাগুলো থেকে তারা নিরাশ হয়ে যায় এবং দীর্ঘ প্রার্থনা জানাতে থাকে আল্লাহ্র কাছে।

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি চায়, তার বিপদগ্রস্ত অবস্থার প্রার্থনা কবুল করা হোক, তার জন্য উচিত সুখের সময়েও প্রলম্বিত প্রার্থনা করা। এক হাদিসে এরকমই বলা হয়েছে।

সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ঃ আয়াত ৫২, ৫৩, ৫৪

❑ বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে, তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?'

❑ আমি উহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব বিশ্বজগতে এবং উহাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত?

❑ জানিয়া রাখ, ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতকারে সন্দিহান, জানিয়া রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! কোরআন যে মহাসত্য, আপনি তা অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে চেষ্টা করুন এভাবে— আল্লাহ্‌ই যদি কোরআনের অবতারণা করে থাকেন, তবে কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে আর সন্দেহ করা যেতে পারে কি? তোমরা একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, এই মহাগ্রন্থটি মানবরচিত কোনো গ্রন্থ নয়। এমতাবস্থায় তোমরা কোরআনকে অস্বীকার করতে পারো কীভাবে? তবু যদি তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হও, প্রতিপক্ষ হও আল্লাহ্‌র শাশ্বত বাণীসম্ভারের, তবে তোমাদের চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর হতে পারে কে?

আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে মিল রয়েছে ৪৪ সংখ্যক আয়াতের 'বলো, মুমিনদের জন্য এটা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার' কথাটির। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আপনি বলুন, হে আমার স্বজাতি! কোরআন এর বিশ্বাসীর জন্য শুভপথনির্দেশ ও অন্তর-বাহিরের ব্যাধির প্রতিষেধক। সুতরাং এই কোরআন যে বিশ্বাস করবে, সে হয়ে যাবে ঐহিক-পারত্রিক উভয় প্রকার কল্যাণের অধিকারী। আর যে এর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত থাকবে, প্রত্যাখ্যান করবে এর মর্মস্পর্শী আহ্বানকে, সে হয়ে যাবে সর্বাধিক বিভ্রান্ত।

পরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে'।

এখানে 'আয়াতিনা ফীল্ আফাক্ব' অর্থ আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো বহির্জগতে বা বিশ্বজগতে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে বহির্জগতের নিদর্শনাবলী হচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের অবাধ্য জনগোষ্ঠীগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ। আর 'ফী আনফুসিহিম' (তাদের নিজেদের মধ্যের নিদর্শনাবলী) অর্থ বদর যুদ্ধের ঘটনাবলী, যে যুদ্ধে নিহত ও বন্দী হয়েছিলো বহুসংখ্যক মুশরিক। কাতাদাও এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে— দুঃখ-দুর্দশা ও শারীরিক রোগব্যাধি। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'ফীল্ আফাক্ব' অর্থ রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দের বিভিন্ন জনপদ বিজয় এবং 'ফী আনফুসিহিম' অর্থ মক্কাবিজয়।

আতা এবং ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'ফীল্ আফাক্ব' অর্থ আকাশ-পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সুবৃহৎ নিদর্শনরাজি এবং 'ফী আনফুসিহিম' অর্থ বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম সৃষ্টিসমূহ।

বায়যাবী লিখেছেন, 'ফীল্ আফাক্ব' অর্থ ১. ভবিষ্যতের ঘটনাবলী সম্পর্কে রসুল স. এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং 'ফী আনফুসিহীম' অর্থ ১. ওই সকল ঘটনাবলী, যা ঘটেছিলো মক্কাবাসীদের চোখের সামনে, যেমন বদর যুদ্ধ, মক্কা বিজয় মানুষের শারীরিক গঠন ও অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির বিস্ময়কর নিদর্শন। ২. অতীতকালের ঘটনাবলী ও দুর্ঘটনার নিদর্শনসমূহ ৩. রসুল স. ও তাঁর উত্তরসূরীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোর উপর একচ্ছত্র শাসন।

এরপর বলা হয়েছে— 'ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটাই সত্য'। একথার অর্থ— যেনো তাদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত এবং তাঁর রসুল তাঁর বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত। অথবা যেনো প্রমাণিত হয় আল্লাহ্র ধর্ম সত্য এবং এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষণা হয়ে থাকে আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'এটা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং উহ্য একটি ক্রিয়ার সঙ্গে রয়েছে এর সংযোগ। ওই উহ্যতা সহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ন্যস্ত দায়িত্বের শুভপরিণতি সম্পর্কে কি আপনার সন্দেহ আছে? আর আপনার জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার প্রভুপ্রতিপালক সবকিছু দেখেন? সুতরাং নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের যে অঙ্গীকার তিনি আপনার সঙ্গে করেছেন, তা অবশ্যই পরিপূরিত হবে। অথবা শাহীদ' বা প্রত্যক্ষদর্শী অর্থ এখানে 'অবগত'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের ও আপনার অবস্থা সম্পর্কে ভালো করেই জানেন কিংবা এখানকার বক্তব্যার্থটি দাঁড়াবে— পাপ থেকে মানুষকে থামাবার জন্য এই বিশ্বাসটিই কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে অবহিত? কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্ত শাস্তি তাদেরকে পেতেই হবে।

মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— কোরআন সত্য হওয়ার ব্যাপারে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার সাক্ষী তিনি নিজে। অর্থাৎ কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য প্রমাণই যথেষ্ট, এবং এর প্রমাণ হচ্ছে তিনি কোরআনকে করেছেন অলৌকিক। জুজায বলেছেন, এখানে 'যথেষ্ট' অর্থ— আল্লাহ্ এমন সকল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যা বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্র সাক্ষ্য প্রমাণই যথেষ্ট, কেননা তিনি সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন। কোনোকিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়।

এখানে 'বিরব্বিকা' অর্থ তোমার প্রতিপালক। 'বা' অক্ষরটি এখানে অতিরিক্ত হিসেবে সন্নিবেশিত। 'রব্বিকা' এখানে কর্তা। আর 'কাফা' শব্দমূল থেকে সাধিত ক্রিয়ার কর্তার সাথে ব্যবহৃত হয় যে 'বা' সেই 'বা' অব্যয়টি অতিরিক্তই হয়ে থাকে।

এরপরের আয়াতে (৫৪) বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো, এরা এদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতকারে সন্দিহান। জেনে রাখো সবকিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রয়েছেন'। এ কথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! জেনে রাখুন ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের প্রভুপালকের সাক্ষাতকারের বিষয়টিকে মোটেও বিশ্বাস করে না। আরো শুনে রাখুন, আল্লাহ্তায়ালা তাঁর আনুরূপ্যবিহীন জ্ঞান দ্বারা সকল কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

এখানে 'প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতকারে সন্দিহান' অর্থ মহাবিচারের দিবস অথবা কর্মফল প্রাপ্তি সম্পর্কে সন্দিহান। আর সবকিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে

রয়েছেন' অর্থ সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি তাঁর আনুরূপ্যবিহীন সত্তা এবং জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। ওই পরিবেষ্টনের প্রকৃতি মানুষের ধারণাও কল্পনার অতীত।

সুরা হা-মীম আস্ সাজ্দার তাফসীর শেষ হলো আজ ২৮ শে সফর ১২০৮ হিজরী সনে। আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন ওয়া সাল্লাল্লহু আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মায়ীন।

সূরা শূরা

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এর রুকুর সংখ্যা ৫ এবং আয়াতের সংখ্যা ৫৩।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯

❑ হা-মীম।

❑ 'আইন-সীন-ক্বাফ।

❑ এইভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। তিনি সমুন্নত, মহান।

❑ আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয় এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্তবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, জানিয়া রাখ, আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

❑ যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাহাদের কর্মবিধায়ক নহ।

❑ এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায়, যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

❑ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই উম্মাত করিতে পারিতেন; বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; আর যালিমরা, উহাদের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারীও নাই।

❑ উহারা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'হা-মীম' (১) 'আঈন সীন ক্বফ' (২) বাগবী লিখেছেন, একবার হাসান ইবনে ফজলকে জিজ্ঞেস করা হলো, এই সুরায় 'হা-মীম' ও 'আঈন সীন ক্বফ'কে আলাদা করা হয়েছে কেনো? অন্য সুরায় তো 'কাফ হা ইয়া আঈন সোয়াদ'কে এরকমভাবে পৃথক করা হয়নি। তিনি বললেন, 'হা-মীম' দিয়ে যে সকল সুরা শুরু হয়েছে, এই সুরাটি সেগুলোর অন্যতম। অন্যগুলোর মতো এখানেও 'হা-মীম' প্রয়োগ করা হয়েছে অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে। কিন্তু শুধু 'কাফ হা' দিয়ে কোনো সুরা শুরু হয়নি। শুরু হয়েছে 'ইয়া আঈন সোয়াদ' সহযোগে। এরকমও বলা যেতে পারে যে, এখানে 'হা-

মীম’ হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিধেয় আইন সীন ক্বফ। এরকম পৃথকভাবে লিখলেও বিধেয়কে খণ্ডিত করা হয় না। কিংবা বলা যেতে পারে, এখানকার ‘হা-মীম’ ও ‘আঈন সীন ক্বফ’ দু’টি পৃথক আয়াত এবং অন্য সুরায় উল্লেখিত ‘কাফ হা ইয়া আঈন সোয়াদ’ একটি আয়াত।

আবার বিষয়টিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ‘কাফ হা ইয়া আঈন সোয়াদ’ এবং এ ধরনের অন্যান্য সুরার অবোধ্য শিরোনামগুলোকে আলেমগণ ‘বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি’র অন্তর্ভূত করেন। সেগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যাও তাঁরা দিয়ে থাকেন।

কিন্তু ‘হা-মীম’ এর বিচ্ছিন্ন বর্ণরাজি হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা একমত নন। কেউ কেউ আবার ‘হা-মীম’কে বর্ণনা করেছেন ক্রিয়া অর্থে। অর্থাৎ তাঁরা বলেন, ‘হা-মীম’ অর্থ ‘হুম্মাল আমরু’ (যা মীমাংসাযোগ্য তা মীমাংসিত হয়েছে)।

ইকরামা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে ‘হা’ অর্থ আল্লাহ্‌র হুকুম। ‘মীম’ অর্থ ‘মাজ্বীদ’ (আল্লাহ্‌ মহামহিম)। ‘আঈন’ হচ্ছে ‘ই’ল্‌ম’ (আল্লাহ্‌র জ্ঞান), ‘সীন’ হচ্ছে ‘সানা’ (আল্লাহ্‌র নূর বা মাহাত্ম্য) এবং ‘ক্বফ’ অর্থ ‘কুদরত’ (আল্লাহ্‌র পরাক্রম)। আর এখানে আল্লাহ্‌ এগুলোর শপথ করেছেন। এটাও হজরত ইবনে আব্বাসের উক্তিরূপে পরিচিত যে, প্রত্যেক গ্রন্থধারী নবীকে ‘হা-মীম আঈন সীন ক্বফ’ প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে অবশ্য এর সমর্থনও রয়েছে।

পরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— ‘এভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌’।

এখানে ‘আ’যীয’ অর্থ পরাক্রমশালী এবং ‘হাকীম’ অর্থ প্রজ্ঞাময়, আপন সিদ্ধান্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত। আর ‘ইউহা’ অর্থ প্রত্যাদেশ করেন। এটি একটি চলমান ক্রিয়াপদ, যাতে অতীতকালের অবস্থাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যাদেশ করার ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র রীতি। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! এই সুরায় যে সকল বিষয় আপনাকে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, অথবা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যেভাবে এই সুরা আপনাকে দেওয়া হয়েছে, সেভাবে প্রত্যাদেশ করা হয়েছিলো আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান’। এখানে ‘আ’লীয়্যু’ অর্থ সমুন্নত, শীর্ষাধিকারী। আর ‘আ’জীম’ অর্থ মহান, শ্রেষ্ঠ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ থেকে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়’। একথার অর্থ— অসম্ভব কিছু নয় যে, ভারবহনে অক্ষম হয়ে যে কোনো মুহূর্তে আকাশ ভেঙে পড়বে। অথবা ভেঙে পড়বে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও মহত্বের প্রভাবে। কিংবা আকাশ ভেঙে পড়বে অংশীবাদীদের ‘আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেন’ এরকম অপভাষণের কারণে। অন্য এক আয়াতে এরকম বলাও হয়েছে। যেমন— ‘নিশ্চয় তোমরা এক অদ্ভূত কাণ্ড করেছো, হয়তো সে কারণে এখনই নভোমণ্ডল ভেঙে পড়বে’। এরকমও অর্থ করা যেতে পারে যে— ফেরেশতাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে যদি আকাশ ভেঙে পড়ে, তবে তা-ও অসম্ভব কিছু নয়। হজরত আনাস থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আকাশে মড়মড় আওয়াজ হয়। আর সেখানে এরকম আওয়াজ হওয়াই স্বাভাবিক। যার অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই আল্লাহ্‌র শপথ! আকাশে এমন এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে সেজদারত

অবস্থায় নেই কোনো ফেরেশতা, যারা জয়গান করে কেবল আল্লাহ্‌র। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, আসমানে পা ফেলার মতো এমন কোনো শূন্য স্থান নেই, যেখানে দণ্ডায়মান, রুকু অথবা সেজদা অবস্থায় না আছে কোনো ফেরেশতা।

‘মিন ফাওক্বিহিন্না’ অর্থ ঊর্ধ্বদেশ থেকে। অর্থাৎ আকাশ ভাঙতে শুরু করবে উপরের দিক থেকে। এরকম বলার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে— আকাশ উপর থেকে ভেঙে পড়লে তা হবে আল্লাহ্‌র মহাপরাক্রমের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। দ্বিতীয়তঃ ‘পড়া’ বা ‘পতিত হওয়া’ও তাঁর মহামর্যাদার পরিচায়ক। তৃতীয়তঃ ফেরেশতাদের ডাকে ভেঙে পড়াও আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয়বাহী। কারণ আল্লাহ্‌ই তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং থাকতে দিয়েছেন আকাশের উপরে।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে’। একথার অর্থ অংশীবাদীরা যখন আল্লাহ্‌র মহান মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এরকম অপবিত্র বাক্য উচ্চারণ করতে থাকে, বলতে থাকে ‘আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেন’ ‘ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা’ ইত্যাদি, তখন ফেরেশতারা অবস্থান গ্রহণ করে ওই সকল অপবিত্র মন্তব্যের বিরুদ্ধে। তারা তখন ঘোষণা করতে থাকে আল্লাহ্‌র সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা। বিশেষ করে তারা যখন প্রত্যক্ষ করতে থাকে আল্লাহ্‌র মহিমার উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাবচ্ছটা, তখন তারা তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে আরো বেশী বেশী করে। এখানে ‘বিহাম্‌দি রব্বিহিম’ অর্থ প্রভুপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা।

এরপর বলা হয়েছে— 'এবং মর্ত্যবাসীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে'। একথার অর্থ— এবং ওই ফেরেশতারা পৃথিবীবাসী বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাও করে। ক্ষমাপ্রার্থনা করে এজন্য যে, বিশ্বাসগত দিক থেকে তারা একে অপরের নিকটজন। আর নিকটজনের কল্যাণকামনা করাইতো স্বাভাবিক। এখানে 'ইয়াস্‌তাগ্‌ফিরূন' অর্থ ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

এরপর বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো, আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তাঁর বন্ধুদের প্রতি বড়ই ক্ষমাপরবশ ও পরম দয়ার্দ্র।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা প্রতিমা, শয়তান অথবা স্ব-প্রবৃত্তিকে অভিভাবক ও পরিচালক বলে মানে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র সতত পর্যবেক্ষণ। সুতরাং যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতিফল তারা পাবেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও'। একথার অর্থ— এ ব্যাপারে আপনাকে এমতো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে, আপনি তাদেরকে আপনার নিজস্ব অভিপ্রায়ানুসারে সরল পথে নিয়ে আসবেন। অথবা— তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য আপনাকে দায়ী করা হবে। কিংবা— তাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ধারণ আপনার উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। আপনার দায়িত্ব তো কেবল সত্যের প্রচার।

এরপরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'এভাবে আমি তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো মক্কা ও তার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পারো কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।

এখানে 'উম্মাল কুরা' অর্থ পল্লীমাতা। যেহেতু আরবের অধিকাংশ জনপদের উৎপত্তি হয়েছে মক্কানগরী থেকে। উপরন্তু আরবভূমিতে আদি জনপদের পত্তন হয়েছিলো মক্কাতে। তাই মক্কা নগরীকে ভূষিত করা হযেছে পল্লীমাতা অভিধায়।

এখানে 'মান হাওলাহা' অর্থ তার চতুর্দিকের জনগণকে। অর্থাৎ মক্কার চতুর্দিকের নিকট ও দূরের সকল জনপদবাসীদেরকে। উল্লেখ্য, এখানে প্রথমে সতর্ক করতে বলা হয়েছে মক্কা ও মক্কা-সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের। তারপর বলা হয়েছে অবশিষ্ট পৃথিবীবাসীদের কথা। এর কারণ হচ্ছে নিকটবর্তীরাই সত্যের আহবান শ্রবণের প্রথম হকদার এবং প্রচার সহযোগী হবার দায়িত্বও প্রথমে বর্তায় তাদের উপরেই।

রসুল স. বলেছেন, অন্যান্য নবীর উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে পাঁচটি বিষয়ে— ১. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানবতার পথপ্রদর্শনার্থে। ২. আমার উম্মতের জন্য আমার শাফায়াতের অধিকার সুসংরক্ষিত। ৩. এক মাসের পথের দূরত্বের শত্রুদের মনেও প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় আমার ত্রাস। ৪. পুরো পৃথিবীর মাটিকে আমার জন্য করে দেওয়া হয়েছে জায়নামাজ এবং ৫. গণিমতের মাল ভক্ষণ আমার জন্য করে দেওয়া হয়েছে বৈধ, যা ইতোপূর্বে অন্য কারো জন্য বৈধ করা হয়নি। বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত শোয়াইব ইবনে ইয়াজিদ থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ছয়টি বিষয়ে আমি অন্যান্য পয়গম্বর অপেক্ষা বিশেষ মর্যাদায় মর্যাদায়িত— ১. আমাকে দেওয়া হয়েছে সমাবদ্ধ এমন বাণী, যা সংক্ষিপ্ত, অথচ গভীর অর্থবহ ২. সাহায্যমণ্ডিত করা হয়েছে আমাকে দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতাপ দিয়ে ৩. যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে আমার জন্য করা হয়েছে হালাল ৪. আমার জন্য সমস্ত পৃথিবীর জমিনকে করা হয়েছে মসজিদ। ৫. আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সকল মানুষের নবী হিসাবে ৬. নবুয়তের প্রবহমানতার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে আমাকে দিয়েই।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, একদিন রসুল স. তাঁর পবিত্র দুই হাতের মুঠিতে দু'টি লিখিত দলিল নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। বললেন, এই দলিল দু'টো নির্ধারণ করা হয়েছে বিশ্বসমূহের প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে। এর একটিতে আছে জান্নাতবাসীদের নাম-ধাম, সংখ্যা ও গোত্রপরিচয়। তারা জান্নাতবাসী তখন থেকেই, যখন তারা থাকে পিতৃপৃষ্ঠে অথবা

মাতৃগর্ভে। এটাই হচ্ছে আগত-অনাগত সকল জান্নাতবাসীর পূর্বনির্ধারিত দলিল। এরপর তিনি অপর দলিলটি দেখিয়ে বললেন, আর এই দলিলটি হচ্ছে জাহান্নামবাসীদের। এটাও বিশ্বসমূহের মহান প্রভুপালক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ণয়িত। এতে রয়েছে জাহান্নামবাসীদের নাম-ধাম, সংখ্যা ও গোত্রপরিচয়। তারা জাহান্নামবাসী তখন থেকেই যখন তারা অবস্থান করছিলো তাদের পিতৃস্কন্ধে অথবা মাতৃ-উদরে। এটাই হচ্ছে আগত-অনাগত সকল জাহান্নামবাসীদের চূড়ান্ত দলিল। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! তাহলে আর আমলের প্রয়োজন কী? তিনি স. বললেন, আমল করে

যেতে থাকো। সোজা পথে চলতে থাকো। যে জান্নাতবাসী, তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে জান্নাতবাসীদের মতো শুভ কর্মকাণ্ডের উপর, তা সে সারা জীবন যেমন আমলই করুক না কেনো। আর যে জাহান্নামী হবে, তার জীবন সাঙ্গ হবে জাহান্নামবাসীদের মতো অশুভ কর্মকাণ্ডের উপর, তা সে সারা জীবন ধরে যা কিছু করে থাকুক না কেনো। এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন 'সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।

এরপরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মত করতে পারতেন; বস্তুতঃ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; আর জালেমেরা, তাদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই'।

এখানে 'উম্মাতান ওয়াহিদাতান' অর্থ একই উম্মত। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানকার 'একই উম্মত করতে পারতেন' অর্থ— করতে পারতেন একই ধর্মাবলম্বী। মুকাতিল বলেছেন, এর অর্থ— সকলকে ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত করতে পারতেন। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে সকলকেই সত্য পথের উপরে একত্রিত করতেন'।

'আজ্জলিমূন' অর্থ জালেম, স্বেচ্ছাচারী, সীমালংঘনকারী। 'মা লাহুম মিঁউ ওয়ালীয়্যুঁ ওয়ালা নাসীর' অর্থ তাদের কোনো অভিভাবক নেই।,কোনো সাহায্যকারীও নেই। অর্থাৎ এমন কোনো অভিভাবক এবং সাহায্যকারী তারা পাবে না, যারা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে। ভীতিপ্রদর্শনকে জোরালো করবার জন্যই এখানে বক্তব্যটি পরিবেশন করা হয়েছে ভিন্ন ভঙ্গিতে। তাই এখানে জান্নাতীদের বিপরীতে 'যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহ থেকে করেন বঞ্চিত' এরকম বলে বলা হয়েছে, আর জালেমেরা, তাদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই'। এরকম বলা হয়েছে অসন্তোষের আতিশয্যবশতঃ।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'তারা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতুকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

প্রশ্নাকারে উপস্থাপিত এখানকার প্রথম বাক্যটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— ওই সকল স্বেচ্ছাচারীরা তো আল্লাহ্কে অভিভাবক নির্ধারণ

করেনি। অভিভাবক নির্ধারণ করেছে আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে— প্রতিমা, শয়তান অথবা অপপ্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে। অথবা কথাটির অর্থ হবে— তারা যাকে বা যাদেরকে অভিভাবক বলে মেনেছে, মহাবিচারের দিবসে তারা আর অভিভাবক থাকবেই না। বরং প্রকৃত অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ্! যিনি কর্মফলপ্রদানার্থে পুনরুত্থান দিবসে মৃতকে জীবিত করবেন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ রসুল স. এর অভিভাবক এবং অভিভাবক তাদের, যারা তাঁর রসুলের একনিষ্ঠ অনুসারী।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

❑ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন— উহার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট। তিনিই আল্লাহ্— আমার প্রতিপালক; তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি আর তাঁহারই অভিমুখী আমি।

❑ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আন'আমের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। তিনি যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিয্‌ক বর্ধিত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

❑ তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। তুমি মুশরিকদিগকে যাহার প্রতি আহ্‌বান করিতেছ তাহা উহাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী, তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।

❑ উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। উহাদের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহারা সেই সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

❑ সুতরাং তুমি উহার দিকে আহ্বান কর ও উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। বল, 'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদিগকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।'

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেনো, তার মীমাংসা তো আল্লাহ্রই নিকট'। একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা যে সকল ধর্মীয় বিষয় নিয়ে বিশ্বাসীদের সঙ্গে বচসা-বিতর্ক করো, সে সকল বিষয়ের মীমাংসা আল্লাহ্ই করবেন। মহাবিচারের দিবসে তোমাদের উভয়

দলকে চিরদিনের জন্য পৃথক করে দিবেন। কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন— হে বিশ্বাসীরা 'মুতাশাবিহাত' (রহস্যাচ্ছন্ন) আয়াতসমূহ নিয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হও, সে সকল বিষয়কে 'মুহকামাত' (সুস্পষ্ট) আয়াতের অনুকূল করে নাও।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনিই আল্লাহ্— আমার প্রতিপালক! তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি, আর তাঁরই অভিমুখী আমি'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি বলুন, শত্রুদের সঙ্গে মতভেদের বিষয়ে এবং সকল কাজকর্মে আমি তাঁরই প্রতি নির্ভর করি এবং অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থায় তাঁরই প্রতি অভিনিবেশী থাকি।

পরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আনআ'মের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তাদের জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন'।

এখানে 'মিন আন্ফুসিকুম আয্ওয়াজ্বা' অর্থ তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া। 'মিনাল আনআ'মি আয্ওয়াজ্বা' অর্থ আনআ'মের মধ্য থেকে তাদের জোড়া। অর্থাৎ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন নারী ও পুরুষ। 'ইয়াজ্রাউ কুম' অর্থ বংশবিস্তার করেন। আর 'ফীহ্' অর্থ এভাবে, এই নিয়মে। কেউ কেউ 'ফীহি' এর অর্থ করেছেন তার গর্ভাশয় এবং 'ফী' এর আগে যোগ করেছেন 'বা'। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তোমাদের বংশবিস্তার ঘটিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— এভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেকের জোড়া বানিয়ে বানিয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'লাইসা কামিছ্লিহী শাইউন' (কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়)। এখানে 'মিছাল' শব্দটি সন্নিবেশিত হয়েছে অতিরিক্তরূপে। এভাবে উদ্দেশ্য দাঁড়িয়েছে— তিনি কোনো কিছুর মতো নন। 'মিছাল' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে যথাযথ গুরুত্ব আরোপণার্থে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে— 'ফাইন্ আমানু বিমিছ্লি মা আমানতুম বিহী' (তারা যদি ইমান আনতো যেরূপ তোমরা ইমান এনেছো)। কারো কারো কাছে 'কামিছ্লিহী' এর 'কা' অতিরিক্ত। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— এমন কিছুই নেই, যা তাঁর অনুরূপ। অর্থাৎ তিনি আনুরূপ্যবিহীন। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'মিছাল' এখানে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে অতিশয়োক্তির জন্য। না-সূচক শব্দ ক্রিয়ার অতিশয়োক্তি হিসেবে বিবেচিত হলে যেমন বলা হয়, তোমার মতো মানুষ একাজ করে না। অর্থাৎ তুমি একাজ করো না। সম্বোধনকারীর 'মিছাল' বা দৃষ্টান্ত যদি সম্বোধিত জনের অনুরূপ বা সমান হয় এবং বলে, সে এ কাজ করে না, তবে সম্বোধিত ব্যক্তির না করাটা মর্যাদার দিক থেকে উত্তম বলে প্রমাণিত হবে। রূপকের জন্য বাস্তব অস্তিত্ব বা তার সম্ভাবনা প্রয়োজনীয় হয়। যেমন কোনো দীর্ঘদেহী লোককে রূপক অর্থে বলা হয় অমুক ব্যক্তি নিজাদ এর মতো লম্বা, তবে এমতোক্ষেত্রে সে যে দীর্ঘদেহী সেটাই

বুঝায়। দুজনের আবার আকৃতি অবিকল একরকম হতে হবে, তার কোনো অর্থ নেই। এভাবে 'বাল ইয়াদাহু মাব্সুত্বতান' এই আয়াতে হাত লম্বা হওয়া অর্থ দানশীল হওয়া। বাস্তবে হাত লম্বা হওয়া এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য নয়। আর তা সম্ভবও নয়। আবার কারো কারো মতে 'মিছাল' অর্থ এখানে গুণ। অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীর মতো অন্য কারো গুণাবলী নেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'। একথার অর্থ— যা কিছু শ্রবণ ও দর্শনের যোগ্য তা তিনি শোনেন ও দেখেন। আর তাঁর শোনা ও দেখার বিষয়টিও আনুরূপ্যবিহীন। অর্থাৎ অন্য কারো মতো নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন শ্রোতা

ও দ্রষ্টা। অন্য সকল শ্রোতা ও দ্রষ্টা তাঁর শ্রুতি ও দৃষ্টির মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ তাঁর দয়ায়, অথবা তাঁর শ্রুতি ও দৃষ্টির প্রতিচ্ছায়ারূপে অন্যেরা শুনতে ও দেখতে পায়। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আল্লাহ্ সত্তাগত দিক থেকে যেমন অন্য কোনোকিছুর সদৃশ নন, তেমনি সদৃশ নন গুণাবলী এবং কার্যাবলীর দিক থেকেও। তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ সকল কিছুই আনুরূপ্যবিহীন।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁরই নিকট। তিনি যার জন্য ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত'। একথার অর্থ— আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে আকাশ-পৃথিবীর সকল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ। তিনি তাঁর ইচ্ছা মতো সে সম্পদ বন্টন করেন। কারো জীবনোপকরণ বাড়িয়ে দেন এবং কারো জীবনোপকরণকে দেন কমিয়ে। এরকম করেন এ বিষয়টি পরীক্ষা করবার জন্য যে, তারা সুখে কৃতজ্ঞ এবং দুঃখে ধৈর্যশীল হয় কিনা। আর নিঃসন্দেহে তিনি সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই যা করা সমীচীন, তাই-ই করে থাকেন।

এখানে রিজিক অর্থ জীবনোপকরণ, পানাহারের সামগ্রী। কালাবী এর অর্থ করেছেন— বৃষ্টি ও শস্যভাণ্ডার।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নুহকে। আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং এতে মতভেদ কোরো না'। এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে— মোহাম্মদ যে ধর্মমত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তা নতুন কোনো ধর্মমত নয়। এটাই ছিলো সকল যুগের সকল নবী-রসুল কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত শাশ্বত ধর্মাদর্শ। নুহ, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা সকল প্রত্যাদিষ্ট পুরুষই এই চিরন্তন ধর্মাদর্শ প্রচারে আজীবন নিয়োজিত থেকেছেন। কেননা এটা হচ্ছে মহাসত্য। আর যা সত্য তা সকল স্থানে ও কালেই সত্য। এ সত্যের পরে ভ্রষ্টতা ছাড়া যে আর কিছুই নেই। সুতরাং এই মহাসত্য সম্পর্কে মতভেদ করার কিছুই নেই। তৎসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে এই মহাসত্য ইসলামের বিরুদ্ধতা করে চলেছে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকেরা। এর কারণ এই যে, তারা মিথ্যাশ্রয়ী, শাশ্বত ধর্মাদর্শের প্রতি সীমাহীন বিদ্বেষপরায়ণ।

নাসাঈ, আহমদ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, রসুল স. একবার মাটিতে লম্বা একটি সরল রেখা এঁকে বললেন, মনে করো এটা আল্লাহ্র পথ। এরপর সরল রেখাটির ডানে বামে আরো অনেক দাগ কেটে বললেন, আর ভ্রান্তপথ হচ্ছে এগুলো, যার প্রত্যেকটিতে বসে আছে একটি করে শয়তান, সে তার নিজের দিকে আহ্বান করে। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'এই হচ্ছে আমার সোজা পথ, সুতরাং এর অনুসরণ করো'।

আল্লাহ্র সত্তা-গুণবত্তা-কার্যাবলীর আনুরূপ্যবিহীন এককত্ব, নবী-রসুল, আকাশাগত গ্রন্থসমূহ, ফেরেশতা, মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান, বিচার দিবস, নবী-রসুল কর্তৃক প্রচারিত নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাদি ইত্যাদিতে বিশ্বাস করার নাম ইসলাম। এই বিশ্বাস ও বিধিবিধান সাধারণভাবে সকল নবী-রসুলের ধর্মাদর্শের অন্তর্ভূত। এর মধ্যে শাখা-প্রশাখাগত কোনো কোনো বিধানের প্রতিষ্ঠা অথবা অবলুপ্তি কখনোই মূল বিষয়াবলীকে মতদ্বৈধতাধীন করতে পারে না। এরকম ঘটনা তো কখনো কখনো একই নবীর শরিয়তে ঘটানো হয়ে থাকে। রহিত বিধানের স্থলে বলবত করা হয় নতুন বিধান। যেমন রসুল স. প্রথমদিকে নামাজ পাঠ করতেন বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে। পরে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় কাবামুখী হতে। কিন্তু নামাজ পাঠের বিধান তৎসত্ত্বেও থাকে অক্ষুণ্ন। সুতরাং এরকম ঘটনা শাশ্বত ধর্মাদর্শে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। এভাবে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নবীর শরিয়তের শাখা-প্রশাখাগত বিধানে যদি সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন করা-ও হয়, তবুও একথা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে না যে, তাঁদের ধর্মাদর্শের মৌলিকত্ব মতভেদপূর্ণ।

এখানে 'আন্ আক্বীমুদ্ দীন' অর্থ তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো। মর্মার্থ— হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্র রসুল যে বিধান তোমাদেরকে দান করেন নির্দ্বিধচিত্তে তা পালনে যত্নবান হও। এভাবে 'আন' শব্দটি হবে এখানে বর্ণনামূলক এবং শব্দটি এখানে মূল শব্দ হিসেবে বিবেচনা করলেও তা সঠিক হবে।

'ওয়ালা তাতাফার্‌রাকু ফীহ্' অর্থ এবং এতে মতভেদ কোরো না। মর্মার্থ— স্বধারণার বশবর্তী হয়ে, অথবা কেবল গোড়ামী ও গোঁয়ার্তুমির বশবর্তী হয়ে ধর্মের মধ্যে মতপৃথকতার সৃষ্টি কোরো না। ইতোপূর্বে বর্ণিত রসুল স. কর্তৃক অংকিত সরল রেখা অংকন সম্পর্কিত হাদিসেও এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও রসুল স. এর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তিয়াত্তরটি দল-উপদল। আর এর সঙ্গে ইহুদী-খৃষ্টান অংশীবাদীদের তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ মতভেদ তো রয়েছেই।

হজরত আলী বলেছেন, বিভেদ সৃষ্টি কোরো না। ঐক্য হচ্ছে শান্তি এবং অনৈক্য হচ্ছে শাস্তি। হজরত আবু জর থেকে আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, একতা থেকে যে অঙ্গুলি পরিমাণ দূরে সরে যায়, সে যেনো গলা থেকে খুলে ফেলে ইসলামের সুদৃঢ় রজ্জু। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যুথবদ্ধতার উপরে রয়েছে আল্লাহ্র হাত। হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স.

বলেছেন, শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে বাঘের মতো। দূরে দূরে থাকা এবং একা একা চলা দলছুট ছাগীকে যেমন নেকড়ে সহজেই ধরে ফেলে, তেমনি করে শয়তান কুক্ষিগত করে যুথবিবর্জিত মুসলমানকে। অতএব তোমরা ইসলামের প্রশস্ত রাজপথ ছেড়ে গলিপথের দিকে ধাবিত হয়ো না। যুথবদ্ধ থেকো।

এরপর বলা হয়েছে— 'তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছো, তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী, তাকে দ্বীনের দিকে চালিত করেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি ও আপনার আহ্বান অংশীবাদীদের নিকট দুঃসহ। আর আল্লাহ্ ইচ্ছাময়। তিনি যাকে চান, তাকে তাঁর প্রিয়ভাজনরূপে গ্রহণ করেন এবং যে তাঁকে চায়, তার প্রত্যাগমনের পথকে করেন সুগম।

সুফী সাধকগণ বলেন, আল্লাহ্ যাঁদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন, তাঁরাই হন তাঁর মনোনীত জন— নবী-রসুল ও সিদ্দীক। আর যাঁরা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্মুখী হতে চান, তাঁরা হন নবী-রসুল ও সিদ্দীকগণের একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁদেরকেই আল্লাহ্ সামর্থ্যদান করেন সৎপথে পরিচালিত হতে। তাঁরা হচ্ছেন আউলিয়া ও পুণ্যবান সম্প্রদায়।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট জ্ঞান আসবার পর কেবল মাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গ্রন্থধারীরা ততক্ষণ পর্যন্ত বিভক্ত হয়নি, যতক্ষণ না এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে যে, সকল নবীর ধর্মাদর্শ অভিন্ন এবং মোহাম্মদ স. এর উপরে যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই প্রত্যাদেশই অবতীর্ণ করা হয়েছিলো নবী নুহ, নবী ইব্রাহিম, নবী মুসা ও নবী ঈসার উপর।

এখানে 'বাগ্ইয়াম্ বাইনাহুম' অর্থ মতভেদ ঘটায়। আতা বলেছেন, রসুল স. এর বিরুদ্ধে তারা প্রদর্শন করতো চূড়ান্ত পর্যায়ের অহংকার। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'বাগা আলাইহি বাগ্ইয়ান্' অর্থ উপরে উঠেছিলো, অত্যাচার করেছিলো, বড় বেশী বেড়ে গিয়েছিলো।

এরপর বলা হয়েছে— 'এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেতো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ আখেরাতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে চূড়ান্ত শাস্তি দিবেন— এটা যদি তিনি পূর্বাহ্নে স্থির করে না রাখতেন, তাহলে পৃথিবীতেই বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটাতেন। এখানেই মূলোৎপাটন করতেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এবং বিশ্বাসীদেরকেও দিতেন তাৎক্ষণিক বিজয়।

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে'। 'তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিকদেরকে। অর্থাৎ ইহুদী-

খৃস্টানদের পর মক্কার মুশরিকেরা কোরআন পেয়ে পড়েছে ঘোর দ্বন্দ্বে। বুঝতে পারছে না, কী করে এর আওতা থেকে বের হওয়া যায়। অথবা কথাটির লক্ষ্য এখানে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। তারাও কিতাব পেয়েছে তাদের পূর্ববর্তী উম্মতের পর। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা এ ব্যাপারে পতিত হয়েছে বিভ্রান্তির দোদুল্যমানতায়। ভেবে পাচ্ছে না কী করবে এখন। অথবা তাদের নিজেদের কিতাবের ব্যাপারেও এখন তারা সন্দেহপ্রবণ। কারণ সেখানেও রয়েছে সর্বশেষ রসুলের সত্যতার সাক্ষ্য।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তুমি তার দিকে আহ্বান করো ও তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকো যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ কোরো না'। একথার অর্থ— সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে ধর্মাশ্রয়ী হতে বলুন। আরো বলুন ধর্মের মধ্যে মতভেদ না করতে এবং উপদেশ দিন কোরআনের অনুসরণে চলতে। তাদের অপধারণা ও অপপ্রস্তাবকে প্রশ্রয় দিবেনই না।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ্ই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ই আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট'।

এখানে 'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি' অর্থ আমার বিশ্বাস আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত মহাগ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুকূল। ইহুদী-খৃষ্টানদের মতো অপবিশ্বাস আমার মোটেই নেই। তারা তো আল্লাহ্র কিতাবসমূহের মধ্যে কোনো কোনোটিকে মানে, আবার কোনো কোনোটিকে মানে না। 'আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে' অর্থ আমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে দেওয়া, তোমাদের কাছে আল্লাহ্র বিধান (শরিয়ত) পৌঁছে দেওয়া। উল্লেখ্য, নবীগণের ইমান ও আমল সর্বাধিক পরিপূর্ণ। রসুল স. এর জন্য এমতো পরিপূর্ণতার প্রকাশ ঘটেছে 'বিশ্বাস করি' ও 'ন্যায়বিচার করতে' কথা দু'টোর মাধ্যমে। অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাবে বিশ্বাসই হচ্ছে পরিপূর্ণ ইমান এবং ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় আমলের পূর্ণত্ব। 'আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের' অর্থ তোমাদের

সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত বচসা তো নেই। আমাদের কাজে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই, আবার তোমাদের কাজের মধ্যেও নেই আমাদের জন্য ক্ষতি। আমরা কেবল শুভাকাঙ্খী হিসেবে তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি ইসলামের দিকে। সুতরাং শত্রুতা অবশ্যই পরিহার্য। 'আল্লাহ্ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট' অর্থ আর আমাদের সকলের অবশেষ প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌রই নিকটে। মহাবিচারের দিবসে তিনি আমাদের সকলকেই সমবেত করবেন। তারপর যা করার, তা তিনিই তো করবেন।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়, হিজরতের পূর্বে এবং জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে। পরে এই আয়াতের বিধান রহিত হয়ে যায় এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা করাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন— হে বিশ্বাসীগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কোরো না'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকবে, এক আল্লাহ্‌র প্রতি তোমরা বিশ্বাস না করা পর্যন্ত'।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, ইকরামা বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হলো 'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি দলে দলে লোকজনকে আল্লাহ্‌র ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবেন' তখন মক্কার লোকেরা তাদের আওতাভূত মুসলমানদেরকে বললো, তোমরা তবে আর এখানে পড়ে থাকবে কেনো? যাও, দলবৃদ্ধি করো। তাদের এমতো কথার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। বলা হয়েছে—

সূরা শূরা ঃ আয়াত **১৬, ১৭, ১৮, ১৯**

❑ আল্লাহ্‌কে স্বীকার করিবার পর যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাহাদের যুক্তি-তর্ক তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং উহারা তাঁহার ক্রোধের পাত্র এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

❑ আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং তূলাদণ্ড। তুমি কী জান— সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

❑ যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই ইহা ত্বরান্বিত করিতে চাহে। আর যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে এবং জানে উহা সত্য। জানিয়া রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে তাহারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

❑ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিয্‌ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আর যারা আল্লাহ্‌কে মুখে মুখে স্বীকার করে, অথচ আল্লাহ্‌র ধর্ম সম্পর্কে যারা মুসলমানদের মধ্যে সূত্রপাত করে কুটবিতর্কের, তাদের যুক্তি আল্লাহ্‌র কাছে মূল্যহীন, তাদের উপরে পতিত হবে আল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

কাতাদা সূত্রে আবদুর রাজ্জাক উল্লেখ করেছেন, 'বিতর্ক করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে। কেননা তারা বলতো, আমাদের কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তোমাদের কিতাবের পূর্বে এবং আমাদের নবীও এসেছেন তোমাদের নবীর আগে। সুতরাং আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেয়। আর এখানকার 'তাদের যুক্তি তর্ক তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার' অর্থ তাদের কুযুক্তি আল্লাহ্‌র কাছে মূল্যহীন, অগ্রাহ্য।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড। তুমি কী জানো— সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন(১৭)? যারা এটা বিশ্বাস করে না, তারাই এটাকে ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী, তারা এটাকে ভয় করে এবং জানে এটা সত্য। জেনে রাখো, কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে' (১৮)।

এখানে 'আলকিতাবা বিল হাক্বক্বি' অর্থ সত্যসহ কিতাব। অর্থাৎ এই কিতাব সম্পূর্ণতই ন্যায়সঙ্গত, ভ্রান্তি থেকে সতত মুক্ত, সত্যিকারের বিশ্বাস ও নির্ভুল নির্দেশাবলীবিশিষ্ট।

'আল মীযান' অর্থ তুলাদণ্ড। কাতাদা, মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'মীযান' অর্থ ন্যায়বিচার। তুলাদণ্ড হচ্ছে সুবিচারের প্রতীক। তাই এখানে ন্যায়বিচারকেই বলা হয়েছে তুলাদণ্ড বা পুণ্য-পাপের পরিমাপক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ এখানে সঠিকভাবে ওজন করার আদেশ দিয়েছেন এবং মাপে কম দিতে নিষেধ করেছেন। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, এখানে 'মীযান' অর্থ শরিয়ত। কেননা শরিয়তের মাধ্যমেই পাপ-পুণ্য নির্ণয় করা হয় এবং মানুষের পারস্পরিক প্রাপ্য নিশ্চিত করা হয়।

'ওয়ামা ইউদ্রীকা লাআ'াল্লাস্ সাআ'তা ক্বরীব্' অর্থ তুমি কী জানো— সম্ভবতঃ কিয়ামত আসন্ন। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় জানেন, কিয়ামত খুব বেশী দূরে হয় তো বা নয়। সুতরাং আপনি এই মহাগ্রন্থ কোরআন অনুযায়ী চলুন, সকল বিষয় নিষ্পন্ন করুন শরিয়তের বিধানানুসারে। সর্বাধিক গুরুত্ব দিন ন্যায়পরায়ণতার। কেননা এমনও তো হতে পারে, কিয়ামত হঠাৎ এসেই পড়লো, অথচ আপনার যথাপ্রস্তুতি বিপর্যস্ত। তখন তো পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ আর থাকবে না। তখন তো দেওয়া হবে কেবল প্রতিফল। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাসাঈ। এখানকার 'আস্সাআ'ত' শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'ক্বরীব' পুংলিঙ্গ। এ দু'টোর মধ্যে সামঞ্জস্য নেই বলেই কাসাঈ 'ক্বরীব' (আসন্ন) শব্দের কর্তা সুপ্ত

হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের আগমন অত্যাসন্ন। কেউ কেউ বলেছেন, 'ক্বরীব' যদিও পুংলিঙ্গবাচক, তবুও এর উদ্দেশ্য আসন্ন, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন এরকম যারা বলেন, তাদের কাছে ফায়িলের ওজনে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। আবার কারো কারো মতে 'সাআ'ত' এর অন্তর্নিহিত অর্থ 'বাআ'ছ' এবং 'বাআ'ছ' পুংলিঙ্গ। সেকারণেই এখানে 'ক্বরীব'কে পুংলিঙ্গ হিসেবে আনা হয়েছে।

মুকাতিল বলেছেন, রসুল স. একবার কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সেখানে কয়েকজন মূর্তিপূজক বসেছিলো। তারা বললো, বলুন, কিয়ামত কখন হবে? তাদের একথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

'ইউমারূন' অর্থ বাক-বিতণ্ডা করে, কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে 'মির্ইয়াতুন' এবং 'মুর্ইয়াতুন' অর্থ সন্দেহ করা, বাকবিতণ্ডা করা। যেমন বলা হয় 'মার্হু মু মার্তা' (এতে সন্দেহ কী, দুগ্ধদোহনকালে উষ্ট্রীর স্তন জোরে টিপতে হয়)। তর্ক-বিতর্ক করবার সময় দুই দলই কড়া জবাব প্রত্যাশা করে। সেজন্য এধরনের তর্কবিতর্ককে বলা হয় 'মির্ইয়াতুন'।

'লাফী দ্বলালিম্ বায়ীদ' অর্থ ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। কিয়ামত যদিও পরিদৃশ্যমান নয়, তবুও কোরআন, হাদিস এবং সঠিক বিচারবোধ একথাই সাক্ষ্য দেয় যে, কিয়ামত অতিবাস্তব। যথাসময়ে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচার। কেননা মানুষের পৃথিবীর জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্তির বিষয়টি অতি জরুরী। একারণেই বলা যেতে পারে, কিয়ামত প্রত্যক্ষগোচর ও অনুভূতিগোচর না হওয়া সত্ত্বেও তা সুনিশ্চিত, যেনো তা চোখের সামনেই রয়েছে। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি কিয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি মনে করে কিয়ামত তাঁর ক্ষমতাবহির্ভূত, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে, হারিয়ে ফেলেছে প্রকৃত পথ।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্, তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু, তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী'।

'লাত্বীফ' অর্থ অতি দয়ালু। হজরত ইবনে আব্বাস এরকম বলেছেন। ইকরামা বলেছেন, এর অর্থ— বান্দাদের প্রতি কল্যাণপরবশ। সুদ্দী বলেছেন, করুণাকারী। মুকাতিল বলেছেন, পাপী ও পুণ্যবান সকলের প্রতি দয়াশীল। পাপীদের প্রতি দয়াশীল এই অর্থে যে, পাপের কারণে তিনি তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করেন না, তওবার সুযোগ দান করেন। কেউ কেউ শব্দটির অর্থ করেছেন— লাভ প্রদানকারী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ— তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে কল্যাণকে বিস্তৃত করেন এবং দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন, তাদেরকে দান করেন তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং নির্দেশ প্রদান করেন যথাযথ সহনশীলতার, আনুগত্যের।

'তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন' অর্থ তিনি তাঁর নির্ভুল ব্যবস্থাপনায় যেমন চান, তেমনই অনুকম্পা বিতরণ করেন। আহার্য দিয়ে থাকেন বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষ ও প্রাণীকুলকে। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন,

সৃষ্টির জীবনোপকরণ নির্ধারণার্থে আল্লাহ্ দু'টি পন্থা অবলম্বন করেন— তোমাদেরকে দান করেন পবিত্র আহার এবং সম্পূর্ণ আহার কাউকে একসঙ্গে তুলে দেন না। 'আল কুভীয়্যু' অর্থ প্রবল, পরাক্রান্ত, সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশকারী। আর 'আ'যীয্' অর্থ এমন মহাপরাক্রমের অধিকারী, যা অতিক্রান্ত করার সাধ্য কারোই নেই।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩

❑ যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহারই কিছু দেই, আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না।

❑ ইহাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যাহারা ইহাদের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের, যাহার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই? ফয়সালার ঘোষণা না থাকিলে ইহাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হইয়াই যাইত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ তুমি যালিমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে উহাদের কৃতকর্মের জন্য; আর ইহা আপতিত হইবেই উহাদের উপর। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা থাকিবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাই পাইবে। ইহাই তো মহাঅনুগ্রহ।

❑ এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁহার বান্দাদিগকে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, 'আমি ইহার বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাহি না।' যে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যে ব্যক্তি পরকালের সাফল্য চায়, আমি তার সাফল্যসম্ভারকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেই এবং যে পৃথিবীর সফলতা চায়, আমি ইচ্ছা করলে তার কিছু কিছু তাকে দান করি, কিন্তু তার পরকালের ভাণ্ডার করে রাখি শূন্য।

'হারছা' অর্থ জমিতে বীজবপন করা। ওই বীজ থেকে উৎপন্ন ফসলকেও বলে 'হারছা'। 'কামুস' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এর অর্থ উপার্জন, মালপত্র সঞ্চয়, চাষাবাদ। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ হবে— পরকালের পুণ্য, সফলতা। ওই পুণ্য ও সফলতাকে এখানে তুলনা করা হয়েছে ফসলের সঙ্গে। কেননা তা হবে, পৃথিবীর কর্মকাণ্ডের ফল বা ফসল। এজন্যই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। এরকমও বলা যেতে পারে যে, ফসল অর্থ এখানে উপার্জন, যা পৃথিবীতেই অর্জন করতে হয় পুণ্যপ্রচেষ্টার দ্বারা। 'আমি তার ফসল বর্ধিত করে দেই' অর্থ আমি তার উপার্জনে বা চাষাবাদে উন্নতি দান করি। দান করি দশগুণ, সাতশ গুণ অথবা এর চেয়েও বেশী। যেমন একটি শস্যদানা থেকে যে চারা উৎপন্ন হয়, সে চারা থেকে পাওয়া যায়

বহুসংখ্যক শস্যদানা। যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তারই কিছু দেই। পৃথিবীকামীদের কাম্যবস্তুও আমিই দেই, তবে পুরোপুরি দেই না, দেই যৎকিঞ্চিত।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেন— ফলাফল প্রাপ্তি ঘটে উদ্দেশ্যানুসারে। মানুষ যা নিয়ত করে, তা-ই পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পরিতোষার্জনার্থে দেশত্যাগ (হিজরত) করে, তার দেশত্যাগ হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্যই। আর যে দেশত্যাগী হয় কোনো রমণীকে বিবাহ করার জন্য অথবা অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে, তার দেশত্যাগ হয় তার অপউদ্দেশ্য পরিপূরণার্থেই।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতদেরকে শুভসংবাদ দাও সমুজ্জ্বল হওয়ার, উন্নত হওয়ার, বিজয়ী হওয়ার এবং পৃথিবীতে কর্তৃত্ব লাভ করার। যে ব্যক্তি দুনিয়ার লাভের জন্য আখেরাতের কাজ করবে, আখেরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'এদের কি এমন কতকগুলো দেবতা আছে, যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেতো'। এখানে 'এদের কি এমন কতকগুলো দেবতা আছে' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। 'লাহুম শুরাকাউ' অর্থ কতকগুলো শরীক বা দেবতা। হজরত ইবনে আব্বাস

বলেছেন, এখানকার 'এমন দ্বীনের বিধান দিয়েছে' অর্থ শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের, অংশীবাদিত্বের, আখেরাতের অস্বীকৃতির ও কেবল পার্থিব সাফল্যের। আর এখানকার 'ফয়সালার ঘোষণা' অর্থ মহাবিচার দিবসের মীমাংসার ঘটনা। অর্থাৎ মহাবিচার দিবসে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে চূড়ান্তভাবে শায়েস্তা করা হবে— এই বিষয়টি যদি আল্লাহ্ পূর্বে নির্ধারণ করে না রাখতেন, তবে তাদের অংশীবাদিতার শাস্তি দিতেন তাৎক্ষণিকভাবে, এই পৃথিবীতেই।

এরপর বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় জালেমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'। এখানে 'তাদের' সর্বনাম ব্যবহার না করে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে 'জালেমদের'। এরকম করা হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, তাদেরকে আখেরাতে অনন্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে তাদের 'জুলুম' (স্বেচ্ছাচারিতা, সীমালংঘন, অংশীবাদিতা) এর জন্যই। অন্যান্য ছোট-খাটো পাপের কারণে নয়।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'তুমি জালেমদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্য, আর এটা আপতিত হবেই তাদের উপর'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! মহাবিচারের দিবসে আপনি দেখবেন, অংশীবাদিতার মহাপাপের কারণে ওই সকল সীমালংঘনকারী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, তৎসত্ত্বেও তাদের কৃত অপরাধের শাস্তি সেদিন তাদেরকে ভোগ করতেই হবে, ভীতসন্ত্রস্ত হলেও কোনো লাভ হবে না।

এরপর বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু চাইবে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তা-ই পাবে। এটাই তো মহাঅনুগ্রহ'। এখানে 'রওদ্বতিল জান্নাত' অর্থ জান্নাতাভ্যন্তরস্থিত সর্বাধিক সুন্দর স্থান। আর 'আলফাদ্বলুল কাবীর' অর্থ মহাঅনুগ্রহ। অর্থাৎ ওই মহাঅনুগ্রহ জান্নাতের তুলনায় পৃথিবী তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! শুনুন, এই মহাঅনুগ্রহের শুভসমাচারই আল্লাহ্ দেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীকে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে।

এরপর বলা হয়েছে— 'বলো, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আপনার স্বজনদের মধ্যে যারা মুশরিক, তাদেরকে বলুন! হে আমার নিকটজনেরা! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে পথ প্রদর্শন করে চলেছি কেবল তাঁরই পরিতোষণার্থে। তোমাদের কাছে এর জন্য আমি বিত্ত-বৈভব-সম্মান-নেতৃত্ব কোনোকিছুই চাই না। চাই শুধু এতোটুকু যে, তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখো।

তাউসের উক্তি উল্লেখ করে বোখারী লিখেছেন, একবার হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো, আত্মীয়ের সৌহার্দ অর্থ কী? সাঈদ ইবনে যোবায়ের বললেন, 'আত্মীয়ের সৌহার্দ' অর্থ রসুল স. এর জ্ঞাতিকুটুম্ব। হজরত ইবনে আব্বাস

তাঁর কথা শুনে বললেন, প্রত্যুত্তর করতে তড়ি ঘড়ি করলে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, কুরাইশদের সকল গোত্রই ছিলো রসুল স. এর আত্মীয়। সুতরাং তাদের সকলকে লক্ষ্য করেই তাঁকে আল্লাহ্ একথা বলতে বলেছিলেন যে, আমি যে ধর্মপ্রচার করছি, তার কোনো বিনিময় আমি তোমাদের কাছ থেকে চাই না। চাই শুধু এতোটুকু যে, তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন কোরো না।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে শা'বী সূত্রে বাগবী লিখেছেন, এখানকার 'আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান চাই না' কথাটির অর্থ তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্মান রক্ষা করো, অক্ষুণ্ন রাখো আপনজনোচিত সুসম্পর্ক। মুজাহিদ, ইকরামা, সুদ্দী, মুকাতিল ও জুহাকও এরকম বলেছেন। ইকরামা অর্থ করেছেন— আমি তোমাদের কাছ থেকে সত্যপ্রচারের জন্য কোনো প্রতিদান চাই না কেবল এইটুকু ছাড়া যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তা রয়েছে তা বজায় রাখো।

বাগবী লিখেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে কুরায়েশরা রসুল স.কে নানাভাবে দুঃখ-যাতনা দিতো। তখন এই আয়াতে আল্লাহ্ রসুল স.কে 'আত্মীয়তা বজায় রাখো' এই নির্দেশটি কুরায়েশদের কাছে প্রচার করতে বলেছিলেন। পরে যখন তিনি স. হিজরত করলেন এবং মদীনার আনসারগণ রসুল স.কে হৃদয়াসনে চিরদিনের জন্য অধিষ্ঠিত করলেন, তখন এই আয়াতকে আল্লাহ্তায়ালা রহিত করলেন এই আয়াত দিয়ে 'আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো জমা রয়েছে আল্লাহ্র নিকট'। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী সকল নবীকেই আল্লাহ্পাক এরকম কথা জনসমক্ষে প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। জুহাক ইবনে মুজাহিদ এবং হোসাইন ইবনে ফজলও এই আয়াতকে রহিত আয়াত বলে মনে করেন। বাগবী লিখেছেন, অভিমতটি গ্রহণযোগ্য। কেননা রসুল স.কে ভালোবাসা, তাঁকে প্রাণাধিক প্রিয় মনে করাই পূর্ণ ইমান। প্রত্যেক বিশ্বাসীকেই এরকম মনে করতে হবে। মদীনাবাসী সাহাবীগণ সেরকমই মনে করতেন।

আমি বলি, রসুল স. এর বংশধর ও সহচরবৃন্দকে ভালোবাসা ইসলামের অপরিহার্য একটি কর্তব্য, যা কখনো রহিত হতে পারে না। যেমন হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও প্রিয়বস্তুসমূহ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন, যেগুলোতে ইমানের আস্বাদ অনুভব করা যায়। যেমন— ১. আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রসুলকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসা ২. কাউকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালোবাসা ৩. ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় সত্যপ্রত্যাখ্যানে ফিরে যাওয়ার কল্পনাকে আগুনে পতিত হওয়া অপেক্ষা অধিক অপছন্দ মনে হওয়া। বোখারী, মুসলিম। উল্লেখ্য, প্রতিদান চাওয়ার বিষয়টি অবশ্যই রহিত।

আলোচ্য আয়াতাংশের হজরত ইবনে আব্বাস কৃত ব্যাখ্যাকে মুজাহিদ উল্লেখ করেছেন এভাবে— তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাসো এবং আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করো। হাসানের বর্ণনাও অনুরূপ। তিনি বলেছেন, 'কুরবা' (সৌহার্দ) অর্থ এখানে আল্লাহ্র নৈকট্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা আনুগত্য ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন ও প্রিয়ভাজন হও। হাসান বলেছেন 'কুরবা' থেকে মর্মার্থ হবে আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন। কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন, বক্তব্যটির উদ্দেশ্য এরকম— তোমাদের কাছে আমি এতোটুকু আশা রাখি যে, তোমরা আমার আপনজন ও সন্তানদেরকে ভালোবাসো এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে আমাকে সম্মান করো। সাঈদ ইবনে যোবায়ের এবং ওমর ইবনে শোয়াইব এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনার আপনজন কারা? তিনি স. বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের পুত্রদ্বয়।

পথভ্রষ্ট শিয়ারা এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চায় যে, আগের তিন খলিফার খেলাফত সঠিক ছিলো না। প্রকৃত খলিফা ছিলেন কেবল হজরত আলী। তারা আরো বলে, এই আয়াতের মাধ্যমে হজরত আলীকে ভালোবাসা অত্যাবশ্যক প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্যদেরকে ভালোবাসা অত্যাবশ্যক নয়। আর ভালোবাসার অপরিহার্য দাবি হচ্ছে, প্রিয়তমজনের আনুগত্য করা। একারণেই হজরত আলীর খেলাফত ছাড়া অন্য কারো খেলাফতের প্রতি অনুগত থাকা সমীচীন নয়। কিন্তু তাদের এমতো ধারণা অবিশুদ্ধ। কেননা— ১. বর্ণিত হাদিসের সূত্র পরম্পরাভূত হাসান আশারী একজন গোঁড়া শিয়া। তদুপরি এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়, যখন হজরত আলী ছিলেন কুমার, সুতরাং তিনি তখন কারো স্বামী বা পিতা ছিলেন না। ২. একথা ঠিক যে, হজরত আলী, হজরত ফাতেমা ও তাঁদের দুই পুত্রকে ভালোবাসা ওয়াজিব। কিন্তু এতে করে একথা প্রমাণিত হয় না যে, অন্যদের প্রতি ভালোবাসা ওয়াজিব হতে পারে না। হজরত আনাস থেকে ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আবু বকর ও ওমরকে ভালোবাসা ইমান এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা কুফর। তিনি স. আরো বলেছেন, আবু বকর ও ওমরকে ভালোবাসাই বিশ্বাসের চিহ্ন এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা সত্যপ্রত্যাখ্যানের নিদর্শন। আর আনসারদেরকে মহব্বত করাও ইমানের লক্ষণ এবং তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কুফরীর আলামত। আর যারা আমার সাহাবীগণকে গালি দেয়, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। তাদের ব্যাপারে যে আমাকে সম্মান করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সম্মান রক্ষা করবো। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আসাকের।

রসুল স. বলেছেন, আনসারদের প্রতি ভালোবাসা বিশ্বাসী হওয়ার নিদর্শন এবং তাদেরকে ঘৃণা করা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হওয়ার লক্ষণ। হজরত আনাস থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন নাসাঈ। তিনি স. আরো বলেছেন, কুরায়েশ

সম্প্রদায়কে মহব্বত করার অর্থ ইমান এবং তাদের সঙ্গে দুশমনী রাখার অর্থ কুফর। আরবীয়দেরকে ভালোবাসার অর্থ বিশ্বাসী হওয়া এবং তাদেরকে শত্রু মনে করা অবিশ্বাসী হওয়া। যে আরববাসীকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে এবং তাদের সঙ্গে যারা শত্রুতা করে, তারা আমার সঙ্গে শত্রুতা করে। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী।

যার ভালোবাসা ওয়াজিব, তিনি ছাড়া অন্য কেউ খলিফা হতে পারবেন না— শিয়াদের এই অভিমতটিও ভুল। কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেন, এখানে 'কুরবা' (নিকটজন) বলে বুঝানো হয়েছে রসুল স. এর ওই সকল আপনজনকে, জাকাত গ্রহণ যাদের জন্য ছিলো নিষিদ্ধ। অর্থাৎ তাঁরা হচ্ছেন বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিব। এই দুই গোত্রের লোকেরা ইসলাম পূর্ব সময়ে যেমন একাত্ম ছিলেন, তেমনি একাত্ম ছিলেন ইসলাম আগমনের পরেও।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে রসুল স. এর আত্মীয় অর্থ হজরত আলী, হজরত আকিল, হজরত জাফর ও হজরত আব্বাসের বংশধরগণ। তাঁদের সম্পর্কেই রসুল স. বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী জিনিষ রেখে যাচ্ছি। একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথনির্দেশনা ও জ্যোতি। অপরটি হচ্ছে— আমার পরিবার-পরিজন। তোমরা এ দু'টোকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধোরো। বাগবী লিখেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আরকামকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রসুল স. এর পরিবার-পরিজন কারা? তিনি বললেন, আলী, আকীল ও আব্বাসের সন্তানগণ।

একটি সংশয় ঃ সত্যধর্মের প্রচার ছিলো রসুল স. এর জন্য ফরজ। আর কারো কাছে প্রতিদান চাওয়া তাঁর জন্য বৈধও ছিলো না। তাহলে তিনি এরকম বলতে পারেন কীভাবে যে, আমি এর বিনিময়ে চাই কেবল আত্মীয়তার সৌহার্দ। তাছাড়া ইতোপূর্বের আয়াতেও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দেই, আখেরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।

সংশয়ভঞ্জন ঃ এখানে আত্মীয়তার সৌহার্দকে ধর্মপ্রচারকর্মের বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়েছে রূপক অর্থে। প্রকৃত অর্থে নয়। সৌহার্দ, সম্প্রীতি 'প্রতিদান' এর অনুরূপ বলেই এখানে আত্মীয়তার সৌহার্দকে প্রতিদান বলা হয়েছে। কেননা বাস্তব ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক বা প্রতিদান বলে তাকেই যার দ্বারা প্রতিদানপ্রাপকেরা উপকৃত হতে পারে। কিন্তু এখানে উপকৃত হওয়ার বিষয়টিতে রসুল স. এর তো কোনো উপকার নেই। উপকার রয়েছে তাদের, যারা তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত আত্মীয়তার সম্মান করবে, তারা হয়ে যেতে পারবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যভাজন ও পূর্ণ ইমানের অধিকারী। ফলে লাভবান হবে তারাই। সেকারণেই আমি বলি, আলোচ্য বক্তব্যের মর্মার্থ হবে— আমি কেবল তোমাদের কাছে এতোটুকুই প্রত্যাশা করি যে, তোমরা আমার পরিবার পরিজন, আপনজন ও সন্তান-সন্ততিকে ভালোবাসো।

রসুল স. সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। তাই তাঁর পক্ষে ধর্মপ্রচারের মহান দায়িত্ব পালন করতে থাকবে বিদ্বজ্জন— তাফসীরবেত্তা, হাদিসবেত্তা, ফকীহ্ ও আধ্যাত্মিক সাধকগণ। তাঁদের উপরেও এ

দায়িত্বটি রয়েছে যে, তাঁরা রসুল স. এর পরিবার পরিজনকে ভালোবাসতে বলবেন। বলবেন, আমরাও ধর্মপ্রচারের জন্য কোনো বিনিময় চাই না। চাই এতোটুকু যে, সকলে যেনো রসুল স. এর পরিবার পরিজনকে ভালোবাসে। তাছাড়া বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক ছিলেন হজরত আলী। তাঁর বংশোদ্ভূত ইমামগণও ছিলেন আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্যভাজন। রসুল স. স্বয়ং বলেছেন, আমি হচ্ছি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার তোরণ। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বাযযার ও তিবরানী। এই হাদিসের সমর্থনে আরো হাদিস রয়েছে যেগুলো বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে ওমর ও হজরত আলী। হাকেমও এই হাদিসকে নির্ভুল বলে সাব্যস্ত করেছেন। একারণেই দেখা যায়, পরবর্তী আউলিয়াগণের অনেকেরই আধ্যাত্মিক সূত্রপরম্পরা আহলে বাইতের ইমামগণের সঙ্গে সংযুক্ত। হজরত আলী ও হজরত ফাতেমার বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন অসংখ্য আউলিয়া দরবেশ। যেমন— গাউসুস্ সকলাইন আবদুল কাদের জিলানী, খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, খাজা বাকী বিল্লাহ্, শায়েখ আবুল হাসান শাজালী প্রমুখ। একারণেই হাদিসে উল্লেখিত দু'টি ভারী জিনিসের একটি হচ্ছে এই আহলে বাইত। অর্থাৎ রসুল স. এর বংশধর বা পরিবার পরিজন। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাগণ তাই লিখেছেন, এখানে 'আত্মীয়তার সৌহার্দ ব্যতীত' কথাটি হচ্ছে বিকর্তিত ইসতেস্না। অর্থাৎ এখানে 'ইল্লা' অর্থ 'লাকিন্না' এবং 'প্রতিদান' উল্লেখ করা হয়েছে এখানে বাস্তব অর্থে। ফলে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আত্মীয়বর্গ! আমি তোমাদের পথপ্রদর্শনার্থে যে শ্রম দান করি, তার বিনিময় হিসেবে চাই কেবল এতোটুকুই যে, তোমরা আমার সঙ্গে রক্ষা করে চলো আত্মীয়সুলভ সম্প্রীতি। হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম কর্তৃক হাদিসটিতেও এই বক্তব্যটি

প্রতিফলিত হয়েছে। রসুল স. এর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সোহার্দশীল হলে তার উত্তম বিনিময় প্রাপ্তি সমর্থিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতেই।

বলা হয়েছে— 'যে উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য এতে কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী'। এখানে 'উত্তম কাজ' (হাসানা) অর্থ রসুল স. এর পরিবার-পরিজন ও বংশধরগণকে ভালোবাসা। এরকম অর্থ না করলে পূর্বাপর বাক্যের মধ্যে আর সামঞ্জস্য থাকে না। অবশ্য 'হাসান' বলতে সকল প্রকার সৎকর্মকেই বোঝায়। কিন্তু এখানে শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে রসুল স. এর নিকটজনদের ভালোবাসা বোঝাতে। এই ভালোবাসার কল্যাণ আল্লাহ্তায়ালা বর্ধিত করতেই থাকেন। সেকারণেই দেখা যায়, রসুল স. এর রূহানী পরিবারের সদস্য তরিকতের পীর মাশায়েখগণের ভালোবাসার ফলস্বরূপ রসুল স. এর ভালোবাসাও বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় আল্লাহ্র মহব্বত, যা মানব জীবন লাভের মূল উদ্দেশ্য। সুফীসাধকগণ তাই বলেন, ফানার পূর্ণত্ব লাভ হয় এভাবেঃ ফানা ফিশ শায়েখ— ফানা ফিররসুল— ফানা ফিল্লাহ্। ফানা অর্থ এমন আত্মবিলুপ্তি, যাতে বন্ধু-সুহৃদ-প্রিয়জন, এমন কী নিজের অস্তিত্বের স্মরণও হয়ে যায় অন্তর্হিত। জেগে থাকে কেবল এক আল্লাহর আনুরূপ্যহীন অস্তিত্বের সতত সম্মোহন।

তাফসীরে মাযহারী/৪৪২

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবু বকর সিদ্দীক সম্পর্কে। বোখারী লিখেছেন, হজরত আবু বকর বলেছেন, তোমরা আহলে বাইতের ব্যাপারে রসুল স. এর সম্মান রক্ষা কোরো।

'ইন্নাল্লহা গফুর' অর্থ নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল' অর্থাৎ যে ব্যক্তি রসুল স.কে ও তাঁর একান্ত প্রিয়জন আউলিয়া কেরামকে ভালোবাসে তার প্রতি তিনি সবিশেষ ক্ষমাপরবশ। 'লিইয়াগ্‌ফিরা লাকাল্লহু মা তাকদ্দামু মিন জাম্‌বিকা ওয়ামা তাআখ্‌খর' (যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত-ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন)— এই আয়াতের উদ্দেশ্যও সম্ভবতঃ এরকমই। এখানে 'মা তাআখ্‌খার' এর উদ্দেশ্য— যারা রসুল স.কে ভালোবাসে, তাদের এবং তাদের মিত্রদের গোনাহ। 'শাকুর' অর্থ— কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এখানে মর্মার্থ হবে— আল্লাহ্পাক যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে জানেন অনুগত ও প্রেমিকদের।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯

❑ উহারা কি বলে যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে, যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যাহা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।

তাফসীরে মাযহারী/৪৪৩

❑ তিনিই তাঁহার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন।
❑ তিনি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।
❑ আল্লাহ্ তাঁহার সকল বান্দাকে জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দিলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করিত; কিন্তু তিনি তাঁহার ইচ্ছামত পরিমাণেই নাযিল করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে সম্যক জানেন ও দেখেন।
❑ উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।
❑ তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা আপনাকে তো যথামর্যাদা দিলোই নো, উল্টো বরং এই বলতে শুরু করলো যে, আপনি অসত্যভাষী। তাদের মতে আপনার নবুয়ত ও আপনার উপরে প্রত্যাদেশিত কোরআন সত্য নয়। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। যদি সেরকম হতো, তবে তাদের বলার অপেক্ষা না রেখে আল্লাহ্তায়ালাই সত্যের অনুপ্রবেশ থেকে আপনার হৃদয়কে রুদ্ধ করে দিতেন। কেননা মিথ্যাকে বিলুপ্ত করা এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত করাই আল্লাহ্র কাজ। কার অন্তরে কী আছে, তা তিনি ভালো করেই জানেন। সুতরাং একথাও আমার অবগতির আওতাভূত যে, আপনি আমার সত্য রসুল এবং আপনার উপরে অবতরণরত প্রত্যাদেশাবলীও সত্য। আর মিথ্যা হচ্ছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীর দল, যারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য সচেষ্ট।

এখানে 'ফা ইঁয়্যাশা আল্লাহু ইয়াখতিমু আ'লা ক্বলবিকা' অর্থ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। অর্থাৎ মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর মতো সুমহান ব্যক্তিত্বের পক্ষে মিথ্যাচারী হওয়া অসম্ভব। মিথ্যার আশ্রয় তো গ্রহণ করতে পারে কেবল সে-ই যার হৃদয়ে আল্লাহ্ বিভ্রান্তির মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। যিনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং আল্লাহ্র পরিচয়লাভে ধন্য, তিনি কখনোই মিথ্যাশ্রয়ী হতে পারেন না।

মুজাহিদ কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনার হৃদয়ে লাগিয়ে দিবেন সহিষ্ণুতার মোহর, ফলে মুশরিকের দল কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ কষ্টে আপনি বিচলিত হবেন না এবং তাদের মিথ্যা দুর্ণাম শুনেও আপনার কোনো দুঃখবোধ থাকবে না। কাতাদা অর্থ করেছেন এরকম— আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আপনার অন্তরে স্থাপন করতেন বিস্মৃতির মোহর। তাহলে কোরআন আপনার স্মৃতি থেকে মুছে যেতো। সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্র বাণী নয় এমন বাণীকে যদি আমি আল্লাহ্র বাণী বলে প্রচার করতাম, তবে তো আল্লাহ্ই আমার হৃদয়ে বসিয়ে দিতেন অনড় বিস্মৃতির মোহর। ফলে কোনোকিছু আমি আর মনে রাখতে পারতাম না।

'আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন' এই বাক্যটি অবশ্য পৃথক। অর্থাৎ এর দ্বারা মুশরিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত মিথ্যা অপবাদকে অস্বীকার করা হয়েছে প্রামাণ্য দৃষ্টিতে। একথাটিই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মিথ্যার বিলোপন ও সত্যের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আল্লাহ্র বিধান। তাই তো তিনি তাঁর রসুল ও কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করবেনই। যেহেতু তা সত্য। নিশ্চিহ্ন করে দিবেন বিরুদ্ধ পক্ষীয়দেরকে। এটা হচ্ছে আল্লাহ্র অঙ্গীকার। আবার তাঁর অঙ্গীকার অবশ্য বাস্তবায়নব্য।

'ইন্নাহু আ'লীমুম্ বিজাতিস্ সুদূর' অর্থ অন্তরে যা আছে, সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে দুস্প্রাপ্য সূত্রসহযোগে বাগবী ও তিবরানী বর্ণনা করেছেন, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান চাই না'— এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন কিছুসংখ্যক লোকের মনে এই শয়তানী ধারণার উদয় হলো যে, রসুল স. তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আমাদের নেতা বানিয়ে যেতে চান। তৎক্ষণাৎ হজরত জিবরাইল অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আপনার সম্পর্কে কিছু লোকের মনে এই অপধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি তাই তাদেরকে সতর্ক করণার্থে অবতীর্ণ করেছেন 'অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত'। রসুল স. তখন জনসমক্ষে সদ্য অবতীর্ণ এই বাণী পাঠ করে শোনালেন। তখন অন্তরে অপধারণা লালনকারীরা তওবা করে এবং বলে, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি সত্যিই আল্লাহ্র রসুল। তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (২৫)। বলা হয়— 'তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন ও পাপমোচন করেন এবং তোমরা যা করো, তিনি তা জানেন'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'তিনিই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন' অর্থ তিনি তওবা কবুল করেন তাঁর প্রতি অনুগতজনদের, প্রিয়ভাজনদের। যেমন আরববাসীরা বলেন 'ক্বিলতু মিনহুশ্ শাইআ' (তার কাছ থেকে আমি অমুক বস্তু নিয়ে নিয়েছি) 'ক্বিলতু আ'নহুশ্ শাইআ' (আমি বস্তুকে তার কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছি)। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, কথাটির অর্থ— আল্লাহ্ তওবা কবুল করেন তাঁর ওই সকল বান্দার, যারা পাপ পরিত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করে এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র অনুগত হয়ে যায়। হজরত সুহাইল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, তওবা অর্থ মন্দকে পরিত্যাগ করে ভালোর দিকে প্রত্যাবর্তন। বায়যাবী লিখেছেন হজরত আলী বলেছেন, পাপ থেকে তওবা করার অর্থ

ছয়টি— ১. ফরজ নির্দেশ লংঘিত হওয়ার কারণে অনুশোচনা ২. বাদ পড়ে যাওয়া ফরজ পুনরায় সম্পন্ন করা ৩. অন্যের অধিকার ও ন্যায়-দাবিকে প্রত্যর্পণ করা ৪. ইতোপূর্বে প্রবৃত্তি যেভাবে পাপলিপ্ত হয়েছিলো, সেভাবে প্রবৃত্তিকে পুণ্যমগ্ন করা ৫. পূর্বে যেভাবে পাপকে আস্বাদন করা হয়েছিলো, সেভাবে
বর্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রবৃত্তিকে আনুগত্যের তিক্ততা অনুভব করানো ৬. আগের হাসির বদলে প্রতিষ্ঠিত করা রোদন। শরহে সুন্নাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, অনুশোচনাই তওবা এবং তওবাকারী নিষ্পাপ হয়ে যায়।

একটি উপযোগ ঃ বাগবী লিখেছেন, হারেছ ইবনে সুয়াইদ বলেছেন, আমি একবার হজরত আবদুল্লাহ্‌কে তাঁর অসুস্থ অবস্থায় দেখতে গেলাম। তিনি বললেন, এক লোক জনমানবহীন বিশাল মরুপ্রান্তরে উট চরাচ্ছিলো। উটের পিঠে ছিলো তার পানাহারের সামগ্রী। এক সময় শ্রান্তি নিবারণের জন্য সে একস্থানে নেমে পড়লো। মাটিতে শুয়ে পড়তেই অল্পক্ষণের মধ্যে ঢলে পড়লো গভীর নিদ্রায়। ঘুম ভাঙতেই দেখলো, উটটি আর নেই। সে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তার হারানো উট খুঁজতে শুরু করলো। ঘোরাফিরা করতে করতে হয়ে পড়লো পিপাসার্ত। উপায়ন্তর না দেখে ঠিক করলো, যেখান থেকে তার উটটি হারিয়েছে, সেখানেই ফিরে যাবে। অপেক্ষা করবে মৃত্যু পর্যন্ত। তাই করলো সে। আগের স্থানে ফিরে গিয়ে বসে পড়লো মাটিতে। আবার ক্ষুধায় পিপাসায় এবং শ্রান্তিতে দুচোখ বন্ধ হয়ে এলো তার। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলতেই দেখতে পেলো উটটি শুয়ে রয়েছে তার একেবারে কাছে। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো তার অন্তরাত্মা। শোনো, এরকম লোক যেমন তার হারানো উটটি পেয়ে খুশী হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন আল্লাহ্, যখন তার কোনো বান্দা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তওবা করে।

হজরত আনাস ইবনে মালেক থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জনশূন্য মরুভূমিতে গিয়ে হাজির হও, এমতাবস্থায় যদি তোমার পানাহার সামগ্রীবাহী উটটি হঠাৎ হারিয়ে যায় এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উটটি না পেয়ে যদি হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় সেখানকার কোনো বৃক্ষচ্ছায়ায় শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণতে গুণতে ঘুমিয়ে পড়ো। তারপর সহসা চোখ মেলতেই যদি দেখো উটটি সশরীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার সামনে। ওই খুশীতে আত্মহারা হয়ে যদি বলতে থাকো, হে আল্লাহ্! তুমি সত্যি সত্যিই আমার বান্দা এবং আমি তোমার প্রভুপালক। তোমাদের এমতাবস্থার খুশীর চেয়ে অনেক বেশী খুশী হন আল্লাহ্ তাঁর পাপী বান্দা পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, বান্দা যখন তার গোনাহ্ স্বীকার করে এবং তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। তিনি স. আরো বলেছেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বের সকল তওবাকারীর তওবা আল্লাহ্ কবুল করে নেন। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মাজা ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ ব্যক্তির মতো।

'ওয়া ইয়া'ফূ আনিস্ সাইয়্যিআত' অর্থ এবং পাপ মোচন করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার ছোট বড় সব পাপ মাফ করে দেন— সে তওবা করুক, অথবা না করুক।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এমন এক লোক ছিলো, যে জীবনে কখনো ভালো কাজ করেনি। মৃত্যুকালে সে তার আপনজনদেরকে ডেকে বললো, আমি মরে গেলে তোমরা আমার মরদেহ পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ো। আর দেহভস্মগুলোর অর্ধেক ফেলে

দিয়ো সমুদ্রে এবং বাকী অর্ধেক ছড়িয়ে দিয়ো ডাঙ্গায়। কেননা আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ্ আমাকে এমন শাস্তি দিবেন, যে শাস্তি তিনি আর কাউকে দেননি। এর পরক্ষণে তার মৃত্যু হলো। তার আপনজনেরাও তার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করলো। তারপর আল্লাহ্ দেহভস্মগুলোকে একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। শুধালেন, তুমি তোমার আপনজনদেরকে এমন করতে বলেছিলে কেনো? সে বললো, হে আমার প্রভুপালক! আমি তো এমন করতে বলেছিলাম কেবল তোমার ভয়ে। একথা শুনে আল্লাহ্ তাকে মার্জনা করলেন।

হজরত আবু দারদা থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার তাঁর মিম্বরে আরোহণ করলেন। বললেন, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? তিনি স. বললেন, তবুও। আমি পুনরায় একই প্রশ্ন করলাম এবং তিনিও জবাব দিলেন একইভাবে। পুনরায় তিনি স. ঘোষণা করলেন, ভালো করে শুনে নাও, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দু'টি জান্নাত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! সে যদি হয় ব্যভিচারী ও অপহারক, তবুও কী? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, তবুও। আবু দারদার নাক ধূলিধুসরিত হলেও।

'ওয়া ইয়া'লামু মা তাফআ'লূন' অর্থ এবং তোমরা যা করো, তিনি তা জানেন। উল্লেখ্য, একথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা তওবা করতে আগ্রহী নও, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'তিনি মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন'।

এখানে 'ওয়া ইয়াস্তাজীবুল্ লাজীনা' কথাটির 'আল্লাজীনা' এর 'লাম' অক্ষরটি রয়েছে উহ্য। শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'লিল্লাজীনা'। যেমন 'লাম' উহ্য রয়েছে 'ওয়া ইজা ক্বলূহুম' কথাটিতে। সেখানেও শব্দটির মূলরূপ ছিলো 'ওয়া ইজা ক্বলূ লাহুম'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'সাড়া দেন' অর্থ প্রতিদান প্রদান করেন। বায়যাবী লিখেছেন, এই প্রতিদান হচ্ছে অনুগত থাকার প্রতিদান। কেননা আনুগত্যমণ্ডিত হওয়াও প্রার্থনা করা বা আহবান করার অনুরূপ। এক হাদিসে এসেছে, শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা হচ্ছে 'আলহামদুলিল্লাহ্'। হজরত জাবের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা। ইবনে হাববান বলেছেন, একবার তাপসপ্রবর ইব্রাহিম ইবনে আদহামকে এক লোক জিজ্ঞেস করলো, আমরা দোয়া করি, কিন্তু আমাদের দোয়া কবুল হয় না। কারণ কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে অনুগত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। অথচ তোমরা অননুগত। এটাই তোমাদের দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ।

'তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন' অর্থ আল্লাহ্ তাদের ভ্রাতা-বন্ধুদের জন্য তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। বলেছেন আবু সালেহ।

এরপর বলা হয়েছে— 'কাফেরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অবস্থা এর বিপরীত। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্ যেমন অত্যধিক অনুকম্পামণ্ডিত করবেন, তেমনি অত্যধিক শাস্তিদান করবেন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

এরপরের আয়াতে (২৭) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণেই নাযিল করে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত খাব্বাব ইবনে আরত বলেছেন, এই আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের কয়েকজনকে লক্ষ্য করে। আমরা একবার মনে মনে ভাবলাম, বনী কুরায়জা, বনী নাজির ও বনী কাইনুকা গোত্রভূত ইহুদীরা কতো স্বচ্ছল, আমাদের অবস্থাও যদি সেরকম স্বচ্ছল হতো। তখনই অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এখানে 'বিপর্যয় সৃষ্টি করতো' অর্থ সম্পদশালী হলে তারা অহংকারে মেতে থাকতো। কিংবা অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতো অন্যের উপরে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'বিপর্যয় সৃষ্টি করতো' অর্থ নির্মাণ করতো একের পর এক প্রাসাদ, সংগ্রহ করতো একের পর এক যানবাহন এবং প্রস্তুত করতো একের পর এক পোশাক। 'বিপর্যয়' এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— যে সকল জিনিস পরিমাণ ও গুণগত দিক দিয়ে কম-বেশী রাখা সমীচীন, সে সকল কিছুকে অর্জন করবার অপচেষ্টা। ভারসাম্যমূলকতার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন।

'কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণেই নাযিল করেন' অর্থ অনিবার্য বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা থেকে মানবতাকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই রিজিক বিতরণের এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি নিজে। রিজিক বন্টন তাই সম্পূর্ণতই তাঁর অভিপ্রায়াধীন। আর 'তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন' অর্থ তিনিই কেবল জানেন, কার জীবনোপকরণ কখন কীভাবে কতোটুকু বন্টন করতে হবে। কেননা তাঁর সকল বান্দার অভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্য অবস্থা তাঁর সর্বময় জ্ঞান ও সর্বত্রগামী দর্শনের সতত আওতাভূত।

হজরত আলী বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আসহাবে সুফ্ফাগণ সম্পর্কে। ওই সকল সাহাবী ছিলেন বিত্তহীন ও গৃহহীন। রসুল স. তাঁদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মসজিদের বাইরের চত্বরে। জ্ঞানার্জন ও আল্লাহ্র উপাসনা-বন্দনাই ছিলো তাঁদের সার্বক্ষণিক কর্ম। প্রায়শ দেখা দিতো তাঁদের অন্ন সংকট। তাই একবার তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবলেন, আহ্ আমাদের অবস্থা যদি স্বচ্ছল লোকদের মতো হতো। হাকেম, তিবরানী। হজরত ওমর থেকে ইবনে হারেছও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হজরত আনাস থেকে বাগবী লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীকে অপবাদ দিলো, সে যেনো যুদ্ধ করতে দাঁড়ালো আমারই বিরুদ্ধে। আমি আমার আউলিয়াগণকে রক্ষার জন্য এমন ভয়ংকর; যেমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে ক্রোধান্বিত সিংহ। আমার বান্দারা অন্য কোনো উপায়ে আমার এমন নিকটবর্তী হতে পারে না,

যতোখানি নিকটবর্তী হতে পারে ফরজ ইবাদতের মাধ্যমে। আর নফল ইবাদতের মাধ্যমেও তারা আমার নৈকট্য অর্জন করে। সে নৈকট্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। তখন আমি হয়ে যাই তাদের কান, চোখ ও হাত, যা দিয়ে তারা শোনে, দ্যাখে ও কর্ম করে। তারা তখন আমার কাছে প্রার্থী হলে আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করি। দান করি, যদি তারা কিছু চায়। আর আমি সর্বাধিক উদ্বিগ্ন হই তাদের প্রাণ হরণকালে। মৃত্যু যদি পরিহারযোগ্য কিছু হতো, তবে আমিও তাদেরকে কষ্ট দিতে চাইতাম না। কিন্তু মৃত্যু তো অমোঘ। কারণ তা আমা কর্তৃক প্রদত্ত এক বিধান। আর আমার এমন কিছুসংখ্যক বান্দা রয়েছে, যারা সতত উন্মুক্ত রাখতে চায় ইবাদত বন্দেগীর তোরণ। কিন্তু আমি তাদেরকে সংযত রাখি। কেননা অসংযম তাদেরকে নিয়ে যাবে অহমিকার পথে। ফলে তারা হয়ে যাবে স্খলিত। আবার আমার কিছুসংখ্যক বান্দা এমনও রয়েছে যে, তাদের বিশ্বাসকে ঠিক করতে সাহায্য করে ধন-সম্পদ, অভাবগ্রস্ত হলে তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে বিপর্যস্ত। তাই আমি তাদেরকে দান করি বিত্ত-স্বাচ্ছল্য। আবার এমন কিছুসংখ্যক বান্দাও আমার রয়েছে, যাদের বিশ্বাসের রক্ষাকবচ হচ্ছে দারিদ্র। বিত্তপতি হলেই বরং তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে বিশৃঙ্খল। তাই আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি বিত্তহীনতা। এরকম শারীরিক সুস্থতাই হয় কারো কারো ইমান রক্ষার বর্ম। তাদেরকে যদি আমি পীড়াগ্রস্ত করি, তবে তাদের ইমান রক্ষা করা হয়ে যাবে কঠিন। তাই তাদেরকে আমি সুস্থই রাখি। আবার আমার এমন বান্দাও কিছু রয়েছে, যারা সুস্থ হলেই বরং বিপদে পড়বে। তখন তাদের ইমান রক্ষা করা হয়ে পড়বে দুষ্কর। সুতরাং আমি আমার বান্দাগণের বিষয়াবলী সম্পন্ন করি আমার মহাপ্রজ্ঞা অনুসারে। তাদের সকল কিছু সম্পর্কে আমি জ্ঞাত এবং তাদের সকল কর্মের আমি দ্রষ্টা।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখনই তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ'।

এখানে 'হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে' অর্থ তুমুল খরার সময় যখন মানুষ বৃষ্টি চেয়ে চেয়ে হয়ে পড়ে ক্লান্ত, নিরাশ। 'করুণা বিস্তার করেন' অর্থ অবতীর্ণ করেন এমন পরিমিত বৃষ্টি, যাতে করে ভূমিতে উৎপন্ন হয় ফল ও ফসল। জীবন রক্ষা পায় উদ্ভিদ, প্রাণী ও পাখির। 'অভিভাবক' অর্থ বান্দাদের রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক। আর 'প্রশংসার্হ' অর্থ যেহেতু তিনি তাঁর অপার দয়ায় বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর সৃষ্টিকুলকে, সেহেতু তিনিই প্রকৃত অর্থে প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকারী।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে রেখেছেন সেইগুলি। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাদেরকে সমবেত করতে সক্ষম'। একথার অর্থ—প্রতিটি সৃষ্ট প্রাণী ও পদার্থই তাদের একক সৃজয়িতা আল্লাহ্‌র সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যকলাপের প্রমাণ। আর এই প্রমাণপঞ্জির মধ্যে অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে সুবৃহৎ ও নিখুঁত আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থিত অন্যান্য প্রাণী। যেগুলোকে তিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন। এই বিশাল প্রাণীকুল রয়েছে তাঁর সতত প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার আওতায়। তাই তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় এদেরকে সমবেত করতে সক্ষম। মহাবিচারের দিবসে তিনি তা করবেনও।

এখানে 'মিন আয়াতিহী' অর্থ নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। 'মিন দাব্বাতিন' অর্থ সকল প্রাণী— মানুষ, ফেরেশতা, জ্বিন, জীবজন্তু সবকিছুই এর অন্তর্ভূত। কেননা 'দাব্বাত' বলে সকল প্রাণবন্ত ও বিচরণশীল প্রাণীকে। অথবা 'দাব্বাত' অর্থ এখানে কেবলই পৃথিবীতে বিচরণশীল জীবজন্তুসমূহ। এমতাবস্থায় এখানকার 'ফীহিমা' (এই দুইয়ের মধ্যে) দ্বিত্ব সর্বনামটি আকাশ-পৃথিবী উভয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কথাটি সম্পৃক্ত হবে কেবল পৃথিবীর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে, পৃথিবীর মতো আকাশেও রয়েছে প্রাণীর অস্তিত্ব— যেমন ফেরেশতা। আর তাদের সকলকেই তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে সমবেত করতে সক্ষম, যেমন করবেন শেষ বিচারের কালে।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

❑ তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

❑ তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

❑ তাঁহার অন্যতম নিদর্শন পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ।

❑ তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

❑ অথবা তিনি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন;

❑ আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, তাহাদের কোন নিষ্কৃতি নাই।

❑ বস্তুত তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী তাহাদের জন্য, যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে,

❑ যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হইলে ক্ষমা করিয়া দেয়,

❑ যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাহাদিগকে আমি যে রিয্ক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! মনে রেখো, তোমাদের উপরে যে সকল বিপদ-মুসিবত আপতিত হয়, তা তোমাদেরই অর্জন, তোমাদেরই কৃত পাপের ফল। আর অতীব মমতাপরবশ বলে তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি এমনিতেই ক্ষমা করে দেন। নতুবা তোমরা তো হতে আরো অধিক বিপদগ্রস্ত।

এখানে 'ফাবিমা কাসাবাত্ আইদীকুম' অর্থ তোমাদের স্বহস্ত অর্জিত পরিণতি, তোমাদের কৃতকর্মের ফল। 'মা আসবাকুম' এর 'মা' এখানে শর্তপ্রকাশক। অথবা যোজক অব্যয়, যার মধ্যে রয়েছে শর্তের অর্থ। আর 'অনেক অপরাধ ক্ষমা করেছেন' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে আগের নামপদীয় বাক্যের সঙ্গে। অথবা তা প্রসঙ্গবর্জিত।

হাসান বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. বলতেন, আমার জীবনাধিকারী সেই পবিত্র সত্তার শপথ! পাপ ব্যতীত পায়ে বিঁধে না কোনো কাঁটা,
স্খলিত হয় না কোনো পদবিক্ষেপ, এমনকি পেশী সঞ্চালনও হয় না অস্বাভাবিক। আর অধিকাংশ পাপ তো সেগুলোই, যেগুলোকে আল্লাহ্ মার্জনা করেন। হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসীদের অসুখ-বিসুখ তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্যস্বরূপ। হাকেম, বায়হাকী।

বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী একবার উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অতীব সুন্দর আয়াত পাঠ করে শোনাবো, যা আমাকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন রসুল স. স্বয়ং। তা হচ্ছে 'তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃত কর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন'। এবার এর ব্যাখ্যা শোনো— 'মা আসবাকুম মিম্ মুসিবাতুন' অর্থ পার্থিব কষ্ট, বিপদাপদ, অসুখ-বিসুখ। আর 'ফাবিমা কাসাবাত্ আইদীকুম' অর্থ কৃতকর্মের পার্থিব কষ্ট, যা ভোগ করলে পরকালে এজন্য তাকে আর শাস্তি দেওয়া হবে না। বরং দেওয়া হবে পুরস্কার। আর যে অপরাধগুলো তিনি এমনিতেই ক্ষমা করে দেন, সেগুলোর জন্যও আখেরাতে তার কোনো শাস্তি নেই। আর তিনি হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, চূড়ান্ত বিচারক।

বাগবী লিখেছেন, ইকরামা বলেছেন, বিশ্বাসীদের গায়ে সামান্য আঁচড় লাগলেও বুঝতে হবে এটা তার পাপের ক্ষতিপূরণ। এই কষ্টটুকু ছাড়া আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করতেন না। আবার কষ্টভোগ হতে পারে উন্নততর মর্যাদাপ্রাপ্তির জন্যও, যে কষ্ট না পেলে ওই উচ্চ মর্যাদা আল্লাহ্ তাদেরকে দান করতেন না।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই'। একথার অর্থ— যে বিপদাপদ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই বিপদ-আপদ তোমরা কিছুতেই অপসারণ করতে পারবে না। ব্যর্থ করতে পারবে না তাঁর অভিপ্রায়। সুতরাং বুঝে নাও, আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের এমন কোনো রক্ষাকর্তা নেই, যে তোমাদেরকে স্থিরীকৃত বিপদ-মুসিবত থেকে রক্ষা করতে পারে, নেই এমন কোনো সাহায্যকারীও, যার সাহায্যে তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যেতে পারো।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ (৩২)। তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য (৩৩)। অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন (৩৪); আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই' (৩৫)।

এখানে 'আল জ্বাওয়ারি ফীল বাহরি' অর্থ সমুদ্রে চলমান জলযানসমূহ। 'কাল আ'লাম' অর্থ এমন জাহাজ, যা সমুদ্রে ভেসে থাকে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে। 'রওয়াকিদা' অর্থ নিশ্চল, স্তব্ধ। 'আ'লা জহরিহী' অর্থ সমুদ্রপৃষ্ঠে। 'সব্বারিন শাকুর' অর্থ ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ। রসুল স. বলেছেন, বিশ্বাসের দু'টি অংশ— ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা। হজরত আনাস থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বায়হাকী।

'আও ইউবিক্বহুন্না' অর্থ অথবা বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। কথাটির সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের 'নিশ্চল হয়ে পড়বে' কথাটির সঙ্গে, অথবা 'বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন' এর সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— বায়ূকে স্তব্ধ করে দেওয়া, ফলে জাহাজ নিশ্চল হয়ে যাওয়া এবং অবশেষে জাহাজ ও জাহাজের যাত্রীদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এসকল কিছুই তো তিনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির যোগাযোগ রয়েছে আগের আয়াতের কেবল 'তিনি ইচ্ছা করলে' কথাটির সঙ্গে। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস থামিয়ে দিয়ে জাহাজের গতি যেমন রুদ্ধ করে দিতে পারেন, তেমনি তুফান-টাইফুন দ্বারা জাহাজকে নিমজ্জিতও তো করতে পারেন।

'ওয়া ইয়া'ফু আ'ন কাছীর' অর্থ এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন। বাক্যটি জুমলা প্রসঙ্গ বর্জিত। অর্থাৎ কিন্তু অনেককেই ক্ষমা করে দেন এবং রক্ষা করেন। অথবা কথাটির সংযোগ রয়েছে আগের বক্তব্যগুলোর সঙ্গে। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়াবে— তিনি ইচ্ছে করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। যদি তাই করেন, তবে জাহাজ স্থবির হয়ে থাকবে। অথবা সমুদ্রে ঝড় উঠিয়ে জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারেন। যদি তা করেন, তবে জাহাজারোহীরা ডুবে যাবে, কিংবা উড়ে যাবে হাওয়ার অনুকূলে। তখন অধিকাংশ আরোহীকে তিনি ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

'আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে মক্কার মুশরিক এবং তাদের মতো অন্যান্য সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীকে, যারা আল্লাহ্র বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— যারা আল্লাহ্র বাণী সম্পর্কে তর্ক-সন্দেহের সৃষ্টি করে, তাদের সমুদ্রযাত্রাকালে আল্লাহ্ তো তাদের উপর সহজেই প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন বাতাস স্তব্ধ করে দিয়ে, অথবা ঝড় উঠিয়ে। তখন তো তারা জানতে পারবে যে, এই বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো উপায়ই নেই। অথবা বক্তব্যটি দাঁড়াবে— যারা আল্লাহ্র বাণীকে কুটতর্কের মাধ্যমে প্রতিহত করে, তারা যখন

মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত হবে, তখন জানতে পারবে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো পথই আর তাদের নেই।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'বস্তুত তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী তাদের জন্য— যারা ইমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে'। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে তোমাদের সকলকেই দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর এই অস্থায়ী জীবনের প্রয়োজনীয় রসদ-সম্ভার। এগুলো তোমরা সাময়িকভাবে সকলেই ভোগ করে থাকো। কিন্তু মনে রেখো, এগুলোর কোনোটিই স্থায়ী নয়। সুতরাং পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করো এবং পরিত্যাগ করো ওই সকল বস্তুকে যা পরকাল সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়। তোমাদের

পরকালের পুণ্য প্রচেষ্টার ফল জমা রয়েছে আল্লাহ্র কাছে, যা পরিমাণগত ও প্রকৃতিগত উভয় দিক থেকে পৃথিবীর সাফল্য অপেক্ষা অনেক অনেক উত্তম এবং তা চিরস্থায়ীভাবে দেওয়া হবে তাদেরকে, যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে এবং তাঁরই প্রতি সতত নির্ভরশীল হয়।

হজরত আলী বলেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দীক যখন তাঁর যথাসর্বস্ব ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন তখন কিছুসংখ্যক লোক তাঁর এ কাজের সমালোচনা করতে থাকে। আর তখনই অবতীর্ণ হয় এই আয়াত।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধবিশিষ্ট হলে ক্ষমা করে দেয় (৩৭), যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে' (৩৮)। আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যগত সংযোগ রয়েছে পূর্বের আয়াতের 'যারা ইমান আনে' কথাটির সঙ্গে। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— যারা ইমান আনে, তাদের প্রভুপালকের উপরে নির্ভর করে, বেঁচে থাকে মহাপাপ ও ঘৃণ্যকর্ম থেকে, ক্রোধান্বিত হওয়া সত্ত্বেও অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ্র ডাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়, নামাজ পাঠ করে, সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় না, তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের পুরস্কার, যা অত্যুত্তম ও চিরস্থায়ী।

মুকাতিল বলেছেন, এখনে 'গুরুতর পাপ' অর্থ ওই সকল অন্যায় কর্ম, যেগুলোর জন্য শরিয়তে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। সুরা নিসার তাফসীরে গুরুতর পাপ কবীরা গুনাহসমূহ সম্পর্কে সবিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আর 'অশ্লীল কার্য' অর্থ এখানে ব্যভিচার। এরকম বলেছেন সুদ্দী। এখানকার 'ক্রোধবিশিষ্ট হলে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে আগের বাক্যের 'বেঁচে থাকে' কথাটির সঙ্গে এবং 'ক্ষমা করে দেয়' (হুম ইয়াগ্ফিরূন) এর 'হুম' সর্বনাম এটাই প্রমাণ করে যে, রাগের সময়েও তারা অপরাধীকে মাফ করে দেওয়ার মতো মানুষ। আর 'প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়' অর্থ প্রভুপ্রতিপালকের আদেশানুসারে চলে। 'আমরুহু শূরা বাইনাহুম' অর্থ নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে। অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে তারা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করে না। করে সুহৃদ-স্বজনদের পরামর্শক্রমে। একথা বলাই বাহুল্য যে, যে বিশ্বাসী ব্যক্তি তার সমবিশ্বাসী বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শক্রমে চলে, সে লাভ করে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। আর বিশ্বাসী ভ্রাতাকে শুভপরামর্শ দান এবং অপসিদ্ধান্ত থেকে বাধা প্রদান বিশ্বাসীগণেরই বৈশিষ্ট্য। রসুল স. বলেছেন, শুভপরামর্শপ্রদানকারীরা বিশ্বাসভাজন। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম, হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে মাজা এবং জননী উম্মে সালমা থেকে তিরমিজি।

তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আলী বলেছেন, যার কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হয়, সে বিশ্বাসভাজন। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভ্রাতাকে সেই পরামর্শ দিয়ো, যা তোমার নিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো, সেরকম পরামর্শই দিয়ো অন্যকে।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩

❑ এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

❑ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে। আল্লাহ্ যালিমদিগকে পসন্দ করেন না।

❑ তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না;

❑ কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়, উহাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়, উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা অত্যাচারিত তারা ইচ্ছা করলে অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। আর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে যদি তারা অভিযুক্ত অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে তা আরো উত্তম। তার এমতো উদারতার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে। এজন্য আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে পুরস্কৃত করবেন। তবে একথাও ঠিক যে, আল্লাহ্ অত্যাচারীকে পছন্দ করেন না।

ইবনে জায়েদ বলেছেন, বিশ্বাসীরা হয় দু'রকম স্বভাবের। একদল অত্যাচারের বদলা না নেওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারেন না। আর এক দল বদলা না নিয়ে তার অধিকার হরণকারীকে মার্জনা করে দেন। এখানে 'যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে' বলে বলা হয়েছে প্রথম দলভূতদের কথা।

ইব্রাহিম বলেছেন, এধরনের বিশ্বাসীরা অপমানকে সহ্য করেন না। অপমানিত হওয়া তাদের কাছে খুবই অপ্রীতিকর। কিন্তু তাঁরা যদি তাঁদের অধিকার খর্বকারী অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান হন, তবে অভিযুক্তদেরকে উপেক্ষা করেন এবং ক্ষমাও করে দেন। আতা বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে ওই সকল বিশ্বাসীদের কথা, যাদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিলো কেবল একথা বলার জন্য যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই'। মক্কাবিজয়ের পর তাঁরা তাদের প্রতি অত্যাচারকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।

বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাক এখানে উত্তম-অত্যুত্তম সকল প্রকার ইমানদারগণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ এবং ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম। তাই এতে করে একথা বলা যেতে পারে না যে, এখানে দু'রকম কথা বলা হলো কেনো? আর 'যে ক্ষমা করে দেয়' কথাটি এখানে একথাই প্রমাণ করে যে, তারা প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধীকে ক্ষমা করে দেন। নতুবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমার তো কোনো মূল্যই নেই। আবার 'প্রতিশোধ গ্রহণ করে' কথাটিও একথা প্রমাণ করে, তাদের ক্ষমতা অত্যাচারীদের সমকক্ষ। তৎসত্ত্বেও তারা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সুতরাং বুঝতে হবে দু'টো গুণই প্রশংসনীয়। ক্ষমা করা নিঃসন্দেহে অত্যুত্তম। কিন্তু সমকক্ষদের প্রতি যুদ্ধ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করাও অনুত্তম নয়। বরং তা প্রশংসনীয়। কেননা এমতাবস্থায় ক্ষমা করলে তাদের সাহস যাবে বেড়ে এবং আবারো তারা ঘটাবে অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি।

আমি বলি, অত্যাচারী যদি আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন করে এবং আল্লাহ্-অভিমুখী হওয়ার কারণে অত্যাচার চালায়, তবে তাদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করাই উত্তম। বরং এমতাবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ হবে অত্যাবশ্যক, যাতে করে এরকম অত্যাচারের দরোজা হয়ে যেতে পারে রুদ্ধ। আর যদি সে অত্যাচার করে ব্যক্তিগত কোনো কারণে, তবে এমতোক্ষেত্রে সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ। কিন্তু ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম। কেননা অশুভকে শুভ দ্বারা প্রতিহত করা সর্বোৎকৃষ্ট।

‘মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ’— এরকম বলা হয়েছে কেবল বাহ্যিক সাযুজ্যের কারণে। অথবা প্রতিশোধ গ্রহণকে এজন্যে ‘মন্দ’ বলা যেতে পারে যে, বিষয়টি অপরাধীর কাছে অনভিপ্রেত। কিংবা বলা যেতে পারে, প্রতিশোধ গ্রহণ মন্দ, ক্ষমা করার চেয়ে।

ইবনে আউন বর্ণনা করেছেন, আমি একবার আলী ইবনে জায়েদ ইবনে জারআনকে জিজ্ঞেস করলাম ‘মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ’ এই আয়াতের অর্থ কী? তিনি বললেন, তাহলে একটি ঘটনা শোনো। ঘটনাটি আমি শুনেছি আমার সৎমা উম্মে মোহাম্মদের কাছ থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, একদিন জাহাশের কন্যা জয়নাব আমার কাছে বসেছিলেন। এমন সময় গৃহে প্রবেশ করলেন রসুল স.। তিনি একটা কিছু করতে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে

ইশারায় জয়নাবের উপস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি স. সংযত হলেন। জয়নাব তখন আমাকে বললেন, তুমি খুব অলস। তিনি স. তাঁকে চুপ থাকতে বললেন। কিন্তু তিনি থামলেন না। রসুল স. আমাকে বললেন, তুমিও তাকে ভালো-মন্দ কিছু বলো। তখন আমি জয়নাবকে বললাম, তুমিও অলস। এরপর জয়নাব উঠে চলে গেলেন ফাতেমাদের বাড়িতে। তাকে বললেন, আয়েশা আমাকে অলস বলেছে। এরপর ফাতেমা এলো রসুল স. এর নিকট। অভিযোগ পেশ করলো আমার বিরুদ্ধে। রসুল স. বললেন, ফাতেমা! আয়েশা যে তোমার পিতার প্রিয়পাত্রী। ফাতেমা ফিরে গেলো তার বাড়িতে। আলীর নিকট খুলে বললো গোটা বৃত্তান্ত। এরপর আলী এলো রসুল স. এর নিকট। তাঁর সাথে মতবিনিময় করলো এ ব্যাপারে। আবু দাউদ এরকম বর্ণনা করেছেন।

মুকাতিল বলেছেন, ‘মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ’ অর্থ খুনের বদলা খুন। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেছেন, এখানে ‘প্রতিশোধ’ অর্থ মন্দ কথার মন্দ প্রত্যুত্তর। যেমন কেউ বললো, আল্লাহ্ তোমাকে অপমানিত করুন। সম্বোধিত ব্যক্তি জবাব দিলো, আল্লাহ্ অপমানিত করুন তোমাকেও। অর্থাৎ গালিগালাজের প্রতিফল হচ্ছে অনুরূপ গালিগালাজ।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত আবু বকরকে নিয়ে একস্থানে বসেছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে আবু বকরকে গালি দিলো। তিনি কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। রসুল স. মৃদু হাসলেন। লোকটি পুনরায় আরো বেশী খারাপ ভাষায় আবু বকরকে গালি দিলো। এবার আবু বকরও কিছুটা উত্তেজিত হয়ে তার কথার প্রত্যুত্তর করলেন। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তার কথার প্রত্যুত্তর করলাম বলে কি আপনি অতুষ্ট? উঠে পড়লেন যে। তিনি স. বললেন, তার গালির প্রত্যুত্তর দিচ্ছিলো একজন ফেরেশতা। কিন্তু তুমি প্রত্যুত্তর করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হলো শয়তান। এখন শয়তানের সঙ্গে আমি বসি কী করে? তিনটি কথা মনে রেখো— ১. অত্যাচারিত কেউ যদি তার প্রতি অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয় তবে আল্লাহ্ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন এবং তাকে সাহায্য করেন ২. যে অন্যের সাহায্যার্থে দানের দরোজা উন্মুক্ত করে, আল্লাহ্ বাড়িয়ে দেন তার সম্পদ ৩. ধনার্জনের আশায় যে অন্যের কাছে প্রার্থী হয়, আল্লাহ্ কমিয়ে দেন তার সম্পদ।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, আমি একবার সুফিয়ান সওরীকে জিজ্ঞেস করলাম ‘মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ’ কথাটির অর্থ কি এই যে, কেউ গালি দিলে তাকে অনুরূপ গালি দিতে হবে? অথবা কেউ মন্দ আচরণ করলে তার প্রতি প্রদর্শন করতে হবে অনুরূপ মন্দ আচরণ? তিনি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। এরপর আমি গেলাম হিশাম ইবনে হুজায়েরের কাছে। তিনি আমার কথা শুনে বললেন, না, তুমি যেমন বলছো সেরকম নয়। বরং কথাটির অর্থ— কেউ তোমাকে আহত করলে তুমিও তাকে অনুরূপ আহত করতে পারবে। গালিগালাজের কথা এখানে বলা হয়নি। হিশামের একথার সমর্থন রয়েছে হাদিস

শরীফেও। যেমন— রসুল স. একবার দু'জন লোককে কুৎসিৎ কথা বলে বচসা করতে দেখে বললেন, লোকদু'টো শয়তান। তাই অনর্থক বাজে কথা বলে চলেছে। আহমদ এবং বোখারী আয়াজ ইবনে হেমার সূত্রে।

রসুল স. এরকমও বলেছেন যে, অধিক পরিমাণ অভিশাপ প্রদানকারী মহাবিচারের দিবসে সাক্ষ্য দিতে পারবে না, আর তাদের সুপারিশ কবুলও করা হবে না। আরো বলেছেন, গালিগালাজে লিপ্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে সেই ব্যক্তিই প্রধান অপরাধী, যে প্রথমে গালি দিতে শুরু করে। প্রতিশোধ গ্রহণকারী সীমালংঘন করলে হয়ে যায় মুখ্য অপরাধী। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ, মুসলিম ও আবু দাউদ।

‘ফামান আ'ফা ওয়া আস্লাহা’ অর্থ ‘ক্ষমা করে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে’। আর ‘ফাআজ্রুহূ আ'লাল্লহ্’ অর্থ তার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন। যদিও তিনি সকল প্রকার বাধ্যতা ও ঔচিত্য থেকে পবিত্র।

বাগবী লিখেছেন, হাসান বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, আল্লাহ্র কাছে যাদের পুরস্কার জমা আছে, তারা দাঁড়িয়ে যাও। এ ঘোষণার পর দাঁড়াবে কেবল তারাই, যারা তাদের প্রতি অত্যাচারকারীকে ক্ষমা করেছিলো।

একথা বলার পর তিনি পাঠ করতেন 'আল্লাহ্ জালেমদেরকে পছন্দ করেন না'। অর্থাৎ যারা গালির সূচনা করে কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে, তারা আল্লাহ্র পছন্দের পাত্র নয়। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একথার অর্থ— যারা জুলুমের সূচনা করে, তাদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

এরপরের আয়াতে (৪১) বলা হয়েছে— 'তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না'। একথার অর্থ— অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি তার প্রতি অত্যাচারের সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়, তবে তাকে মন্দ যেমন বলা যাবে না, তেমনি কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যাবে না তার বিরুদ্ধে। আর এর জন্য তাকে কোনো জবাবদিহিও করতে হবে না।

এরপরের আয়াতে (৪২) বলা হয়েছে— 'কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, যারা মানুষের উপরে অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'। একথার অর্থ— ইহকালের ভর্ৎসনা, জাবাবহিদি, বিরুদ্ধব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরকালের শাস্তিযোগ্য হওয়ার কথা তো কেবল বলা যেতে পারবে তাদের সম্পর্কে, যারা মানুষের জানমালের ক্ষতি করে এবং প্রদর্শন করে অনর্থক ঔদ্ধত্য। তাদের জন্যই পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এখানে 'ইয়াবৃগুণ' অর্থ বিদ্রোহাচরণ করে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে, জুলুম করে, সত্য থেকে দূরে চলে যায়। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'বাগা' হচ্ছে অতীতকালবোধক এবং 'ইয়াব্গি' বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল-জ্ঞাপক ক্রিয়াপদ। আর 'বাগ্ইয়ুন' হচ্ছে মূল শব্দ।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, তা তো হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ'। একথার অর্থ— অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দিলে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ধৈর্য অবলম্বন করলে তা হবে অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক কাজ। মহৎ মানুষেরা এরকমই করে থাকেন। কেননা ধর্মে এরকম আচরণই অধিকতর বাঞ্ছিত।

জুজায বলেছেন, ধৈর্যধারণকারীকে সওয়াব দেওয়া হবে এবং সওয়াব প্রাপ্তিই হচ্ছে পরিপূর্ণ প্রাপ্তি। মুকাতিল বলেছেন, এটা সেই সকল কাজের অন্তর্গত, যে সকল কাজের জন্য আল্লাহ্ আদেশ প্রদান করেছেন।

সূরা শূরা ঃ আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

❑ আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তাহার জন্য কোন অভিভাবক নাই। যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তুমি উহাদিগকে বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?'

❑ তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে; তাহারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাইতেছে। মু'মিনরা কিয়ামতের দিন বলিবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।' জানিয়া রাখ, যালিমরা অবশ্যই ভোগ করিবে স্থায়ী শাস্তি।

❑ আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উহাদের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার কোন গতি নাই।

❑ তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সেই দিবস আসিবার পূর্বে, যাহা অপ্রতিরোধ্য; যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না।

❑ উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তোমাকে তো আমি ইহাদের রক্ষক করিয়া পাঠাই নাই। তোমার কাজ তো কেবল বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন উহাদের কৃতকর্মের জন্য উহাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন,

❑ অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! শুনে রাখুন, আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার পথভ্রষ্ট হওয়া সুনিশ্চিত। এরকম লোক তখন আর এমন অভিভাবক, সুহৃদ বা পথপ্রদর্শক খুঁজে পায় না, যে তাকে আখেরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। এদের পৃথিবীর জীবনও হয় বিপর্যস্ত। এরাই সীমালংঘনকারী। পরকালে এরা যখন অনিবার্য শাস্তির সম্মুখীন হবে, তখন ভয়ে-আতংকে আঁতকে উঠে বলবে, এখন পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় আছে কী? সেখানে যেতে পারলে আমরা আর ভুল করবো না।

এখানে 'লাম্মা রআউল আ'জাব' অর্থ যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। ওই শাস্তি অবধারিত। তাই ভবিষ্যতের ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সুনিশ্চিতার্থক অতীতকালের ক্রিয়া। আর 'উপায় আছে কী' প্রশ্নবোধক হলেও এটা হবে তাদের মিনতি অর্থাৎ একথা বলে তারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের আবেদন জানাবে।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে; তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাচ্ছে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তখন আরো দেখবেন, তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের লেলিহান আগুনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় অবনত মস্তকে আধবোঁজা চোখে তাকাচ্ছে।

এখানে 'মিন ত্বরফিন খফিয়্যি' অর্থ অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাবে, গোপনে বা চোরাদৃষ্টিতে দেখবে, যে ভাবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকায় জল্লাদের তলোয়ারের দিকে। কারো কারো মতে এখানকার 'মিন' প্রারম্ভিক এবং 'বা' নৈমিত্তিক অর্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'মুমিনরা কিয়ামতের দিন বলবে, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে'। বিশ্বাসীরা তখন অবিশ্বাসী ও অংশীবাদীদের এরকম দুরবস্থা দেখে বলবে, আমরা আগেই বলেছিলাম, সত্যপ্রত্যাখ্যানের শাস্তি অনিবার্য। এখন দেখলে তো। এখন তো এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তির উপায় এদের নেই। আর এদের নেতারা এখন তাদের অনুসারীদের চেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তারাই ছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী জনগোষ্ঠীর পুরোধা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অর্থ জান্নাতের সুন্দরী হুরীদেরকে হারানো, ইমান আনলে তারা যাদেরকে পেতো।

এরপর বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো, জালেমরা অবশ্যই ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি'। কথাটি বিশ্বাসীদের বক্তব্যের শেষাংশও হতে পারে, আবার এমনও হতে পারে যে, কথাটি আল্লাহ্র, যা তিনি বলেছেন বিশ্বাসীদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের সত্যয়নার্থে।

এরপরের আয়াতে (৪৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ ব্যতীত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোনো গতি নেই'। একথার অর্থ— ওই অনিবার্য জাহান্নামযাত্রা ঠেকাতে পারে, এরকম কোনো সাহায্যদাতা অভিভাবক তাদের তখন থাকবেই না। তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানে কল্যাণচ্যুত।

এরপরের আয়াতে (৪৭) বলা হয়েছে— 'তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেই দিবস আসবার পূর্বে, যা অপ্রতিরোধ্য; যেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য তা নিরোধ করবার কেউ থাকবে না'। এ কথার অর্থ— হে মানুষ! এখনো সময় আছে, সাবধান হও। তোমাদের প্রভুপ্রতিপালক তাঁর রসুলের মাধ্যমে যে ধর্মমতের দিকে তোমাদেরকে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন, সেই মহা কল্যাণকর ধর্মমতকে গ্রহণ করো, অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু অথবা মহাপ্রলয় আগমনের পূর্বেই। যদি এরকম না করো, তবে মহাবিচারের দিবসে তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তখন তোমাদের উপরে আপতিত শাস্তি প্রতিহত করার সাধ্যও কারো হবে না।

এখানে 'লা মারাদ্দা লাহু মিনাল্লা'হ্ অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফিরাতে পারবে না কেউ। অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন সেই দিবস আগমনের আদেশ দিবেন, তখন সে আদেশ আর ফিরিয়ে নিবেন না। এই অর্থে 'মিনাল্লহ্' কথাটি সম্পর্কযুক্ত হবে 'লা মারাদ্দা' এর সঙ্গে। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'ইয়াতী' এর সঙ্গে। যদি তাই হয় তবে, বক্তব্যটি দাঁড়াবে— সে দিন যখন আসবে, তখন তাকে আর ফিরিয়ে রাখা হবে না। 'দিবস' অর্থ এখানে মৃত্যুলগ্ন, অথবা মহাপ্রলয়কাল। 'মালজ্বা' অর্থ আশ্রয়স্থল। আর 'মা লাকুম মিন নাকীর' অর্থ নিরোধ করবার কেউ থাকবে না। অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে তখন কেউই থাকবে না। এমনকি তোমাদের বিরুদ্ধে সেদিন সাক্ষ্য দিবে তোমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গও (আমল লেখকেরাও সাক্ষ্যদাতা হবে তোমাদের অপকর্মসমূহের)।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমাকে তো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজ তো কেবল বাণী পৌঁছে দেওয়া'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে যদি তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, তবে তাদেরকে তা-ই করতে দিন। আর এ জন্য আপনার মনোকষ্ট পাওয়ারও কোনো কারণ নেই। কেননা আমি আপনাকে তাদের জন্য এমতো রক্ষক নিযুক্ত করিনি যে, আপনাকে তাদের ঔদ্ধত্য অবজ্ঞার বিচার-

বিশ্লেষণ করতে হবে, অথবা করতে হবে জবাবদিহি। আপনার কর্তব্য কেবল আমার বাণী পৌঁছে দেওয়া। আর সে কাজ তো আপনি করেই চলেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ-আপদ ঘটে, তখন মানুষ হয়ে পড়ে অকৃতজ্ঞ'।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'অনুগ্রহ' অর্থ ধন-সম্পদ, সুস্বাস্থ্য। আর 'বিপদ-আপদ' অর্থ দুর্ভিক্ষ, অভাব, অসুখ-বিসুখ।

'বিমা ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম' অর্থ স্বহস্তার্জিত কৃতকর্ম। মানুষ অধিকাংশ কাজ হাত দ্বারাই করে, তাই তাদের কৃতকর্মকে এখানে বলা হয়েছে 'ক্বদ্দামাত্ আইদীহিম' (স্বহস্তার্জিত)। আর 'কাফুর' অর্থ অকৃতজ্ঞ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— অধিকাংশ মানুষের স্বভাব এই যে, আল্লাহ্ তাদেরকে বিত্ত-স্বাস্থ্য-সম্মান ইত্যাদির উপকরণ আস্বাদন করালে তারা হয়ে পড়ে গর্বোৎফুল্ল। আবার তাদের অপকর্মের কারণে তাদের উপর অভাব-দারিদ্র-অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি নেমে এলে তারা হয়ে যায় ধৈর্যহারা, অকৃতজ্ঞ।

'ইজা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সুপ্রমাণিত বিষয়ে। এখানেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থেই। আল্লাহ্র সত্তাগত অনুগ্রহ এটাই দাবি করে যে, তাঁর বান্দারা তাঁর প্রদত্ত অনুকম্পা আস্বাদন করুক। সেকারণেই এখানে 'আজাক্বনা' (আস্বাদন করাই) কথাটির পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইজা'। কিন্তু বিপদাপদের আগমন যেহেতু তাঁর অনুগ্রহের দাবি নয়, এবং এটাও তাঁর বিধান নয় যে, মানুষ অহেতুক বিপদ-মুসিবতে জাড়িয়ে পড়ুক, তাই এখানকার 'তুসিব্হুম' এর পূর্বে বসেছে সন্দিগ্ধসূচক 'ইন্'(যদি, যখন)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ের (৪৯, ৫০) মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় অধিপতি। তাঁর অভিপ্রায় সতত স্বাধীন। তাই তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সৃজন করেন। ইচ্ছামতো কাউকে দান করেন কন্যা, কাউকে দান করেন পুত্র, আবার কাউকে দান করেন কন্যা-পুত্র উভয়ই। কাউকে আবার করেন বন্ধ্যা। ফলে তারা হয় সন্তানহীন। এরকম করতে পারেন তিনি একারণেও যে, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন' এবং 'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন' বাক্য দু'টো সমার্থক। কোনো কোনো আলেম আবার বলেছেন, এখানে 'পুত্রে'র পূর্বে এসেছে 'কন্যা'র কথা। সুতরাং বলতেই হয় যে, ওই রমণীরা বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী, যদি তাদের প্রথম সন্তান হয় কন্যা।

বাগবী লিখেছেন, ইহুদীরা একবার রসুল স.কে বললো, নবী মুসা তো আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। আপনি দাবি করেছেন, আপনিও নবী। তাহলে আপনি আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না কেনো? কেনোই বা তাঁকে দেখতে পান না? তাদের এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াত। বলা হলো—

সূরা শূরা ঃ আয়াত ৫১, ৫২, ৫৩

❑ মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ্ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

❑ এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ—

❑ সেই আল্লাহ্র পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার মালিক। জানিয়া রাখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্র বক্তব্যগুণ (সিফাতুল কালাম) এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার মতো যোগ্যতা মানুষের নেই। তাই মানুষের মধ্যে যাঁরা নবী, তাদেরকে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দেওয়া হয় প্রত্যাদেশের মাধ্যমে, অথবা পর্দার অন্তরালের মাধ্যমে কিংবা প্রত্যাদেশবাহী ফেরেশতার মাধ্যমে। ওই ফেরেশতারা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ব্যক্ত করেন কেবল সেই বাণীটুকুই, যা তাঁর অভিপ্রায়ানুকূল।

এখানে **'ওয়া মা কানা লিবাশারিন আঁইয়্যুকাল্লিমা হুল্লহ'** অর্থ মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সঙ্গে কথা বলবেন। আর **'ইল্লা ওয়াহ্ইয়া'** অর্থ প্রত্যাদেশ ব্যতিরেকে। আভিধানিক অর্থে **'ওহী'** বা **'প্রত্যাদেশ'** অর্থ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইঙ্গিত করা। এখানে উদ্দেশ্য, সেই অন্তরালবর্তী অখণ্ড বাক্য (সিফাতুল কালাম) যা অক্ষরনির্ভর নয়, অথবা যা অক্ষরাতীত। এধরনের আনুরূপ্যবিহীন বক্তব্য জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় নবী-রসুলগণের অন্তরে প্রক্ষেপ করা হয়। আর এটাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি প্রক্ষিপ্ত প্রত্যাদেশ। এই প্রত্যাদেশ আবার দুই প্রকার— ১. সামনাসামনি, যেমন বিবরণ রয়েছে মেরাজ বিষয়ক হাদিসে। পরকালে আল্লাহ্ দর্শনের কথাও ওই হাদিসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। ২. অদৃশ্য আওয়াজ শ্রুত হওয়া, যেমন হজরত মুসা শুনতে পেয়েছিলেন তুর পর্বতের উপত্যকায়। কিন্তু এখানে **'পর্দার অন্তরালে'**র কথা পরে উল্লেখিত হওয়ায় প্রথমোক্ত **'ওহী'**র অর্থ হবে প্রথম প্রকারের, অর্থাৎ সামনাসামনি এবং **'পর্দার অন্তরাল'** হবে দ্বিতীয় প্রকারের। তবে এমতো ব্যাখ্যাকে মান্য করলে **'পৃথিবীতে আল্লাহ দর্শন অসম্ভব'** একথা প্রমাণ করা যায় না। বরং আয়াতখানি আল্লাহ্ দর্শন সম্ভব হওয়ার অনুকূলে।

আমি বলি, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বাগবী যা লিখেছেন, তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যাদেশকালে পৃথিবীতে আল্লাহ্ দর্শন সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় এখানকার **'ওহী'**র অর্থ হবে হৃদয়াভ্যন্তরে অবিমিশ্রমূল বক্তব্যের উল্লেখ এবং **'পর্দার অন্তরাল'** এর অর্থ হবে ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় বা মাধ্যম এবং দর্শন ব্যতীত শুনতে পাওয়ার মতো বাণী, যেমন হজরত মুসা শুনতে পেয়েছিলেন তুর পাহাড়ের তুয়া উপত্যকায়।

'দূত প্রেরণ করেন' অর্থ প্রেরণ করেন ফেরেশতা, হজরত জিবরাইল, অথবা অন্য কেউ। আর এখানকার **'ফাইউহা বিইজ্নিহী মাইঁইয়াশাউ'** অর্থ তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান, তা ব্যক্ত করেন। নাফে'র ক্বেরাতে এসেছে দু'ধরনের প্রত্যাদেশের কথা— ফেরেশতার মাধ্যমে এবং ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়া।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, হারেছ ইবনে হিশাম একবার রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আপনার কাছে প্রত্যাদেশ আসে কীভাবে? তিনি স. বললেন, কখনো কখনো আসে ঘণ্টার ঝনঝন ধ্বনি সহযোগে। এধরনের প্রত্যাদেশ আমার জন্য বড়ই কষ্টদায়ক। কষ্টদায়ক অবস্থা শেষ হলে

আমার স্মৃতিপটে প্রতিভাত হয় সদ্য অবতীর্ণ বাণী। আবার কখনো কখনো আমার কাছে প্রত্যাদেশ আনে ফেরেশতা এবং সে যা বলে তা আমার স্মরণে থাকে স্পষ্টভাবে। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, একবার আমি দেখলাম, রসুল স. এর উপরে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর প্রত্যাদেশের প্রভাব কেটে গেলো। তখন ছিলো প্রচণ্ড শীত। তৎসত্ত্বেও আমি দেখলাম, তাঁর পবিত্র ললাট থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছে। বোখারী, মুসলিম।

হজরত উবাদা ইবনে সামেত বলেছেন, রসুল স. এর উপরে যখন প্রত্যাদেশ শুরু হতো, তখন তাঁর চেহারা হয়ে যেতো ফিকে। মুসলিম। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবুয়ত প্রাপ্তির পর রসুল স. মক্কায় অবস্থান করে ছিলেন পনেরো বৎসর। প্রথম সাত বৎসর তিনি আওয়াজ শুনতে পেতেন। আলোও দৃষ্টিগোচর হতো, কিন্তু কোনোকিছু দেখা যেতো না। অবশিষ্ট আট বছর প্রত্যাদেশ আসতো। এর পর তিনি স. মদীনায় চলে যান এবং সেখানে অবস্থান করেন দশ বৎসর। মহাতিরোধানের সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো পঁয়ষট্টি বৎসর। বোখারী, মুসলিম।

জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. এর প্রতি প্রত্যাদেশ সূচিত হয়েছিলো শুভস্বপ্নের মাধ্যমে। তখন তিনি শায়িত অবস্থায় স্বপ্নদর্শন করতেন। বোখারী, মুসলিম।

'ইন্নাহু আ'লিয়্যুন হাকীম' অর্থ তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ সৃজিতদের বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে তিনি বহু বহু উর্ধ্বে এবং তাঁর আনুরূপ্যহীন বিজ্ঞতা যে রকম দাবি রাখে, তিনি সেরকম প্রজ্ঞাধিকারী। তাঁর প্রজ্ঞার দাবি অনুসারেই তিনি তাঁর অভিপ্রায় পূরণ করতেন। কখনো বাণীর মাধ্যমে, কখনো মাধ্যম বিহনে।

পরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— **'এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ, তুমি তো জানতে না কিতাব কী এবং ইমান কী'!** একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যেভাবে আমি আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, সেভাবেই এখন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আপনাকে জানাচ্ছি আমার আদেশাবলী। এমতো প্রত্যাদেশের পূর্বে কিতাব কী জিনিস আপনি তা জানতেন না। একথাও জানতেন না যে, প্রকৃত বিশ্বাস কাকে বলে।

কালাবী ও মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ কিতাব, কোরআন মজীদ। সুদ্দী বলেছেন, দেহ যেমন আত্মানির্ভর, হৃদয়ের সজীবতাও তেমনি কোরআননির্ভর। অর্থাৎ কোরআন আত্মাকে প্রাণবন্ত করে। সেকারণেই কোরআনকে বলা হয় রূহ। রবী ইবনে আনাস বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ জিবরাইল এবং 'আওহাইনা' অর্থ 'আর্সালনা' (আমি প্রেরণ করেছি)। অর্থাৎ আমি প্রেরণ করেছি জিবরাইলকে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'রূহ' অর্থ নবুয়ত। হাসান বলেছেন, এর অর্থ অনুগ্রহ। এই উভয় অর্থের উদ্দেশ্য আবার 'কোরআন' ও হয়। অর্থাৎ কোরআন হচ্ছে নবুয়ত ও রহমতের নিদর্শন।

'মিন্ আমরিনা' অর্থ আমার নির্দেশ। অর্থাৎ রূহ প্রেরিত হয় আমার নির্দেশানুসারেই। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— 'রূহ' হচ্ছে আমাদের নির্দেশের ফল। 'মা কুনতা তাদ্রী' অর্থ আপনি জানতেন না। 'মালকিতাব' অর্থ কিতাব কী এবং 'ওয়ালাল্ ঈমান' অর্থ ইমান কী? অর্থাৎ ধর্মের ওই সকল বিধিবিধান সম্পর্কে আপনি জানতেন না, যা বুদ্ধির অতীত। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেছেন, এখানে 'ইমান' অর্থ নামাজ। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'মা কানাল্লহু লিইযুদ্বিআ' ঈমানাকুম' (আল্লাহ্ এরকম নন যে, তিনি তোমার নামাজসমূহকে নিষ্ফল করে দিবেন)। এমতো ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিদ্বানগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নবীগণের ইমান অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত, প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত। আত্মিক প্রক্ষেপণ বা ইলহামের মাধ্যমে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, সমগ্র সৃষ্টির সৃজয়িতা একজন। তিনি সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র এবং সর্বগুণে গুণান্বিত।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন বলেছেন, প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পূর্বে রসুল স. ইবাদত করতেন হজরত ইবরাহিমের ধর্মমতানুসারে। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। কেননা অভিমতটির পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। রসুল স. ছিলেন অক্ষরের অমুখাপেক্ষী, তাই তিনি কোনো কিতাব পাঠ করেননি। আর তার পারিপার্শ্বিকতা ছিলো পৌত্তলিকতাদুষ্ট। এমতাবস্থায় হজরত ইবরাহিমের ধর্ম সম্পর্কে তিনি কীভাবে জানতে পারবেন। সুতরাং একমাত্র প্রত্যাদেশই ছিলো ধর্মীয় বিধানাদি প্রাপ্তির উপায়। তবে একথা সত্যি যে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পূর্বে তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন। আর আমি মনে করি প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির পূর্বে তিনি পরিপূর্ণ মুমিনও ছিলেন। ইমানের মূল তত্ত্বের উপরে তিনি প্রতিষ্ঠিতও ছিলেন। কিন্তু তিনি একথা তখন বুঝতে পারেননি যে, হৃদয়ের এমতো বিশ্বাসের নাম ইমান। বুঝলেন তখন, যখন অবতীর্ণ হতে শুরু করলো প্রত্যাদেশ।

এরপর বলা হয়েছে— 'পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি, তুমি তো পথনির্দেশ করো কেবল সরল পথ—'

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'নূর' বা 'আলো' অর্থ 'বিশ্বাসের আলো'। সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'একে' অর্থ এই কোরআনকে। অর্থাৎ আমি এই কোরআনকে করেছি আলো, যা অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলো ফোটায়। 'যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি' অর্থ যে কোরআন দ্বারা আমি আমার সেবকগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পরিশুদ্ধ ধর্মমতের দিকে চালিত করি। ফলে তারা হতে পারে আমার নৈকট্যভাজন এবং যোগ্য হয় জান্নাতের। 'তুমি তো প্রদর্শন করো কেবল সরল পথ' অর্থ হে আমার রসুল! আপনি তো কেবল সকল মানুষকে সোজা পথে চলবার জন্য উপদেশ দিয়ে চলেছেন। অর্থাৎ প্রচার করে চলেছেন সরল পথের শিক্ষা, যার নাম ইসলাম, যে ইসলাম পৌঁছে দেয় জান্নাতে'। এখানে 'হেদায়েত' অর্থ পথ দেখানো।

শেষোক্ত আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'সেই আল্লাহ্র পথ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার মালিক'। একথার অর্থ— এই ইসলাম হচ্ছে সেই মহান আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ও প্রবর্তিত, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর এক ও অংশীবিহীন অধিকর্তা। অর্থাৎ সকলে ও সকল কিছুই যাঁর অধিকারায়ত্ত।

এরপর বলা হয়েছে— 'জেনে রাখো, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে'। একথার অর্থ— সকলকেই একদিন আপনাপন কর্মফলের জবাবদিহির জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হতেই হবে। আর তখন তিনি সকলের জন্য নির্ধারণ করবেন যথোপযুক্ত প্রতিফল— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। বাক্যটিতে যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য শুভসমাচার এবং অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির ভীতি। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অধিক অবহিত।

আলহামদুলিল্লাহ্! সুরা 'শূরার' তাফসীর শেষ হলো আজ ১৩ই রবিউল আউয়াল শনিবার আসরের সময়ে, ১২০৮ হিজরী সনে। ওয়াসল্লাল্লহু তায়ালা আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মায়ীন। আমিন।

সূরা যুখ্রুফ

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। এর রুকুর সংখ্যা ৭ এবং আয়াতের সংখ্যা ৮৯।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

❑ হা-মীম।

❑ শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের;

❑ আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

❑ ইহা তো রহিয়াছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে; ইহা মহান, জ্ঞানগর্ভ।

❑ আমি কি তোমাদিগ হইতে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করিয়া লইব এই কারণে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?

❑ পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করিয়াছিলাম।

❑ এবং যখনই উহাদের নিকট কোন নবী আসিয়াছে উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।

❑ যাহারা ইহাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম; আর এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের'। এখানে 'সুস্পষ্ট কিতাব' অর্থ কোরআন মজীদ। কেননা কোরআন সত্য পথের সন্ধান দেয় এবং সে পথচিহ্নকে করে সুপরিস্ফুট। আর কোরআনের অলৌকিকত্বের একমাত্র দাবি হচ্ছে কোরআনকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া এবং এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারা যে, এই কোরআনেই রয়েছে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ।

'ওয়াল কিতাব' এর 'ওয়াও' বর্ণটি এখানে শপথমূলক। আর 'হা-মীম'কে যদি সে শপথের মাধ্যম ধরা হয়, তবে বলতে হয়, 'ওয়াও' হচ্ছে এখানে সংযোজক এবং এর পরবর্তী অংশটুকু হচ্ছে শপথের জবাবমূলক।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— আমি এটা অবতীর্ণ করেছি, আরবী ভাষায় কোরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো'। প্রকৃত কোরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র বক্তব্য-গুণ (সিফাতুল কালাম), যা ভাষার অমুখাপেক্ষী, অসৃষ্ট, অনাদি, আনুরূপ্যবিহীন ও বোধগম্যতার অতীত। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হবে— অবতারিত কোরআনকে আমি দিয়েছি আরবী ভাষার রঙ, পোশাক বা প্রকাশ, যাতে তোমরা পাঠ করতে পারো এবং হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হও।

আল্লাহ্‌তায়ালা বিভিন্ন বিষয়ের শপথ করেছেন। অর্থাৎ সেগুলোকে বানিয়েছেন তাঁর আনুরূপ্যবিহীন এককত্বের স্বাক্ষ্য-প্রমাণ। আরবী ভাষার এই কোরআনের শপথও তিনি করেছেন। এটা এক অনন্যসাধারণ শপথ। কেননা শপথের মাধ্যমে (সুস্পষ্ট কোরআন) ও শপথকৃত বিষয় (আরবীতে কোরআন) এর মধ্যে এখানে জোরালো সম্পর্ক বিদ্যমান।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'এটা তো রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ।

এখানে 'উম্মুল কিতাব' অর্থ 'লওহে মাহফুজ। অন্য এক আয়াতে কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যেমন 'বাল হুয়া কুরআনুম মাজীদ ফী লাওহিম্‌ মাহফুজ' (বরং তা হলো এমন সম্মানিত কোরআন, যা সুসংরক্ষিত রয়েছে লওহে মাহফুজে)। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্‌ সবার আগে সৃষ্টি করেছেন কলম। তারপর তাকে নির্দেশ দিয়েছেন লিখতে, যা কিছু তিনি সৃষ্টি করতে চান।

'লাদাইনা' অর্থ আমার নিকট। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যেমন আনুরূপ্যবিহীন, তেমনি আনুরূপ্যহীন তাঁর নৈকট্যও। সুতরাং তা বোধাতীত, জ্ঞানাতীত ও কল্পনাতীত।

কোনো কোনো বিজ্ঞজন বলেছেন, এখানে 'লাদাইনা'র পূর্বে আর একটি শব্দ উহ্য রয়েছে 'মাহফুজান' (সংরক্ষিত)। অর্থাৎ কোরআন আমা কর্তৃক সুসংরক্ষিত বলে এর ভাব ও ভাষা সকল প্রকার পরিবর্তন, পরিযোজন ও পরিবিয়োজন থেকে মুক্ত।

'লাআ'লিয়্যুন' অর্থ এমন মহান ও মহামর্যাদাসম্পন্ন যে, জ্ঞান-বুদ্ধি তাকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা রাখে না। অথবা এখানে কথাটির উদ্দেশ্য, এই কোরআন পূর্ববর্তী আকাশাগত গ্রন্থাবলীর তুলনায় অধিকতর অজেয়। হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, আত্মিক উদ্ভাসনের (কাশফের) মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় যে, পূর্ববর্তী মহাগ্রন্থসমূহ যেনো বৃত্তের বিস্তৃতি, আর কোরআন হচ্ছে তার সুমহান কেন্দ্র। বলাই বাহুল্য যে, বিস্তারের মহিমা প্রকাশ করা সত্ত্বেও বৃত্ত তার কেন্দ্র অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন। যেমন চন্দ্র তার আলোকপরিমণ্ডল অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির দৃষ্ট হলেও আলোকিত পরিপার্শ্ব অপেক্ষা মহত্ব ও মাহাত্ম তারই অধিক। আর 'হাকীম' অর্থ বিজ্ঞতা ও নিপুণতায় পরিপূর্ণ, অথবা এমতো অক্ষয়, যা অন্য কোনো বাণী দ্বারা আর রহিত হবে না' অর্থাৎ কোরআনই হচ্ছে সর্বশেষ মহাগ্রন্থ।

এরপরের আয়াতে (৫)বলা হয়েছে— 'আমি কি তোমাদের থেকে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নিবো এ কারণে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ— না, উপর্যুপরি সীমালংঘন করে যাওয়া সত্ত্বেও আমি এই প্রত্যাদেশাবলী প্রত্যাহার করবো না।

'সফহান' হচ্ছে তাগিদপ্রদায়ক শব্দ। এর অর্থ পার্শ্বপরিবর্তন করা, মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, প্রত্যাহার করা।

'ইন্ কুনতুম ক্বওমাম্ মুস্‌রিফীন' অর্থ একারণে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? উল্লেখ্য, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সীমালংঘনের কারণে তাদের প্রতি বিমুখ না হওয়াই সমীচীন। কিন্তু এখানে অতিমাত্রায় কুফরী কাজে সীমালংঘন করাটাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করার কারণ স্থির করা হয়েছে। সেকারণেই প্রয়োগ করা হয়েছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক বাক্য। এমতাবস্থায় বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তোমরা কুফরীতে অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছো বলে কি আমি প্রত্যাদেশ প্রেরণ স্থগিত করবো? কোরআনের অবতরণপ্রবাহ বন্ধ করে দিবো? শুভ কাজের আদেশ দিবো না? অশুভ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবো না?

কাতাদার ব্যাখ্যা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, অংশীবাদীরা যখন কোরআনকে মানতে অস্বীকার করলো, তখন যদি কোরআন প্রত্যাহার করে নেওয়া হতো, তবে ধ্বংস হয়ে যেতো সকল মানুষ। আল্লাহ্ তাই এরকম করেননি। বরং তার অপার করুণাবশে বিশ বৎসরেরও অধিক সময় ধরে কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। মুজাহিদ ও সুদ্দী কথাটির অর্থ করেছেন এরকম— আমি তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবো, আর তোমরা পার পেয়ে যাবে— কী ভেবেছো তোমরা? যথোপযুক্ত শাস্তি দান ছাড়া তোমাদেরকে কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবো?

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করেছিলাম (৬) এবং যখনই তাদের নিকট কোনো নবী এসেছে, তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে (৭)। যারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিলো, তাদেরকে আমি ধ্বংস করে ছিলাম; আর এভাবে চলে এসেছে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত' (৮)। কথাগুলোর মাধ্যমে সান্ত্বনার বাণী শোনানো হয়েছে রসুল স.কে। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের পীড়াদায়ক আচরণ দর্শনে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। এটা তাদের চিরাচরিত রীতি। আপনাকে যেমন এরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে চলেছে, তেমনি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো পূর্ববর্তী যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। তারাও বিদ্রূপবানে জর্জরিত করতো আমা কর্তৃক প্রেরিত নবী-রসুলগণকে। আর তারা মক্কাবাসী সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চেয়েও ছিলো শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিকতর প্রবল। সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন। ধর্মপ্রচারের দায়িত্বপালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না। নিশ্চিত জানবেন, ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যেমন আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম, তেমনি আমার ইচ্ছামতো আমি এদেরকেও যে কোনো মুহূর্তে করবো পর্যুদস্ত। আর পূর্ববর্তী নবী-রসুলকে যেমন বিজয়ী করেছিলাম, তেমনি আপনাকেও দান করবো বিজয়।

'ওয়ামাদ্বা মাছালুল্ আউয়ালীন' অর্থ এভাবে চলে এসেছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত। বাক্যটির মাধ্যমে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যুগপৎ রসুল স. এর বিজয়ের শুভসংবাদ এবং তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়দের ধ্বংসের হুমকি। অর্থাৎ পূর্ববর্তী জামানায় যেমন নবী-রসুলগণ ও তাদের শত্রুদের বিজয় ও পরাজয়ের ঘটনা ঘটেছিলো, তেমনি ঘটবে রসুল স. ও তাঁর শত্রুদের ক্ষেত্রেও।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

❑ তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলি তো সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্',

❑ যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা এবং উহাতে করিয়াছেন তোমাদের চলিবার পথ, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাইতে পার;

❑ এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। অতঃপর আমি তদ্দ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে। এইভাবেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।

❑ আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আন'আম, যাহাতে তোমরা আরোহণ কর,

❑ যাহাতে তোমরা উহাদের পৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পার, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা উহার উপর স্থির হইয়া বস; এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি ইহাদিগকে আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগকে বশীভূত করিতে।

❑ 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব।'

❑ উহারা তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে তাঁহার অংশ সাব্যস্ত করিয়াছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি মক্কার মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কে, দেখবেন তারা নির্দ্বিধায় জবাব দিচ্ছে, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিধর আল্লাহ্। অথচ দেখুন, সেই আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে তারা পূজা-অর্চনা করে চলেছে তাদের প্রতিমাগুলোর। উল্লেখ্য, মক্কার মুশরিকেরা আল্লাহ্কেই সৃষ্টিকর্তা বলে জানতো, কিন্তু প্রতিমাপূজা করতো এই বিশ্বাসে যে, সেগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। অথচ এটা যে স্পষ্টতই অংশীবাদিতা, তা তারা স্বীকার করতে চাইতো না।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং এতে করেছেন তোমাদের চলবার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ইতো তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যাসদৃশ স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র, যাতে তোমাদের বসবাস হয় স্বস্তিদায়ক; এবং এখানে তিনি পথচারীদের জন্য রেখেছেন সুগম পথের ব্যবস্থা, যাতে তোমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারো সহজে। এখানে 'সুবুলান' অর্থ যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো, যে পথ নির্ভুল গন্তব্যাভিমুখী।

এরপরের আয়াতে (১১) বলা হয়েছে— 'এবং যিনি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন পরিমিতভাবে অতঃপর আমি তদ্দারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে। এভাবে তোমাদেরকে বের করা হবে'।

এখানে 'বিক্বদরিন' অর্থ পরিমিতভাবে। আর এখানকার 'বের করা হবে' অর্থ বের করা হবে কবর থেকে। অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবসে যখন হজরত ইসরাফিল শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন, তখন প্রত্যেককে জীবিত করে বের করা হবে তাদের আপনাপন কবর থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইস্রাফিলের প্রথম ও দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির মধ্যেকার ব্যবধান হবে চল্লিশ। হাদিসটি শুনে লোকেরা হজরত আবু হোরায়রাকে জিজ্ঞেস করলো, হে রসুল-সহচর! 'চল্লিশ' মানে কী চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি তা বলতে পারবো না। তারা পুনঃ জিজ্ঞেস করলো, তাহলে কী চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, তা-ও জানি না। তারা আবার বললো, তাহলে কী চল্লিশ বৎসর? তিনি জবাব দিলেন, সে কথা বলার ক্ষমতাও আমার নেই। তবে রসুল স. বলেছেন, ওই সময় আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। তার ফলে কবরবাসীরা তাদের নিজ নিজ কবরে এমনভাবে উত্থিত হতে থাকবে, যেমনভাবে মাটিতে উদ্গত হয়ে থাকে শাক-সবজী। কেবল একটি হাড় ছাড়া মানুষের শরীরের অন্যান্য অংশ বিলীন হয়ে যায়। ওই হাড় হচ্ছে মেরুদণ্ডের হাড়। ওই হাড়ের সঙ্গেই নতুন শরীরকে জোড়া দেওয়া হবে পুনরুত্থানকালে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম ও সাঈদ ইবনে যোবায়েরের মাধ্যমে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তখন আরশের তলদেশ থেকে বের হয়ে আসবে এক উত্তম মরুদ্যান, ফলে মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াবে সকল বিচরণশীল প্রাণী, যেভাবে তরুশ্রেণী উদগত হয় মৃত্তিকাপৃষ্ঠে। তারপর আত্মাসমূহকে আদেশ করা হবে, দৃষ্টির অগোচরে নিজ নিজ দেহে অভ্যন্তরস্থিত হও। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন 'হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! তুমি তোমার প্রতিপালনকর্তার দিকে ফিরে যাও পরিতুষ্ট ও পরিতোষভাজন হয়ে'।

হজরত আনাস থেকে আহমদ ও আবুল আলীয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুনরুত্থান পর্বে সকলকে কবর থেকে ওঠানো হবে এবং আকাশ থেকে তাদের উপর বর্ষিত হবে হালকা বৃষ্টি।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আনআ'ম যাতে তোমরা আরোহণ করো'। এখানে 'আযওয়াজ্বা' অর্থ যুগল সৃষ্টি। বিভিন্ন প্রজাতির জোড়া।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'যাতে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো, তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বসো এবং বলো, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে'।

'আ'লা জুহূরিহী' বাক্যে সর্বনামটি একবচন হলেও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনার্থে। কেননা সর্বনামটির সম্পৃক্তি রয়েছে এখানকার 'যার উপর তোমরা স্থির হয়ে বসো' কথাটির সঙ্গে। আর 'যার উপর' অর্থ ওই সকল জলযান ও ভারবাহী পশুসমূহের উপর। বাহন যেহেতু একাধিক, তাই সেগুলোর আরোহীও নিশ্চয় হবে একাধিক। সেজন্যেই এখানে 'জুহূরিহী' অর্থ 'এর' না হয়ে হবে 'এদের'। অনুবাদে অবশ্য সেরকমই করা হয়েছে।

'ছুম্মা তাজকুরূ' অর্থ অতঃপর স্মরণ করো। 'ওয়া তাক্বূলূ' অর্থ এবং বলো। অর্থাৎ মৌখিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলো। আর 'মুক্বরিনীন' অর্থ বশীভূত করে দিয়েছেন। 'আক্বরানা' অর্থ বশীভূত করে দেওয়া। এর আক্ষরিক অর্থ সঙ্গী করে নেওয়া এবং সঙ্গী হতে পারে সে, যে অবাধ্য নয়। উল্লেখ্য, যে বলবান, তাকে দুর্বলের সঙ্গী বানানো যায় না। অথচ দ্যাখো মানুষের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন পশুরাও মানুষের বশীভূত। নিঃসন্দেহে তাদেরকে আল্লাহ্ই বশীভূত করে দিয়েছেন।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো'।

পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পারো। অর্থাৎ স্থির হয়ে বসে গমন করতে পারো নির্ধারিত গন্তব্যে। এভাবে সেখানে পার্থিব যাত্রার কথা বলে এই আয়াতে বলা হয়েছে পরকালীন যাত্রার কথা, যে যাত্রা অনিবার্য। অর্থাৎ শেষ যাত্রা হচ্ছে আল্লাহ্র নিকটে গমন।

আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও বাগবী লিখেছেন, হজরত আলী একবার তাঁর অশ্বের রেকাবে পা রেখে পাঠ করলেন বিস্মিল্লাহ্। এরপর অশ্বের পিঠে আরোহণ করে স্থির হয়ে বসে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তারপর পাঠ করলেন 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো'। এরপর তিনবার করে উচ্চারণ করলেন 'আলহামদুলিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবর'। তারপর বললেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো প্রভুপালক নেই। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী। তুমি আমার অপরাধ মার্জনা করো, কেননা তুমিই একমাত্র পাপমার্জনাকারী। এরপর তিনি মৃদু হাসলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে বিশ্বাসীগণের অধিনায়ক! আপনার হাসির হেতু কী? তিনি বললেন, আমি রসুল স.কে এরকম করতে দেখেছি। বলতে শুনেছি, বান্দার এমতো মার্জনা প্রার্থনা আল্লাহ্ পছন্দ করেন।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ'।

এখানে বান্দাকে আল্লাহ্‌র অংশ সাব্যস্ত করার অর্থ— ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলা। মক্কার মুশরিকেরা এরকম বলতো। উল্লেখ্য, সন্তানেরা হয় তাদেরই পিতার ঔরসজাত। সেকারণেই পিতা-সন্তানেরা হয় একে অপরের অংশ। যেমন

হজরত মাসউদ ইবনে মাখরামা থেকে বোখারী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ফাতেমা আমার অংশ। সুতরাং তাকে যে অতুষ্ট করবে সে আমাকেও অতুষ্ট করবে। আহমদ ও হাকেমের বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— ফাতেমা আমার টুকরা। তাকে যে দুঃখ দেয়, সে আমাকে দুঃখ দেয়। আর তাকে যে তুষ্ট করে, সে আমাকেও তুষ্ট করে।

কথাটির সম্পর্ক রয়েছে ৯ সংখ্যক আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে। অর্থাৎ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা কে? এরকম জিজ্ঞাসার জবাবে তারা বলে, আল্লাহ্। অথচ ফেরেশতাদেরকে সাব্যস্ত করে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে। সুতরাং তাদের ধারণা অস্বচ্ছ, অপবিত্র ও স্ববিরোধী। কেননা সৃষ্টি কখনো আল্লাহ্‌র পিতা-পুত্র-কন্যা-ভার্যা হতেই পারে না। এরকম অপবিত্র বিশ্বাসের নামই তো অংশীবাদিতা, যা সম্পূর্ণতই নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য।

'মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ' অর্থ যে মানুষ আল্লাহ্‌র অংশীদার নির্ধারণ করে, তার চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ আর কেউ নয়। তার অজ্ঞতা সীমাহীন এবং ক্ষমার অযোগ্য। এখানে 'মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট। অর্থাৎ অংশীবাদীদের অজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতা দিবালোক অপেক্ষা অধিক দৃষ্টিগ্রাহ্য। সুতরাং তার শাস্তির অনিবার্যতার বিষয়টিও অস্পষ্ট কিছু নয়।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫

❑ তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?

❑ দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি উহারা যাহা আরোপ করে উহাদের কাহাকেও সেই সন্তানের সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

❑ উহারা কি আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?

❑ উহারা দয়াময় আল্লাহ্র বান্দা ফিরিশ্তাদিগকে নারী গণ্য করিয়াছে; ইহাদের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? উহাদের উক্তি অবশ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

❑ উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমরা ইহাদের পূজা করিতাম না।' এ বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই; উহারা তো কেবল মনগড়া বলিতেছে।

❑ আমি কি উহাদিগকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করিয়াছি যাহা উহারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছে?

❑ বরং উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।'

❑ এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলিত, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'

❑ সেই সতর্ককারী বলিত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে যে পথে পাইয়াছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি তবুও কি তোমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিবে?' তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহা সহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

❑ অতঃপর আমি উহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইলাম। দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হইয়াছে!

প্রথমোক্ত আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্নটি একই সঙ্গে ভীতিপ্রদর্শক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। তদুপরি এতে রয়েছে বিস্ময়াত্মক অভিব্যক্তি। তাছাড়া এর মধ্যে

ধ্বনিত হয়েছে অংশীবাদীদের অপবিত্র বিশ্বাসের জোর প্রতিবাদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— অংশীবাদীরা কতোই না মূর্খ! তারা আল্লাহ্র অংশ সাব্যস্তকেই যথেষ্ট মনে করে না, উপরন্তু তাঁর জন্য নির্ধারণ করে এমন সন্তান, যা তারা নিজেরা পছন্দ করে না। আল্লাহ্ কি তবে তাদের সমকক্ষও নন যে, পুত্রাধিকারী হওয়াও তাঁর সাজেনা। সাজে কেবল কন্যাধিকারী হওয়া?

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি তারা যা আরোপ করে, তাদের কাউকে সেই সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলে তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্মযাতনায় ক্লিষ্ট হয়'। একথার অর্থ— তারা নিজেরা কন্যা সন্তানের জনক হওয়াকে মনে করে অগৌরবের বিষয়। তাই কেউ তার কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ পেলে তার মুখমণ্ডল অপমানের প্রভাবে হয়ে যায় কৃষ্ণবর্ণ। আর তারা দগ্ধ হতে থাকে অসহনীয় মর্মযাতনানলে।

এখানে 'দয়াময় আল্লাহ্র প্রতি তারা যা আরোপ করে' কথাটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে উপমারূপে। 'মাছালা' বা সৃদশ শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে সে কারণেই। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র সদৃশ হওয়াকেও মনে করে অপমানজনক। হতে চায় তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্ট। সে কারণেই আল্লাহ্কে বানায় কন্যাসন্তানের জনক। আর নিজেরা পছন্দ করে পুত্রসন্তানের জনয়িতা হতে। সুতরাং তারা যে কোন পর্যায়ের অজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ তা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। এখানে 'কাজীম' অর্থ দুঃসহ মর্মযাতনাক্লিষ্ট।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা কি আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ'? নারীরা সাধারণতঃ হয় সাজসজ্জাসর্বস্বা ও তীক্ষ্ণধীবিচ্যুতা। মন এবং দেহও তাদের পুরুষাপেক্ষা কোমল ও দুর্বল। আরবীয়রা ছিলো যুদ্ধপ্রিয় জাতি। তাই তারা সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিতো পুরুষকে। একারণেই কন্যাসন্তানের জনক হওয়াকে তারা মনে করতো অপমানজনক। অথচ আল্লাহ্কে সৃজয়িতা ও পালয়িতা জানা সত্ত্বেও তাঁকে বানাতো কন্যাসন্তানের জনক। তাদের এমতো মূর্খতার চিত্রটির প্রতিই এখানে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এ বিষয়টির দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো পুরুষের জন্যই সমীচীন নয় যে, সে নারীর মতো সাজসজ্জাপ্রবণা হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে করে রাখবে অকর্মণ্য অথবা অশাণিত। তাদের অন্তর-বাহির উভয় দিকই হতে হবে ধর্মবিধানসম্মত।

'তর্কবিতর্ককালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ' এরকম বলে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তিক অপরিণত অবস্থাকে। কাতাদা বলেছেন, কোনো রমণী তার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করাতে যেয়ে যখন তার পক্ষের প্রমাণ উপস্থাপন করতে শুরু করে, তখন সাধারণতঃ দেখা যায়, উপস্থাপিত প্রমাণ শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে তারই বিপক্ষে।

আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নবোধক বাক্যটি একই সঙ্গে ভীতিপ্রদর্শক, বিস্ময়প্রকাশক ও অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তারা বলে কী? আল্লাহ্ কি তবে তার সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন এক সৃষ্টিকে সন্তান করে নিলেন, যা তাদের ঘৃণার পাত্রী, যাদের জন্মসংবাদ শুনলে তাদের চেহারা কালো হয়ে যায়, তাদের মন হয়ে যায় দুঃখ-ভারাক্রান্ত এবং যারা হয় অলংকারসর্বস্বা- অবলা ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্না? আল্লাহ্র আযাবের সম্ভাবনা থেকে তারা কি এতোই নির্ভয়?

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'তারা দয়াময় আল্লাহ্র ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে; এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিলো'? একথার অর্থ— আল্লাহ্র অংশীদার নির্ণয় করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ফেরেশতাদের সম্মানকে কলুষিত করতেও তারা পিছপা হয়নি। ফেরেশতারা আল্লাহ্র বিশেষ সৃষ্টি। তারা না নারী, না পুরুষ। তারা আল্লাহ্র সতত অনুগত এবং নির্ভুল ইবাদত-বন্দেগীতে রত। তারা পানাহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তারা নিষ্পাপ। তারা আল্লাহ্র নৈকট্যভাজন বান্দা। অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। অংশীবাদীরা এতোই অবিমৃশ্য, দুর্বিনীত ও দুর্বৃত্ত যে, আল্লাহ্র এমতো পবিত্র সৃষ্টিকে তারা সাব্যস্ত করে তার কন্যা বলে। অথচ তারা এদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানবে কীভাবে? কখন কীভাবে আমি ফেরেশতাদের সৃষ্টি করি, তারা কি তা দেখেছে? তাহলে এমতো অপবিত্র বচন উচ্চারণ করে কোন সাহসে, যার সঙ্গে তাদের শ্রুতি, দৃষ্টি ও জ্ঞানের কোনো যোগসূত্রই নেই? আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে কি তারা এতোটাই নিঃশঙ্ক?

এরপর বলা হয়েছে— 'তাদের উক্তি অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে'। একথার অর্থ— তাদের এ সকল অংশীবাদদুষ্ট উক্তি অবশ্যই আমার আমল লেখক ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করে রাখবে এবং মহাবিচারের দিবসে তাদেরকে এজন্য কঠোর জবাবদিহি করতে হবে। এর অন্যথা হওয়া অসম্ভব।

কাতাদা সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, কিছুসংখ্যক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বলে বেড়াতো, জ্বিন জতির সঙ্গে রয়েছে আল্লাহ্র বৈবাহিক সম্পর্ক এবং ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। তাদের এমতো অপমন্তব্য খণ্ডনার্থে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত।

কালাবী ও মুকাতিল সূত্রে বাগবী লিখেছেন, মক্কার পৌত্তলিকরা 'ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা' এরকম বলাতে একদিন রসুল স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা একথা জানলে কীভাবে? তারা বললো, আমরা এরকম শুনেছি আমাদের গুরুজনদের কাছ থেকে। আর আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের গুরুজনবচন নির্ভুল। তাদের এমতো মূর্খোক্তির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে ওই আয়াত।

এর পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতাম না'।

এখানে 'এদের পূজা করতাম না' অর্থ ফেরেশতাদের পূজা করতাম না। এরকম বলেছেন কাতাদা, মুকাতিল ও কালাবী। মুজাহিদ কথাটির অর্থ করেছেন— পূজা করতাম না মূর্তির।

এরপর বলা হয়েছে— 'এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই; তারা তো মনগড়া কথা বলছে'। একথার অর্থ— ফেরেশতা অথবা প্রতিমার পূজা যে নিষিদ্ধ, অবশ্যপরিহার্য এবং শাস্তিযোগ্য, সে বিষয়ে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-সুস্থবিবেকবোধ কোনোটাই নেই। আল্লাহ্ তো কখনোই কাউকে এরকম বলেননি। এ হচ্ছে তাদের স্বকপোলকল্পনা। তারা যা খুশী তাই বলে এবং মনগড়া পথে চলে। এখানে 'ইয়াখ্‌রুসূন' অর্থ চিন্তা-ভাবনা না করেই যা খুশী তাই মন্তব্য করে, মনগড়া কথা বলে।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোনো কিতাব দান করেছি, যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে'? আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে ইতোপূর্বে উল্লেখিত 'এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিলো' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তারা কি ফেরেশতাদের সৃজনপ্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছিলো, অথবা তাদের কাছে কি কোরআনের আগে অন্য কোনো কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছিলাম, যার মাধ্যমে তারা একথা প্রমাণ করতে পারবে যে, ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা এবং প্রতিমাদের কাজ তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করা?

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'বরং তারা বলে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি'। একথার অর্থ— অংশীবাদিতার পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণই তাদের নেই। ফেরেশতাদেরকে তারা আল্লাহ্র কন্যা বলে, পূজা করে প্রতিমার, অথচ তারা ফেরেশতাদের সৃষ্টি যেমন প্রত্যক্ষ করেনি, তেমনি তাদের প্রতি ইতোপূর্বে কোনো কিতাবও অবতীর্ণ হয়নি, তাই তাদের অপধর্মাদর্শের পক্ষে তারা কেবল এতটুকুই বলতে পারে যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এরকম করতে দেখেছি। সুতরাং একথা বলতে আর কোনো বাধা নেই যে, তাদের মতাদর্শ ও কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণতই কুসংস্কার ও অন্ধ-অনুকরণ নির্ভর।

এখানে 'আ'লা উম্মাতিন' অর্থ এক মতাদর্শের অনুসারী। এভাবে এখানে অংশীবাদীদের ইচ্ছাকে চিহ্নিত করা হয়েছে সমমতাদর্শানুসারী একটি সম্প্রদায়রূপে। যেমন রাহবার বলে ওই ব্যক্তিকে, যার দিকে লোকেরা ছুটে যায়। মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'উম্মাত' অর্থ পরিচালক (ইমাম)। আর এখানকার 'আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি' অর্থ আমরা আমাদের

পূর্বপুরুষদের মতাদর্শকেই মনে করি অভ্রান্ত। তাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি হৃষ্টচিত্তে। বলাবাহুল্য, তাদের এমতো অপবচনে ফুটে উঠেছে তাদের অযৌক্তিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয়।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এভাবে তোমার পূর্বে কোনো জনপদে যখনই আমি কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখন তাদের সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলতো, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি'। কথাটির মধ্যে রয়েছে রসুল স. এর জন্য সান্ত্বনার বাণী। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আপনার সম্প্রদায়ের অংশীবাদীরা তাদের অংশীবাদিতার সমর্থনে যেমন তাদের বাপ-দাদাদের দোহাই দেয়, পূর্ববর্তী যুগের অংশীবাদী সম্প্রদায়গুলোও সেরকম করতো। সুস্থ বিচার-বুদ্ধিকে কাজে না লাগিয়ে প্রত্যাখ্যান করতো তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রসুলগণকে। আর তাদের মধ্যে যারা বিত্তবান, তারাই এ ব্যাপারে ছিলো অগ্রণী। জেনে রাখুন, এটাই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের চিরাচরিত স্বভাব। সুতরাং আপনি ব্যথিত হবেন না। সহিষ্ণুতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে চলুন সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব। ফলাফল নির্ধারক তো আমি।

এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করায় একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ঐশ্বর্যপ্রিয়তাই হচ্ছে সকল মিথ্যাচারের ভিত্তি। বিত্তলিপ্সুরা হারিয়ে ফেলে সুস্থ বিবেচনা বোধ। হয়ে যায় অন্ধ অনুকরণের পুরোধা।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'সেই সতর্ককারী বলতো, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছো, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে'? একথার অর্থ— তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রসুলগণ তাদের শুভবোধ জাগ্রত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করতো। বলতো, না জেনে, না শুনে, না বুঝে কোনো কাজ করা কি ঠিক? অথচ তোমরা তো সেরকমই করে চলেছো। সত্যমিথ্যার প্রভেদ নির্ণয়ের জন্য সামান্য ভাবনা-চিন্তাও করতে চাইছো না। এক কথায় বলে দিচ্ছো, বাপদাদাদের ধর্মাদর্শ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাদর্শ আমরা মানিই না। কেনো? বিচার বিশ্লেষণ করে কোনোকিছু গ্রহণ করা কি দোষের, না প্রশংসার ভেবে চিন্তে দ্যাখো, আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমত অপেক্ষা উত্তম কোনো ধর্মমত এনেছি কিনা? যদি আনি, তবুও কি তোমরা আগের মতোই নিকৃষ্টতাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে? জবাবে তারা বলতো, তুমি কী নিয়ে এসেছো, না এসেছো তা আমরা জানতেও চাই না। আমরা তোমাকে মানিই না। আর তোমার মতো যারা, তাদের সকলকেই আমরা প্রত্যাখ্যান করি।

এখানে 'সেই সতর্ককারী' বলে বুঝানো হয়েছে পূর্ববর্তী যুগের কোনো একজন নবীকে অথবা সকল নবীর পথপ্রদর্শন পদ্ধতির দৃষ্টান্তরূপে তাঁদের যে কোনো একজনকে। অর্থাৎ তাঁদের আহ্বান ছিলো এরকম। কিংবা কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে কেবল রসুল স.কে। বক্তব্যের গতিপ্রবাহ অবশ্য প্রথমোক্ত অভিমতটিকে সমর্থন করে। কেননা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে 'আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম'। কথাটি অতীতকালবোধক। সুতরাং প্রথমোক্ত মতটিই সঠিক।

'তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে' প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর পথনির্দেশ যদি আমি এনেই থাকি, তবে তো তোমাদের উচিত তাদের অন্ধঅনুকরণ থেকে সরে আসা। আর এখানকার 'উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ' অর্থ অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য ও শুদ্ধ ধর্মমত। এখানে বিশেষ্য রয়েছে উহ্য।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। দ্যাখো, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কী হয়েছে'? একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! ওই সকল উদ্ধত সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কিন্তু আমি রেহাই দেইনি। যথাসময়ে কার্যকর করেছি প্রতিশোধ। ফলে পৃথিবীতেই তারা হয়েছে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস। পরবর্তী পৃথিবীর লাঞ্ছনা ও মর্মন্তুদ শাস্তি তো রয়েছেই। দেখুন, মিথ্যাচারীরা এভাবেই বিনাশ হয়ে যায়। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আপনার বিরুদ্ধাচারীদের বিনাশও অবধারিত।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫

❑ স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা যাহাদের পূজা কর তাহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই;

❑ 'সম্পর্ক আছে শুধু তাঁহারই সহিত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন।'

❑ এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদের জন্য, যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে।

❑ বরঞ্চ আমিই উহাদিগকে এবং উহাদের পূর্বপুরুষদিগকে দিয়াছিলাম ভোগের সামগ্রী, অবশেষে উহাদের নিকট আসিল সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

❑ যখন উহাদের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিল, 'ইহা তো জাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি।'

❑ এবং ইহারা বলে, 'এই কুরআন কেন নাযিল করা হইল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?'

❑ ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে? আমিই উহাদের মধ্যে উহাদের জীবিকা বন্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে; এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

❑ সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে, এই আশংকা না থাকিলে দয়াময় আল্লাহ্‌কে যাহারা অস্বীকার করে, উহাদিগকে আমি দিতাম উহাদের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাহাতে উহারা আরোহণ করে,

❑ এবং উহাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালঙ্ক— যাহাতে উহারা হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতে পারে,

❑ এবং স্বর্ণ নির্মিতও। আর এই সকলই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে আখিরাতের কল্যাণ।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! এবার শুনুন নবী ইব্রাহিমের বৃত্তান্ত। তিনিও তাঁর পৌত্তলিক পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক জনতাকে সত্যের আহ্বান জনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমাদের প্রতিমাপূজার সঙ্গে আমার

বিশ্বাসগত ও কর্মগত কোনো প্রকার যোগসাজশ নেই। আমার বিশ্বাস ও উপাসনার সম্পর্ক রয়েছে কেবল সেই মহসৃজয়িতার সঙ্গে, যিনি আমাকে সৃজন করেছেন। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমাকে শুভপথে পরিচালিত করবেনই।

এখানকার 'বারাউ' শব্দটি একটি ধাতুমূল। তাই এর দ্বিবচন, বহুবচন কোনোটাই হয় না। এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষণীয় শব্দরূপে এবং

আধিক্য প্রকাশক হিসেবে। আর এখানকার 'মিম্মা তা'বদূন' এর 'মা' ধাত্যর্থে ব্যবহৃত। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— তোমার এই পূজায় আমি অপরিতুষ্ট। অথবা এখানকার 'মা' হচ্ছে যোজক অব্যয়। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— তোমাদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর প্রতি আমি ত্যক্ত-বিরক্ত। অর্থাৎ এগুলোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। উল্লেখ্য, মক্কার পৌত্তলিকেরা দাবি করতো, তারা তাদের পিতৃপুরুষদের ধর্মমতানুসারী। তাই এখানে হজরত ইব্রাহিমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। এভাবে তাদেরকে এটাই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, দ্যাখো, নবী ইব্রাহিম তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে কী বলেছিলেন। তিনি তো তাঁর পিতার অন্ধ অনুকরণ করেননি। সুতরাং তোমরা তোমাদের সেই প্রধান পিতৃপুরুষের অনুসরণ করো না কেনো? অথবা এখানে রসুল স.কেই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে হজরত ইব্রাহিমের আদর্শের। যেনো বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! নবী ইব্রাহিম তাঁর পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের সম্মুখে যেমন পৌত্তলিকতার প্রতি প্রকাশ করেছিলেন চরম অসন্তোষ, আপনিও তেমন করুন। বলুন, পৌত্তলিকতার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। আমার বিশ্বাস তো সম্পৃক্ত মহাবিশ্বের মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা আল্লাহ্‌র সঙ্গে। অবশ্যই তিনি আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন'।

'ইল্লাল্ লাজী ফাত্বরাণী' অর্থ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ব্যতীত। ব্যতিক্রমী অব্যয়টি এখানে যুক্তক অথবা বিযুক্তক। কারণ, পূর্ববর্তী বাক্য 'মা তা'বুদূ' এর 'মা' অব্যয়টি সেখানে ব্যাপকার্থক, অথবা বিশেষণার্থক। আর 'সাইয়াহ্‌দীন' অর্থ সৎপথে পরিচালিত করবেন। অর্থাৎ তাঁর মারেফাতের ক্রমোন্নতির মর্যাদাপূর্ণ স্তরসমূহ দান করবেন।

এরপরের আয়াতে (২৮) বলা হয়েছে— 'এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গিয়েছে তাঁর পরবর্তীদের জন্য, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে'। একথার অর্থ— নবী ইব্রাহিমের এমতো উপপ্লবাত্মক বাণীটি মহামানবতার জন্য একটি অক্ষয় আদর্শ হয়ে রয়েছে, যাতে যুগে যুগে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে আল্লাহ্‌র এককত্বসম্ভূত বিশ্বাসকে এবং পৌত্তলিকতার প্রতি প্রকাশ করতে পারে তাদের চরম বিরাগ। একইভাবে যেনো ঘোষণা দিতে পারে— তোমরা যাদের পূজা করো, তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমার সম্পর্ক আছে শুধু তাঁর সঙ্গে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।

এখানকার 'জ্বাআ'লাহা' কথাটির 'হা' সর্বনাম হজরত ইব্রাহিমের ঘোষণাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাতাদা বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের বংশধারায় সর্বযুগে একত্ববাদিতাসম্ভূত বিশ্বাস ও সাধনা উচ্চকিত হতে থাকবে। কুরতুবী আবার এখানকার 'জ্বাআ'লা' এর কর্তা সাব্যস্ত করছেন আল্লাহ্‌কে। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আল্লাহ্ হজরত ইব্রাহিমের বিপ্লবী বাণীকে স্থায়ী করে রেখেছেন পরবর্তীদের জন্য। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানকার 'বাণী' (কলিমাতুন)

অর্থ 'আমি নতি স্বীকার করি বিশ্বসমূহের প্রভুপালয়িতার নিকটে'। কথাটি হজরত ইব্রাহিমের। তিনি তাঁর বর্ণনাকালে 'সাম্মাকুমুল মুস্লিমীন' এই আয়াতখানিও পাঠ করেছেন।

'লাআ'ল্লাহুম ইয়ারজ্বিউন' অর্থ যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি নবী ইব্রাহিমের অক্ষয় বচনটি আপনার সম্প্রদায়ভূতদেরকে পাঠ করে শোনান, যাতে তাদের চৈতন্যোদয় ঘটে এবং কায়মনোবাক্যে ফিরে আসতে পারে চিরন্তন বিশ্বাসের ছায়ায়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'বরঞ্চ আমিই তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে দিয়েছিলাম ভোগের সামগ্রী, অবশেষে তাদের নিকট এলো সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসুল (২৯) যখন তাদের নিকট সত্য এলো, তারা বললো, এটা তো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি' (৩০)। একথার অর্থ— বরং আমি মক্কার পৌত্তলিক ও তাদের পৌত্তলিক পূর্বপুরুষদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি না দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি। পৃথিবীসম্ভোগ করতে দিয়েছি কয়েক পুরুষ ধরে। শেষে তাদের মধ্যে প্রেরণ করলাম শেষ প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ কোরআন, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করলো না। উল্টো কোরআনকে বললো যাদু। সরাসরি একথাও জানিয়ে দিলো যে, আমরা এ গ্রন্থকে অগ্রাহ্য করি।

এখানে 'সত্য' অর্থ কোরআন মজীদ। মুকাতিল বলেছেন, এখানে 'সত্য' অর্থ ইসলাম। 'হাজা সিহ্‌রুন' অর্থ এটা তো যাদু। উল্লেখ্য, কোরআনের অনুরূপ বাণী নির্মাণে তারা অক্ষম ছিলো বলেই বিদ্বেষবশতঃ কোরআনকে বলতো যাদু। আর 'রসূলুম্ মুবীন' অর্থ স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসুল। অথবা এমন রসুল, যিনি অলৌকিকত্ব প্রদর্শক, দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র এককত্ব প্রমাণক, কিংবা আল্লাহ্‌র নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা প্রকাশক।

জুহাক সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. যখন মক্কাবাসীদের কাছে নিজেকে রসুল বলে প্রকাশ করলেন, তখন তাদের অধিকাংশই তাঁর দাবিকে অস্বীকার করলো। বলতে শুরু করলো, আল্লাহ্‌র মহিমা অতি উচ্চ। তাই তিনি কোনো মানুষকে রসুল করে পাঠাতে পারেন না। তখন অবতীর্ণ হলো 'মানুষের কাছে এটা কী আশ্চর্যের যে, আমি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে। অথচ আপনার পূর্বে আমি যাদেরকে রসুল করে পাঠিয়েছি, তারা সকলেই ছিলো পুরুষ ও মনুষ্যসম্প্রদায়ভূত'। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা কিছুটা দমে গেলো। তারপর উত্থাপন করলো নতুন বাহানা। বললো, ঠিক আছে, মানুষের মধ্য থেকেই যদি রসুল প্রেরণ করতে হয়, তবে তো রসুল করা উচিত প্রবীণ ও নেতৃস্থানীয় কাউকে। পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের এমতো অপমন্তব্য ও তার জবাব।

বলা হয়েছে— 'এবং তারা বলে, এই কোরআন কেনো নাজিল করা হলো না দুই জনপদের কোনো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর (৩১)? তারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি, পার্থিব

জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর' (৩২)।

এখানে 'দুই জনপদ' অর্থ মক্কা ও তায়েফ। আর প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি অর্থ প্রভাবে-প্রতাপে ও ধনসম্পদে অগ্রণী। পৌত্তলিকেরা মনে করতো, রেসালাত যেহেতু একটি অত্যন্ত উচ্চপদমর্যাদা, সেহেতু তা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরই পাওয়া উচিত। কিন্তু তারা একথা বুঝতে পারতো না, পদমর্যাদাটি পার্থিব প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ আধ্যাত্মিকতা ও পার্থিবতা সমতুল নয়। আর আল্লাহতায়ালাই ভালো জানেন, রেসালতের মতো গুরুদায়িত্ব বহনের উপযোগী কে? তাই তিনি যোগ্য ব্যক্তিকেই দান করেন তাঁর রেসালত। অথবা এ ব্যাপারে তাঁর অভিপ্রায়ই মূল কথা। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাঁকেই তাঁর রসুল করে নেন। যুগপৎ তাঁকে দান করেন যোগ্যতা ও দায়িত্ব এবং দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত সামর্থ্য। ফলে মানুষ হয়েও তাঁরা হন স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ, যাঁরা সত্যপ্রিয়, অসমসাহসী, দৃঢ়চেতা, অজেয় ও নিষ্পাপ।

ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা বলতো, কোরআন যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হতো, তবে তা মোহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ না হয়ে অবতীর্ণ হতো আমার উপর, অথবা ইবনে মাসউদ সাক্বাফীর উপর। তাদের এমতো অপবচনটিই উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমোক্ত আয়াতখানিতে। বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, মুশরিকেরা মনে করতো, মক্কার উতবা ইবনে রবীয়া অথবা তায়েফের আবদে ইয়ালীল এর উপরে কোরআন অবতীর্ণ হওয়াই ছিলো সমীচীন। কেউ কেউ বলেছেন, তারা মনে করতো, কোরআন অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিলো মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা, অথবা তায়েফের হাবীব ইবনে আমর ও ইবনে উবায়েদ সাক্বাফীর উপর। হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় সমর্থন রয়েছে শেষোক্ত অভিমতটির।

'এরা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে' কথাটির অর্থ হে আমার রসুল! ওই সকল লোক বলে কী? তারা কি আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ রেসালাতকে নিজেরাই ইচ্ছেমতো ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে চায়? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের স্বকপোলকল্পনার মূলোৎপাটন এবং তাদের অজ্ঞতার উপর বিস্ময়প্রকাশ।

'আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করি' অর্থ— আমিই বণ্টন করি তাদের জীবনোপকরণ। অথচ নবুয়ত বণ্টন করবে অন্য কেউ, এ-ও কি হয়? না হওয়া সমীচীন? ইহ-পারত্রিক কল্যাণসমূহের আমিই তো একমাত্র বণ্টনকারী। আমিই তো একমাত্র দাতা। আর অন্য সকলে তো গ্রহীতা মাত্র।

'একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে' অর্থ বিদ্যায়, ধনে এবং অন্যান্য বিষয়ে আমিই মানুষকে করি এককে অন্যের চেয়ে উন্নত, যাতে করে উন্নত ব্যক্তিরা হতে পারে পৃথিবীর ব্যক্তিক

ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ডের পরিচালক এবং অনুন্নতরা হতে পারে তাদের সহায়ক। এভাবে সচল, সবল ও সফল হতে পারে মানুষের সমাজ। সবাই সমান হলে তো কেউ কারো কথা শুনতো না। ফলে জীবনযাত্রা হয়ে যেতো স্থবির। কাতাদা ও জুহাক বলেছেন, মানুষ অর্থ ও প্রতিপত্তি বলে অন্যকে অধীনস্থ করতে পারে বটে, কিন্তু তাতে করে নিজের বা অন্যের রিজিক কমবেশী করতে পারে না। কেবল আল্লাহ্‌ই করতে পারে জীবনোকরণের সংকোচন ও প্রসরণ।

'তারা যা জমা করে, তা থেকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর' অর্থ পার্থিব বিত্ত-অর্থ-প্রভাব-প্রতিপত্তি, যা মানুষ কুক্ষিগত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, তা থেকে নবুয়ত অসংখ্য গুণ উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ পার্থিব শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আল্লাহ্‌ না দিলে কেউ পায় না, তেমনি নবুয়তও আল্লাহ্‌ না দিলে কারো পাবার উপায় নেই। সুতরাং নবুয়ত কাকে দিতে হবে, না হবে সে সম্পর্কে তারা কথা বলতে চায় কোন যুক্তিতে। কোন সাহসে মন্তব্য করে, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর কোরআন নাজিল করা হলো না কেনো?

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহ্কে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যাতে তারা আরোহণ করে (৩৩) এবং তাদের গৃহের জন্য দরোজা ও পালঙ্ক— যাতে তারা হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারে (৩৪) এবং স্বর্ণনির্মিতও। আর এই সকলই তো পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। মুত্তাক্বীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে আখেরাতের কল্যাণ' (৩৫)।

এখানে 'আন্নাস্' অর্থ মনুষ্যজাতি। 'উম্মাতান ওয়াহিদাতান' অর্থ এক মতাবলম্বী। 'সুক্বফান্' অর্থ ছাদ। শব্দটি 'সাক্বফুন'এর বহুবচন। যেমন 'দাহনুন' এর বহুবচন 'দুহুনুন'। আবু উবায়দা বলেছেন, এরকম তৃতীয় কোনো দৃষ্টান্ত আর নেই। কেউ কেউ বলেছেন, 'সুক্বফুন' বহুবচন 'সাক্বীফুন' এর। আবার কারো কারো কাছে 'সুক্বফুন্' হচ্ছে বহুবচনের বহুবচন। 'মাআ'রিজ' অর্থ সিঁড়ি, সোপান। 'আ'লাইহা ইয়াজহারুন' অর্থ তার উপর আরোহণ করে। 'ওয়া সুরুরা' অর্থ পালঙ্ক, রৌপ্যনির্মিত শয্যা। 'সুরুরুন' হচ্ছে 'সারীর' এর বহুবচন। 'যুখ্রুফান' অর্থ স্বর্ণনির্মিত। অন্য এক আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'সৌন্দর্য' অর্থে। এভাবে এখানকার বক্তব্যটির মর্মার্থ দাঁড়িয়েছে— স্বর্ণ-রৌপ্য ও পার্থিব সুখোপকরণসমূহ আল্লাহ্র কাছে অতি তুচ্ছ। এসকলকিছু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে দেওয়াই ছিলো সমীচীন। কিন্তু এতে করে সকল মানুষেরই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমি বিশ্বাসীদেরকেও এগুলোর মধ্যে অংশ দিয়েছি। তৎসত্ত্বেও বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীদেরকে একথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, এসবকিছু হচ্ছে পার্থিব ভোগোপকরণ, যা অবক্ষয়প্রবণ, অস্থায়ী। প্রকৃত কল্যাণ হচ্ছে আখেরাতের কল্যাণ। যা আল্লাহ্ জমা করে রেখেছেন মুত্তাকীদের জন্য।

এখানকার 'মুত্তাকিদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে আখেরাতের কল্যাণ' কথাটির মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মর্যাদাধারী যে ব্যক্তি আখেরাতে মর্যাদাসম্পন্ন। আর কথাটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, পৃথিবীর সুখোপকরণসমূহ বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী কাউকেই এককভাবে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্র শত্রুদেরকেও এর অংশীদার করা হয়েছে। পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহ্র কাছে কিছুটা মূল্যবান হলেও নিশ্চয় এতে তিনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কোনো অংশ রাখতেন না।

হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে তিরমিজি ও জিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র কাছে দুনিয়ার ওজন যদি মাছির পাখার সমানও হতো, তাহলে তিনি এখানে কাফেরদেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। অন্য এক বর্ণনায় 'এক ঢোক পানি'র স্থলে এসেছে 'এক বিন্দু পানি'র কথা।

হজরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ ফাহরী বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সঙ্গে একই বাহনে আরোহী হয়েছিলাম। পথ চলতে চলতে আমরা এক স্থানে দেখলাম, মাটিতে পড়ে রয়েছে একটি বকরীর মৃত বাচ্চা। তিনি স. সেটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমরা কি বুঝতে পারছো, মূল্যহীন বলেই গৃহকর্তা এটাকে গৃহের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, গৃহকর্তার নিকটে এটা যেমন মূল্যহীন, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে দুনিয়া তদপেক্ষাও অধিক মূল্যহীন।

আবু নাঈম লিখেছেন, দাউদ ইবনে হেলাল হানবী বলেছেন, হজরত ইব্রাহিমের আকাশী পুস্তিকায় লেখা আছে, হে পৃথিবী! তুমি পুণ্যবানদের সম্মুখে লজ্জিত হয়ে আসো। তৎসত্ত্বেও তুমি তাদের দৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ। তাদের হৃদয়ে আমি তোমার জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছি ঘৃণা। তাইতো তারা তোমার প্রতি বিমুখ। আমার সৃষ্টির মধ্যে তোমার চেয়ে হীন আমি কাউকে করিনি। সেকারণেই তুমি সর্বাবস্থায় তুচ্ছ এবং ক্রমান্বয়ে তুমি এগিয়ে যাচ্ছো ধ্বংসের দিকেই। তোমার সৃষ্টির সূচনালগ্নেই আমি একথা স্থির করে দিয়েছিলাম যে, তুমি কারো জন্য চিরকাল থাকবে না এবং তোমার জন্যও কেউ চিরদিন অপেক্ষা করবে না, সে তোমার প্রীতিভাজন অথবা বিরাগভাজন, যে-ই হোক না কেনো। যারা আমার সন্তোষাধিষ্ঠিত হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে আমাকে দ্যাখে, তাদের জন্য সেই প্রতিদানই উত্তম, যা আমার কাছে রয়েছে। তারা যখন কবর থেকে উঠে আমার কাছে আসবে, তখন তদের ইমানের নূর চলতে থাকবে তাদের আগে আগে। ফেরেশতারাও তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। তখন আমি তাদেরকে পৌঁছে দিবো আমার ওই অনুগ্রহ পর্যন্ত, যার কামনা তারা করতো।

হজরত জাবের থেকে জিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া অভিশপ্ত এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা-ও, কেবল ওই সকল বিষয় ছাড়া, যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে (যেমন ইমান, ইসলাম, কিতাব, রসুল, পুণ্যকর্ম)। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে মাজা এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী

হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে— কেবল আল্লাহ্র জিকির, জিকিরের উপকরণসমূহ, ধর্মীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা ছাড়া। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বাযযারের বর্ণনায় এসেছে এভাবে— কেবল শুভকর্মের নির্দেশ-অশুভকর্মের নিষেধ এবং আল্লাহ্র জিকির

ছাড়া। আবু দাউদ সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন এভাবে— কেবল ওই সকল সৎকর্ম ও সৎবাণী ব্যতীত, যা আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনের সহায়ক।

জননী আয়েশা থেকে আহমদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, পৃথিবী হচ্ছে তার কর্মস্থান, পরকালে যার কোনো আবাসস্থল নেই। আর পৃথিবী হচ্ছে তার সম্পদ, পরকালে যার কোনো সম্পদ নেই। আর পৃথিবীর সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখতে ভালোবাসে তারা, যাদের কোনো জ্ঞান নেই। পরিণতসূত্রে বায়হাকী হজরত ইবনে মাসউদ থেকেও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বাসীগণের জন্য কারাগার এবং কারাগারের ছোট-খাট স্বপ্ন। যখন সে পৃথিবী পরিত্যাগ করে, তখনই ঘটে তার কারামুক্তি এবং স্বপ্নমুক্তি। আহমদ, তিবরানী, হাকেম, আবু নাঈম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ, তিরমিজি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, দুনিয়া হচ্ছে মুমিনদের কয়েদখানা এবং কাফেরদের জান্নাত। হজরত সালমান থেকে বায়হাকী, হাকেম এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে বাযযারও এরকম বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসের মর্মার্থ হচ্ছে— পরকালে যে সকল সুখসুবিধা বিশ্বাসীদের জন্য জমা আছে, তার তুলনায় পৃথিবীর আরাম আয়েশ তাদের কাছে বন্দী জীবনে কোনো রকম বেঁচে থাকার মতো। পক্ষান্তরে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা পৃথিবীতে যতোই দুঃখযাতনা ভোগ করে থাকুক না কেনো, পরকালের দুঃখকষ্টের তুলনায় তা জান্নাতের মতো। আল্লাহ্‌ই সর্ববিষয়ে অবগত।

একটি প্রশ্ন ঃ 'মসনদ-উল-ফেরদাউস' রচয়িতা হজরত ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পৃথিবী পরকালপ্রত্যাশীদের জন্য নিষিদ্ধ, পরবর্তী পৃথিবী পৃথিবীপ্রত্যাশীদের জন্য নিষিদ্ধ এবং উভয় পৃথিবী নিষিদ্ধ আল্লাহ্‌প্রত্যাশীদের জন্য। এ কথার অর্থ কী?

জবাব ঃ আমি বলি, হাদিসটির মর্মার্থ এরকম নয় যে, পৃথিবীর ধন-সম্পদ বৈধভাবে অর্জন করা নিষিদ্ধ। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৃথিবীর ধন-সম্পদের জন্য হৃদয়ের আকর্ষণ নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ্‌ এরশাদ করেছেন 'আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের জন্য পৃথিবীর সাজসজ্জা এবং পবিত্র আহার্যকে হারাম করেননি'। তবে হ্যাঁ, প্রকৃত ভোগাস্বাদ অবশ্য আখেরাতের জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং বুঝতে হবে দুনিয়ার মহব্বতে যে জড়িয়ে পড়বে, সে পরকালের সুখ-শান্তি হারাবে। রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবাসবে, সে পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে আখেরাতকে ভালোবাসবে সে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তার দুনিয়াকে। তোমরা কিন্তু অক্ষয়তাকেই ধ্বংসশীলতার উপরে গুরুত্ব দিয়ো। হজরত আবু মুসা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও হাকেম।

'পরকাল' উদ্দেশ্য পরকালের সৌভাগ্য ও আনন্দ। অবিশ্বাসীরা কেবল দুনিয়াকেই চায়। তাই পরকালের সুখভোগ তাদের জন্য হারাম। তাদের কথা বলা হয়েছে এক আয়াতে এভাবে 'যারা বলে, হে প্রভুপালনকর্তা! আমাদেরকে যা দেওয়ার দুনিয়াতেই দিয়ে দাও। বস্তুতঃ তাদের জন্য পরকালে কিছু নেই'।

এখন অবশিষ্ট রইলো 'আল্লাহ্‌প্রত্যাশীদের জন্য দুনিয়া-আখেরাত উভয়টিই হারাম' কথাটি। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌প্রত্যাশীদের অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ থাকে আল্লাহ্‌র ভালোবাসায়। তাদের সে ভালোবাসা এতো গভীর যে, তাদের সমস্ত সত্তাকে তা পরিপ্লাবিত করে রাখে। ফলে তারা পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে হয়ে যায় চিরদিনের জন্য সম্পর্কচ্যুত। আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো প্রতি তাদের প্রকৃত মনোযোগ আর থাকেই না। এক বর্ণনায় এসেছে, তাপসীপ্রবরা রাবেয়া বসরী একবার এক হাতে পানিপূর্ণ পাত্র এবং অপর হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ভদ্রে! এভাবে আপনি কোথায় চলেছেন। তিনি বললেন, পানি দিয়ে আমি দোজখ নিভিয়ে ফেলবো এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবো বেহেশত, যাতে মানুষ আর যেনো দোজখের ভয়ে এবং বেহেশতের লোভে আল্লাহ্‌র ইবাদত না করে। ইবাদত যেনো করে কেবল আল্লাহ্‌র জন্য।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি বলেছেন, রাবেয়া বসরীর উক্তিটি ছিলো মত্ততাসম্ভূত। পৃথিবীর পথে বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্যকর্তব্য তো এই যে, তারা বেহেশত পাবার আকাঙ্খায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তা করবে কেবল এই কারণে যে, বেহেশত হচ্ছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। আর দোজখ থেকে পরিত্রাণ কামনাও তাদের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা দোজখ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ক্রোধ। সুতরাং বুঝতে হবে, এমতাবস্থায় তাদের 'লোভ' ও 'ভয়' দুষণীয় কিছু নয়।

একটি প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হওয়া সিদ্ধ, যদি এতে করে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর বান্দাগণের অধিকার খর্বিত না হয়। আর বৈধ জীবিকার অনুসন্ধান বৈধ তো বটেই, তদুপরি তা অত্যাবশ্যক। রসুল স. বলেছেন, হালাল রিজিকের সন্ধান করা আল্লাহ্‌র ফরজসমূহ পূরণের পরবর্তী ফরজ। হজরত ইবনে মাসউদ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী ও বায়হাকী। তাহলে দুনিয়াকে মহব্বত করা হারাম কথাটির অর্থ কী?

উত্তর ঃ দুনিয়াকে মহব্বত করার অর্থ দুনিয়াকে পরকালের উপরে গুরুত্ব দেওয়া। কেউ কেউ অর্থ উপার্জন করতে গিয়ে দুনিয়ার মহব্বতে এতোই বিভোর হয়ে পড়ে যে, পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে হয়ে পড়ে অমনোযোগী। তার অন্তরে প্রয়োজন পরিপূরণ অপেক্ষা লোভ-লালসা হয়ে পড়ে প্রবল। সে তখন হয়ে যায় অপকামনার হাতে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বন্দী। তার দৃষ্টিতে বিত্তহীনদের চেয়ে বিত্তপতিরা হয়ে যায় অধিক সম্মানার্হ। ন্যায়-অন্যায় বোধ তখন তার আর থাকেই না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও যে লোক আল্লাহ্র স্মরণ, নামাজ, জাকাত ইত্যাদি পুন্যকর্ম সম্পর্কে সতত সচেতন

থাকে, ভয় করে মহাবিচার দিবসের জবাবদিহিতাকে, সে কিন্তু দুনিয়াদার নয়। এরকম লোক অর্থ উপার্জনে ব্যপৃত থাকে পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের জন্য, দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তদেরকে দান করবার জন্য, আল্লাহ্র পথে ব্যয়, প্রতিবেশীদের অধিকার পূরণ ইত্যাদি শুভ উদ্দেশ্যে। এমতো ব্যক্তির ধনোপার্জন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওয়াজিব। আবার ক্ষেত্রবিশেষে কমপক্ষে মোস্তাহাব তো বটেই। আবার কোনো ক্ষেত্রে তো মোবাহ। হারাম কিছুতেই নয়। হজরত আবু সাঈদ থেকে ইবনে হাব্বান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল পথে উপার্জন করে এবং ওই উপার্জন থেকে নিজে খায়, পরিধান করে, ব্যয় করে পরিবার পরিজন-আত্মীয়-স্বজনের জন্য, তার এ সকল কিছুই তখন হয় তার পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার অবলম্বন।

একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবী-কামনায় সংযম প্রদর্শন সুন্নত। রসুল স. বলেছেন, তোমরা পৃথিবীতে সংযত থাকো। অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। কেননা যার জন্য যা সৃষ্টি করা হয়েছে, তা প্রাপ্তি সহজ। আহমদ, ইবনে মাজা, হাকেম।

সূরা যুখ্রুফ ঃ আয়াত ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫

❑ যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তাহার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।

❑ শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।

❑ অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন সে শয়তানকে বলিবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

❑ আর আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজেই আসিবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক।

❑ তুমি কি শুনাইতে পারিবে বধিরকে অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?

❑ আমি যদি তোমাকে লইয়া যাই, তবু আমি উহাদিগকে শাস্তি দিব;

❑ অথবা আমি উহাদিগকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি, আমি তোমাকে তাহা প্রত্যক্ষ করাই, বস্তুত উহাদের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

❑ সুতরাং তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি সরল পথেই রহিয়াছ।

❑ কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে।

❑ তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলাম যাহার ইবাদত করা যায়?

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার আকাশজ বাণীসম্ভার এই কোরআনের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করে, মগ্ন থাকে ঘোর পার্থিবতায়, ফলে হয়ে পড়ে আল্লাহ্র স্মরণবিচ্যুত, আমি তার সহচররূপে নিযুক্ত করি সেই এক শয়তানকে। ওই শয়তান তাকে তখন শুভপথানুসারী হতে দেয়ই না। ভ্রষ্টতাকেই তার দৃষ্টিতে করে তোলে শোভন। সেকারণেই ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও সে তখন মনে করে, তার পথই সঠিক পথ।

এখানে 'নুক্বাইয়্যেদ্ব লাহু শাইত্বানা' অর্থ নিয়োজিত করি এক শয়তান। 'ফাহুয়া লাহু ক্বরীন' অর্থ সেই হয় তার সহচর। উল্লেখ্য, ওই শয়তান সহচরটিই তখন আল্লাহ্বিমুখ ব্যক্তিকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর অপবিশ্বাস ও পাপকে তার চোখে প্রতিভাত করায় সুন্দররূপে। আর সে-ও তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তার আচরিত মতাদর্শই হচ্ছে সৎ মতাদর্শ।

মোহাম্মদ ইবনে ওসমান মাখজুমী বর্ণনা করেছেন, কুরায়েশরা একবার নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে ঠিক করলো যে, মোহাম্মদের প্রত্যেক সহচরের জন্য এমন একজন করে লোক নিযুক্ত করা হোক, যে তাদেরকে বিভিন্নভাবে পর্যুদস্ত করতে পারবে। তাই করা হলো। হজরত আবু বকরকে নাজেহাল করার জন্য নিযুক্ত করা

হলো তালহা ইবনে উবাইদকে। তালহা হজরত আবু বকরের কাছে গিয়ে দেখলো, তিনি তাঁর কয়েকজন সতীর্থকে নিয়ে বসে আছেন। তিনি তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তালহা! কিছু বলতে চাও? তালহা বললো, হ্যাঁ, আমি তোমাকে লাত উজ্জার উপাসনার দিকে আহ্বান জানাতে চাই। তিনি বললেন, লাত কে? তালহা বললো, আমাদের পালনকর্তা। হজরত আবু বকর পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, উজ্জা তাহলে কে? তালহা বললো, মেয়েরা। তিনি পুনঃপ্রশ্ন করলেন, তাদের মা কে ছিলো? তালহা একথার কোনো জবাব দিতে পারলো না। তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললো, এবার তোমরা জবাব দাও। সকলেই নির্বাক। তালহা বললো, আবু বকর! উঠুন। আমার সাক্ষ্য শুনুন। আমি ঘোষণা দিচ্ছি 'আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রসুল'। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো। কতো নিকৃষ্ট সহচর সে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এধরনের লোক যখন মহাবিচারের দিবসে অপরাধীরূপে দণ্ডায়মান হবে, তখন সে তার ওই সহচর শয়তানকে দেখে ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়বে। বলবে, পৃথিবীতে তোর সঙ্গে যদি আমার সূর্যোদয়স্থান ও সূর্যাস্তস্থানের ব্যবধানের সমান ব্যবধান থাকতো, তাহলে আজ আমি এই মহাসংকটে পড়তাম না। তোর মতো নিকৃষ্ট সহচর আর হয়ই না।

এখানে 'ইয়ালাইতা' কথাটির 'ইয়া' শব্দটি হয় সতর্কসূচক, না হয় সম্বোধনমূলক এবং সম্বোধিত জন এখানে রয়েছে উহ্য। এখানে পুরো সম্বোধনটি দাঁড়ায় 'ইয়া ক্বরীন' হে সহচর! 'মাশরিক্বাইন' অর্থ দুই পূর্ব এবং 'মাগরিবাইন' অর্থ দুই পশ্চিম। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে সূর্যোদয়স্থল ও অস্তস্থলে ঘটে তারতম্য। সে কারণেই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবচনবোধক শব্দরূপ 'মাশরিক্বাইন 'ও 'মাগরিবাইন'।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, কাফেরদেরকে যখন কবর থেকে ওঠানো হবে, তখন তাদের শয়তানকেও তাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। এভাবে উভয়কে এক সঙ্গে প্রবেশ করানো হবে দোজখে।

এরপরের আয়াতে (৩৯) বলা হয়েছে— 'আর আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক'। একথার অর্থ— হে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা! তোমরা মহাবিচারের দিবসে আক্ষেপে ও অনুতাপে জর্জরিত হতে থাকবে বটে, কিন্তু তোমাদের সে অনুতাপ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। কারণ ওই স্থান সংশোধনের স্থান নয়। ওই স্থান হচ্ছে প্রতিফল প্রদানের স্থান। তাই তখন তোমাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, পৃথিবীতে তোমরা শয়তানের সঙ্গে যোগসাজশ করে প্রতিমাপূজার মতো ঘৃণ্য অপকর্মে লিপ্ত ছিলে,

ছাড়িয়ে গিয়েছিলে সভ্যতা-ভব্যতা ও শুভবোধের সকল সীমানা। তাই তোমরা সকলে এবার মহাশাস্তি ভোগ করতে থাকো। অর্থাৎ স্বেচ্ছারিতার ক্ষেত্রে যখন একজোট হয়েছিলে, তখন শাস্তিও ভোগ করো একজোট অবস্থায়। বক্তব্যটি এরকমও হতে পারে যে— তোমরা তখন সকলে মিলে একজোট হলেও তোমাদের উপরে আপতিত শাস্তিকে রোধ অথবা লঘু করতে পারবে না। সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় অনেক বিপদগ্রস্ত লোক একসাথে হলে তাদের দুঃখবোধ কিছুটা হাল্কা হয়ে যায়। কিন্তু সেরকম কোনো অনুভূতি তখন তাদের হবেই না। কেননা তখন শাস্তি হবে অতীব তীব্র।

এরপরের আয়াতে (৪০) বলা হয়েছে— 'তুমি কি শোনাতে পারবে বধিরকে অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাকে কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে'?

এখানকার 'তাকে কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে' বাক্যটির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে 'যে অন্ধ' কথাটির সঙ্গে। কেননা অন্ধ হওয়া এবং পথভ্রষ্ট হওয়া দু'টি পৃথক ধরনের বৈশিষ্ট্য। আর প্রশ্নটি (তাকে কি পারবে) এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও বিস্ময়াত্মক। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! ওই সকল লোক অবিশ্বাস ও পৌত্তলিকতায় আসক্ত নিমজ্জিত। তাদের দৃষ্টি অজ্ঞতা ও মূর্খতার পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত, শ্রবণেন্দ্রিয়ও সত্যের বাণী শুনবার যোগ্যতারহিত। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে পথ দেখাবেন কেমন করে? কেমন করেই বা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাবেন মহাগ্রন্থ এই কোরআনের সুললিত বাণী?

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি যদি তোমাকে নিয়ে যাই তবু আমি তাদেরকে শাস্তি দিবো (৪১), অথবা আমি তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি, আমি তোমাকে তা প্রদর্শন করাই, বস্তুত তাদের উপর তো আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে' (৪২)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! তাদেরকে শাস্তি দিবো বলে আমি যে অঙ্গীকার করেছি, তা আমি যথাসময়ে পরিপূর্ণ করবোই। কেননা তাদের উপর এবং মহাবিশ্বের উপর আমি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আমার অভিপ্রায়নির্ভর। আমি হয়তো তাদেরকে শাস্তি দিবো আপনি পৃথিবীতে থাকতেই, অথবা আপনার পৃথিবী পরিত্যাগের পর।

এখানকার 'ফাইম্মা' (আমি যদি) কথাটির মূল রূপ ছিলো 'ফা ইন্ মা'। এর মধ্যে 'ইন্' হচ্ছে শর্তপ্রকাশক এবং 'মা' অতিরিক্ত ও দৃঢ়তাপ্রকাশক। সেকারণেই এখানকার 'নাজহাবান্না' কথাটির 'নুন' অক্ষরটি আনা হয়েছে অধিকতর দৃঢ়তা জ্ঞাপনার্থে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার নবী! আপনি কোনো চিন্তা
করবেন না। আমি আপনার শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করবোই। আপনার জীবদ্দশায়, অথবা আপনার মহাতিরোভাবের পর। তাছাড়া তাদের জন্য পরকালের স্থায়ী শাস্তি তো রয়েছেই। তারা তো কখনোই আমার আওতার বাইরে যেতে পারবে না। তাই আমি যখন ইচ্ছা, তখনই তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাক এখানে উল্লেখিত শাস্তি তাদের উপরে অবতীর্ণ করেছিলেন বদর যুদ্ধের সময়। অধিকাংশ তাফসীরবেত্তাগণের অভিমত এরকমই।

হাসান ও কাতাদা বলেছেন, রসুল স. এর জীবদ্দশায় মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো তিক্ত ঘটনা ঘটেনি যা তাঁর মনোবেদনার কারণ হতে পারতো। কিন্তু তাঁর মহাতিরোধানের পর এই উম্মতের মধ্যে দেখা দেয় অনেক বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে ওই সকল ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স.কে স্বপ্নযোগে তাঁর উম্মতের পরবর্তী আত্মকলহ ও যুদ্ধবিগ্রহের দৃশ্যগুলো দেখিয়ে দেওয়া হয়। তাই ওই স্বপ্নদর্শনের পর পৃথিবী পরিত্যাগ অবধি তাঁকে আর প্রফুল্লচিত্ত দেখা যায়নি। আমি মনে করি, রসুল স.কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিলো ইমাম হোসেনের কারবালায় শাহাদত বরণ এবং বনী উমাইয়ার উদ্ধত অভ্যুদয়ের ঘটনা। আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ আবদী বলেছেন, হজরত আলী এই আয়াত পাঠ করার পর বলতেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি চলে গেলেন, আর আল্লাহর শাস্তি অবশিষ্ট রয়ে গেলো তাঁর দুশমনদের জন্য।

এরপরের আয়াতে (৪৩) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো। তুমি সরল পথেই রয়েছো'। একথার অর্থ— সুতরাং হে আমার রসুল! আপনি নিমগ্ন থাকুন আপনার কর্তব্যকর্মে। জিবরাইলের মাধ্যমে আপনার অন্তরে আমি যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করে চলেছি, সেই প্রত্যাদেশানুসারে আপনি চলুন। কেননা আপনি সরল সঠিক পথে রয়েছেন, যে পথে বক্রতার লেশমাত্রও নেই।

এখানকার 'ফাস্তাম্সিক' কথাটির 'ফা' নৈমিত্তিক। এর সম্পর্ক রয়েছে ৩ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত 'অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়' কথাটির সঙ্গে। মধ্যবর্তী আয়াতসমূহ ভিন্ন প্রসঙ্গের এবং এখানকার 'তুমি সরল পথেই রয়েছো' কথাটিতে বিধৃত হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যটির কারণ।

এরপরের আয়াতে (৪৪) বলা হয়েছে— 'কোরআন তো তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই কোরআন আপনার এবং আপনার নিজ সম্প্রদায় কুরায়েশদের জন্য অতীব সম্মানের।

হজরত আদী ইবনে হাতেম বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি স. বললেন, আমার হৃদয়ে আমার সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য যে প্রগাঢ় ভালোবাসা রয়েছে, তা আল্লাহ্ জানেন। তাই তিনি আমার সঙ্গে আমার সম্প্রদায়কেও সম্মান দান করেছে। একথা বলে তিনি পাঠ করলেন, 'কোরআন তো তোমার ও তোমার

সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু'। তারপর পাঠ করলেন 'তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও এবং তোমার বিশ্বাসী অনুগামীদের প্রতি সদয় হও'। এরপর তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট আরো কৃতজ্ঞতা জানাই একারণে যে, তিনি আমার সম্প্রদায় থেকেই প্রকাশ করেছেন সিদ্দীক, শহীদ ও ইমামগণকে। অবশ্যই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাগণের অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। তিনি সমগ্র আরব জাহানের মধ্যে কুরায়েশদেরকে করেছেন সর্বোত্তম। কুরায়েশ সম্প্রদায় হচ্ছে ওই প্রাচুর্য ভরা বৃক্ষ সমতুল্য যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন 'পবিত্র বাক্য হচ্ছে পবিত্র

বৃক্ষের মতো। তার শিকড় সুপ্রোথিত এবং ডালপালা আকাশে সুবিস্তৃত'। আর এখানে 'সম্মান' অর্থ ইসলামের সম্মান, যার প্রতি আল্লাহ্ কুরায়েশদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং তাদেরকে এই সম্মানের উপযুক্ত করেছেন। তাদেরকে সম্মানিত করণার্থেই আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন সুরা কুরায়েশ।

হজরত আদী ইবনে হাতেম আরো বর্ণনা করেছেন, আমি এমন কখনো দেখিনি যে, রসুল স. এর সম্মুখে কুরায়েশ প্রসঙ্গে কল্যাণকর আলোচনা উত্থাপন করলে তিনি স. এতে করে আনন্দিত হননি। এই প্রসঙ্গটির আলোচনা তাঁর নিকট এতো প্রীতিকর ছিলো যে, তাঁর চেহারার আনন্দের ছাপ সকলেরই চোখে পড়তো এবং তিনি আনন্দের আতিশয্যে প্রায়শই পাঠ করতেন 'কোরআন তো তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের সম্মানের বস্তু'।

জুহাক সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. এর কাছে যখন জানতে চাওয়া হতো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনার পরে আপনার স্থলাভিষিক্ত হবেন কে? তখন তিনি স. কোনো জবাব দিতেন না। কিন্তু এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এরকম প্রশ্ন শুনে তিনি স. জবাব দিতেন, আমার স্থলাভিষিক্তি অর্জিত হবে কুরায়েশদের। হজরত আলী থেকেও এরকম হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হজরত ইবনে ওমর উল্লেখ করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন মাত্র দু'জন মানুষ থাকবে তখনও নেতৃত্ব থাকবে কুরায়েশদের। অথবা বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে মাত্র দু'জন অবশিষ্ট থাকলেও নেতৃত্ব থাকা প্রয়োজন কুরায়েশদের।

হজরত মুয়াবিয়া বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, প্রশাসক কুরায়েশদের মধ্যেই থাকবে। যে কেউ এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে, আল্লাহ্ তার শক্তি খর্ব করবেন, যে পর্যন্ত সেই কুরায়েশ ধর্মকে সোজা রাখবে।

মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'সম্প্রদায়' অর্থ আরব সম্প্রদায়। কোরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই সমগ্র আরববাসী একারণে শ্রদ্ধার্হ। এর মধ্যে যে আরববাসী কোরআনের সেবায় অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তার মর্যাদা অন্যাপেক্ষা অধিক। এভাবে দেখা যায়, কুরায়েশ সম্প্রদায় অন্যাপেক্ষা অধিক উত্তম এবং তাঁর মধ্যে বনী হাশেম অত্যুত্তম। কেননা রসুল স. স্বয়ং কুরায়েশ এবং বনী হাশেম।

আলোচ্য বাক্যটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, রসুল স. মহাসম্মান লাভ করেছেন আল্লাহ্ প্রদত্ত গভীর জ্ঞান ও মহাপ্রজ্ঞার কারণে এবং তাঁর সম্প্রদায়, অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ সম্মানলাভ করেছেন ইসলাম প্রাপ্তির কারণে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে'। একথার অর্থ— হে ইসলামের অনুসারীরা! শুনে রাখো, মহাবিচারের দিবসে অবশ্যই তোমাদেরকে এই কোরআন বা এই ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বলা হবে, তোমরা এই কোরআনের নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা পালনে কতোটুকু যত্নবান ছিলে?

এরপরের আয়াতে (৪৫) বলা হয়েছে— 'তোমার পূর্বে আমি যে সকল রসুল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা করো, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো দেবতা স্থির করেছিলাম, যার ইবাদত করা যায়'?

বাগবী লিখেছেন, এ বিষয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন যে, এখানে কাকে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে? সরাসরি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে, না তাঁদের অনুসারীদেরকে। আতা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স.কে মেরাজ রজনীতে যখন ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, তখন পূর্ববর্তী সকল নবী-রসুলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছিলো। বায়তুল মাকদিসের ওই আম্বিয়া সমাবেশে হজরত জিবরাইল আজান ও ইকামত বলেছিলেন। একথাও রসুল স.কে বলেছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম রসুল! আপনিই ইমাম। রসুল স. এর ইমামতিতে নামাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হজরত জিবরাইল পাঠ করে শুনিয়েছিলেন এই আয়াত। রসুল স. তখন বলেছিলেন, আপনার আবৃত্তি তো আমরা সকলেই শুনলাম। এতোটুকুই যথেষ্ট।

জুহুরী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেছেন, শবে মেরাজে আল্লাহ্‌তায়ালা রসুল স. সহ সকল পয়গম্বরকে একত্র করলেন। অবতীর্ণ হলো 'তোমার পূর্বে যে সকল রসুল ..... ইবাদত করা যায়'। রসুল স. আয়াতখানি আবৃত্তি করে শোনালেন বটে, কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ তিনি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, সকল নবীই এ ব্যাপারে একই কথা বলবেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যায় না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এখানকার ‘মান আরসালনা’ কথাটির পূর্বে উহ্য রয়েছে ‘উমাম’ শব্দটি। ওই উহ্যতা সহ সম্বোধনটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! আপনি পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের আলেমগণকে জিজ্ঞেস করুন। আর যে সব আলেম সুশোভিত হয়েছিলেন ইসলাম রূপ অমূল্য সম্পদে। আতা ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় এসেছে তেমনই, যেমন ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস। মুজাহিদ, কাতাদা, জুহাক, সুদ্দী, হাসান ও মুকাতিলও এরকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। হজরত ইবনে মাসউদ এবং হজরত উবাই ইবনে কা'ব আয়াতখানি পাঠ করতেন এভাবে ‘ওয়াস্আলিল্ লাজীনা আরসালনা ইলাইহিম ক্বলাকা মির রসুলিনা’ (এবং জিজ্ঞেস করুন ওই সকল লোককে যাদের কাছে আমি ইতোপূর্বে রসুল প্রেরণ করেছিলাম)। এমতো পাঠটিও হজরত ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যার অনুকূল। এভাবে এখানকার এই প্রশ্নটির মূল উদ্দেশ্য হয়েছে মূর্তিপূজকদেরকে একথাই বুঝিয়ে দেওয়া যে, সকল যুগের সকল নবীই ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর বিরুদ্ধে। তারা সকলেই মানুষকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বলেছেন। নিষেধ করেছেন আল্লাহ্‌র সমকক্ষ অথবা অংশীদার হিসাবে কাউকে অথবা কোনো কিছু দাঁড় করাতে।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬

❑ মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, ‘আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত।’

❑ সে উহাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবামাত্র উহারা তাহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল।

❑ আমি উহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে।

❑ উহারা বলিয়াছিল, ‘হে জাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তাহা প্রার্থনা কর যাহা তিনি তোমার সহিত অংগীকার করিয়াছেন, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করিব।’

❑ অতঃপর যখন আমি উহাদিগ হইতে শাস্তি বিদূরিত করিলাম তখনই উহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বসিল।

❑ ফির'আওন তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলিয়া ঘোষণা করিল,'হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নহে? আর এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা ইহা দেখ না?

❑ 'আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলিতেও অক্ষম!

❑ 'মূসাকে কেন দেওয়া হইল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তাহার সঙ্গে কেন আসিল না ফিরিশ্‌তাগণ দলবদ্ধভাবে?'

❑ এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল, ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল। উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

❑ যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদের সকলকে।

❑ তৎপর পরবর্তীদের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে দুঃখিত হবেন না। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এরকমই করে থাকে। আপনার পূর্বে প্রেরিত মুসা নবীর ক্ষেত্রেও এরকমই ঘটেছিলো। আমি তাকে অলৌকিক যষ্টি ও শুভ্রোজ্জ্বল হাতের নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। মুসা তাদেরকে বলেছিলেন, আমি মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপ্রতিপালক আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রসুল। কিন্তু তারা তাঁর কথা বিশ্বাস করলো না। বরং তাঁর কথা নিয়ে, অথবা তাঁর নিদর্শনসমূহ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিলো। উল্লেখ্য, এখানে হজরত মুসার ইতিবৃত্তের অবতারণা করা হয়েছে রসুল স.কে সান্ত্বনা প্রদানার্থেই। আর এ ঘটনার মাধ্যমে ৩১ সংখ্যক আয়াতে উল্লেখিত মক্কার মুশরিকদের এই কোরআন কেনো নাজিল করা হলো না শ্রেষ্ঠ দু'টি জনপদের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর' কথাটিকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ নবুয়ত ফেরাউনের মতো প্রতাপশালী নৃপতিদের ভাগ্যে জোটে না। মহৎহৃদয় মুসার মতো মহান ব্যক্তিত্বই নবুয়তের পবিত্র গুরুভার বহন করতে পারেন। এটাই আল্লাহ্‌র শাশ্বত রীতি। হজরত মুসার একত্ববাদসম্ভূত সাক্ষ্য উপস্থাপন করাও আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের আর একটি উদ্দেশ্য।

এরপরের আয়াতে (৪৮) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে এমন কোনো নিদর্শন দেখাইনি, যা অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে'। একথার অর্থ— আমি তখন তাদেরকে আরো অনেক নিদর্শন দেখালাম। তাদের শুভবোধকে জাগ্রত করবার জন্য শাস্তিও দিলাম ওই সকল অলৌকিক নিদর্শনগুলোর মাধ্যমে। যেমন তাদেরকে করলাম দুর্ভিক্ষকবলিত, কখনো প্রবাহিত করলাম প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝা, অতিষ্ঠ করলাম তাদের শস্যক্ষেত্রে পঙ্গপালের আক্রমণ দিয়ে। আরো আপতিত করলাম ভেক, রক্ত ইত্যাদির আযাব। এ সকল কিছুর উদ্দেশ্য ছিলো, তারা যেনো সত্য পথে ফিরে আসে।

এখানে 'আকবারু মিন উখ্‌তিহা' অর্থ তার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ ওই সকল অলৌকিকত্বের প্রতিটিই ছিলো চূড়ান্ত বিস্ময়ের। ফেরাউন ও তার লোকেরা তাই প্রতিটি নিদর্শনকে শ্রেষ্ঠ না ভেবে পারতো না। যেমন জনৈক কবি বলেছেন— যার সঙ্গেই তোমার সাক্ষাত ঘটুক না কেনো, তুমি সাক্ষাত করলে তাদের নেতার সঙ্গে। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে নেতার মতো গুণাবলী। যেমন নক্ষত্রের আলোর দিকনির্দেশনায় চলে পথিক। কিংবা এরকমও বলা যেতে পারে যে, ওই নিদর্শনগুলোর প্রতিটির প্রকৃতি ও বিশেষত্ব ছিলো অনন্যসাধারণ।

এরপরের আয়াতে (৪৯) বলা হয়েছে— 'তারা বলেছিলো, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা করো, যা তিনি তোমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, তা হলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করবো'। একথার অর্থ— যখন তাদের উপরে দুর্ভিক্ষ, পঙ্গপাল ইত্যাদির শাস্তি শুরু হলো, তখন তারা হজরত মুসাকে বললো, হে অজেয় যাদুকর! তোমার ক্ষমতাকে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করো, তিনি যেনো আমাদের কষ্ট দূর করে দেন। আমরা কথা দিচ্ছি, বিপদমুক্ত হলে আমরা তোমার ধর্মমতের অনুসারী হবো। উল্লেখ্য, প্রতিটি বিপদেই তারা হজরত মুসার কাছে এরকম আবেদন জানাতো। হজরত মুসা প্রতিবার দোয়া করতেন। ফলে বিপদ সরে যেতো। কিন্তু তারা তাদের কথা রাখতো না। বরং পূর্বাপেক্ষা আরো অধিক দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতো সত্যপ্রত্যাখ্যানকে। আর তাঁকে নবী বলে স্বীকার না করে বার বার তাঁকে সম্বোধন করতো যাদুকর বলে।

কেউ কেউ বলেছেন, হজরত মুসাকে তারা 'যাদুকর' বলতো শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে। কেননা তাদের দৃষ্টিতে যাদু ছিলো অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জ্ঞান। তাই 'হে যাদুকর' বলে তারা যেনো এটাই বোঝাতে চাইতো যে, হে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও নিপুণ বিদ্যার অধিকারী। আমার কাছে ব্যাখ্যাটি সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা হজরত মুসা কর্তৃক প্রদর্শিত মোজেজাকে যাদু বললে তিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন। এক আয়াতে সে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এভাবে— 'সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবার পরেও তোমরা একথা বলছো? একি যাদু? যারা যাদুকর, তারা তো সফল হতে পারে না'। কেউ কেউ আবার বলেছেন, তাদের 'যাদুকর' বলার উদ্দেশ্য ছিলো এরকম— ওই লোক তো যাদু দ্বারাই আমাদেরকে প্রভাবান্বিত করেছে। এই ব্যাখ্যাটিও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার সমতুল। সুতরাং এই ব্যাখ্যাটিকেও সঠিক বলা যায় না।

এরপরের আয়াতে (৫০) বলা হয়েছে— 'অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি বিদূরিত করলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসলো'। একথার অর্থ— আমি আমার নবীর দোয়া কবুল করলাম। বিপদ অপসারিত করলাম তাদের উপর থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা ইমান আনয়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তা ভঙ্গ করে বসলো।

এরপরের আয়াতে (৫১) বলা হয়েছে— 'ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করলো, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? আর এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা কি এটা দেখ না'? একথার অর্থ— বিপদ বিদূরিত হওয়ার পর ফেরাউন তার লোকজনদেরকে একত্র করলো। তার আশংকা হলো, লোকেরা আবার না হজরত মুসার আনুগত্য স্বীকার করে বসে। তাই সে তার প্রতাপ পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমিই কি মিসরাধিপতি নই? আর এই নহরগুলো, যেগুলো প্রবাহিত হচ্ছে আমার রাজপ্রাসাদের তলদেশ দিয়ে, এগুলো কি আমার কর্তৃত্বভূত নয়? এগুলো তো তোমাদের চোখের সামনেই। তোমরা কি দেখছো না?

এখানে 'আনহার' অর্থ নদী, নহর। উল্লেখ্য, নীলনদের ছিলো অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা। সেগুলোর প্রধান শাখা ছিলো চারটি— নহরে শাহী, নহরে তুলুন, নহরে দিমিয়াত ও নহরে তিনস্। 'তাজ্‌রি মিন তাহ্‌তী' অর্থ আমার মহলের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত, অথবা বয়ে চলেছে আমার আদেশে, কিংবা প্রবাহিত হচ্ছে শাহী উদ্যানসমূহের মধ্য দিয়ে। আর 'আফালা তুব্‌সিরূন' অর্থ তোমরা কি এসব দ্যাখো না?

এরপরের আয়াতে (৫২) বলা হয়েছে— 'আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি থেকে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম'।

হজরত মুসার উচ্চারণে আড়ষ্টতা ছিলো। তিনি এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও— যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে'। এরকম প্রার্থনার পর তাঁর উচ্চারণের আড়ষ্টতা অনেকাংশে দূর হয়ে গিয়েছিলো। তৎসত্ত্বেও কিছুটা আড়ষ্টতা ছিলোই। সেদিকে ইঙ্গিত করেই ফেরাউন তার লোকজনকে বলেছিলো— মুসা তো স্পষ্ট করে কথা বলতেও অক্ষম। সুতরাং সে হীন। কিন্তু দ্যাখো, আমার কথায় কোনো জড়তা নেই। সুতরাং আমি কি তার চেয়ে উত্তম নই। আর উত্তম যে, তার অনুসারী হওয়াই কি তোমাদের কর্তব্য নয়?

এখানকার 'মাহীন' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'মুহানাত' থেকে। এর অর্থ অপূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা, হীনতা, দুর্বলতা, যা অধিনায়ক হওয়ার অন্তরায়। প্রথমে উল্লেখিত 'আম' শব্দটি এখানে মুনকাতিয়া বা বিচ্ছিন্নকারী। আর 'হামযা' অক্ষরটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে জিজ্ঞাসাবোধক অর্থে এবং এই জিজ্ঞাসা স্বীকৃতিজ্ঞাপক। এভাবে এখানকার 'আম্‌আনা খইর' কথাটির অর্থ দাঁড়িয়েছে— আমিই তো শ্রেষ্ঠ।

বাগবী লিখেছেন, অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে এখানকার 'আম' অর্থ 'বাল'। ফাররা বলেছেন, এখানে 'আম' হয়েছে 'মুত্তাসিলা' বা সংযোজক। এবং শব্দটির পরেই রয়েছে যতিচিহ্ন। অর্থাৎ তোমরা কি দ্যাখো না, বা তোমরা তো দেখছোই। এমতাবস্থায় 'আম' এর পরে শুরু হয় নতুন বাক্য বা পরবর্তী বাক্য। এখানে 'কারণে'র স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ পরবর্তী ফলাফলকে। এভাবে বক্তব্যটি

দাঁড়িয়েছে— তোমরা তো জানোই যে, আমি তার চেয়ে শ্রেয়ঃ। এমতাবস্থায় শ্রেয়ঃ হওয়ার জ্ঞান হচ্ছে কারণের ফল এবং দেখাটা হচ্ছে কারণ। যেনো বলা হয়েছে— তোমরা কি দ্যাখো না, বা তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছো, এবং দেখার পরে জানছো যে, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এরপরের আয়াতে (৫৩) বলা হয়েছে— 'মুসাকে কেনো দেওয়া হলো না স্বর্ণবলয়, অথবা তার সঙ্গে কেনো এলো না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে'?

মুজাহিদ বলেছেন, মিসরবাসীদের রীতি ছিলো, কাউকে জনপতি করা হলে, নেতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ তাকে সোনার কাঁকন ও গলাবন্ধ পরিয়ে দেওয়া হতো। এগুলোই ছিলো তার জনপতি হওয়ার নিদর্শন। ফেরাউন তাই বলেছিলো— মুসা যদি জননেতাই হবে, তবে যিনি তাকে এরকম দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি তাকে সোনার বালা পরালেন না কেনো?

'তার সঙ্গে কেনো এলোনা ফেরেশতারা দলবদ্ধভাবে' কথাটির অর্থ আমরা তো তাকে জননায়ক বানাইনি। সুতরাং তার জননায়ক হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়া উচিত ফেরেশতাদের। কিন্তু তাদেরকেও তো আমরা অনুপস্থিত দেখছি। সুতরাং তাকে আমরা নেতা বা নবী বলে মানতে পারি কীভাবে?

এরপরের আয়াতে(৫৪) বলা হয়েছে— 'এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিলো, ফলে তারা তার কথা মেনে নিলো। তারা তো ছিলো এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— ফেরাউনের এরকম যুক্তিপ্রমাণ শুনে তার লোকেরা নির্বাক

হয়ে গেলো। ফেরাউনের কথাকেই মেনে নিলো সর্বান্তঃকরণে। এর কারণ এই যে, তাদের হৃদয় ছিলো চিররুদ্ধ। তাই সত্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। সত্তাগতভাবেই তারা সত্যের সঙ্গে ছিলো সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত।

এখানে **'ফাস্তাখাফ্ফা ক্বওমাহ'** অর্থ এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিলো। **'ইসতাখফ্ফা রায়া'** অর্থ কারো সিদ্ধান্তকে অশুদ্ধ করে দেওয়া এবং সঠিক পথ থেকে হটিয়ে দেওয়া। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছ থেকে আশা করেছিলো ত্বরিৎ ও দৃঢ় আনুগত্য। আর বিভিন্ন অপযুক্তি প্রদর্শন করে সে তা পেয়েছিলোও। হজরত মুসাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা সত্ত্বেও তারা তা ভঙ্গ করেছিলো নির্দ্বিধায়। আর এখানকার **'তারা ছিলো এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়'** কথাটির অর্থ নিঃসন্দেহে তারা সত্তাগতভাবে ছিলো পাপাসক্ত। তাই অনুগত হয়েছিলো পাপিষ্ঠের।

এরপরের আয়াতে (৫৫) বলা হয়েছে— **'যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করলো, আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সকলকে'**। একথার অর্থ— যখন তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলো, তখন আমি ক্রোধান্বিত হলাম এবং তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম সমুদ্রগর্ভে।

এখানে **'আসাফূনা'** অর্থ আমাকে ক্রোধান্বিত করলো। যেমন বলা হয় **'আসাফা ফুলানুন'** (অমুক ব্যক্তি ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়েছে)।

এরপরের আয়াতে (৫৬) বলা হয়েছে— **'তৎপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত'**।

এখানে **'সালাফান্'** অর্থ ইতিহাস। শব্দটি একটি ধাতুমূল। অথবা শব্দটি **'সালিফুন'** এর বহুবচন, যেমন **'খাদামা'** বহুবচন **'খাদিমুন'** এর। এভাবে এখানকার বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এভাবে আমি তাদেরকে ইতিহাস করে রাখলাম, যাতে পরবর্তী যুগের মানুষেরা এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের জন্য এই ঘটনাটি হয় একটি দৃষ্টান্ত।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে দোজখের দিকে অগ্রগামী করে রেখেছি এবং তাদেরকে করেছি তাদের পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও উপদেশ। কেউ কেউ বলেছেন, **'মাছালা'** শব্দটির উদ্দেশ্য এখানে— তাদের এমতো বিস্ময়কর ঘটনাকে আমি প্রবাদতুল্য করে রেখেছি, যেনো চিরন্তন প্রবাদবচনরূপে তাদের এই মর্মান্তিক ঘটনাটি মানুষের মধ্যে আলোচিত হতে থাকে। এদের মতো কাউকে অবাধ্যতা করতে দেখলে যেনো লোকে বলে, তোমরা তো দেখছি ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তদের মতো।

যথাসূত্রপরম্পরায় আহমদ ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার রসুল স. কুরায়েশদেরকে বললেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। তারা বললো, তাহলে তুমি যে বললে ঈসা আল্লাহ্র নবী এবং আল্লাহ্র একজন প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্র পুত্র হিসেবে তাকেও তো খৃষ্টানেরা পূজা করে থাকে। তাহলে তার মধ্যেও কি কোনো কল্যাণ নেই? তাদের এমতো অপবচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত—

সূরা যুখ্রুফ ঃ আয়াত ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২

❑ **যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় তাহাতে শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয়,**

❑ এবং বলে, 'আমাদের উপাস্যগুলি শ্রেষ্ঠ না 'ঈসা?' ইহারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে। বস্তুত ইহারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

❑ সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।

❑ আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের মধ্য হইতে ফিরিশ্তা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইত।

❑ 'ঈসা তো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরল পথ।

❑ শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি যখন আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ঈসা ইবনে মরিয়মের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, তখন তারা আনন্দে অধীর হয়ে হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। বলে, কোরআনেই বলা হয়েছে— এক আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য কারো উপাসনা করা হলে, ওই উপাস্যও হবে জাহান্নামের ইন্ধন। খৃষ্টানেরা তো ঈসার উপাসনা করে। তাহলে সে-ও তো জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আর আমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলোর তুলনায় ঈসা তো শ্রেষ্ঠও নয়। হে আমার রসুল! আপনি তাদের এমতো হৈ-চৈ শোরগোলকে উপেক্ষা করুন। কেননা ওই লোকেরা সত্যান্বেষী নয়। বরং অযথা বিতর্ক করাই তাদের স্বভাব।

ইবনে মারদুবিয়া ও জিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইবনে যাবআরী রসুল স.কে বললো, হে মোহাম্মদ! 'এক আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের উপাসনা করা হয়, তারা দোজখের ইন্ধন হবে' এই আয়াত কি আপনার উপর অবতীর্ণ হয়নি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। সে বললো, চন্দ্র, সূর্য, ফেরেশতা, ঈসা, উযায়েরের যে পূজা করা হয়, তাহলে তারাও কি দোজখের ইন্ধন হবে? তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে, তারা দোজখ থেকে দূরে থাকবে' এবং তৎসহ অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়।

এখানে 'ইয়াসিদ্দূন' অর্থ শোরগোল, হৈ-চৈ। 'ইয়াসিদ্দূন' ও 'ইয়াসুদ্দূন' শব্দ দু'টো সমঅর্থসম্পন্ন। ক্বারী কাসাই বলেছেন, শব্দটি দু'রকমভাবেই ব্যবহারযোগ্য, যেমন একই অর্থে ব্যবহারযোগ্য 'ইয়া'রিশূন' ও 'ইয়া'রুশূন'। তিনি একথাও বলেছেন যে, 'ইয়াসিদ্দূন' অর্থ চেঁচামেচি করা। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবও এরকম বলেছেন। জুহাক বলেছেন, এর অর্থ আশ্চর্যান্বিত করে। কাতাদা বলেছেন, তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে। কুরতুবী বলেছেন, তাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। কাতাদা বলেছেন, কথাটির অর্থ— তারা বলে, মোহাম্মদ চায়, খৃষ্টানেরা যেমন ঈসার উপাসনা করে, তেমনি আমরাও যেনো উপাসনা শুরু করে দিই।

ইবনে জায়েদ ও সুদ্দী বলেছেন, এখানকার 'হুয়া' অর্থ হজরত ঈসা। অর্থাৎ 'হুয়া' সর্বনামটি এখানে রসুল স.কে চিহ্নিত করে না, চিহ্নিত করে হজরত ঈসাকে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, হে মোহাম্মদ! তুমি বলো, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে পূজা করা হয়, তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। এটা তো আমাদের জন্য ভালোই। আমরাও চাই, ঈসা, উযায়ের ও ফেরেশতাদের সঙ্গে আমাদের দেবতারাও দোজখে চলে যাক।

'মা দ্বরাবূহু লাকা ইল্লা জ্বাদালা' অর্থ এরা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে। অর্থাৎ সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করবার উদ্দেশ্যে নয়, তারা এরকম কুটতর্কের অবতারণা করে শুধুই বিতণ্ডা সৃষ্টির জন্য। আর তারা একথাও ভালো ভাবে জানে যে, আপনি তাদের দ্বারা উপাসিত হবেন, সেরকম কোনো উদ্দেশ্যও আপনার নেই। অথবা তারা ভালোভাবে জানে 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করো, তারা হবে দোজখের ইন্ধন' আয়াতের অর্থ দোজখের ইন্ধন হবে তাদের অপ্রাণ বিগ্রহসমূহ— প্রাণবন্ত ঈসা, উযায়ের এবং ফেরেশতারা নয়। আর 'বালহুম ক্বওমুন খসিমুন' অর্থ বস্তুত তারা তো এক বিতণ্ডা সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়।

হজরত আবু উমামা থেকে আহমদ, বাগবী, তিরমিজি, ইবনে মাজা ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সৎপথ প্রাপ্তির পর কোনো জাতি পথভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হয়েছে বিতণ্ডা সৃষ্টির স্বভাব(একারণেই তারা পথভ্রষ্ট হয়)। এরপর তিনি স. পাঠ করেন 'এরা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে। বস্তুত তারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়'।

এরপরের আয়াতে (৫৯) বলা হয়েছে— 'সে তো ছিলো আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বনী ইসরাইলের জন্য দৃষ্টান্ত'। একথার অর্থ— ঈসা আমার পুত্র কদাচ নয়। এরকম হওয়া সম্ভবও নয়। বরং ঈসা হচ্ছে আমার বান্দাগণের মধ্যে এক বান্দা, যাকে আমি নবুয়ত দ্বারা বিশেষভবে অনুগ্রহায়িত করেছি। বানিয়েছি বনী ইসরাইলদের জন্য আমার অপার ক্ষমতার এক অবাক নিদর্শন।

এরপরের আয়াতে (৬০) বলা হয়েছে— 'আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো'। একথার অর্থ— আমি ইচ্ছা করলে মানুষের মধ্য থেকে অথবা মানুষকে ধ্বংস করে দিয়ে তৎপরিবর্তে পৃথিবীতে প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম ফেরেশতাদেরকে। তারা পৃথিবীতে বসবাস করতো এবং

একনিষ্ঠভাবে আমার ইবাদত বন্দেগী করতো। অর্থাৎ ঈসাকে যেভাবে আমি সৃষ্টি করেছি তার চেয়েও বিস্ময়করভাবে তো আমি ফেরেশতাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। কিন্তু এতে করে কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের বংশগত সম্পর্ক প্রমাণিত হবে? বরং প্রমাণিত হবে তো এটাই যে, আল্লাহ্‌ই সকল লৌকিক ও অলৌকিক বিষয়াবলীর একমাত্র স্রষ্টা। আর তাঁর জ্ঞান ও শক্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

এরপরের আয়াতে (৬১) বলা হয়েছে— 'ঈসাতো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ কোরো না এবং আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সরল পথ'। একথার অর্থ— আমার প্রিয় নবী ঈসাকে আমি সশরীরে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছি। তাকে আমি করেছি কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। তাকে আমি পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করবো। তার আবির্ভাব তখন একথাই প্রমাণ করবে যে, কিয়ামত আর বেশী দূরে নয়। সুতরাং হে আমার বান্দাগণ! তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ো না। কেননা সরল পথ এটাই।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, ভেবে দ্যাখো, তখন তোমাদের অবস্থা কী রকম হবে, যখন মরিয়মতনয় তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন এবং তোমাদের ইমাম হবেন তোমাদের মধ্য থেকেই। হজরত হুজায়ফা ইবনে উসাইদ গিফারী বলেছেন, আমরা কয়েকজন মিলে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলাম। এমন সময় রসুল স. উপস্থিত হলেন। বললেন, কোন বিষয়ে তোমরা আলাপ করছিলে? আমরা বললাম, কিয়ামতের বিষয়ে। তিনি স. বললেন, মনে রেখো, দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। সে দশটি নিদর্শন হচ্ছে— ১. ধোঁয়া ২. দাজ্জাল ৩. দাব্বাতুল আরদ্ব ৪. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ৫. মরিয়মতনয় ঈসার পুনরাবির্ভাব ৬. ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব ৭. পৃথিবীর তিনটি স্থানে ভূমি ধস—পূর্বাঞ্চলে ৮. পশ্চিমাঞ্চলে ৯. আরব উপদ্বীপে ১০. ইয়েমেন থেকে উদ্ভূত হবে এক অভিনব আগুন, ওই আগুনই মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশর-প্রান্তরের দিকে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, দশম নিদর্শন হবে প্রচণ্ড বাতাস, যা মানুষজনকে নিক্ষেপ করবে সাগরে। মুসলিম।

হজরত নাওয়াস ইবনে সামআন বর্ণনা করেছেন, রসুল স. দাজ্জাল বিষয়ক এক দীর্ঘ হাদিসে উল্লেখ করেছেন, মরিয়মপুত্র ঈসাকে আল্লাহ্‌ পুনরায় প্রেরণ করবেন। তিনি দামেস্ক শহরের পূর্বদিকের শ্বেতশুভ্র মিনারের উপর নামবেন জরদ রঙের পোশাক পরে, দুই ফেরেশতার কাঁধে ভর দিয়ে। যখন তিনি মস্তক অবনত করবেন, তখন তাঁর বদন থেকে রৌপ্যমিশ্রিত মোতির মতো ঝরে পড়তে থাকবে স্বেদবিন্দু। আর এরকম ঘটবে তখনও যখন উত্তোলন করবেন মস্তক। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মরিয়মপুত্র ঈসা ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক হয়ে অবশ্যই তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন। অবশ্যই ভেঙে ফেলবেন ক্রুশ। বধ করবেন বরাহকুলকে। রহিত করবেন জিযিয়া। উষ্ট্রীকে এমন অকার্যকর করবেন যে, সেগুলো আর উপকারে আসবে না। দূর করে দিবেন মানুষের পারস্পরিক শত্রুতা। ধন-সম্পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবেন। কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করবে না।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের দলপতি মরিয়মপুত্রকে বলবে, আসুন, আপনি আমাদের নামাজের জামাতের ইমাম হন। তিনি এই উম্মতের অভূতপূর্ব মর্যাদা দেখে বলবেন, তোমাদের দলপতি তোমাদের মধ্য থেকেই হোক।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ঈসা বায়তুল মাকদিসে গিয়ে দেখবেন, আসরের নামাজ শুরু হয়েছে। তাঁর পদশব্দ শুনে ইমাম পিছনে সরে আসবে। তিনি তাঁকে ইশারায় পূর্বস্থানে গিয়ে দাঁড়াতে বলবেন এবং মোহাম্মদ স. এর শরিয়ত অনুসারে সকলের সঙ্গে মিলে নামাজ সম্পন্ন করবেন। তিনি শূকর নিধন করবেন, ক্রুশ ভাঙবেন, ইহুদী-খৃষ্টানদের উপাসনালয়গুলোকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তাঁকে যারা বিশ্বাস করবে, তাদেরকে ছাড়া অবশিষ্ট ইহুদী-খৃষ্টানকে হত্যা করবেন।

হাসান এবং ব্যাখ্যাকারগণের অভিমত হচ্ছে, এখানকার 'ইন্নাহু লা ই'লমুল লিস্‌সাআ'ত' কথাটির সর্বনাম 'হু' এর সম্বন্ধ কোরআনের দিকে। অর্থাৎ 'হু' অর্থ এখানে 'ঈসা' না হয়ে হবে কোরআন এবং এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে— কোরআন তো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন। অর্থাৎ কোরআন কিয়ামতের কথাই বলে। জানিয়ে দেয় কিয়ামতের ভয়াবহতার বিভিন্ন বিবরণ।

'ফালা তামতারুন্‌না বিহা ওয়াত্‌তাবিঊ'নী'' অর্থ সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ কোরো না। অর্থাৎ হজরত ঈসা অথবা কোরআন যখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে, তখন তোমরা এমতো সন্দেহে নিপতিত হয়ো না যে, কিয়ামত হবে না। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— সুতরাং তোমরা কিয়ামতকে মিথ্যা বলে প্রমাণ কোরো না।

'এবং আমাকে অনুসরণ করো' অর্থ জীবনযাপন করো আমা কর্তৃক প্রেরিত রসুল এবং আমা কর্তৃক প্রবর্তিত কোরআনের অনুসারী হয়ে। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটি রসুল স. এর। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে কথাটির পূর্বে উহ্য রয়েছে 'বলো'। অর্থাৎ

হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে বলুন, তোমরা আমার অনুসরণ করো। আর 'হাজা সিরত্বুম্ মুস্তাক্বীম' অর্থ এটাই সরল পথ।

এরপর বলা হয়েছে— 'শয়তান যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি মানুষকে আরো উপদেশ দিন, তোমরা এই সরল পথেই থাকো। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে কখনো এ পথ থেকে সরে যেয়ো না। জেনে রেখো, শয়তান তোমাদের চিরশত্রু। একথা গোপন কিছু নয়। সে-ই তোমাদের জান্নাত হারাবার কারণ। এখনো সে তোমাদেরকে এই সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সুতরাং সাবধান।

সূরা যুখ্রুফ ঃ আয়াত ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭

❑ 'ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল তখন সে বলিয়াছিল, 'আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে কতক বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

❑ 'আল্লাহ্ই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব তোমরা তাঁহার 'ইবাদত কর; ইহাই সরল পথ।'

❑ অতঃপর উহাদের বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করিল, সুতরাং যালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির!

❑ উহারা তো উহাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে।

❑ বন্ধুরা সেই দিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ব্যতীত।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন ঈসা তার সম্প্রদায়ের কাছে অলৌকিক নিদর্শনসমূহ নিয়ে আবির্ভূত হলো। বললো, হে আমার সম্প্রদায়। আমি তোমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছি প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়ে, তোমাদের মতানৈক্যমণ্ডিত বিষয়াবলীর সঠিক সমাধান করতে। সুতরাং তোমরা আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার, তোমাদের এবং সমগ্রবিশ্বের সকলকিছুর সৃজয়িতা ও পালয়িতা। অতএব, তোমরা ইবাদত করো কেবল তাঁর। এটাই সরল সঠিক পথ।

এখানে 'স্পষ্ট নিদর্শন' অর্থ ইঞ্জিল শরীফ, অথবা ইঞ্জিল শরীফের সুস্পষ্ট বিধানাবলী। আর 'মতভেদ' বলে বুঝানো হয়েছে এখানে বনী ইসরাইলের একাত্তরটি দল-উপদলের মতভেদের কথা। উল্লেখ্য, হজরত ঈসা আবির্ভূত হয়েছিলেন ওই সকল মতভেদ দূর করে দিয়ে এক ও অবিভাজ্য শাশ্বত সরল পথরেখাকে সুস্পষ্ট করে দিবার জন্য।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইহুদীরা একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। খৃষ্টানেরা বিভক্ত হয়েছিলো বায়াত্তরটি দলে। আর আমার উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হবে তিয়াত্তরটি দল। জুজায বলেছেন, হজরত ঈসা ইঞ্জিলে যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে একটি বিষয় ছিলো ইহুদীদের ধর্মীয় মতভেদ বিষয়ক।

'ফাত্তাকুল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করো। এখানকার 'ফা' অক্ষরটি নৈমিত্তিক। অর্থাৎ হজরত ঈসার প্রজ্ঞা ছিলো আল্লাহ্ভীতির ভিত্তি। 'আ'ত্বীউন' অর্থ আমার অনুসরণ

করো। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যে সকল বিধি-বিধান নিয়ে এসেছি, সেগুলো প্রতিপালন করো আমার অনুসরণে। **'ফা'বুদুহু'** অর্থ তাঁর ইবাদত করো। অন্য কারো ইবাদতে কখনোই আগ্রহান্বিত হয়ো না। আর এখানকার **'এটাই সরল পথ'** কথাটি আল্লাহ্‌র, অথবা কথাটি হজরত ঈসার বক্তব্যের প্রলম্বায়ন বা জের।

এরপরের আয়াতে (৬৫) বলা হয়েছে— **'অতঃপর তাদের বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করলো, সুতরাং জালেমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মান্তিক দিবসের শাস্তির'**। একথার অর্থ— কিন্তু তারা নবী ঈসার সদুপদেশাবলীকে মান্য করলো না। প্রত্যাখ্যান করলো তাঁর সরল পথের দিক নির্দেশনাকে। পুনর্বার ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্টি করলো প্রচণ্ড মতভেদ। তাই তাদের জন্য অবধারিত হয়েছে পরকালের মর্মন্তুদ শাস্তি। কতোই না দুর্ভাগা তারা।

এখানে **'তাদের বিভিন্ন দল'** অর্থ হজরত ঈসার উম্মতের মাধ্যমে বিভিন্ন দল। অথবা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিভিন্ন দল। **'ফা ওয়াইলুন'** অর্থ দুর্ভোগ। **'জলামু'** অর্থ জালেমেরা, স্বেচ্ছাচারী বা সীমালংঘনকারীরা, যারা স্বপ্রবৃত্তির পূজক। আর **'মিন আ'জাবি ইয়াওমিন আ'লীম'** অর্থ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির।

হজরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, ধীরে ধীরে আমার উম্মতের অবস্থাও হয়ে যাবে বনী ইসরাইলদের মতো। তাদের মধ্যে কেউ যদি জননীগমন করে থাকে, তবে আমার উম্মতেরও কেউ সেরকম করবে। তারা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো বায়াত্তরটি দলে। আর আমার উম্মতের মধ্যে হবে তিয়াত্তরটি দল। তার মধ্যে জান্নাতে গমন করতে পারবে কেবল একটি দল। অন্যেরা হবে জাহান্নামী। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ওই সঠিক দল কোনটি? তিনি স. বললেন, যে পথে রয়েছি আমি এবং আমার সহচরবৃন্দ।

হজরত মুয়াবিয়া সূত্রে আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, বায়াত্তরটি দল দোজখে যাবে। কেবল একটি দল যাবে বেহেশতে। সেই দল হচ্ছে যুথবদ্ধ দল (আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত)।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— **'তারা তো তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসবার অপেক্ষাই করছে (৬৬)। বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ব্যতীত' (৬৭)**। একথার অর্থ মক্কার মুশরিকেরা কিয়ামত বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও তারা অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের অপেক্ষাতেই রয়েছে। কেননা কিয়ামত যে অবধারিত। আর সেদিনের ভয়াবহতা এমন হবে যে, সুহৃদ-স্বজন কেউ কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। বরং একে অপরকে শত্রু বলে ভাববে। কেবল বিশুদ্ধচিত্ত বিশ্বাসীরা হবে এর ব্যতিক্রম। তাদের মধ্যের পারস্পরিক হৃদ্যতা কখনো বিনষ্ট হবে না— না দুনিয়ায়, না আখেরাতে।

বাগবী লিখেছেন, **'বন্ধুরা সেদিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু মুত্তাকীরা ব্যতীত'** এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে হজরত আলী তাঁর মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, বিশ্বাসীগণের মধ্যে যেমন বন্ধুত্ব হয়, তেমনি বন্ধুত্ব হয় অবিশ্বাসীদের

মধ্যেও। বিশ্বাসী বন্ধু পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তার পৃথিবীবাসী বন্ধুর জন্য দোয়া করে এভাবে— হে আমার প্রভুপালক! আমার বন্ধুটি আমাকে তোমার ও তোমার রসুলের আনুগত্য করতে বলতো। আমাকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করতো, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতো। সুতরাং তুমি তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়ো না। আর তুমি যেমন আমাকে শুভকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য দিয়েছিলে, তেমনি তাকেও দিয়ো। তাকে রেখো সতত সত্যাধিষ্ঠিত। যেভাবে আমাকে তুমি সম্মানিত করেছো, সেভাবে সম্মানিত কোরো তাকেও। মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌পাক তাদের দু'জনকেই একত্র করে বলেন, তোমরা পরস্পরের প্রশস্তি বর্ণনা করো। তারা তখন একজন অন্যজনের প্রশস্তি করে এভাবে— সে ছিলো আমার উত্তম ভ্রাতা, উত্তম সুহৃদ এবং উত্তম সহচর। অবিশ্বাসীদের অবস্থা হবে এর বিপরীত। তাদের মধ্যে যার আগে মৃত্যু হয় সে নিবেদন জানায়, হে আমার প্রভুপালক! আমার ওই বন্ধুটি আমাকে মন্দ কর্মে উদ্বুদ্ধ করতো, নিষেধ করতো ভালো কাজ করতে। তোমার ও তোমার রসুলের আনুগত্য করতে সে-ই তো আমাকে বারণ করতো। বলতো, পরকাল বলে কিছু নেই। সে তো ছিলো আমার অত্যন্ত নিকৃষ্ট ভ্রাতা, অতি নিকৃষ্ট বন্ধু এবং অতি মন্দ সাথী।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর সর্বপূর্বে অবস্থিত কোনো বিশ্বাসী যদি সর্বপশ্চিমের কোনো বিশ্বাসীকে ভালোবাসে, মহা বিচারের দিবসে আল্লাহ্‌ তাদেরকে মিলিয়ে দিবেন। বলবেন, এবার দেখলে তো। এই-ই হচ্ছে তোমার প্রিয়জন, যাকে তুমি ভালোবাসতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে। হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার কারণে যারা পরস্পরকে ভালোবাসতো তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দান করবো। কেননা আজ আমার ছায়ার আশ্রয় ব্যতীত আর কোনো আশ্রয় নেই। হজরত আবু হোরায়রা থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র দুই বান্দা পরস্পরকে মহব্বত করলে তারা যদি পৃথিবীর সর্বপূর্ব ও সর্বপশ্চিমের অধিবাসীও হয়, তবুও তাদেরকে পরকালে আল্লাহ্‌ এক জায়গায় আনবেন। বলবেন, দ্যাখো, এই হচ্ছে তোমার সেই বন্ধু, যাকে তুমি আমার জন্য মহব্বত করতে।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ আয়াত ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯

❑ হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।

❑ যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—

❑ তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

❑ স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করা হইবে; সেথায় রহিয়াছে সমস্ত কিছু, যাহা অন্তর চাহে এবং যাহাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে।

❑ ইহাই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার অধিকারী করা হইয়াছে, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ।

❑ সেথায় তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর ফলমূল, তাহা হইতে তোমরা আহার করিবে।

❑ নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিবে স্থায়ীভাবে;

❑ উহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং উহারা উহাতে হতাশ হইয়া পড়িবে।

❑ আমি উহাদের প্রতি যুলুম করি নাই, বরং উহারা নিজেরাই ছিল যালিম।

❑ উহারা চীৎকার করিয়া বলিবে, 'হে মালিক, তোমার প্রতিপালক যেন আমাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দেন।' সে বলিবে, 'তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে।'

❑ আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ।'

❑ উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে? বরং আমিই তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— মহবিচারের দিবসে মহাসংকটকালে আল্লাহ্ স্বয়ং মুত্তাকীগণকে অভয় দান করবেন। বলবেন, হে আমার প্রিয়ভাজন দাসগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই। দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরকে আজ স্পর্শ

করবেই না। কেননা তোমরা আমার নিদর্শনসমূহকে বিশ্বাস করেছিলে এবং আমার প্রতি ছিলে পূর্ণসমর্পিত। আজ তো তোমাদের পুরস্কৃত হওয়ার সময়। তোমরা এখন তোমাদের বিশ্বাসবতী সহধর্মিণীগণকে নিয়ে চিরসুখময় বেহেশতে প্রবেশ করো। উল্লেখ্য, এরকম ঘোষণা শুনে মুত্তাক্বীগণ উৎফুল্ল হবে এবং সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে অবিশ্বাসীরা।

এখানে 'ইয়া ই'বাদী' থেকে শুরু হয়েছে নতুন বক্তব্য। আর এখানে উহ্য রয়েছে 'ইয়াক্বুলু' (আল্লাহ্ বলবেন) কথাটি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তখন তাঁর বিশ্বাসীবান্দাগণকে (মুত্তাক্বীগণকে) বলবেন, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

এখানে 'তুহ্বারূন' অর্থ সানন্দে, উৎফুল্ল হয়ে। বলাবহুল্য, জান্নাতগমনের আদেশে তারা অবশ্যই উৎফুল্ল হবে। সে উৎফুল্লতা ফুটে উঠবে তাদের মুখাবয়বে। শব্দটি উৎসারিত হয়েছে 'হিবার' থেকে, যার অর্থ প্রভাব, লক্ষণ। অথবা এখানে 'তুহবারূন' শব্দটির অর্থ হবে সুসজ্জিত করে। এমতাবস্থায় 'তুহবারূন' এর ধাতুমূল হবে হিব্রূন' এবং হিব্রূন' অর্থ সৌন্দর্য, কমনীয়তা। কিংবা শব্দটির অর্থ হবে এখানে সসম্মানে। অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীরা এখন সসম্মানে বেহেশতে প্রবেশ করো।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু, যা অন্তর চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে (৭১)। এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ (৭২)' সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমুল, তা থেকে তোমরা আহার করবে' (৭৩)।

এখানে 'ইউত্বফু আ'লাইহিম' অর্থ জান্নাতের চিরকিশোর পরিচারকগণ প্রদক্ষিণ করবে। তারাই সোনার বাসন ও পানপাত্র নিয়ে নির্দেশ লাভের আশায় জান্নাতবাসীদের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাফিরা করতে থাকবে। এখানে তাই বলা হয়েছে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে'।

এখানকার 'সিহাফ' অর্থ বড় পেয়ালা, থালা, বা বাসন। শব্দটি 'সাহাফাত' এর বহুবচন। আর 'আকওয়াব' অর্থ পানপাত্র, কুঁজো, বা সুরাহী। অর্থাৎ এমন পাত্র, যার গলদেশ গোলাকার এবং যাতে কোনো হাতল থাকে না।

'সেখানে রয়েছে সমস্তকিছু, যা অন্তর চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়' একথার অর্থ জান্নাতবাসীদের অভাব বলে কিছুই থাকবে না। যা কিছু চিত্তসুখকর ও নয়নতৃপ্তকারী, তার সকল কিছুই তারা সেখানে যখন ইচ্ছা করবে তখনই পাবে। উল্লেখ্য, সুফীসাধকগণ যেহেতু আল্লাহ্র প্রেম ও দীদার ছাড়া আর কিছুই চান না, সেহেতু সেখানে তাঁদের প্রেমমগ্নতা ও দীদার হবে নিরবচ্ছিন্ন।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে সাবেত থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে এক ব্যক্তি একবার নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ঘোড়া আমার পছন্দ। বেহেশতে কি ঘোড়া পাওয়া যাবে? তিনি স.

বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি জান্নাতবাসী হও। তুমি তোমার পছন্দ মতো লাল অথবা যে কোনো বর্ণের তেজস্বী ঘোড়ায় চড়ে জান্নাতের যে কোনো স্থানে গমন করতে পারবে। সেখানে উপস্থিত আর একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আমি ভালোবাসি উট। বেহেশতে কি উট পাওয়া যাবে? তিনি স. বললেন, হে আরবী! আল্লাহ্ যদি তোমাকে বেহেশতবাসী করেন, তবে তুমি তা-ই পাবে, যা তোমার হৃদয় চায় এবং যাতে তৃপ্ত হয় তোমার নয়ন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে তিরমিজি এবং বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। বিশুদ্ধ সূত্রে এরকম হাদিস আরো বর্ণনা করেছেন হজরত আবদুর রহমান থেকে তিবরানী ও বায়হাকী এবং হজরত আবু আইয়ুব থেকে বায়হাকী। তবে তাদের বর্ণিত হাদিসে রয়েছে কেবল ঘোড়ার কথা। উটের উল্লেখ সেগুলোতে নেই।

আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের জন্য কর্মফলস্বরূপ নির্ধারণ করে রেখেছেন জান্নাত অথবা জাহান্নাম। কিন্তু মানুষ কর্মদোষে অথবা কর্মগুণে হয়ে যায় জাহান্নামী, অথবা জান্নাতী। তাই এখানে বলা হয়েছে এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ। হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জাহান্নামীদেরকে জান্নাতের ওই স্থান দেখানো হবে, যা তারা পুণ্যবান হলে পেতো। তখন তারা আক্ষেপে-অনুতাপে জর্জরিত হয়ে বলবে, আল্লাহ্ যদি আমাকে হেদায়েত দান করতেন, তবে আমিও হতে পারতাম মুত্তাকীদের দলভূত। আর জান্নাতবাসীদেরকেও দেখানো হবে জাহান্নামের ওই স্থান, যেখানে তারা প্রবেশ করতো ইমানদার না হলে। তারা তখন আনন্দিত হয়ে বলে উঠবে, ওই পবিত্র সত্তার প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। হজরত আবু হোরায়রা থেকে এরকমও বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল স. বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য বাসস্থান রাখা হয়েছে বেহেশত ও দোজখ উভয় জায়গায়। কাফেরদের জান্নাতের কর্মস্থানের উত্তরাধিকারী হবে মুমিনেরা এবং মুমিনদের জাহান্নামের উত্তরাধিকারী হবে দোজখীরা। এই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখেই এখানে বলা হয়েছে তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে'।

'সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল' একথা প্রসঙ্গে বাযযার ও তিবরানীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত সাওবান বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, বেহেশতবাসীরা সেখানকার কোনো গাছ থেকে ফল পেড়ে নিলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সৃষ্টি করে দেওয়া হবে নতুন ফল। হজরত আবু মুসার উদ্ধৃতি দিয়ে বাযযার বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন আদমকে জান্নাত থেকে চলে যেতে বললেন, তখন তাঁর সঙ্গে কিছু ফলমূলও দিলেন এবং সেগুলোর গুণাগুণও তাঁকে জানিয়ে দিলেন। পৃথিবীর সকল ফল ওই ফলগুলোরই প্রজন্মনায়ন। তবে বেহেশতের ফল পচনমুক্ত এবং পৃথিবীর ফল পচনশীল।

ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বলেছেন, সিরিয়াবাসীরা একবার হজরত ইবনে মাসউদের কাছে জান্নাত সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি বললেন, সেখানকার

ফলের গুচ্ছ অনেক বড়। যেনো তা এখান থেকে সিনাই পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইবনে আবিদ্ দুন্ইয়া বর্ণনা করেছেন, জান্নাতের এক একটি ফল হবে বারো হাত লম্বা এবং সেগুলোর মধ্যে কোনো আঁটি থাকবে না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ীভাবে (৭৪); তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়বে (৭৫)। আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিলো জালেম' (৭৬)। একথার অর্থ— নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা দোজখে শাস্তিভোগ করতে থাকবে স্থায়ীভাবে এবং ওই শাস্তি এতোটুকুও লাঘব করা হবে না। ফলে মুক্তির আশা তারা চিরতরে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এরকম হবে তাদেরই কর্মফলের কারণে। আমার পক্ষ থেকে সামান্যতম অন্যায় ও তাদের সঙ্গে করা হবে না। বরং তারাই তো অন্যায়কারী। এখানে 'অপরাধী' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী বা কাফের,পাপী বিশ্বাসী নয়। কেননা অন্য আয়াতে তাদেরকে অপরাধী বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, পাপী বিশ্বাসীরা দোজখে প্রবেশ করলেও পাপক্ষয়ের পর মুক্তিলাভ করবে। অবশেষে প্রবেশ করবে বেহেশতে।

এরপরের আয়াতে (৭৭) বলা হয়েছে— 'তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক যেনো আমাকে নিঃশেষ করে দেন। সে বলবে, তোমরা তো এভাবেই থাকবে'। একথার অর্থ মর্মন্তুদ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে দোজখীরা দোজখের তত্ত্বাবধায়ক মালেক ফেরেশতাকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রভুপালককে বলো, তিনি যেনো আমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে এই নিদারুণ কষ্টের চির অবসান ঘটান। আল্লাহ্ অথবা মালেক উত্তরে বলবে, তোমাদেরকে এভাবেই থাকতে হবে। তোমরা মরবেও না, স্বস্তিও পাবে না। উল্লেখ্য, দোজখীদেরকে এরকম বলা হবে তাদের নিবেদন উপস্থাপনের এক হাজার বৎসর পর। ইবনে যোবায়ের, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আবিদ্ দুনইয়া এবং বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বলেছেন, দোজখীদের 'তোমার প্রভুপালক যেনো আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন' এরকম কাকুতি মিনতির জবাবে 'তোমরা তো এভাবেই থাকবে' বলা হবে এক হাজার বৎসর পর।

'জাওয়াইদুজ জুহুদ' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, হান্নাদ, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, বায়হাকী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস বলেছেন, দোজখবাসীরা মালেককে চীৎকার করে ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রভুপালককে বলে আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দাও। মালেক একথা শুনেও চল্লিশ বৎসর যাবত চুপ করে থাকবে। তারপর বলবে, তোমরা চিরকাল এভাবেই থাকবে। এরপর তারা তাদের প্রভুপালককে ডেকে ডেকে বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমরা ছিলাম মহাদুর্ভাগা, পথভ্রষ্ট। আমাদেরকে আর একবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। এরপরেও যদি আমরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করি, তবে অবশ্যই আমরা হবো অপরাধী। পৃথিবীতে তারা

যতোদিন বেঁচে ছিলো, তার দ্বিগুণ সময় পর্যন্ত তাদের একথার জবাব দেওয়া হবে না। তারপর বলা হবে— তোমরা চিরধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো। কথা বোলো না। এর পর থেকে তারা হয়ে যাবে চিরনির্বাক।

সাঈদ ইবনে মনসুর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, দোজখবাসীরা পাঁচবার মুক্তিপ্রার্থনা করবে। চারবার তিনি জবাব দিবেন। পঞ্চমবার থাকবেন নির্জবাব। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছো, জীবনও দিয়েছো দু'বার। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। এখন আমাদের নিষ্কৃতি প্রাপ্তির কোনো উপায় আছে কী? জবাবে আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের এ বিপদ একারণে যে যখন তোমাদেরকে আমার দিকে ডাকা হতো, তখন তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে। আর আমার সঙ্গে যখন কাউকে শরীক করা হতো, তখন তোমরা তা স্বীকার করে নিতে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও। আমরা এবার সৎকর্ম করবো। আমরা এখন দৃঢ় বিশ্বাসী। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা আজকের এই পরিণতির কথা ভুলে গিয়েছিলে, সেকারণে আমিও আজ তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি তোমরা এখন আস্বাদন করতে থাকো। দোজখবাসীরা পুনরায় নিবেদন করবে, হে আমাদের পালয়িতা! আমাদেরকে অন্তত কিছুদিনের জন্য অবকাশ দাও, যাতে আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি এবং অনুসরণ করতে পারি তোমার রসুলের। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি ইতোপূর্বে শপথ করে একথা বলতে না যে, তোমাদেরকে পৃথিবী ছেড়ে পরকালে আসতে হবে না? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভুপালক! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। আমরা আগে যা করতাম, তা আর করবো না। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এতোটা বয়স দিইনি যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম সতর্ককারী। অতএব এখন আস্বাদন করো মর্মন্তুদ শাস্তি। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই। দোজখবাসীরা আবার নিবেদন জানাবে, হে আমাদের প্রভুপ্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে ঢেকে ফেলেছিলো এবং আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো। আমার সঙ্গে কথা বোলো না। এরপর থেকে আল্লাহ্ও তাদের সঙ্গে আর কথা বলবেন না।

এরপরের আয়াতে (৭৮) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ বলবেন, আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলো সত্যবিমুখ'। একথার অর্থ— 'তোমরা তো এভাবেই থাকবে' এরকম বলার পর আল্লাহ্ পুনরায় ঘোষণা করবেন, আমি তো তোমাদের নিকট আমা কর্তৃক প্রেরিত বার্তাবাহক এবং আমার পক্ষ থেকে অবতারিত গ্রন্থের

মাধ্যমে সত্য ধর্মের সংবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তখন তোমাদের অধিকাংশই সে সত্যকে অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করে বসেছিলে। এখানে 'কারিহূন' অর্থ সত্য-বিমুখ। অর্থাৎ সত্যবিমুখতা ছিলো তোমাদের সত্তাসন্নিহিত প্রবৃত্তি। তাই তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করতে এতোটুকুও দ্বিধান্বিত হতে না।

এরপরের আয়াতে (৭৯) বলা হয়েছে— 'তারা কি কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? বরং আমিই তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কি আমার রসুলের বিরুদ্ধে কোনো গোপন অভিসন্ধি ঠিক করে রেখেছে? অথবা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্য তারা কি কোনো গোপন পরিকল্পনা স্থির করেছে। বরং সকল বিষয়ে চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নকারী তো আমিই। আমি তো তাদের জন্য করে রেখেছি শাস্তির ব্যবস্থা।

এখানে 'আম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে 'বাল' (বরং) অর্থে। এভাবে এখান থেকে শুরু হয়েছে নতুন বক্তব্য। আর 'আব্রমূ' অর্থ এখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, গোপন অভিসন্ধি।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কারাজী বলেছেন, একবার কাবা গৃহের আড়ালে গোপনে তিনজন লোক সমবেত হলো। তাদের মধ্যে দু'জন ছিলো কুরায়েশ এবং একজন সাক্বাফী, অথবা দু'জন সাক্বাফী ও একজন কুরায়েশ। তাদের মধ্যে একজন বললো, তোমাদের কী মনে হয়, আল্লাহ্ কি আমাদের কথা শোনেন? অন্যজন বললো, চেঁচিয়ে বললে শোনেন। চুপি চুপি বললে শোনেন না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা যুখ্রুফ ঃ আয়াত ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯

❑ উহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফিরিশ্তাগণ তো উহাদের নিকট থাকিয়া সবকিছু লিপিবদ্ধ করে।

❑ বল, 'দয়াময় আল্লাহ্র কোন সন্তান থাকিলে আমি হইতাম তাহার উপাসকগণের অগ্রণী;

❑ 'উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং 'আরশের অধিকারী পবিত্র মহান।'

❑ অতএব উহাদিগকে যে দিবসের কথা বলা হইয়াছে তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি উহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতে দাও।

❑ তিনিই ইলাহ্ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ্ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

❑ কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

❑ আল্লাহ্র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাহাদের নাই, তবে যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া উহার সাক্ষ্য দেয়, তাহারা ব্যতীত।

❑ যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে, উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তবুও উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে?

❑ আমি অবগত আছি রাসূলের এই উক্তিঃ 'হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না।'

❑ সুতরাং তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— ওই লোকেরা কী ভেবেছে? আমি কি তাদের অন্তরের কথা এবং একান্ত শলাপরামর্শের কথা জানি না? আমি তো সর্বজ্ঞ। তাছাড়া তাদের সকলের সঙ্গে আমি রেখে দিয়েছি আমল লেখক ফেরেশতাদেরকে। তারাও তাদের সকল কার্যকলাপের বিবরণ লিখে রাখে।

এখানকার 'আম'ও ব্যবহৃত হচ্ছে 'বাল' অর্থে। এভাবে ঘটানো হয়েছে বক্তব্যান্তর। 'সিররহুম' অর্থ গোপন বিষয়। 'নাজ্ওয়াহুম' অর্থ মন্ত্রনা, কানাঘুষা, শলাপরামর্শ। 'রুসুলুনা' অর্থ আমার ফেরেশতাগণ, যারা মানুষের ভালো ও মন্দ আমলসমূহ লিখে রাখে। আর 'লাদাইহিম' অর্থ তাদের নিকটে থাকে, কখনো পৃথক হয় না। অর্থাৎ ওই আমল লেখক ফেরেশতারা কখনোই তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে না।

পরের আয়াতে (৮১) বলা হয়েছে— বলো, দয়াময় আল্লাহ্র কোনো সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা আল্লাহ্র পুত্র আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে বলে দিন, তা-ই যদি হতো তবে আমিই তো সবার আগে তার উপাসনা শুরু করতাম। কিন্তু তা যে অসম্ভব ও চরমতম মিথ্যাচার। সুতরাং আমি তো একথা মানতেই পারি না। কেননা আমি আল্লাহ্র সত্য রসুল।

পিতাকে সম্মান করলে তার সন্তানকেও সম্মান করতে হয়। যেমন রসুল স. বলেছেন, ফাতেমা আমার অংশ। তাই যা তাকে বিষণ্ন করে, তা আমাকেও বিষণ্ন করে দেয়। বোখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত ইবনে মাসউদ থেকে। এখানে বিজ্ঞজনোচিত বাককুশলতা দ্বারা আল্লাহ্র পুত্র কল্পনা করার মতো জঘন্য অংশীবাদিতাকে খণ্ডন করা হয়েছে। একথাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র পুত্র হওয়ার কথা ধারণাও করা যায় না। সুতরাং যা অসম্ভব, তাকে পূজনীয় ভাবা তো আরো অসম্ভব। অন্য এক আয়াতে এরকম অসম্ভাব্যতাকে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে, যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য থাকতো, তাহলে উভয়েই অনাসৃষ্টি উৎপাদন করতো, 'লাওকানা ফীহিমা আলিহাতুন ইল্লাল্লহু লাফাসাদাতা' এই আয়াত দু'টোর মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেখানকার 'লাও' অস্বীকার করেছে শর্ত ও পরিণতি উভয়কে। আর এই আয়াতের 'ইন' প্রযোজ্য হয় কেবল শর্তের ক্ষেত্রে। এর দ্বারা উভয় দিকে (আয়াতের প্রথম ও শেষ অংশে) সমর্থন রয়েছে নাবোধকতার এবং এই না-বোধকতা দাঁড়িয়েছে হ্যাঁ-বোধকতার বিরুদ্ধে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— রসুল স. যে আল্লাহ্র পুত্র হওয়াকে অস্বীকার করেন, তা কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষনির্ভর নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র পুত্রকে তিনি বিদ্বেষবশতঃ মেনে নিচ্ছেন না, বিষয়টি এরকম নয়। বরং এরকম হওয়াই যে অসম্ভব। সুতরাং অসম্ভবকে সম্ভব মনে করার মতো মিথ্যাচারকে তিনি প্রশ্রয় তো দিতে পারেনই না। তিনি যে সতত সত্যাধিষ্ঠিত নিষ্পাপ ও ন্যায়বান রসুল।

সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ এরকম— তোমরা যদি মনে করো আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে, তবে তা তোমাদের ব্যাপার। কিন্তু আমি তো জানি মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা সন্তান গ্রহণের মতো মুখাপেক্ষিতা থেকে চিরপবিত্র। আমার বক্তব্য তোমাদের ধারণার বিপরীত।

এখানে 'আ'বাদুন' অর্থ উপাসক। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, উন্নাসিক। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— আমিই সর্বাগ্রে তোমাদের অপবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করছি। আবার কেউ কেউ বলেছেন 'আ'বাদুন' অর্থ প্রচণ্ড ক্রোধ। অর্থাৎ আমি তোমাদের বিশ্বাস ও বক্তব্যের প্রতি ভীষণ অতুষ্ট। এরকম কথা শুনলেই আমার ভীষণ রাগ হয়। 'কামুস' গ্রন্থে রয়েছে, 'আ'বাদুন' অর্থ প্রচণ্ড রোষ, ভীষণ যুদ্ধ, অনুতাপ, ভর্ৎসনা, লোভ-লালসা, প্রত্যাখ্যান। আ'বিদা শব্দটি 'ফারিহা' শব্দটির মতো বাবে সামীয়ার নিয়মে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ হচ্ছে প্রত্যাখ্যান ও প্রচন্ড রোষ।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে— হে আমার রসুল! তাদেরকে স্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দিন, দয়াময়ের কোনো সন্তান থাকতে পারে না— আমিই একথার সর্বাগ্রগণ্য সাক্ষ্যদাতা। এখানে 'ইন্' অর্থ 'যদি' না হয়ে হবে না-সুচক। 'আবেদীন' অর্থ— সাক্ষ্যদাতা।

এরপরের আয়াতে (৮২) বলা হয়েছে— 'তারা যা আরোপ করে, তা থেকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র, মহান'। একথার অর্থ— যিনি গগন-ভূবনের একচ্ছত্র অধীশ্বর এবং মহান আরশের একক অধিকর্তা, তিনি ওই সকল অপবিশ্বাস থেকে পবিত্র, যা বর্ণনা করে মূর্তিপূজকেরা। অর্থাৎ আকাশসমূহ, পৃথিবী ও আরশের মতো সুবৃহৎ অস্তিত্বও যখন আল্লাহ্র অংশ নয়, তখন অন্যেরা তার অংশ হতে পারবে কেমন করে? তাঁর সঙ্গে সকলের ও সকল কিছুর সম্পর্ক স্রষ্টা ও সৃষ্টির। পিতা-পুত্র, পুত্র-পিতা, পতি-ভার্যা, ভার্যা-পতি এসকল সম্বন্ধ তো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, স্রষ্টার কদাচ নয়।

এরপরের আয়াতে (৮৩) বলা হয়েছে— 'অতএব, তাদেরকে যে দিবসের কথা বলা হয়েছে, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তুমি তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়াকৌতুক করতে দাও'। এখানে 'ইয়াখূদ্বু' অর্থ নিরর্থক কর্ম, অনর্থক বাক-বচসা। 'ইয়ালআ'বূ অর্থ ক্রীড়া- কৌতুক। আর 'ইয়াওমাহুম' অর্থ যে দিবস। অর্থাৎ মহাপ্রলয় দিবস।

এরপরের আয়াতে (৮৪) বলা হয়েছে— 'তিনিই ইলাহ্ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ'। একথার অর্থ— অন্তরীক্ষে হোক, অথবা ভূপৃষ্ঠে, উপাস্য হওয়ার অধিকার আর কারো নেই। থাকতে পারেই না। তিনি যে আনুরূপ্যবিহীনরূপে প্রজ্ঞাধিকারী এবং সর্বপরিজ্ঞাতা। অন্য কেউ যেহেতু এরকম গুণসম্পন্ন নয়, তাই তিনি ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতাও কারো নেই।

এখানে 'আলহাকীম' অর্থ প্রজ্ঞাময়, জগতসমূহের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুবিজ্ঞ, সকলের ও সকলকিছুর পরিণাম নির্ণায়ক। আর 'আ'লীম' অর্থ এমন অতুলনীয় জ্ঞানী, যাঁর জ্ঞানের বাইরে কারো বা কোনোকিছুর অস্তিত্বই নেই।

এরপরের আয়াতে (৮৫) বলা হয়েছে— 'কতো মহান তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্তকিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে'। এখানে 'ওয়াই'নদাহু ই'লমুস্ সায়াত' অর্থ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে। অর্থাৎ মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে, তা জানেন কেবল তিনিই, অন্য কেউ নয়। সুতরাং সকলের এবং সকল কিছুর অধিকার রয়েছে কেবল তাঁর।

এরপরের আয়াতে (৮৬) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে তাঁর সাক্ষ্য দেয়, তারা ব্যতীত'। একথার অর্থ— পৌত্তলিকেরা মনে করে তাদের পূজনীয় প্রতিমাগুলো তাদের পক্ষে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। কিন্তু তা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। কারণ ওগুলো অপ্রাণ। যাদের মধ্যে প্রাণের উপস্থিতিই

নেই, তাদের আবার সুপারিশ করার অধিকার থাকেই বা কী করে? তবে ওই সকল ব্যক্তিত্ব সুপারিশ করার যোগ্যতাসম্পন্ন, যারা বিশ্বাসী ও আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন।

এখানে 'যারা সত্য উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত' অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ' কলেমার মর্ম যারা বোঝে এবং এই মহাসত্যের সাক্ষ্য যারা দেয় তারা ব্যতীত। ব্যতিক্রমীটি বিযুক্ত, অথবা সংযুক্ত। সংযুক্ত এই অর্থে যে, ফেরেশতা এবং হজরত ঈসা-হজরত উযায়েরের উপাসনাও তারা করে। আর বিযুক্ত হওয়ার কারণ, তাঁরা কিন্তু তাদের অন্যান্য পূজনীয় প্রতিমাগুলোর মতো অপ্রাণ ও সুপারিশ ক্ষমতাহীন নন। কেননা তারা মহাকলেমায় বিশ্বাসী এবং সাক্ষ্যদাতা। শেষে তাই বলে দেওয়া হয়েছে 'তারা ব্যতীত'।

এরপরের আয়াতে (৮৭) বলা হয়েছে— 'যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্'। তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি অবগত আছি রসুলের এই উক্তি ঃ হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ইমান আনবে না (৮৮)। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো এবং বলো, সালাম; তারা শীঘ্রই জানতে পারবে'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আমি আপনার এই অভিমতটি সম্পর্কে সম্যক অবগতঃ হে আমার প্রভুপালনকর্তা! আমি এই দুর্বিনীত সম্প্রদায়ের ইমান আনয়নের ব্যাপারে আশাবাদী নই। অতএব এ ব্যাপারে আমার নির্দেশ শুনুন। তাদের আচরণে আর ব্যথিত না হয়ে তাদের সঙ্গে উপেক্ষার সম্পর্ক গড়ে তুলুন 'সালাম' বলে দিয়ে। যথাশীঘ্র আমি তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবোই। যথাসময়ে তারা তা জানতেও পারবে। কিন্তু তখন পবিত্রাণের পথ তাদের জন্য হয়ে যাবে চিররুদ্ধ।

এখানে 'এই সম্প্রদায় তো ইমান আনবে না' অর্থ শত চেষ্টা করলেও এরা কিয়ামত দিবসে আর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। 'আমি অবগত আছি' কথাটি এখানে মূল আয়াতে রয়েছে উহ্য। 'উপেক্ষা করো' অর্থ তারা ইমান আনবে, এমতো দুরাশা আর কোরোই না, তাদের প্রতি হয়ে যাও সম্পূর্ণরূপে বিমুখ। 'বলো, 'সালাম' অর্থ তাদেরকে জানিয়ে দাও চূড়ান্ত অভিবাদন। বলো,

তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি তোমাদেরকে ত্যাগ করেছি, তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করো। আর 'শীঘ্রই তারা জানতে পারবে' অর্থ অচিরেই তারা পেয়ে যাবে তাদের ভুল ধারণা, মিথ্যাচারিতা ও অপকর্মের শাস্তি। মুকাতিল বলেছেন,পরবর্তীতে জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতদ্বয় রহিত হয়ে গিয়েছে।

সকল প্রশংসা স্তব-স্তুতি প্রশস্তি আল্লাহ্র। সকল দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। তৎসহ তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন-বংশধর ও সম্মানার্হ সহচরবৃন্দের প্রতি। সুরা যুখ্‌রুফের তাফসীর শেষ হলো আজ ২৪ শে রবিউল আউয়াল বুধবার, ১২০৮ হিজরী সনে।

সূরা দুখান

মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় রয়েছে ৩ রুকু এবং ৫৯ আয়াত।
সূরা দুখান ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭

❑ হা-মীম।
❑ শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।
❑ আমি তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে; আমি তো সতর্ককারী।
❑ এই রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়,
❑ আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করিয়া থাকি
❑ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ—
❑ যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হা-মীম। শপথ মহাগ্রন্থ কোরআনের, যে গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে বৈধ ও অবৈধের প্রভেদরেখাকে। এই মহাগ্রন্থ আমি অবতীর্ণ করেছি সৌভাগ্যমণ্ডিত রজনীতে। আমি তো দয়ার্দ্র সতর্ককারী।

এখানে সৌভাগ্যমণ্ডিত রজনী অর্থ রমজান মাসের কদরের রাত্রি। এই রাতেই বর্ষিত হয় ইহ-পারত্রিক কল্যাণ। এ রাতে ফেরেশতাগণের দ্বারা রহমত অবতীর্ণ হয় এবং গৃহীত হয় প্রার্থীদের প্রার্থনা। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন কাতাদা ও ইবনে জায়েদ। তাঁদের মতে কদরের রাতেই লওহে মাহফুজ থেকে কোরআন আনা হয় পৃথিবীর নিকটতম আকাশে। তারপর সেখান থেকে বিশ বৎসর ধরে বিভিন্ন প্রেক্ষিত ও প্রেক্ষাপটে রসুল স. এর কাছে হজরত জিবরাইলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হতে থাকে আল কোরআন।

কেউ কেউ বলেছেন, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে শাবান মাসের মধ্যবর্তী এক রাত্রিতে। কিন্তু তাদের এমতো ধারণা সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্ স্বয়ং বলেছেন, 'রমজান এমন একটি মাস, যে মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। অন্যত্র বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি এটা অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কদরে'।

কাসেম ইবনে মোহাম্মদ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, অর্ধশাবানের রাতে আল্লাহ্ পৃথিবীর নিকট আকাশে আনুরূপ্যহীন অবতরণ করেন এবং সকলকে মার্জনা করেন। মার্জনা করেন না কেবল হিংসুক ও মূর্তিপূজককে। বাগবী। এই হাদিস কিন্তু অর্ধশাবানের রাতে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। আর এখানকার 'আমি তো সতর্ককারী' অর্থ নিশ্চয় আমি এই কোরআনের মাধ্যমে আমার শাস্তি সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছি।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে (৪,৫) বলা হয়েছে— 'এই রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় আমার আদেশক্রমে'। একথার অর্থ— আমার আদেশে কদরের রাতে আগামী এক বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সিদ্ধান্ত বলবত করা হয়। উল্লেখ্য, এমতো গুরুত্বের কারণেই এই রাতে কোরআন মজীদ অবতীর্ণ করা হয়েছে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কদরের রাত্রিতে পরবর্তী বৎসরের যাবতীয় ঘটিতব্য বিষয় লওহে মাহফুজ থেকে অনুলিপি করে নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় কল্যাণ-অকল্যাণ, জীবনোপকরণ, আয়ু-জীবনাবসান ইত্যাদির। এমনকি একথাও লিখে দেওয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এ বৎসর হজব্রত পালন করবে।

হাসান, কাতাদা ও মুজাহিদ বলেছেন, রমজান মাসের কদর রাত্রিতে প্রত্যেকের পরবর্তী বৎসরের মৃত্যু, জন্ম, পানাহার এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডসমূহের মীমাংসা করে দেওয়া হয়।

ইকরামা বলেছেন, শাবান মাসের মাঝামাঝি রাতে (১৫ই শাবান রাতে) সারা বৎসরের কাজকর্মের ফয়সালা করে দেওয়া হয়। জীবিতদেরকে পৃথকভাবে লিখে দেওয়া হয় মৃতদের থেকে। এ ফয়সালার কোনো পরিবর্তন করা হয় না। বাগবী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে মাইসারা আখফাশ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, শাবান মাসে পরবর্তী শাবান পর্যন্ত মৃত্যুর ফয়সালা করে দেওয়া হয়। এমন কি ওই সকল শিশুদের নামও পৃথক করা হয়; যাদের পিতা বিয়ে করে ১৫ই শাবানের পরে। আর যে সব শিশু জন্ম গ্রহণ করে সে সময়ে। আবার মৃত্যু বরণও করে ওই বৎসরে।

আবুজ্ জোহার বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, অর্ধশাবানের রাতে (শবে বরাতে) আল্লাহ্ সবকিছু মীমাংসা করে দেন এবং রমজানের কদর রাত্রিতে সেই মীমাংসা দেওয়া হয় মীমাংসা বাস্তবায়নকারীদের হাতে।

'আম্রাম্ মিন ইনদিনা' অর্থ আমার আদেশক্রমে। এই আদেশ হচ্ছে সেই আদেশ, যা উৎসারিত হয় আমার অতুলনীয় প্রজ্ঞা থেকে। অথবা আদেশ অর্থ এখানে কেবলই আদেশ। এমতাবস্থায় 'স্থিরীকৃত হয়' কথাটি হবে একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম।

এরপর বলা হয়েছে— 'আমি তো রসুল প্রেরণ করে থাকি'। পরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ'। একথার অর্থ, আমি অতীব অনুগ্রহপরবশ বলেই নিয়ম করেছি, আমার বান্দাগণকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করবো। পয়গম্বর প্রেরণ ও কিতাব অবতরণ সেই নিয়মেরই ফল।

'রহমাতাম্ মির রব্বিক' অর্থ তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্বরূপ। এখানকার 'রব' (প্রতিপালক) শব্দটি এ কথাই জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্ সকলের দয়ার্দ্র পালনকর্তা। সেকারণেই তিনি মানুষের কাছে প্রেরণ করেন তাঁর বার্তাবাহক। অন্য কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে নয়। বাধ্যতা ও ঔচিত্য থেকে তিনি সতত পবিত্র। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি বার্তাবাহক প্রেরণ করি সৃষ্টির উপরে আমার অনুগ্রহের তাগিদে এবং অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি প্রদানার্থে।

এরপর বলা হয়েছে— 'তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ—' এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও'। একথার অর্থ— তিনি তাঁর বান্দাদের সকল উক্তি শ্রবণ করেন এবং তাদের সর্ববিষয়ে জানেন। এসকল গুণ কোনো সৃষ্টির মধ্যে থাকতে পারে না। অতএব হে বিশ্বাসের দাবিদারগণ! যদি তোমরা সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়েই থাকো, তবে নির্বিবাদে একথা মেনে নাও যে, কেবল আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সকল সৃষ্টির একক প্রভুপালনকর্তা।

'ইন্ কুন্তুম মূক্বিনীন' অর্থ যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হলে একথাটিও সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নাও। বলো, আল্লাহ্ই আকাশ-পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থিত সকল কিছুর স্রষ্টা। অথবা অর্থ হবে— তোমরা আল্লাহ্কে আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা যখন বলোই, তখন তা অন্তর দিয়েও বিশ্বাস করো। সেই সঙ্গে একথাও বিশ্বাস করো যে, মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল।

সূরা দুখান ঃ আয়াত ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

❑ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।
❑ বস্তুত উহারা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতেছে।
❑ অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হইবে আকাশ,
❑ এবং উহা আবৃত করিয়া ফেলিবে মানব জাতিকে। ইহা হইবে মর্মন্তুদ শাস্তি।
❑ তখন উহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে শাস্তি দূর কর, অবশ্যই আমরা ঈমান আনিব।'
❑ উহারা কি করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে? উহাদের নিকট তো আসিয়াছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল;
❑ অতঃপর উহারা তাহাকে অমান্য করিয়া বলে, 'সে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক পাগল!'
❑ আমি কিছু কালের জন্য শাস্তি রহিত করিব— তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।
❑ যেদিন আমি তোমাদিগকে প্রবলভাবে পাকড়াও করিব, সেদিন নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে শাস্তি দিবই।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদী জনগোষ্ঠীকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিন যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য আর কেউই নয়। আর তোমরা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছো তাঁর অপার প্রজ্ঞাময়তা ও শক্তিমত্তার দু'টি বিস্ময়কর নিদর্শন— জীবন ও মৃত্যু। আরো দেখতে পাচ্ছো, তিনি সকলের ও সকল কিছুর প্রভুপালয়িতা। তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও। কিন্তু তারা তো অবরুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী। তাই মহাসত্যের বিষয়ে সন্দিহান হয়। আপনাকে ও আপনার দয়ার্দ্র আহ্বানকে নিয়ে করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাস।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'অতএব, তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের, যেদিন স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ (১০), এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। তা হবে মর্মন্তুদ শাস্তি'(১১)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তাদের অপ-আচরণদৃষ্টে ব্যথিত হবেন না। তাদেরকে পৃথিবীতে যেহেতু সাময়িক অবকাশ আমি দিয়েছি, তাই কিছু কালের জন্য আপনি অবলম্বন করুন উপেক্ষা ও অপেক্ষা। মহাপ্রলয় দিবস তো সুনিশ্চিত। সেদিন থেকেই শুরু হবে তাদের মহামর্মন্তুদ নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি, যেদিন আকাশ ধুম্রকুণ্ডলীতে ছেয়ে যাবে, আর ওই ধুম্রমণ্ডলী ঢেকে ফেলবে সকল মানুষকে।

এখানে 'দুখান' ধুম্রকুণ্ডলী বা ধুম্রপুঞ্জ। এ সম্পর্কে আলেমগণ অবশ্য বিভিন্নরকম মন্তব্য করেছেন। হাদিস শরীফেও এ সম্পর্কে এসেছে বিভিন্ন রকমের বিবরণ। যেমন হজরত হুজায়ফা ইবনে জারীর, ছা'লাবী ও বাগবী

বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, কিয়ামতের প্রথম লক্ষণ হবে ধোঁয়া, মরিয়ম পুত্র ঈসার পুনরাবির্ভাব এবং অভিনতুন এক অগ্নিকুণ্ড, যা উদ্ভূত হবে এডেনের কোনো এক গিরিগহ্বর থেকে। ওই আগুনই মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশর প্রান্তরে। সেখানে দ্বিপ্রহরে সকলে সমবেত হলে আগুনটিও থেমে যাবে।

হজরত হুজায়ফা বলেছেন, আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! ওই ধোঁয়া কী ধরনের হবে? তিনি স. প্রথমে পাঠ করলেন 'অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিবসের যেদিন স্পষ্ট ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ'। তারপর বললেন, চল্লিশ

দিন ও চল্লিশ রাত পর্যন্ত সেই ধোঁয়া পূর্ব পশ্চিমের পুরো আকাশ আবৃত করে রাখবে। বিশ্বাসীদের উপর তার প্রভাব হবে যৎকিঞ্চিত শ্লেস্মার মতো এবং অবিশ্বাসীরা তার প্রভাবে হয়ে যাবে মাতালের মতো উদভ্রান্ত। ওই ধোঁয়া প্রবেশ করবে তাদের নাসিকারন্ধ্র ও কর্ণগহ্বর দিয়ে এবং নির্গত হতে থাকবে তাদের পায়ুপথ দিয়ে।

হজরত আবু মালেক আশয়ারী থেকে তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের প্রভুপালক তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে ওই ধুম্রপুঞ্জ, মুমিনদের উপরে যার প্রভাব হবে শ্লেস্মার মতো এবং যার প্রভাবে কাফেরেরা ফুলে ফেঁপে উঠবে, তাদের কান দিয়েও বের হতে থাকবে ধোঁয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে দাব্বাতুল আরদ্ব এবং তৃতীয়টি হচ্ছে দাজ্জাল।

এরপরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে শাস্তি দূর করো, অবশ্যই আমরা ইমান আনবো' একথার অর্থ— ওই ধুম্রপুঞ্জের কষ্টকর প্রভাবে যখন তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, তখন মিনতি জানাবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও। এবার আমরা অবশ্যই ইমানদার হবো।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কী করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রসুল (১৩), অতঃপর তাকে অমান্য করে বলে, সে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক পাগল'(১৪)।

'তারা কী করে উপদেশ গ্রহণ করবে' এই প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ তারা তো উপদেশ গ্রহণ করতে পারবেই না। কেননা তারা তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী নবীকে পেয়েছিলোই। তৎসত্ত্বেও তো তারা ইমান আনেনি। উল্টো বরং তাকে অপবাদ দিয়েছে 'উন্মাদ' বলে। বলেছে, কোরআন তাকে শিক্ষা দেয় এক অনারব ক্রীতদাস। উল্লেখ্য, মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে কেউ কেউ বলতো, মোহাম্মদকে তো কোরআন শিখিয়ে দেয় বনী সাক্বিফের এক অনারব গোলাম।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমি কিছুকালের জন্য শাস্তি রহিত করবো— তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে'। এখানে 'কিছুকালের জন্য' অর্থ তাদের পৃথিবীর জীবনের অবশিষ্ট আয়ুর জন্য। অর্থাৎ শাস্তি দিলে তারা ইমান আনতে চাইবে, আবার শাস্তি স্থগিত করলে পুনরায় ফিরে যাবে পৌত্তলিকতায়। এমনই তাদের স্বভাব।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবোই'।

এখানে 'যে দিন' অর্থ কিয়ামতের দিন। কিন্তু হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, বদরের দিন।

আবুজ্জোহা সূত্রে বাগবী লিখেছেন, মাসরুক বলেছেন, এক লোক একবার কুন্দা গোত্রের জনপদে বসে বলতে শুরু করলো, কিয়ামতের সময় একটি ধোঁয়া এসে ভণ্ড কপটদের চোখ ও কান দিয়ে ঢুকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে নষ্ট করে দিবে। অবশ্য প্রকৃত বিশ্বাসীদের উপরে তার প্রতিক্রিয়া হবে মামুলী ধরনের, শ্লেস্মার প্রভাবের মতো। তার কথা শুনে আমরা সকলে ভীত হয়ে পড়লাম। পরে হজরত ইবনে মাসউদের কছে গিয়ে এ সম্পর্কে জানালাম। তিনি একথা শুনে ত্রস্তে উঠে বসলেন। রাগত স্বরে বললেন, কেউ কিছু জানলে তা বলা উচিত। আর না জানলে বলা উচিত, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। এরকম উক্তি জ্ঞানের নিদর্শন। যেমন আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে বলেছেন, 'বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আর আমি লৌকিকতাসর্বস্বও নই'। প্রকৃত ঘটনা এরকম— দীর্ঘদিন ধরে আহ্বান জানানো সত্ত্বেও যখন কুরায়েশরা ইসলাম গ্রহণ করলো না, তখন রসুল স. অপপ্রার্থনা জানালেন, হে আমার আল্লাহ্! নবী ইউসুফের জামানায় তুমি যেমন সাতবছর ধরে একটানা দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলে, তেমনি এদের উপরেও দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও। তাঁর এমতো অপপ্রার্থনার কারণে কুরায়েশদের উপরে নেমে এলো ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। আহারাভাবে জীবন ধারন করা দুষ্কর হলো কুরায়েশদের। মৃত পশুর গোশত, হাড়-হাড্ডি ইত্যাদি খেয়ে তারা জীবন ধারণ করতে লাগলো কোনো রকমে। ক্ষুধার প্রকোপে তাদের দৃষ্টি শক্তি হয়ে পড়লো ঝাপসা। ফলে তাদের দৃষ্টিতে আকাশ-পৃথিবীকে মনে হতে লাগলো ঝাপসা ধোঁয়ার মতো। অনন্যোপায় হয়ে একদিন আবু সুফিয়ান এসে বললো, মোহাম্মদ! আল্লাহ্ তো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে শুভআচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্যাখো, তোমার সম্প্রদায় এখন মরতে বসেছে। এদেরকে বাঁচাও। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করো। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো সুরা দুখানের ১০ থেকে ১৫ সংখ্যক আয়াতের শেষ পর্যন্ত। রসুল স. সদ্য প্রত্যাদেশিত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন। তারপর দুর্ভিক্ষ অপসারণের আবেদন জানিয়ে দোয়াও করলেন। দুর্ভিক্ষ সরে গেলো। কুরায়েশরা ঠিকই ফিরে গেলো তাদের আগের পৌত্তলিকতায়। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করলেন 'যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবোই'। এই অঙ্গীকারের অনুসরণেই আল্লাহ্ তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করেছিলেন বদর যুদ্ধের দিনে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়েছে— বদর যুদ্ধের শাস্তি, রোমকদের পরাজয়, চন্দ্র দ্বিখণ্ডন এবং ক্ষুধার কারণে ধোঁয়া দেখতে পাওয়া।

বোখারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, কুরায়েশদের অবাধ্যতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেলো, তখন রসুল স. তাদেরকে শায়েস্তা করবার জন্য আল্লাহ্র কাছে হজরত ইউসুফের সময়ের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ কামনা করলেন। তার ফলে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো যে, তাদেরকে মৃত প্রাণীর হাড়গোড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে হলো। ক্ষুধার চোটে তাদের দৃষ্টি হয়ে গেলো ঝাপসা। মনে হতে লাগলো সবকিছু যেনো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। তখন অবতীর্ণ হলো 'অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের, যেদিন ধুম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ....'। জনতা বললো, হে আল্লাহ্র রসুল! দুর্ভিক্ষকবলিতদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন। মানুষ তো মরণাপন্ন। রসুল স. বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন। শুরু হলো দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বস্তিদায়ক বৃষ্টি। তখন অবতীর্ণ হলো 'আমি কিছুকালের জন্য শাস্তি রহিত করবো— তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে'। তাই হলো। তারা পুনরায় নিমজ্জিত হলো ঘোর পৌত্তলিকতায়। তারপর অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। আর এই আয়াতে 'প্রবলভাবে পাকড়াও করবো' বলে বদর যুদ্ধের দিবসে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

সূরা দুখানঃ আয়াত **১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪,২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯**

❑ ইহাদের পূর্বে আমি তো ফির'আওন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উহাদের নিকটও আসিয়াছিল এক সম্মানিত রাসূল,

❑ সে বলিল, 'আল্লাহ্র বান্দাদিগকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

❑ 'এবং তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিও না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি স্পষ্ট প্রমাণ।

❑ 'তোমরা যাহাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে না পার, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ লইতেছি।

❑ 'যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমা হইতে দূরে থাক।'

❑ অতঃপর মূসা তাহার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করিল, 'ইহারা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

❑ আমি বলিয়াছিলাম, 'তুমি আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বাহির হইয়া পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।'

❑ সমুদ্রকে স্থির থাকিতে দাও, উহারা এমন এক বাহিনী যাহা নিমজ্জিত হইবে।

❑ উহারা পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ;

❑ কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ,

❑ কত বিলাস-উপকরণ, উহাতে তাহারা আনন্দ পাইত।

❑ এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।

❑ আকাশ এবং পৃথিবী কেহই উহাদের জন্যে অশ্রুপাত করে নাই এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হয় নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— এখন যেমন আমি একজন মহাসম্মানিত রসুল প্রেরণ করে মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষা করছি, তেমনি আমি পরীক্ষা করেছিলাম ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে একজন স্বনামধন্য রসুল প্রেরণ করে। সেই সম্মানিত রসুল তাদেরকে সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে তোমরা বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য করছো। এখন তাদেরকে মুক্তি দাও। তাদের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করো আমার কাছে। কেননা আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত রসুল।

এখানে 'ফাতান্না' অর্থ পরীক্ষা করেছিলাম'। 'কুবলাহুম' অর্থ এদের পূর্বে, এই মক্কাবাসীদের আগে। 'রসুলুন কারীম' অর্থ সম্মানিত রসুল। 'রসুল' এর সঙ্গে এখানে তানভীন যুক্ত করা হয়েছে বিশেষ আভিজাত্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ রসুলগণের মধ্যে তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। আবার 'কারীম' অর্থও বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন— আল্লাহ্‌র কাছে, অথবা বিশ্বাসীদের কাছে, কিংবা বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের দিক দিয়ে। আর এখানকার 'সে বললো' অর্থ হজরত মুসা বললেন।

ই'বাদাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে। অর্থাৎ বনী ইসরাইল জনতাকে। এখানে উহ্য রয়েছে একটি সম্বোধনসূচক 'শব্দ'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমার আহ্বানকে কবুল করে নাও। আল্লাহ্‌র দাবি (ঈমান)

পূর্ণ করো। 'ইন্নী লাকুম রসূলুন আমীন' অর্থ নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বস্ত রসুল। 'আমীন' অর্থ আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের বিশ্বস্ত বাহক। আর এ বিশ্বস্ততার প্রমাণ হচ্ছে আমা কর্তৃক প্রদর্শিত মোজেজাসমূহ, যা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ কোরো না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ (১৯)। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পারো, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ গ্রহণ করছি (২০)। যদি আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করো, তবে তোমরা আমার কাছ থেকে দূরে থাকো' (২১)। একথার অর্থ— হজরত মুসা তাদেরকে আরো বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে দুর্বিনয় প্রকাশ কোরো না। আমাকে আল্লাহ্‌র রসুল বলে মেনে নাও। আমি আমার রেসালতের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করছি, যা অনস্বীকার্য। তোমরা হয়তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারো। তা-ই যদি করো, যদি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তাহলে আমি গ্রহণ করছি আল্লাহ্‌র শরণ। হে মিসরবাসী! এখন তোমরা কী করবে ভেবে দ্যাখো। যদি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস না করো, তবে আমার কাছ থেকে দূরেই থাকো। আমার সঙ্গে আর সম্পর্কই রেখো না।

এখানে 'ওয়া আল্লা তা'লূ আ'লাল্লহ্' অর্থ এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ কোরো না। বিসুলত্বনিম্ মুবীন' অর্থ স্পষ্ট প্রমাণ। উল্লেখ্য, প্রত্যর্পণ করা একটি কাজ। এর সঙ্গে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রয়েছে। তাই আগের আয়াতে 'প্রত্যর্পণ করো' বলার পর ব্যবহৃত হয়েছে 'বিশ্বস্ত রসুল' কথাটি। আর এখানে 'ঔদ্ধত্যপ্রকাশ কোরো না' বলার পরে ব্যবহৃত হয়েছে স্পষ্ট প্রমাণের কথা। কেননা স্পষ্ট প্রমাণ দর্শনের পর ঔদ্ধত্য অশোভন এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

হজরত মুসা যখন এভাবে ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। হজরত মুসাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে বলে হুমকি দেয়। সেকারণেই হজরত মুসা বলেন, তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পারো, সেজন্য আমি আমার ও তোমাদের প্রভুপালকের শরণ গ্রহণ করছি।

কাতাদা বলেছেন, এখানকার 'আন্ তারজুমূনী' এর 'রজুম' অর্থ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর উদ্দেশ্য গালি দেওয়া, যাদুকর বলা। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা হজরত মুসা যদি তাদের গালিগালাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে আল্লাহ্‌র শরণ কামনা করতেন, তবে তারা আর কখনো তাঁকে গালি দিতে পারতো না। অথচ দেখা যায়, তারা তাঁকে বহুবার 'যাদুকর' বলে সম্বোধন করেছে। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা বললো, সে তো এক স্পষ্ট যাদুকর'।

এরপরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— 'অতঃপর মুসা তার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করলো, এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়'। একথার অর্থ— দীর্ঘকাল ধরে হজরত মুসা তাদেরকে পথপ্রদর্শনের চেষ্টা করলেন। তাদের চৈতন্যোদয়ের আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা তাঁর সত্য আহ্বানকে স্বীকার করলো না। শেষে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, হে আমার প্রভুপালক! এরা তো চিরভ্রষ্ট বলেই মনে হয়। এরা তো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। সুতরাং তুমি তাদের এবং আমার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দাও। এখানে 'অপরাধী' অর্থ মূর্তিপূজক। কিছুটা অপ্রত্যক্ষ হলেও হজরত মুসার এমতো বক্তব্য হচ্ছে বদ দোয়া। আর মূর্তিপূজকেরা তো বদদোয়ারই উপযুক্ত, যদি তারা সত্যের আহ্বানে সাড়া না দেয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি বলেছিলাম, তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীযোগে বের হয়ে পড়ো, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে (২৩)। সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন এক বাহিনী, যা নিমজ্জিত হবে (২৪)।

এখানে 'ফাআস্‌রি' অর্থ নিশি যোগে প্রস্থান কোরো। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ হজরত মুসার দোয়া কবুল করার পর বললেন। 'ইন্নাকুম মুত্তাবাউন' অর্থ তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার লোকেরা যখন তোমাদের চলে যাওয়ার খবর পাবে, তখনই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। আর 'সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও' অর্থ হে মুসা! তুমি ও তোমার অনুসারীরা সমুদ্রাভ্যন্তরের পথ অতিক্রম করে যখন সমুদ্রের অপর পাড়ে চলে যাবে, তখনও সমুদ্রকে আগের মতো পথবিশিষ্ট অবস্থায় থাকতে দিয়ো। অর্থাৎ তোমার যষ্টির আঘাতে সমুদ্রকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ো না। ঘটনাটি ছিলো এরকম— আল্লাহ্‌র নির্দেশে হজরত মুসা বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। পরদিন সকালে এ খবর রাষ্ট্র হয়ে গেলে ফেরাউন ও তার লোকেরা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলো। ঠিক করলো, পলাতক বনী ইসরাইলদেরকে ধরে নিয়ে আসতেই হবে। সকলে মিলে তখন তারা বনী ইসরাইলদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। ওদিকে হজরত মুসা ও তাঁর অনুগামীরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়ে যাত্রা স্থগিত করতে বাধ্য হলেন। পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ফেরাউন ও তার বাহিনী দ্রুত এগিয়ে আসছে। ধরা পড়ার ভয়ে তাঁরা অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ অলৌকিকভাবে তাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর প্রিয় নবী মুসাকে নির্দেশ দিলেন, তোমার হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে আঘাত করো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নির্দেশ পালন করলেন। সমুদ্রবক্ষে সৃষ্টি হলো বারোটি পথ। ওই পথগুলো দিয়ে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে নির্বিঘ্নে সমুদ্রের ওপারে গিয়ে উঠলেন। ভাবলেন, পুনর্বার যষ্টির আঘাতে সমুদ্রকে আগের মতো সমান করে দিবেন, যাতে ফেরাউন ও তার লোকেরা অপর পাড়ে যাত্রা স্থগিত করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিলো অন্যরকম। তাই প্রত্যাদেশ করলেন 'সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও'। এর পরের ঘটনা সহজেই অনুমেয়। ফেরাউন ও তার লোকেরা সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছে আর দেরী করলো না। সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেলো সমুদ্রপথে। সমুদ্রের মাঝামাঝি যেতে না যেতেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ভেঙে পড়লো বিশালাকৃতির পানির দেওয়ালগুলো। সলিল সমাধি ঘটলো তাদের এভাবেই।

এরপরের আয়াতচতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিলো কতো উদ্যান ও প্রস্রবণ (২৫); কতো শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ (২৬), কতো বিলাস উপকরণ, তাতে তারা আনন্দ পেতো (২৭)। এরূপই ঘটেছিলো এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে' (২৮)। একথার অর্থ— ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে আমি এভাবে পানিতে ডুবিয়ে মারলাম। পশ্চাতে পড়ে রইলো তাদের স্থাবর—অস্থাবর সকল বিত্ত-বৈভব। পড়ে রইলো কতো বাগান, প্রস্রবণ, শস্যস্নাত প্রান্তর, সুরম্য ভবন এবং আরো কতো বিলাস সামগ্রী যা ছিলো তাদের চিত্তবিনোদনের উপকরণ। এভাবেই আমি ঘটিয়েছি মিথ্যার তিরোধানায়ন এবং সত্যের অভ্যুদয়ন। আর তাদের ওই পরিত্যক্ত বিত্ত-বৈভবের অধিকারী করে দিয়েছি আমি বনী ইসরাইলদেরকে।

এরপরের আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হয়নি'।

এখানে আকাশ-পৃথিবীর অশ্রুপাত না করার কথা বলা হয়েছে রূপকার্থে। প্রকৃত কথা হচ্ছে তাদের জীবনের তেমন কোনো গুরুত্বই ছিলো না। তাই তাদের মৃত্যুও হয়েছে অন্যের কাছে অতি তুচ্ছ। যেমন কোনো সজ্জন ব্যক্তি পরলোকগমন করলে লোকে বলে, তার বিয়োগ ব্যাথায় আকাশ বাতাস কাঁদছে। কোনো কোনো বিদ্বান আবার বলেছেন, বাস্তব অর্থেই এখানে বলা হয়েছে আকাশ-পৃথিবীর অশ্রুপাত না করার কথা। কেননা হাদিস শরীফে বলা হয়েছে বিশ্বাসীরা পৃথিবী পরিত্যাগ করলে তাদের বিরহে অশ্রুপাত করে আকাশ ও মৃত্তিকা।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র প্রত্যেক বান্দার জন্য আকাশে দু'টি দরোজা রয়েছে। একটি দিয়ে তার পুণ্যকর্ম উর্ধ্বে উত্থিত হয় এবং অপরটি দিয়ে নেমে আসে তার রিজিক। তার মৃত্যু সংঘটিত হলে তার জন্য উভয় দরোজাই কাঁদে।

বায়হাকীর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে এবং ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, একবার হজরত ইবনে আব্বাসের কাছে 'আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি' এই আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, প্রত্যেকের জন্য আকাশে একটি দরোজা রয়েছে। ওই দরোজা দিয়ে তার জীবনোপকরণ আগমন করে এবং তার কৃতকর্মসমূহ উপরে ওঠে। কোনো মুমিন মৃত্যুবরণ করলে ওই দরোজাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন দরোজা দু'টি তার জন্য কাঁদে। আর যে স্থানে সে নামাজ পড়তো, জিকির করতো , সেই স্থানও যখন তাকে আর পায় না, তখন কাঁদে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বাগবী, আবুল আলিয়া ও ইবনে আবী হাতেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে এই হাদিস বর্ণনার পর তিরমিজি লিখেছেন, শেষে তিনি পুনরায় 'আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি' এই আয়াত পাঠ করলেন।

হজরত শোরাইহ্ ইবনে উয়াইনা হাজরামী থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন কোনো মুমিন সফররত অবস্থায় স্বজন-বান্ধবহীন অবস্থায় মারা যায়, তখন আকাশ-পৃথিবী তার জন্য বিলাপ করে। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করে না'। তারপর বললেন, কাফেরদের জন্য কেউ কাঁদে না।

সূরা দুখান ঃ আয়াত ৩০ — ৪২

❑ আমি তো উদ্ধার করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হইতে

❑ ফির্'আওনের; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের মধ্যে।

❑ আমি জানিয়া শুনিয়াই উহাদিগকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম,

❑ এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম নির্দশনাবলী, যাহাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা;

❑ উহারা বলিয়াই থাকে,

❑ 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমরা আর উত্থিত হইব না।

❑ 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।'

❑ শ্রেষ্ঠ কি উহারা, না তুব্বা' সম্প্রদায় ও ইহাদের পূর্ববর্তীরা? আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, অবশ্যই উহারা ছিল অপরাধী।

❑ আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই;

❑ আমি এই দুইটি অযথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

❑ নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে উহাদের বিচার দিবস।

❑ সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা সাহায্যও পাইবে না।

❑ তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন তাহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আর আমি বনী ইসরাইলদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম ফেরাউনের লাঞ্ছনাদায়ক কঠিন অত্যাচার থেকে। ফেরাউন তো ছিলো সীমালংঘনকারীদের মধ্যে এক চরম সীমালংঘনকারী।

এখানে 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি' অর্থ বনী ইসরাইলদের শিশুপুত্রদেরকে বধ করা এবং শিশু কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা। প্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ক্রীতদাসীর মতো খাটানো ইত্যাদি। আর 'পরাক্রান্ত' অর্থ উদ্ধত, অথবা উচ্চ শ্রেণীভূত। আর 'সীমালংঘনকারী' অর্থ অহংকার ও অনিষ্টকামিতার দিক দিয়ে সীমালংঘনকারী।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি জেনে শুনে তাদেরকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম (৩৩), এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে ছিলো সুস্পষ্ট পরীক্ষা' (৩৪)। একথার অর্থ— আমি জানতাম যে, নবী মুসার সাহচর্যধন্য বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠী তৎকালীন পৃথিবীতে অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উপযোগী। তাই তাদেরকে তখন সেরকমই করেছিলাম। আর তাদেরকে দিয়েছিলাম বিশেষ বিশেষ নিদর্শন— যেমন সমুদ্রভ্যান্তরের বারোটি পথ, তীহ্ প্রান্তরের মেঘের ছায়া এবং 'মান্না' ও 'সালওয়া' নামক বেহেশতী আহার্য ইত্যাদি। কিন্তু ওই নিদর্শনসমূহ ছিলো তাদের জন্য সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

এখানে 'বালাউম্ মুবীন' অর্থ সুস্পষ্ট পরীক্ষা। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ প্রকাশ্য অনুগ্রহ। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এখানে 'পরীক্ষা' অর্থ সুখশান্তি, বিপদ-আপদের মাধ্যমে যাচাই বাছাই। একথা বলার পর তিনি পাঠ করেছেন, 'আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি'।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা বলেই থাকে (৩৪), আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং আমরা আর উত্থিত হবো না' (৩৫)। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকেরা বলে, পরকাল বলে কিছু নেই। আমরা জন্মেছি একবার, মরবও একবার। আমাদেরকে আর জীবিত করা হবেই না। উল্লেখ্য, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং মক্কার মুশরিকেরা সমস্বভাবসম্পন্ন। উভয়ে ছিলো

পথভ্রষ্টতার উপরে দণ্ডায়মান। তাই এখানে প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হয়েছে মক্কার মুশরিকদের কথা। তবে তখন পর্যন্ত তাদের মধ্যে একটি মাত্র পার্থক্য ছিলো। পার্থক্যটি হচ্ছে— ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মক্কার মুশরিকেরা তখন পর্যন্ত শাস্তি পায়নি। তবে শাস্তির হুমকি তাদেরকে তখন দেওয়া হচ্ছিলো বার বার।

এখানে 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই' অর্থ পুনরুত্থান বলে কোনো কিছুই নেই। কোনো কোনো আলেম কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— যখন পৌত্তলিকদেরকে বলা হলো, তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে, যেমন জন্মের পূর্বে তোমরা মৃত অর্থাৎ নিস্প্রাণ ছিলে, তারপর পেয়েছো এই জীবন, তখন তারা বললো, জন্ম পূর্ববর্তী মৃত্যু তো ছিলো প্রথম মৃত্যু, দ্বিতীয় মৃত্যুর পর আর জীবন পাওয়া যাবে না। সুতরাং আমরা আর কখনো পুনরুত্থিত হবো না।

এরপরের আয়াতে (৩৬) বলা হয়েছে— 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত করো'। একথার অর্থ— পৌত্তলিকেরা রসুল স. ও তাঁর সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে আরো বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করে দেখাও না কেনো?

এরপরের আয়াতে (৩৭) বলা হয়েছে— 'শ্রেষ্ঠ কি তারা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও এদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই তারা ছিলো অপরাধী'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! তাদেরকে বলুন, তারা কি অতীতের দুর্ধর্ষ তুব্বা এবং আদ-ছামুদ ইত্যাদি দুর্ধর্ষ সম্প্রদায়ের চেয়েও শৌর্যবীর্যে-কীর্তিতে অধিক শক্তিমান? নিশ্চয়ই নয়। তবুও তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম। তাহলে তোমরা ধ্বংস হওয়া থেকে নির্ভয় হও কীভাবে?

'তুব্বা' ছিলো এক লোকের নাম। বহুসংখ্যক লোকের অধিনায়ক ছিলো সে। তাকে তুব্বা বলা হতো সেকারণেই। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা, তুব্বা নামের অনেক নৃপতি ছিলো। আর তারা একে একে সকলেই শাসনক্ষমতায় এসেছিলো। তাদের রাজ্য শাসনের মাঝখানে কোনো ছেদ পড়েনি। সেকারণে তাদেরকে 'তাতাবিয়'ও বলা হতো। হজরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য বিদ্বজ্জনের উদ্ধৃতি দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, সর্বশেষ তুব্বা ছিলো আস্আদ আবু কুরাইব ইবনে মালিক কুরব। বাগবী এই আয়াতের টীকাভাষ্যে এ বিষয়ে অনেককিছু লিখেছেন। আমি ওই বিবরণ উদ্ধৃত করেছি সুরা কাফে'র তাফসীরে।

তুব্বা ছিলেন মুসলমান। তাই আলোচ্য আয়াতে তাঁকে তিরস্কার করা হয়নি, বরং তিরস্কার করা হয়েছে তাঁর সম্প্রদায়কে, যারা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলো।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাঁর 'আল মুবতাদা' গ্রন্থে এবং ইবনে হিশাম তাঁর 'আত্‌তীজান' গ্রন্থে লিখেছেন, মদীনায় আগমন করে রসুল স. প্রথমে হজরত আবু আইয়ুবের যে বাড়িতে উঠেছিলেন, ওই বাড়িটি ছিলো প্রথম তুব্বা কর্তৃক নির্মিত। ওই প্রথম তুব্বার নাম ছিলো তাবান ইবনে সা'দ। সুরা জুমআর তাফসীরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এখানকার এদের পূর্ববর্তীরা' কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে আ'দ ছামুদ ইত্যাদি মূর্তিপূজক জনগোষ্ঠীকে। আর মুর্তিপূজাই ছিলো তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার কারণ। একথার দিকেই মক্কার মূর্তিপূজকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই তারা ছিলো অপরাধী।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে কোনো কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; (৩৮) এবং তাদের মধ্যে কোনো কিছুই বৃথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না' (৩৯)। একথার

অর্থ— তারা পরকাল, শেষ বিচার ইত্যাদি অস্বীকার করে, অথচ একথাও জানে যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আমিই। আর আমি এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এগুলোই তো আমার সত্তা-নাম-গুণাবলীর প্রমাণ। আর এগুলোর দ্বারা মানুষকে এমতো পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য যে, তাদের মধ্যে কে আমাকে বিশ্বাস করে এবং কে করে না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমার এই মহা উদ্দেশ্যের খবর রাখে না। কেননা তারা পৃথিবীপূজক এবং প্রজ্ঞা-ভাবনাহীন।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার দিবস (৪০)। সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না (৪১)। তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, দয়ালু' (৪২)। একথার অর্থ— নিশ্চয়ই পুনরুত্থান দিবসে সকলকে তাদের আপন আপন সমাধিস্থল থেকে ওঠানো হবে। তারপর শুরু হবে বিচার। নির্ধারণ করা হবে সকলের জন্য চিরস্থায়ী পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। আর ওই দিন হবে মহাসংকটের। তখন আত্মীয় অথবা অনাত্মীয়, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কোনো উপকার করতে পারবে না, ক্ষতি থেকে একে অপরকে বাঁচাতেও পারবে না। তবে যারা বিশ্বাসী ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত তাদের কথা আলাদা। তাদেরকে আল্লাহ্ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ক্ষমা করবেন, কিংবা তাদেরকে ক্ষমা করা হবে তাদের একজনের জন্য অন্যজনের সুপারিশক্রমে। আল্লাহ্ তো মহাপরাক্রমশালী। তাই তিনি কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে সে শাস্তিকে প্রতিহত করার সাধ্য কারো হবে না। আবার তিনি পরম দয়ালুও। তাই যাকে দয়া করবেন, সে অবশ্যই হবে তাঁর মার্জনাভাজন।

আবু মালেক সূত্রে সাঈদ ইবনে মনসুর বর্ণনা করেছেন, একবার আবু জেহেল শুষ্ক খেজুর ও মাখন নিয়ে সঙ্গী-সাথীদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বললো, নাও, যাক্কুম খাও। এই হচ্ছে সে-ই যাক্কুম, মোহাম্মদ যার ভয় তোমাদেরকে দেখায়। তার এমতো অপবচনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলো পরবর্তী আয়াতসমূহ। বলা হলো—

সূরা দুখান ঃ আয়াত ৪৩ - ৫৯

- ❑ নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইবে—
- ❑ পাপীর খাদ্য;
- ❑ গলিত তাম্রের মত, উহাদের উদরে ফুটিতে থাকিবে
- ❑ ফুটন্ত পানির মত।
- ❑ উহাকে ধর এবং টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে,
- ❑ অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও—

❑ এবং বলা হইবে 'আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত!
❑ 'ইহা তো উহাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করিতে।'
❑ মুত্তাকীরা থাকিবে নিরাপদ স্থানে—
❑ উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,
❑ তাহারা পরিধান করিবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখি হইয়া বসিবে।
❑ এইরূপই ঘটিবে; আমি উহাদিগকে সঙ্গিণী দান করিব আয়তলোচনা হূর,
❑ সেথায় তাহারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনিতে বলিবে।
❑ প্রথম মৃত্যুর পর তাহারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করিবে না। আর তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন—
❑ তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। ইহাই তো মহাসাফল্য।

❑ আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।
❑ সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, উহারাও প্রতীক্ষমান।

প্রথমোক্ত আয়াতচতুষ্টয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— নিশ্চয়ই জাহান্নামবাসী পাপিষ্ঠশ্রেষ্ঠদের খাদ্য হবে যাক্কুম। অতীব কদর্যাকার ওই খাদ্য দেখতে হবে গলিত তামা, অথবা তেলের গাদের মতো, ভক্ষণের পর যা তাদের পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মতো।

এখানে 'আলআছীম' অর্থ ঘোর পাপী, পাপিষ্ঠশ্রেষ্ঠ। 'আল্‌মুহলি' অর্থ গলিত ধাতু, কিংবা তেলের কালো গাদ। আর 'ফী বুতুন' অর্থ উদরে, পেটের মধ্যে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বাগবী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যতোটা ভয় করা উচিত। শোনো, যাক্কুমের একটি টুকরা যদি পৃথিবীতে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে সকল পৃথিবীবাসীর জীবন হয়ে যাবে তিক্ত ও বিস্বাদপূর্ণ। তাহলে অনুমান করো, ওই সকল লোকের অবস্থা হবে কেমন, যাক্কুমই হবে যাদের আহার্য। তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী প্রমুখও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি মন্তব্য করেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'তাকে ধরো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে (৪৭), অতঃপর তার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও— (৪৮) এবং বলা হবে, আস্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত (৪৯)। এটা তো তা-ই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে' (৫০)। একথার অর্থ— দোজখের প্রহরীদেরকে লক্ষ্য করে তখন বলা হবে, এই কাফেরকে ধরো এবং একে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও দোজখের মধ্যে, তারপর তার মাথায় ঢেলে দাও উত্তপ্ত পানি। এভাবে তাকে উপর্যুপরি শাস্তি দিতেই থাকো এবং বলো, দ্যাখো, এখন কেমন লাগে। তুমি তো পৃথিবীতে মানী-গুণী বলে গর্ব করতে। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো, এটা হচ্ছে সেই শাস্তি, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

এখানে 'সাওয়ায়িল জাহীম' অর্থ দোজখের মধ্য স্থলে। আর এখানকার 'তুমি তো ছিলে সম্মানিত', অভিজাত কথাটির অর্থ তুমিতো পৃথিবীতে নিজেকে মনে করতে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। বাগবী লিখেছেন, মুকাতিল বলেছেন, দোজখরক্ষীরা কাফেরদের মাথায় জোরে আঘাত করবে। ফলে তাদের মাথা ফেটে বেরিয়ে পড়বে মগজ। তখন তারা তাদের মাথায় ঢালতে থাকবে ফুটন্ত পানি এবং বলতে থাকবে— আস্বাদ গ্রহণ করো। তুমি না সম্মানিত, অভিজাত। উল্লেখ্য, আবু জেহেল এরকমই দাবি করতো। বলতো, আমি এই জনপদের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও অভিজাত ব্যক্তি। আর অবজ্ঞাভরে রসুল স.কে দেখিয়ে বলতো— আর এ হচ্ছে দোজখের রক্ষী।

'মাগাজী' গ্রন্থে ইকরামা সূত্রে উমুবী লিখেছেন, রসুল স. একবার আবু জেহেলের সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাকে একথা বলতে— তুমি ধ্বংস হও, হও বিধ্বস্ত। আবু জেহেল তার কাঁধের পরিধেয় বস্ত্র নামিয়ে বললো, তুমি ও তোমার সাথী আল্লাহ্ আমার কিছুই করতে পারবে না। তুমি তো জানোই, আমি মক্কাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুলীন ও শ্রদ্ধেয়। উল্লেখ্য, আবু জেহেলের এমতো অহংকারকে আল্লাহ্ চুর্ণবিচুর্ণ করেছেন বদর যুদ্ধের সময় এবং বলেছেন 'আস্বাদ গ্রহণ করো, তুমি না সম্মানিত, অভিজাত'! কাতাদা সূত্রে ইবনে জারীরও এরকম বর্ণনা করেছেন। আর এখানকার 'ইন্‌না হাজা মা কুনতুমবিহী তামতারূন' কথাটির অর্থ— এটা তো তা-ই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।

এরপরের আয়াত চতুষ্টয়ে বলা হয়েছে— 'মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে (৫১), উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে (৫২), তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে (৫৩)। এরূপই ঘটবে; আমি তাদেরকে সঙ্গিনী দান করবো,

আয়াতলোচনা হুর' (৫৪)। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তারা থাকবে চিরনিরাপদ বেহেশতের এমন স্থানে যেখানে রয়েছে মনোরম উদ্যান ও প্রবহমান নদী। তাদের পরিধেয় হবে মসৃণ ও পুরুষ্ট রেশমের। আর আমি তাদেরকে পত্নীরূপে দান করবো আয়তআখিনী সুন্দরী হুর। আমি যেরকম বর্ণনা করলাম সেরকমই ঘটবে সেখানে।

এখানে 'মাকৃমিন আমীন' অর্থ নিরাপদ স্থান। 'ফী জান্নাতিঁউ ওয়া উ'য়ুন' অর্থ উদ্যান ও ঝর্ণাধারার মাঝামাঝি। অর্থাৎ এমন বাগানের মধ্যে, যেখানে রয়েছে প্রবহমান নদী। 'সুন্দুস' অর্থ রেশমী বস্ত্র। আর 'ইস্‌তাবরাক্ব' অর্থ মিহি ও পুরু। মোহাম্মদ ইবনে কা'ব সূত্রে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর কেউ যদি বেহেশতের পোশাক পরে, তবে তাকে যারা দেখবে তারা বেহুঁশ হয়ে যাবে। ওই সৌন্দর্য তাদের চোখে সহ্য করতে পারবে না। 'মিআতাইন' গ্রন্থে ইকরামা সূত্রে সাবুনী লিখেছেন, বেহেশতীদের পোশাকের রঙ ক্ষণে ক্ষণে সত্তর রকম রঙে বদলাতে থাকবে।

'মুতাক্বাবিলীন' অর্থ মুখোমুখি হয়ে বসবে। 'কাজালিকা' অর্থ এরকমই ঘটবে। আর 'আমি তাদেরকে সঙ্গিনী দান করবো আয়তলোচনা হুর' অর্থ আমি তাদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দিবো বেহেশতের মদিরনয়না সুন্দরী হুরদের। অবশ্য এখানকার 'যাওওয়াজনাহুম' অর্থ বিবাহ দেওয়া নয়, বরং এর অর্থ জোড়া মিলিয়ে দেওয়া। সেকারণেই এখানকার 'হুরিন' এর পূর্বে 'বা' অক্ষর সংযুক্ত করে বলা হয়েছে 'বিহুরিন'। 'বিবাহ' বোঝাতে চাইলে বলা হতো 'হুরান আ'ইনা' অর্থাৎ 'বা' অক্ষর ব্যবহার করা হতো না। আরবী ভাষায় কোনো মেয়েকে বিবাহ করার কথা বলা হলে বলতে হয় 'যওয়াজ্বতুহু ফুলানাতুন' (আমি তাকে অমুকের সঙ্গে বিবাহ দিলাম)। এরকম বলা হয় না যে 'যওয়াজ্বতুহু বি ফুলানাতিন্'। অর্থাৎ 'বা' ব্যবহার করা হয় না। সেকারণেই আবু উবায়দা কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি আয়াতলোচনা বেহেশতী ললনাদের সঙ্গে তোমাদেরকে যুগলবন্দী করবো জোড়ায় জোড়ায়, যেমন একটি পাদুকা হয় অন্যটির জোড়া।

'হুরিন' অর্থ সুন্দরী, যাদের রঙ ও রূপ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আর এখানকার 'ঈন' অর্থ আয়তলোচনা টানা টানা চক্ষুধারিণী। 'হুরিণ' শব্দটি 'হাইরউ' এর বহুবচন।

হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সুলোচনা হুরীদেরকে তৈরী করা হয়েছে জাফরান দিয়ে। সুপরিণত সূত্রে হজরত আনাস থেকে বায়হাকীও এরকম বর্ণনা করেছেন। পরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরকম হাদিস এসেছে এবং মুজাহিদও এরকম হাদিসের বর্ণনাকারী। জায়েদ ইবনে আব্বাস সূত্রে ইবনে মোবারক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ হুরীদেরকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেননি, সৃষ্টি করেছেন মেশক ও জাফরান দিয়ে।

হজরত আনাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যদি কোনো হুর সমুদ্রে থুথু নিক্ষেপ করে, তবে সমুদ্রের সমস্ত পানি হয়ে যাবে সুমিষ্ট। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া বলেছেন, কোনো হুরী যদি আকাশ অথবা পৃথিবীতে তার বাহু প্রদর্শন করে, তবে তার বাহুর রূপ দেখেই মানুষ পাগল হয়ে যাবে। আর যদি সে তার ঘোমটা খুলে দেয়, তবে তার রূপের ছটায় তেজস্কর সূর্যকেও মনে হবে নিস্প্রভ বাতির মতো। আর যদি সে উঁকি দেয়, তবে এক সঙ্গে হতচকিত হয়ে উঠবে আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই। হান্নাদ বর্ণনা করেছেন, হুব্বান ইবনে আহীলাহ্ বলেছেন, পৃথিবীবাসী রমণীদের মধ্যে যারা বেহেশতে যাবে, তারা হবে হুরীদের চেয়েও সুন্দর।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে (৫৫)। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন—(৫৬) তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। এটাই তো মহাসাফল্য' (৫৭)। একথার অর্থ— বেহেশতবাসীরা সেখানকার পুস্পোদ্যানে বসে নিশ্চিন্ত মনে পরিচারকদেরকে ইচ্ছা মতো বিভিন্ন রকমের ফলমূল আনতে বলবে। এভাবে তারা সেখানে সুখভোগ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। আর তাদের ওই বেহেশতী জীবন হবে মৃত্যুহীন, অনন্ত। এভাবে দোজখের শাস্তি থেকে আল্লাহ্ই তাদেরকে দয়া করে বাঁচাবেন। এটাই হচ্ছে মহাসফলতা।

এখানে 'বিকুল্লি ফাকিহাতিন্' অর্থ বিবিধ ফলমূল, যা খেতে ইচ্ছে করবে। 'আমিনীন' অর্থ প্রশান্ত চিত্তে। অর্থাৎ এমতো দুশ্চিন্তা মোটেও প্রশ্রয় পাবে না যে, তাড়াতাড়ি না খেলে ফলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, অথবা বেশী বেশী খেলে সবই তো শেষ হয়ে যাবে।

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, পৃথিবীর তিক্ত-মিষ্ট সকল প্রকার ফলই বেহেশতে পাওয়া যাবে। এমনকি বিবেরক ফলও। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন বেহেশতের জিনিষপত্রের নাম পৃথিবীতেও চালু রয়েছে।

'প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না' ব্যতিক্রমীটি এখানে হবে সংযুক্ত অথবা বিযুক্ত। আর কথাটিতে মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে রূপকার্থে। কেননা পরকালে কারো মৃত্যু হবে না। পরকালের জীবন মৃত্যুহীন। বেহেশতেও

মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নেই। সুতরাং পৃথিবীর মৃত্যুই প্রথম এবং শেষ মৃত্যু। বরং মৃত্যুর পরেই পুণ্যবান বিশ্বাসীরা জান্নাত অবলোকন করতে থাকে। মনে হতে থাকে তারা যেনো বেহেশতেই রয়েছে। আর এখানকার 'নিজ অনুগ্রহে' কথাটির অর্থ— বিশ্বাসীরা যা কিছু পাবে, তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই পাবে। দোজখাগ্নি থেকে পরিত্রাণও তারা লাভ করবে আল্লাহ্‌র দয়াতেই। কেননা আল্লাহ্‌র উপরে কারো কোনো অধিকার খাটে না।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, পুণ্যকর্ম কাউকে স্বর্গে যেমন নিয়ে যেতে পারবে না, তেমনি রক্ষা করতে পারবে না নরক থেকে। আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ব্যতিরেকে আমিও হতে পারবো না স্বর্গাধিকারী। মুসলিম।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে (৫৮, ৫৯) বলা হয়েছে— 'আমি তো তোমার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা করো, তারাও প্রতীক্ষমান'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি যাতে সহজে কোরআন বুঝতে পারেন এবং এর মাধ্যমে সদুপদেশ দিতে পারেন পথবিভ্রান্ত মানুষকে, তাই আমি এই মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি আপনার মাতৃভাষায়। এরপরেও যদি তারা আপনার সুস্পষ্ট আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে আপনি ধৈর্য ধরে তাদের উপরে শাস্তি আরোপণ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারাও স্বধারণার বশবর্তী হয়ে এই মর্মে প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে থাকুক যে, অবশেষে আপনিই হতোদ্যম হয়ে পড়বেন। অথবা আপনি অপেক্ষা করুন কাংখিত বিজয়ের এবং তারা আশা করতে থাকুক আপনার পরাজয়ের।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে শিথিল সূত্রে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নিশীথে সুরা দুখান পাঠ করে, প্রভাতে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে সত্তর হাজার ফেরেশতা। শিথিল সূত্রসহযোগে তিরমিজি এরকমও বর্ণনা করেছেন যে, জুমআর রাতে যে ব্যক্তি নিয়মিত সুরা দুখান পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিবেন। ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হাসান বলেছেন, জুমা রজনীতে যে ব্যক্তি সুরা দুখান তেলাওয়াত করবে, তার অতীতের অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেওয়া হবে। অদৃঢ় সূত্রপরম্পরায় হজরত আবু উমামা থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে অথবা দিনে 'হা-মীম দুখান' আবৃত্তি করবে, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।

সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র। সুরা দুখানের তাফসীর সমাপ্ত হলো আজ ২৮শে রবিউল আউয়াল, ১২০৮ হিজরী সনে। ওয়াল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। ওয়া সল্লাল্লহু তায়ালা আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্বমায়ীন। আমিন।

সূরা জ্বাছিয়া

এই সুরাটিও অবতীর্ণ হয়েছে পুণ্যভূমি মক্কায়। এর রুকু ও আয়াতের সংখ্যা যথাক্রমে ৪ এবং ৩৭।

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত **১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১**

❑ হা-মীম।

❑ এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

❑ নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদের জন্য।

❑ তোমাদের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য;

❑ নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে

তাফসীরে মাযহারী/৫৩৯

এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে।

❑ এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, যাহা আমি তোমার নিকট তিলাওয়াত করিতেছি যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার আয়াতের পরিবর্তে উহারা আর কোন বাণীতে বিশ্বাস করিবে?

❑ দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর,

❑ যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের তিলাওয়াত শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে উহা শোনে নাই। উহাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির;

❑ যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন উহা লইয়া পরিহাস করে। উহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

❑ উহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে জাহান্নাম; উহাদের কৃতকর্ম উহাদের কোন কাজে আসিবে না, উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে অভিভাবক স্থির করিয়াছে উহারাও নহে। উহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

❑ এই কুরআন সৎপথের দিশারী; যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, উহাদের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— 'হা-মীম'। এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে, যাঁর পরাক্রম অপ্রতিরোধ্য এবং যাঁর জ্ঞান অপরিমেয়। সেকারণেই তাঁর শত্রুকুল শাস্তি পাবেই পাবে এবং সেকারণেই মহাবিশ্বের পরিকল্পনা পরিচালনা এতো নিখুঁত এবং সুশৃঙ্খল।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— **'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য'**। একথার অর্থ— নিশ্চয় যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য আকাশে ও পৃথিবীতে রয়েছে আল্লাহ্‌র এককত্বের বহুসংখ্যক নিদর্শন। আর 'খলক্ব' (সৃষ্টি) শব্দটি এখানে উহ্য রয়েছে মনে করলে বক্তব্যটি দাঁড়াবে— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার মধ্যে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে মহৎ নিদর্শনাবলী।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— **'তোমাদের সৃজনে ও জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য'**।

এখানে 'ওয়া ফী খলক্বিকুম' অর্থ তোমাদের সৃজনে। অর্থাৎ মানুষের সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও এককত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যেমন শুক্রবিন্দু থেকে মানুষের জন্ম, প্রবৃদ্ধি ও পরিণতির বিভিন্ন স্তরসমূহ। 'ওয়া মা ইয়াবুছ্ছু মিন দাব্বাতিন' অর্থ এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে। কথাটির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে জেরপ্রদানকারী একটি সর্বনামের সাথে। তৎসত্ত্বেও 'খলাক্বকুম' (তোমাদের সৃজনে) কথাটির সঙ্গে একে সম্পর্কযুক্ত করাই অধিকতর সমীচীন। কেননা জন্তু-জানোয়ারদের বিভিন্ন প্রজাতি সৃজন, তাদের বংশবিস্তার এবং তাদের জীবনোপকরণ নিশ্চিতকরণ এসকল কিছুই হচ্ছে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, এককত্ব এবং পূর্ণতার প্রমাণ।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— **'নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে'**।

এখানে 'ওয়াখ্‌তিলাফিল্ লাইলি ওয়ান্ নাহার' অর্থ রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে। অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্মকালের দিন রাতের সংকোচন-প্রসরণের মধ্যে। 'মির রিজক্বিন্' অর্থ এখানে বৃষ্টি। কেননা বৃষ্টিই হচ্ছে রিজিক উৎপন্ন হওয়ার কারণ। 'ফাআহ্‌ইয়া বিহিল্ আরদ্ব 'বা'দা মাওতিহা' অর্থ ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। অর্থাৎ বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে নিষ্ফলা মৃত্তিকাকে করে তোলেন শস্যপ্রজননক্ষম। 'ওয়া তাস্‌রীফির রিয়াহি' অর্থ এবং বায়ুর পরিবর্তনে। আর 'আয়াতুল্ লিক্বওমি ইয়া'ক্বিলূন' অর্থ নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ সেই সকল লোকদের জন্য, যারা এ সকল কিছুকে আল্লাহ্‌র এককত্বের নিদর্শন বলে চিহ্নিত করতে পারে এবং তাঁকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে। অথবা 'চিন্তাশীল সম্প্রদায়' অর্থ এখানে বিশ্বাসী ও জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। কেননা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তো জন্তু-জানোয়ার সদৃশ। বরং তাদের চেয়েও অধিক পথচ্যুত।

বায়যাবী লিখেছেন, তিনটি আয়াতে যে নিদর্শনরাজির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো দৃশ্যমানতা এবং ঋতুর দিক থেকেও বিভিন্ন প্রকৃতির। তাই সেগুলোর রহস্য বুঝতে গেলে প্রয়োজন গভীর চিন্তা ও অনুধ্যানের। আবার ওই তিনটি আয়াতের অনিবার্যতা প্রকাশ করা হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। একস্থানে বলা হয়েছে 'ক্বওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন'। আর এক জায়গায় বলা হয়েছে 'কুওমিঁই ইউক্বিণু'। আবার অন্য স্থানে বলা হয়েছে 'মু'মিনীন'। এরকম করা হয়েছে কেবল বক্তব্যকে স্মরণ করার জন্য। নতুবা 'ইমান' 'ইয়াক্বিন' এগুলো সমার্থক এবং উভয়ই চিন্তাশীলতা ও বোধগম্যতার ফল। অর্থাৎ বুদ্ধির দাবি এই যে, বুদ্ধিমানেরা যেনো অবশ্যই এক আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— **'এগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি তোমার নিকট তেলাওয়াত করছি যথাযথভাবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে'?** একথার অর্থ— হে আমার রসুল! কোরআনের এই বাণীসম্ভার আল্লাহ্‌রই আয়াত, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ভুলভাবে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। তাই মানুষের উচিত নির্বিবাদে ও সর্বান্তঃকরণে এই আয়াতসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। যদি তারা এরকম না করে তাহলে তো অবশ্যই হয়ে পড়বে সত্যপথচ্যুত। কেননা যা তাঁর বাণীর পরিপন্থী, তার সকল কিছুই মিথ্যা।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— **'দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর (৭), যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের তেলাওয়াত শোনে, অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে, যেনো সে তা শোনেনি, তাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির' (৮)**। একথার অর্থ যারা ঘোর মিথ্যাবাদী, পাপী, তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ।

আর যে আল্লাহ্‌র বাণী শুনেও শোনে না, অহংকার বশে আগের মতোই অটল থাকে সত্যপ্রত্যাখ্যানের উপর, হে আমার রসুল! আপনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ প্রদান করুন।

এখানে 'আছীম' অর্থ ঘোর পাপী । আর পরের বাক্যে বলা হয়েছে ঘোর পৌত্তলিক নজর ইবনে হারেছের কথা। 'ছুম্‌মা ইউসির্‌রু মুস্‌তাক্‌বিরান' অর্থ অথচ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অটল থাকে। 'ছুম্‌মা' অর্থ অতঃপর (এখানে অর্থ করা হয়েছে 'অথচ')। শব্দটি ব্যবহার করা হয় সাধারণতঃ কালক্ষেপণার্থে। আয়াত শ্রবণের পর কালক্ষেপণ করা জ্ঞানের উর্ধ্বে। অর্থাৎ সময়ান্তর বুঝানোর জন্য। অথবা ব্যবধান প্রকাশার্থে। এখানে ব্যবধান নির্দেশ করার জন্যই বলা হয়েছে 'অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে'। অর্থাৎ নজর ইবনে হারেছ সত্যের আহ্বান শুনেও শোনে না। প্রত্যাখ্যান করে অহংকারের সঙ্গে।

'মুস্‌তাক্‌বিরূন' অর্থ তারা উদ্ধত। অর্থাৎ নজর ইবনে হারেছ ইমানকে তুচ্ছ বিষয় মনে করে অহংকারের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করে। 'ফাবাশ্‌শির' অর্থ সুসংবাদ দাও। এখানকার 'ফা' নৈমিত্তিক। অর্থাৎ 'ফা' এর পূর্ববর্তী বাক্যে বর্ণিত হয়েছে তার পরবর্তী বাক্যের কারণ। আর শাস্তির সংবাদ দানের ক্ষেত্রে এখানে 'সুসংবাদ' ব্যবহার করা হয়েছে বিদ্রূপার্থে, পরিহাসচ্ছলে। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! যারা নজর ইবনে হারেছের মতো ঘোর মিথ্যাবাদী পাপী, তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ। কেননা তারা আল্লাহ্‌র বাণী শুনেও অবজ্ঞা ও অহমিকাবশতঃ প্রত্যাখ্যান করে। এমন ভান করে যে, যেনো কিছু শোনেইনি। অতএব আপনি নজরকে মর্মন্তুদ শাস্তির অনিবার্যতার কথা জানিয়ে দিন।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— 'যখন আমার কোনো আয়াত সে অবগত হয়, তখন তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (৯)। তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম, তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসবে না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে, তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি (১০)। এই কোরআন সৎপথের দিশারী; যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি' (১১)। একথার অর্থ— নজর ইবনে হারেছ এবং তার মতো মিথ্যাবাদী পাপীরা আল্লাহ্‌র বাণী কেবল প্রত্যাখ্যানই করে না, বরং তা নিয়ে ঠাট্টা-উপহাসও করে। এধরনের অপরাধীদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। জাহান্নাম তাদের পশ্চাদানুসরণ করে চলেছে। পরকালে তাদের পৃথিবীর কোনো অর্জন কাজে আসবে না। আর যাদেরকে তারা সুপারিশকারীরূপে পূজা করতো, তারাও তাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। কেননা তাদের উপাস্যদের জন্যও রয়েছে কঠোর শাস্তি। ওই সকল অপমান্যও মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে কেবল কোরআন। কারণ কোরআন হচ্ছে সত্য পথের দিশারী। সুতরাং যারা এই কোরআনকে মানবে না, তাদেরকে তো অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে হবেই।

তাফসীরে মাযহারী/৫৪২

এখানে 'লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি' অর্থ কবরের আযাব। 'তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম' অর্থ তাদের সামনে পিছনে সবদিকেই রয়েছে জাহান্নাম। অর্থাৎ পরকালে জাহান্নামের আযাব শুরু হলেও তারা যেনো এখন থেকেই জাহান্নামের আগুন দ্বারা পরিবেষ্টিত। 'তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে' অর্থ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা পূজা করেছে যে সকল প্রতিমার, অথবা আনুগত্য করেছে যে সকল অংশীবাদী দলপতির। 'তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো কাজে আসবে না' অর্থ তাদের ধনবল, জনবল কোনোকিছুই সেদিন তাদের কাজে আসবে না। 'আর এই কোরআন সৎপথের দিশারী' অর্থ এই কোরআন হচ্ছে নির্ভুল পথপ্রদর্শক।

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ১২, ১৩

❑ আল্লাহ্‌ই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আদেশে উহাতে নৌযানসমূহ চলাচল করিতে পারে ও যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

❑ আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মানুষ! আল্লাহ্‌ই তো তোমাদের জন্য সমুদ্রকে করেছেন কল্যাণার্জনের মাধ্যম। সমুদ্রযাত্রাকে করেছেন সুগম। সে কারণেই তো তোমাদের জলযানগুলো বন্দর থেকে বন্দরে চলাচল করতে পারে নির্বিঘ্নে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবনোপকরণ আহরণ করতে পারো এবং সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো তাঁর। এভাবে সমুদ্রই কেবল নয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু দয়া করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তোমাদেরই কল্যাণে রেখেছেন সতত নিয়োজিত। যারা চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান, কেবল তারাই এ সকল নিদর্শনের মর্ম বোঝে এবং পথিক হয় বিশ্বাসী পথের।

এখানে 'সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন' অর্থ সমুদ্রপৃষ্ঠকে করেছেন সমতল, মসৃণ ও সুনাব্য। 'যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পারো' অর্থ যাতে তোমরা বিভিন্ন সমুদ্রবন্দরে পণ্যবিনিময়ের মাধ্যমে অর্জন করতে পারো অর্থ-বিত্ত, প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ। 'তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত

রেখেছেন পৃথিবীর সমস্ত কিছু' অর্থ তিনি আকাশের সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র, বায়ুপ্রবাহ-মেঘমালা এবং পৃথিবীর ফল-ফসল, নদী-বৃক্ষ-পর্বতমালা সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের উপকারার্থে। হজরত ইবনে আব্বাস এখানকার 'সমস্ত কিছু' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— সমগ্র সৃষ্টিই মানুষের জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ্ এ সকল কিছুই দিয়েছেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, অনুগ্রহ করে। জুজাযও এরকম বলেছেন। 'আর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে তো রয়েছে নিদর্শন' অর্থ যারা জ্ঞানী ও তত্ত্বানুসন্ধানী তারাই কেবল আল্লাহ্র এ সকল নিদর্শন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয় এবং ইমান আনে মহাসৃজয়িতা ও মহাপ্রভুপালয়িতা আল্লাহ্র উপর।

হজরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা থেকে বাগবী লিখেছেন, একবার মক্কায় গিফারী গোত্রের এক লোক হজরত ওমরকে গালি দিলো। হজরত ওমর তখন তার উপর হামলা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সে সময় অবতীর্ণ হলো নিম্নবর্ণিত আয়াত। বলা হলো—

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ১৪, ১৫

❑ মু'মিনদিগকে বল, 'তাহারা যেন ক্ষমা করে উহাদিগকে, যাহারা আল্লাহ্র দিবসগুলির প্রত্যাশা করে না । ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন।'

❑ যে সৎকর্ম করে সে তাহার কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আপনার বিশ্বাসী সহচরবর্গকে এই মর্মে সদুপদেশ দিন যে, তারা যেনো ওই সকল লোকের মূর্খজনোচিত আচরণকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, যারা আল্লাহ্কেই বিশ্বাস করে না, আস্থা রাখে না পরকালের প্রতি। কেননা আল্লাহ্ তায়ালাই পরকালে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটাবেন। প্রত্যেককেই দিবেন তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। পুণ্যবানেরা পুণ্যকর্ম করে তাদের নিজেদের ভালোর জন্য। আর যে মন্দকর্মপ্রবণ, সে তার মন্দকর্মের ক্ষতিকর প্রতিফল ভোগ করবে নিজেই। আর একথাও নিশ্চিত যে, পুণ্যবান-পাপী সকলকেই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে তাদের প্রভুপ্রতিপালক সকাশে।

এখানে 'ইয়াগ্ফির' অর্থ ক্ষমা করে। 'লা ইয়ারজুন' অর্থ প্রত্যাশা করে না। 'আইইয়ামাল্লহ্' অর্থ আল্লাহ্র দিবসগুলির। অর্থাৎ বিশ্বাসীদেরকে প্রদত্ত বিজয়ের সুসংবাদসম্বলিত শুভ দিবসগুলির।

বাগবী লিখেছেন, কারাজী ও সুদ্দী বলেছেন, প্রথমদিকে বিধর্মীরা মক্কার মুসলমানদেরকে খুবই কষ্ট দিতো। অত্যাচারিত সাহাবীগণ প্রায়শ এ বিষয়ে রসুল স. এর কাছে অনুযোগ উপস্থাপন করতেন। তখন অবতীর্ণ হয়েছিলো আলোচ্য আয়াতদ্বয়। পরে যখন জেহাদের আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন রহিত হয়ে গেলো আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের বিধান।

'বিমা কানূ ইয়াক্সিবূন' অর্থ কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ভালো-মন্দ উভয় প্রকার কর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করবেন। 'ফালি নাফ্সিহী' অর্থ তার কল্যাণের জন্যই করে। 'ওয়া মান আসাআ ফাআ'লাইহা' অর্থ কেউ মন্দ কর্ম করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে। আর 'ছুম্মা ইলা রব্বিকুম তুরজ্বাউ'ন' অর্থ অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ তোমাদেরকে অবশেষে আল্লাহ্ সকাশে উপস্থিত করানো হবে তোমাদের সুকর্ম ও কুকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল প্রদানের উদ্দেশ্যে।

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১

❑ আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নুবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম এবং দিয়াছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর।

❑ আমি উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম দীন সম্পর্কে। উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর উহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করিয়াছিল। উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন উহাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন।

❑ ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি উহার অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না।

❑ আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় উহারা তোমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।

❑ এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।

❑ দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? উহাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এবার বনী ইসরাইল জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু শুনুন, আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম আকাশজ গ্রন্থ, শাসনক্ষমতা ও ধর্মীয় জ্ঞান। তাদের মধ্যে অনেককে করেছিলাম নবী। সম্প্রদায়গত শ্রেষ্ঠত্বও দিয়েছিলাম তাদেরকে তখনকার অপরাপর জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে। আরো দিয়েছিলোম উত্তম আহার্যসম্ভার। ধর্ম সম্পর্কেও দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। কিন্তু এতো কিছু পাবার পরেও জ্ঞাতসারে তারা হয়ে গিয়েছিলো নিজেদের মধ্যেই বিদ্বেষপরায়ণ। মতানৈক্য পৌঁছেছিলো তাদের চরমে। সন্ধি তাদের কখনো হয়নি। হবেও না। তাই আল্লাহ্ই মহাবিচারের দিবসে তাদের অনাপোষ মতোবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিবেন।

এখানে 'কিতাব' অর্থ তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর। 'হুকামা' অর্থ কর্তৃত্ব, শাসনক্ষমতা। 'আন্নুবুওওয়াহ্' অর্থ নবুয়ত। উল্লেখ্য, বনী ইসরাইলদের মধ্যে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছিলেন বহুসংখ্যক নবী। 'রযাক্বনাহুম মিনাত্ ত্বইয়্যিবাত' অর্থ উত্তম জীবনোপকরণ, সুস্বাদু আহার্যসম্ভার। 'ফাদ্বদ্বল্নাহুম আ'লাল আ'লামীন' অর্থ দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তাদের জামানায় আল্লাহ্‌র নিকটে তারা ছাড়া আর কেউ প্রিয়ভাজন ও সম্মানার্হ ছিলো না।

'দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর' কথাটির দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, বিশেষ মানুষ বিশেষ ফেরেশতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা 'বিশ্বজগত' (আ'লামীন) এর মধ্যে ফেরেশতারা রয়েছে। অর্থাৎ বনী ইসরাইলদের নবীগণ অবশ্যই বিশিষ্ট ফেরেশতাবৃন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

'বাইয়্যিনাতিম্ মিনাল আমরি' অর্থ ধর্মীয় বিষয়সমূহের সুস্পষ্ট প্রমাণ। উল্লেখ্য, ওই সকল বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা বনী ইসরাইলদের জন্য ছিলো অত্যাবশ্যক। শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর বিবরণও লিপিবদ্ধ ছিলো তাদের কিতাবে। তাই তাঁর উপর ইমান আনাও ছিলো তাদের জন্য অত্যাবশ্যক। একারণেই তারা রসুল স.কে চিনতো, যেমন চিনতো নিজেদের সন্তানকে। আর এখানে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করতো কথাটির অর্থ তারা তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে করতো প্রচণ্ড মতোবিরোধ, অথবা মতানৈক্য করতো রসুল স. এর প্রতি ইমান আনা না আনার ব্যাপারে, যার ভিত্তি ছিলো কেবলই বিদ্বেষ, অহমিকা ও শত্রুতা, আর যার পক্ষে তাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণও ছিলো না। কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের একাত্তর ও বায়াত্তর দলের মধ্যে কোনো দলের অভিমতই প্রামাণ্য ছিলো না। তারা এরকম দল-উপদল সৃষ্টি করেছিলো কেবলই আপনাপন জেদ বজায়ার্থে। এই উম্মতের বায়াত্তর দলের মধ্যে একটি দল ছাড়া বাকী দলগুলোর অবস্থাও তেমনি। তারা কোরআনের আয়াতকে করেছে খণ্ডিত, অপব্যাখ্যাদুষ্ট, অথবা বিকৃত। যেমন মুতাজিলারা ইসলামকে বুঝতে যেয়ে আশ্রয় করেছে জড়বাদী বুদ্ধি ও ভ্রান্ত দর্শনশাস্ত্রের। আবার মুজাস্সিমা সম্প্রদায় মনে করে আকারাতীত বলে কোনোকিছু নেই, এমনকি আল্লাহ্ও অবয়ববিশিষ্ট। এদিকে রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি সম্প্রদায় সম্পূর্ণই বিদ্বেষ ও ঈর্ষানির্ভর।

'ইয়াওমাল কিয়ামাহ্' অর্থ কিয়ামতের দিন। আর 'ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন' অর্থ তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। অর্থাৎ পুরস্কৃত করবেন সত্যাশ্রয়ীদের এবং শাস্তি দিবেন মিথ্যাধিষ্ঠিতদেরকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কোরো না (১৮)। আল্লাহ্র মোকাবিলায় তারা তোমার কোনোই উপকার করতে পারবে না; জালেমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ্ তো মুত্তাক্বীদের বন্ধু'(১৯)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনাকে তো আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি স্বতন্ত্র শরিয়তের উপর, যা সর্বশেষ, সর্বোৎকৃষ্ট ও পূর্ণতম। সুতরাং আপনি এই শরিয়তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকুন। সদুদ্দেশ্যে হলেও অজ্ঞদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ্র বিধানের তোয়াক্কা না করে অনুসরণ করে স্ব-অভিমতের। আরো শুনুন, আল্লাহ্র বিপরীতে কারো কোনো উপকার করবার অধিকার ও সামর্থ্য নেই। থাকতে পারেও না। সুতরাং নিশ্চিত জানবেন, স্বেচ্ছাচারীরা পরস্পরের সখা, আর আল্লাহ্র প্রতি সমর্পিতদের সখা হচ্ছেন আল্লাহ্ স্বয়ং।

'শরীআ'তিন' অর্থ শরিয়ত, বিশেষ ধর্মীয় বিধান, নিজের ও অন্যদের জীবনে যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় নবীগণকে। 'মিনাল আমরি' অর্থ বিধান, বা বিধিনিষেধ। আর এখানকার 'সুতরাং, তুমি তার অনুসরণ করো, অজ্ঞদের

খেয়ালখুশীর অনুসরণ কোরো না' নির্দেশটি রসুল.কে লক্ষ্য করে দেওয়া হলেও এর উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত। কেননা আল্লাহ্র বিধিবিধানের অনুসরণ না করা এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— হে আমার রসুল! আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে যারা অজ্ঞ, সেই সকল প্রবৃত্তিপূজারীদের অনুসরণ যেনো আপনার উম্মত না করে। আবার 'অজ্ঞ' বলে এখানে আল্লাহ্র কিতাবের জ্ঞানবিবর্জিত দার্শনিকদের কথাও বলা হয়ে থাকতে পারে। অথবা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী কুরায়েশ গোত্রপতিদেরকে এখানে 'অজ্ঞ' বলা হয়ে থাকতে পারে। কেননা তারাই খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতো এবং রসুল স.কে আহবান জানাতো তাদের পৌত্তলিক পিতৃপুরুষদের অপবিত্র ধর্মমতের দিকে। কিংবা এরকমও হতে পারে যে, এখানে 'অজ্ঞ' বলে বোঝানো হয়েছে ওই সকল ইহুদী বিদ্বানকে যারা আল্লাহ্র কিতাব তওরাতের জ্ঞান রাখা সত্ত্বেও ধর্মীয় রীতিনীতির বিকৃত ব্যাখ্যা করতো। অর্থাৎ তারা ছিলো পণ্ডিতমূর্খ, অজ্ঞদের চেয়েও অধিক মন্দ।

'জালেমরা একে অপরের বন্ধু' অর্থ সমমতাদর্শী বলেই স্বেচ্ছাচারীরা নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব বজায় রাখে। একজোট হয়ে বিরোধিতা করে শুভ ও সত্য ধর্মাদর্শের । আর 'আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের বন্ধু' অর্থ হে আমার রসুল! আল্লাহ্ যেহেতু আল্লাহ্ভীরুদের বন্ধু, তাই আপনিও তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখুন। নিশ্চয় জানবেন স্বেচ্ছাচারীদের বন্ধুত্ব এবং আল্লাহ্অন্তপ্রাণগণের বন্ধু কখনো একত্রিত হতে পারে না। আর আল্লাহ্দ্রোহীরাও কখনো ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্প্রেমিকগণের ।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'এই কোরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত'। একথার অর্থ— মহাগ্রন্থ কোরআন মহামানবতার জন্য জ্ঞানসিন্ধু এবং সত্যপথপ্রাপ্তির মাধ্যম এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথের দিশারী ও অফুরন্ত অনুগ্রহ আহরণের উপায়।

এখানে 'হাজা' (এটা) অর্থ এই কোরআন, অথবা এই শরিয়ত। 'বাসায়িরু' অর্থ সত্যদৃষ্টি লাভ করার মাধ্যম, বা সুস্পষ্ট দলিল। 'লিন্নাস' অর্থ মানবজাতির জন্য। কথাটির মাধ্যমে এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয় যে, কোরআনে রয়েছে ইহকাল পরকাল

উভয় জগতের কল্যাণ। 'হুদাঁও ওয়া রহমাহ্' অর্থ পথনির্দেশ ও রহমত। আর 'ক্বওমিঁই ইউক্বিনূন' অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

এরপরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে এদেরকে তাদের সমান গণ্য করবো, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে? তাদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ'। একথার অর্থ— সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা ভেবেছে কী? সত্য ও মিথ্যা কি সমতুল? যারা বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মপরায়ণ, তারা কি জীবনে ও মৃত্যুতে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও পাপিষ্ঠদের মতো শুভপরিণতিহীন হতে পারে? কখনোই নয়। হায়, দুর্বৃত্তদের মনোভাব ও সিদ্ধান্ত কতোইনা অজ্ঞজনোচিত ও অশুভ।

এখানকার 'আম্ হাসিবা' এর 'আম' 'মুনকাতিয়া' বা বিয়োজক এবং 'আম' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'বাল' (বরং) অর্থে। এখানকার প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও পরিহাসব্যঞ্জক। আর এখানকার 'ইজ্বতারহূ' অর্থ যারা দুষ্কৃতিকারী।

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কার ওই সকল দুষ্কর্মপরায়ণ মূর্তিপূজকদেরকে লক্ষ্য করে, যারা মুসলমানদের কাছে গর্ব করে বলতো, তোমাদের কথা মতো যদি মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান, মহাবিচার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েই যায়, তবে দেখো, সেখানেও আমরা তোমাদের চেয়ে ভালো থাকবো, যেমন এখন আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক বিত্তাধিকারী ও প্রতাপশালী। তাদের এমতো অপবচনকেই প্রশ্নাকারে ও পরিহাসচ্ছলে খণ্ডন করা হয়েছে এখানে।

'সাআ মা ইয়াহ্কুমূন' অর্থ তাদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ। অর্থাৎ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীকে সমমর্যাদাসম্পন্ন ভাববার ধারণাটি কতোইনা অসত্য।

মাসরুক বলেছেন, একবার মক্কার এক লোক আমাকে একটি বাড়ির সামনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো, দেখুন এটাই হচ্ছে আপনার ভ্রাতা মহাত্মা তামীমদারীর বাসভবন। তিনি একবার সারারাত ধরে রুকু সেজদা করেছিলেন এবং বার বার পাঠ করেছিলেন 'দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে এদেরকে তাদের সমান মনে করবো, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে? তাদের সিদ্ধান্ত কতো মন্দ'।

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ২২, ২৩

❑ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং যাহাতে প্রত্যক ব্যক্তিকে তাহার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যাইতে পারে আর তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

❑ তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ্ বানাইয়া লইয়াছে? আল্লাহ্ জানিয়া শুনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাহাকে পথনির্দেশ করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছেন এজন্য যে, এ সকল কিছু দেখে মানুষ যেনো মুগ্ধ হয়। চিন্তাভাবনা করে এবং বুঝতে পারে, এই বিশাল সৃষ্টির সৃজয়িতা এক ও অতুলনীয়রূপে পরাক্রমশালী। এভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনার সঠিক প্রয়োগ করে অবলম্বন করে বিশ্বাসের পথ এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডকে করে তোলে শুভ ও পুণ্যকর্মময়। এই উদ্দেশ্যেই এই মহাসৃষ্টিকে বানানো হয়েছে তাঁর সত্তা-গুণবত্তা ও কার্যকলাপের নিদর্শন বা প্রমাণ। তারপর একদিন তিনি এই হিসাবও অবশ্যই গ্রহণ করবেন যে, কে তাঁর উদ্দেশ্য সফল করলো এবং কে করলো না। তখন প্রত্যেকের কৃতকর্মের যথাযথ ফলাফলও তিনি প্রদান করবেন। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে দিবেন তাদের যথাপ্রাপ্য— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার। এ ব্যাপারে তাদের উপরে কোনোপ্রকার জুলুম করা হবে না। পুণ্য ও পাপ কম-বেশী করা হবে না এতটুকুও। অর্থাৎ মানুষের পুণ্য ও পাপের যথাপ্রতিফল ইহকালে যদি না-ও হয়, তবে তা পরকালে দেওয়া হবেই। আকাশ-পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে একারণেই। উল্লেখ্য আল্লাহ্র কোনো কাজই জুলুম নয়। কেননা সকলে ও সকলকিছুই

তাঁর অধিকারায়ত্ব। তাই পুণ্যকর্মশীলদেরকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করা যেমন তাঁর জন্য জুলুম নয়, তেমনি জুলুম নয় পাপীদেরকে পাপের অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা। কিন্তু তাঁর বান্দারা এরকম করলে তা হবে জুলুম। এদিক থেকে চিন্তা করেই এখানে বলা হয়েছে— তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সকল দিক থেকে জুলুমের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন।

পরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'তুমি লক্ষ্য করেছো তাকে; যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ্ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, প্রকাশ্যত প্রতিমাপূজা করলেও ওই সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের প্রবৃত্তিজাত কামনাবাসনার উপাসক। অর্থাৎ তারা আসলে আত্ম-পূজক। আল্লাহ্তায়ালা তাই তাদেরকে জ্ঞাতসারেই বিভ্রান্ত থাকতে দিয়েছেন। তাদের শ্রুতি দৃষ্টি ও হৃদয়কে করে দিয়েছেন আড়ষ্ট ও অবরুদ্ধ। সুতরাং তাদেরকে পথ দেখাবার সাধ্য কারো নেই। এরপরেও কি মানুষ আল্লাহ্র অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায়কে মান্য করবে না? গ্রহণ করবে না তাঁর পথনির্দেশনাকে?

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যাব্যপদেশে হজরত ইবনে আব্বাস, হাসান ও কাতাদা বলেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের প্রবৃত্তির কামনা-লালসা এবং অপবিবেচনাকেই তাদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। তাই উপাস্য নির্ধারণ করে তারা নিজেরাই। খেয়ালখুশীমতো দেব-দেবীদেরকে কল্পনা করে বিভিন্ন শক্তির আধাররূপে। একারণেই প্রকৃত উপাস্য এক আল্লাহ্র উপরে তাদের বিশ্বাস নেই। নেই তাঁর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের অপপ্রবৃত্তিই তাদের উপাস্য। আর তারা যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবেই উপাসনা করে চলে তার।

ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজিরের বর্ণনায় এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের সূত্রে বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, মক্কার পৌত্তলিকেরা পাথর ও সোনারূপার পূজা করতো। আবার আগের চেয়ে ভালো পাথর পেয়ে গেলে ওই পাথরের মূর্তি নির্মাণ করে তার পূজা শুরু করতো, পূর্বের পাষাণমূর্তিটি দিতো ফেলে। তাদের এমতো অপআচরণের প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

শা'বী বলেছেন, 'হাওয়া' অর্থ গড়িয়ে পড়া, পতিত হওয়া। খেয়াল-খুশী বা কামনা-বাসনাও মানুষকে দোজখের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সেকারণেই কামনা-বাসনাকে বলা হয় 'হাওয়া'। 'আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে বিভ্রান্ত করেছেন' অর্থ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাই তার স্বভাবগত ভ্রষ্টতার কথা তার অজানা নয়। অথবা সে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য বলেই আল্লাহ্ তাকে পথভ্রষ্ট করে রেখেছেন। আর কে বিভ্রান্ত হবে এবং কে হবে না, তা তো তিনি জানেনই। তিনি যে সর্বজ্ঞানধর। কিংবা তার সৃষ্টির আগে থেকেই তাঁর একথা জানা আছে যে, সে পথভ্রষ্ট হবেই। তাই তার বিভ্রান্তি তাঁর জ্ঞানবহির্ভূত বিষয় নয়। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কারো বা কোনোকিছুর অস্তিত্ব থাকা তো সম্ভবই নয়। তাঁর জ্ঞান যে আনুরূপ্যবিহীনরূপে সর্বত্রগামী।

হজরত আবু আবদুল্লাহ্ একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। লোকেরা তাঁকে দেখতে গেলো। দেখলো, তিনি কাঁদছেন। তারা জিজ্ঞেস করলো, হে রসুল- সহচর! আপনি কাঁদছেন কেনো? রসুল স. তো আজ্ঞা করেছেন, মূল বাক্য গ্রহণ করো এবং তার উপরে অবিচল থাকো। তারপর মৃত্যুর মাধ্যমে মিলিত হয়ো আমার সঙ্গে। হজরত আবু আবদুল্লাহ্ বললেন, তাতো আমি জানিই। কিন্তু আমি রসুল স.কে একথাও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তাঁর আনুরূপ্যবিহীন দক্ষিণ হস্তের ও বাম হস্তের মুঠিতে আত্মাগুলোকে আবদ্ধ করে রাখেন এবং বলেন, এগুলো জান্নাতী এবং এগুলো জাহান্নামী। আর আমি সর্বময় অভিপ্রায়ধারী। একথা মনে পড়ছে বলেই আমি কাঁদছি। কেননা আমি তো জানি না আমি তাঁর কোন মুষ্টিতে আবদ্ধ।

'তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ' অর্থ আল্লাহ্ তাকে করে রেখেছেন সত্যশ্রবণ, সত্যদর্শন ও সত্য-উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত। আর এখানকার 'অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে পথনির্দেশ করবে' প্রশ্নটি হচ্ছে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তাকে পথ দেখাবার সাধ্য কারো নেই।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা বলতো, রাত ও দিনই আমাদেরকে ধ্বংস করেছে। তাদের এমতো অপমন্তব্যের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী আয়াত। বলা হয়েছে—

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ২৪, ২৫, ২৬

❑ উহারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি আর কাল-ই আমাদিগকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এই ব্যাপারে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

❑ উহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন উহাদের কোন যুক্তি থাকে না কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।

❑ বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদিগকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসে একত্র করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, পৃথিবীর জীবনই হচ্ছে জীবন। এর পরে আর কিছুই নেই। সুতরাং আমাদের জীবন ও মরণ সম্পূর্ণতই পৃথিবীসম্পৃক্ত। আর আমাদের এই মহামূল্যবান জীবনকে দিবা-রাত্রির আবর্তনই ক্ষয় করে ফেলে। কিন্তু হে আমার রসুল! আপনি নিশ্চয় একথা বুঝতে পারেন যে, জীবন-মৃত্যুর রহস্য ও মহাজীবনের তত্ত্ব সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ। তাদের অভিমত তো সম্পূর্ণতই তাদেরই স্বকপোলকল্পিত।

এখানে 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন' অর্থ পার্থিবতাই সবকিছু। এরপরে আর কিছুই নেই। 'আমরা মরি ও বাঁচি' অর্থ আমরা কখনো মৃত্যু বরণ করি, আবার কখনো আমাদের সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করে। এভাবে পৃথিবীর এই মরা বাঁচাই আমাদের সবকিছু। পরকালের ধারণা কেবলই কল্পনা। বাক্যটির উদ্দেশ্য এরকম নয় যে, আমাদের মৃত্যুর পর আবার আমরা জীবন ফিরে পাব। কেননা এখানে 'ওয়াও' (ও) এসেছে কেবল সংযোজক হিসেবে, অনুবর্তনের জন্য আসেনি। জুজায এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ এখানে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা একথাই বলতে চেয়েছে যে, পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমাদের মরা-বাঁচা সবকিছুরই শেষ এখানেই।

'ওয়ামা ইউহ্লিকুনা ইল্লাদ্ দাহ্রু' অর্থ আর কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। অর্থাৎ প্রবহমান সময়ের আঘাতেই মানুষ ক্ষয় হতে হতে ধ্বংস হয়ে যায়। এখানে 'দাহ্র' অর্থ কাল। পৃথিবীর মোট বয়সকেও বলা হয় 'দাহ্র'। আর 'জামানা' অর্থ সকল জামানা, সকল সময়, তা সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত, যা-ই হোক না কেনো।

'বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই' অর্থ তাদের জ্ঞানার্জনের কোনো পথই খোলা নেই। উল্লেখ্য, জ্ঞান অর্জনের পন্থা দু'টি— ১. স্বভাবজ জ্ঞান, যা লাভ হয় চিন্তা-চেতনা ব্যতিরেকেই এবং ২. চিন্তাজাত জ্ঞান, যার ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব প্রমাণ। সময় যে সবকিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়— এমতো জ্ঞান বর্ণিত পন্থা দু'টোর একটিতেও পড়ে না। তাই এখানে বলা হয়েছে— এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। অর্থাৎ জীবন অর্থ মহাজীবন, মৃত্যু তার চলার পথের একটি তোরণ মাত্র। এই জ্ঞান লাভ করেছেন কেবল নবী-রসুলগণ এবং তাঁদের বিশ্বাসী অনুগামীগণ। যারা এরকম নন, তারা যে সত্যি সত্যিই অজ্ঞ, সে ব্যাপারে সন্দেহ মাত্র নেই।

'ইন্ হুম ইল্লা ইয়াজুন্নূন' অর্থ তারা তো কেবল মন গড়া কথা বলে। অর্থাৎ তারা কোনো জ্ঞান ও প্রমাণ ছাড়াই সময়কে সর্বশক্তিধর বলে বিশ্বাস করে। সময়ের স্রষ্টার কথা ভুলেও উচ্চারণ করে না। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, তোমরা কালকে মন্দ বোলো না। কেননা আল্লাহ্ই কাল (মহাকালের নিয়ন্ত্রয়িতা)। বাগবীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তানেরা! তোমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে 'হায়রে যুগ'! এরূপ বোলো না। কেননা আমিই সময়। আমিই আবর্তন ঘটাই দিবস-নিশিথের। আবার আমিই একসময় এমতো আবর্তনকে রহিত করবো। হাদিসটির প্রকৃত অর্থ এরকম— মানুষ সাধারণতঃ বলে জামানা খারাপ। সময়ই যতো সব বিপদ-আপদ টেনে আনে। অথচ তারা ভুলে যায় যে, আল্লাহ্ই সুখ ও দুঃখের একমাত্র নির্ধারয়িতা। সুতরাং সময়কে মন্দ বলার অর্থ আল্লাহ্কে মন্দ বলা। অথচ তিনি সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে সতত মুক্ত ও চিরপবিত্র। কোনো কোনো আলেম আবার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আল্লাহ্ই সময়প্রবাহের একমাত্র সৃজয়িতা। সুতরাং সময়কে মন্দ বলা অংশীবাদিতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এরকম অপমন্তব্য থেকে সতর্ক হও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন তাদের কোনো যুক্তি থাকে না কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত করো (২৫)। বলো, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (২৬)। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যখন আপনার স্বগোত্রীয় পৌত্তলিকদের সামনে আমার বাণী আবৃত্তি করে শোনান, তখন তাদের বলার এবং করার আর কিছুই থাকে না। তবুও তারা স্বভাবগত বক্রতা হেতু এই বলে পাশ কাটাতে চায় যে, ঠিক আছে, তুমি ও তোমার অনুচরেরা সত্যবাদী যদি হয়েই থাকো, তবে আমাদের পৌত্তলিক পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করে দেখাও তো দেখি। আমরা তাদের মুখেই শুনি, তোমরা সত্যবাদী, না প্রতারক। হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি তাদের এমতো

কুবচনের জবাবে বলে দিন, জীবন ও মৃত্যু সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র অভিপ্রায়নির্ভর। তিনিই তো তাঁর ইচ্ছামতো জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের বলার কিছু নেই। তবে আমরা একথা অবশ্যই বলবো যে, আল্লাহ্কে অস্বীকার করার মন্দ প্রতিফল একদিন পেতেই হবে। মহাবিচারের দিবসে তিনি সকলকে একত্রিত করবেনই। তারপর সকলকে দিবেন যথোপযুক্ত প্রতিফল— বিশ্বাসীদেরকে বেহেশত এবং দোজখ অবিশ্বাসীদেরকে। আমরা সেই দিবসের সফলতার জন্যই এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে অজ্ঞ, অসতর্ক ও প্রত্যাখ্যানপ্রবণ।

এখানে 'আয়াতুনা বাইয়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট আয়াত। 'হুজজ্বাতাহুম' অর্থ এমন যুক্তি, যা প্রামাণ্য। 'ইউহ্ঈ' অর্থ জীবন দান করেন। 'ইউমীতুকুম' অর্থ তোমাদেরকে মৃত্যু ঘটান। 'ইয়াজ্মাউকুম' অর্থ একত্র করবেন। আর 'ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ' অর্থ কিয়ামত দিবসে। এখানে 'ইলা' শব্দটি অতিরিক্ত। অথবা এখানে 'ইলা' ব্যবহৃত হয়েছে 'লাম' অর্থে। এভাবে কথাটির অর্থ 'কিয়ামতের দিকে' না হয়ে হয়েছে 'কিয়ামত দিবসে'।

'লা রইবা ফীহ্' অর্থ যাতে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচার অবশ্যই সংঘটিত হবে। কেননা আল্লাহ্র অঙ্গীকার অবশ্যবাস্তবায়নব্য। পুনরুত্থান দিবসে তিনি সকলকে পুনর্জীবিত করবেনই। কেননা সকল বিষয়ে তিনি সর্বশক্তিধর। আর প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি অধিকতর সহজও। তাছাড়া পৃথিবীতে পাপ-পুণ্যের সামগ্রিক বিচার হয় না। তাই বুদ্ধি-বিবেচনার দাবিও এই যে, মানুষ তাদের কৃতকর্মের চূড়ান্ত প্রতিফল পাক। আর তা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব কেবল পরকালে। পৃথিবী হচ্ছে কর্মক্ষেত্র। আর পরকাল হচ্ছে ফলাফল লাভের স্থান। ফলাফল তো দেওয়া হয় কর্ম সমাপনের পরেই।

'ওয়ালা কিন্না আকছারান্ নাসি লা ইয়া'লামূন' অর্থ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র শক্তিমত্তা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান রাখে না। তাই তারা জীবন যাপন করে অসতর্কভাবে, উদাসীনতাকে আশ্রয় করে।

সূরা জ্বাছিয়া ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই, যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত,

❑ এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার 'আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হইবে ও বলা হইবে, 'আজ তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

❑ 'এই আমার লিপি, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।'

❑ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে। ইহাই মহাসাফল্য।

❑ পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

❑ যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি তো সত্য, এবং কিয়ামত— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তখন তোমরা বলিয়া থাক, 'আমরা জানি না কিয়ামত কী; আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নহি।'

❑ উহাদের মন্দ কর্মগুলি উহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

❑ আর বলা হইবে, 'আজ আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাতকারকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। তোমাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

❑ 'ইহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং সেই দিন উহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

❑ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগতসমূহের প্রতিপালক।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌র। যেদিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর হে আমার রসুল! আপনি দেখবেন, মহাবিচারের দিবসে সকলেই ভয়ে শংকায় নতজানু হয়ে থাকবে। সকলের সামনে উন্মোচন করা হবে তাদের আমলনামা। বলা হবে, তোমাদের আপনাপন কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে আজ। দ্যাখো, এই হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের বিবরণবিশিষ্ট পুস্তিকা। এই পুস্তিকা এখন তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে, যদি তোমরা অপরাধী হও। আমি আমার আমল লেখক ফেরেশতাদের মাধ্যমে তোমাদের কৃতকর্মসমূহের কথা পৃথিবীতেই লিপিবদ্ধ করিয়ে রেখেছিলাম।

'সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত' অর্থ মিথ্যাশ্রয়ীদেরকে সেদিন প্রেরণ করা হবে দোজখে। 'জ্বাছিয়াতান' অর্থ ভয়ে নতজানু হয়ে থাকবে। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন বাগবী। অর্থাৎ বিচার চলাকালে অভিযুক্তরা যেমন অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকবে, তেমনি তারা নতজানু হয়ে অপেক্ষা করবে শেষ সিদ্ধান্তের। হজরত আলী বলেছেন, তখন আমি হবো প্রথম ব্যক্তি, যে নতজানু হয়ে আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করবে। সুরা হজের যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

হজরত সালমান ফারসী বলেছেন, মহাবিচারের দিবসের একটি মুহূর্ত হবে দশবৎসরের সময়পরিসরের সমান। সকলেই তখন নতজানু হয়ে থাকবে। এমনকি হজরত ইব্রাহিম পর্যন্ত 'হায় আমার কী হবে' বলে চিৎকার করতে থাকবেন। আরো বলবেন, হে আমার প্রভুপালক! আমি কেবল আমার আত্মার মুক্তির জন্য নিবেদন জানাই।

কোনো কোনো বিদ্বান এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'কুল্লু উম্মাতিন জ্বাছিয়াতান' (প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু) কথাটির 'জ্বাছিয়াতান' অর্থ সমবেত হবে। অর্থাৎ সকলেই তখন বিচারস্থলে সমবেত হবে। এরকম অর্থ করা হলে বুঝতে হবে, শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'জ্বাছাওয়াহ্' থেকে। আর

'জ্বাছাওয়াহ্' অর্থ দলবদ্ধ হওয়া। জাযারী তাঁর নেহায়া গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে লোকেরা তাদের আপনাপন নবীর পশ্চাতে দলবদ্ধ হবে। 'জাওয়াহিদুজ্জুহুদ' গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ও আবদ ইবনে ছানিয়াহ্ সুত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সেই দৃশ্য আমার চোখে ভাসছে, যখন তোমরা সমবেত হবে জাহান্নামের পশ্চাতের 'করম' নামক এক উচ্চ স্থানে। এরপরে সুফিয়ান পাঠ করলেন এই আয়াত। শায়েখ ইবনে হাজার লিখেছেন, 'করম' অর্থ উচ্চ স্থান, যেখানে রসুল স. এর উম্মতগণ সমবেত হবে।

'ইলা কিতাবিহা' অর্থ আমলনামার দিকে। অর্থাৎ সকলকে তখন হিসাবের প্রতি মনোযোগী করে তোলা হবে। হজরত আনাস থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সকলের আমলনামা জমা করা হয় আরশের নিচে। যখন হিসাব গ্রহণের জন্য সকলকে বিচারস্থলে দাঁড় করানো হবে, তখন হঠাৎ এক দমকা হাওয়া এসে আমলনামাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে সকলের ডান অথবা বাম হাতে এনে ফেলবে। আমলনামাগুলোর প্রথমে লেখা থাকবে 'আজ তুমিই তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট'। কাজেই পাঠ কোরো তোমার পুস্তিকা।

'ইন্না কুন্না নাসতানসিখু' অর্থ তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম অর্থাৎ আমি এসকল কিছু পৃথিবীতেই লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম আমার আমল লেখক ফেরেশতাদের দ্বারা। কোনো কোনো আলেম 'নাস্তানসিখু' কথাটির অর্থ করেছেন আমলের বিবরণগুলোর অনুলিপি করিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, ওই ফেরেশতারা মানুষের সকলকিছুই উপস্থিত করে আল্লাহ্র সমক্ষে। তারপর যেগুলো শাস্তি অথবা পুরস্কারের যোগ্য, সেগুলো ছাড়া অন্যগুলোকে মুছে ফেলা হয়। অর্থাৎ যেসকল বিষয়ে পাপ-পুণ্য কোনোটাই নেই, সে সকল বিষয়কে আমলনামা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দাখিল করবেন তাঁর রহমতে। এটাই মহাসাফল্য (৩০)। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়' (৩১)। একথার অর্থ— বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ যারা, তাদেরকে আল্লাহ্ প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। আর এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট সাফল্য। পক্ষান্তরে যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের কাছে আমার বার্তা তো পৌঁছেই গিয়েছিলো। কিন্তু তখন তো তোমাদের শুভবোধ জাগ্রত হয়নি। তোমরা ছিলে স্বভাবগতভাবে সত্যপ্রত্যাখ্যানপ্রবণ। তাই ঔদ্ধত্যভরে তোমরা তখন সত্যের আহ্বানকে দিয়েছিলে ফিরিয়ে। সে মহাঅপরাধের সাজা আজ তোমাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

এখানে 'দাখিল করবেন স্বীয় রহমতে' অর্থ প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। আর 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি'— এই প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়— তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ তো পাঠ করা হয়েছিলোই। তৎসত্ত্বেও তো তোমরা তা বিশ্বাস করোনি।

'আর তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়' একথার অর্থ তোমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো সত্যপ্রত্যাখ্যান ও অপরাধপ্রবণতা। সারকথা হলো, আল্লাহ্পাক তাদেরকে শাস্তিকবলিত করবেন। যেহেতু অপরাধপ্রবণতা ছিলো তাদের অভ্যাসগত।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— 'যখন বলা হয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং কিয়ামত, এতে কোনো সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাকো, আমরা জানি না কিয়ামত কী; আমরা মনে করি এটা একটা ধারণামাত্র এবং আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নই'। একথার অর্থ— আর যখন তোমাদেরকে বলা হতো আল্লাহ্র অঙ্গীকার সত্য, সুতরাং কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ মাত্রই নেই, তখন তোমরা বিষয়টিকে আমলেই আনতে না। বলতে কিয়ামত আবার কী জিনিস? আমরা তো মনে করি, বিষয়টি একটি কল্পনা মাত্র। সুতরাং কী করে এরকম কল্পনাকে বাস্তব বলে মানি?

এখানে ‘ওয়া’দুন’ অর্থ প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কিয়ামতের অঙ্গীকার। ‘ওয়া’দুন’ শব্দটি ক্রিয়ামূল। এভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় অঙ্গীকৃত। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিশ্রুত। ‘লা রইবা ফীহা’ অর্থ এতে কোনো সন্দেহ নেই। ‘মাস্ সাআ’ত’ অর্থ কিয়ামতের বিষয়ে। আর ‘ইন্নাজুন্নু ইল্লা জন্না’ অর্থ আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র। এখানে ‘জন্নান’ শব্দে তানভীন যুক্ত করা হয়েছে তুচ্ছার্থে। অর্থাৎ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কিয়ামতের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতো। বলতো, কিয়ামত আবার কী! এই ‘জন্’ শব্দটি আবার কখনো কখনো জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন ‘আল্‌খশিয়ীনাল্ লাজীনা ইয়াজুন্নুনা আন্নাহুম মুলাক্বু রব্বাহুম’ (বিনয়ীরা একথা মনে রাখে যে, তাদেরকে তাদের প্রভুপালকের কাছে ফিরে যেতে হবেই)। আবার কখনো কখনো এর অর্থ হয় ‘সন্দেহ’। যেমন এখানে হয়েছে।

এরপরের আয়াতত্রয়ে বলা হয়েছে— ‘তাদের মন্দ কর্মগুলি তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে (৩৩)। আর বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হবো যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাতকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না (৩৪)। এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে, পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারণা করেছিলো। সুতরাং সেই দিন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হবে না’ (৩৫)। একথার অর্থ— আর মহাবিচারের দিবসে তাদের যাবতীয় কুকর্মের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে শাস্তি সম্পর্কে তারা ঠাট্টা-তামাশা করতো সেই শাস্তিই তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। তখন আমি তাদেরকে বলবো, পৃথিবীতে তোমরা এই মহাবিচারদিবসের কথা শোনা সত্ত্বেও তা বিশ্বাস করোনি, তাই আমিও আজ তোমাদের মুক্তির প্রসঙ্গ মনে রাখবো না। আরো শোনো, এখন থেকে তোমাদের আবাসস্থলরূপে নির্ধারণ করা হলো চিরকালীন দোজখ এবং সেখানে তোমাদেরকে

সাহায্য করবে, এমন কেউই নেই। স্মরণে রেখো, তোমাদের এমতো সহায়হীন হওয়ার কারণ এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলে। সুতরাং তোমাদেরকে আর কখনো দোজখের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে না এবং আল্লাহ্‌র পরিতোষ প্রার্থনার কোনো সুযোগও তোমাদেরকে দেওয়া হবে না।

এখানে ‘আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হবো’ অর্থ আজ আমি তোমাদেরকে শাস্তিকবলিত করে ছেড়ে দেবো। আল্লাহ্‌পাক সর্বজ্ঞ। তাঁর ভুল হওয়া সম্ভব নয়। তাই এখানে ভুলের অর্থ করা হয়েছে— ‘পরিত্যাগ বা প্রত্যাখ্যান’। ‘তোমরা এই সাক্ষাতকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে’ অর্থ তোমরা আজকের এই মহাবিচারের জন্য কোনো প্রকার পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করোনি। আর ‘তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না’ অর্থ এমন সাহায্যকারী তোমরা তখন পাবে না, যারা তোমাদেরকে দোজখ থেকে মুক্ত করতে পারে।

‘আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে’ অর্থ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করেই অবজ্ঞাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আর এখানে ‘ওয়া লা হুম ইউস্‌তা’তাবূন’ অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হবে না। এখানে ‘উতবা’ অর্থ সন্তুষ্টি, পরিতুষ্টি। ‘কামুস’ অভিধানে এরকম বলা হয়েছে। আর ‘ইসতা’তাব’ অর্থ পরিতুষ্টি প্রার্থনা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তাদেরকে তখন এরকম বলা হবে না যে, তোমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করে আল্লাহ্‌র পরিতুষ্টি চেয়ে নাও। কেননা তখন তো ক্ষমাপ্রদর্শনের সময় নয়। তখন কেবল প্রতিফল প্রদানের সময়।

‘নেহায়া’ প্রণেতা লিখেছেন ‘উত্‌বা’ অর্থ পাপ ও অশ্লীলতা থেকে ফিরে আসা, তওবা করা। এমতো অর্থের ভিত্তিতে বাগবী কথাটির মর্মার্থ করেছেন— তাদেরকে তখন এরকম বলা হবে না যে, তোমরা এখন আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে ফিরে এসো। আর এখানে ‘ইয়াসতা’তাবূন’ এর পূর্বে ‘হুম’ (তাদের) সর্বনামটি বসানো হয়েছে বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অসন্তোষ দূর করার জন্য তখন তাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিকার চাওয়া হবে না। উল্লেখ্য, বিশ্বাসীগণের অবস্থা হবে এর বিপরীত।

শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগত সমূহের প্রতিপালক (৩৬)। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’(৩৭)।

এখানে ‘ফালিল্লাহিল্ হাম্‌দ’ অর্থ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। যিনি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন। তাদেরকে দান করবেন জান্নাত ও জাহান্নাম। আর আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও জগতসমূহের প্রভুপালক বলে

এখানে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, এই মহাসৃষ্টি টিকে রয়েছে কেবল তাঁরই দয়ার্দ্র প্রতিপালনে। কথাটির মধ্যে তাঁর অপার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে পুরোপুরি। কেননা সর্বশক্তিধর ও সর্বময় কর্তৃত্ব যার নেই, তিনি কখনো মহাপ্রভুপালয়িতা হতে পারেন না। সেকারণেই পরক্ষণে বলা হয়েছে তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী গৌরব-গরিমার কথা এবং শেষে বলা হয়েছে— 'তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়'। অর্থাৎ তিনি এমন আনুরূপ্যবিহীনরূপে পরাক্রমময় যে, তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তারের অধিকার ও সামর্থ্য কারো নেই এবং তিনি এমন প্রজ্ঞাময় যে, তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হয় এমন বিজ্ঞতামণ্ডিত, যার সমতুল হবার যোগ্যতা কারো নেই।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, শ্রেষ্ঠত্ব আমার উত্তরীয় এবং গৌরব-গরিমা আমার পরিধেয়। এ দু'টোর কোনো একটিকে যে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করবে, আমি তাকে দোজখে প্রবেশ করাবো।

সুরা জ্বাছিয়ার তাফসীর শেষ হলো আজ ২২ শে রবিউস্সানি, হিজরী ১২০৮ হিজরী সনে। আল্হাম্দুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন ওয়া সাল্লাল্লহু আলাইহি আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মদিঁউ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজ্বমাঈন। আমিন।

ষষ্ঠবিংশতিতম পারা

সূরা আহ্ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণ এই সূরায় রয়েছে ৪টি রুকু এবং ৩৫টি আয়াত।

সূরা আহ্ক্বাফ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮

❑ হা-মীম।
❑ এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ;

তাফসীরে মাযহারী/৫৬১
❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু কাফিররা, উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।
❑ বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও অথবা
আকাশমণ্ডলীতে উহাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন
কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকিলে তাহা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'
❑ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাকে সাড়া দিবে না? এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।
❑ যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হইবে তখন ঐগুলি হইবে উহাদের শত্রু এবং ঐগুলি উহাদের ইবাদত অস্বীকার করিবে।
❑ যখন উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় এবং উহাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফিররা বলে, 'ইহা তো সুস্পষ্ট জাদু।'
❑ তবে কি উহারা বলে যে, 'সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে।' বল, 'যদি আমি ইহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি, তবে তোমরা তো আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

প্রথমোক্ত আয়াতত্রয়ের মর্মার্থ হচ্ছে—'হা-মীম'। এই মহাগ্রন্থ সেই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাধিকারী। যে আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি, সেই আমিই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছি যথাযথভাবে। আমার অভিপ্রায়ানুসারে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এগুলো স্থায়ী থাকবে। তারপর মহাপ্রলয়কালে ধ্বংস হয়ে যাবে আমার অভিপ্রায়ানুযায়ীই। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে এসব কথা বলে বিশ্বাসী জীবনকে বরণ করে নিতে বলা হয়। এই মর্মে সতর্ক করা হয় যে, বিশ্বাসী না হলে তারা হয়ে পড়বে আমার রোষ ও শাস্তিকবলিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সতর্ক হয় না। অবলীলায় হয়ে যায় সত্যবিমুখ।

এখানে 'তান্‌যীল' অর্থ অবতীর্ণ। আর 'আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু আমি সৃষ্টি করেছি যথাযথভাবে' অর্থ আকাশ-পৃথিবী ও এতদূভয়স্থিত সকল কিছুকে আমি উদ্দেশ্যহীনরূপে সৃষ্টি করিনি। বরং এগুলোকে আমি করেছি আমার সত্তা-নাম-গুণবত্তা ও কার্যকলাপের নিদর্শন। এই মহা সৃষ্টি নিরবচ্ছিন্নরূপে একথাই প্রকাশ করছে যে, এগুলোর স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেউ একজন রয়েছেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিধর ও মমতাপরবশ। সুতরাং মানুষ যেনো এসকল কিছু দেখে, বুঝে ও চিন্তা ভাবনা করে, তাঁকেই একমাত্র উপাস্য ও প্রভুপ্রতিপালক বলে মেনে নেয়। একথাও স্বীকার করে যে, এই পৃথিবী, এই আকাশ চিরদিন থাকবে না। একদিন অবশ্যই এগিয়ে আসবে মহাপ্রলয়, মহাপুনরুত্থান ও মহাবিচারের দিবস। সেদিন যথোপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হবে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে। জ্ঞান ও ন্যায়বিচার তো এরকমই সাক্ষ্য দেয়। দিতে থাকে।

তাফসীরে মাযহারী/৫৬২

'ওয়াল্ লাজীনা কাফারূ আ'ম্‌মা উনজিরূ' অর্থ তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এখানে 'আ'ম্‌মা' এর 'মা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ সতর্ক করা হয়েছে। অথবা এখানকার 'মা' হচ্ছে যোজক অব্যয়। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের শাস্তি, যা থেকে অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

মু'রিদূন' অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়। অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না যে, কিয়ামত দিবসের আগমন অসম্ভব কিছু নয়। বরং তা অপরিহার্য। কেননা কিয়ামত সংঘটিত না হলে মহাবিচার তো অনুষ্ঠিত হবে না। আর বিচার না হলে মানুষের পৃথিবীর কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত প্রতিফলও তো দেওয়া যাবে না। প্রতিষ্ঠিত হবে না ন্যায়। এসকল কিছুর চিন্তা তারা করতেই চায় না। উপরন্তু বিনা বিবেচনায়, বিনা প্রমাণে পূজা করতে থাকে পুতুলের। আর এভাবে হয়ে যায় শাস্তির উপযোগী।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাকে ডাকো, তাদের কথা ভেবে দেখেছো কী? এরা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কী? পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান থাকলে, তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি অংশীবাদীদেরকে বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরাই বলো, যে স্রষ্টা নয়, সে কি কখনো উপাস্য হতে পারে? তোমরা যে সকল পুতুলের পূজো করো, তারা কবে কোথায় কখন কী সৃষ্টি করেছে। পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টিতে তারা কি কখনো অংশগ্রহণ করেছিলো? না কোনো প্রকার সৃজনকর্মে তাদের অংশগ্রহণের কথা কল্পনা করা যায়? যা অপ্রান, তা কি কখনো মানুষের উপকার অথবা ক্ষতি করতে পারে? নিশ্চয় পারে না। আর তা-ই যদি না পারে, তবে তারা অন্যের উপাসনা গ্রহণের যোগ্যই বা হয় কী করে? অথচ তোমরা তাদেরই উপাসনা করে চলেছো বিনা বিচারে, বিনা প্রমাণে। কেনো? পূর্ববর্তী কোনো আসমানী কিতাব, অথবা যথাযথপরম্পরাসূত্রে তোমাদের পৌত্তলিকতার স্বপক্ষে কি তোমরা কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবে? যদি পারো, তবে দেখাও।

এখানে 'মা জা খলাকু' অর্থ কী সৃষ্টি করেছে? এখানকার 'মা' জিজ্ঞাসামূলক এবং 'জা' হচ্ছে যোজক এবং এখানে এটি ব্যবহৃত হয়েছে 'আল্‌লাজী (যা) অর্থে। অর্থাৎ কোন সে বস্তু, যা তারা সৃষ্টি করেছে? 'মিনাল আরদ্ব' অর্থ পৃথিবীতে। 'ফীস্ সামাওয়াত' অর্থ আকাশে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— পৃথিবী ও আকাশের কোনো সৃজনকর্মে তোমাদের ওই প্রতিমাগুলো অংশগ্রহণ করেছিলো কি? না এরকম করা তাদের পক্ষে সম্ভব? তাহলে বলো, কোন যুক্তিতে তোমরা তাদের পূজো অর্চনা করো? উল্লেখ্য, অংশীবাদীরা মনে করে পৃথিবীর ঘটনা-দুর্ঘটনা আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাবেই ঘটে থাকে। এ ধারণাটিকেও এখানে খণ্ডন করা হয়েছে আলোচ্য বক্তব্যটির মাধ্যমে।

'পূর্ববর্তী কোনো কিতাব' অর্থ পূর্বের কোনো আকাশীগ্রন্থ।'আছারতিম্ মিন্ ই'ল্‌ম' অর্থ পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান। রসুল স. এর উক্তিরূপে হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, 'আছারাতিন্' অর্থ লিপিবদ্ধকৃত জ্ঞান। মুজাহিদ ও ইকরামা শব্দটির অর্থ করেছেন— অনুলিপিকৃত বিবরণ। কাতাদা বলেছেন, এর অর্থ— বিশেষ। কালাবী বলেছেন— অবশিষ্টাংশ। 'কামুস' অভিধানে রয়েছে, 'আছারা' অর্থ কোনো কিছুর বাকী অংশ। আর, এখানে 'ই'লম' (জ্ঞান) অর্থ নবীগণের জ্ঞান, যা তাঁরা লাভ করেন প্রত্যাদেশবলে।

তাফসীরে মাযহারী/৫৬৩

'ইন্‌কুন্‌তুম সদিক্বীন' অর্থ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে মূর্তিপূজা করতে বলেছেন, তোমাদের এই দাবি যদি সত্য হয়, তবে তার প্রমাণ দেখাও।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয় (৫)। যখন কিয়ামতের দিনে মানুষকে একত্র করা হবে, তখন ওইগুলি হবে তাদের শত্রু এবং ওইগুলি তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে'(৬)। একথার অর্থ— ওই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ঠ আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন জড়প্রতিমার পূজা করে, যারা নিঃসাড়। প্রার্থনাকারীরা কিয়ামত

পর্যন্ত ডাকলেও তারা সাড়া দিতে পারবে না। বরং কেউ তাদেরকে ডাকে, কি না ডাকে, তা-ও তারা বুঝবার সামর্থ্য রাখে না। মহাবিচারের দিবসে ওই সকল জড়প্রতিমাই যখন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রাণপ্রাপ্ত হবে, তখন তারাও শত্রু হয়ে যাবে তাদের পূজারীদের। তাদের উপাসনাকেও করে বসবে অস্বীকার।

এখানে 'সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কেউ-ই নেই। 'এইগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়' অর্থ জড়প্রতিমাগুলি তাদের উপাসকদের প্রার্থনা-অপ্রার্থনা সম্পর্কে জানেই না। আর হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশতাদেরকে যে তারা আল্লাহ্র পুত্র-পুত্রী জ্ঞানে ডাকে, তাঁরাও তাদের প্রার্থনা সম্পর্কে জানেন না। কেননা তাঁরা পুণ্যবান। তাই সতত আল্লাহ্ অভিমুখী থাকাই তাদের কাজ। কেউ তাঁদের উপাসনা করবে, তা তো তাঁরা চিন্তাই করতে পারেন না। আর 'ওইগুলি হবে তাদের শত্রু এবং ওইগুলি তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে' অর্থ তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো, অথবা হজরত ঈসা, হজরত উযায়ের এবং ফেরেশতারা মহাবিচারের দিনে হয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধপক্ষ। বলবে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! আমরা এদের প্রতি অপরিতুষ্ট। এরা আসলে আমাদের উপাসনা করতো না। উপাসনা করতো তাদের অপপ্রবৃত্তিজাত কামনা বাসনার। এভাবে তাদের উপাস্যরা পৃথিবীতে যেমন তাদের কোনো কাজে আসে না, তেমনি কাজে আসবে না পরকালেও। বরং পরকালে তারা সরাসরি হবে তাদের ক্ষতির কারণ। সুতরাং অংশীবাদীদের চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত হতে পারে আর কে? কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে বক্তব্যার্থটি হবে এরকম— মহাবিচারের দিবসে মূর্তিপূজারীরাই তাদের অপকর্মের কথা অস্বীকার করে বসবে। বলবে, শপথ সেই শাশ্বত উপাস্যের, যিনি আমাদের একমাত্র প্রভুপালনকর্তা, আমরা কখনোই মূর্তিপূজক ছিলাম না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয়, এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফেরেরা
বলে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু (৭)। তবে কি তারা বলে যে, সে এটা উদ্ভাবন করেছে। বলো, যদি আমি এটা উদ্ভাবন করে থাকি, তবে তোমরা তো আল্লাহ্র শাস্তি থেকে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায়

লিপ্ত আছো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (৮)। একথার অর্থ— মক্কার মুশরিকদের কাছে যখন কোরআনের স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন তারা বলে, এতো দেখছি স্পষ্ট যাদু। আরো বলে, মোহাম্মদই এসকল বাণীর রচয়িতা। হে আমার রসুল! তাদের এমতো মিথ্যাবচনের জবাব দিন এভাবে— এরকম করলে আমি তো আল্লাহ্র রোষকবলিত হবো। হবো শাস্তির উপযুক্ত। সে শাস্তি থেকে তোমরা তো আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তাই তিনি নিশ্চয় শোনেন ও জানেন তোমরা তাঁর সম্পর্কে কী বলো। তিনিই তোমাদের ও আমার মধ্যে প্রকৃত সাক্ষী। আর তিনি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াপরবশও।

এখানে 'লিলহাক্বক্ব' অর্থ সত্যের জন্য, সত্যকে। অর্থাৎ কোরআনের আয়াত। 'কাফারূ' (কাফেরেরা) এর সঙ্গে শব্দটি উল্লেখ করায় এখানে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, কোরআনের আয়াত অভ্রান্ত। আর যারা একে অস্বীকার করে, তারা নিঃসন্দেহে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।'লাম্মা জ্বাআহুম হাজা সিহ্রুম মুবীন' অর্থ তারা বলে, এতো সুস্পষ্ট যাদু। অর্থাৎ কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা এরকম বলে দেয়। 'তবে কি তারা বলে যে, সে এটা উদ্ভাবন করেছে' বাক্যটি এখানে প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়জ্ঞাপক। 'তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছো, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত' অর্থ— আল্লাহ্ই জানেন কে সত্যবাদী— আমি, না তোমরা? 'সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট' অর্থ নিশ্চয় জেনো, তোমাদের মিথ্যাচারিতার জন্য তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। কেননা তিনি এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জানেন। আর 'তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' অর্থ তিনি মার্জনাশীল ও পরম দয়ার্দ্র বলেই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের এমতো গর্হিত অপরাধের জন্য তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান করেন না।

সূরা আহ্ক্বাফ ঃ আয়াত ৯, ১০

❑ বল, 'আমি কোন নূতন রাসূল নহি। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হইবে; আমি আমার প্রতি যাহা ওহী করা হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র'।

❑ বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি এই কুরআন আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর, অথচ বনী ইসরাঈলের একজন ইহার অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমাদের পরিণাম কি হইবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে একথাও বলুন যে, আমি তো নিজেকে প্রথম পয়গম্বর বলে দাবি করছি না। ইতোপূর্বেও তো অনেক পয়গম্বর এসেছিলেন। তারা যেমন সত্যাধিষ্ঠিত ছিলেন, আমিও তেমনই। তাদের মতো আমার দাবির স্বপক্ষেও রয়েছে অলৌকিক নিদর্শন। সুতরাং তোমরা আমাকে পয়গাম্বর বলে স্বীকার করবে না কেন? আল্লাহ্ই তোমাদের ও আমার মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত দাতা। আমাকে একথাও বলা হয়নি যে, আমাদের ব্যাপারে অবশেষে কী করা হবে। আমি তো কেবল অনুসরণ করি আমার প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশাবলীর । আর আমিতো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ভিন্ন অন্য কেউ নই।

'আমি কোনো নতুন রসুল নই'কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে, আমি একক কোনো পয়গম্বর নই যে, তোমাদের ইচ্ছা ও দাবিসমূহ পূর্ণ করে দিবো, যা আগের যুগের পয়গম্বগণ করতেন, বা করতে পারতেন। আর 'আমি জানিনা, আমার ও তোমাদের মধ্যে কী করা হবে' একথার অর্থ কোনো কোনো আলেম করেছেন এভাবে— আমি জানি না, মহাবিচারের দিনে তোমাদের সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হবে। উল্লেখ্য, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা খুবই খুশী হয়েছিলো। বলেছিলো, লাত ও উজ্জার শপথ! আল্লাহ্র কাছে আমাদের ও মোহাম্মদের মর্যাদা একই রকমের। এই বাণী যদি তার স্বরচিত না হতো, তবে আল্লাহ্ তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতা সম্পর্কে জানিয়ে দিতেন। তাদের এমতো অপকথনের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের অনবধানতা মার্জনা করেন, আপনার প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং আপনাকে চালিত করেন সরল পথে'। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! আপনার কল্যাণ হোক। আমরা তো জানলাম, আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করবেন। কিন্তু একথা তো জানতে পারলাম না যে, আমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হবে। তখন অবতীর্ণ হলো 'যাতে তিনি বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যার পাদদেশের রয়েছে জলবতী নদী। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে মোচন করেন তাদের পাপ। এটাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য'।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও ইকরামা বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির পূর্বে। পরে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে যখন তাঁর অগ্রপশ্চাতের সকল অনবধানতাকে মার্জনা করার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন এই আয়াতটি রহিত হয়ে যায়। আমার কাছে কিন্তু এই অভিমতটি সঠিক মনে হয় না। কেননা মক্কা-মদীনা উভয় স্থানে অবতীর্ণ আয়াতসমূহে বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা এবং অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির অঙ্গীকার করা হয়েছে। যেমন সর্বপ্রথমে নিকটাত্মীয়দেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, সেখানেও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছিলো যে, ইমান না আনলে শাস্তি অনিবার্য। আর ইমান যারা আনবে, তারা হবে ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তামুক্ত এবং অবশেষে লাভ করবে জান্নাত। যেমন 'আর এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে আরবী ভাষায়, যা স্বেচ্ছাচারীদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে দেয় শুভসংবাদ, যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। অতঃপর এতে অবিচল থাকে, তাদের কোনো

ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী'। আর এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র রসুল বিশ্বাসীদের শুভপরিণাম এবং অবিশ্বাসীদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে জানবেন না। আল্লাহ্‌ তাঁর কিতাবে বিষয়টি উল্লেখ করবেন না, তা-ই ভাবা যেতে পারে কীভাবে? এরকম হলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাই বা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ছাড়তে যাবে কোন্‌ দুঃখে? সত্যধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দেওয়ার দশ বৎসর পরে যদি রসুল স. ও তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গের শুভপরিণতির কথা জানানো হয়, তৎসঙ্গে জানানো হয় অবিশ্বাসীদের অপপরিণতির কথা, তবে বিষয়টি বিসদৃশ, বিতর্কিত ও বিলম্বিত হয়ে যায় নাকি? তাই বর্ণিত মন্তব্যটি অঠিক হওয়াই সমীচীন।

একটি সন্দেহ ঃ খারেজা ইবনে জায়েদ থেকে এবং স্বসূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী রমনী হজরত উম্মে আলা বলেছেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আসেন, তখন আনসারগণ লটারী করে ঠিক করেন যে, তাঁরা কে কাকে আশ্রয় দিবেন। আমার ভাগে পড়লেন ওসমান ইবনে মাজুন। অর্থাৎ আমি হলাম তাঁর আশ্রয়দাত্রী। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তাঁর অনেক সেবা শুশ্রূষা করলাম। কিছুকাল পরেই তিনি পরলোকগমন করলেন। সংবাদ শুনে উপস্থিত হলেন রসুল স. স্বয়ং। আমি আড়ালে গিয়ে ওসমানের মরদেহকে লক্ষ্য করে বললাম, আবু সায়িব! আল্লাহ্‌ আপনার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্‌ আপনাকে মর্যাদায়িত করেছেন। রসুল স. বললেন, তুমি একথা কী করে জানলে? আমি বললাম, তাই তো। তিনি স. বললেন, তার প্রভুপালক তাকে ডেকে নিয়েছেন। আমি তার কল্যাণ আশা রাখি। আমি তো আল্লাহ্‌র রসুল হওয়া সত্ত্বেও একথা জানি না যে, আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে? হজরত উম্মে আলা আরো বলেছেন, এরপর থেকে আমি আর কারো সম্পর্কে এরকম নিশ্চিতার্থক মন্তব্য করতাম না। কিছু দিন পর আমি স্বপ্নে

দেখলাম, ওসমান ইবনে মাজুনের পাশ দিয়ে একটি ঝর্ণাধারা বয়ে চলেছে। রসুল স.কে একথা জানালে তিনি মন্তব্য করলেন, ওটা হচ্ছে তার পুণ্যকর্ম। এই হাদিসটি আলোচ্য আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ কার সঙ্গে কী আচরণ করবেন তা কেউই জানে না। 'এমনকি আল্লাহ্‌র রসুলও নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত নন' যদি এরকম না হয়, তবে বর্ণিত হাদিসটির মর্মার্থ কী হবে?

সন্দেহভঞ্জন ঃ আমি বলি, হাদিসটির মর্মার্থ এরকম— কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির মুক্তি অথবা শাস্তির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ঠিক নয়। কেননা এতে করে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার দাবি করা হয়। অথচ সত্তাগতভাবে অদৃশ্যের জ্ঞান রয়েছে কেবল আল্লাহ্‌র। তবে কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক পূণ্যকর্ম দৃষ্টে তার সম্পর্কে কল্যাণের আশা করা যেতে পারে। আর রসুল স. এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে এরকম— আমি আল্লাহ্‌র রসুল হওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহ্‌ আমাকে অতীত-ভবিষ্যতের জ্ঞান দান করা সত্ত্বেও আমি সঠিক ভাবে জানি না যে, কার কোন কাজের কী প্রতিদান কখন কীভাবে এবং কী পরিমাণে দেওয়া হবে। তাহলে তুমি আবু সায়িব সম্পর্কে এরকম নিশ্চিতার্থক মন্তব্য করলে কেনো?

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার আলোচ্য বক্তব্যটির ব্যাখ্যা এভাবেও করেছেন যে— ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্‌ তোমাদের ও আমার বিষয়ে কখন কীরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, তার বিস্তারিত বৃত্তান্ত আমি জানি না। কেননা সত্তাগতভাবে আমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা নই। কিন্তু এমতো ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা এখানে বক্তব্যের গতি-প্রকৃতি একথাই বলে দিতে চায় যে, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা রসুল স.কে তাদের স্বধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতো। লোভ দেখাতো ধন-সম্পদের, কর্তৃত্বের এবং সুন্দরী ললনার। আবার কখনো প্রদর্শন করতো হুমকি। নির্যাতনও চালাতো বিভিন্নভাবে। তৎসত্ত্বেও রসুল স.কে তারা সত্যধর্ম ইসলাম থেকে একটুও টলাতে পারেনি। তিনি বারংবার তাদেরকে একথাই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের কাছে কোনো কিছুরই প্রত্যাশী আমি নই। মঙ্গলামঙ্গলের নির্ধারয়িতা কেবলই আল্লাহ্‌। তিনি যেমন চাইবেন, তেমনই হবে। এমতো ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— আমি জানি না, আমার ও তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পরিতোষ ও রোষ হবে কতোটা তীব্র। আমরা কে কতোটা হবো কৃতকার্য, অথবা অকৃতকার্য! আর আমি তো তোমাদের প্রস্তাবানুগত হতে পারিই না। কেননা আমি আল্লাহ্‌র সত্য রসুল।

'আমি আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, কেবল তারই অনুসরণ করি' কথাটির অর্থ— আমি তো কোরআনের বিধানানুসারেই চলবো। এই কোরআনকে এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করবো না। বায়যাবী লিখেছেন, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এমন কিছু অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো, যে সম্পর্কে রসুল স.কে তখনো জানানো হয়নি। এই আয়াত তাদের ওই জিজ্ঞাসারই জবাব। আবার সাহাবীগণের নিবেদনের প্রেক্ষিতেও আয়াতাংশটি অবতীর্ণ হয়ে থাকতে পারে।

অর্থাৎ তাঁরা কাফেরদের অত্যাচার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে যখন রসুল স. এর কাছে এর প্রতিকার কামনা করলেন, আল্লাহ্‌ তখন তাঁর রসুলকে বলতে বললেন— 'আমি আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হয়, কেবল তারই অনুসরণ করি'। সুতরাং তোমরা

প্রত্যাদেশের আশায় ও অপেক্ষায় থাকো। দেখো, আল্লাহ্ কীভাবে এর বিহিত করেন, অথবা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে কী নির্দেশ দেন। বাগবী এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

কোনো কোনো বিদ্বজ্জন আবার কথাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে— আমি জানি না পৃথিবীতে আমার ও তোমাদের মধ্যে কী আচরণ করা হবে। তাঁরা বলেন, কথাটির সঙ্গে পরকালের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা পরকালে রসুল স. যে সর্বোচ্চ জান্নাতের অধিকারী হবেন এবং তাঁর শত্রুরা যে দোজখবাসী হবে, সেকথা তো সকলেরই জানা। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মক্কাবাসীদের অত্যাচারে যখন সাহাবীগণ অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন, তখন রসুল স. এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন খেজুর গাছ বিশিষ্ট এক সমতল ভূখণ্ড। তিনি ওই ভূখণ্ডেই তাঁর নতুন আবাস গড়েছেন। সাহাবীগণকে তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা জানালেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি সেখানে গমন করবেন কবে? রসুল স. নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। তখনই অবতীর্ণ হলো 'আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে'।

আবার কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বক্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে— আমি অবগত নই, এ পৃথিবীতে আমার অবস্থা পূর্ববর্তী যুগের কোনো নবীর মতো হবে কিনা। যেমন নবী ইব্রাহিমকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিলো। হে বিশ্বাসবানেরা! আমি একথাও জানি না যে, তোমাদেরকে আমার সঙ্গে দেশত্যাগ করতে হবে কিনা, না আমার সঙ্গে তোমাদেরকেও হত্যা করা হবে। আর হে অবিশ্বাসীরা! তোমাদের বিরুদ্ধেই বা অবলম্বন করা হবে কী ব্যবস্থা। জানি না, অতীত যুগের অবাধ্যদের মতো তোমাদের পরিণতি হবে কি না। যেমন নবী লুতের অবাধ্য সম্প্রদায়কে প্রস্তরবৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিলো, ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে দেওয়া হয়েছিলো সলিল সমাধি। কিংবা কারুনকে করা হয়েছিলো ভূপ্রোথিত। এরপর আল্লাহ্পাক তাঁর প্রিয়তম রসুলকে সান্ত্বনা প্রদানার্থে অবতীর্ণ করলেন 'তিনিই তাঁর রসুলকে হেদায়েত ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে অন্য সকল ধর্মের উপরে আপনার ধর্ম বিজয়ী হয়'। আর মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে জানালেন 'অথচ আল্লাহ্ কখনোই তাদের উপর আযাব নাজিল করবেন না, যতোক্ষণ আপনি অবস্থান করবেন তাদের মধ্যে। আর তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকলে আল্লাহ্ও তাদেরকে শাস্তি দিবেন না'। এরকম ব্যাখ্যাই করেছেন সুদ্দী।

'আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র' অর্থ— আমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা বলে যেমন দাবি করি না, তেমনি আমাকে এমতো অধিকার দেওয়া হয়নি যে, আমি তোমাদেরকে ইমান আনার জন্য জবরদস্তি করবো। বরং ইমান না আনলে যে আল্লাহ্র বিরাগভাজন হতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে অনন্তকাল ধরে, এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়াই আমার কাজ।

পরের আয়াতে (১০) বলা হয়েছে— 'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি এই কোরআন আল্লাহ্র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, আর তোমরা এতে অবিশ্বাস করো, উপরন্তু বনী ইসরাইলের একজন এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এতে বিশ্বাসস্থাপন করলো; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো, তাহলে তোমাদের পরিণাম কী হবে? নিশ্চয় আল্লাহ্ জালেমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না'।

এখানে 'বনী ইসরাইলের একজন' বলে বুঝানো হয়েছে হজরত আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ইবনে হারেছকে। তিনি ছিলেন নবী ইব্রাহিম—নবী ইসহাক—নবী ইয়াকুব—নবী ইউসুফ— এই বংশপরম্পরাভূত।

হজরত আনাস থেকে বোখারী, বায়হাকী; হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের জনৈক পুত্র থেকে মোহাম্মদ ইবনে সালাম; হজরত মুসা ইবনে উক্বা এবং জুহুরী সূত্রে বায়হাকী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেছেন, তওরাত পড়ার কারণে আমি রসুল স. এর নাম, গুণাবলী ও আকার আকৃতি সম্পর্কে জানতাম। তিনি মদীনায় এসে বনী আমর ইবনে আউফের মহল্লায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করলেন। আমি তখন চড়েছিলাম একটি খেজুর গাছে। আর ওই গাছের নিচে বসে ছিলেন আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারেছ। আমি রসুল স. এর আগমন বার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করলাম। ফুফু বললেন, মনে হচ্ছে নবী মুসা ইবনে ইমরানের আগমনবার্তা শুনতে পেলেও তুমি এরকম সোচ্ছ্বাসে আনন্দ প্রকাশ করতে না। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! ইনি মুসা ইবনে ইমরানের ভ্রাতা এবং একই ধর্মের অনুসারী। মুসা যা নিয়ে এসেছিলেন, ইনিও তাই নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। ফুফু বললেন, এতো কেবল জনশ্রুতি। এরপর আমি রসুল স. এর মজলিশে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁকে দেখা মাত্র বুঝতে পারলাম যে, এই পবিত্র মুখাবয়ব কোনো মিথ্যাশ্রয়ীর হতে পারে না। তিনি স. নসিহত করলেন, হে জনতা! অন্নহীনদের অন্নদান করো, সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও। স্বজন বন্ধন অটুট রাখো এবং রাতে যখন সকলে নিদ্রিত থাকে, তখন শয্যাত্যাগ করে নামাজে দণ্ডায়মান হও এবং এভাবে প্রবেশ করো জান্নাতে। বললাম, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করবো, যার জবাব নবী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। প্রথম প্রশ্ন — কিয়ামতের সর্বপ্রথম নিদর্শন কী? দ্বিতীয় প্রশ্ন— জান্নাতবাসীদেরকে সর্বপ্রথম কী খেতে দেওয়া হবে? আর তৃতীয় প্রশ্ন— সন্তানেরা মাতা-পিতার আকৃতি পায় কেনো? আরও একটি কথা জানতে চাই আমি। তা হচ্ছে— চাঁদের মধ্যে কলংক দৃষ্ট হয় কেনো? তিনি স. বললেন, তোমার প্রশ্নের জবাব

এইমাত্র জিবরাইল আমাকে বলে গেলেন। আমি বললাম, তিনি তো ইহুদীদের দুশমন। তিনি স. বললেন, কিয়ামতের সর্বপ্রথম নিদর্শন হবে একটি আগুন, যা মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। জান্নাতবাসীদেরকে

প্রথমে খেতে দেওয়া হবে মাছের ভূনা কলিজা। পুরুষের শুক্র অধিকতর প্রবল হলে সন্তান হয় পিতার মতো এবং মাতার মতো হয় নারীর বীর্য অধিকতর প্রভাবশালী হলে। আর চাঁদের কালোদাগের কারণ ঘটেছে তাকে নিস্প্রভ করে দেওয়ার কারণে। প্রথমে চাঁদও ছিলো সূর্যের মতো আলোকদীপ্ত। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন 'আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি; তারপর নিস্প্রভ করে দিয়েছি রাতের নিদর্শনটিকে'। আমি একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র রসুল। এরপর আমি স্বগৃহে ফিরে এসে গৃহবাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিলাম। ইসলাম গ্রহণ করলো পরিবারের সবাই। তবে বিষয়টি থাকলো গোপন। পুনরায় রসুল স. এর কাছে ফিরে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! ইহুদীরা জানে যে আমি তাদের ধর্মীয় নেতা। কিন্তু তারা মিথ্যাচারাসক্ত। তাই প্রথমেই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রচার করতে চাই না। এ সংবাদ এখনই জানাজানি হয়ে গেলে তারা আমার নামে অনেক অলীক অপবাদ প্রচার করবে। তাই আমি চাই, আপনি আমাকে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখুন। তারপর তাদের সকলকে ডেকে এনে আমার সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলুন। তিনি স. এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আমি আত্মগোপন করে রইলাম পাশের প্রকোষ্ঠে। তিনি স. তাদেরকে ডেকে এনে বললেন, হে বনী ইসরাইল! আল্লাহ্কে ভয় করো। শপথ সেই আল্লাহ্র, যিনি আমাকে তাঁর রসুল করে পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের জন্য নতুন শরিয়ত নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা আমার ধর্মাদর্শকে গ্রহণ করো। আশ্রয় গ্রহণ করো ইসলামের সুশীতল ছায়ায়। ইহুদীরা বললো, আমরা আপনার ধর্মকে সত্য বলে জানি না। তিনি স. বললেন, তোমাদের মধ্যের আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম কেমন মানুষ? তারা বললো, নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের চেয়ে উত্তম। আর তিনি আমাদের নেতা ও নেতার পুত্র। রসুল স. বললেন, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমরাও কি ইসলাম ধর্মকে মেনে নিবে? তারা বললো, আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন। রসুল স. এরপর আমাকে লক্ষ্য করে ডাকলেন, বাইরে এসো। সঙ্গে সঙ্গে আমি বাইরে এলাম এবং ঘোষণা করলাম, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মদান আ'বদুহু ওয়া রসুলুহু। হে বনী ইসরাইল! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সর্বশেষ রসুলকে মেনে নাও। উত্তমরূপে অবগত হও যে, তওরাত শরীফে সর্বশেষ রসুল হিসেবে যাঁর নাম ও বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে, ইনিই তিনি। তারা একথা শুনে রেগে গেলো। বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। আর তুমি আমাদের মন্দ গোত্রপতির ততোধিক মন্দ সন্তান। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমি তো আপনাকে প্রথমেই বলেছিলাম যে, এরা মিথ্যাশ্রয়ী। এরপর আমি আমার পরিবারের লোকজনদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলাম। আমার ফুফু খালেদাও গ্রহণ করলেন ইসলাম। আজীবন তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণা।

বিশুদ্ধ সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, হজরত আউফ ইবনে আশজায়ী বলেছেন, একদিন রসুল স. ইহুদীদের বস্তিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমি ছিলাম তাঁর সঙ্গে। সেদিন ছিলো ইহুদীদের ঈদের দিন। তাই তারা রসুল স.কে দেখে অপ্রসন্ন হলো। রসুল স. তাদেরকে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে বারো জন লোক আমার সম্মুখে হাজির করো, যারা সাক্ষ্য দিবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্'। যদি এরকম করতে পারো, তবে তোমাদের উপরে আপতিত আল্লাহ্র ক্রোধ অপসারিত হয়ে যাবে। একথা শুনে তারা নীরব হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো কথাই বললো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর রসুল স. ফিরে আসবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। তাদের একজন এগিয়ে এসে বললো, একটু দাঁড়ান। রসুল স. দাঁড়ালেন। লোকটি জনতার দিকে মুখ করে বললো, হে বনী ইসরাইল! তোমরা আমাকে কেমন মনে করো? জনতা জবাব দিলো, আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র কিতাব তোমার চেয়ে বেশী বুঝতে পারে, এমন কেউ-ই আমাদের মধ্যে নেই। তোমার পূর্বে তোমার পিতা ও পিতামহও ছিলেন তখনকার সময়ের বড় আলেম। লোকটি বললো, তাহলে শোনো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ইনিই সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর, যার কথা তোমরা তওরাতে পাঠ করে থাকো। জনতা এগিয়ে এসে তাকে সরিয়ে দিলো। বললো, তুমি মিথ্যাবাদী। তখন অবতীর্ণ হলো আলোচ্য আয়াত। বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ছাড়া এখানকার কারো সম্পর্কে রসুল স.কে এরকম বলতে শুনিনি যে, সে জান্নাতবাসীদের মধ্যে একজন। তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় সুরা আহ্কাফের ১০ সংখ্যক আয়াত। এ হাদিসটির বর্ণনাকারী ইমাম বোখারীর উস্তাদ আবদুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ বলেন— হাদিসটির বর্ণনাকারী মালেক। আরো বলেন— আমি জানি না মালেক কি নিজের থেকে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছেন, না হাদিস হিসাবেই তা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে জারীরের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম স্বয়ং বলেছেন, আমার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে 'অথচ বনী ইসরাইলের একজন এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে' আয়াতটি।

কিন্তু মাসরুক বলেছেন, এই আয়াত হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। কেননা আলোচ্য সুরায় সকল আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে মক্কায়। আর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণ করেছেন রসুল স. এর মদীনায় হিজরতের পরে। সুতরাং বুঝতে হবে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কুরায়েশদের সঙ্গে রসুল স. এর বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে। তাই যদি হয়, তবে বুঝতে হবে এখানকার 'সাক্ষ্য দিয়েছে' বলে বুঝানো হয়েছে নবী মুসাকে। আর এখানকার 'এর অনুরূপ কিতাব' কথাটির অর্থ হবে এই কোরআনের অনুরূপ অন্য এক আসমানী কিতাব। অর্থাৎ তওরাত। আর সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হবে তওরাতের ওই সকল আয়াতের সাক্ষ্য যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে শেষ রসুলের নাম-ধাম-গুণাবলীর বিবরণ।

'ওয়াস্তাক্‌বার্‌তুম' অর্থ আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো। অর্থাৎ অহংকারবশতঃ তোমরা সত্যের আহ্বানকে স্বীকার করতে চাও না।

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে **'ইন্ কানা মিন্ ইন্‌দিল্লাহ্'** এর অর্থ যদি এই কোরআন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। বাক্যটি শর্তযুক্ত। এখানে শর্তের প্রতিফল রয়েছে উহ্য। এভাবে তোমাদের পরিণাম কী হবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— যদি এই কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী হয়েই থাকে, আর তোমরা যদি তা ঔদ্ধত্যবশতঃ অস্বীকার করো, তবে তোমরাই হবে সর্বাপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট। সুতরাং ভেবে দেখোছো কী, তোমাদের শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

একটি সন্দেহ ঃ কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী হওয়া, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা কোরআন অস্বীকার করা, বনী ইসরাইলের একজনের এসম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রদান— এসকল কিছুই তো নিঃসন্দিগ্ধ বিষয়। তাহলে এখানে সন্দেহযুক্ত শব্দ **'ইন্'** (যদি) ব্যবহার করা হলো কেনো?

সন্দেহভঞ্জন ঃ এখানে **'ওয়াও'** (এবং) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কেবলই সংযোজকরূপে। তাই **'এবং'** এর পূর্বের বাক্যের প্রতিক্রিয়া এখানে পরবর্তী বাক্যের উপরে পড়বে না। তাছাড়া **'যদি'** শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে ভর্ৎসনা ও সতর্কতা জ্ঞাপনার্থে। এভাবে এখানে একথাটিই বুঝিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে যে, কোরআন যখন আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত, তখন কোনো সুস্থ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে কোরআনের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন বৈধ নয়। তাছাড়া এর সপক্ষে যখন জ্ঞানী একজন বনী ইসরাইলের সাক্ষ্য রয়েছে, তখন কোরআনকে না মানার কোনো কারণই থাকতে পারে না। এরপরেও ঔদ্ধত্য ও অস্বীকৃতি পরিত্যাগ না করা নিশ্চয়ই অপরিণামদর্শিতার কাজ। তাহলে তোমরা এবার ভেবে দেখতে চেষ্টা করো যে, এর পরিণাম হবে কতো ভয়াবহ। **'ইন'** এর এরকম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে অন্য আয়াতেও। যেমন **'ইন কুনতুম ক্বওমাম্ মুসরিফীন'** (যদি তোমরা হও সীমালজ্ঘনকারী)।

সূরা আহ্‌ক্বাফ ঃ আয়াত **১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬**

❑ মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিররা বলে, 'যদি ইহা ভাল হইত তবে তাহারা ইহার দিকে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না। আর যখন উহারা ইহা দ্বারা সৎপথপ্রাপ্ত হয় নাই। তখন তাহারা অবশ্য বলিবে, 'ইহা তো এক পুরাতন মিথ্যা।'

❑ ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। আর এই কিতাব ইহার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেন ইহা যালিমদিগকে সতর্ক করে এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দেয়।

❑ যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্' অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

❑ তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহারা যাহা করিত তাহার পুরস্কার স্বরূপ।

❑ আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয়, তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পসন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

❑ 'আমি ইহাদেরই সুকৃতিগুলি গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা সত্য।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলে, কোরআন যদি কল্যাণজনক কিছু হতো, তবে তাদের আগেই আমরা কোরআনকে মেনে নিতাম। কেননা তারা প্রতিপত্তিহীন, আর আমরা প্রতিপত্তিশালী। প্রকৃত কথা হচ্ছে, কোরআন দ্বারা তারা পথপ্রাপ্ত হয়নি। সেকারণেই তারা কোরআন সম্পর্কে 'এটা তো এক পুরাতন মিথ্যা' এরকম জঘন্য মন্তব্য করতে পারে।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেন, কাতাদা বলেন, মক্কার অংশীবাদীরা বলতো, আমরা উচ্চ মর্যাদাশালী। তাই আমরা মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদি তাদের ধর্ম ভালো হতো, তবে অমুক অমুক প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন ব্যক্তি আমাদের আগে ইসলাম গ্রহণ করতে পারতো না।

ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, আউন ইবনে আবী শাদ্দাদ বলেছেন, হজরত ওমরের যানীন নাম্নী এক ক্রীতদাসী ছিলো। তিনি তাঁর মনিবের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই ভীষণভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন মনিবের দ্বারা। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা এদৃশ্য দেখে মন্তব্য করেছিলো, ইসলাম যদি ভালো কিছু হতো, যানীন কিছুতেই এ ব্যাপারে অগ্রগামিনী হতে পারতো না। তখন অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত। জুহাক ও হাসান সূত্রে ইবনে সা'দও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বাগবী লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতখানি যদি হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে—ইহুদী অবিশ্বাসীরা ইহুদী বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলে, মোহাম্মদের ধর্ম যদি উত্তম হতো, তবে আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের মতো লোক আমাদেরকে টেক্কা দিতে পারতো না।

'ওয়া ইজ লাম ইয়াহ্‌তাদূ বিহী' অর্থ যখন তারা এর দ্বারা (কোরআন দ্বারা) সৎপথ প্রাপ্ত হয়নি হয়েছে ইমানদারগণ। অর্থাৎ পথপ্রাপ্ত না হওয়াই কোরআনের প্রতি তাদের বীতস্পৃহ হওয়ার কারণ। আর 'ফা সাইয়াকুলূনা হাজা ইফকুন্ ক্বদীম' অর্থ তখন তারা অবশ্যই বলবে, এটা তো এক পুরাতন মিথ্যা। একথার অর্থ— যেহেতু তারা পথভ্রষ্ট, তাই একথা তো বলবেই যে, এটা হচ্ছে সনাতন কিংবদন্তিতুল্য, যা মোহাম্মদকে কেউ না কেউ শিখিয়ে দিয়েছে।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'এর পূর্বে মুসার কিতাব ছিলো আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেনো এটা জালেমদেরকে সতর্ক করে এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়'। একথার অর্থ— কোরআনের পূর্বে তওরাতও ছিলো মানুষের জন্য আদর্শ ও রহমতস্বরূপ, যা অবতীর্ণ হয়েছিলো নবী মুসার উপর। সুতরাং তওরাত ও কোরআন

একে অপরের প্রত্যয়নকারী। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তওরাত অবতীর্ণ হয়েছে হিব্রু ভাষায় এবং কোরআন আরবীতে। তবে উভয় কিতাবের মূল উদ্দেশ্য এক। আর তা হচ্ছে— স্বেচ্ছাচারীদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককরণ এবং সুসংবাদ প্রদান তাদেরকে, যারা সৎকর্মপরায়ণ।

এখানে 'ইউন্‌জিরা' অর্থ সতর্ক করে এবং 'বুশরা' অর্থ সুসংবাদ দেয়। কথাটি এখানে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার কারণ। এভাবে কথাটি দাঁড়ায়— এটা হচ্ছে সেই কিতাব, যা পুণ্যবানদেরকে মহাসাফল্যের শুভসংবাদ দেয়।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না (১৩)। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা যা করতো তার পুরস্কারস্বরূপ' (১৪)। একথার অর্থ— যারা বলে আল্লাহ্‌ই আমাদের প্রভুপালনকর্তা এবং এই বিশ্বাসের উপরে যারা অবিচল থাকে, পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা সেখানে দুশ্চিন্তিতও হবে না। তারা তাদের শুভ কর্মসমূহের প্রতিফলরূপে অধিকারী হবে জান্নাতের। আর সেখানে চিরকাল বসবাস করবে।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে, তাকে গর্ভেধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে তিরিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয়, তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করো; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত'।

এখানে 'ওয়া ওয়াস্‌সাইনাল ইন্‌সানা' কথাটির 'আল ইন্‌সানে'র 'আলিফ্‌লাম' হচ্ছে 'আহ্‌দী' (নির্দিষ্টার্থক)। অর্থাৎ এখানে 'মানুষ' অর্থ বিশেষ কোনো মানুষ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'মানুষ' অর্থ হজরত আবু বকর সিদ্দীক। তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। তাঁর মাতা-পিতা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য কোনো মুহাজির সাহাবীর এরকম সৌভাগ্য লাভ হয়নি। আবার সুদ্দী ও জুহাক বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসকে লক্ষ্য করে। সুরা আন্‌কাবুতের তাফসীরে হজরত সা'দের এসম্পর্কিত ঘটনার সবিস্তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা বলেছেন, এখানকার 'আল ইন্‌সানে'র 'আলিফ্‌লাম' হচ্ছে 'জিনসী' (জাতিবাচক), হজরত আবু বকর অথবা হজরত সা'দ যার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হোক না কেনো। কিন্তু এমতো অভিমত আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের গতিপ্রকৃতির অনুকূল নয়।

'বিওয়ালিদাইহি ইহ্‌সানা' অর্থ যেনো মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। উল্লেখ্য, হজরত আবু বকরের মাতার নাম ছিলো হজরত উম্মুল খায়ের বিনতে খায়ের ইবনে সখর ইবনে ওমর এবং পিতার নাম ছিলো হজরত আবু কোহাফা ইবনে ওসমান ইবনে ওমর।

'কুরহান' অর্থ কষ্ট। সদ্ব্যবহার করার কারণ হিসেবে এখানে 'কষ্ট' কেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'কুরহান' অর্থ কষ্ট, শ্রম, বোঝা। 'কুরহা' ও 'কারহা' সমার্থক। কেউ কেউ বলেছেন 'কুরহান' হচ্ছে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং 'কারহান' হচ্ছে ক্রিয়ামুল।

এখানে জননীর কষ্টের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার মায়েরই বেশী। রসুল স. বলেছেন, সুন্দর আচরণ করো মায়ের সঙ্গে, তারপরেও মায়ের সঙ্গে, তারপরেও মায়ের সঙ্গে, তারপরে বাপের সঙ্গে এবং তারপরে আত্মীয়তার নৈকট্যানুসারে।

'ওয়া ফিসলুহু' অর্থ স্তন্য ছাড়ানো, মাতৃ দুগ্ধপান বন্ধ করানো। এখানে গর্ভধারণ ও মাতৃস্তন্য ছাড়ানোর মোট সময়সীমা ধরা হয়েছে তিরিশ মাস। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সর্বনিম্ন গর্ভধারণ কাল ছয়মাস। কেননা অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, মাতৃস্তন্য ছাড়াতে হবে দুই বছরের মধ্যে। সুতরাং তিরিশ মাসের মধ্যে দুই বছর বা চব্বিশ মাস বাদ দিলে থাকে মাত্র ছয় মাস। আলেমগণ অবশ্য সর্বনিম্ন গর্ভধারণকাল যে ছয় মাস, সে ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। কিন্তু গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময় নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা দু'বছর পর্যন্ত গর্ভধারণের সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন চার, পাঁচ, সাত বৎসরের সময়সীমা। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন চার বছরের কথা। আর ইমাম আহমদের অভিমত সম্পর্কে দু'টি বিবরণ পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের অনুকূল এবং অন্যটি অনুকূল ইমাম আবু হানিফার মতের।

আবুল হরব আসওয়াদ দুয়ালী সূত্রে কাতাদা বর্ণনা করেছেন, ছয়মাস গর্ভবতী থাকার পর সন্তান প্রসব করেছে, এরকম এক মহিলাকে একবার নিয়ে আসা হলো খলিফা ওমরের দরবারে। তিনি এব্যাপারে তাঁর সতীর্থদের নিকট থেকে পরামর্শ কামনা করলেন। হজরত আলী বললেন, হে বিশ্বাসীদের অধিনায়ক! এই মহিলার ব্যভিচারিণী হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন 'তাকে গর্ভধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে তিরিশ মাস'। অন্যত্র বলেছেন, 'দুধ ছাড়ানোর সময় দুই বৎসর'। হজরত ওমর একথা শোনার পর মহিলাটিকে ছেড়ে দিলেন। কিছু কাল পর আবার সংবাদ পাওয়া গেলো, মহিলাটি পুনরায় ছয়মাসের বাচ্চা প্রসব করেছে।

নাফে ইবনে যোবায়ের বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ওই মহিলা সম্পর্কে আমি জানতাম। তার সম্পর্কে লোকজনের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিলো। আমিই তো তখন খলিফাকে বলেছিলাম, আপনি কীভাবে জুলুম

করতে পারেন? তিনি বললেন, তার মানে? আমি বললাম, পাঠ করুন 'গর্ভধারণ ও মাতৃস্তন্য ছাড়াতে সময় লাগে তিরিশ মাস'। আর 'স্তন্যপানের সময় কাল দুই বৎসর'। বলুন, বছরে কতো মাস হয়? তিনি বললেন, বারো মাস। আমি বললাম, এভাবে দু'বছরের হিসেবে চব্বিশ মাস বাদ গেলে থাকে কতো? তিনি বললেন, ছয়মাস। আমি বললাম, 'আল্লাহ্ গর্ভধারণকালের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটান তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে'। একথা শোনার পর খলিফার সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

আবু উবায়দা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ বলেছেন, খলিফা ওসমানের দরবারে একবার এক স্ত্রীলোককে নিয়ে আসা হলো। অনেকের সন্দেহ হয়েছিলো, সে হয়তো ব্যভিচারিণী। কিন্তু ইবনে আব্বাস দলিল দিলেন এভাবে 'ওয়া হামলুহু ওয়া ফিসলুহু ছালাছুনা শাহ্‌রা'। খলিফা ওসমান একথা শুনে স্ত্রীলোকটিকে অব্যাহতি দিলেন।

ইমাম আবু হানিফা জননী আয়েশার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, গর্ভধারণের সময়সীমা যতোই দীর্ঘ হোক না কেনো, দুই বৎসরের বেশী সে গর্ভরক্ষা করতে পারে না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যতোই কেনো না সে দ্বিগুণ গর্ভাশয়ের অধিকারিণী হয়। বিষয়টি অবশ্য জটিল। নিজস্ব বিবেচনায় এরকম জটিলতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করা দুরূহ। জননী আয়েশা হয়তোবা রসুল স. এর কাছ থেকে এরকম শুনে থাকবেন। অথবা এটা তাঁর নিজস্ব অভিমত। আমি মনে করি, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত যেরকম অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, তেমনি জননী আয়েশার মন্তব্যটিও অনভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। তিনি হয়তো তাঁর জীবদ্দশায় দুই বৎসরের অধিক গর্ভধারণ করতে কাউকে দেখেননি। সেজন্যেই সাধারণভাবে তিনি যা দেখেছেন, শুনেছেন, মন্তব্যও করেছেন ঠিক সেভাবেই। আর আলোচ্য আয়াতে গর্ভধারণের যে সময়সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, তা সঠিক বলে গ্রহণ করা যেতে পারবে তখনই যখন এখানকার 'আলইন্‌সানে'র 'আলিফ্ লাম'কে ধরা হবে জাতিবাচক। আর এখানকার 'আলিফ লাম'কে যদি নির্দিষ্টার্থক ধরা হয়, তবে বুঝতে হবে, এখানকার সময়সীমা একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ইমাম আবু হানিফা দুধপান ছাড়ানোর সময়সীমা আড়াই বৎসর বা তিরিশ মাসের বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিমতের সঙ্গে আবার এই আয়াতের কোনো সঙ্গতি নেই। সুরা নিসার তাফসীরের যথাস্থানে এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। আবার হজরত ইবনে আব্বাসকে উদ্ধৃত করে ইকরামা বলেছেন, নয় মাসে সন্তান প্রসব করলে মাতা তার সন্তানকে দুধপান করাবে একুশ মাস। আর ছয় মাসে সন্তান প্রসব করলে সে তার সন্তানকে দুধ পান করাবে চব্বিশ মাস।

এখানকার 'ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হয়' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি অনুক্ত ক্রিয়ার সঙ্গে। ওই অনুক্ততাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মাতা-পিতার সাদর প্রতিপালনের মাধ্যমে যখন সে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পৌঁছে এবং এভাবে উপনীত হয় চল্লিশ বৎসর বয়সে, যখন তার জ্ঞান

বুদ্ধি হয় পরিপূর্ণ ও পরিণত। উল্লেখ্য, রসুল স. এবং হজরত আবু বকরের বয়স যখন ছিলো যথাক্রমে বিশ ও আঠারো, তখন তাঁরা বাণিজ্য ব্যপদেশে একসঙ্গে সিরিয়া গমণ করেছিলেন । তাঁরা অধিকাংশ সময় একত্রে সময়াতিপাত করতেন। আর হজরত আবু বকরের বয়স যখন চল্লিশ, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু বর্ণনাকারী সম্ভবতঃ এরকম কথা বলেছেন ভুল করে। কেননা রসুল স. অপেক্ষা তিনি বয়সে ছিলেন দুই বৎসরের ছোট। আর চল্লিশ বৎসর ছয় মাস বয়সে যখন রসুল স. নবুয়তের গুরুদায়িত্ব লাভ করেন, তখন তাঁর বয়স হওয়ার কথা আটত্রিশ বৎসর ছয় মাস। অর্থাৎ বেশী হলে সাড়ে আটত্রিশ। অবশ্য রসুল স. চল্লিশ না সাড়ে চল্লিশ বৎসরে নবুয়ত পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে এ পর্যন্ত মতানৈক্য রয়েই গিয়েছে।

'আওযি'নী' অর্থ সামর্থ্য দাও, দাও তোমার পক্ষ থেকে প্রেরণা। কোনো কোনো আলেম বলেছেন 'ওয়ায্উন' অর্থ থামিয়ে দেওয়া। যদি তাই হয়, তবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার প্রভুপালক! আমাকে এমন করে দাও, যাতে আমি আমার প্রবৃত্তির কৃতজ্ঞতাহীনতার গতিকে থামিয়ে দিতে পারি। আর এখানে 'আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো' অর্থ আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে ইসলামে অনুপ্রবেশ করার যে সৌভাগ্য তুমি দান করেছো। অবশ্য সকল প্রকার শুভপ্রাপ্তিই এখানকার 'অনুগ্রহে'র অন্তর্ভূত হতে পারে।

'সলিহান' অর্থ সৎকর্ম। শব্দটিতে 'তানভীন' যোগ করা হয়েছে এখানে সম্মান প্রকাশার্থে। এর দ্বারা সাধারণভাবে বুঝানো হয়েছে সকল সৎকর্মকে। অর্থাৎ ওই সকল কর্মকে, যা আল্লাহ্‌র পরিতোষআহরক। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে উদ্ধৃত সিদ্দীক শ্রেষ্ঠ আবু বকরের প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। তাঁকে দিয়েছিলেন বহুসংখ্যক সৎকর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য। যেমন তিনি চেয়েছিলেন অত্যাচারিত হয়ে সত্যধর্ম প্রচারে অটল থাকতে, দাসমুক্ত করতে, সন্তান-সন্ততিকে পুণ্যবান পূণ্যবতী করে গড়ে তুলতে। এসকল কিছুই তিনি করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছিলো বলেই তিনি তাঁর পরিবারের সকল সদস্যসহ ইসলাম গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, দাস-দাসী সকলেই হয়েছিলেন রসুল স. এর সম্মানার্হ সাহাবী। এরকম সৌভাগ্য আর কোনো সাহাবীর ভাগ্যে জোটেনি।

'ইন্নী তুব্তু ইলাইকা' অর্থ কুফরী থেকে, তোমার অতুষ্টি থেকে এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের অন্তরায় ঔদাসীন্য থেকে আমি তোমারই অভিমুখী হলাম। আর 'ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন' অর্থ আমি অবশ্যই আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভূত। এভাবে সমাপ্ত পূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমেও একথা প্রমাণিত হয় যে, এখানকার 'আল ইন্সানে'র আলিফ লাম নির্দিষ্টার্থক। অর্থাৎ এখানে 'মানুষ' অর্থ নির্দিষ্ট মানুষ। কেননা, সকল মানুষ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে এতো সুন্দরভাবে গুছিয়ে প্রার্থনা করে না। করতে পারেও না। আর সেই নির্দিষ্ট মানুষটি যে হজরত আবু বকর ছাড়া

অন্য কেউ নন, তা বলাই বাহুল্য। আর চল্লিশ বছরের কাছাকাছি বয়সে ইমান এনেছিলেন তিনিই। যথাকৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবেদনও জানিয়ে ছিলেন ওই বয়সে। সুতরাং ধরা যেতে পারে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর্তিও আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছিলেন।

একটি সন্দেহ ঃ হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আবু বকরের পিতা হজরত আবু কোহাফা ইমান এনেছিলেন মক্কাবিজয়ের পর। তখন হজরত আবু বকরের বয়স হয়েছিলো ষাট বৎসর। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাঁর মদীনা গমনের পূর্বে। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি ইমানদার হয়েছিলেন, তখন তাঁর পিতা ছিলেন কাফের। তাহলে কাফের পিতার প্রতি ইমানদার পুত্রের সদ্ব্যবহার প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়ার অর্থ কী? আর হজরত আবু বকরের একথা বলারই বা কী যুক্তি থাকতে পারে যে, 'আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো'। অর্থাৎ তাদেরকে দিয়েছো ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য। কেননা তখন পর্যন্ত তো তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেনইনি।

সন্দেহের অপনোদন ঃ আমি বলি, কোনো কোনো বর্ণনায় এরকম কথাও এসেছে যে, হজরত আবু বকর ইসলাম গ্রহণ করেন আটত্রিশ বৎসর বয়সে। দু'বছর পর যখন তাঁর বয়স চল্লিশ হয়, তখন তাঁর মাতা-পিতাও ইসলাম গ্রহণ করেন। এই বিবরণটিই সঠিক বলে মনে হয়। আর যদি আগের বর্ণনা মতো একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, হজরত আবু কোহাফা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মক্কাবিজয়ের পর, তবুও আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো হেরফের ঘটে না। আর কাফের পিতামাতার সঙ্গে ইমানদার পুত্রের শোভন আচরণ বৈধ। কেননা সুরা আনকাবুতের এক আয়াতে এসেছে, 'আমি মানুষকে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাদেরকে আমার সঙ্গে শরীক করার আদেশ দেয়, যার সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য কোরো না'। এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতের 'অনুগ্রহ' কথাটির অর্থ হবে ব্যাপক অনুগ্রহ— পার্থিব অথবা ধর্মীয়। আবার এখানকার 'আলইন্সানে'র আলিফ লামকে জাতিবাচক ধরে নিলেও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা ঠিক থাকবে। এমতাবস্থায় 'পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয়' কথাটির অর্থ হবে দৈহিকভাবে হয় সুঠাম এবং 'চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয়' কথাটির অর্থ হবে যখন আগমন করে তার জ্ঞানবুদ্ধির পরিপক্কতা। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মানুষ যখন দৈহিক ও মানসিকভাবে পূর্ণ ও পরিণত হয়, তখন সে প্রাপ্ত অনুগ্রহসমূহের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কামনা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য। আল্লাহ্ই প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত।

এরপরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'আমি এদেরই সুকীর্তিগুলি গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দকর্মগুলি ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সত্য'।

এখানে 'এদেরই' বলে যদি সাধারণ মানুষকে ধরা হয়, তবে সকল সুকীর্তিধারীরাই হবে এর অন্তর্ভূত। আর এর উদ্দেশ্য যদি হয় কেবল হজরত আবু বকর, অথবা হজরত সা'দ, তবুও পরোক্ষভাবে ওই সকল সুকীর্তিধারীরা এর অন্তর্ভূত হবে, যারা তাঁদের মতো গুণসম্পন্ন। আর এমতাবস্থায় 'এদেরই' কথাটি হবে রূপক বা পরোক্ষার্থক। আর শব্দের এরূপ পরোক্ষার্থক ব্যবহার বক্তব্যকে করে অধিকতর শানিত ও অলংকারসমৃদ্ধ। কেননা এতে করে দাবির সঙ্গে সঙ্গে দলিলও উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

'আহ্সানা মাআ'মিলু' অর্থ সুকীর্তিসমূহ। সিদ্ধ বা 'মোবাহ্' কর্মসমূহ যদিও 'সু' পদবাচ্য, তবুও তা পুণ্যার্জক নয়। তাই বুঝতে হবে, এখানে 'সুকীর্তিগুলি গ্রহণ করে থাকি' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল অধিক সুকর্মসমূহকে যেগুলো পুণ্যার্জক। কেননা মূল্য বা বিনিময় দেওয়া হয় তারই, যা গ্রহণ করা হয়। অথবা কথাটির মাধ্যমে হজরত আবু বকর, অথবা হজরত সা'দের সুর্কমসমূহ যে অন্যাপেক্ষা উত্তম, সে কথাই বোঝানো হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তা কবুল করার প্রতিশ্রুতিও। 'মন্দকর্মগুলি ক্ষমা করি' অর্থ আমি তাদের ভুল-ত্রুটির জন্য তাদেরকে শাস্তিযোগ্য বিবেচনা করি না। বরং সেগুলো মার্জনা করে দেই। 'তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত' অর্থ অন্য জান্নাতবাসীদের মতো, অথবা তার চেয়েও বেশী পুরস্কৃত করা হবে তাদেরকে। আর এখানকার 'এদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সত্য' অর্থ পৃথিবীতে হজরত আবু বকর, হজরত সা'দ এবং এদের মতো পুণ্যবানদেরকে সুকীর্তি গ্রহণের, ক্ষমার এবং জান্নাতের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই পরিপূরণ করা হবে। কথাটি সাধারণ কর্মপদ এবং এখানে কথাটি প্রযুক্ত হয়েছে মূল বক্তব্যকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানার্থে।

সূরা আহ্ক্বাফ ঃ আয়াত ১৭, ১৮, ১৯, ২০

❑ আর এমন লোক আছে, যে তাহার মাতা-পিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের জন্য! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হইব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হইয়াছে'? তখন তাহার মাতা-পিতা আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করিয়া বলে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, 'ইহা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।'

❑ ইহাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায় গত হইয়াছে তাহাদের মত ইহাদের প্রতিও আল্লাহ্র উক্তি সত্য হইয়াছে। ইহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

❑ প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী, ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

❑ যে দিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পাইয়াছ এবং সেইগুলি উপভোগও করিয়াছ। সুতরাং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।'

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— আবার এমন দুর্বৃত্ত আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে, তোমাদের প্রতি অক্ষেপ! অনর্থক তোমরা আমাকে কিয়ামতের ভয় দেখাও। বলো, পুনরুত্থান দিবসে সবাইকে পুনর্জীবিত করা হবে। তারপর বিচার করা হবে সকলের কৃতকর্মের। কই? কতো মানুষ তো মৃত্যুমুখে পতিত হলো। কেউই তো পুনর্জীবিত হলো না। ওই দুর্বৃত্তের বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী পিতা-মাতা তখন আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে এবং পুত্রকে বলে, তোমার কপালে রয়েছে দুর্ভোগ। শীগগির তওবা করো। বিশ্বাস স্থাপন করো পুনরুত্থান দিবসের প্রতি। কেননা আল্লাহ্ একথা বিশ্বাস করতে বলেছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। এরকম কথা শোনার পরেও ওই দুর্বৃত্ত সংযত হয় না। বলে, এ সমস্ত হচ্ছে অতীতের কিংবদন্তি, যার কোনো বাস্তবতাই নেই।

ইউসুফ ইবনে মালেক সূত্রে বোখারী বর্ণনা করেছেন, তখন চলেছে হজরত মুয়াবিয়ার শাসনকাল। হেজাজের শাসনকর্তা মারোয়ান একদিন ভাষণ দানকালে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার বশ্যতা স্বীকারের জন্য জনগণকে আহ্বান জানালো। তখন হজরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর তাকে কিছু কটু কথা শুনিয়ে দিলেন। মারোয়ান বললো, একে গ্রেফতার করো। হজরত আবদুর রহমান তখন তাঁর বোন উম্মত জননী হজরত আয়েশার গৃহে আশ্রয় নিলেন। তাই মারোয়ান তাঁকে গ্রেফতার করতে পারলো না। কিন্তু জনগণের উদ্দেশ্যে বললো, এই সে-ই

লোক, যার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে 'আর এমন লোকও আছে যে তার মাতাপিতাকে বলে........ অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়'। জননী আয়েশা তখন বলেন, আল্লাহ্ আমার সম্পর্কে মন্দ কিছু অবতীর্ণ করেননি। বরং কিছুসংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন আমার নিষ্কলুষতার সমর্থনে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মারোয়ানের কথা শুনে হজরত আবদুর রহমান রাগান্বিত হন। বলেন, পুত্রকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করা তো রাজ-রাজড়াদের রীতি। সুদ্দী সূত্রে ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসও এরকম বলেছেন। তার সঙ্গে এই মন্তব্যটিও করেছেন যে, আবদুর রহমান সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো তাঁর মুসলমান হওয়ার পূর্বে।

বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস, সুদ্দী ও মুজাহিদ বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে হজরত আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে। কোনো কোনো বর্ণনায় হজরত আবদুল্লাহ্র স্থলে এসেছে হজরত আবদুর রহমানের নাম। হজরত আবদুর রহমানকে যখন তাঁর পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, তখন তিনি বলেন, আমাকে তাহলে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাদান, আমের ইবনে কা'ব এবং প্রয়াত কুরায়েশ গুরজনদেরকে জীবিত করে দেখাও। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখি, তারা তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেন কিনা।

আমার মনে হয়, মারোয়ানের মন্তব্যের কারণেই এমতো ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, এই আয়াত হজরত আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আর মারোয়ানের উক্তিটি ছিলো বিদ্বেষপ্রসূত। বাগবী লিখেছেন, জননী আয়েশা মারোয়ানের মন্তব্যকে খণ্ডন করেছেন এবং জনৈক ব্যক্তির নাম নিয়ে বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তার সম্পর্কে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, যে বর্ণনায় জননী আয়েশা কর্তৃক মারোয়ানের উক্তি খণ্ডন করার কথা এবং হজরত আবুদর রহমান সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ধারণা নাকচ হওয়ার কথা এসেছে, সে-ই বর্ণনাটির সূত্রপরম্পরা অধিকতর যথার্থও গ্রহণ যোগ্য।

বাগবী আরো লিখেছেন, অধিকতর বিশুদ্ধ ধারণা এই যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এক সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্পর্কে, যে ছিলো তার মাতাপিতার অবাধ্য। হাসান এবং কাতাদাও এরকম বলেছেন। জুজায বলেছে, হজরত আবদুর রহমান সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ধারণা পরবর্তী আয়াতেই অপনোদনিত হয়ে যায়।

পরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'এদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানবসম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের মতো এদের প্রতিও আল্লাহ্র উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত'। একথার অর্থ— অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল সত্যপ্রত্যাখ্যান-কারীদের ধারণা ও কর্মকাণ্ড একই রকম। আল্লাহ্র উক্তি তাদের সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। এরা চিরহতভাগ্য ও চিরক্ষতিগ্রস্ত।

এখানে 'এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' অর্থ এরাই হচ্ছে দোজখবাসী। একথাতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াত হজরত আবদুর রহমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়নি। কেননা তিনি ছিলেন সম্মানিত সাহাবী এবং শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের অন্যতম। তাই 'ক্ষতিগ্রস্ত' শব্দটি তাঁর সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারেই না।

এরপরের আয়াতে(১৯) বলা হয়েছে— 'প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পুণ্যবানদের মধ্যেও মর্যাদাগত তারতম্য রয়েছে। তাই তাদের প্রতিফলপ্রাপ্তির মধ্যেও ঘটবে তারতম্য। বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা পরবর্তী সময়ের ইসলাম গ্রহণকারী অপেক্ষা উত্তম, সে ব্যবধান সামান্য সময়ের জন্য হলেও। মুকাতিল বলেছেন, পুণ্যকর্মের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে প্রতিফলের প্রকৃতি। এই নিয়মেই আল্লাহ্ সকলকে প্রতিফল প্রদান করবেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে থাকবে কর্মগত ও কর্মের প্রতিফলগত তারতম্য। ইবনে জায়েদ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, দোজখীদের শ্রেষ্ঠত্ব নিম্নমুখী এবং বেহেশতীদের শ্রেষ্ঠত্ব ঊর্ধ্বমুখী। অর্থাৎ অধিকতর পাপীরা হবে অধিক শাস্তির উপযোগী এবং অধিক মর্যাদার অধিকারী হবে অধিকতর পুণ্যবানেরা।

আর এখানে 'তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না' অর্থ আল্লাহ্পাক তাঁর অতুলনীয় বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা অনুসারে প্রত্যেককে তার কর্মফল প্রদান করবেন। পুণ্যবানদের পুণ্য যেমন এতটুকুও কম করবেন না, তেমনি এতটুকুও অধিক করবেন না পাপিষ্ঠদের পাপ।

এরপরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছো এবং সেগুলি উপভোগও করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী'।

এখানে 'ওয়া ইয়াওমা ইউ'রাদুল্ লাজীনা কাফারূ আ'লান্নার১ অর্থ যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে। এভাবে এখানে বক্তব্যকে অস্বীকার করার জন্য বাক্যের গঠনভঙ্গিতে আনয়ন করা হয়েছে পরিবর্তন। 'আজ্হাব্তুম ত্বয়্যিবাতিকুম ফী হায়াতিকুমুদ্ দুন্ইয়া' অর্থ তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছো। 'ওয়াস্তাম্তা'তুম বিহা' অর্থ এবং সেগুলো উপভোগও করেছো। অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদেরকে আল্লাহ্ যে সকল সুখোপকরণ দিয়েছিলেন, তার কোনোকিছুই তোমরা উপভোগ করতে বাকী রাখোনি। 'আ'জাবাল হূনি' অর্থ অবমাননাকর শাস্তি। আর 'বিমা কুন্তুম তাফ্সুকূন' অর্থ তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী। এখানকার 'মা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অর্থাৎ 'সত্যদ্রোহী' হওয়ার কারণেই আজ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে অবমাননাকর শাস্তি।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতে পার্থিব সুখ-সম্ভারের মধ্যে ডুবে থাকার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সেকারণেই রসুল স. এবং তাঁর সাহাবীগণ পার্থিব সুখ-সম্ভারের প্রতি অত্যাসক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতেন। বোখারী ও মুসলিম।

বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখলাম, তিনি স. শুয়ে রয়েছেন একটি খালি চাটাইয়ের উপর। মাথায় দিয়েছিলেন খেজুরের আঁশ ভর্তি চামড়ার বালিশ। তাঁর পবিত্র শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র প্রিয়তম রসুল! প্রার্থনা করুন, আল্লাহ্ যেনো আপনার উম্মতকে স্বচ্ছলতা দান করেন। পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। তবুও আল্লাহ্ তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছেন। তিনি স. বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি এরকম ভাবছো কেনো? তাদেরকে তো কেবল দুনিয়াই দেওয়া হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন বললেন, ওমর! তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, তাদের জন্য পার্থিবতা এবং আমাদের জন্য পরকাল? বোখারী ও মুসলিম আরো বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, রসুল স. এর পরিবার পরিজন তাঁর মহাতিরোধান পর্যন্ত কখনো পরপর দুদিন উদর পূর্তি করে আহার করেননি।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, আবু সাঈদ মকবরী বলেছেন, কিছুসংখ্যক লোক এক স্থানে বসে আহারের আয়োজন করছিলেন। হজরত আবু হোরায়রা সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তিনি সেখানে বসলেন না। যেতে যেতে বললেন, রসুল স. পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন। তিনি স. যবের রুটিও কখনো পেটভরে খাননি। জননী আয়েশা বলেছেন, কখনো কখনো এমন হতো, মাসাধিককাল পর্যন্ত আমাদের ঘরের উনুন জ্বলতো না। আমাদের দিন কেটে যেতো কেবল খেজুর ও পানি খেয়ে। আল্লাহ্ আনসার রমণীগণের মঙ্গল করুন। তারা কখনো হাদিয়া হিসেবে আমাদের কাছে দুধ পাঠাতো। আহমদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো কোনো রাতে রসুল স. অনাহারে থাকতেন। তাঁর পরিবার পরিজনদের অবস্থাও সেরকমই ছিলো। আর অধিকাংশ সময় তাঁদের ভাগ্যে জুটতো কেবল শুকনো রুটি।

হজরত আনাস থেকে তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমনভাবে সতর্ক করা হয়েছে, যে রকম সতর্ক আর কাউকে করা হয় না। আর আমাকে যেভাবে দুঃখ যাতনা দেওয়া হয়েছে, সেরকম দুঃখ যাতনাও দেওয়া হয় না অন্য কাউকে। একবার আমাদের উপর দিয়ে তিরিশটি দিবা-রাত্রি এমনভাবে অতিবাহিত হলো যে, আমরা প্রায় অন্নহীন অবস্থাতেই কাটালাম। এমন খাদ্য আমাদের জুটলো না, যা খেয়ে জীবন ধারণ করা যায়। অবশ্য বেলাল মাঝে মাঝে আমাদের জন্যই কিছু খাদ্য লুকিয়ে রাখতো। তিরমিজি বলেছেন, ঘটনাটি ওই সময়ের, যখন রসুল স. হজরত বেলালকে নিয়ে

মদীনার বাইরে কোনো এক স্থানে চলে গিয়েছিলেন। তখন সামান্য খাদ্যবস্তু ছিলো তাঁদের সঙ্গে, যা হজরত বেলাল তাঁর বগলের নিচে লুকিয়ে রাখতে পারতেন।

বোখারী লিখেছেন, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, আমি সত্তরজন এমন সাহাবীকে দেখেছি, যাদের কাছে ঊর্ধ্বাঙ্গে আবৃত করার মতো বস্ত্র ছিলো না'। নিম্নাঙ্গের পরিধেয়ও ছিলো হ্রস্ব, যা কোনো রকমে পায়ের অর্ধাংশ পর্যন্ত পৌঁছতো।

কেউ আবার গলায় এমনভাবে কম্বল জড়িয়ে রাখতেন যে, তাতে করে কোনো রকমে তাদের লজ্জা নিবারণ হতো। আবার নিম্নাংগের হ্রস্ব বসন তাঁরা হাত দিয়ে জড়িয়ে থাকতেন, যাতে গোপনাঙ্গ উন্মোচিত না হয়।

বোখারী বর্ণনা করেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, আমি একবার রসুল স. এর জন্য যবের রুটি প্রস্তুত করলাম। তিনি তা নিয়ে ছিলেন এক ইহুদীর কাছ থেকে তাঁর যুদ্ধের পোশাক বন্ধক রেখে। আমি নিজে দেখেছি, অধিকাংশ দিন তাঁর পরিবার পরিজনদের জন্য গম অথবা যবও থাকতো না। থাকতো না কোনো ব্যঞ্জনও। অথচ তখন তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন তাঁর নয়জন সহধর্মিণী।

তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু তালহা বলেছেন, আমরা কয়েকজন একবার রসুল স. এর কাছে গিয়ে জানালাম, আমরা ক্ষুধার্ত। দেখালাম, আমাদের প্রত্যেকের পেটে বাঁধা রয়েছে একটি করে পাথর। তিনি স. দেখালেন, তাঁর পেটে বাঁধা রয়েছে দু'টি পাথর। তিরমিজি একথাও বলেছেন যে, হাদিসটি দুষ্প্রাপ্য শ্রেণীর।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান বলেছেন, আমি একবার হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তিনজন লোক এসে বললো, হে আবু মোহাম্মদ! আল্লাহ্র শপথ! আমরা খুবই অসমর্থ। আমাদের না আছে কোনো আহার্য, না আছে বাহন। হজরত আবদুল্লাহ্ বললেন, তোমরা কি আমার কাছে কিছু চাও? যদি চাও, তবে আমি তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারবো। সে রকম সামর্থ্য আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। যদি পছন্দ করো, তবে আমি তোমাদের কথা স্থানীয় প্রশাসককেও জানাতে পারি। আর যদি ভালো মনে করো, তবে ধৈর্যধারণ করো। কেননা আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, মহাবিচারের দিবসে বিত্তহীনেরা বিত্তপতিদের চল্লিশ বৎসর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। একথা শুনে তারা বললো, আমরা তাহলে ধৈর্যই ধারণ করলাম। কারো কাছে কিছু চাইবো না।

আহমদ বর্ণনা করেছেন, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেন, রসুল স. আমাকে যখন ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করলেন, তখন বললেন, আরাম আয়েশ থেকে দূরে থেকো। আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দারা কখনো সুখ-সম্ভোগে মগ্ন থাকতে পারে না। বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে লিখেছেন, হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অল্প উপার্জনে আল্লাহ্র প্রতি পরিতুষ্ট থাকে, তার অল্প আমলেই আল্লাহ্ পরিতুষ্ট হন। বাগবী লিখেছেন, একবার হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রোজা রাখলেন, সন্ধ্যায় যখন তাঁর সামনে আহার্য উপস্থিত করা হলো, তখন তিনি বললেন, আমার চেয়ে কতোইনা উত্তম ছিলেন মাসআব ইবনে উমায়ের। শহীদ হওয়ায় তাকে কাফনরূপে দেওয়া হয়েছিলো একটি চাদর। চাদরটি এতো ছোটো ছিলো যে, মাথা ঢেকে দিলে পা অনাবৃত হয়ে পড়তো। আবার পা ঢেকে দিলে উন্মোচিত হয়ে পড়তো মস্তক। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, আমার মনে আছে, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তখন একথাও

বলেছিলেন যে, শহীদ হামযাও ছিলেন আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর আমাদের জন্য দুনিয়াকে করে দেওয়া হয়েছে প্রশস্ত। কিংবা বলেছেন, আমার তো ভয় হয় যে, আমাদের পুণ্যকর্মসমূহের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হলো কিনা। একথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। আহার করলেন না।

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, একবার ওমর ইবনে খাত্তাব আমার হাতে গোশত দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? আমি বললাম, গোশত। খেতে ইচ্ছে করেছিলো, তাই কিনলাম। তিনি বললেন, যা মনে চাইবে, তা-ই ক্রয় করবে? তোমার কি এই আয়াতের ভয় নেই? একথা বলেই তিনি পাঠ করলেন সুরা আহ্কাফের ২০ সংখ্যক আয়াত। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বর্ণনা করেছেন, ওমর তখন আরো বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই, যে তার স্বজন-বান্ধবদের জন্য নিজে অভুক্ত থাকে? সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে হজরত ইবনে ওমরের এক বিবৃতিতে। রজীন বর্ণনা করেছেন, হজরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, একবার ওমর ইবনে খাত্তাব পানি পান করতে চাইলেন। তাকে পানি ভর্তি একটি পাত্র এনে দেওয়া হলো। বলা হলো, পানিতে কিছু মধু মেশানো হয়েছে। তিনি বললেন, অবশ্যই এই পানীয় পবিত্র। কিন্তু আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি পার্থিব সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হবে, সে বঞ্চিত হবে পরকালের সুখ-সম্ভোগ থেকে। এই বলে তিনি পাঠ করলেন 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছো এবং সেগুলো উপভোগও করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি'। আমার তো ভয় হয়, আমাদের পুণ্যকর্মসমূহের প্রতিদান এখানেই দেওয়া হচ্ছে কিনা। এরপর তিনি আর মধুর শরবত পান করলেন না।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, জীবন ভোগ করার অর্থ কেবল এরকম নয় যে, আমরা ছোট ছোট ছাগলের গোশত্ ভুনা করবো, ময়দার নরম রুটি তৈরী করবো এবং শুষ্ক আঙ্গুর এতো বেশী সময়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখবো যে, তা হয়ে যাবে চন্দ্রমুখী বকরীর চোখের মতো। তারপর সবগুলোকে একত্র করে সম্পন্ন করবো ভোজন। বরং আমরা চাই যে, সম্ভোগেচ্ছাকে আমরা লালন করবো পরকালের জন্য। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন 'তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছো এবং সেগুলো সম্ভোগও করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি'।

কাতাদা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, এখন আমি চাইলে সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার খেতে পারি, পরতে পারি সুন্দর পোশাক। কিন্তু আমি আমার সম্ভোগ প্রবৃত্তিকে পরকালের জন্য প্রতীক্ষারত রাখতে চাই। এক বর্ণনায় এসেছে, খলিফা হজরত ওমর যখন সিরিয়ায় গেলেন, তখন তাঁর জন্য এমন সব সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করা হলো, যা তিনি আগে কখনো চোখেও দেখেননি। তিনি বললেন, এই দরিদ্র মুসলমানদের তাহলে কী হবে যারা জীবনভর যবের রুটিও পেট ভরে খেতে পায় না। হজরত খালেদ ইবনে ওলীদ বললেন, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

হজরত ওমরের চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি রোদনজড়িত কণ্ঠে বললেন, তাহলে তো আমার অংশে রইলো তুচ্ছ পদার্থ। আর তারা জান্নাতের অধিকারী হলে তো আমার চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। হামিদ ইবনে হেলাল বলেছেন, জননী হাফসা প্রায় রাতে তাঁর পিতা খলিফা ওমরের গৃহে রাত্রি যাপন করতেন। কিন্তু তাঁর সামনে রাতের খাবার আনা হলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করতেন। হজরত ওমর একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! তুমি আমাদের খাবার খেতে চাও না কেনো? তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার গৃহবাসীরা যে খাবার তৈরী করে তা আপনার খাবারের চেয়ে অনেক নরম। আমি আবার সেই সুস্বাদু খাবার পছন্দ করি। হজরত ওমর তাঁকে স্নেহসিক্ত ভর্ৎসনার স্বরে বললেন তোমার মা তোমার জন্য রোদন করুক! তুমি কি জানো না যে, আমি চাইলে একটা আস্ত মোটা তাজা ছাগল ভুনা করে খেতে পারি। আরো হুকুম দিতে পারি এক সা কিসমিস পানিতে ততোক্ষণ পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখতে, যতোক্ষণ না তা হয়ে যায় হরিণের রক্তের মতো লাল। সেই সত্তার শপথ! যাঁর অলৌকিক অধিকারে রয়েছে আমার জীবন! পরকালের পুণ্য কমে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি নিজের ও তোমাদের জন্য মুখরোচক আহার্যের আয়োজন করতাম।

হাসান বর্ণনা করেছেন, আমি একবার বসরার প্রশাসক হজরত আবু মুসার সঙ্গে খলিফা ওমরের সাহচর্যে উপস্থিত হলাম। কিছুদিন অবস্থান করলাম তাঁর সান্নিধ্যে। দেখলাম, প্রতিদিন তাঁর রুটির সঙ্গে কখনো দেওয়া হয় দুধ, কখনো গোশতের কিমা, আবার কখনো গোশতের ঝোল, কিন্তু সবকিছুর পরিমাণ হতো খুব অল্প। তিনি আমাদেরকে তখন বলেছিলেন, আমার মনে হয়, তোমরা আমার খাবার পছন্দ করো না। আমি চাইলে তো তোমাদের চেয়েও অধিক সুস্বাদু ও মুখরোচক খাদ্য খেতে পারি। জীবন যাপন করতে পারি আরাম আয়াশে। আল্লাহ্র শপথ! আমি জলচর পাখি ও অন্যান্য পাখির গোশতের গুণাগুণ সম্পর্কেও জানি। কিন্তু আল্লাহ্ যে লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন ভোজনবিলাসীদের। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'তোমরা তোমাদের পার্থিব সুখ-সম্ভার পেয়েছো এবং সেগুলো উপভোগও করেছো। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি'।

সূরা আহ্‌ক্বাফ ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

❑ স্মরণ কর, 'আদ্ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল। সে তাহার আহ্কাফ্বাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। আমিতো তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।'

❑ উহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদিগকে আমাদের দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

❑ সে বলিল, 'ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই নিকট আছে। আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি কেবল তাহাই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।'

❑ 'অতঃপর যখন উহারা উহাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন বলিতে লাগিল, 'উহা তো মেঘ আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে।' হূদ বলিল, 'ইহাই তো তাহা, যাহা তোমরা ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছ, এক ঝড়, ইহাতে রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

❑ 'আল্লাহ্র নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করিয়া দিবে।' অতঃপর উহাদের পরিণাম এই হইল যে, উহাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

❑ আমি উহাদিগকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তোমাদিগকে তাহা দেই নাই; আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় উহাদের কোন কাজে আসে নাই; কেননা উহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল। যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! স্মরণ করুন আপনার পূর্ববর্তী নবী হুদের কথা। তাঁর পূর্বে ও পরে আরো অনেক নবী তাঁদের আপনাপন সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে প্রেরিত হয়েছিলেন। আর হুদ প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁর আ'দ জাতির জ্ঞাতিভ্রাতা আহ্কাফ্বাসীদের পথপ্রদর্শনার্থে। দুর্বিনীত ও অবাধ্য আহ্কাফ্বাসীদেরকে তিনি বলেছিলেন, অংশীবাদিতা থেকে সতর্ক হও। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো উপাসনা কোরো না। আমি তো আশংকা করছি কখন না জানি তোমাদের উপরে এসে পড়ে ভয়ংকর আযাব।

এখানে 'আ'দ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা' অর্থ নবী হুদ। 'যার পূর্বে ও পরে সতর্ককারী এসেছিলো' অর্থ তাঁর পূর্বে ও পরে এসেছিলেন আরো অনেক নবী। যেমন পূর্বে নবী নুহ। পরে নবী সালেহ্, নবী ইব্রাহিম, নবী লুত প্রমুখ। 'সতর্ক করেছিলো' অর্থ তাদের অনিষ্ট সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আর 'ইয়াওমিন আ'জীম' অর্থ মহাদিবস, ভীষণ বিপদের দিন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আহ্কাফের অবস্থান ইয়েমেন ও মেহরার মধ্যবর্তী স্থানে। মুকাতিল বলেছেন, আদ সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ছিলো ইয়েমেন এলাকার মেহরা অঞ্চলের হাজরা মাউত নামক স্থানে। মেহরার উট পৃথিবী প্রসিদ্ধ। আর ওই স্থানের অধিবাসীরা ছিলো ইরম সম্প্রদায়ভূত। কাতাদা বলেছেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে, ইয়েমেনে বসবাস করতো আ'দ নামক এক সম্প্রদায়। সমুদ্রের উপকুলবর্তী উঁচুনিচু বালুকাভূমিতে ছিলো তাদের বসবাস। তাদেরকে ইয়াশজরও বলা হতো।

‘আহ্কাফ্’ শব্দটি ‘হকফ্’ এর বহুবচন। আর ‘হকফ্’ বলা হয় বালুকাময় অঞ্চলকে, যা ক্রমাগত বাঁক খেতে খেতে হয়ে যায় বিস্তীর্ণ প্রান্তর। ইবনে জায়েদ বলেছেন, ‘হকফ্’ হচ্ছে বিস্তীর্ণ বালুকাময় মালভূমি। ক্বারী কাসাই বলেছেন, বিস্তির্ণ বালুকাময় উপকুলকে বলে ‘হকফ্’।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে— ‘তারা বলেছিলো, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজো থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছো? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছো, তা আনয়ন করো’। একথার অর্থ— হুদের কথা শুনে তারা ক্ষেপে গেলো। বললো, তোমার মতলব কী? তুমি কি আমাদেরকে দিয়েই আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজা অর্চনা বন্ধ করিয়ে দিতে চাও? তোমাকে তো আমরা বিশ্বাসই করি না। ঠিক আছে, সত্যবাদী যদি তুমি হয়েই থাকো, তবে যে শাস্তির ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছো, তা শীগগির নিয়ে এসো। এখানে ‘তুমি নিবৃত্ত করতে এসেছো’ কথাটি ঠিক প্রশ্নবোধক নয়। বরং কথাটি সিদ্ধান্তমূলক। এর সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায়—বুঝেছি। তুমি চাও, আমরা আমাদের দেব-দেবীদের পূজো পার্বণ বন্ধ করে দেই। ‘ইন্ কুন্‌তা মিনাস সদিক্বীন’ অর্থ তুমি সত্যবাদী হলে। কথাটি পূর্বোক্ত আয়াতের ‘মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি’ এর অনুগামী। সেজন্যেই এখানে ‘ইন্ কুন্‌তা’ এর জবাবকে প্রচ্ছন্ন রাখার কোনো প্রয়োজন পড়েনি।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— ‘সে বললো, এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌র নিকটে আছে। আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, কেবল তা-ই তোমাদের নিকটে প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়’। একথার অর্থ— হুদ তখন বললেন, বিষয়টি সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়নির্ভর। তিনিই জানেন, কোথায় কখন কীভাবে তিনি তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। সুতরাং তোমাদের কথামতো, অথবা আমার ইচ্ছামতো শাস্তি আসতে পারে না। আমার দায়িত্ব কেবল সত্যের প্রচার। আর তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সত্য গ্রহণ। অথচ তোমরা দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছো। তোমরা তো দেখছি নিতান্তই মূঢ়, অপরিণামদর্শী।

এখানে ‘এর জ্ঞান’ অর্থ কখন শাস্তি আপতিত হবে, তার নির্ধারিত দিনক্ষণ ও প্রকৃতির অবহিতি। অর্থাৎ শাস্তি আসবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নির্ধারিত সময়ে। আমার ইচ্ছায়, অথবা তোমাদের প্রস্তাবানুসারে নয়। আর ‘তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়’ অর্থ তোমরা সত্যি সত্যিই মূর্খ। নতুবা জানতে নবীগণের দায়িত্ব হচ্ছে কেবল সত্যের প্রচার। কাউকে শাস্তি দান, অথবা শাস্তি থেকে অব্যাহতি প্রদান তাদের দায়িত্বভূত কোনো বিষয় নয়। এ সম্পর্কে জানেন কেবল আল্লাহ্।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— ‘অতঃপর তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখলো, তখন বলতে লাগলো, ওই মেঘ তো আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। হুদ বললো, এটা তো সে-ই, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছো, এক ঝড়, এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি(২৪)। আল্লাহ্‌র নির্দেশে এটা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রইলো না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি’ (২৫)।

আহ্কাফ্‌বাসীদেরকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছিলো, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে। ঘটনাটি ছিলো এরকম— তাদের অঞ্চলে দেখা দিলো খরার প্রচণ্ড প্রকোপ। দীর্ঘ দু’টি বৎসর ধরে চললো একটানা অনাবৃষ্টি। ফলে খাদ্যাভাবে ও গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো তারা। হঠাৎ একদিন তারা দেখতে পেলো আকাশে ভাসছে একখণ্ড কালো মেঘ। ওই মেঘ দেখে তাদের আবালবৃদ্ধবনিতা খুশী হলো খুব। বললো, যাক বাঁচা গেলো। বৃষ্টিপাতের আর বিলম্ব নেই। নিশ্চয় এবার কেটে যাবে দাবদাহ ও অজন্মা। নবী হুদ বললেন, উৎফুল্ল হয়ো না। এই মেঘই তোমাদের সর্বনাশ ঘটাবে। যে শাস্তিকে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে, এ হচ্ছে সেই শাস্তি। এই মেঘপুঞ্জ থেকেই সৃষ্টি হবে প্রচণ্ড ঝড়। আর ওই ঝড় হবে মারাত্মক ও মর্মন্তুদ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এই ঝড় তোমাদেরকে এবং তোমাদের সবকিছুকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত্যা। তাদের বসতবাটির তৈজসপত্র, গৃহপালিত পশু সবকিছু পঙ্গপালের মতো ঘুরপাক খেতে থাকলো আকাশে। সভয়ে

তারা নিজ নিজ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো। তবুও আত্মরক্ষা করতে পারলো না। তুফান অর্গলাবদ্ধ দরজাগুলোকে ভেঙে ফেললো। তারপর তাদেরকে বার বার আছড়াতে লাগলো মাটিতে। এরপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে ঝঞ্ঝাবাহিত বালুকারাশি এসে পড়তে লাগলো তাদের উপর। এভাবে এক সময় বালির স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে মরে রইলো তারা। ঝড়তুফান তবুও বন্ধ হলো না। প্রবল বেগে বয়ে চললো একটানা সাতদিন আটরাত্রি পর্যন্ত। সাতদিন পর তাদের লাশের উপর থেকে উড়ে গেলো বালুর স্তূপ। তারপর তুফানের শেষ আঘাত তাদের মরদেহগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করলো সমুদ্রে। এক বর্ণনায় এসেছে, নবী হুদ তখন তাঁর বিশ্বাসী অনুচরবর্গকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন অদূরের দুর্ভেদ্য দুর্গসদৃশ এক উপত্যকায়।

বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, মুখগহ্বরে আলজিহ্বা পরিদৃশ্যমান হয়, এভাবে আমি রসুল স.কে কখনো জোরে হাসতে দেখিনি। তাঁর হাসি ছিলো স্মিত। আর তাঁর চেহারায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হতো তখন,

যখন তিনি আকাশে মেঘ জমতে দেখতেন। বাগবী বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! মেঘ দেখলে লোকে খুশী হয়, আশা করে বৃষ্টিপাতের। আর আপনি মেঘ দেখলেই হয়ে যান বিষণ্ন ও চিন্তিত। কারণ কী? তিনি স. বললেন, আয়েশা! মেঘ দেখলেই আমার সেই মেঘের কথা মনে পড়ে। আশংকা হয়, এই মেঘেও না জানি কোন শাস্তি লুকিয়ে রয়েছে। আহ্কাফ্বাসীরাও তো মেঘ দেখে বৃষ্টি আশা করেছিলো। জননী আয়েশা আরো বলেছেন, ঝড় উঠলে রসুল স. বলতেন, হে আল্লাহ্! এ থেকে আমি তোমার কাছে কামনা করি তোমার কল্যাণের। কামনা করি, এর অভ্যন্তরস্থিত কল্যাণেরও। এই বাতাস যা বহন করে এনেছে, আমি প্রার্থনা করি, তা-ও কল্যাণময় হোক। আর আশ্রয় যাচনা করি এর অনিষ্টতা থেকে। মেঘ দেখলে তাঁর মুখমণ্ডলের বর্ণ বদলে যেতো, অস্থির হয়ে গমনাগমন করতেন ঘরে বাইরে। তাঁর এমতো অস্থিরতা শুরু হতো তখন, যখন শুরু হতো বৃষ্টিপাত। আমি একবার তাঁর এরকম অস্থির হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি স. বললেন, আয়েশা! এরকম মেঘ দেখেই তো আহ্কাফ্বাসীরা বলেছিলো, এই মেঘ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে? বলেনি? কিন্তু তাদের আশা কি পূরণ হয়েছিলো?

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বৃষ্টি দেখলে বলতেন, আমি আল্লাহ্র অনুকম্পা-প্রত্যাশী। বোখারী, মুসলিম। আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও শাফেয়ী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. মেঘ অথবা ঝড়ের আগমনাভাস দেখতে পেলে সব কাজ ফেলে রেখে সেদিকে মুখ করে বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় যাচনা করি ওই অনিষ্টতা থেকে, যা এর মধ্যে রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, ঝড়ঝঞ্ঝা শুরু হলে রসুল স. নতজানু হয়ে বলতেন, হে আল্লাহ্! একে তুমি তোমার অনুগ্রহে পরিণত করো, একে শাস্তির কারণ বানিয়ো না। শাফেয়ী, বায়হাকী।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোনো কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিলো। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো'।

এখানে 'আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম' অর্থ তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম প্রতুল শক্তি ও সম্পদ। 'ইম্ মাক্কান্নাকুম ফীহি' অর্থ তোমাদেরকে তা দেইনি। এখানকার 'ইন্' হচ্ছে না-সূচক। অর্থাৎ তোমাদেরকে সেরকম শক্তি ও সম্পদ দেওয়া হয়নি। অথবা 'ইন্' এখানে শর্তসূচক, যার প্রতিফল রয়েছে উহ্য। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— তোমাদেরকে তাদের মতো শক্তি-সম্পদ দান করলে তোমাদের ঔদ্ধত্য যেতো অনেক বেড়ে। কিংবা 'ইন্' এখানে অতিরিক্তরূপে সংযোজিত। এভাবে অর্থ দাঁড়ায়— আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন করেছি, তোমাদেরকেও ক্ষমতাসম্পন্ন করেছি সেই বিষয়েই। তবে 'ইন্'কে এখানে না-সূচক অর্থে গ্রহণ করাই হবে অধিকতর সঙ্গত। কেননা তাদের বিপুল বিত্তপ্রতিপত্তির কথা অন্য আয়াতে বিধৃত হয়েছে স্পষ্টভাবে। যেমন— জনবল, ধনবল ও চাষাবাদের দিক দিয়ে তারা শক্তিশালী ছিলো। 'কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় তাদের কোনো কাজে আসেনি' অর্থ তারা কান, চোখ, হৃদয় থাকা সত্ত্বেও শুনতে, দেখতে ও বুঝতে চেষ্টা করেনি সত্যকে। এভাবে হয়ে গিয়েছে মহাশাস্তির উপযোগী। আর 'যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো' অর্থ নবী হুদ তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাতেন। কিন্তু তারা ভয় তো করতোই না, উল্টো বরং এই নিয়ে মেতে যেতো হাসি-তামাশায়। অথচ যা নিয়ে তারা মশকরা করতো, সেই ভীষণ শাস্তিই একদিন আপতিত হলো তাদের উপর। ফলে তারা চিরতরে উৎপাটিত হলো এই পৃথিবী থেকে।

সূরা আহ্ক্বাফ ঃ আয়াত ২৭, ২৮

❑ আমি তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি উহাদিগকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছিলাম, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

❑ উহারা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন? বস্তুত

উহাদের ইলাহ্গুলি উহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল। উহাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এইরূপই।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে মক্কাবাসী! ছামুদ সম্প্রদায়, সাদুমবাসী ইত্যাদি দুর্বিনীত জনগোষ্ঠী তো বসবাস করতো তোমাদেরই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে। আমি তাদের প্রতি সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম। তাদের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছিলাম অলৌকিক নিদর্শনাবলী। তবুও তারা সতর্ক হয়নি। ফিরে আসেনি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের পথে। সেকারণেই তো আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। কই, তখন তো তাদের মিথ্যা উপাস্যসমূহ তাদেরকে সাহায্য করতে আসেনি, যাদের উপাসনা তারা করতো আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে। বরং তাদের সবকিছুই ছিলো কল্পনা ও মিথ্যাচার। আর কল্পনাচরণ ও মিথ্যা উদ্ভাবনের পরিণাম এরকমই হয়।

মূর্তিপূজারীরা তাদের পূজ্য মূর্তিগুলোকে আল্লাহ্‌ জ্ঞানে পূজা করে না। পূজা করে এই বিশ্বাসে যে, এই দেবীপ্রতিমাগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তাই এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করেছিলো'। তাদের এমতো অপবিশ্বাসের কথা অন্য এক আয়াতে বিবৃত হয়েছে এভাবে 'এসকল প্রতিমা আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করবে আমাদের মুক্তির জন্য'।

'বস্তুত তাদের ইলাহ্‌গুলি তাদের নিকট থেকে অন্তর্হিত হয়ে পড়লো' কথাটির অর্থ তাদের পূজ্য প্রতিমাগুলো ছিলো প্রাণহীন। সুতরাং কারো উপকার কিংবা অপকার করবার সাধ্য তো তাদের ছিলোই না। কিন্তু প্রমিতাপূজারীদের ধারণা ছিলো, তারা তাদেরকে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যখন আযাব এসে পড়লো তখন তাদের এমতো অপবিশ্বাস হয়ে গেলো অন্তর্হিত। বিষয়টি তাদের কাল্পনিক দেব-দেবীদের অন্তর্হিত হওয়ার মতোই। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে 'ইলাহ্‌গুলি তাদের নিকট থেকে অন্তির্হিত হয়ে পড়লো' অর্থ আযাব আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে গেলো তাদের দীর্ঘদিনের পৌত্তলিকতাদুষ্ট অপবিশ্বাস। উল্লেখ্য, কল্পনা ও মিথ্যা ভাবনা বাস্তবের আঘাতে এভাবেই চিরতরে উবে যায়। তাই শেষে বলা হয়েছে— তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এরূপই (ওয়া জালিকা ইফ্‌কুহুম ওয়ামা কানূ ইয়াফ্‌তারূন)। এখানে 'ইফ্‌কুম' অর্থ মিথ্যা, সত্যদ্রোহিতা। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা লিখেছেন, এখানে 'জালিকা' (এরূপই) কথাটিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যাচারিতাই ছিলো তখন তাদের সাহায্য না পাওয়ার কারণ। অর্থাৎ সত্যদ্রোহিতার পরিণতিতেই তারা তখন হয়ে পড়েছিলো আল্লাহ্‌র রোষকবলিত। আর এখানকার 'মা কানু' এর 'মা' হচ্ছে ক্রিয়ামূল।

হজরত ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার নাখলা উপত্যকায় বসে কোরআন আবৃত্তি শুরু করলেন। কয়েকটি জ্বিন

পাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে তাঁর কোরআন পাঠ শুনে মুগ্ধ হলো। নিচে নেমে এসে অবাক হয়ে শুনতে লাগলো আল্লাহ্‌র কালাম। তারা সংখ্যায় ছিলো নয়জন। তার মধ্যে একজনের নাম ছিলো রাজবাআ'। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত। বলা হয়—

সূরা আহ্‌ক্বাফ ঃ আয়াত ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

❑ স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জিন্নকে, যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেছিল। যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, উহারা বলিল, 'চুপ করিয়া শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হইল উহারা উহাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপে।

❑ উহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে, ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

❑ 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।'

❑ কেহ যদি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। উহারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! শুনুন, একবার আমি জ্বিন সম্প্রদায়ের একটি দলকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে দিলাম। তারা আপনার কাছে এসে আপনার কোরআন পাঠ শুনতে লাগলো। একে অপরকে বললো, চুপ

করে শুনো। আপনার কোরআন পাঠ তারা খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলো এবং মুগ্ধ হয়ে গেলো। তারপর তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে কোরআনের প্রচার করতে লাগলো।

এখান থেকে শুরু হয়েছে নতুন প্রসঙ্গ এবং এমতো প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে রসুল স.কে সান্ত্বনা প্রদানার্থে। যেনো বলা হয়েছে, হে আমার রসুল! মক্কার মুশরিকেরা বার বার কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করলে কী হবে, জ্বিন সম্প্রদায়ের একটি দল আপনার কোরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, কোরআনের এবং আপনার নবুয়তের সংবাদ তারা পৌঁছে দিয়েছে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে।

এখানে 'নাফার' অর্থ দশের কম সংখ্যক ব্যক্তির দল। এর বহুবচন হচ্ছে 'আনফার'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নাসিবীনে ছিলো সাতটি জ্বিন। রসুল স. তাদেরকে ইসলাম প্রচারকরূপে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে তাদের সংখ্যা ছিলো নয়জন। বাগবী লিখেছেন, হজরত যর ইবনে হুবাইশ সূত্রে আসেম বর্ণনা করেছেন, হজরত রাজবাআও ছিলেন ওই নয়জনের মধ্যে। উল্লেখ্য, এ সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে সুরা জ্বিনের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

পরের আয়াতে (৩০) বলা হয়েছে— 'তারা বলেছিলো, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে'।

আতা বলেছেন, ওই জ্বিনগুলি ছিলো ইহুদীসম্প্রদায়ভূত। আমি মনে করি, 'যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসার পরে', সেই কিতাবের মাধ্যমে তওরাত শরীফের বিধি বিধানসমূহ রহিত করা হয়েছে। এর পূর্বে যবুর, তওরাত ও ইঞ্জিল শরীফের অধিকাংশ বিধান অরহিত অবস্থায় ছিলো। যেমন হজরত ঈসা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যিনি তাকে কিতাব, হেকমত এবং তওরাত-ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করেছিলেন' আবার হজরত ঈসার উক্তিরূপে আর এক আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে 'আমি তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছি ওই সকল বস্তু, যা ইতোপূর্বে তোমাদের জন্য অবৈধ ছিলো'।

এখানে 'ইয়াহ্‌দি ইলাল হাক্ব' অর্থ সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং 'ওয়া ইলা ত্বরীকিম্‌ মুসতাক্বীম' অর্থ পরিচালিত করে সরল পথের দিকে।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে—'হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীদের প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, আল্লাহ্‌ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন (৩১)। কেউ যদি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। এরাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে' (৩২)।

এখানে 'আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও' অর্থ শেষ রসুল মোহাম্মদ মোস্তফা স. কর্তৃক আনীত ধর্মমত গ্রহণ করো। 'আল্লাহ্‌ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন' অর্থ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আল্লাহ্‌র যে সকল অধিকার লংঘিত হয়েছে, তা তিনি মাফ করে দিবেন। উল্লেখ্য, তওবা করলে বান্দার অধিকার লংঘিত হওয়ার পাপ ক্ষমা করা হয় না। উল্লেখ্য, ওই ধর্মপ্রচারক জ্বিনদের আহ্বানে তাদের সম্প্রদায়ের সত্তর জন একযোগে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সকলে মিলে রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হয়। তিনি স. তখন ছিলেন বুতহায়। তিনি স. তাদেরকে কোরআন পাঠ করে শোনান। ফরজ হুকুমসমূহ পালন করে যেতে বলেন এবং বিরত থাকতে বলেন নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে। আর এই ঘটনার দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, রসুল স. প্রেরিত হয়েছেন জ্বিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শনার্থে।

সূরা আহ্‌ক্বাফ ঃ আয়াত ৩৩, ৩৪, ৩৫

❑ উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন দান করিতেও সক্ষম? বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ যেই দিন কাফিরদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের নিকট, সেই দিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহা কি সত্য নহে?' উহারা বলিবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! ইহা সত্য।' তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমরা ছিলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী।'

❑ অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর তুমি উহাদের জন্য ত্বরা করিও না। উহাদিগকে যেই বিষয়ে

সতর্ক করা হইয়াছে তাহা যেই দিন উহারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেই দিন উহাদের মনে হইবে, উহারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। ইহা এক ঘোষণা, পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হইবে।

প্রথমে বলা হয়েছে— 'তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এই সকল সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম'? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক এবং এর সংযোগ রয়েছে একটি প্রচ্ছন্ন বাক্যের সঙ্গে। ওই প্রচ্ছন্নতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— এই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা বিনা চিন্তা-ভাবনায় আল্লাহ্ যে মৃতকে জীবিত করেন, তা অস্বীকার করে কেনো, কেনো এ বিষয়ে ভাবতে চায় না যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আর এমতো মহাস্রষ্টা যিনি, তার কোনো প্রকার ক্লান্তি শ্রান্তি থাকা সম্ভব নয়?

এরপর বলা হয়েছে— 'বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। একথার অর্থ— সত্তাগতভাবে সর্ববিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলেই তিনি যখন যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। সৃষ্টি করতে পারেন রহস্যময় আকাশসমূহ ও বিশাল পৃথিবীকে। আর এই সুবিশাল কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করলেও তিনি ক্লান্তি-শ্রান্তির সঙ্গে থাকেন সতত সম্পর্কচ্যুত।

পরের আয়াতে (৩৪) বলা হয়েছে— 'যেদিন কাফেরদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এটা সত্য। তখন তাদেরকে বলা হবে, শাস্তি আস্বাদন করো। কারণ তোমরা ছিলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী'। একথার অর্থ— যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে দোজখের তটদেশে উপস্থিত করানো হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, এবার বলো, দোজখ কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রভুপালনকর্তার শপথ! নিশ্চয়ই দোজখ সত্য। তখন তাদেরকে আদেশের ভঙ্গিতে বলা হবে, কিন্তু তোমরা ছিলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী। সুতরাং এখন শাস্তি ভোগ করতে থাকো।

বলা বহুল্য, 'আমাদের প্রভুপালকের শপথ! এটা সত্য' এরকম স্বীকৃতি তখন তাদের কোনো কাজে আসবে না। কেননা পৃথিবী হচ্ছে ইমান আনার স্থান, আখেরাত নয়। আখেরাতে দেওয়া হবে কেবল কৃতকর্মসমূহের প্রতিফল।

এখানে 'ফা জুক্বল আ'জাব' (শাস্তি আস্বাদন করো) কথাটির 'ফা' নৈমিত্তিক। অর্থাৎ 'ফা' এর আগের বাক্য এর পরের বাক্যের নিমিত্ত। দোজখ সত্য হওয়া সত্ত্বেও তারা পৃথিবীতে দোজখকে অস্বীকার করতো। তাই তাদের ওই অস্বীকৃতিই হবে তখন তাদের শাস্তিগ্রস্ত হওয়ার নিমিত্ত। আর ' জুক্ব' হচ্ছে নির্দেশজ্ঞাপক শব্দরূপ, যার মধ্যে দিয়ে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তীব্র ঘৃণা ও তিরস্কারের।

শেষোক্ত আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসুলগণ। আর তুমি তাদের জন্য ত্বরা কোরো

না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা যে দিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেই দিন তাদের মনে হবে, তারা যেনো দিবসের একদণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা এক ঘোষণা, পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে'। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! সত্যের পথ বন্ধুর। এটাই আমার শাশ্বত বিধান। সুতরাং আপনি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অসুন্দর আচরণ দৃষ্টে ব্যথিত ও হতোদ্যম হবেন না। বরং আপনার পূর্বের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসুলগণের মতো সহিষ্ণুতা ও সাহসের সঙ্গে আপন কর্তব্যে অটল থাকাই হবে আপনার জন্য শোভন ও সমীচীন। সুতরাং প্রতিশোধেচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করুন। পৃথিবীর সাময়িক সুখভোগের অবকাশ আমিই তাদেরকে দিয়েছি। অবশেষে শাস্তি তো তাদেরকে পেতেই হবে। তাই বলে, এব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। মহাবিচারের দিবসে আমি তো তাদেরকে যথোপযুক্ত দণ্ডদান করবোই। ওই দিবসের উপায়বিহীনতা দৃষ্টে তাদের মনে হবে, পৃথিবীতে তাদের অবস্থান ছিলো মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। অতএব, আপনি কেবল পুনঃপুনঃ তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করতে থাকুন যে, আল্লাহ্ পাপিষ্ঠদেরকে অতি অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করাবেন। বিশেষ করে অংশীবাদী ও অবিশ্বাসীদের শাস্তি হবে অনন্তকালীন।

এখানে 'উলুল আ'য্মি' অর্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুদৃঢ় ধৈর্যধারী, নির্ভিক, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। এই 'উলুল আযম' পয়গম্বর কারা, সে বিষয়ে বিদ্বজ্জন তুমুল মতভেদ করেছেন। যেমন ইবনে জায়েদ বলেছেন, প্রত্যেক পয়গম্বরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, ছিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি-সাহসে পূর্ণ ও পরিণত। এমতাবস্থায় এখানকার 'মিনার রসুল' এর 'মিন' হবে বিবৃতিমূলক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, একমাত্র হজরত ইউনুস ছাড়া অন্য সকল নবীই ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি একবার প্রত্যাদেশ আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেননি। তাই রসুল স.কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ একস্থানে বলেছেন 'আপনি ইউনুসের মতো হবেন না'। কোনো কোনো আলেম আবার হজরত আদমকেও 'উলুল আযম' পয়গম্বরগণের তালিকা থেকে বাদ দেন। কেননা আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন 'আমি তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাইনি'। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'উলুল আযম' হচ্ছেন ওই সকল বার্তাবাহক, যাদের নামোল্লেখ করা হয়েছে সুরা আল ইমরানে। তাঁদের সর্বমোট সংখ্যা আঠারো— যেমন ১. ইব্রাহিম ২. ইসহাক ৩. ইয়াকুব ৪. নুহ ৫. দাউদ ৬. সুলায়মান ৭. আইয়ুব ৮. ইউসুফ ৯. মুসা ১০. হারুন ১১. জাকারিয়া ১২. ইয়াহ্ইয়া ১৩. ঈসা ১৪. ইলিয়াস ১৫. ইসমাইল ১৬. আল ইয়াসা ১৭. ইউনুস এবং ১৮. লুত আলাইহিমুস্ সালাম। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের নামোল্লেখের পর বলেছেন 'তারা ওই সকল ব্যক্তি, যাঁদেরকে আল্লাহ্ সঠিক পথ দেখিয়েছেন, আপনি তাঁদের পথের অনুসরণ করুন'।

কালাবী বলেছেন, যাঁদেরকে জেহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, তাঁরাই উলুল আযম রসুল। কেউ কেউ বলেছেন, এরকম রসুল ছিলেন ছয়জন— ১. নুহ ২. হুদ ৩. সালেহ ৪. লুত ৫. শোয়াইব এবং ৬. মুসা আলাইহিমুস সালাম। সুরা আরাফ ও সুরা শুয়ারায় তাঁদের নাম বিন্যস্ত হয়েছে এভাবেই।

মুকাতিল বলেছেন, 'উলুল আযম' নবী ছিলেন এই ছয় জন— ১. হজরত নুহ । তাঁর সম্প্রদায়ের অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন। ২. হজরত ইব্রাহিম। নমরুদ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলো। তৎসত্ত্বেও তিনি অধৈর্য হননি। ৩. হজরত ইসহাক। তিনি জবেহ হওয়ার আদেশ পেয়েও ধৈর্যচ্যুত হননি। (মুকাতিলের এই মতটি আলেমগণের ঐকমত্যের পরিপন্থী। কেননা জবেহ হওয়ার আদেশ পেয়েছিলেন হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক নয়)। ৪. হজরত ইয়াকুব। পুত্রবিরহে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি অধৈর্য মনোভাব প্রকাশ করেননি। ৫. হজরত ইউসুফ। তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন কূপে ও কারাগারে অন্তরীণ থাকার সময়। ৬. হজরত আইয়ুব । তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন দীর্ঘ রোগভোগ করা সত্ত্বেও।

হজরত ইবনে আব্বাস এবং কাতাদার মতে 'উলুল আযম' বাণীবাহকের সংখ্যা পাঁচ জন— যাঁদেরকে দেওয়া হয়েছিলো পৃথক পৃথক শরিয়ত। তাঁরা হচ্ছেন— ১. হজরত নুহ ২. হজরত ইব্রাহিম ৩. হজরত মুসা ৪. হজরত ঈসা এবং ৫. হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স.।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্ উলুল আযম বচনবাহকগণের বিবরণ দিয়েছেন এই আয়াতে 'যখন আমি নবীগণ থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমার কাছ থেকে, নুহ, ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসা থেকে'। এই পাঁচজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে অন্য এক আয়াতে এভাবে 'আমি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সেই পথই নির্ধারণ করেছি, যার নির্দেশ করেছি নুহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসার প্রতি এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কোরো না।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি বলেছেন, 'উলুল আযম' পয়ম্বরের সংখ্যা ছয়জন— আদম, নুহ, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদ আলাইহিমুস সালাম। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র শরিয়তধারী। তাঁদের পরবর্তী নবীগণ ছিলেন তাঁদেরই শরিয়তের বাহক ও প্রচারক। এদের সকলের পূর্বে ছিলেন কেবল হজরত আদম। তিনি চলতেন তাঁর নিজস্ব শরিয়তানুসারে। বাগবী লিখেছেন, মাসরুক বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা সূত্রে আমি জানতে পেরেছি, রসুল স. বলেছেন, আয়েশা! মোহাম্মদ ও তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য পৃথিবীপ্রসক্তি সমীচীন নয়। আল্লাহ্ পূর্ববর্তী উলুল আযম রসুলগণের পৃথিবীবিরাগ পছন্দ

করেছেন। আমাকেও করেছেন তাঁদের মতো। বলেছেন 'সুতরাং আপনিও ধৈর্যধারণ করুন, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ রসুলগণ'। আল্লাহ্‌র শপথ! আমাকে এ নির্দেশ মানতেই হবে। এর অন্যথা হতে পারেই না। সত্যপ্রচারে তাঁরা যেমন শ্রমশীল ছিলেন, আমাকেও শ্রমশীল হতে হবে সেরকমই। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

হজরত ইবনে মাসউদ বলেছেন, সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে, রসুল স. এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করছেন। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা

তাঁকে প্রহারে প্রহারে রক্তাক্ত করলো। আর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছতে মুছতে দোয়া করতে লাগলেন, হে আমার আল্লাহ্‌! তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও। এরা যে অবুঝ। বোখারী ও মুসলিম।

'তুমি তাদের জন্য ত্বরা কোরো না' অর্থ হে আমার রসুল! আপনি অত্যাচারী কুরায়েশদের দ্রুত শাস্তি কামনা করবেন না। শাস্তি আসবে নির্ধারিত সময়ে। একথার মাধ্যমে অনুমিত হয় যে, দুর্বৃত্ত কুরায়েশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রসুল স. মনে মনে তাদের তাৎক্ষণিক শাস্তির কথা ভাবছিলেন। তাই 'ত্বরা কোরো না' বলে আল্লাহ তাঁকে এমতো ভাবনা থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন।

'সেই দিন তাদের মনে হবে, তারা যেনো দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি' অর্থ সেদিনের ভয়াবহতা ও উপায়বিহীনতা দৃষ্টে তাদের পৃথিবীর জীবনের স্মৃতি উবেই যাবে প্রায়। মনে হবে পৃথিবী বলে যেনো কোনোকিছু ছিলোই না।

'এটা এক ঘোষণা' অর্থ এই কোরআন প্রচার করতে হবে। অথবা প্রচার করতে হবে এই কোরআনানুযায়ী ধর্মমত ইসলাম। এখানে 'বালাগুন' (ঘোষণা, সংবাদ) শব্দে তানভীন যুক্ত করা হয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থে। অর্থাৎ এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার কাজটি শ্রেষ্ঠ কাজ। আর 'পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে' অর্থ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে অনন্তকালের জন্য শাস্তিগ্রস্ত করা হবে না। অবশিষ্টরা হবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন। একারণেই কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসংশ্লিষ্ট যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো এই আয়াতের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

সূরা আহ্‌কাফের তাফসীর শেষ হলো আজ ১৩ই জমাদিউল আউয়ালে, ১২০৮ হিজরী সনে। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন, ওয়া সালল্লহু তায়ালা আ'লা খইরি খলক্বিহী মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আ'লা আ'লিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আজ্‌মায়ীন। আমিন।

সূরা মুহাম্মাদ

এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এতে রয়েছে ৪ রুকু এবং ৩৮ আয়াত।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬

❑ যাহারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে তিনি তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দেন।

❑ যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই তাহাদের প্রতিপালক হইতে প্রেরিত সত্য, তিনি তাহাদের মন্দ কর্মগুলি বিদূরিত করিবেন এবং তাহাদের অবস্থা ভাল করিবেন।

❑ ইহা এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা তাহাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এইভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাহাদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন।

❑ অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। ইহাই বিধান। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে। যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদের কর্ম বিনষ্ট হইতে দেন না।

❑ তিনি তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাহাদের অবস্থা ভাল করিয়া দেন।

❑ তিনি তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার কথা তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যের সৎপথ প্রাপ্তির প্রচেষ্টার অন্তরায় হয়, তাদের ভালো-মন্দ সকল কর্মই আল্লাহ্ নিষ্ফল করে দেন।

এখানে 'আয়্মালা' অর্থ ভালো-মন্দ উভয় প্রকার কর্ম। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরাও সাধারণতঃ ভালো ভালো কাজ করে। যেমন অন্নহীনকে অন্নদান করে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে, দাসমুক্ত করে, সজাগ থাকে প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে। কিন্তু তাদের এসকল শুভকর্মগুলোকেও আল্লাহ্ পণ্ড করে দিবেন। তাই পরকালে এসকলের শুভপ্রতিফল তারা পাবে না। কেননা তারা এসকল কর্ম আল্লাহ্‌র পরিতোষ অর্জনার্থে করে না। করে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। কারণ আল্লাহ্‌কে তো তারা পুণ্যপ্রদাতা এবং শাস্তিদাতা বলে স্বীকারই করে না। অবশ্য আল্লাহ্ সাধারণতঃ তাদের শুভকর্মাবলীর প্রতিফল এই পৃথিবীতেই দিয়ে দেন সুনাম অথবা বিত্তপ্রাচুর্যের আকারে, কিংবা তাদের অহমিকার ইন্ধনরূপে। আর জুহাক এখানকার 'ব্যর্থ করে দেন' কথাটির অর্থ করেন এভাবে— আল্লাহ্ তাদের গোপন অভিসন্ধি অকার্যকর করে দেন। রসুল স. এর বিরুদ্ধাচারীদেরকে তিনি এরকমই করেছিলেন, তাদের প্রতারণার জালে জড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকেই।

পরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'যারা ইমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মোহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর এটাই তাদের প্রভুপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলি বিদূরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন (২)। এটা এজন্য যে, যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ইমান আনে, তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন' (৩)।

এখানে 'আললাজীনা আমানু' অর্থ যারা ইমান আনে। একথা বলে ইসলামের সকল বিশ্বাস্য বিষয়াবলীর প্রতি ইমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে। বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে রসুল স. কর্তৃক আনীত বিধানাবলীর উপরেও। অর্থাৎ বিশ্বাস্য বিষয় ও শরিয়তের বিধান উভয়ের প্রতি বিশ্বাস না রাখা পর্যন্ত ইমান পূর্ণ হয় না।

'আর এটাই তাদের প্রতিপালক থেকে প্রেরিত' কথাটি এখানে প্রসঙ্গান্তর এবং বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়েছে সীমিতকরণ অর্থে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ হবে— শরিয়তে মোহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল শরীয়তী বিধানকে রহিতকারী। কিন্তু এই শরিয়ত অন্য শরিয়ত দ্বারা রহিত নয়।

'তাদের অবস্থা ভালো করবেন' অর্থ পৃথিবীতে তাদেরকে নিরাপদ রাখবেন শয়তানের আক্রমণ থেকে। দান করবেন পুণ্যকর্মাবলী সম্পাদনের সামর্থ্য। শত্রুদের উপরে করবেন বিজয়ী এবং পরকালে দান করবেন আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও বেহেশতের সুখ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কথাটির অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে সারাজীবন নিরাপদে রাখবেন।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে' কথাটি বলা হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদের উদ্দেশ্যে, আর 'যারা ইমান আনে তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে' একথা বলা হয়েছে আনসারগণের উদ্দেশ্যে। আমার মতে, কথাটি সাধারণভাবে সকল ইমানদার সম্পর্কেই বলা হয়েছে। তেমনি 'যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে' কথাটি মধ্যেও সাধারণভাবে সকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী অন্তর্ভুক্ত। এখানে 'মিথ্যার অনুসরণ করে' অর্থ শয়তানের অনুসরণ করে। আর এখানকার 'এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যানুসারী এবং বিশ্বাসীরা সত্যানুগামী— এই দৃষ্টান্তটির দ্বারাই আল্লাহ্ এভাবে বুঝিয়ে দেন সত্য-মিথ্যার প্রভেদ।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— 'অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে মুকাবিলা করো, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো। পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জেহাদ চালাবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ এদের অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তার কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না'।

এখানে 'গর্দানে আঘাত করো' অর্থ একেবারে শেষ করে দাও। কেননা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত করলে তাদের মৃত্যু না-ও হতে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধকালে কাফেরদেরকে একেবারে হত্যা করে ফেলাই আল্লাহ্‌র পছন্দ। 'হাত্তা ইজা আছখানতুমূহুম' অর্থ যখন তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে। 'আছ খানতুম' শব্দটি পরিগঠিত হয়েছে 'ছাখীন' থেকে। 'ছাখীন' অর্থ মজবুত, মোটা। 'ফাশুদ্দুল ওয়াছাক্বা' অর্থ কষে বাঁধবে, যাতে তারা পালাতে না পারে। 'ভীছাক্ব' এবং 'ওয়াছাক্ব' অর্থ এমন বন্ধন, যা কোনো কিছু দিয়ে রচনা করা হয়। 'অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ' অর্থ এরপর ইচ্ছে করলে তাদেরকে দয়া করে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিয়ো, অথবা ছেড়ে দিয়ো মুক্তিপণ নিয়ে।

বাগবী লিখেছেন, এই আয়াতের বিধান রহিত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আলেমগণ মতপৃথকতা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াত রহিত হয়েছে অপর দুইটি আয়াতের মাধ্যমে— ১. 'অংশীবাদীদেরকে হত্যা করো, যেখানে তাদেরকে পাও' ২. 'সুতরাং তুমি যদি কখনো তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদেরকে এমন শাস্তি দাও, যেনো তাদের অনুগামীরা তা দেখে পালিয়ে যায়'। কাতাদা, জুহাক, সুদ্দী ও ইবনে জুরাইজও এরকম বলেছেন। আওযায়ীও এ মতের প্রবক্তা। এক বর্ণনায় এই অভিমতের যোগসূত্র ইমাম আবু হানিফার সঙ্গেও করা হয়েছে। আমার মতে উদ্ধৃত আয়াত দু'টো দ্বারা এই আয়াত রহিত হয়নি।

কেননা এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কেবল প্রায়োগিক পার্থক্য। আর এগুলোর কোনোটি সাধারণার্থক, আবার কোনোটি বিশেষার্থক। কেননা যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানো আলেম ওলামাগণের মতানুসারে এখনো বৈধ। এরকম বলেছেন ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক। আর সাধারণ বিধানাবলীর মধ্যে যখন কিছুসংখ্যক বিধানকে বিশেষ বিধানরূপে নির্ধারণ করা হয়, তখন অন্য বিধানগুলোও আর সুদৃঢ় থাকে না এবং ধারণপ্রসুত অদৃঢ় বিধান সুদৃঢ় বিধানকে অকার্যকরও করতে পারে না।

অন্যান্য আলেমের মতে আলোচ্য আয়াত রহিত নয়। কেননা বন্দী কাফের পুরুষ ও মানসিক ভারসাম্যসম্পন্ন না হলে খলিফা এই অধিকার সংরক্ষণ করেন যে, তিনি তাকে হয় হত্যা করবেন, না হয় গোলাম বানাবেন, না হয় বন্দী বিনিময় করবেন, নয়তো মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দিবেন। হজরত ইবনে ওমর এবং অধিকাংশ সাহাবী এই অভিমতের প্রবক্তা। হাসান, আতা, সওরী, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইসহাকেরও সিদ্ধান্ত তাই।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তাদের শাসনক্ষমতা সুদৃঢ় হয়, তখন অবতীর্ণ হয় 'অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ'। সুতরাং এ বিধানকে রহিত বলা যায় না। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ। তাছাড়া রসুল স. এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাগণ এই বিধানই কার্যকর করেছেন। অর্থাৎ তারা বন্দীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাদের নিজস্ব অভিপ্রায়ানুসারে। তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন মুক্তিপণ না নিয়ে, অথবা নিয়ে।

আমি বলি, রহিত হয়েছে এই আয়াত 'নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশে প্রচুর রক্তপাত ঘটবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো। আর আল্লাহ্ চান আখেরাত। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। কিন্তু 'অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ' এই আয়াত এখানে রহিতকারী। কেননা পূর্ববর্ণিত আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়েছিলো বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, দ্বিতীয় হিজরীতে। আর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে অনেক পরে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের বছরে। তখন তিনি স. মুক্তিপণ ছাড়াই কিছু বন্দীকে মুক্ত করে দেন। হজরত আনাস বলেছেন, বর্মসজ্জিত আশিজন তামীম গোত্রীয় লোক রসুল স. ও সাহাবীগণকে পাহাড়ের আড়াল থেকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলো। রসুল স. তাদেরকে বন্দী করেন এবং পরে ছেড়ে দেন বিনা মুক্তিপণে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তাদেরকে শেষ পর্যন্ত মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় 'তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন, তাদের উপরে তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ তা দেখেন'। মুসলিম। বন্দীদের বিধান সম্পর্কিত হাদিস ও এব্যাপারে আলেমগণের মতভেদসমূহের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে সুরা আনফালের তাফসীরে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

'হাত্তা তাদ্বআ'ল হারবু আওযারহা' অর্থ যতোক্ষণ না যুদ্ধ এর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এখানে 'আওযারাহা' অর্থ অস্ত্রের বোঝা, অস্ত্রশস্ত্র। কথাটির অর্থ— যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর থাকে কেবল মুসলমান। অথবা তখন সন্ধি করার মতো কেউ থাকে না। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'আওযারাহা' অর্থ পাপ। আর 'অস্ত্র নামিয়ে ফেলে' অর্থ যুদ্ধে পরাজিত হলে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের পাপের বোঝা নামিয়ে ফেলে। তওবা করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ভালোমতো কতল করো এবং বন্দী করো, যাতে তারা সকলেই নিরুপায় হয়ে হলেও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়।

নিহত হওয়া, আহত হওয়া, বন্দী হওয়া, বিনা পণে বা পণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এসকল কিছুকে আল্লাহ্ যুদ্ধের বিয়োগফল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যুদ্ধের গতানুগতিক পরম্পর্য যেনো শেষ হয়ে যায়। আর বিধর্মীদের শক্তি খর্ব হয়ে গেলে ধর্মযুদ্ধ এমনিতেই শেষ হয়ে যায়। হজরত ঈসার পুনরাবির্ভাবের পর এরকমই ঘটবে। হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সব সময় সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। আর যুদ্ধে জয়লাভ করবে তারাই। এমনকি এই দলের শেষ ব্যক্তিটিও যুদ্ধ করবে দাজ্জালের সাথে। বাগবীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আমার আবির্ভাবের পর জেহাদ শুরু হয়েছে। এমনকি আমার উম্মতের শেষ ব্যক্তিটিও দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

'এটাই বিধান এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন' কথাটির অর্থ হে বিশ্বাসীগণ! আযাব-গজব নামিয়ে দিয়ে অথবা যে কোনোভাবে যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ধ্বংস করে দিতে তো পারেনই। কিন্তু তাতে তোমাদের লাভ কী? তোমরা তাহলে জেহাদের সওয়াব ও মিথ্যা নিশ্চিহ্ন করার আনন্দ পাবে কেমন করে? আর 'তিনি চান, তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে' কথাটির অর্থ— কিন্তু জেহাদকে তিনি চান উভয়ের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করতে। অর্থাৎ বিশ্বাসীরা যেনো যুদ্ধের পরীক্ষার মাধ্যমে লাভ করতে পারে পুণ্য। আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কারো কারো যেনো চৈতন্যোদয় ঘটে, মিথ্যার অসারতা ও সত্যের শক্তিমত্তা দেখে তারা যেনো হয়ে যেতে পারে মুসলমান, আর অবশিষ্টরা যেনো হয় দোজখের শাস্তির উপযোগী। সারকথা, আল্লাহ্ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে যে কোনো মুহূর্তে ধ্বংস করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও জেহাদের হুকুম দিয়েছেন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে। আর ওই মহৎউদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়কে পরীক্ষা করা। আর এখানকার 'যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তার কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না' অর্থ তাদের পাপের কারণে তাদের পুণ্যকর্মসমূহকে আল্লাহ্ নষ্ট করেন না। বরং তাদের পাপসমূহকে তিনি মার্জনা করেন এবং দান করেন পুণ্যকর্মসমূহের প্রতুল পুরস্কার।

ইস্পাহানীর 'তারগীব' নামক পুস্তকে এবং হজরত আনাস থেকে বায্যার ও বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, শহীদ তিন রকমের— ১. ওই

লোক, যে তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে পুণ্যের আশায় লড়াই করবার জন্য মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করতে বের হয়। সে নিহত হলে তার পাপসমূহ মার্জনা করা হবে, তাকে রক্ষা করা হবে কবরের শাস্তি ও কিয়ামতের দিবসের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা থেকে, তাকে পরানো হবে মর্যাদাপূর্ণ পোশাক, মস্তকে পরানো হবে সম্মানের মুকুট

এবং তাকে যুগলবন্দী করা হবে বেহেশতের সুলোচনা হুরীদের সঙ্গে। ২. ওই ব্যক্তি, যে তার জানমাল নিয়ে পুণ্যলাভ ও জয়ের আশায় যুদ্ধ যাত্রা করে, তৎপর নিহত হয়। তাকে সঙ্গী করা হবে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্‌র। বিশ্বস্ত মজলিসে তাকে দান করা হবে রাজকীয় আসন। আর সে সন্নিধান পাবে আল্লাহ্‌র। ৩. ওই জন, যে তার জান-মাল নিয়ে পুণ্য অর্জনার্থে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয় এই মনোভাব নিয়ে যে, প্রথমে শত্রুনিধন করবে, তারপর নিহত হবে নিজে। এরকম শহীদ যারা, তারা মহাবিচারের দিবসে উপস্থিত হবে তাদের কাঁধের উপর তলোয়ারের ঝনঝৎকার শব্দ তুলে। লোক সকল উপবিষ্ট থাকবে নতজানু হয়ে। তখন সে তেজস্বী কণ্ঠে বলবে, আমি আল্লাহ্‌র পথে রক্ত ও সম্পদ দিয়েছি। সুতরাং আমার জন্য সুপ্রশস্ত জায়গা ছেড়ে দাও। এরপর সকল শহীদ মিলে আরশের নিচে উপস্থিত হবে এবং উপবেশন করবে নূরের মিম্বরে। নিশ্চিন্তে অবলোকন করতে থাকবে অন্যদের বিচার। কোনো ভয়ভীতি তাদের থাকবে না। মৃত্যুচিন্তা, শাস্তির আশংকা, ইসরাফিলের শিঙ্গাধ্বনি, মীযান, হিসাব, পুলসিরাত কোনো কিছুই তাদেরকে দুশ্চিন্তিত করতে পারবে না এতোটুকুও। তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। কবুল করা হবে প্রার্থনা। তাদেরকে থাকতে দেওয়া হবে তাদের পছন্দমতো স্থানে জান্নাতের যে কোনো জায়গায়।

ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনায় এসেছে, কাতাদা বলেছেন, আমার কাছে এই সংবাদটি পৌঁছেছে যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে উহুদ যুদ্ধের সময়, যখন মুসলমানদের অনেকেই শহীদ হয়েছিলেন এবং শত্রুদের অর্তকিত আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলো মুসলিম সেনারা, আর মুশরিকেরা বিজয়ের আনন্দে চীৎকার করে বলতে শুরু করেছিলো 'হুবল দেবতার জয়' 'হুবল দেবতার জয়'। মুসলমানেরা তাদের হতোদ্যমতা তাৎক্ষণিকভাবে কাটিয়ে উঠে জবাব দিয়েছিলো আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ। তারা বলেছিলো, আমাদের উজ্জা দেবী রয়েছে, তোমাদের কোনো উজ্জা নেই। রসুল স. তখন তাঁর সাহাবীগণকে বলেছিলেন, তোমরা বলো আল্লাহ্ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— 'তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন'। একথার অর্থ— আল্লাহ্ তাদেরকে পৃথিবীতে সৎপথে পরিচালিত করবেন এবং পরকালে দান করবেন সমুচ্চ মর্যাদা। আর ইহ-পরকাল উভয় স্থানে তাদেরকে রাখবেন উত্তম অবস্থায়। পৃথিবীর উত্তমতা এই হবে যে, যে সকল ধর্মযোদ্ধা শহীদ হয়নি, তাদেরকে করা হবে শহীদগণের তালিকাভূত এবং শাহাদতের পুণ্যও দেওয়া হবে তাদেরকে। কেননা

তারাও শহীদ হওয়ার ইচ্ছা নিয়েই গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলো। শেষে এমন হবে যে, যারা শহীদ হয়েছিলো এবং যারা তা হয়নি, তাদের উভয়ের পাপসমূহ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের পুণ্যকর্মসমূহকে কবুল করে নিবেন। আর তাদের উপর যদি কারো দাবি দাওয়া থাকে তবে আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ উদ্যোগে পুণ্য ও প্রতিদান দিয়ে রাজী করাবেন।

আবু নাঈম তাঁর 'হুলিয়া' পুস্তকে হজরত সহল ইবনে সা'দ সূত্রে, বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে এবং বায্যার হজরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচারের দিবসে তিন ধরনের লোকের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্ তাদের ঋণ পরিশোধ করবেন— ১. ওই ব্যক্তি যে আশংকা করে শত্রুরা মুসলিম দেশে আক্রমণ করবে, এমতাবস্থায় অস্ত্র ক্রয় করার সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও যে ঋণ করে অস্ত্র কিনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে, তারপর ঋণ পরিশোধ করার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে। আল্লাহ্ তার ঋণ পরিশোধ করবেন নিজে। ২. ওই ব্যক্তি, যে তার মৃত ভ্রাতার কাফন ঋণ করে কেনার পর ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য লাভের আগেই মৃত্যুরবণ করে, তাঁর ঋণও শোধ করে দিবেন আল্লাহ্ এবং ৩. ওই লোক, যে ব্যভিচারের ভয়ে ঋণ করে বিবাহ করে, কিন্তু মরে যায় ঋণ শোধ হওয়ার আগেই, তার ঋণও পরিশোধ করবেন আল্লাহ্ স্বয়ং।

উত্তম সূত্রপরম্পরায় তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' পুস্তকে লিখেছেন, রসুল স. বলেছেন, মহাবিচার দিবসের বিচারপর্ব শেষ হওয়ার পর যখন জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়ে যাবে, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! পরস্পরের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে আপোষ করে নাও। তোমাদের দাবি দাওয়া সম্পর্কিত প্রতিদান রয়েছে এখন আল্লাহ্‌র দায়িত্বে।

এরপরের আয়াতে (৬) বলা হয়েছে— 'তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন'।

জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে কোনো পথপ্রদর্শক ছাড়াই। তাদের আবাসভবনগুলোই তাদেরকে যেনো হাতছানি দিয়ে ডাকবে। যখন তারা আপন আপন এলাকায় প্রবেশ করে, তখন তাদের মনে হবে, এখানে তারা জন্মের পর থেকেই বসবাস করে আসছে। পৃথিবীবাসীরা যেমন পথ প্রদর্শক ছাড়াই নিজ বাড়িতে পরিবার পরিজন ও দাস-দাসীদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সকলকেই মনে হয় ঘনিষ্ট ও পরিচিত, তার চেয়েও অধিক ঘনিষ্ট ও চেনা মনে হবে তাদের বেহেশতের বসতবাটি, হুর ও পরিচারকগণকে। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার জান্নাতে দাখেল হওয়ার বিষয়ে এরকমই বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যিনি আমাকে সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ! দুনিয়াতে তোমরা নিজেদের স্ত্রী ও পরিজনবর্গের নিকটে ততোবেশী পরিচিত নও, যতো বেশী পরিচিত একজন জান্নাতবাসী তাদের সেখানকার সঙ্গিনী ও স্বজন সম্পর্কে। একটি দীর্ঘ হাদিসের

সূত্রে ইবনে যোবায়ের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আল বাআ'ছ' পুস্তকে। আরো বর্ণনা করেছেন তিবরানী, আবুল আলিয়া প্রমুখ।

সূরা মুহম্মাদ ঃ আয়াত ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

❑ হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।

❑ যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

❑ ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপসন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ উহাদের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিবেন।

❑ উহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং দেখে নাই উহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছে? আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং কাফিরদের জন্য রহিয়াছে অনুরূপ পরিণাম।

❑ ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তো মু'মিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের তো কোন অভিভাবকই নাই।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং ইসলামে তোমাদের অবস্থানকে করবেন অধিকতর সুদৃঢ়।

পরের আয়াতে (৮) বলা হয়েছে— 'যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন'।

এখানে 'ফাতা'সাল্ লাহুম' অর্থ তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। হজরত ইবনে আব্বাস কথাটির অর্থ করেছেন— তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে অনেক দূরে। আবুল আলিয়া বলেছেন, 'তা'সান' অর্থ পরাজিত, পতিত। জুহাক অর্থ করেছেন— ব্যর্থতা,

অকৃতকার্যতা। ইবনে জায়েদ বলেছেন, এর অর্থ বিক্ষিপ্ত, বিস্রস্ত, পরাজিত। ফাররা বলেছেন, শব্দটি ক্রিয়ামূল এবং এই বাক্য প্রার্থনামূলক। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এর অর্থ পৃথিবীতে হোঁচট খাওয়া এবং পরকালে দোজখে পতিত হওয়া। যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তাকে সাধারণতঃ কেউ ওঠাতে চায় না। একেই বলে 'তা'সান'। কামুস অভিধানে বলা হয়েছে, শব্দটির অর্থ বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া, হোঁচট খাওয়া, পতিত হওয়া, পাপমগ্ন হওয়া, দূরে সরে যাওয়া। আর এখানকার 'আদ্বল্লা আ'মালাহুম' অর্থ তিনি তাদের কর্ম বা অর্জন ব্যর্থ করে দিবেন।

এরপরের আয়াতে (৯) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন'। একথার অর্থ— তারা দুর্ভোগকবলিত ও অসফল হবে একারণে যে, তারা কোরআন পছন্দ করে না। এর কারণ হচ্ছে, এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র আনুরূপ্যহীন এককত্বসমৃদ্ধ বিশুদ্ধ বিশ্বাসের কথা, রয়েছে এমন আদেশ-নিষেধ, যা তাদের অপবিত্র ও স্থূল কামনা বাসনার বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, আগের আয়াতে বলা হয়েছে 'তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন' আর এখানে বলা হলো 'আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন'। পুনঃপুনঃ একথা উল্লেখ করায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি অনিবার্য।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম (১০)। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ তো মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফেরদের তো কোনো অভিভাবক নেই' (১১)।

এখানে 'তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি' অর্থ মক্কার অংশীবাদীরা কি বিদেশ ভ্রমণ করেনি? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। এর যোগ রয়েছে একটি অনুক্ত বক্তব্যের সঙ্গে। ওই অনুক্ততাসহ কথাটি দাঁড়ায়— তারা কি কখনো ঘর থেকে বের হয়নি, ভ্রমণ করেনি কি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে? 'দাম্মারল্লহু আ'লাইহিম' অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। 'কাফেরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম' অর্থ আগের যুগের সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের যে দুর্দশা হয়েছিলো, তার চেয়ে অধিক দুর্দশাগ্রস্ত হবে মক্কার সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা। 'বি আন্নাল্লহা মাওলাল্ লাজীনা আমানূ' অর্থ আল্লাহ্ তো বিশ্বাসীদের অভিভাবক। আর 'আন্নাল কাফিরীনা লা মাওলা লাহুম' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের তো কোনো অভিভাবকই নেই। উল্লেখ্য, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক বলেই বিশ্বাসীরা ইসলামের উপরে দৃঢ়পদে থাকতে পারে। বেঁচে থাকতে পারে শয়তানের প্ররোচনা থেকে। যেমন এক আয়াতে শয়তানকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোমার কোনো প্রভাব খাটবে না'।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ১২, ১৩, ১৪, ১৫

❑ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যাহারা কুফরী করে উহারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে; আর জাহান্নামই উহাদের নিবাস।

❑ উহারা তোমার যে জনপদ হইতে তোমাকে বিতাড়িত করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং উহাদিগকে সাহায্যকারী কেহ ছিল না।

❑ যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তাহার ন্যায় যাহার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?

❑ মুত্তাকীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্তঃ উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেথায় উহাদের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল আর তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ

হইতে ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাহাদের ন্যায় যাহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে এবং যাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি যাহা উহাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে?

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— 'নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং পুণ্যকর্ম করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতের এমন উদ্যানবিশিষ্ট আবাস দান করবেন, যার পাদদেশে রয়েছে বহমান নদী। আর অবিশ্বাসীদের পরিণতি হবে ঠিক এর বিপরীত। তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশনে। কেননা তারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে, ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকে এবং উদরপূর্তি করে চতুস্পদ জন্তুদের মতো।

এখানে 'ইয়াতামাত্তাউ'না' অর্থ ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে। 'কামা তা'কুলুল আনআ'ম' অর্থ জন্তু-জানোয়ারের মতো উদরপুর্তি করে। আর 'মাছওয়ান' অর্থ নিবাস, আবাস, বাসস্থান।

পরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'তারা তোমার যে জনপদ থেকে তোমাকে বিতাড়িত করেছে, তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কতো জনপদ ছিলো; আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্যকারী কেউ ছিলো না'।

মক্কার পৌত্তলিকেরা রসুল স.কে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। এক সময় তাদের অত্যাচার এমন চরমে পৌঁছে যায় যে, তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। হিজরত করে চলে যান মদীনায়। সেকারণেই আলোচ্য আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে 'তারা তোমার যে জনপদ থেকে তোমাকে বিতাড়িত করেছে'।

'কা আয়্যিম্ মিন ক্বরইয়াতিন হিয়া আশাদ্দু কুওওয়াতান' অর্থ তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কতো জনপদ ছিলো। এখানে 'ক্বরইয়াতি' অর্থ জনপদের অধিবাসী। এখানে সম্বন্ধ পদকে লোপ করা হয়েছে এবং সম্বন্ধ পদের বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে সম্বন্ধকৃতের উপর। এভাবে অর্থ দাঁড়িয়েছে— মক্কার পৌত্তলিকদের চেয়েও ওই সকল জনপদের অধিবাসীরা অধিক শক্তিশালী ছিলো। যেমন আ'দ, ছামুদ, সাদুমবাসী প্রভৃতি। 'আহ্লাকনাহুম' অর্থ আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি। আর 'ফালা নাসিরা লাহুম' অর্থ তাদেরকে সাহায্যকারী কেউ ছিলো না।

আবু ইয়ালা সূত্রে বাগবী বর্ণনা করেছেন, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, গভীর নিশিথে যখন রসুল স. মক্কা ত্যাগ করে ছওর গুহার দিকে যাত্রা করলেন, তখন পুনঃপুনঃ কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন, হে আমার জন্মভূমি! তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সকল শহরের চেয়ে অধিক প্রিয়। পৌত্তলিকেরা বাধ্য না করলে আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতাম না। তাঁর এমতো বিলাপের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার ন্যায়, যার নিকট নিজের মন্দকর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে'।

এখানে 'সে কি তার ন্যায়' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। অর্থাৎ বর্ণিত দল দু'টো কখনো একরকম হতে পারে না। কেননা বিশ্বাসীদের অভিভাবক আল্লাহ্ এবং অবিশ্বাসীরা অভিভাবকহীন। বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং অবিশ্বাসীরা প্রতিষ্ঠিত কুপ্রবৃত্তিজাত বাসনা কামনার উপর। সে কারণেই তাদের চোখে তাদের নিজেদের কর্মাবলীকেই সুন্দর বলে মনে হয়। সুতরাং কস্মিনকালেও এই দু'টো দল সম্মিলিত হতে পারে না।

এখানে 'বাইয়্যিনাত' অর্থ সুস্পষ্ট প্রমাণ— প্রত্যাদেশাগত, পরম্পরাগত, অথবা শুভ বুদ্ধিসম্ভূত, যেরকমই হোক না কেনো। 'যার নিকট মন্দকর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয়' অর্থ যার কাছে মূর্তিপূজা ও অন্যান্য অশ্লীল কর্ম সুন্দর বলে মনে হয় প্রবৃত্তি অথবা শয়তানের প্ররোচনায়। আর 'যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে' অর্থ যারা ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ এবং সত্য-অসত্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না। জীবন যাপন করে মন যেভাবে চায়, সেভাবে।

এরপরের আয়াতে (১৫) বলা হয়েছে— 'মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত, তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর'।

এখানে 'মাছালুল জ্বান্নাতি' অর্থ জান্নাতের দৃষ্টান্ত বা বেহেশতের বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। বাক্যটি এখানে উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় রয়েছে উহ্য। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়ায়— ইতোপূর্বে বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এখন উপস্থাপন করা হয়েছে সেই জান্নাতের বিবরণ।

পৃথিবীতে পানি, দুধ, মধু কোথাও বেশীদিন আবদ্ধ করে রাখলে তা দূষিত হয়ে পড়ে এবং হয়ে যায় পানের অযোগ্য। কিন্তু বেহেশতের পানি ও দুধের নহর কখনোই সেরকম হবে না। সব সময় থাকবে পবিত্র, নির্মল ও সুস্বাদু। সুরা ও মধুর নহরগুলোর অবস্থাও হবে সেরকমই। তাই এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে— বেহেশতে আছে এমন পানি, দুধ ও মধুর নহর যেগুলো থাকবে সতত নির্মল। অর্থাৎ সেখানকার পানি, দুধ, সুরা ও মধু হবে অত্যন্ত স্বাদবিশিষ্ট, সুস্বাদু ও পরিশোধিত।

এখানকার ‘লাজ্‌জাতিন’ হচ্ছে উপমিত বিশেষণ। তাই ‘লাজিজ’ অর্থ দাঁড়ায় স্বাদু বা সুস্বাদু। এর পুংলিঙ্গ হচ্ছে ‘লাজ্জুন’। অথবা ক্রিয়ামূল এবং সম্বন্ধপদ রয়েছে উহ্য। এভাবে শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় স্বাদবিশিষ্ট, আনন্দদায়ক। অর্থাৎ স্বাদে গন্ধে ভরপুর। উল্লেখ্য, বেহেশতের সুরা হবে পবিত্র ও চিত্তপ্রফুল্লকর, পৃথিবীর সুরার মতো অপবিত্র, ক্ষতিকর ও মত্ততা আনয়নকারী নয়।

‘আসালিম্ মুসাফ্‌ফা’ অর্থ পরিশোধিত মধু, যাতে থাকবে না মৃত মৌমাছি, মোম অথবা অন্য কোনো কিছুর গন্ধ অথবা মিশ্রণ। হজরত মুয়াবিয়া ইবনে হিদাহ্ বলেছেন, আমি নিজে রসুল স.কে বলতে শুনেছি, বেহেশতে রয়েছে পানি, দুধ,

সুরা ও মধুর দরিয়া। তিরমিজি, বায়যাবী। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জান্নাতের নহরগুলো হবে মেশকের সুরভিযুক্ত এবং সেগুলো প্রবাহিত হবে সেখানকার পর্বতমালা ভেদ করে। ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী, তিবরানী, ইবনে আবী হাতেম। মাসরুক বলেছেন, জান্নাতের নদীগুলো গর্ত বা নালা দিয়ে প্রবাহিত হবে না, প্রবাহিত হবে সমতল ভূমির উপর দিয়ে। ইবনে মোবারক, বায়হাকী।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমরা ভাববে জান্নাতের নদীগুলো খাদে প্রবাহিত। আসলে তা নয়। আল্লাহ্‌র শপথ! ওই নদীগুলো প্রবাহিত হবে সমতলভূমির উপর দিয়ে। ওগুলোর দু'পাশে থাকবে মোতির তাঁবু এবং সেখানকার মাটি হবে মেশকের সুরভিসংযুক্ত।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সিহুন, জিহুন, নীল ও ফোরাত নদী বেহেশত থেকেই এসেছে। মুসলিম। হজরত আমর ইবনে আউফ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, চারটি নদী এসেছে জান্নাত থেকে— নীল, ফোরাত, জিহুন ও সিহুন। আর চারটি পাহাড় হচ্ছে জান্নাতের পাহাড়— উহুদ, তুর, লবনান ও উরকান। হজরত কা'ব আহবার বলেছেন, জান্নাতের নীল হচ্ছে মধুর নহর, দজলা দুধের, ফোরাত সুরার এবং সিহুন পানির। বায়হাকী। কা'ব আহবারের এমতো বিবৃতি উল্লেখ করার পর বাগবী মন্তব্য করেছেন, জান্নাতের সব কয়টি নহর কাওসার থেকে প্রবহমান।

এরপর বলা হয়েছে— ‘এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিভিন্ন ফলমূল, আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা’।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, দুনিয়ায় এমন কোনো ফল নেই যা জান্নাতে পাওয়া যাবে না— তিক্ত-মিষ্ট যেরকমই হোকনা কেনো। এমনকি মাকাল ফলও সেখানে পাওয়া যাবে। ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মুনজির। তিনি আরো বলেছেন, পৃথিবীতে রয়েছে কেবল জান্নাতের ফলগুলোর নাম। এখানকার বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ কোনোটাই সেখানকার ফলের বর্ণ-গন্ধ-স্বাদের মতো নয়। হজরত সওবান বলেছেন, আমি রসুল স.কে বলতে শুনেছি, জান্নাতবাসীরা সেখানকার কোনো গাছ থেকে ফল পেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেখা দিবে নতুন ফল।

‘ওয়া মাগফিরাতুম্ মির রব্বিহিম’ অর্থ আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের উপর আর কখনো অপরিতুষ্ট হবেন না। এরকম কখনোই হবে না যে, তিনি কখনো পরিতুষ্ট হবেন, আবার কখনো হবেন অপরিতুষ্ট।

এরপর বলা হয়েছে— ‘মুত্তাক্বীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিবে’।

এখানে ‘যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে’ কথাটি একটি উহ্য উদ্দেশ্যের বিধেয়। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— চিরকাল যে জান্নাতে থাকবে, সে কি এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে চিরকাল থাকবে জাহান্নামে। এখানে ‘কামান হুয়া’ শাব্দিক দিক দিয়ে, বা শব্দ হিসেবে একবচন। সেকারণেই ‘হুয়া’ (সে) সর্বনামটি একবচন শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে ‘মান’ হচ্ছে বহুবচন। সেজন্যই ‘সুকু’ এর সর্বনাম আনা হয়েছে বহুবচনে। আর এখানকার ‘যা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে’ অর্থ ফুটন্ত পানি পান করার ফলে তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে বের হয়ে যাবে পায়ুপথ দিয়ে।

ইবনে জুরাইজ সূত্রে ইবনে মুনজির বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সকাশে মুমিন-মুনাফিক সকলেই সমবেত হতো। মুমিনেরা তাঁর কথা শুনতো খুব মনোযোগের সঙ্গে এবং মুনাফিকেরা হয়ে যেতো অমনোযোগী। তাই তারা রসুল স. এর বক্তব্য মনে রাখতে পারতো না। পরে তারা মুমিনগণকে জিজ্ঞেস করতো, আজ কী বিষয়ে যেনো আলোচনা হলো? এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে নিম্নের আয়াত। বলা হয়েছে—

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ১৬, ১৭, ১৮, ১৯

❑ উহাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাহারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাহাদিগকে বলে, 'এইমাত্র সে কী বলিল?' ইহাদের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে।

❑ যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাহাদের সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে মুত্তাকী হইবার শক্তিদান করেন।

❑ উহারা কি কেবল এইজন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত উহাদের নিকট আসিয়া পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে। কিয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া!

❑ সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! কিছুসংখ্যক লোক এরকম ঃ যারা আপনার মজলিশে বলে আপনার কথা শোনে, তারপর বাইরে গিয়ে আপনার খাঁটি সহচরবর্গকে বসে, একটু আগে কী বিষয়ে যেনো আলোচনা হলো? মনে রাখবেন, ওই লোকগুলো কপটাচারী। আল্লাহ্ তাদের হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তারা অনুসরণ করে তাদের কুপ্রবৃত্তিজাত কামনা বাসনার।

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। তারা রসুল স, এর পবিত্র সান্নিধ্যে বসে তাঁর বক্তব্য শুনতো বটে, কিন্তু প্রদর্শন করতো প্রচ্ছন্ন উন্নাসিকতা এবং অবহেলা। তাই তারা ইচ্ছে করেই রসুল স. এর কথা মনে রাখতো না। অথবা তারা তাদের খেয়াল-খুশী মতো রসুল স. এর কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতো না।

এখানে 'আনিফা' অর্থ এইমাত্র, এখনই, 'আনিফা শাইউন' অর্থ কোনোকিছুর অগ্রাংশ। নাসিকাকে 'আন্‌ফ্' বলা হয় একারণেই। উল্লেখ্য, মুনাফিকদের 'এইমাত্র সে কী বললো' এরকম বলতো জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, বরং এরকম বলতো তারা উপহাসার্থে।

পরের আয়াতে (১৭) বলা হয়েছে— 'যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলবার শক্তিবৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাক্বী হবার শক্তিদান করেন'। এ কথার অর্থ— যারা সঠিক পথে থাকে আল্লাহ্ তাদেরকে সঠিক পথে চলবার শক্তি বাড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌ভীরু বা সাবধানী হবার সামর্থ্য দান করেন।

এখানে 'মুত্তাক্বী হবার শক্তিদান করেন' অর্থ তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেন দোজখ থেকে মুক্ত থাকার উপায়সমূহ। সাঈদ ইবনে যোবায়ের কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তাদেরকে দান করেন তাদের সৎকর্ম ও সতর্কতার পুরস্কার।

এরপরের আয়াতে (১৮) বলা হয়েছে— 'তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে! কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে'?

এখানে 'তারা কি কেবল এজন্য অপেক্ষা করছে' প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর এখানে 'তারা বলে' বুঝানো হয়েছে মক্কার পৌত্তলিকদেরকে, যারা কিয়ামত বিশ্বাস করতো না। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— মক্কার পৌত্তলিকেরা কিয়ামত

বিশ্বাস করে না। তাই বার বার প্রশ্ন করে, কিয়ামত কখন আসবে? হে আমার রসুল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, কিয়ামত চাক্ষুষ করলে কি তোমরা ইমান আনবে? কিন্তু তখন তো ইমান আনলেও তো কোনো লাভ হবে না। কেননা তখন বন্ধ হয়ে যাবে তওবার তোরণ। আর তখন আনুগত্য করার অবকাশও তো তোমরা পাবে না। তওবা করার সময় তো এখনই। এখনো সময় আছে, সাবধান হও। কারণ কিয়ামতের লক্ষণসমূহের মধ্যে কিছু কিছু তো ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়েছেই, অন্যগুলোও প্রকাশের বিলম্ব আর নেই।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক অপেক্ষা করতে থাকে এমন বিত্তশালী হবার যা উদ্ধত করে দেয়, এমন দারিদ্রের, যা অত্যাবশ্যক ধর্মীয় কর্তব্যাবলীকে ভুলিয়ে দেয়, এমন পীড়ার, যা সমস্ত স্বস্তিকে বিলোপ করে দেয়, এমন বার্ধক্যের, যা করে দেয় মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন, এমন মৃত্যুর, যা সতত প্রস্তুত, অথবা অপেক্ষা কর দাজ্জালের, সে এমনই নিকৃষ্ট, যে এখনো অদৃশ্য এবং অপেক্ষা করে কিয়ামতের। আর কিয়ামত হচ্ছে কঠিন বিস্বাদ ও বিপদ।

'কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে' অর্থ কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ তো এসেই পড়েছে প্রায়। অর্থাৎ কিছু লক্ষণ তো প্রকাশিত হয়েছেই। অন্য লক্ষণগুলোও প্রকাশ পাওয়ার পথে। প্রকাশিত লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে চন্দ্রদ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং রসুল স. এর মহাআবির্ভাব ও ধুম্র। যেমন আল্লাহ্ বলেন 'কিয়ামত নিকটে এসে পড়েছে এবং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে'। আবার হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে মুসলিম ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. তাঁর হাতের তর্জনী ও আঙটিপরিহিত মধ্যমা আঙুল একত্র করে বললেন, আমার আবির্ভাব ও কিয়ামত এরকম, পাশাপাশি। হজরত আনাস থেকে আহমদ, ইবনে মাজা এবং তিরমিজিও এরকম হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এমন একটি হাদিস তোমাদের কাছে বর্ণনা করবো, যা আমি ব্যতীত আর কেউ বলবে না। আমি স্বয়ং রসুল স.কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্ব আলামত হচ্ছে এগুলো— জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হবে, অজ্ঞতার বিস্তার ঘটবে, বেড়ে যাবে ব্যভিচারী ও মদ্যপদের সংখ্যা, নারীরা সংখ্যায় বেড়ে যাবে, আর কমতে থাকবে পুরুষদের সংখ্যা, এমন কী তাদের অনুপাত দাঁড়াবে পঞ্চাশ জনে একজন। অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, জ্ঞান কমে যাবে, বেড়ে যাবে অজ্ঞতা। বোখারী মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, একবার এক বেদুইন রসুল স.কে জিজ্ঞেস করলো, কিয়ামত কখন আসবে? তিনি স. বললেন, যখন আমানতের খেয়ানত করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষায় থেকো। লোকটি বললো, আমানত খেয়ানত করা হবে কীভাবে? তিনি স. জবাব দিলেন, রাষ্ট্রীয় শাসনাধিকার চলে যাবে অযোগ্যদের হাতে। বোখারী।

হজরত আবু হোরায়রা আরো বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যখন গণিমতের মালকে স্বীয় সম্পদ, আমানতকে প্রাপ্য এবং জাকাতকে জরিমানা

সাব্যস্ত করা হবে, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা হবে পার্থিব উদ্দেশ্যে, পুরুষেরা হবে মায়ের অবাধ্য ও স্ত্রীর বাধ্য, মানুষ বন্ধুকে ভাববে আপন পিতার চেয়ে অধিক সুহৃদ, মসজিদে শুরু হবে শোরগোল, জাতির নেতা হবে ফাসেক লোকেরা এবং শাসক হবে সে, যে সবচেয়ে অধম, সম্মান করা হবে কেবল তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার্থে, বেড়ে যাবে গান-বাজনা, মদ্যপান, নিন্দা-মন্দ করতে থাকবে পরবর্তীরা তাদের পূর্ববর্তীদেরকে— তখন তোমরা অপেক্ষা কোরো লাল ঝঞ্ঝার, ভূমিকম্পের, ভূমিধসের, চেহারা বিকৃত হওয়ার এবং প্রস্তরবৃষ্টির। তখন এমন ভাবে এই ঘটনাগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে যে, মনে হবে সূত্রবিচ্ছিন্ন তসবী থেকে যেনো একের পর এক ছিঁড়ে পড়ছে তসবীদানা। তিরমিজি।

হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত যখন পনেরটি অপকর্মে লিপ্ত হবে, তখন তাদের উপরে নেমে আসবে মহাবিপদ। এরপর তিনি একে একে সবগুলোর কথা জানিয়ে দিলেন। তার মধ্যে ছিলো এই কথাগুলোও— ধর্মপরায়ণ হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অর্জন করা হবে ধর্মীয় জ্ঞান, বন্ধুরা হবে পিতা অপেক্ষা অধিক প্রিয়ভাজন, মদ্যপানের প্রসার ঘটবে, প্রচলন ঘটবে রেশমী বস্ত্রের। তিরমিজি।

এরপরের আয়াতে (১৯) বলা হয়েছে— 'সুতরাং জেনে রাখো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, ক্ষমাপ্রার্থনা করো তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! এই চির অক্ষয় ও সত্যটিকে কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া সমীচীন নয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্যই নেই। সুতরাং দাসত্বের আনুকূল্য রক্ষার্থে মার্জনা প্রার্থনা করুন নিজের জন্য এবং পাপমার্জনার জন্য প্রার্থনা করুন আপনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুগামী ও অনুগামিনীদের জন্য, যারা বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাই সকলের প্রকাশ্য গোপন সকল প্রকার গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত।

এখানে 'ফা'লামু' (জেনে রাখো) কথাটির 'ফা' হচ্ছে নৈমিত্তিক অব্যয়। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আপনি যখন জেনে গেলেন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ফলাফল, তখন আপনি আল্লাহ্র এককত্ব সম্পর্কীয় জ্ঞান ও প্রবৃত্তির

সংশোধায়ন এবং তদনুযায়ী তা পালন করার জ্ঞানের উপরেই অটল থাকুন; পরকালে এই জ্ঞানই আপনার অশেষ উপকারে আসবে।

'ওয়াস্তাগফির লিজাম্বিকা' অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করো নিজের জন্য। উল্লেখ্য, অন্যান্য নবীর মতো রসুল স.ও নিষ্পাপ, বরং তিনি নিষ্পাপশ্রেষ্ঠ। তবুও এখানে এমন করে বলা হয়েছে এই কারণে যে, তিনি স.ও সম্ভাব্যের বৃত্তের (দায়রায়ে ইমকানের) অন্তর্ভূত। মহিমময় আল্লাহ্পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদার যথাযোগ্য ইবাদত বান্দাদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। কিছুনা কিছু অপূর্ণতা থেকেই যায়। এজন্যই রসুল স.কে আদেশ করা হয়েছে নিজেকে যথাযোগ্য ইবাদতের অযোগ্য মনে করে

তাঁর সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হতে। অর্থাৎ সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ হলেও তিনি সৃষ্টি, স্রষ্টা কদাচ নন। তাই আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চমর্যাদার তুলনায় তাঁর নিজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া নিতান্তই শোভন। কেননা তিনিও আল্লাহ্র বান্দা। আর আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার মধ্যেই রয়েছে তাঁর দাসগুণের সম্মান। এরকম শ্রেষ্ঠ ক্ষমাপ্রার্থী যিনি, তার পক্ষেই কেবল সম্ভব ও শোভন অন্যের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। তাই এখানে পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য'। অর্থাৎ বিশ্বাসবান ও বিশ্বাসবতীদের ত্রুটির জন্যও আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা আপনি তাদের সকল শুভকর্মের শিক্ষাদাতাও বটে। এভাবে ব্যাখ্যা করলে একথাটিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রসুল স.কে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে মূলতঃ তাঁর উম্মতকে শিক্ষা প্রদানার্থে। উল্লেখ্য, যিনি আল্লাহ্র প্রকৃত বান্দা, তাঁর কাছে নির্দেশ পালন করাই দাসত্বের মূল দাবি। তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সর্বোচ্চ সৌভাগ্য। তাই আল্লাহ্র প্রিয়তম হওয়া সত্ত্বেও রসুল স. এ নির্দেশ মেনে নিয়েছেন নির্দ্বিধায়। কেননা তিনি যে অন্য কারো মতো নন। তিনি যে দাস হিসেবেও অতুলনীয়। 'আ'বদুহু ওয়া রসুলুহু' কথাটির মর্মার্থও তাই। সেকারণেই রসুল স. এমনও বলেছেন যে, আমার হৃদয়ও তমসাচ্ছন্ন হয় এবং আমিও প্রতিদিন সত্তর বার আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করে থাকি। মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ, নাসাঈ।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'র পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা এবং আল্লাহ্ সকাশে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া তোমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা ইবলিস বলে, আমি পাপকর্ম দ্বারা মানুষকে ধ্বংস করি, আর তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্' ও ক্ষমাপ্রার্থনা দ্বারা আমাকে ধ্বংস করে। আমি তখন অন্য বুদ্ধি আঁটলাম। তাদের হৃদয়ে জাগিয়ে দিলাম কামনা-বাসনা । তারা তখন নিজেদেরকে সৎপথপ্রাপ্ত বলেই মনে করতে লাগলো (ক্ষমাপ্রার্থনার প্রয়োজন আর বোধ করলো না)।

হজরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্র পুত্র ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত তালহাকে চিন্তিত দেখে হজরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোমার? হজরত তালহা বললেন, আমি একবার রসুল স.কে বলতে শুনেছিলাম, আমি এমন একটি কথা জানি, যা মৃত্যুকালে পাঠ করলে মৃত্যুকষ্ট লাঘব হয় এবং মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির মুখোমণ্ডল হয়ে উঠে উজ্জ্বল। কথাটি কী তা আমি তখন জিজ্ঞেস করিনি। ভেবেছিলাম পরে কখনো জেনে নিবো। কিন্তু সে সুযোগ আমি পাইনি। তার আগেই তিনি স. এর মহাপ্রস্থান ঘটেছে। হজরত ওমর বললেন, আমি জানি কথাটি কী? রসুল স. বলেছেন, এই বাক্যটির চেয়ে অন্য কোনো বাক্যই শ্রেষ্ঠ নয়। তিনি স. তাঁর প্রিয় পিতৃব্য আবু তালেবকে তাঁর পরলোকগমনের সময় এই বাক্যটিই উচ্চারণ করতে বলেছিলেন। বাক্যটি হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্'। হজরত তালহা একথা শুনে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। হজরত ওসমান বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা

ইলাহা ইল্লাল্লহ্' এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে মরবে সে জান্নাতে যাবে (শুরুতেই, অথবা পাপ মোচনের পর)। আমি বলি, হৃদয় তমসাচ্ছন্ন হওয়ার অর্থ প্রবৃত্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। সুফী সাধকগণ তাই নিজেদের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বজ সকল কিছুই আল্লাহ্কে সমর্পণ করেন। ফলে আসক্ত হয়ে ওঠেন আল্লাহ্র আলোর ঔজ্জ্বল্যের।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি একবার বললেন, যে ব্যক্তি নিজেকে ফিরিঙ্গি কাফেরের চেয়ে উত্তম ভাবে, তার জন্য আল্লাহ্র মারেফত নিষিদ্ধ। প্রশ্ন করা হলো, তা কী করে সম্ভব? সুফীগণ তো কমপক্ষে নিজেকে খাঁটি ইমানদার বলে জানবে এবং কাফেরকেও জানবে নিশ্চিত কাফের বলে। কুফরীর উপরে তো ইমানের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। জবাবে তিনি বললেন, সম্ভাবনার অন্ধকার থেকে কোনো সম্ভাব্য বিষয়ই মুক্ত নয়। অস্তিত্ব ও অস্তিত্বজ নূর তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঋণরূপে প্রাপ্ত এবং তা হচ্ছে আমানত, যার সম্পর্কে এক আয়াতে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেনো প্রাপকের প্রাপ্য আমানত তার নিকটে সমর্পণ করো'। সুফীগণ তো এই নির্দেশটিই পালন করেন। তাঁরা তাই জানেন যে, শুভ ও পবিত্র যা তার সকল কিছুই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত। সুতরাং সকল কৃতিত্ব-গৌরব তাঁরই। আর তাঁদের নিজেদের সত্তাকে তারা মনে করেন সম্ভাব্যের বৃত্তভূত। তাই দেখতে পান, তার মতো নিকৃষ্ট আর কেউ নয়। এমনকি ফিরিঙ্গি কাফেরও নয়। এরকম আত্মপরিচিতি লাভ করা সহজ কথা নয়। বরং এটা হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের মারেফাত। আর এরকম মনোভাব ইমান-

কুফরের বৈপরীত্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়। অবশ্য যারা অপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ও উদাসীন, তারা নিজেদেরকেই উৎকর্ষাধিকারী বলে জানে। তাদের সত্তায় নীরবে সরবে উচ্চারিত হতে থাকে 'আনা খইরুম মিনহু' (আমি তার চেয়ে উত্তম)।

'ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত' অর্থ এবং মুমিন নর-নারীদের জন্য। অর্থাৎ হে আমার নবী! বিশ্বাসী-বিশ্বাসিনীদের পাপের জন্যও আপনি আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন এবং তাদেরকে এমন কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করুন, যা হতে পারে তাদের ক্ষমাপ্রাপ্তির নিমিত্ত। বাগবী লিখেছেন, এই উম্মত বড়ই সৌভাগ্যশালী। কেননা তাদের গোনাহ মাফের জন্য তাদের নবীকে আল্লাহ্ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন। রসুল স.ও এ নির্দেশ পালন করেছেন এবং একথা বলাই বাহুল্য যে, ইনশাআল্লাহ্ তার প্রার্থনা পৃথিবীতে কবুলও করা হয়েছে এবং পরকালেও কবুল করা হবে শাফায়াত আকারে।

'ওয়াল্লহু ইয়া'লামু মুতাক্বাল্লাবাকুম ওয়া মাছওয়াকুম' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন'। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'গতিবিধি' অর্থ পৃথিবীর অস্থায়ী প্রাপ্তির প্রতি ধাবিত হওয়া। আর 'অবস্থান' অর্থ পরকালীন অবস্থান— বেহেশত, অথবা দোজখ। মুকাতিল ও ইবনে জারীর বলেছেন, এখানে 'গতিবিধি' অর্থ দিবসের কর্মচাঞ্চল্য এবং

'অবস্থান' অর্থ নিশিথের শয্যাসুখ। ইকরামা বলেছেন, এখানে শব্দ দু'টোর অর্থ যথাক্রমে— পিতার পৃষ্ঠদেশ থেকে মাতৃউদরে গমন এবং পৃথিবীর জীবন যাপন। ইবনে কীসান বলেছেন, এখানে 'মুতাক্বল্লাব' (গতিবিধি) অর্থ পিতা থেকে মাতার গর্ভে আসা এবং 'মাছওয়া' (অবস্থান) অর্থ কবরে অবস্থান। এভাবে কথাটির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্র নিকটে গোপন বলে যখন কিছুই নেই তখন তোমরা সতর্ক হও, ভয় করো কেবল তাঁকেই।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮

❑ মু'মিনরা বলে, 'একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?' অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে যুদ্ধের কোন নির্দেশ থাকে তুমি দেখিবে

যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে। শোচনীয় পরিণাম উহাদের।

❑ আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য উহাদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইলে, যদি উহারা আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করিত তবে তাহাদের জন্য ইহা অবশ্যই মঙ্গলজনক হইত।

❑ তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে।

❑ আল্লাহ্ ইহাদিগকেই লা'নত করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন।

❑ তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ?

❑ যাহারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে, শয়তান উহাদের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।

❑ ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা যাহারা অপসন্দ করে তাহাদিগকে উহারা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করিব।' আল্লাহ্ উহাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।

❑ ফিরিশ্তারা যখন উহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে, তখন উহাদের দশা কেমন হইবে!

❑ ইহা এইজন্য যে, উহারা তাহার অনুসরণ করে, যাহা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁহার সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি ইহাদের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— জেহাদের জন্য বিশ্বাসীদের অন্তরে রয়েছে সুতীব্র আগ্রহ। তাই তারা বলে, নতুন একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেনো, যার মধ্যে থাকবে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ। তারপর যখন জেহাদের বিধান সম্পর্কিত নতুন কোনো প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন প্রকৃত বিশ্বাসীরা উৎফুল্ল হলেও বিষণ্ন হয় কপটাচারীরা। কেননা তাদের হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত। হে আমার রসুল! একটু ভালো করে দেখলেই আপনি চিনতে পারবেন তাদের। দেখবেন, তারা যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ পেয়ে মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষের মতো আপনার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। নিঃসন্দেহে ওই সকল মুনাফিকদের জন্য অপেক্ষা করছে শোচনীয় পরিণাম।

কাতাদা বলেছেন, যে সকল সুরায় জেহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, ওই সকল সুরা সুরক্ষিত ও অরহিত। আর জেহাদের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে তৎপূর্ববর্তী শান্তিসমঝোতাপ্রকাশক আয়াতগুলোকে রহিত করে দিয়ে। কিন্তু জেহাদের আয়াতগুলোর বিধান কার্যকর থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এই সকল আয়াত মুনাফিকদের কাছে সমগ্র কোরআন অপেক্ষা অধিক ভারী ও ভয়াবহ।

এখানে 'ফীকুলুবিহিম মারাদ্বুন' অর্থ তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে অর্থাৎ তারা দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ। আর 'ফাআওলা লাহুম' অর্থ তাদের জন্য উত্তম।

পরের আয়াতে (২১) বলা হয়েছে— 'আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য তাদের জন্য উত্তম ছিলো; সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে, যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করতো, তবে তাদের জন্য এটাই মঙ্গলজনক হতো'। একথার অর্থ— যখন জেহাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, তখন ওই সকল কপটাচারী যদি সাগ্রহে আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে যত্নবান হতো, তবে তা তাদের জন্য হতো হিতকর।

এখানে 'আ'যামাল আম্‌রু' অর্থ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এখানে কিছু কথা উহ্য রয়েছে। ওই উহ্যতাসহ কথাটি দাঁড়ায়— যাদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যখন যুদ্ধেযাত্রার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অথবা 'আ'যামা' অর্থ এখানে গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, অবশ্যকরণীয় হয়েছে। অর্থাৎ জেহাদ যখন সাব্যস্ত হয়েছে অবশ্যকর্তব্য বলে। 'ফালাও সাদাকুল্লহ্' অর্থ যদি তারা তাদের অঙ্গীকার পূরণ করতো। অর্থাৎ অপরিহার্যতা মনে প্রাণে সত্য বলে বিশ্বাস করতো। আর এখানকার 'লাকানা খইরল্লাহুম' (তবে তাদের জন্য এটা অবশ্যই মঙ্গলজনক হতো) কথাটি আগের বাক্যের ধারাবাহিকতা বা বিধেয়। কোনো কোনো তাফসীরকারের মত, শর্তের প্রতিফল এখানে রয়েছে উহ্য এবং এখানকার শেষ বাক্যটি খণ্ডিত। এভাবে পুরো বক্তব্যটি দাঁড়ায়— জেহাদ যখন অত্যাবশ্যক কর্তব্য বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, তখন তারা সত্যে পরিণত করে দেখায়নি তাদের কথা। এ সিদ্ধান্তকে তাদের কাছে মনে হয়েছে বিস্বাদ; কিন্তু তারা যদি এ সিদ্ধান্তকে কার্যকর করে দেখাতে পারতো, তা তাদের জন্য হতো কতোইনা কল্যাণকর।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে (২২)। আল্লাহ্ এদেরকেই লানত করেন, আর করেন বধির, দৃষ্টিহীন' (২৩)। একথার অর্থ— ওহে কাপুরুষ ভীরুর দল! যদি তোমরা রসুল স. এর অনুগত্য থেকে বিমুখ হও, তাহলে কি আমরা ধরে নিবো, দেশে তোমরা সৃষ্টি করবে ভয়ঙ্কর অনাসৃষ্টি। বিরোধ করতে থাকবে সংগ্রামী বিশ্বাসী স্বজনদের সাথে। প্রশ্নবোধকটি এখানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপক।

অর্থাৎ না তা হতেই পারে না। বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না দেশে। স্বজন বন্ধনও ছিন্ন করা যাবে না। সাবধান! তোমাদের যেনো কখনো এই ধারণার উদয় না হয় যে, তোমরা যা খুশী তাই করবে, ছিন্ন করবে স্বজনবন্ধন। যারা এরকম করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। তিনি তাদেরকে করেন সত্যশ্রবণ থেকে বধির এবং শুভদর্শন থেকে অন্ধ। অর্থাৎ ক্ষমতাসীনদের জন্য দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি ও স্বজনবন্ধন ছিন্ন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

হজরত বুরাইদা বলেছেন, আমি একবার খলিফা ওমরের কাছে বসেছিলাম। এমন সময় শোনা গেলো একটি চীৎকারের আওয়াজ। তিনি সচকিত হলেন।

বললেন, দ্যাখো তো, কে এরকম করে? ইয়ারফা বললো, এক বালিকার মাকে বিক্রয় করা হচ্ছে। তিনি বললেন, মুহাজির ও আনসারগণকে ডেকে আনো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক লোক সমবেত হলো। হজরত ওমর আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, তোমরা বলোতো দেখি, রসুল স. যা কিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে কি আত্মীয়তা ছিন্ন করার কোনো অনুমোদন আছে? জনতা জবাব দিলো, না। তাহলে দ্যাখো, ইতোমধ্যে তোমাদের ভিতরে আত্মীয়তা ছিন্ন করা শুরু হয়ে গিয়েছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন 'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে'। তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে একজনের মাকে বিক্রয় করা হচ্ছে, যদিও আল্লাহ্ বিকল্প ব্যবস্থার অবকাশ রেখেছেন। জনতা বললো, তাহলে আপনি এর একটা বিহিত করুন। হজরত ওমর তখন এইমর্মে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রশাসকের কাছে নির্দেশ পাঠালেন যে, 'কোনো স্বাধীন ব্যক্তির মাতাকে যেনো বিক্রয় না করা হয়। কারণ এটা অন্যায়'।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ২০ সংখ্যক আয়াতের 'আল্লাজীনা ফীক্বুলুবিহিম মারাদ্ব' (তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে) এর উদ্দেশ্য মুনাফিকেরা বা কপটাচারীরা। 'মারাদ্ব' উদ্দেশ্য সংশয়, কাপট্য। আর 'আওলা' অর্থ শোচনীয় পরিণাম, কঠিন শাস্তি, ধ্বংস, বিনাশ। 'আওলা' শব্দটি 'আফআ'লু' শব্দরূপে পার্থক্যসূচক বিশেষণের শব্দরূপ। এর আক্ষরিক মূল শব্দ 'ওয়াইল'। অথবা 'ওয়ালী' অর্থ নৈকট্য এবং ২১ সংখ্যক আয়াতের 'ত্বয়াতুঁউ ওয়া ক্বওলুম্ মা'রূফ' (আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য) হচ্ছে উদ্দেশ্য, যার বিধেয় 'খইরুল্লাহুম' (তাদের জন্য উত্তম ছিলো) এখানে রয়েছে উহ্য। এভাবেও বলা যেতে পারে যে, মুনাফিকেরা বলতো, 'আমরা আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য সম্পর্কে অবগত আছি'। আল্লাহ্ তাদের কথাটিকেই হুবহু এখানে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি তারা তাদের একথা সত্যে পরিণত করে দেখাতো, তবে উত্তম হতো। কিন্তু তারা মিথ্যা বলেছে। এমতাবস্থায় যদি তারা জনগণের শাসক হয়, তবে তারা দেশে বিপর্যয় ঘটাবেই, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবেই। এমতাবস্থায় এখানকার 'লাইতুম' শব্দটির অর্থ হবে— প্রশাসক, জনশাসক। উল্লেখ্য, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বনী উমাইয়া ও বনী হাশেমের উদ্ধত শাসকদের সম্পর্কে। কথাটির গুরুত্ব এভাবেও প্রমাণিত হয় যে, হজরত আলী এখানকার 'তাওয়াল্লাইতুম' কথাটি পাঠ করেছেন কর্মবাচ্যরূপে 'ওয়াল্লাইতুম'। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— তোমরা যদি কোনো অত্যাচারীকে জনশাসক নিযুক্ত করো, তাহলে সে দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে, ফলে কলহ-হাঙ্গমা হবে নিত্যদিনের ঘটনা। আর তারা ছিন্ন করে দিবে আত্মীয়তার বন্ধনও।

ইবনে জাওজী লিখেছেন, কাজী আবু ইয়ালী তাঁর 'মুতামাদ' কিতাবে লিখেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পুত্র বর্ণনা করেছেন, আমি একবার আমার স্বনামধন্য পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকে যে বলে, আমরা শাসক ইয়াজিদকে

ভালোবাসি। তিনি বললেন, বৎস! যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে কি ইয়াজিদের আনুগত্য করা সম্ভব? তবে সেই ব্যক্তিকে কেনো অভিশাপ করা ঠিক হবেনা, যাকে আল্লাহ্ নিজেই অভিশাপ দিয়েছেন। আমি বললাম, তিনি কি তাঁর কিতাবের কোথাও ইয়াজিদকে অভিশাপ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি পাঠ করলেন আলোচ্য আয়াতদ্বয়।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? তাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ'?

এখানে 'আফালা ইয়াতাদাব্বারূনাল কুরআন' অর্থ তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক ও তিরস্কারসূচক। এর সোজাসুজি অর্থ— আক্ষেপ! তারা কোরআনের প্রতি মোটেও মনোযোগী নয়। তাই অনুসন্ধান করে দেখে না কী রয়েছে এর মধ্যে। যদি অনুসন্ধান করতো, তবে নিশ্চয় এর মধ্যে খুঁজে পেতো ইহ-পারত্রিক কল্যাণের দিক নির্দেশনা। আর এখানকার 'না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ' কথাটি রূপকার্থক। 'ক্বলব' বা অন্তরকে এখানে উপমা দেওয়া হয়েছে ধনাগারের সঙ্গে। ধনাগার তালাবদ্ধ করা অপরিহার্য না হলেও সমীচীন। উপমার প্রয়োজনীয়তাকে এখানে উপমিতের সঙ্গে সুদৃঢ় করা হয়েছে। তারপর তালাবদ্ধ কথাটিকে যুক্ত করা হয়েছে অন্তরের সঙ্গে, যাতে করে এ বিষয়টি জানা যায় যে, অন্তরে যে তালা পড়েছে, তা বাহ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য কোনো তালা নয়, বরং তা হচ্ছে এক অদৃশ্য ও অপ্রচলিত তালা, যা অন্তরের জন্যই উপযোগী। অর্থাৎ তা হচ্ছে উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার তালা। এভাবে এখানে একথাটি

ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই অবরুদ্ধ হৃদয়ের লোকদের কোরআন থেকে উপকার আহরণের কোনো যোগ্যতাই নেই, কোরআনের প্রতি যদি তারা মনোযোগীও হয়, তবুও সম্ভবতঃ তারা তা বুঝতে পারবে না।

এখানে 'কুলুবিন' এর 'তানভীন' আংশিকার্থক। অর্থাৎ সকলেই নয়, কোনো কোনো লোক এরকম তালাবদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী। অথবা 'তানভীন' এখানে অনির্দিষ্টার্থক এবং এর ব্যবহার ঘটেছে এখানে 'অজ্ঞাত' অর্থে। অর্থাৎ তাদের হৃদয়ের কঠোরতার প্রকৃতি অজ্ঞাত।

বাগবী লিখেছেন, হিশাম ইবনে ওরওয়া বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া বলেন— রসুল স. একবার এই আয়াত পাঠ করলেন। এক ইয়েমেনী যুবক তাঁর পাঠ শুনে বললো, তালা তো পড়বেই। আল্লাহ্ না খোলা পর্যন্ত ওই তালা খোলার সাধ্যও কারো হবে না। হজরত ওমর যুবকটির কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। পরে খলিফা হওয়ার পর ওই যুবককে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন একান্ত সচিবরূপে। কিন্তু অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত সহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর এই আয়াতের আবৃত্তি শুনে ইয়েমেনী এক যুবক বলেছিলো, অন্তরে যে তালা পড়ে, তা খুলে দিতে পারেন কেবল আল্লাহ্। হজরত ওমর যখন খলিফা হলেন, তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য ওই যুবকটির খোঁজ করলেন। কিন্তু জানা গেলো, সে আর বেঁচে নেই।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়'।

এখানে 'সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ করে' অর্থ ইসলামের আহ্বান শোনার পরেও আবার ফিরে যায় প্রতিমাপূজা ও পাপাচারের দিকে। হজরত ওরওয়া বলেছেন, এ সকল লোক হচ্ছে কোরআন প্রত্যাখ্যানকারী ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। তাদের কাছে তওরাতের মাধ্যমে শেষ রসুল এবং তার প্রতি অবতীর্ণ কোরআন সম্পর্কে প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে। সেকারণেই তারা রসুল স. এর বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক জানতো। কিন্তু তিনি স. যখন তাদের কাছে এলেন, তখন তারা তাঁকে পরিত্যাগ করলো। হজরত ইবনে আব্বাস, জুহাক ও সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে মুনাফিকদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কথা।

'আশ্শাইত্বনু 'সাওওয়ালা লাহুম' অর্থ শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায়। এখানাকার 'সাওওয়ালা' শব্দটি 'সওওয়াল' শব্দ হতে গঠিত। আর 'সওওয়াল' অর্থ সহজসাধ্য। অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে কবীরা গোনাহ্ করাকে সহজ করে দেয়। কেউ কেউ মনে করেন, অর্থের দিক দিয়ে 'সাওওয়ালা' সঙ্গতিপূর্ণ 'সাওওয়াল' এর সঙ্গে। অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে কামনা বাসনার দিকে প্রবৃত্ত করে। 'সাওওয়াল' অর্থ বাসনা। আর 'আম্লা লাহুম' অর্থ এখানে তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। অর্থাৎ তাদের কামনা-বাসনার আগুনকে অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করে।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা যারা অপছন্দ করে, তাদেরকে তারা বলে, আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আল্লাহ্ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন'। একথার অর্থ— শয়তান কর্তৃক প্রদত্ত মিথ্যা আশা তাদের উপরে একারণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে যে, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট এই কোরআনের প্রতিই তারা বীতশ্রদ্ধ। তাই মুনাফিকেরা ইহুদীদেরকে, অথবা ইহুদীরা মুনাফিকদেরকে, অথবা তাদের এক দল অন্য দলকে বলে, কোনো কোনো বিষয়ে আমরা তোমাদের কথা মতো চলবো। কেননা মোহাম্মদ ও তার অনুচরেরা আমাদের উভয় দলের শত্রু। তাই যুদ্ধের সময় তোমরা যেমন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না, তেমনি আমরাও তখন পশ্চাপসরণ করবো। আল্লাহ্ কিন্তু তাদের এরকম গোপন শলাপরামর্শ ও যড়যন্ত্রের কথা ভালো করেই জানেন।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে (২৭)। এটা এ জন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন' (২৮)। একথার অর্থ— ওই ইহুদীরা ও মুনাফিকেরা ভেবেছে কী, তাদেরকে কি

এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? মৃত্যুকাল থেকেই তাদের উপরে শুরু হবে তাদের শাস্তি, যা আর কখনো বন্ধ হবে না। হে আমার রসুল! ভাবুন তো দেখি, তখন তাদের দুর্দশা কোন পর্যায়ে পৌঁছবে মৃত্যুকালে যখন শাস্তির ফেরেশতারা এসে তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ বের করে নিয়ে যাবে! তাদেরকে এরকম শাস্তি দেওয়া হবে একারণে যে, যে পথ আল্লাহ্র অশান্তির উদ্রেক করে, তারা ছিলো সেই অশুভ পথের পথিক। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথের প্রতি ছিলো তারা চিরবৈরী। তাই আল্লাহ্ তাদের সকল কর্ম অবশ্যই ব্যর্থ করে দেন।

এখানকার 'ফা কাইফা' (কেমন হবে) কথাটি বিস্ময়সূচক। অর্থাৎ কী বিস্ময়ের ব্যাপারই না তখন ঘটবে, যখন ফেরেশতারা তাদেরকে মারতে মারতে খতম করে ফেলবে। 'জালিকা' অর্থ এজন্যে। অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এজন্যই যে, তারা

ওই পথে চলতো, যে পথে রয়েছে আল্লাহ্‌র বিরাগ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, তওরাতে রসুল স. এর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা তারা গোপন রেখেছে। এভাবে হয়ে গিয়েছে আল্লাহ্‌র অসন্তোষভাজন। আর এখানকার 'তাঁর সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে' অর্থ তারা এমন সব কাজকে ঘৃণা করে, যেগুলো আল্লাহ্‌র সন্তোষার্জনের সহায়ক। একারণেই তো আল্লাহ্ তাদের সকল প্রচেষ্টা বিফল করে দেন।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

❑ যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ কখনো উহাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না?

❑ আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি উহাদের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে উহাদিগকে চিনিতে পারিবে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

❑ আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদিগকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

❑ যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হইবার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, উহারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তিনি তো তাহাদের কর্ম ব্যর্থ করিবেন।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! মুনাফিকেরা মনে করে, তাদের গোপন দুরভিসন্ধির সংবাদ চিরদিনই গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তো যেকোনো মুহূর্তে তাদের পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারেন। অথবা প্রকট করে দিতে পারেন তাদের মুনাফিকির লক্ষণসমূহ। তাহলে আপনিও তাদেরকে সনাক্ত করতে পারেন সহজে। অবশ্য তাদের কথাবার্তা শুনে আপনিও তাদেরকে চিনে নিতে পারেন। আর তারা না জানলেও আপনি তো জানেন যে, আমি সর্বজ্ঞ। আমি তো আপনার ও অন্যান্যদের সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কেই সম্যক অবগত।

প্রথমোক্ত আয়াতের প্রশ্নটি এখানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক। আর 'আম হাসিবাল্ লাজীনা' (তারা কি মনে করে) এর 'আম' এখানে বিয়োজক। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছে এর বিপরীতধর্মী বক্তব্য। শুরু হয়েছে নতুন বাক্য। আর 'মারাদ্বুন' (ব্যাধি) অর্থ এখানে কপটতা।

'ওয়ালাও নাশাউ লাআরইনাকাহুম' অর্থ আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। 'ফা লাআ'রাফতাহুম বিসীমাহুম' অর্থ ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে। বাগবী লিখেছেন, হজরত আনাস বলেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল স. এর কাছে মুনাফিকদের পরিচয় আর গোপন থাকেনি।

'ওয়া লাতা'রিফান্নাহুম ফী লাহ্নিল ক্বউলি' অর্থ তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। বাক্যকে তার মূল গতি থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়াকে বলে 'লাহ্নি ক্বওলি'। মুনাফিকেরা এরকমই করতো। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে রসুল স. ও সাহাবীগণের দোষত্রুটি বর্ণনা করতো। কখনো আবার পরোক্ষাভাবে করতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ। আবার কখনো নিন্দা করতো প্রশংসাচ্ছলে। বাগবী লিখেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে রসুল স. মুনাফিকদের কথাবার্তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারতেন।

'আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত' অর্থ আল্লাহ্ পুণ্যবান-পাপী, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের প্রকাশ্য-গোপন আমল সম্পর্কে অবশ্যই জানেন। সেকারণেই তিনি সকলকে দিতে পারবেন উপযুক্ত প্রতিফল— পুরস্কার, অথবা তিরস্কার।

পরের আয়াতে (৩১) বলা হয়েছে— 'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যতোক্ষণ না আমি মেনে নেই তোমাদের মধ্যে জেহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি'। একথার অর্থ—

আমি জেহাদের আদেশ দেই বিশ্বাসীদেরকে এই মর্মে পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে সর্বসমক্ষে কে জেহাদের মাধ্যমে তার অন্তরস্থিত বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং চরম সংকটপন্ন সময়েও অবলম্বন করে ধৈর্য।

'হাত্তা না'লাম' অর্থ যতোক্ষণ না আমি জেনে নেই। অর্থাৎ তাদের গোপন ইমানকে তো আমি জানিই, তৎসত্ত্বেও পরীক্ষার মাধ্যমে মেনে নিতে চাই তাদের প্রকাশ্য আমল। অথবা 'না'লাম' অর্থ এখানে 'নুমায়্যিয' (ছেঁটে দেই, আলাদা করে দেই)। অর্থাৎ বাস্তবেও যেনো জেহাদের পরীক্ষার মাধ্যমে আমি আলাদা করে ফেলি প্রকৃত বিশ্বাসী ও কপটদেরকে। অথবা 'না'লাম' এর উদ্দেশ্য এখানে— যেনো জেনে নেই প্রকৃত বন্ধুকে? 'সবিরীন' অর্থ ধৈর্যশীল। আর 'আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি' অর্থ বিশ্বাস ও কথা অনুসারে তোমরা কার্য করো কিনা, তা আমি এভাবেই পরীক্ষা করে থাকি। উল্লেখ্য, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয় তাকে, যে পরীক্ষার ফলাফল কী হবে তা জানে না। কিন্তু আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ। পূর্বাপর সকল কিছুই তাঁর জ্ঞানায়ত্ব। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এখানে তিনি 'যতোক্ষণ না আমি জেনে নেই' 'পরীক্ষা করি', এরকম বললেন কেনো? এর জবাবে আমি বলি, প্রকাশ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন। কোনো বিষয়ের অস্তিত্বপূর্ব এবং অস্তিত্বপরবর্তী অবস্থা নিশ্চয় এক নয়। আল্লাহ্ সকলকিছুর অনস্তিত্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত। কিন্তু তাঁর নির্দেশ বলবত হতে পারে কেবল অস্তিত্ববান কোনো কিছুর উপরে। পরীক্ষা করার কথা এখানে বলা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই। এভাবে 'যতোক্ষণ না আমি জেনে নেই' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়— যেনো আমি তাদের উপরে আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন করি। 'পরীক্ষা করি' কথাটির অর্থও এরকম। অর্থাৎ যেনো আমি বাস্তবে তাদের উপরে কার্যকর করি আমার নির্দেশ, যেনো তারা তা মেনে সৌভাগ্যশালী হয়।

এরপরের আয়াতে (৩২) বলা হয়েছে— যারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার পর রসুলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্র কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন'।

এখানে 'রসুলের বিরোধিতা করে' বলে বুঝানো হয়েছে ইহুদী বনী নাজির, বনী কুরায়জাকে এবং মক্কার ওই বারো জন সর্দারকে যারা বদর যুদ্ধের সময় মুশরিক বাহিনীকে পালাক্রমে উট জবাই করে খাইয়েছিলো। 'তারা আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি করতে পারবে না'। অর্থ তারা তাদের কুফরী দ্বারা নিজেদেরই ক্ষতিসাধন করবে। কেননা আল্লাহ্র ক্ষতিসাধন তো অকল্পনীয়। আর 'তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন' অর্থ আল্লাহ্ তাদের ইহকালীন প্রচেষ্টাকে যেমন নিষ্ফল করে দিবেন, তেমনি পরকালেও তারা হবে পুণ্যবঞ্চিত।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এই আয়াতে ওই সকল লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় মুশরিক সৈন্যদেরকে ভূরিভোজন করাতো। অন্য এক আয়াতেও প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে। যেমন 'নিঃসন্দেহে তারা কাফের, যারা

নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করে। বস্তুত তারা এখন আরো ব্যয় করবে। তারপর সেটাই হবে তাদের আক্ষেপের কারণ এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হবে'।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ৩৩

❑ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করিও না।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, এখানে 'আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট কোরো না' অর্থ সংশয়, কপটতা ও অহংকার দ্বারা পুণ্যকর্মকে বরবাদ কোরো না। কালাবী অর্থ করেছেন— কপটতা, অথবা বাগাড়ম্বর দ্বারা নিজেদের পুণ্যকর্মকে ব্যর্থ করে দিয়ো না। হাসান অর্থ করেছেন— কবীরা গোনাহ্র মতো বড় গোনাহ্ করে নিজেদেরকে ধ্বংস করো না।

প্রথমদিকে সাহাবীগণের ধারণা ছিলো শিরিক করলে যেমন পুণ্যকর্ম কোনো কাজে আসে না, তেমনি ইমানদারদের ক্ষতি করতে পারে না কোনো পাপ। তাদের এমতো ধারণাকে খণ্ডনার্থে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত। অবতীর্ণ হওয়ার এই প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিতাবুস সালাওয়াতে আবুল আলিয়াকে উদ্ধৃত করে আবী হাতেম ও মোহাম্মদ ইবনে নসর মারুজি বর্ণনা করেছেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন, পাপ করলে পুণ্যকর্ম পণ্ড হয়ে যায়। আবুল আলিয়ার এই উদ্ধৃতিটি বাগবীও বর্ণনা করেছেন। আর মুকাতিল কথাটির অর্থ করেছেন— তোমরা ইমান এনেছো ও

সৎকর্ম করে যাচ্ছো বলে একথা কখনো মনে কোরো না যে, তোমরা রসুল স. এর কোনো উপকার করছো। এরকম মনে করলে তোমাদের সকল শুভপ্রচেষ্টা বিফলে যাবে।

মাসআলা ঃ ইমাম আবু হানিফা বলেছেন, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও ওমরা, যে কোনো ইবাদত শুরু করলে তা সুসম্পন্ন করা অত্যাবশ্যক। শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়া মাঝপথে কোনো ইবাদত স্থগিত করা সমীচীন নয়। 'হেদায়া' ও 'কুদরী' প্রণেতা প্রমুখও এরকম বলেছেন। তবে কেউ নিমন্ত্রণ করলে নফল রোজাদার তার রোজা ভঙ্গ করে ওই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবে কী না, সে সম্পর্কে মতপৃথকতা রয়েছে। এরকম করাকে কেউ বলেছেন জায়েয, আবার কেউ একে আখ্যা দিয়েছেন নাজায়েয বলে। কারো কারো মতে দিনের প্রথমাংশে এরকম দাওয়াত কবুল করা যায়। দ্বিপ্রহরের পর কবুল করা যায় না। তবে দিনের দ্বিতীয়াংশে রোজা ভঙ্গ না করলে যদি পিতামাতার অবাধ্যতা হয় তবে তখন রোজা ভাঙ্গা যাবে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক বলেছেন, নফল ইবাদত শুরু করে শেষ

হওয়ার আগে ছেড়ে দিলে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানিফা একথাও বলেছেন যে, ওজর ছাড়াও নফল রোজা ভাঙা যাবে, কিন্তু পরে তার কাযা আদায় করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বলেছেন, হজ ও ওমরা শুরু করার পর শেষ করা ওয়াজিব। শেষ না করা হলে তার কাযা আদায় করাও হবে ওয়াজিব। কিন্তু নফল নামাজ ও রোজার ক্ষেত্রে পরে কাযা আদায় করার বিষয়টি ওয়াজিব নয়, বরং মোস্তাহাব।

আমাদের প্রমাণ ঃ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এরকম বলা যে— তোমরা সন্দেহ, ভণ্ডামী, কপটতা, কৃত্রিমতা, বাহ্যাড়ম্বর, খ্যাতির বাসনা ও অন্যান্য পাপ দ্বারা তোমাদের ভালো কাজকে পণ্ড করে দিয়ো না। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, 'বিনষ্ট কোরো না' কথাটি সাধারণ অর্থসম্পন্ন। কোনো ভালো কাজ শুরু করার পর তা সম্পূর্ণ করার আগে ভঙ্গ করাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূত। কেননা এমতো ভালো কাজের যতোটুকু সম্পাদিত হয়েছে, তা যেমন ইবাদত, তেমনি যেটুকু বাকী আছে, সেটুকুও ইবাদতই । সুতরাং ওই কাজকে যদি কোনো কবীরা গোনাহ্, অর্থাৎ কপটতা, অহংকার, যশস্পৃহা ইত্যাদির দ্বারা ভঙ্গ করা হয়, তবে ওই কাজটি নিজেই হয়ে পড়বে সৎকার্যাবলী বিনাশকারী। আমাদের, অর্থাৎ হানাফীগণের এই বিধানটির সমর্থন রয়েছে হাদিস শরীফেও।

যেমন ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, জননী আয়েশা বলেছেন, হাফসার নিকটে কিছু বকরীর গোশত হাদিয়ারূপে এসেছিলো। আমরা দু'জনেই রোজা ছিলাম। তবুও ওই গোশত খেয়ে রোজা ভঙ্গ করলাম। কিছুক্ষণ পর রসুল স. এলেন। আমরা তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি স. বললেন, এই রোজা তোমরা পরে আদায় করে নিয়ো। সুফিয়ান ইবনে হাসীন থেকে আহমদ এবং জাফর ইবনে বরকান সূত্রে তিরমিজিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিজির বর্ণনাটি এরকম— জননী আয়েশা বলেছেন, আমি ও হাফসা দু'জনেই রোজা ছিলাম। কিছু আহার্যদ্রব্য হাদিয়া হিসেবে এলো। আমাদের দু'জনেরই তা খেতে ইচ্ছে হলো তাই খেয়ে নিলাম। একটু পরে রসুল স. এলে হাফসা-ই তাঁকে ঘটনাটি জানালো। তিনি স. বললেন, এর বদলে তোমরা পরে আর একদিন রোজা করে নিয়ো। জামিল ইবনে ওরওয়া সূত্রে আবু দাউদ ও নাসাঈও এরকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বোখারী বর্ণনাটিকে বলেছেন অপ্রচ্ছন্ন. কেননা ওরওয়া থেকে জামিলের শোনা প্রমাণিত হয় না এবং জামিল থেকে ইয়াজিদের শোনার বিষয়টিও প্রমাণহীন। তিরমিজি লিখেছেন, হাদিসটি সালেহ ইবনে আবু আখজার এবং মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবী হাফসা বর্ণনা করেছেন, যা জুহুরী পেয়েছিলেন ওরওয়ার মাধ্যমে জননী আয়েশা থেকে। হজরত মালেক ইবনে আনাস, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর, জিয়াদ ইবনে সা'দ ও অন্যান্য হাফেজে হাদিসগণও জুহুরীর মাধ্যমে জননী আয়েশা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন অপরিণত সূত্রে। এই সূত্রে আবার

ওরওয়ার নাম আসেনি। এটাই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আমি একবার ইমাম জুহুরীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এই হাদিস জননী আয়েশা থেকে ওরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, এ সম্পর্কে আমি ওরওয়ার কাছ থেকে কিছু শুনিনি। সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেকের শাসনামলে কিছুসংখ্যক লোক এ ধরনের কোনো কোনো ব্যক্তির নামোল্লেখ করেছেন, যারা হাদিসটি শুনেছেন জননী আয়েশা থেকে। ওই ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ওরওয়া-ও।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, বোখারী তাঁর হাদিস চয়নের রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই নিয়মের উপর— হাদিস বর্ণনাকারী ও শ্রবণকারীর মধ্যে সাক্ষাত হওয়া ও সরাসরি হাদিস শ্রবণ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে বর্ণনাকারী ও শ্রবণকারীর সমসাময়িক হওয়ার প্রমাণ পাওয়াটাই যথেষ্ট, দু'জনের মুখোমুখি দর্শন ও শ্রবণের প্রমাণ থাকা জরুরী নয়। আর বোখারী ও তিরমিজির মতানুসারে যদি বর্ণিত হাদিসটিকে মুয়াল্লাল অপ্রচ্ছন্ন বলে ধরেও নেওয়া হয়, তাহলে এটা প্রযোজ্য হবে কেবল বর্ণনার এই পদ্ধতিটির উপরে, অন্য কোনো পদ্ধতির উপরে নয়।এ সম্পর্কে জারীর ইবনে হাজেমের বরাত দিয়ে ইবনে হাব্বান তাঁর 'সহীহ্'

পুস্তকে একটি হাদিস লিখেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ওরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন জননী আয়েশা বলেছেন, আমি ও হাফসা সকাল থেকে নফল রোজা ছিলাম।

অন্য এক পদ্ধতিতে জননী আয়েশা থেকে সাঈদ ইবনে যোবয়েরের মাধ্যমে খাসিফের সূত্রে ইবনে আবী শায়বাও এরকম বর্ণনা করেছেন। হজরত ইবনে আব্বাস—ইকরামা—খাসিফ সূত্রের হাদিস তিবরানী তাঁর 'মুয়াজ্জম' পুস্তকে বর্ণনা করেছেন এভাবে, জননী আয়েশা ও জননী হাফসা দু'জনেই সেদিন রোজা ছিলেন। অন্য আর এক পদ্ধতিতে এরকম বর্ণনা করেছেন বায্যার, নাফেয়ের মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে এবং হাম্মাদ ইবনে ওয়ালিদের মাধ্যমে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে। সকল পদ্ধতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র এক পদ্ধতি তিবরানী তাঁর 'আল আওসাত' পুস্তকে লিখেছেন, মুসা ইবনে হারুন—মোহাম্মদ ইবনে মেহরান জামাল মোহাম্মদ ইবনে আবু সালমা মক্কী এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বলেছেন, জননী আয়েশা ও জননী হাফসার কাছে উপহার হিসেবে কিছু খাদ্যসামগ্রী এলো। দু'জনেই রোজা ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁরা ওই খাদ্য গ্রহণ করে রোজা ভাঙলেন। পরে রসুল স.কে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, তোমরা এ রোজার কাযা করে নিয়ো। আর কখনো এরকম কোরো না।

ইবনে হুম্মাম বলেছেন, এই হাদিসের সূত্রীয় প্রমাণ খণ্ডনযোগ্য নয়। এর কোনো কোনো পদ্ধতি দুর্বল হলেও বহু সূত্র থেকে প্রাপ্ত এই হাদিস অখণ্ডনীয়। তাছাড়া সব পদ্ধতিগুলো আবার শিথিল পদবাচ্যও নয়। কোনো কোনো পদ্ধতি তো রীতিমতো আস্থাযোগ্য এবং প্রমাণরূপে সেগুলো উপস্থাপন করাতেও কোনো অসুবিধে নেই। আর আমার মতে, অপরিণত বা মুরসাল হাদিসও প্রমাণ্য।

ইবনে জাওজী বলেছেন, বর্ণিত হাদিসে যে পুনরায় রোজা রাখতে বলা হয়েছে, তা মোস্তাহাব পর্যায়ের। কিন্তু তাঁর এমতো অভিমত হাদিসের বর্ণনাভঙ্গির পরিপন্থী। কেননা রসুল স. এখানে সরাসরি উম্মতজননীদ্বয়কে ভঙ্গকৃত রোজা পরে আদায় করে নিতে বলেছেন। আর তাঁর নির্দেশ পালন তো ওয়াজিবই হবে। মোস্তাহাব হওয়ার কোনো কারণ তো এখানে নেই। মোস্তাহাব হলে তো তার কাযা পূরণ করতে আদেশের সুর ধ্বনিত হতো না। এরপরেও যদি তাঁর নির্দেশকে মোস্তাহাব বলা হয়, তবে তাঁর কথাটিকে মনে করতে হবে রূপকার্থক। কিন্তু এমতো সুস্পষ্ট নির্দেশকে রূপকার্থক ভাবারও কোনো যুক্তি নেই। তাছাড়া আলোচ্য আয়াতের নির্দেশটিও বর্ণিত হাদিসের পরিপোষণা করে। কেননা এখানে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে তোমাদের কর্ম বিনষ্ট কোরো না'।

একটি সংশয় ঃ এখানে কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের বিবরণে তো সাযুজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আয়াতে বলা হয়েছে 'বিনষ্ট কোরো না'। অর্থাৎ রোজা রাখলে তা ভঙ্গ কোরো না। এখানে রোজা ভাঙ্গাই তো নিষেধ করা হয়েছে। ভঙ্গ রোজার কাযা করার কথা তো এখানে নেই। কিন্তু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ, যদি পরে তার কাযা আদায় করা হয়।

সংশয়ভঞ্জন ঃ আমি বলি, আয়াতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে কাযার সমর্থনেই। অর্থাৎ 'বিনষ্ট কোরো না' অর্থ বিনষ্ট বা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে দিয়ো না, অত্যাবশ্যক দায়িত্বরূপে তা পরবর্তীতে পরিপূরণ করো। আর এমতো ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভঙ্গকৃত রোজার কাযা ওয়াজিবই প্রমাণিত হয়। কোনো আমলের ওয়াজিব হওয়ার যে প্রকৃতি তা হচ্ছে, যদি তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, তবে তার পরিবর্তে এমন কাজ করতে হবে, যা শরিয়তসমর্থিত। অবশিষ্ট রইলো হাদিসের বিজ্ঞপ্তি। সেখানেও এমন কোনো কথা নেই, যা রোজা ভঙ্গ করাকে সমর্থন করে। সেখানে রয়েছে কেবল কাযা করার প্রতি সমর্থন। আর কাযা করার প্রশ্ন ওঠে ওই আমলের ক্ষেত্রে, যা ওয়াজিব। তাছাড়া হাদিসে রোজা ভঙ্গ করাকে স্পষ্টভাবে সমর্থনও তো করা হয়নি। ইমাম আবু হানিফা বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেই।

এ প্রসঙ্গে আরো কিছুসংখ্যক হাদিস রয়েছে। যেমন— দারাকুতনী লিখেছেন, তালহা ইবনে ইয়াহ্ইয়া তাঁর ফুফুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, জননী আয়েশা বলেছেন, একদিন রসুল স. বাইরে থেকে গৃহে প্রবেশ করেই বললেন, আজ আমি রোজা রাখতে চাই। কিন্তু তাঁর সামনে হাদিয়াস্বরূপ যখন কিছু হালুয়া আনা হলো তখন তিনি বললেন, এখন আমি আহার করবো। আর আজকের বদলে অন্য একদিন রোজা রেখে নিবো। দারাকুতনী বলেছেন, শেষের কথাটি মোহাম্মদ ইবনে আমর আবুল আব্বাস বাহেলী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেনি। হয়তো মোহাম্মদ ইবনে আমরেরও এ ব্যাপারে সংশয় ছিলো। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, মোহাম্মদ ইবনে মনসুর, ইবনে উয়াইনা সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণটি এই বাড়তি উক্তিসহ বর্ণনা করেছেন নাসাঈ। ইমাম শাফেয়ীও বাড়তি উক্তিসহ বর্ণনা করেছেন ইবনে উয়াইনার বিবরণটি এবং বলেছেন, ইবনে উয়াইনা এই হাদিসের

বাড়তি বাক্যটি সংযোগ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর আগে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, শেষ বয়সে ইবনে উয়াইনার স্মৃতি হয়ে গিয়েছিলো কিছুটা বিপর্যস্ত।

স্বসূত্রে দারাকুতনী মোহাম্মদ ইবনে আবী হুমাইদ ও ইব্রাহিম ইবনে উবাইদের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন, হজরত আবু সাঈদ খুদরী একবার কিছু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করলেন এবং নিমন্ত্রণ করলেন রসুল স. এবং তাঁর সাহাবীগণকে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন বললেন, আমি তো আজ রোজাদার। রসুল স. বললেন, তোমার ভ্রাতা তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। রোজা ভেঙে ফেলো। এর পরিবর্তে রোজা রেখো অন্য আর একদিন। দারাকুতনী বলেছেন, বর্ণনাটি অপরিণত শ্রেণীর। ইবনে জাওজী লিখেছেন, মোহাম্মদ ইবনে আবী হুমাইদ কিছুই জানে না। নাসাঈ বলেছেন, বর্ণনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইবনে হাব্বান বলেছেন, এটা আলোচনায় আনা যায় না।

দারাকুতনী আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, এক লোক রসুল স. ও কয়েকজন সাহাবীর জন্য পানাহারের আয়োজন করলো। যখন সবাই তাঁর বাড়িতে সারিবদ্ধভাবে বসে পড়লো, তখন একজন হাত গুটিয়ে বসে থাকলো। রসুল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো? সে বললো, আমি রোজা। তিনি স. বললেন, তোমার ভাই তোমার জন্য কতো কষ্ট করে খাবার তৈরী করলো, আর তুমি কিনা বলছো, আমি রোজা। নাও, এবার আহারে অংশ গ্রহণ করো। এর বদলে আর একদিন রোজা রেখো। এই হাদিসের বর্ণনাসূত্রভূত একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন ওমর ইবনে হালিফ। ইবনে আদী এবং ইবনে হাব্বান বলেছেন, তাকে হাদিস বানানোর অপরাধে অভিযুক্ত করা হতো। দারাকুতনী আরো বর্ণনা করেছেন, হজরত সাওবান বলেছেন, রমজান নয় এমন এক মাসের এক দিনে রসুল স. রোজা ছিলেন। কোনো অসুবিধার কারণে সেদিন তাঁর কষ্ট হতে লাগলো। বার বার দেখা দিলো বমির ভাব। শেষে বমিও আর আটকানো গেলো না। বমি করার পর তিনি ওজু করলেন এবং রোজা ভেঙে ফেললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! বমি করার পর কি ওজু করা ফরজ? তিনি স. বললেন, যদি ফরজ হতো, তবে তোমরা কোরআনে একথা দেখতে পেতে। পরদিন রসুল স. পুনরায় রোজা রাখলেন এবং বললেন, আজ রোজা রেখেছি গতকালের ভাঙা রোজার বদলে। এই হাদিসের সূত্রপরম্পরাভূত এক জনের নাম উত্বা ইবনে সাকান। দারাকুতনী তার হাদিস পরিত্যাজ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

স্বসূত্রে দারাকুতনী উল্লেখ করেছেন, জুহাক ইবনে হামযা ও মনসুরকে উদ্ধৃত করে মোহাম্মদ ইবনে আবী হুমাইদ বলেছেন, জননী উম্মে সালমা একদিন রোজা রেখে ভেঙে ফেললেন। রসুল স. তাঁকে এর পরিবর্তে আর একদিন রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, জুহাকের কথা ঠিক নয়। আবু জারআ বলেছেন, মোহাম্মদ ইবনে আবী হুমাইদ অসত্যভাষী।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ তাঁদের অভিমতের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন এই হাদিস— জননী জুয়াইরিয়া বলেছেন, জুমআর দিন আমি রোজা

রেখেছিলাম। রসুল স. আমার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতকাল রোজা রেখেছিলে? আমি বললাম, না। তিনি স. পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, আগামীকাল কি রোজা রাখবে? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, তাহলে রোজা ভেঙে ফেলো। আবু ওমর সূত্রে ইমাম আহমদ বলেছেন, রসুল স. তখন জননী জুয়াইরিয়ার প্রকোষ্টে অবস্থান করেছিলেন।

জননী আয়েশা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কখনো কখনো সকালে আমার কাছে এসে বলতেন, খাবার মতো কি কিছু আছে? আমি বলতাম, না। তিনি স. তখন বলতেন, তাহলে আজ আমি রোজাদার। এরপর হাদিয়ার কোনো খাদ্যদ্রব্য আমার কাছে এলে আমি তাঁকে ডেকে বলতাম, কিছু হাদিয়া এসেছে। আপনার জন্য আমি লুকিয়ে রেখেছি, আসুন! তিনি স. জিজ্ঞেস করতেন, কী এসেছে? আমি বলতাম, হায়িস (এক ধরনের উৎকৃষ্ট হালুয়া)। তিনি স. বলতেন, সকাল থেকে তো আমি রোজা। এরপর তিনি আহার করতেন। মুসলিম। দারাকুতনী ও বায়হাকীর বর্ণনায় হাদিসটি এসেছে এভাবে— জননী আয়েশা বলেছেন, একদিন রসুল স. আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে আহার্য কি কিছু আছে? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, তাহলে আমি রোজা। আর একদিন তিনি স. আমার কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে খাওয়ার মতো কি কিছু আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি স. বললেন, যদিও আমি রোজা রাখতে মনস্থ করেছিলাম, তবুও আমি এখন আহার করবো।

হজরত উম্মে সুলাইম বলেছেন, রসুল স. রাতেই রোজার নিয়ত করতেন। ভোরবেলায় যখন আমার কাছে আসতেন, তখন জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? আমি বলতাম, আপনি না রাতেই রোজার নিয়ত করেছেন। তিনি স. বলতেন, তাতো করেছিই। কিন্তু এ রোজা যেহেতু রমজানের কাযা রোজা অথবা মানতের রোজা নয়, সেহেতু এ রোজা ভাঙলে কোনো ক্ষতি নেই। দারাকুতনীর এই সূত্রপরম্পরার এক জনের নাম মোহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ্ আজরামী, যিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।

হজরত আবু জুহাইফা বলেছেন, রসুল স. হজরত সালমান ও হজরত আবু দারদাকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। তারপর একদিন হজরত সালমান হজরত আবু দারদার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি বাড়ি নেই। আরো দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ও মলিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ অবস্থা কেনো? উম্মে দারদা বললেন, আপনার ভাইটির কি দুনিয়ার খেয়াল আছে? সেজেগুজে থাকবো তাহলে কার জন্য? ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হলেন হজরত আবু দারদা স্বয়ং। কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরী করা খাবার এসে গেলো। হজরত আবু দারদা বললেন, আমি রোজা,

আপনি খান। হজরত সালমান বললেন, আপনি না খেলে আমিও খাবো না। হজরত আবু দারদা আর দ্বিরুক্তি করলেন না। পানাহার করলেন একসাথে। রাতেও দু'জনে শুয়ে পড়লেন এক স্থানে। কিছুক্ষণ পর নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে শয্যাত্যাগ করলেন

হজরত আবু দারদা। হজরত সালমান বললো, এখন শুয়ে পড়ুন। হজরত আবু দারদা পুনরায় উঠে পড়লেন। হজরত সালমান এবারেও তাঁকে বাধা দিলেন, বললেন, শুয়ে পড়ুন, এখনো নামাজের সময় হয়নি। হজরত আবু দারদা পুনরায় শুয়ে পড়লেন। রাত্রি গভীর, গভীরতর হলো। তারপর দু'জনেই উঠে পড়লেন এবং নামাজ পাঠ করলেন। তার পরে হজরত সালমান হজরত আবু দারদাকে বললেন, আপনার উপরে রয়েছে আপনার প্রভুপালনকর্তার হক, শরীরের হক, এবং স্ত্রীর হক। সুতরাং মেটাতে হবে প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকার। পরদিন সকালে হজরত আবু দারদা রসুল স.কে সকল কথা জানালেন। রসুল স. বললেন, সালমান ঠিকই বলেছে।

আমার মতে এই হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, নফল রোজা ভঙ্গ করা জায়েয। কিন্তু এটা প্রমাণিত হয় না যে, ভঙ্গকৃত রোজার কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। জননী জুয়াইরিয়ার হাদিস দ্বারা কেবল এতোটুকু জানা যায় যে, পূর্বের অথবা পরের দিনের সঙ্গে না মিলিয়ে কেবল শুক্রবার রোজা রাখা ঠিক নয়। হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসেও একথার সমর্থন রয়েছে। যেমন তিনি বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, জুমআর দিন রোজা রেখো না, যদি তার আগের দিন রোজা না রেখে থাকো অথবা রোজা না রাখতে চাও তার পরের দিন। বোখারী, মুসলিম। অন্য এক হাদিসে কথাটি বলা হয়েছে এভাবে— রসুল স. শুধুমাত্র জুমআর দিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের পক্ষে আরো কিছু শিথিলসূত্রবিশিষ্ট হাদিস রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হজরত উম্মে হানী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস পাওয়া যায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রপরম্পরায়। যেমন হাম্মাদ ইবনে সালমা—সাম্মাক ইবনে হারব—হারুন ইবনে উম্মে হানী, এই সূত্রে নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, একবার রসুল স. শরবত পান করলেন। আমাকেও বললেন, পান করো। আমি বললাম, আমি রোজা আছি। অথচ আপনার উচ্ছিষ্টের লোভও সামলাতে পারছি না। তিনি স. বললেন, তোমার এই রোজা যদি রমজানের কাযা রোজা হয়, তবে এর বদলে একটি রোজা পালন কোরো অন্য কোনো দিন। আর যদি নফল হয়, তবে তোমার ইচ্ছা— অন্য কোনো দিন এর কাযা আদায় করবে, অথবা করবে না।

হারুন থেকে সাম্মাক সূত্রে এই হাদিস প্রাপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, আমি রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে আনা হলো শরবত। তিনি কিছু শরবত নিজে পান করলেন। আমাকেও কিছু দিলেন। আমি পান করার পর বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমার দ্বারা একটি গোনাহর কাজ হয়ে গেলো। তিনি স. বললেন, কীরকম? আমি বললাম, আমি তো রোজা রেখেছিলাম। তিনি স. বললেন, তুমি কি কোনো রোজার বদলে রোজা রেখেছিলে? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। সাম্মাক ইবনে হারব যদি এই বর্ণনাটির একক বর্ণনাকারী হন, তবে তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। বায়হাকী

বলেছেন, তাঁর সূত্রটি সমালোচিত। ইবনে কাতান বলেছেন, হারুন অপরিচিত। হারুনকে কেউ হজরত উম্মে হানীর পুত্র, কেউ প্রপৌত্র, আবার কেউ বলেছেন দৌহিত্র। আর ইমাম আহমদ ও তিরমিজি বর্ণিত হাদিসে প্রমাণিত হয় না যে, কাযা ওয়াজিব নয়।

আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেছ—ইয়াজিদ ইবনে যিয়াদ—জারীর এই সূত্রপরম্পরায় আবু দাউদ, দারেমী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, হজরত উম্মে হানী বলেছেন, মক্কাবিজয়ের দিবসে ফাতেমা এসে রসুল স. এর বাম পাশে বসে পড়লো। আমি ছিলাম তাঁর ডান পাশে। একজন সেবিকা উপস্থিত হলো এক পাত্র শরবত নিয়ে। আমি ওই শরবতের কিছু অংশ পান করে ফেললাম। তারপর মনে হলো, আমি না রোজা। বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল স! আমি যে রোজা ভেঙে ফেললাম। তিনি স. বললেন, তুমি কি কাযা রোজা রেখেছিলে? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, নফল রোজা ভাঙলে কোনো দোষ নেই।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত উম্মে হানী-হুজ্জাত-শো'বা-মোহাম্মদ ইবনে জাফর এই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, মক্কাবিজয়ের দিবসে রসুল স. আমার গৃহে এলেন। তাঁর সামনে এক পাত্র শরবত উপস্থিত করা হলো। তিনি স. তা পান করলেন। আমাকেও কিছু পান করতে দিলেন। আমি বললাম, আমি তো রোজা। তিনি স. বললেন, নফল রোজা নিজের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছে করলে রাখা যায়, আবার ইচ্ছে করলে ভেঙে ফেলা যায়।

হজরত উম্মে হানী থেকে আবু সালেহ, তাঁর কাছ থেকে জায়দা এবং তাঁর কাছ থেকে আবু দাউদ তায়ালাসী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. হজরত উম্মে হানীর গৃহে গেলেন এবং কিছু পানীয় পান করলেন। অবশিষ্ট কিছু অংশ হজরত উম্মে হানীকে দিলেন। তিনি তা পান করার পর বললেন, আমি তো রোজা ছিলাম। রসুল স. বললেন, নফল রোজার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন। সে ইচ্ছা করলে রাখতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ভাঙতেও পারে। জাহাবী বলেছেন, জায়দার সাথে আবু সালেহের সাক্ষাত ঘটেনি। বোখারী বলেছেন, বিষয়টি

চিন্তাসাপেক্ষ। তাছাড়া এই ঘটনাটিকে বিজয় দিবসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাও সমীচীন নয়। কেননা মক্কা বিজিত হয়েছিলো রমজান মাসে। সুতরাং ওই মাসে কাযা রোজা রাখা এবং নফল রোজার প্রসঙ্গ তোলা যুক্তি-বিবেচনা বহির্ভূত।

ইবনে হুম্মাম এ সব বিবরণকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম আবু হানিফার মতে, নফল রোজা ওজর ছাড়াও ভেঙে ফেলা যায় এবং এর পক্ষের প্রমাণ হচ্ছে ওই সকল হাদিস, যে গুলো ইমাম শাফেয়ী সমর্থন করেছেন। তবে এমতাবস্থায় ভেঙে ফেলা রোজার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে হাদিসও উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বিভিন্ন হাদিস থেকে সামঞ্জস্যের উপায়ও বের হয়ে এসেছে। ইবনে হুম্মাম একথাও লিখেছেন যে, 'ওয়া লা তুবত্বিলূ আয়্মালাকুম' (তোমাদের কর্ম বিনষ্ট কোরো না) কথাটির অর্থ তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। অর্থাৎ এর কোনো সুফল তোমরা পাবে না। এর থাকা না থাকা এক বরাবর। কিন্তু 'কাযা' আদায় করার ইচ্ছা যদি পরিত্যাগ করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে এই আয়াত নিষেধ করে না।

আমি বলি, এখানে বিনষ্ট কোরো না বলে কোনো বিশেষ আমলকে বিনষ্ট করার কথা বলা হয়নি। বরং কথাটি ব্যাপকার্থক এবং এখানে 'বিনষ্ট' হচ্ছে অনির্দিষ্টবাচক ও না-বোধক। সুতরাং বুঝতে হবে, 'বিনষ্ট কোরো না' কথাটি এখানে বলা হয়েছে সকল আমলের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ, নফল রোজা বা অন্য কোনো নফল ইবাদত শুরু করে যদি তা সম্পন্ন না করে, তবে তার ওই আমল হবে অসম্পূর্ণ। বাকী রইলো, কাযা প্রসঙ্গ। কাযা হচ্ছে স্বতন্ত্র একটি আমল, যার দ্বারা বিনষ্ট আমলের প্রতিকার করা হয়ে থাকে। আর কোনো ওজর ছাড়া নফল কোনো ইবাদত শুরু করা এবং ভাঙা তো এই আয়াত দ্বারাই নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। কিন্তু হাদিসের দ্বারা ভেঙে ফেলা বা বিনষ্ট করার বৈধতাও প্রমাণিত। এমতোক্ষেত্রে কোরআনকেই প্রাধান্য দেওয়া জরুরী। সুতরাং মানতে হবে, আমল ভঙ্গ করা বৈধ না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। সেকারণেই নফল হজ ও ওমরা ভঙ্গ করা কারো কাছেই বৈধ নয়। তাই তা কেউ ভেঙে ফেললে পুনরায় তার কাযা আদায় করা অত্যাবশ্যকই তো হবে। আর এনিয়মটিই প্রযোজ্য হবে সকল নফল ইবাদতের বেলায়।

সূরা মুহাম্মাদ ঃ আয়াত ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮

❑ যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।

❑ সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদের সংগে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না।

❑ পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আন, তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাহেন না।

❑ তোমাদের নিকট হইতে তিনি তাহা চাহিলে ও তজ্জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করিবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

❑ দেখ, তোমরাই তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করিতেছে। যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করিবেন; তাহারা তোমাদের মত হইবে না।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এরপর মৃত্যমুখে পতিত হয় সত্যাপ্রত্যাখ্যানকারী অবস্থায়, আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

৩২ সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে রয়েছে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যগত সংযোগ। আর সেখানে ও এখানে 'যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করে' বলে বুঝানো হয়েছে ওই সকল কাফেরকে, যারা বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলো। রসুল স. তাদের লাশগুলোকে একটি গর্তে জমা করিয়েছিলেন। কিন্তু ওই বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও আলোচ্য আয়াত ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ কাউকেই আল্লাহ্ মার্জনা করবেন না, যারা কাফের অবস্থায় মারা যায়।

পরের আয়াতে (৩৫) বলা হয়েছে— 'সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব কোরো না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ণ করবেন না'।

এখানে 'হীনবল হয়ো না' অর্থ যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখিয়ো না। 'সন্ধির প্রস্তাব কোরো না' অর্থ প্রথমেই সন্ধির প্রস্তাব করে বোসো না। এভাবে এখানকার 'তাহীনু' ও 'তাদউ' উভয় ক্রিয়াই নিষেধাজ্ঞাসূচক 'লা' (না) এর আওতায় পড়ে যায়। আর এখানে প্রথমে সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দিতে নিষেধ করা হয়েছে একারণে যে, এরকম প্রস্তাবে প্রকাশ পায় দুর্বলতা।

'তোমরাই প্রবল' অর্থ যেহেতু তোমরা আল্লাহ্‌র সৈনিক, তাই তোমরা তাঁর বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত। সেকারণে তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র শত্রুদের চেয়ে অধিক শক্তিধর। 'আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসেন। আর যে যাকে ভালোবাসে সে তার সঙ্গেই থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ সঙ্গে থাকার বিষয়টি আনুরূপ্যবিহীন। কেননা তাঁর সত্তা-গুণবত্তা-কার্যকলাপ

সবকিছুই অনুরূপতার অতীত। আর 'ওয়া লাঁই ইয়াতিরাকুম আয়মালাকুম' অর্থ তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ণ করবেন না'। 'ওয়াত্‌র' অর্থ ক্ষুণ্ন করা, বা কম করা। হজরত ইবনে আব্বাস, মুকাতিল, কাতাদা ও জুহাক কথাটির অর্থ করেছেন— আল্লাহ্ তোমাদের পুণ্যকর্মের প্রতিদান পূরণে কম করবেন না এবং নিষ্ফলও করে দিবেন না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ইমান আনো, তাক্বওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না (৩৬)। তোমাদের নিকট থেকে তিনি তা চাইলে ও তজ্জন্য তোমাদের উপরে চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন'(৩৭)।

'পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক' অর্থ আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত পার্থিবতা মূল্যহীন ও ক্ষতিকর। রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র জিকির ছাড়া পৃথিবীর সবকিছুই অভিশপ্ত। 'যদি তোমরা ইমান আনো, তাক্বওয়া অবলম্বণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে পুরস্কার দিবেন'। অর্থ— তোমরা যদি বিশ্বাসী ও সাবধানী (মুত্তাক্বী) হও, তবে তোমাদের পুণ্যকর্মসমূহের যথোপযুক্ত প্রতিফল তিনি তোমাদেরকে দিবেন। এমতাবস্থায় তোমাদের পৃথিবীর এই জীবন ক্রীড়া-কৌতুক তুল্য নিরর্থক ও ক্ষতিকর হবে না, হবে আখেরাতের সফল শস্যক্ষেত্রতুল্য। আর 'তিনি তোমাদের ধনসম্পদ চান না' অর্থ তিনি তোমাদের ধনসম্পদের মুখাপেক্ষী নন। বরং সকল বিষয়ে তোমরা তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি তোমাদেরকে ইমান আনতে ও সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন তো তোমাদেরকে উপকৃত করবার জন্যই। এরকম করলে জান্নাতের সুখভোগ করবে তো তোমরাই। অন্য এক আয়াতেও এরকম বলা হয়েছে। যেমন 'আমি তাদের কাছ থেকে রিজিক চাই না'। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— আমি তোমাদের উপরে অতিরিক্ত দানকে বাধ্যতামূলক করিনি। অত্যাবশ্যক দানরূপে নির্ধারণ করেছি অত্যল্প অংশ— চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার এর চেয়েও কম। যেমন ১২০টি ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল। কাজেই তোমাদের দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। ইবনে উয়াইনা এরকম ব্যাখ্যা করেছেন। আয়াতের গতিধারাও এমতো ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। কেননা ইমান ও মিতাচারের প্রেরণা ও পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা-অসারতার কথা শুনে সংকীর্ণচিত্তদের মনে এমতো ধারণার উদ্ভব হওয়াও সম্ভব যে, আল্লাহ্ হয়তো তাঁর রাস্তায় সকল সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতো অপধারণার মূলোৎপাটনার্থেই এখানে বলা হয়েছে 'তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না'।

'ফাইয়ুহ্‌ফিকুম' অর্থ তোমাদের উপরে চাপ দিলে। 'ইহ্‌ফাআ' অর্থ কোনো কাজকে শেষ সীমায় উপনীত করা, আতিশয্য প্রদান করা, চরম চাপ প্রদান।

যেমন এক হাদিসে এসেছে— উহ্‌ফুশ্ শাওয়ারিবা অর্থ গোঁফকে গোড়া থেকে

কেটে ফেলো। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ যদি তোমাদের সকল সম্পদ দান করে দেওয়ার জন্য চাপ প্রদান করতেন, তবে তা দিতে গড়িমসি করতে। আর তা দিতে বাধ্য হলেও দিতে আন্তরিক অসন্তোষের সঙ্গে। আর 'তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন' অর্থ তদবস্থায় তোমার অভ্যন্তরীণ অসন্তোষও তোমরা গোপন রাখতে পারবে না। প্রকাশ করবে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, যা আল্লাহ্র আনুগত্যবিরোধী। কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ্র বাণী সত্য। তিনি একথা ভালো করেই জানেন যে, তাঁর এরকম নির্দেশ সন্তোষের সঙ্গে পালন করা মানুষের জন্য দুরূহ। তাই বলেছেন— তোমরা এমতাবস্থায় আন্তরিকভাবে অপ্রসন্ন তো হবেই, আর আল্লাহ্ও সে গোপন অসন্তোষকে প্রকাশ করে দিবেন।

শেষোক্ত আয়াতে (৩৮) বলা হয়েছে— 'দ্যাখো, তোমরাই তো তারা, যারা যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। যারা কার্পণ্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মতো হবে না'।

এখানে 'হা আনতুম হাউলায়ি তুদআ'উনা লি তুনফিকু ফী সাবীলিল্লাহ' অর্থ দ্যাখো, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে। এখানে 'হাআনতুম হাউলায়ি' কথাটির 'হা' সতর্কতাসূচক। 'আনতুম' (তোমরা) এখানে উদ্দেশ্য এবং এর বিধেয় হচ্ছে 'হাউলায়ি' (তারা)। অথবা 'হাউলায়ি' এখানে সম্বোধিত শব্দ এবং এখানে সম্বোধনসূচক অব্যয় রয়েছে উহ্য এবং 'তাদউনা' (যাদেরকে) এখানে বিধেয়। কিংবা 'হাউলায়ি' হচ্ছে যোজক, 'তাদউনা' যোজ্য এবং যোজক ও যোজ্য মিলে তা হয়েছে 'আনতুম' এর বিধেয়। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— তোমাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে আল্লাহ্র পথে সেই পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করার জন্য, যে পরিমাণ ব্যয় করা আল্লাহ্ তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। যেমন জাকাত, যুদ্ধের জন্য জরুরী ব্যয়। কিন্তু কেউ কেউ এব্যাপারে প্রদর্শন করে কার্পণ্য, যা নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

'যারা কার্পণ্য করে,তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি' অর্থ আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার প্রতিফল তো ভোগ করতে তাদেরকেই। অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে ব্যয় করার সুফল এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করার কুফল ভোগ করতে হবে তোমাদেরকেই, অন্যদেরকে নয়। সুতরাং সাবধান! হজরত ইবনে মাসউদ থেকে বোখারী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার আমাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের জন্য উপকারী ধনসম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের ধনসম্পদকে অধিক পছন্দ করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমরা তো প্রত্যেকেই অধিক পছন্দ করি ওই ধন-সম্পদকে যা আমাদের কাজে লাগে। তিনি স. বললেন, তাহলে শোনো, নিজের উপকারে আসে ওই সম্পদ, যা ব্যয় করা হয় পরকালের কল্যাণার্থে। আর উত্তরাধিকারীদের সম্পদ সেগুলোই, যেগুলো পৃথিবীতে ছেড়ে চলে যেতে হয়।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, প্রতি প্রভাতে আকাশ থেকে দু'জন ফেরেশতা নেমে আসে। তাদের একজন বলে, সত্যের পথে যারা খরচ করে, তাদেরকে তুমি প্রতিদান দাও। অন্যজন বলে, হে আল্লাহ্! যারা সম্পদ ধরে রাখে, তাদের সম্পদ তুমি ধ্বংস করে দাও।

বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আসমা বলেছেন, রসুল স. আমাকে আজ্ঞা করেছেন, খরচ করো। গননা কোরো না। নচেৎ আল্লাহ্ও গুনে গুনে দিবেন। সম্পদকে বেঁধে রেখো না, নতুবা আল্লাহ্ও তোমাকে বেঁধে রাখবেন। বরং অল্প অল্প করে দান করতে থাকো, যতদূর পারো। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক আরো উল্লেখিত হয়েছে, হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, হে আদম কুলোদ্ভরা! খরচ করো, আমিও তোমাদের জন্য খরচ করবো।

'আল্লাহ্ অভাব মুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত' অর্থ তোমাদের ইবাদত এবং দানখয়রাতের মুখাপেক্ষী আল্লাহ্ মোটেও নন। বরং তোমরা ইহ-পরকাল সর্বত্রই সর্ববিষয়ে তাঁরই মুখাপেক্ষী। এজন্যই আদেশ তাঁর এবং তা প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমাদের।

'যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মতো হবে না' কথাটির অর্থ— হে শেষ রসুলের সহচরবৃন্দ! হুঁশিয়ার হও। তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ব্যাপারে অনীহ হও, তবে তোমাদের স্থলে আল্লাহ্ অন্য এক সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যারা আমার নির্দেশাদি পালনে অনীহা প্রকাশ করবে না।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'অন্য জাতি' অর্থ বনী কিনদাহ্ এবং নাখা। হাসান বলেছেন, কথাটির অর্থ অনারব কোনো সম্প্রদায়। আর ইকরামা বলেছেন, এর অর্থ পারস্যবাসী ও সিরিয়াবাসী।

হজরত আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার এই আয়াত পাঠ করলে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! ওই জাতি কারা, আমরা বিমুখ হলে যাদেরকে আমাদের স্থলাবর্তী করা হবে? তিনি স. পাশে উপবিষ্ট সালমান ফারসীর উরুদেশ চাপড়িয়ে বললেন, এই ব্যক্তি এবং তার সম্প্রদায়। সত্যধর্ম যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলেও চলে যায়, তবুও পারস্যের কিছু লোক সেখান থেকে তাকে ছিনিয়ে আনবে। বাগবী, তিরমিজি, হাকেম, ইবনে হাব্বান। তিরমিজি ও হাকেম এই হাদিসকে সনাক্ত করেছে শুদ্ধসূত্রসম্বলিত হাদিস বলে।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বোখারী, মুসলিম এবং হজরত ইবনে মাসউদ থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, ইমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলীতে গিয়ে লুকায়, তবুও পারস্যের কিছুসংখ্যক লোক তাকে খুঁজে পাবে। শিরাজী তাঁর 'আলকাব' গ্রন্থে কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদার বর্ণনা থেকে এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিবরানী এই হাদিসকে বর্ণনা করেছেন আরো কিছু কথা সহযোগে।

অতিরিক্ত বিবরণটুকু হচ্ছে— আরবেরা তখন তাকে পাবে না, পাবে পারস্যের কিছু লোক। মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী শাফেয়ী শায়েখ জালালুদ্দিন সুয়ূ্তির বক্তব্যরূপে উল্লেখ করেছেন, এই হাদিসের উদ্দেশ্য ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সহচরবর্গ। কেননা আর কোনো পারস্যবাসী তাঁর মতো ধর্মজ্ঞ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেননি। তাঁর পিতামহ ছিলেন পারস্যবাসী। ইমাম আবু হানিফার সন্তানগণও ছিলেন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। যেমন তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন আবু আলী কলন্দর পানিপথী, কুতুবে জামান বোরহান হাঁশুবী ও শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী।

সুরা মুহাম্মাদের মাযহারী ব্যাখ্যা শেষ হলো আজ ২৭ শে জমাদিউস আউয়াল, ১২০৮ হিজরী সনে। আল্লাহ্ সকাশে এইমর্মে প্রার্থনা জানাই যে, এই সুরার তাফসীর সেরকম কল্যাণকর হোক, যেরকম কল্যাণকর হয়েছিলো রসুল স. এর প্রিয়ভাজনগণের উপর। হে আল্লাহ্! এই সুরার ব্যাখ্যা সমাপ্ত হওয়ার সওয়াব তুমি প্রেরণ করো তোমার প্রেমাস্পদ মোহাম্মদ মোস্তফা স., তাঁর সহচরবৃন্দ, বংশধরবর্গ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার পরিজন, তাঁর পবিত্র পত্নীগণের প্রতি এবং উম্মতের আউলিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি, বিশেষ করে শায়েখ শামসুদ্দীন হাবীবুল্লাহ্ মাযহারে শহীদ জানে জাঁনা ও তাঁর ঊর্ধ্বতন পীর-মাশায়েখগণের প্রতি। আমিন।

সূরা ফাতাহ্

এই সুরা অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়। এতে রয়েছে ৪টি রুকু এবং ২৯টি আয়াত।

সূরা ফাতাহ্ ঃ আয়াত ১, ২, ৩, ৪, ৫

❑ নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়,

❑ যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,

❑ এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।

❑ তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তাহারা তাহাদের ঈমানের সহিত ঈমান দৃঢ় করিয়া লয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

❑ ইহা এইজন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং তিনি তাহাদের পাপ মোচন করিবেন; ইহাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।

প্রথমে বলা হয়েছে 'ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্হাম্ মুবীনা'। এর অর্থ— নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।

ইমাম আহমদ, বোখারী, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, আমি এক সফরে রসুল স. এর সঙ্গী ছিলাম। তখন আমি তাঁকে একটি বিষয়ে পর পর তিনবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি স. নিরুত্তর রইলেন। আমি মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, ওমর! তোমার জন্য আক্ষেপ! তিনবার প্রশ্ন করেও তুমি জবাব পেলে না। এরপর আমি আমার উটকে আগে বাড়ালাম এবং অন্যদের চেয়ে অনেক আগে চলে গেলাম। ভাবতে লাগলাম, মনে হয় আমাকে তিরস্কার করে কোনো আয়াত অবতীর্ণ হবে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই শুনতে পেলাম পেছন থেকে কে যেনো আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রসুল স. এর পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম। তিনি স. বললেন, আজ রাতে আমার উপরে এমন একটি সুরা নাজিল হয়েছে, যা ওই সকল সামগ্রী অপেক্ষা আমার কাছে অধিক প্রিয়, যেগুলোর উপরে সূর্যালোক পতিত হয়। এরপর তিনি স. পাঠ করতে শুরু করলেন ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্হাম্ মুবীনা......'।

হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমা ও মারোয়ান ইবনে হাকাম থেকে হাকেম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন, সুরা ফাতাহ্ আদ্যোপান্ত অবতীর্ণ হয়েছে মক্কামদীনার মধ্যবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে। কিন্তু 'বিজয়' বলে এখানে কোন্ বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। হজরত আনাস সূত্রে কাতাদার মাধ্যমে আবু জাফর রাজী বর্ণনা করেছেন, এখানে বলা হয়েছে মক্কাবিজয়ের কথা। কেননা মক্কাবিজয় ছিলো সুনিশ্চিত। সেই নিশ্চিতিকে বুঝানোর জন্যই এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালবাচক বক্তব্যভঙ্গি, যেনো মক্কাবিজয় ইতোমধ্যে সুসম্পন্ন হয়েই গিয়েছে। নিশ্চিত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এখানে করা হয়েছে এভাবেই।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিকেই এখানে বলা হয়েছে 'ফাতহে মুবীন' বা প্রকাশ্য বিজয়। ইমাম আহমদ, ইবনে সা'দ, আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে মুনজির, ইবনে মারদুবিয়া ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হজরত মাজমা ইবনে হারেছিয়া আনসারী বলেছেন, আমরা হুদায়বিয়া থেকে কুরাউলগামীমের দিকে ফিরতেই রসুল স. এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি স. আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমরা সকলে যখন তাঁর কাছে সমবেত হলাম, তখন তিনি স. আমাদেরকে পাঠ করে শোনালেন 'নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়'। আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! এটাই কি বিজয়! তিনি স. বললেন, যাঁর অলৌকিক অধিকারে আমার জীবন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ! নিঃসন্দেহে এটাই সুস্পষ্ট বিজয়। হজরত সিদ্দিকে আকবর বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির চেয়ে বড় কোনো বিজয় ইসলামে হয়নি। হজরত বারা থেকে বাগবীও এরকম বর্ণনা করেছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলার কারণ এইযে, এটা হচ্ছে বিজয়ের অবতরণিকা। কথাটিকে আবার এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়— কোনো কিছুর বাঁধন খুলে দেওয়ার নামই তো বিজয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ায় সেই বাঁধনই খুলে গিয়েছিলো। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীরা বাঁধা পড়েছিলো নিজ নিজ সীমানায়। সন্ধির পরে যখন তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মেলামেশা শুরু হলো, তখন ইসলামের ঔদার্য ও মহত্বের জয়যাত্রা হয়ে পড়ে অপ্রতিরোধ্য।

কারো কারো মন্তব্য হচ্ছে, এখানে বিজয় দান করার অর্থ সিদ্ধান্ত দেওয়া। অর্থাৎ হে আমার রসুল! আমি মক্কা বিজয়ের সিদ্ধান্ত দিয়েই দিয়েছি। আগামী বছর আপনি মক্কায় প্রবেশ করবেন বিজয়ীর বেশে।

শা'বী লিখেছেন, এই বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধিজাত বিজয়। কেননা এতে রসুল স. এর অগ্র-পশ্চাৎ সকল অনবধানতাকে মার্জনা করার শুভ সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এর পরে দেওয়া হয়েছে খায়বরের খর্জুরোদ্যানের কর্তৃত্ব। আরো দেওয়া হয়েছে কোরবানীর পশু জবেহ করার স্থান পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হওয়ার কথা। সম্মুখসমরে রোমীয়রা বিজয়ী হয় ইরানীদের উপর। গ্রন্থধারী রোমীয়দের বিজয় হয়েছিলো অগ্নিউপাসকদের উপর। এরপর বিজয়ী হলো মুসলমানেরাও।

জুহুরী লিখেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি অপেক্ষা বড় কোনো বিজয় কখনো হয়নি। এর ফলে ইমানদার ও কাফেরেরা ব্যাপকভাবে মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে ইমানদারদের শুভচিন্তা, উন্নত চরিত্র কাফেরদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাই দেখা যায়, বছর তিনেকের মধ্যে অধিকাংশ কাফের স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়ে যায়। মুসলমানেরা সংখ্যায় হতে থাকে গরিষ্ঠতর।

জুহাক বলেছেন, এই মহাবিজয় সংঘটিত হয়েছিলো যুদ্ধ ব্যতিরেকেই। বায়যাবী লিখেছেন, রসুল স. যখন বিরুদ্ধপক্ষীয়দের উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তখনই সম্পাদিত হয়েছিলো এই সন্ধিচুক্তিটি। তাই এই সন্ধির নাম দেওয়া হয়েছে 'সুস্পষ্ট বিজয়'। উল্লেখ্য, সন্ধিরপ্রস্তাব এসেছিলো

সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট থেকে এবং এই চুক্তিই হয়ে গিয়েছিলো মক্কাবিজয়ের কারণ বা মাধ্যম। এভাবে মক্কাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত করতে পেরেছিলেন বলেই রসুল স. মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন আরবের অন্যান্য গোত্রের দিকে। ফলে অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছিলো ইসলাম গ্রহণের।

পরের আয়াতে বলা হয়েছে— 'যেনো আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন'।

এখানে 'লিইয়াগ্ফির' অর্থ মার্জনা করেন। অর্থাৎ মার্জনা করেন ওই সকল অনবধানতা ও অনুত্তমতা, যেগুলো সংঘটিত হয়েছে এবং হবে অংশীবাদিতার মূলোৎপাটনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কিছু করতে গিয়ে— তাদের কবল থেকে দুর্বল মুসলমানদেরকে মুক্ত করতে গিয়ে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানকার 'লিইয়াগ্ফির' কথাটির 'লাম' পরিণামপ্রকাশক। কথাটির অর্থ হবে— যাতে করে তিনি মার্জনা করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে দিতে পারেন পরিপূর্ণ অনুগ্রহ ও সামগ্রিক বিজয়।

হোসাইন ইবনে ফজল বলেছেন, এখানে 'লিইয়াগ্ফির' এর 'লাম' এর সম্পর্ক রয়েছে 'ওয়াস্তাগফির লিজাম্বিকা ওয়াল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতি' (ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও বিশ্বাসবান-বিশ্বাসবতীদের ক্রটির জন্য) আয়াতের সঙ্গে। যেমন 'লিইলাফি কুরাইশ' এর 'লাম' এর সম্পর্ক রয়েছে 'ফাজ্বাআ'লাহুম কাআ'স্ফিম্ মা'কূল' আয়াতের সঙ্গে। কিন্তু হোসাইন ইবনে ফজলের এমতো ব্যাখ্যার কোনো যুক্তি নেই।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে উহ্য রয়েছে 'ফাশ্কুর'(কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কোরো) ক্রিয়াটি এবং ওই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে 'মার্জনা করেন' কথাটির। অথবা এখানে উহ্য রয়েছে 'ফাস্তাগ্ফির' এবং এর সম্পর্ক রয়েছে, 'লাম' এর সাথে। এরকম বলেছেন, মোহাম্মদ ইবনে জারীর। তিনি আরো বলেছেন, এখানকার 'লিইয়াগ্ফির' এর ঝোঁক রয়েছে 'ইজা জ্বাআ নাস্রুল্লহি ওয়াল ফাত্হ্' আয়াতের দিকে। অর্থাৎ সুরা নসরের এই আয়াতেও আল্লাহ্ সাহায্য ও বিজয়ের অঙ্গীকার প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করেছেন ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার কথা। তাই বুঝতে হবে, এখানেও যেনো 'মার্জনা করেন' কথাটির মধ্যে রয়েছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার নির্দেশ।

'তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রটিসমূহ' অর্থ যে সকল ভুল সম্পাদিত হয়েছে আপনার নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে এবং যে সকল ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার পর। কিন্তু এ কথা বলা যেতে পারবে না যে, রসুল স. কোনো পাপ করেছেন। পাপ ও ভুল নিশ্চয় এক কথা নয়। বরং মনে করতে হবে এখানে 'ক্রটি' অর্থ অনুত্তমতা। অর্থাৎ আপনার সকল কিছু অত্যুত্তম হওয়াই সমীচীন। কেবল উত্তম আপনার জন্য অশোভন। তাই সেরকম কিছু যদি হয়ে থাকে, অথবা ভবিষ্যতে হয়ে যায়, তাই আপনি নিরবচ্ছিন্ন অত্যুত্তমতা প্রার্থনা করুন আমার কাছে। 'পুণ্যবানগণের পুণ্য নৈকট্যভাজনগণের নিকটে পাপ' কথাটি স্মরণীয়।

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, এখানে 'মা তাক্বাদ্দাম' অর্থ সেই সকল ভুল, যা ঘটেছিলো তাঁর নবুয়ত লাভের পূর্বে এবং 'মা তাআখ্খার' অর্থ যে ভুল এখনো হয়নি, অথচ ভবিষ্যতে যা হওয়া সম্ভব। এটা হচ্ছে আরবীয় এক বিশেষ বাগধারা। যেমন তারা বলে থাকেন— জায়েদ যাকে দেখেছে তাকেও দিয়েছে, দিয়েছে তাকেও যাকে সে কখনো দেখেইনি। অথবা— যাকে সে পেয়েছে, তাকেই মেরেছে, আবার তাকেও মেরেছে, যাকে পায়নি।

আতা খোরাসানি বলেছেন, এখানে 'অতীত ক্রটি' হচ্ছে আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার অনবধানতা আর ভবিষ্যত ক্রটি' হচ্ছে তাঁর উম্মতের ভুলভ্রান্তি ও পাপ, যা মার্জনা করা হয়েছে আপনার দোয়ার বরকতে।

'তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন' এই কথাটির মধ্যে রয়েছে রসুল স.কে প্রদত্ত সকল অনুগ্রহের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারানুসারেই ক্রমে ক্রমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিপূর্ণরূপে। দূর হয়েছে অজ্ঞতার অন্ধকার, সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতাপ। এর পর থেকেই বিশ্বাসীরা পেয়েছে পূর্ণ নিরাপত্তা, নিরুপদ্রব চলাচল এবং হজ-ওমরা শান্তির সঙ্গে সম্পাদন করার সুযোগ। সুরা মায়েদার 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম' এই আয়াতে কথাটি বলা হয়েছে আরো স্পষ্ট করে। এ সকল কিছুই অর্জিত হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির অনুসরণে।

'তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন' কথাটির মধ্যে রয়েছে নবুয়ত, সুশাসন ও সকল কিছুর সুব্যবস্থা নিশ্চিত করে দেওয়ার অঙ্গীকার। কোনো কোনো আলেম কথাটির অর্থ করেছেন এভাবে— আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ্পাক দান করবেন সরল পথের বিবরণ। কেউ কেউ বলেছেন, কথাটির অর্থ— সরল পথে সুদৃঢ় রাখবেন, অথবা— বিজয়ের সঙ্গে মার্জনা যেমন আপনাকে দান করবেন, তেমনি দান করবেন এমন মত ও পথ, যার বিধিবিধান কখনো রহিত হবে না।

এরপরের আয়াতে (৩) বলা হয়েছে— 'এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন'।

একটি সংশয় ঃ প্রথমে বিজয়, তারপর ক্ষমা প্রদানের ঘোষণা দেওয়ার পর এসেছে বলিষ্ঠ সাহায্য প্রদানের কথা। সুতরাং এখানে বক্তব্যের ধারাবাহিতা ক্ষুণ্ন হলো না কি। সাহায্যের প্রশ্ন তো ওঠে বিজয়ের পূর্বে। কেননা সাহায্যই হচ্ছে বিজয়ের ভিত্তি।

সংশয় খণ্ডন ঃ এখানে ‘বিজয়’ অর্থ যদি হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়, তাহলে বলা যেতে পরে যে, সন্ধিটি তো সম্পাদিত হয়েছিলো আল্লাহ্র নির্দেশানুসারে। আর আল্লাহ্র নির্দেশ পালনই তো সকল সাহায্যের ভিত্তি। আর এখানে ‘বিজয়’ অর্থ যদি মহাবিজয় হয়, তাহলে বুঝতে হবে এখানে বিজয় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। প্রতিশ্রুতিই সাহায্যের মূল ভিত্তি। আর সাহায্য, বিজয়ের পূর্বগামী।

‘নাসরন আ’যীযা’ অর্থ বলিষ্ঠ সাহায্য। উল্লেখ্য, এরকম বলিষ্ঠ সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই হতে পারেন সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। এখানে কথাটি বলা হয়েছে

অধিকতর দৃঢ়তা প্রকাশনার্থে। কিংবা ‘আ’যীযা’ (বলিষ্ঠ) অর্থ এখানে অপ্রতিরোধ্য। অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে দান করেন অপ্রতিরোধ্য সাহায্য, যাতে কেউই আপনার উপরে জয়ী না হতে পারে।

বোখারী ও মুসলিমের স্বরচিত গ্রন্থদ্বয়ে এবং তিরমিজি ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সাহাবীগণ ছিলেন বিষণ্ন ও বিমর্ষ। তখন অবতীর্ণ হয় ‘ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্হাম মুবীনা’। তখন তিনি স. উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, আজ আমার উপরে এমন এক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার কাছে সমস্ত দুনিয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়। জনৈক সাহাবী বলে ওঠেন, আল্লাহ্র রসুলের জয় হোক। আল্লাহ্ যা করবেন তাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন এই আয়াতে। এরপর অবতীর্ণ হয় ‘আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য’ (৫ম সংখ্যক আয়াতের শেষ) পর্যন্ত।

এরপরের আয়াতে (৪) বলা হয়েছে— ‘তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন, যেনো তারা তাদের ইমানের সঙ্গে দৃঢ় করে নেয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’। একথার অর্থ— আল্লাহ্ই বিশ্বাসীগণের হৃদয়ে অপার্থিব এক শান্তিপ্রবাহ জারী করে দেন, ফলে তাদের বিশ্বাস হয় অধিকতর উজ্জ্বল, সবল ও পরিণত। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সুব্যবস্থাপনা যে সকল ফেরেশতা নিশ্চিত করে চলেছে, ওই সকল ফেরেশতাবাহিনী সম্পূর্ণতই আল্লাহ্র কর্তৃত্বাধীন। এই মহাব্যবস্থাপনা ও মহানিয়ন্ত্রণ একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ ও মহাপ্রজ্ঞাধারী।

এখানে ‘মুমনিদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন’ অর্থ তাদেরকে প্রদান করেন ধৈর্য, স্থৈর্য ও অটলতা, যেনো যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অন্তরে সৃষ্টি না হতে পারে কোনো উদ্বেগ, শংকা, অথবা নৈরাশ্য। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের অন্তরে সৃষ্টি করে দেন অযৌক্তিক ক্রোধ।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্’র সাক্ষ্য দিতে, এর প্রচার করতে। মানুষ যখন এই বাক্যে আস্থা স্থাপন করলো, তখন আল্লাহ্ এর সমন্বয়ে নির্দেশ দান করতে লাগলেন নামাজের, জাকাতের, রোজার ও হজের। এরপর যোগ করলেন জেহাদের অত্যাবশ্যকতা। শেষে ঘোষণা করলেন ধর্মকে পরিপূর্ণ করার কথা। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিশ্বাসীগণের বিশ্বাসকে করা হয়েছে বর্ধিত, বিস্তৃত ও বলিষ্ঠ। উল্লেখ্য, মুসলমানদের দুর্বলতার কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়নি। বরং চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিলো আল্লাহ্র নির্দেশে ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বাবধানে। সেকারণেই এখানে বলা হয়েছে— এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

এরপরের আয়াতে (৫) বলা হয়েছে— ‘এটা এজন্য যে, তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন, এটাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য’। একথার অর্থ— আল্লাহ্ জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য যে,

তিনি ইমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে প্রবেশ করাবেন বেহেশতে, যার পাদদেশে রয়েছে প্রবহমান নদী। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং তিনি তাদেরকে চিরদিনের জন্য ক্ষমা করে দিবেন। আর এটাই আল্লাহ্র বিবেচনায় তাদের জন্য মহাসাফল্য।

এখানকার ‘দাখিল করবেন’ এবং ‘পাপমোচন করবেন’ কথা দু’টোর সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতের ‘ইমান দৃঢ় করে নেয়’ কথাটির সঙ্গে। অথবা কথা দু’টো ‘ইমানকে দৃঢ় করে নেয়’ এর ‘বদলে ইশতেমাল’ বা যুগপৎ অনুবর্তী। কিংবা সংযোজক শব্দটি এখানে রয়েছে উহ্য এবং ওই উহ্য শব্দটি সম্পর্কযুক্ত আগের আয়াতের ‘প্রশান্তি দান করেন’ কথাটির সঙ্গে। কিংবা বাক্য দু’টি ২ সংখ্যক আয়াতের ‘মার্জনা করেন’ এর যুগপৎ অনুবর্তী এবং সম্পর্কযুক্ত প্রথম আয়াতের 'সুস্পষ্ট বিজয়' এর সঙ্গে। এমতাবস্থায় বুঝতে হবে, মাঝখানের ‘তিনিই মুমিনদের অন্তরে শান্তিদান করেন’ কথাটি ভিন্ন প্রসঙ্গের। আর এখানকার ‘এটাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য’ অর্থ এই যে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং পাপমুক্ত হতে পারার বিষয়টি আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তার বান্দাদের জন্য এক মহাসফলতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কেননা চিরকালীন ক্ষতি থেকে চিরমুক্তি এবং স্থায়ী নিরাপত্তা লাভই যে চূড়ান্ত পর্যায়ের কৃতকার্যতা, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

সূরা ফাতাহ্ ঃ আয়াত ৬, ৭, ৮, ৯

❑ আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র উহাদের জন্য, আল্লাহ্ উহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

❑ যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে শক্তি যোগাও ও তাহাকে সম্মান কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— জেহাদের নির্দেশদানের আর একটি কারণ এই যে, যারা ধর্মযুদ্ধে আল্লাহ্‌র বাহিনীর প্রতিপক্ষ হয়, সেই সকল মুনাফিক নারী পুরুষ ও পৌত্তলিক নারী-পুরুষকে আল্লাহ্ শাস্তিদান করবেন। কেননা সৃষ্টির প্রতি অসীম মমতাপরবশ আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের ধারণা অতি মন্দ। পরকালে তারা সম্মুখীন হবে চরম অমঙ্গলের। আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তাদেরকে করেছেন অভিসম্পাতগ্রস্ত। আর তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন দোজখকে। আহা, তারা যদি জানতো, কতোইনা নিকৃষ্ট সেই আবাস।

এখানকার 'শাস্তি দিবেন' কথাটির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে আগের আয়াতে 'প্রবেশ করাবেন' এর সঙ্গে। অর্থাৎ কপটাচারী ও অংশীবাদীদের অবস্থা হবে বিশ্বাসীদের বিপরীত। বিশ্বাসীগণকে যেমন স্বর্গে প্রবেশ করানো হবে, তেমনি অবিশ্বাসীদেরকে প্রবেশ করানো হবে নরকে। আবার উভয় দলের স্বস্তি ও শাস্তি হবে চিরকালীন। আর এখানে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। নির্ধারণ করে তাঁর অংশীদার ও সমকক্ষ। আবার আল্লাহকে ছেড়ে তারা ওই সকল মিথ্যা অংশীদারগুলোর উপাসনাও করে নির্দ্বিধায়। আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করার বিষয়টি এরকমও হতে পারে যে, তারা মনে করে, আল্লাহ্ তাঁর রসুল ও রসুলের সহচরবর্গকে সাহায্য করবেন না। ফলে তাঁর রসুল নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন না। এভাবে এখানকার 'যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেকে শাস্তি দিবেন' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসুল এবং রসুলের বিশ্বস্ত অনুগামীগণের প্রতি অসৎ ধারণা পোষণ করার প্রতিফল শাস্তিরূপে প্রত্যাবর্তিত হবে তাদের দিকেই। আর এখানাকার 'আল্লাহ্ তাদেরকে লানত করেছেন' অর্থ আল্লাহ্ তাদেরকে পরকালে শাস্তি তো দিবেনই, উপরন্তু শাস্তি দিয়েছেন এই দুনিয়ায়। সেকারণেই তারা আল্লাহ্‌র বাহিনীর হাতে বার বার হয়েছে নিহত, বন্দী এবং শেষে হতে চলেছে চূড়ান্তরূপে পরাজিত।

পরের আয়াতে (৭) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

এখানে 'ওয়া লিল্লাহি জুনুদুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব' অর্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই। অর্থাৎ সকল ক্ষমতাই তাঁর। আর তিনি প্রজ্ঞাময়ও। তাই তিনি তাঁর চিরস্বাধীন অভিপ্রায় ও প্রজ্ঞানুসারে যেভাবে চান সেভাবেই সবকিছু পরিচালনা করেন। নস্যাত করে দেন তাঁর রসুল ও রসুলের

অনুগামীদের বিরুদ্ধাচরণ যারা করে, তাদের সকল ষড়যন্ত্র। আর যখন তাদেরকে শাস্তিদান করেন, তখন কেউ অথবা কোনোকিছুই তাঁর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না।

এরপরের আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে— 'আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে (৮), যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনো এবং রসুলকে শক্তি যোগাও ও তাঁকে সম্মান করো; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো' (৯)। একথার অর্থ— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি আমার নিরঙ্কুশ এককত্বের সাক্ষ্যদাতারূপে, বিশ্বাসীগণকে বেহেশতের শুভসমাচারদাতা এবং অবিশ্বাসীদেরকে দোজখ সম্পর্কে সতর্ককারীরূপে। অতএব হে মানুষ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো আমার প্রতি, আমার বার্তাবাহকের প্রতি। সুতরাং তোমরা সহায়তা করো তাঁকে তাঁর বার্তাবহনকর্মে, প্রদর্শন করো তাঁর প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান এবং এই মহাসৌভাগ্যপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বিশুদ্ধচিত্তে সকাল-সন্ধ্যায় বর্ণনা করো আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা।

এখানে 'তুয়াযিরূহু' অর্থ তাঁকে সাহায্য কোরো, 'তুয়াক্বক্বিরূহু' অর্থ তাঁকে সম্মান করো এবং 'সাব্বিহুহু' অর্থ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। অথবা পাঠ করো নামাজ।

এখানকার তিনটি 'হু' সর্বনামই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত। এখানে 'সাহায্য করো' বা 'শক্তি যোগাও' অর্থ সাহায্য করো আল্লাহ্র মনোনীত ধর্মের এবং তাঁর রসুলের। আবার 'শক্তিযোগাও' কথাটির অর্থ এখানে এরকমও হতে পারে যে, সর্বশক্তি দিয়ে তোমরা অভিমুখী হও কেবল আল্লাহ্র প্রতি, মনোযোগী হয়ো না অন্য কারো অথবা কোনো কিছুর দিকে এবং বলো, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো দিক থেকে কোনো সাহায্যও নেই, কোনো শক্তিও নেই)। বাগবী লিখেছেন, 'তাঁকে সাহায্য কোরো', 'তাঁকে সম্মান কোরো' বাক্যদু'টিতে কর্মপদীয় সর্বনাম (হু) 'তাকে' মিলিত হবে রসুল স. এর সাথে। আর 'তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কোরো' বাক্যে 'তাঁর' যুক্ত হবে আল্লাহ্র সাথে। এ ব্যাখ্যার পেক্ষাপটে সর্বনামের বিশৃঙ্খলার কারণে জমখশারী বলেন, ব্যাখ্যাটি অসঙ্গতিপূর্ণ। আমরা বলি—রীতি বিরুদ্ধ না হলে অথবা ভাবের সঙ্গতি থাকলে কোনোই অসুবিধা নেই।

সূরা ফাতাহ্ ঃ আয়াত ১০

❑ যাহারা তোমার হাতে বায়'আত করে তাহারা তো আল্লাহ্রই হাতে বায়'আত করে। আল্লাহ্র হাত তাহাদের হাতের উপর। অতঃপর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাহাকে মহাপুরস্কার দেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! এই হুদায়বিয়া প্রান্তরে যারা এখন আপনার হাতে হাত রেখে জেহাদ ও ধর্মপারায়ণতার বায়াত গ্রহণ করছে, তারা প্রকৃত অর্থে বায়াত গ্রহণ করছে আল্লাহ্র কাছে। এরপর যদি কেউ এই বায়াত ভঙ্গ করে, তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে এর ভয়াবহ প্রতিফল। আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে শাস্তিদান করবেনই। আর যারা এই বায়াত অনুসারে তার কৃত অঙ্গীকার যথারীতি পালন করে চলবে, তিনি অবশ্যই তাকে দান করবেন অক্ষয় পুরস্কার।

এখানে 'যারা তোমার হাতে বায়াত গ্রহণ করে' অর্থ হে রসুল! যারা আপনার কাছে এই মর্মে জেহাদের অঙ্গীকার করে যে, তারা কোনোক্রমেই জেহাদের ময়দান থেকে পশ্চাপসরণ করবে না, মৃত্যু অথবা বিজয় পর্যন্ত প্রাণপনে লড়াই করে যাবে। 'তারা তো আল্লাহ্র হাতে বায়াত গ্রহণ করে' অর্থ হে আমার রসুল! আমার কাছে বায়াত গ্রহণ করতে হলে তো অবশ্যই বায়াত গ্রহণ করতে হবে আপনার কাছেই, কেননা আপনিই আমার নিযুক্ত প্রতিনিধি, আমার রসুল।

'ইয়াদুল্লহি ফাওক্বা আইদীহিম' (আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর) এই বাক্যটির ভিত্তি এখানে ইস্তেআ'রায়ে তাখলিয়া (সংবেদী উপমার) উপর। অর্থাৎ রসুল স. এর হাতে বায়াত হওয়াকে যখন এখানে আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন হাতে বায়াত হওয়ারূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন এরকম ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, তাহলে রসুলের হাতই আল্লাহ্র হাত। তাই অপধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাটুকুকে তিরোহিত করার উদ্দেশ্যে এখানে বলা হয়েছে 'আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর'। অর্থাৎ রসুল ও তাঁর কাছে বায়াত গ্রহণকারীদের হাতের চেয়ে আল্লাহ্র হাত ভিন্ন। কেননা তিনি আকারসম্ভূত নন। অর্থাৎ বায়াতকারী ও বায়াত গ্রহণকারীদের বায়াত অনুমোদন করে যে হাত সে হাত আল্লাহ্র এবং অবশ্যই সে হাত অন্য কারো মতো হওয়া থেকে পবিত্র। সে হাত আনুরূপ্যবিহীন।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের কল্যাণদানের যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা পরিপূর্ণ করবার জন্য আল্লাহ্র আনুরূপ্যবিহীন হাত তাঁদের হাতের উপরে ছিলো। আমি বলি, হজরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তখন

তাঁদের হাতের উপরে রেখেছিলেন তাঁর অঙ্গীকার সম্পন্ন করার হাত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র হাতকে মনে করতে হবে তাঁর এক বিশেষ গুণ, আর সে গুণও হবে তাঁর অন্যান্য গুণের মতো আনুরূপ্যবিহীন, যা কল্পনার অতীত।

কালাবী বলেছেন, এখানে 'আল্লাহ্‌র হাত' অর্থ তাঁর পক্ষ থেকে সৎপথ প্রাপ্তির অনুগ্রহ। আর তাঁর এমতো অনুগ্রহের অর্থ হবে, সাহাবীগণ রসুল স. এর নিকটে আনুগত্যের যে শপথ নিয়েছিলেন, তদপেক্ষা অনেক উত্তম নেয়ামত সৎপথপ্রাপ্তি বা হেদায়েত তিনি তাঁদেরকে দান করেছিলেন।

মুজাহিদ ও কাতাদা সূত্রে আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে জারীর, কেবল মুজাহিদ সূত্রে বায়হাকী এবং ইবনে ইয়াজিদ ও মোহাম্মদ ইবনে আমর সূত্রে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়া যাত্রার আগে রসুল স. মদীনায় এক রাতে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি স. তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে শান্তির সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করছেন। তার সঙ্গীগণের কারো কারো মস্তকের কেশ ছিলো মুণ্ডিত এবং কারো কারো মস্তকের কেশ ছিলো ছাঁটা। এমতাবস্থায় কাবাগৃহের চাবি তাঁর হস্তগত হলো এবং তিনি প্রবেশ করলেন কাবাভ্যন্তরে। বাগবী, মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ। মুজাহিদ সূত্রে প্রাপ্ত কোনো কোনো বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, তিনি স. স্বপ্নটি দেখেছিলেন হুদায়বিয়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত বর্ণনাটিই অধিকতর যথাযথ।

ইবনে সা'দ, মোহম্মদ ইবনে ওমর ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন মরুপ্রান্তরবাসীদেরকে তাঁর সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। তিনি আশংকা করছিলেন যে, নিশ্চয় কুরায়েশরা বিনা যুদ্ধে রসুল স. ও তাঁর বাহিনীকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না।

জুহুরী সূত্রে আহমদ, বোখারী, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু দাউদ ও নাসাঈ এবং মারোয়ান ইবনে হাকাম মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমা ওরওয়া—জুহুরী এই সূত্রপরম্পরায় মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়া যাত্রার পূর্বে রসুল স. বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমে গোসল করলেন। তারপর পরিধান করলেন সাহাবীগণ দ্বারা বয়নকৃত নতুন লুঙ্গি ও চাদর। গৃহদ্বারে অপেক্ষা করছিলো তাঁর কাসওয়া নাম্নী উষ্ট্রীটি। তিনি ওই উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। সহ-আরোহিণীরূপে সঙ্গে নিলেন জননী উম্মে সালমাকে। অন্য উটে আরোহণ করে তাঁর সহযাত্রিণী হলেন হজরত উম্মে মুনী, হজরত আসমা বিনতে আমর এবং হজরত উম্মে আম্মারা আশহালীয়া। যাত্রা শুরু হলো। তাঁর সহগামী হলো তখন মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরাও। রসুল স. এর স্বপ্ন ছিলো সন্দেহাতীতরূপে সত্য। তাই যাত্রার সাফল্য সম্পর্কে কারো মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিলো না। নিরাপত্তার জন্য তাঁদের সঙ্গে ছিলো কেবল তরবারী। আর সেগুলোও ছিলো কটিদেশে কোষাবদ্ধ। রসুল স. তাঁর কোরবানীর পশুগুলোকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে পহেলা যিলক্বদ, ৬ষ্ঠ হিজরী, সোমবারে তিনি স. তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন। দ্বিপ্রহরে জুলহুলায়ফায় পৌঁছে জোহরের নামাজ পাঠ করলেন। কোরবানীর জন্য তিনি স. সঙ্গে নিয়েছিলেন সত্তরটি উট। সেগুলোকে বিশেষ পোশাক পরানো হলো। তাদের কয়েকটিকে তিনি স. কেবলামুখী করে দাঁড় করিয়ে নিজে হাতে সেগুলোতে চিহ্ন করে দিলেন। অবশিষ্টগুলোকে চিহ্ন করে দিবার জন্য তিনি স. নির্দেশ দিলেন হজরত নাজ্‌আহ্‌ ইবনে জুনদুবকে। এরপর উটগুলোর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো মালা, যাতে সবাই চিনতে পারে যে, এগুলো কোরবানীর উট। রসুল স. এর দেখা দেখি সাহাবীগণও তাঁদের আপনাপন কোরবানীর পশুগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করে

নিলেন। এ ছাড়া তাঁদের সঙ্গে দুই শত ঘোড়াও ছিলো। এরপর রসুল স. কুরায়েশদের খবরাখবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন হজরত বিশর ইবনে সুফিয়ানকে। আর হজরত উব্বাদ ইবনে বিশরের নেতৃত্বে কুড়িজনের একটি দলকে পাঠালেন অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তিনি স. ওই অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন হজরত সা'দ ইবনে জায়েদ আশহালীকে। এরপর রসুল স. ইহরামের পোশাক পরে দুই রাকাত নামাজ পাঠ করলেন। তারপর মসজিদের দরোজা থেকেই উঠে পড়লেন তাঁর উষ্ট্রীর উপর। উষ্ট্রীটি চলতে শুরু করলো কেবলামুখী হয়ে। তিনি স. এভাবে ইহরাম পরে রওয়ানা হলেন একারণে যাতে তাঁকে দেখে সবাই সহজে বুঝতে পারে যে, তাঁর এই যাত্রা চলেছে হজ প্রতিপালনের জন্য, যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্যে তিনি স. বের হননি।

চলতে চলতে তিনি স. উচ্চারণ করতে লাগলেন 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'। জননী সালমাসহ অধিকাংশ সাহাবীই জুলহুলায়ফাতে ইহরাম বেঁধে নিয়েছিলেন। অবশিষ্ট সাহাবীগণ ইহরাম বাঁধলেন জুহ্‌ফায় গিয়ে। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো বনী বকর, মুজাইনা ও জুহুনিয়া সম্প্রদায়। রসুল স. তাদেরকেও সহযাত্রী হওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে তেমন কর্ণপাত করলো না। উল্টো বরং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, মোহাম্মদ আমাদেরকে এমন সব লোকের সঙ্গে লড়বার জন্য নিয়ে যেতে চায়, যারা অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে। মোহাম্মদ ও তার সাথীরা তাদের গ্রাসে পরিণত হবে। এদেরকে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে হবে না। কেননা এদের তো সেরকম যুদ্ধপ্রস্তুতিই নেই। সংখ্যায়ও যে এরা খুব বেশী, তা-ও নয়। রসদপত্রও তথৈবচ। এই যাত্রায় আর একটি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন হজরত আবু কাতাদা। তিনি ইহরাম পরিহিত ছিলেন। ওই অবস্থায় তিনি শিকার করলেন একটি বন্য গর্দভ এবং তার কিছু অংশ

হাদিয়া হিসাবে পেশ করলেন রসুল স. সকাশে। ঘটনাটি ঘটেছিলো আব্‌ওয়া নামক স্থানে। সুরা মায়িদার তাফসীরে ঘটনাটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে সবিস্তারে।

রসুল স. জুহ্‌ফায় পৌঁছে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন। অবস্থান গ্রহণ করলেন একটি গাছের নিচে। বিশ্রাম গ্রহণের পর সকলকে সমবেত করে বললেন, মনে হয় তোমাদের আগেই আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো। তবে দু'টো জিনিস রেখে যাবো তোমাদের জন্য। ওই দু'টোকে যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাকো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টো জিনিস হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আল্লাহ্‌র রসুলের সুন্নত।

ওদিকে মক্কায় যখন রসুল স. এর হজ ও ওমরা যাত্রার সংবাদ পৌঁছলো, তখন কুরায়েশেরা নিজেদের মধ্যে শুরু করলো শলাপরামর্শ। শেষে ঠিক করলো, মোহাম্মদ ও তার বাহিনীকে বাধা দিতেই হবে, যুদ্ধ তাদের উদ্দেশ্য না হলেও। কেননা তাকে ওমরা পালন করতে দিলেও কথা উঠবে। জনসমক্ষে প্রচার হয়ে

পড়বে যে, আমরা দুর্বল তাই বাধা দিতে পারিনি। তাদের সঙ্গে আমাদের যে দীর্ঘদিনের বিবাদ, সেকথা তো সকলেই জানে। তারা খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে প্রস্তুত করলো দুইশত সৈনিকের একটি বাহিনী। খালেদ তার বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলো। বনী ছাক্বিফ ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রও যোগ দিলো তার সঙ্গে। এভাবে প্রথমে কুরাউলগামীমে এবং পরে বলদাহ্ গিয়ে তাঁবু ফেললো পৌত্তলিক বাহিনী। নারী ও শিশুরাও ছিলো তাদের সঙ্গে। সেখানে প্রধান প্রধান নেতারা খালেদের সঙ্গে শলাপরমর্শ করলো। শেষে সকলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে, পথিমধ্যেই মোহাম্মদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না কোনোক্রমেও। দশজন গুপ্তচরের একটি দল আরো অগ্রসর হয়ে বসে রইলো গিয়ে একটি পাহাড়ের চূড়ায়। ওই চূড়া থেকে তারা রসুল স. এর গতিবিধি দেখতে পাচ্ছিলো। তাই তাঁর গতিবিধির সংবাদ তাদের পশ্চাতের লোকদের কাছে সরবরাহ করতে তাদের কোনো বেগ পেতে হলো না।

রসুল স. হজরত বিশর ইবনে সুফিয়ানকে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে গাদীরে আশতাত নামক স্থানে রসুল স. এর সঙ্গে মিলিত হলেন। বললেন, কুরায়েশেরা আপনার যাত্রার কথা জেনে ফেলেছে। তারা অধিকাংশই মক্কা থেকে বের হয়ে এসেছে। নারী ও শিশুদেরকেও রেখেছে সঙ্গে। এখন তারা আছে জীতাওয়া নামক স্থানে। আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে নিজেদের মধ্যে তারা এই মর্মে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে যে, আপনাকে তারা কিছুতেই মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। তাদের অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক হয়েছে খালেদ ইবনে ওলীদ। সে তার বাহিনী নিয়ে এখন কুরাউলগামীমে। রসুল স. বললেন, আক্ষেপ কুরায়েশদের জন্য। যুদ্ধ যুদ্ধ করেই তারা শেষ হতে চলেছে। কী এমন ক্ষতি হতো, যদি তারা আমাকে স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচার করতে দিতো। তাদের ধর্ম যদি জয়যুক্ত হতো, তবে তাদের বাসনা তো পূর্ণই হয়ে যেতো। আর আল্লাহ্ যদি আমাকে জয়যুক্ত করতেন, তাহলে তারা ও আমরা হয়ে যেতাম একই দলের। এভাবে হয়ে যেতো একটি বৃহৎদল। তারা স্বধর্ম ত্যাগ না করলেও তো আরবীয় হিসেবে শক্তিশালীই থাকতো। বহিঃশত্রুকে ঠেকাতে পারতো সহজে। কী মনে করেছে তারা? ইসলামকে কি আল্লাহ্ বিজয়ী করবেন না? আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এই ইসলামের পক্ষেই আজীবন যুদ্ধ করে যাবো, তারা বিজয়ী হয়ে গেলেও এবং পৃথিবীতে কেবল আমি একা বেঁচে থাকলেও। এরপর রসুল স. সকলকে ডাকলেন। সবাই সমবেত হওয়ার পর শুরু করলেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি। তারপর বললেন, হে বিশ্বাসী জনতা! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। কী করবো আমি? তাদের সঙ্গের নারী ও শিশুদেরকে কি আমরা বন্দী করে তাদেরকে যিম্মী বানাবো? না সংযত হবো। তারা যদি আক্রমণ করে বসে, তবে তো তাদের একদল লোক বেঘোরে প্রাণ হারাবে। আল্লাহ্ তাদেরকে ছাড়বেন না। আর যদি বলো, তবে আমরা আগে তাদেরকে আক্রমণ না করে কেবল ওমরা পালনের জন্য অগ্রসর হই। এরপর যে বাধা দিবে তাদের বিরুদ্ধে কেবল অস্ত্রধারণ করি।

হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আপনি তো কাবা জিয়ারাতের উদ্দেশ্যে পথ চলেছেন। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তো আপনি যাত্রা করেননি। সুতরাং আপনি কেবল কাবামুখী হয়ে অগ্রসর হন। পথে যারা বাধা দিবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করবো। হজরত উসায়েদ হজরত আবু বকরের এই অভিমতের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করলেন।

ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, হজরত আবু বকরের বক্তব্য শেষ হবার পর উঠে দাঁড়ালেন হজরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ। বললেন, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! বনী ইসরাইলেরা তাদের পয়গম্বরকে বলেছিলো, তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়ে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করো, আমরা এখানেই বসে থাকলাম। আমি আপনাকে সেরকম কিছুতেই বলবো না। বলবো, আপনি ও আপনার প্রভুপালক অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেনই। আমরাও হবো আপনার সহযোদ্ধা। রসুল স. বললেন, তাহলে অগ্রসর হও। এমন সময় খালেদ তার বাহিনী নিয়ে অনেক কাছে এসে পড়লো। সাহাবীগণ তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তাই তাঁরা রসুল স.কে ঘিরে ব্যূহ রচনা করলেন। রসুল স. হজরত উব্‌বাদ ইবনে বিশরকে এগিয়ে গিয়ে সকলকে সারিবদ্ধ করতে বললেন। হজরত উব্‌বাদ সারিবদ্ধ সৈন্য নিয়ে দাঁড়ালেন খালেদ বাহিনীর মুখোমুখী। ইত্যবসরে জোহরের

নামাজের সময় হয়ে গেলো। হজরত বেলাল আজান দিলেন। রসুল স. সাহাবীগণকে নিয়ে জোহরের নামাজ সমাপন করলেন। খালেদ তার লোকদেরকে বললো, ওরা নামাজে মগ্ন ছিলো। ওই অবস্থায় আক্রমণ করা সহজ ছিলো। যাহোক, একটু পরে আবার তারা নামাজে দাঁড়াবে। তাদের কাছে তাদের প্রাণ ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রাণ অপেক্ষা নামাজ অধিক প্রিয়। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা সফল হলো না। আসরের আগেই হজরত জিবরাইল নিয়ে এলেন এই আয়াত। 'ওয়া ইজা কুনতা ফীহিম ফাআক্বামতা লাহুমুস্ সলাতা ফালতাক্বুম ত্বয়িফাতুম মিনহুম'। এই বিধানানুসারে রসুল স. আসর নামাজ পড়লেন। এই বিধানের নাম 'সালাতে খওফ'। এ সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে সুরা নিসার তাফসীরে। বিশ্বস্ত সূত্রে হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে মোহাম্মদ ইবনে ওমর ও বায্যার বর্ণনা করেছেন, সন্ধ্যা হলে রসুল স. বললেন, বাম দিকে হেমসের সামনের রাস্তা দিয়ে চলো। কেননা খালেদ কুরায়েশদেরকে নিয়ে এখন অবস্থান করছে কুরাউলগামীমে। সাহাবীগণকে রসুল স. অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাই অযথা সংঘর্ষ কামনা করতেন না। বললেন, হানজল ঘাটি সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে কে জানে? হজরত বুরাইদা ইবনে হাসিব জবাব দিলেন, আমি।

হজরত জাবের থেকে মুসলিম এবং হজরত আবু সাঈদ থেকে আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ার বছরে আমরা রসুল স. সহযাত্রী হলাম। পৌঁছলাম আসফানে। আগের রাতে আমরা ছিলাম হানজল ঘাটিতে। রসুল স. তখন বলেছিলেন, আজ রাতে এই ঘাটির উপমা সেই নগরতোরণের মতো, যাতে প্রবেশ করার আদেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ্ বনী ইসরাইলদেরকে। বলেছিলেন

'তোমরা নতশির হয়ে ওই তোরণমধ্যে প্রবেশ করো, আমি তোমাদের সকল দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিবো। আজ রাতেও তেমনি যে এই ঘাটি অতিক্রম করবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। সাহাবীগণ বললেন, আমাদের আশংকা হয় আমরা আগুন জ্বালালেই তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি স. বললেন, তারা তোমাদেরকে কোনোভাবেই দেখতে পাবে না। শপথ তাঁর, যাঁর আনুরূপ্যবিহীন অধিকারে রয়েছে আমার জীবন, আজ সকলকেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, কেবল ওই লোক ছাড়া, যে সওয়ার হয়ে আছে তার লাল উটের পিঠে। ওই দুর্ভাগা কে, তা জানার জন্য সাহাবীগণ অনুসন্ধান চালালেন। শেষে দেখতে পেলেন লোকটি বনী জমরা গোত্রের। সাহাবীগণ তাকে বললেন, রসুল স. এর কাছে চলো। তিনি তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। লোকটি বললো, আমি খুঁজছি আমার হারিয়ে যাওয়া উট। উটটি যদি আমি পেয়ে যাই, তবে তা হবে আমার কাছে তোমাদের সাথীর দোয়ার চেয়ে অধিক মূল্যবান। ইত্যবসরে আমরা পৌঁছে গেলাম সুরাদা ঘাটির সামনে। তখন হঠাৎ ওই লোকটির উটের পা পিছলে গেলো। উটটি পড়েই মারা গেলো সঙ্গে সঙ্গে। আর কোত্থেকে একটি হিংস্র জন্তু এসে তাকে যখন ভক্ষণ করলো, তখন সকলে জেনে গেলো তার করুণ পরিণতি।

হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমা এবং মারোয়ান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. যখন হুদায়বিয়ার সন্নিকটে পৌঁছলেন, তখন তাঁর উষ্ট্রীটি থেমে গেলো। দেখা গেলো, সে তার সামনের পা মাটিতে গুটিয়ে বসে পড়েছে। সাহাবীগণ বললেন, হট হট। কিন্তু উটনীটি আর উঠলো না। বরং আরো ভালোভাবে বসে গেলো। সাহাবীগণ বলাবলি করতে লাগলেন, কাসওয়া ধুঁকে পড়েছে। রসুল স. বললেন, না, সে ইচ্ছে করে থামেনি। বরং তাকে থামিয়ে দিয়েছেন সেই সত্তা, যিনি থামিয়ে দিয়েছিলেন আবরাহার হস্তীযুথকে। শপথ তাঁর, যার হাতে রয়েছে আমার জীবন, কুরায়েশেরা আজ আল্লাহ্র মহামর্যাদার কথা তুলে যদি কোনো দাবি জানায়, তবে আমি তা মেনে নিবো। এরপর তিনি স. কাসওয়াকে মৃদু ধমক দিলেন। অমনি সে উঠে পড়লো। এরপর যাত্রা শুরু করলো দিক পরিবর্তন করে। হুদায়বিয়া প্রান্তরের একপাশে যেখানে সামান্য পানি ছিলো, সেখানে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন তিনি স.। সাহাবীগণ দেখলেন, কূপটিতে পানি রয়েছে সামান্যই। তাঁদের আশংকা হলো, অল্পক্ষণের মধ্যেই পানি শেষ হয়ে যাবে। হলোও তাই। পানির প্রয়োজন ছিলো সকলেরই। কিছু কিছু করে পানিও ওঠাতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি শুকিয়ে গেলো। সাহাবীগণ রসুল স. সকাশে কথাটি জানালেন। তিনি স. সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তূণীর থেকে একটি তীর বের করে এনে বললেন, এই তীরটি ওই জায়গায় পুঁতে দাও যেখানে এখনো কিছু পানি জমা হয়ে আছে। আদেশ প্রতিপালিত হলো। তীরপ্রোথিত স্থান থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো পানির ফোয়ারা। সকলে প্রয়োজন মতো পানি সংগ্রহ করতে লাগলেন সেখান থেকে। হজরত মুসাওয়ার বর্ণনা করেছেন, কূপ ভরে গেলো কানায় কানায়। সকলে কূপের কিনারা থেকেই পানি সংগ্রহ করতে

লাগলেন। যিনি রসুল স. এর তীরটি মাটিতে গেঁথে দিয়েছিলেন তাঁর নাম ছিলো নাহিয়াহ্ ইবনে জুনদুব। তিনিই রসুল স. এর কোরবানীর উঠগুলি পরিচালনা করছিলেন। মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আবু মারোয়ান বলেন, আমার কাছে চৌদ্দজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, তীর পুঁতে দিয়েছিলেন নাহিয়াহ্ ইবনে আজম। তিনি বলেছেন, লোকেরা যখন রসুল স.কে পানিসংকটের কথা জানালেন, তখন রসুল স. আমাকে ডেকে তাঁর তীরাধার থেকে একটি তীর বের করে দিলেন। বললেন, সেখান থেকে এক পাত্র পানি নিয়ে এসো। আমি নির্দেশ প্রতিপালন করলাম। তিনি স. ওই পানি দিয়ে ওজু করলেন। তারপর

মুখভর্তি পানি নিয়ে তা কুলি করে ফেলে দিলেন ওই পাত্রটির মধ্যেই। তখন ছিলো গ্রীষ্মকাল। তাই সেখানকার একমাত্র কূপটির পানি গিয়েছিলো কমে। আশে পাশের কূপগুলো দখল করে নিয়েছিলো কুরায়েশেরা। রসুল স. পানির পাত্র ও তীরটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, পাত্রটি নিয়ে কূপে নেমে যেয়ো এবং সেখানে এই তীরটি পুঁতে দেওয়ার পর পাত্রের পানিটুকু ফেলে দিয়ো। আমি যথারীতি এই আদেশটিও পালন করলাম। শপথ তাঁর যিনি রসুল স.কে তাঁর সত্য বাণীবাহক করে পাঠিয়েছেন, আমি কূপ থেকে উঠে আসার আগেই কূপটি কানায় কানায় ভরে গেলো। পানি নির্গত হচ্ছিলো ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করে। লোকেরা অনায়াসে কূপের পাড় থেকেই পানি সংগ্রহ করে নিতে লাগলো। হজরত বারা থেকে আহমদ, বোখারী প্রমুখ, হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে মুসলিম এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে আবু নাঈম, ওরওয়া ও ভিন্ন সূত্রে বায়হাকী ও এরকম বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণনায় তীর প্রোথিত করার কথা নেই।

হজরত জাবের থেকে বোখারী এবং হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ায় পৌঁছে লোকেরা পিপাসিত হয়ে পড়লো। এমন সময় রসুল স. এর সামনে রাখা হলো একটি চর্মনির্মিত পানপাত্র। বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের পান করা এবং ওজু করার মতো জল নেই, কেবল আপনার পাত্রটিতে রক্ষিত জলটুকু ছাড়া। রসুল স. এর সামনে ছিলো আর একটি জলশূন্য বড় পাত্র। আমরা তাঁর নির্দেশে জলটুকু ঢেলে দিলাম বড় পাত্রটিতে। তিনি স. তখন ওই পাত্রে রাখলেন তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয়। সাথে সাথে দেখা গেলো তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ঝর্ণার মতো জলপ্রবাহ জারী হয়েছে। আমরা সকলে ওই পাত্র থেকে জল সংগ্রহ করলাম। পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করলাম। ওজুও সম্পন্ন করলাম। হজরত জাবেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনারা তখন কতোজন ছিলেন? তিনি বললেন, পনেরো শত। কিন্তু আমরা যদি তখন এক লাখও থাকতাম, তবু আমাদের মধ্যে কেউ জলসংকটে ভুগতো না।

রসুল স. যখন হুদায়বিয়ায় এসে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলো বুদাইল ইবনে ওরাকার নেতৃত্বে খাজাআ সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক (পরে বুদাইল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন)। তার সাথীদের মধ্যে ছিলো আমর ইবনে সালেম, হারাস ইবনে উমাইয়া, খারেজা ইবনে করয এবং

ইয়াজিদ ইবনে উমাইয়া। তারা সকলে এসে রসুল স.কে সালাম বললো। বুদাইল বললো, আমরা এসেছি আপনার সম্প্রদায় কা'ব ইবনে লুয়াই এবং আমের ইবনে লুয়াইয়ের পক্ষ থেকে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের সম্প্রদায়ের সকল লোককে সমবেত করেছে। আরো সমবেত করেছে তাদের মিত্রগোত্রগুলোকে। হুদায়বিয়ার জলকূপগুলো তাদের কবজায়। তাদের সঙ্গে রয়েছে নারী ও শিশুরাও। তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেছে যে, আপনাকে তারা কিছুতেই কাবাগৃহ পর্যন্ত অগ্রসর হতে দিবে না। রসুল স. বললেন, কিন্তু আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি কেবল কাবাগৃহ তাওয়াফ করতে। আমাদের পুণ্যপ্রচেষ্টায় যারা বাদ সাধবে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। কুরায়েশেরা কি আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে? যুদ্ধ করতে করতে তারা তো পর্যুদস্তপ্রায়। তবে কুরায়েশেরা যদি চায়, তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমরা তাদের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করতে সম্মত আছি। শর্ত আমাদের একটাই যে, তারা আমাদের এবং অন্য লোকদের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলো অবশ্য কুরায়েশ সম্প্রদায় অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং তাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন নেই। তারা যদি আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে কুরায়েশদের মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হবেই। আর আমাদের কথা যদি তাদেরকে প্রভাবান্বিত করে, তাহলে কুরায়েশেরাও ইচ্ছে করলে ইসলামে দীক্ষিত হতে পারবে। আর যদি তারা চায়, তবে সকলে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে। কিন্তু তারা যদি আমাদের কোনো কথাই না মানে, তাহলে আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি আমার উদ্দেশ্য পরিপূরণার্থে ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রচেষ্টা করে যাবো, যতোক্ষণ স্কন্ধদেশে অটুট থাকবে আমার মস্তক। হে আল্লাহ্! তোমার নির্দেশকে প্রকাশ করে দাও। বুদাইল বললো, আমি আপনার কথাগুলো কুরায়েশদের কাছে পৌঁছে দিবো। একথা বলেই সে তার সাথীদেরকে নিয়ে প্রস্থান করলো। কুরয়েশদের কাছে গিয়ে বললো, আমি মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এলাম। তাঁর বক্তব্য আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। ইকরামা ইবনে আবু জেহেল এবং হাকেম ইবনে আ'স (পরবর্তীতে দু'জনেই মুসলমান হয়েছিলেন) বললো, তাঁর বক্তব্য আমাদেরকে জানানোর দরকার নেই। তুমি বরং আমাদের কথা তাকে গিয়ে জানাও। বলো, এ বৎসর যতোক্ষণ আমাদের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট থাকবে, ততোক্ষণ সে মক্কায় প্রবেশ করতে সমর্থ হবে না। ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাক্বাফী পরামর্শ দিলো, আগে বুদাইলের কথা তো শোনো। তারপর মানতে চাইলে মেনো, না মানতে চাইলে মেনো না। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং হারেছ ইবনে হিশাম (এরাও পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন) বললো, ঠিক আছে, তুমি যা কিছু শুনে এসেছো, তা বলো। বুদাইল রসুল স. এর বক্তব্যের আদ্যপান্ত সবই উল্লেখ করলো। এবার ওরওয়া বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি বয়োজ্যেষ্ঠ! তোমরা কি আমার সন্তানতুল্য নও? সকলে সমস্বরে বললো, অবশ্যই। ওরওয়া বললো, আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য নই?

সবাই বললো, নিশ্চয়ই। ওরওয়া পুনরায় বললো, তোমরা কি জানো যে, তোমাদের সাহায্যার্থে আমি উকাজ গোত্রের লোকদেরকে বের করে এনেছি? কিন্তু তাদের কাছে আমি যখন কিছুই পাইনি, তখনই তো নিজের লোকজন ও সন্তানদের এবং এই সকল লোকদেরকে তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি, যারা আমার কথা মানে। সকলে বললো, আপনি যথার্থই বলেছেন। ওরওয়া বললো, তাহলে শোনো, এই লোকটিতো তোমাদের কাছে উত্তম প্রস্তাবই নিয়ে এসেছে। তাই আমি বলি, তোমরা তার প্রস্তাব মেনে নাও। আর আমাকে অনুমতি দাও, আমি মোহাম্মদের সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাতে কথা বলি। সকলে তার কথায় সায় দিলো। ওরওয়া সাক্ষাত করলো রসুল স. এর সঙ্গে। রসুল স. ইতোপূর্বে যা বলেছিলেন, তা-ই বললেন। ওরওয়া বললো, দ্যাখো মোহাম্মদ! তুমি যদি তোমার আপন সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটন করো, তাহলে কি তা ঠিক হবে? তুমি কখনো শুনেছো যে, কোনো আরব ইতোপূর্বে তার স্ববংশীয়দেরকে উৎখাত করেছে? আর এমনও তো হতে পারে যে, তুমিই পরাজিত হয়েছো। তখন? শপথ আল্লাহ্‌র! আমি তোমার আশে পাশে কিছু সংখ্যক মন্দ লোকের চেহারা দেখতে পাচ্ছি, যারা বিপদ দেখলে তোমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। হজরত আবু বকর সিদ্দীক তার কথা শুনে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, যাও, তোমার লাত দেবতার লজ্জাস্থান চুষতে থাকো। কী ভেবেছো তুমি? আমরা কি আল্লাহ্‌র রসুলকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার লোক? ওরওয়া জিজ্ঞেস করলো, এই লোকটি কে? সাহাবীগণ বললেন, আবু বকর ইবনে আবু কোহাফা। সে বললো, শপথ তাঁর, যার হাতে রয়েছে আমার জীবন, যদি আমি কোনো এক ব্যাপারে তোমার কাছে ঋণী না থাকতাম, তবে তোমার কথার উপযুক্ত জবাব দিতে ছাড়তাম না। ওরওয়া একবার কোনো এক হত্যাকাণ্ডের রক্তপণ পরিশোধ করার ভার নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলো। কিন্তু সে তা পরিশোধ করতে ছিলো অপারগ। তখন কেউ এক দুই অংশ করে তাকে সাহায্য করেছিলো। আর হজরত আবু বকর একাই তাকে দিয়েছিলেন দশ অংশ। ওই উপকারের দিকেই ইঙ্গিত করেছিলো ওরওয়া। এরপর রসুল স. এর সঙ্গে তার কথোপকথন চলতে লাগলো। একবার সে কথা বলতে বলতে স্পর্শ করলো রসুল স. এর পবিত্র শ্মশ্রু। হজরত মুগীরা সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন রসুল স. এর পেছনে। ওরওয়া রসুল স. এর শ্মশ্রু স্পর্শ করতেই তিনি তাঁর তলোয়ারের অগ্রভাগ তার হাতে ঠেকিয়ে বললেন, খবরদার! হাত সরাও। কোনো পৌত্তলিক আল্লাহ্‌র রসুলের পবিত্র শ্মশ্রু স্পর্শ করতে পারে না। ওরওয়া মাথা উচু করে জিজ্ঞেস করলো, এ-কে? সাবাহীগণ বললেন, মুগীরা ইবনে শোবা। ওরওয়া বললো, ও তুমি? কদিন আগেই তো তুমি মলত্যাগের পর তোমার নাপাক পশ্চাদ্দেশ ধুয়েছিলে ওকাযের মেলায়। আর তুমিই তো বনী ছাকিফের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা সৃষ্টি করার হোতা। ঘটনাটি ছিলো এরকম— অজ্ঞতার যুগে হজরত মুগীরা কিছু পথচারীকে হত্যা করেন এবং তাদের মালপত্র লুট করে নেন।

তারপর ইসলাম গ্রহণ করেন। রসুল স. তখন বলেন, আমি তোমার ইসলাম গ্রহণকে অনুমোদন করলাম। কিন্তু ওসব মালপত্রের সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই।

ওরওয়া এবার অন্যান্য সাহাবীগণকেও পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। দেখলো রসুল স. তাঁর নাসিকা থেকে নির্গত তরল পদার্থ ঝেড়ে ফেলার সময় তা মাটিতে পড়ার আগেই তাঁদের কেউ না কেউ তা ধরে ফেলছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা মেখে নিচ্ছেন নিজেদের মুখে, গায়ে। তিনি স. কোনো আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এক সঙ্গে ছুটে আসছেন তাঁরা। আর তিনি স. যখন ওজু করতে শুরু করলেন, তখন তাঁর ওজুর ব্যবহৃত পানি হাতে নেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছেন হুটোপুটি। তিনি স. কথা বলতে শুরু করলেই সকলে নিশ্চুপ ও উৎকর্ণ হয়ে যান। আর সব সময় তাঁর সামনে তাঁদের থাকে অবনতমস্তক ও আনত দৃষ্টি। এ সকল কিছু দেখে শুনে ওরওয়া ফিরে গেলো তার আপন লোকদের কাছে। বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রোম, পারস্য ও নাজ্জাশীর রাজদরবারেও গিয়েছি। কিন্তু ওই সকল রাজদরবারের অনুচরদেরকে তাদের আপনাপন রাজাদেরকে এতো গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা করতে দেখিনি, যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মোহাম্মদের প্রতি তাঁর সহচরেরা। তারা তাঁকে এতো ভক্তি করে যে, চোখ তুলে তার দিকে সোজাসুজি তাকাবারও সাহস পায় না। সকলেই তার আদেশ প্রতিপালনের জন্য সদাপ্রস্তুত। সে কথা বললে সকলে নির্বাক হয়ে শোনে। আর তারা মাটিতে পড়বার আগেই হাতে তুলে নিয়ে গায়ে মুখে চোখে মেখে নেয় তাঁর নাসিকানির্গত তরল পদার্থ ও ওজুর পানি। এবার শোনো, সে একটি ভালো প্রস্তাবই দিয়েছে। প্রস্তাবটি তোমাদের মেনে নেওয়াই উচিত। কুরায়েশরা নিশ্চুপ। ওরওয়া পুনরায় বললো, তোমরা তাঁকে এ বছর ফিরে যেতে বলতে পারো। কিন্তু আগামী বছর তাঁকে আসতে দিতেই হবে। আমার তো মনে হয় তোমাদের উপরে বিপদ অত্যাসন্ন। একথা বলেই সে তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে চলে গেলো তায়েফে।

কুরায়েশদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো বেশ কয়েকটি পৌত্তলিক সম্প্রদায়। একটি দলের অধিনায়ক ছিলো জালিস ইবনে আলকামা। ওরওয়া চলে যাবার পর সে উঠে পড়লো। রওয়ানা হলো রসুল স. এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। রসুল স. দূর থেকে তাকে আসতে দেখে বললেন, জালিস এগিয়ে আসছে। সে এমন ধরনের মানুষ, যে কোরবানীর পশুদের খুবই সম্মান করে। আর সে আল্লাহ্‌ভক্তও বটে। তোমরা কোরবানীর উটগুলো তাঁর চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাও। তাই করা হলো। জালিস বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো সারিসারি কোরবানীর পশু। সবগুলোই কোরবানীর বিশিষ্ট চিহ্নবিশিষ্ট। অনেক দিন ধরে গলায়

বেড়ি দেওয়ার কারণে সে গুলোর গলার পশমও উঠে গিয়েছে। এসব দেখে সে আর অগ্রসর হলো না। ফিরে গিয়ে তার দলের লোকদেরকে বললো, হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম তাদের কোরবানীর পশুগুলোর গলায় কিলাদাহ্ ঝুলছে। দীর্ঘদিন ধরেই পশুগুলো কোরবানীর জন্য লালিতপালিত ও সুচিহ্নিত। সুতরাং তাদেরকে

বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। কুরায়েশেরা একথা শুনে তাকে ধমক দিলো। বললো, তুমি নির্বোধ। তুমি কিছুই জানো না। চুপচাপ বসে থাকো। জালিসও রেগে গেলো। বললো, হে কুরায়েশ গোত্রপতিরা! আমি তোমাদের সঙ্গে এরকম কোনো চুক্তি করিনি যে, কেউ কাবাগৃহের সম্মান প্রদর্শনার্থে এগিয়ে এলে আমি তাকে বাধাদান করবো। শপথ তাঁর, যার হাতে আমার জীবন, মোহাম্মদের উদ্দেশ্য শুভ। সুতরাং তাঁকে বাধা দিতে যেয়ো না। যদি দাও, তবে তোমাদের পুরো দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। কুরায়েশেরা বললো, হয়েছে থামো। আমাদের ব্যাপারে নাক গলিয়ো না। আমরা যা ভালো মনে করি, তাই করবো। মাকরয ইবনে হাফস নামক এক লোক এবার উঠে দাঁড়ালো। বললো, আমাকে তোমরা মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দাও। সকলে তার প্রস্তাবে সায় দিলো। রসুল স. তাকে আসতে দেখে সাহাবীগণকে বললেন, এবার এগিয়ে আসছে মাকরয। সে লোক হিসেবে অত্যন্ত অসৎ। রসুল স. মাকরযকেও একই কথা বললেন, যা ইতোপূর্বে বলেছিলেন ওরওয়া ও জালিসকে। মাকরয চলে গেলো। রসুল স. বললেন, সে-ও নিশ্চয় সঠিক সংবাদই পৌঁছাবে।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ ইবনে ওমরসহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তাঁর উটের উপর খারাশ ইবনে উমাইয়াকে আরোহণ করিয়ে কুরায়েশদের কাছে পাঠালেন। উদ্দেশ্য, তিনি কুরায়েশদেরকে রসুল স. এর মনোভাব সম্পর্কে পুনরায় বিবরণ প্রদান করবেন। কিন্তু কুরায়েশেরা তাকে কথাই বলতে দিলো না। ইকরামা ইবনে আবু জেহেল তাঁর উটের পা কেটে দিলো। তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে রক্ষা করলো। তিনি তাদের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে রসুল স. সকাশে ফিরে এলেন। খুলে বললেন তাদের অপআচরণের কথা।

হজরত ওরওয়া থেকে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. যখন হুদায়বিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন কুরায়েশেরা ঘাবড়ে গেলো। রসুল স. সাহাবীগণের মধ্যে একজনকে তাদের কাছে দূত হিসেবে পাঠাতে মনস্থ করলেন। এই ভেবে ডাকলেন হজরত ওমরকে। হজরত ওমর সব শুনে বললেন, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! কুরায়েশেরা তো আমার কথা শোনার আগেই আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কেননা তারা তো জানে যে, আমি তাদের কতো বড় শত্রু। বনী আদী সম্প্রদায়ের কেউই আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। আমি বরং নাম প্রস্তাব করছি এমন এক জনের, যিনি কুরায়েশদের চোখেও সাম্মানার্হ ও নিরাপদ। তিনি হচ্ছেন ওসমান ইবনে আফ্ফান। প্রস্তাবটি রসুল স. এর মনঃপুত হলো। তিনি স. হজরত ওসমানকে ডেকে বললেন, তুমিই যাও। গিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে বলো যে, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি কেবল ওমরা পালন করতে। তারপর তাদেরকে ইসলামের প্রতিও আহ্বান জানিয়ো। আর অসহায় মুসলমানদেরকে দিয়ো বিজয়ের সুসংবাদ। বোলো, আল্লাহ্ মক্কার ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। ফলে মক্কার কেউ আর তাদের ইমানকে গোপন করবে

না। হজরত ওসমান যথারীতি যাত্রা শুরু করলেন। পথিমধ্যে বলদাহ্ নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানকার লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন? হজরত ওসমান বললেন, রসুল স. আমাকে প্রেরণ করেছেন সবাইকে ইসলামের আহ্বান জানাতে। তাই আমি বলি, তোমরাও ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হও। কেননা আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত ধর্মকে অবশ্যই জয়যুক্ত করবেন এবং তাঁর রসুলকে করবেন মর্যাদায়িত। এরপর আর একটু এগিয়ে গিয়ে কুরায়েশদেরকে জানালেন, তোমরা আমাদেরকে বাধা দিতে চাইছো কেনো? আমাদেরকে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে দাও। অন্য সম্প্রদায় যদি আমাদের উপরে প্রবল হয়ে যায়, তবে তো তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই। আর রসুল স. যদি অন্যান্য গোত্রগুলোর উপরে বিজয়ী হন, তবে তোমরা তাঁর ধর্মে চলে আসতে পারবে। কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারবে। এখনো তোমাদের সংখ্যা অনেক থাকলেও তোমরা যুদ্ধে পর্যুদস্তপ্রায়। তোমাদের প্রধান প্রধান নেতারাও ইতোমধ্যে প্রাণ হারিয়েছে। আর একথাটিও তোমরা অনুধাবন করতে চেষ্ট করো যে, রসুল স. এখানে যুদ্ধ করতে আসেননি। এসেছেন কেবল ওমরা পালন করতে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে কোরবানীর জন্য অনেক চিহ্নিত উট। ওমরা ও কোরবানী সম্পন্ন করার পর তিনি স. মদীনায় ফিরে যাবেন। পৌত্তলিকেরা বললো, তোমার কথা আমরা শুনলাম। কিন্তু একথাও তুমি শুনে রাখো যে, আমরা তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ করতে দিবো না। ফিরে গিয়ে তাঁকে জানাও, আমরা তাঁকে আর মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দিবোই না। হজরত ওসমানের সঙ্গে আব্বাস ইবনে সাঈদের সাক্ষাত হলো। তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি হজরত ওসমানকে দেখেই বললেন, মারহাবা। আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন, তা-ই করুন। আমি আপনাকে নিরাপত্তা প্রদান করলাম। এরপর আব্বাস তাঁর ঘোড়া থেকে নামলেন। হজরত ওসমানকে প্রথমে তাঁর ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে উঠে বসলেন তাঁর পিছনে। বললেন, আপনি এখানে নিশ্চিন্তে আসা-যাওয়া করে আপনার দৌত্যকর্ম করে যেতে পারেন। কাউকে ভয় করার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, আব্বাস ইবনে সাইদ ছিলেন কাবাগৃহের সেবক। তাই সকলেই তাঁকে সম্মান করতো। তিনি হজরত ওসমানকে মক্কায় নিয়ে গেলেন। তিনি একে একে সকল কুরায়েশ নেতার সঙ্গে সাক্ষাত

করে রসুল স. এর বক্তব্য জানালেন। কিন্তু সকলেই প্রকাশ করলো নেতিবাচক মনোভাব। বললো, মোহাম্মদকে কখনোই মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। হজরত ওসমান শেষে সাক্ষাত করলেন মক্কার বন্দীপ্রায় মুসলমান নারী-পুরুষদের কাছে। তারা কুরায়েশদের বাধার কারণে হিজরত না করতে পেরে মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। হজরত ওসমান তাদেরকে এই মর্মে সান্ত্বনার বাণী শোনালেন যে, রসুল স. জানিয়েছেন, আমি খুব শীগ্‌গিরই বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করবো। তখন অবস্থা এমন হবে যে, কাউকে আর ইমান গোপন রাখতে হবে না। তাঁর এই সংবাদ শুনে খুব খুশী হলেন তাঁরা। বললেন, রসুল স. কে আমাদের অভিবাদন জানাবেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত শেষ করে যখন হজরত ওসমান কুরায়েশ

নেতাদের কাছে ফিরে এলেন, তখন তারা বললো, আপনি যদি চান তবে কাবা তাওয়াফ করতে পারেন। হজরত ওসমান বললেন, আল্লাহ্‌র রসুল তওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করতে পারি না। তিনি মক্কায় অবস্থান করলেন তিন দিন। এরমধ্যে তিনি কুরায়েশদেরকে ইসলামের প্রতি পুনঃপুনঃ আহ্বান জানালেন।

ওদিকে রসুল স. এর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ বলাবলি করতে লাগলেন, ওসমান নিশ্চয় কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। রসুল স. বললেন, কখনোই নয়। সে যদি সেখানে বছরের পর বছর অবস্থান করে, তবুও আমি তাওয়াফ করার আগে সে তাওয়াফ করবে না। রসুল স. হুদায়বিয়ায় প্রহরীরূপে নিযুক্ত করেছিলেন হজরত আউস ইবনে আওবা, হজরত উব্বাদ ইবনে বিশর এবং হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমাকে। তাঁরা পালাক্রমে শিবির পাহারা দিতেন।

হজরত ওসমান যখন মক্কায়, তখন একরাতে পাহারায় ছিলেন হজরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা। গভীর রাতে মাকরয ইবনে হাফসের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জনের একটি দল এলো আক্রমণ করতে। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিলো, তারা অতি সন্তর্পণে রসুল স. এর শিবিরের চতুস্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করবে। মুসলমানদের অসতর্ককতার সুযোগ হয়তো পাওয়া যেতেও পারে। কিন্তু অতন্দ্র প্রহরী মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমার হাতে ধরা পড়ে গেলো মাকরয। রসুল স. যে তাঁকে অত্যন্ত অসৎ বলেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো হাতে হাতে। ওদিকে রসুল স. এর অনুমতিক্রমে কয়েকজন মুসলমান হজরত ওসমানের নিরাপত্তারক্ষা অথবা তাঁর কুশলবার্তা সংগ্রহের জন্য গোপনে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁরা হলেন সর্বহজরত করযবিন জাবের ফাহরি, আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইল ইবনে আমর ইবনে আবদুস শামস্‌, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে হুজাফা সাহমী আবুর রুম ইবনে উমায়ের ইবনে আমর, উমায়ের ইবনে ওহাব জামুহী, হাতেব ইবনে আবী বালতা এবং আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমাইয়া। কুরায়েশরা তাঁদের অনুপ্রবেশের সংবাদ জানতে পেরে তাদেরকে বন্দী করে ফেললো। কুরায়েশরা এ সংবাদও পেলো যে মোহাম্মদ ইবনে মুসলিমা তাদের লোককে আটক করে রেখেছে। তাদের উদ্ধারের জন্য তারাও গোপনে পাঠালো একটি সশস্ত্র বাহিনী। মুসলমানেরাও তাদের গতিবিধি টের পেয়ে গেলো। দুই দল মুখোমুখিতেই তাদের মধ্যে শুরু হলো তীর ও পাথরবর্ষণ। মুসলমানেরা গ্রেফতার করতে সমর্থ হলো শত্রুপক্ষের বারোজনকে। হজরত ইবনে জানীম এক পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। শত্রুরা হঠাৎ তাঁকে তীরবিদ্ধ করে শহীদ করলো। ইত্যবসরে সংবাদ এসে পৌঁছলো, হজরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীগণকে শহীদ করা হয়েছে। সংবাদ শুনে রসুল স. মর্মাহত হলেন। আনুগত্যের বায়াত গ্রহণের জন্য ডেকে পাঠালেন সবাইকে।

হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম; হজরত ওরওয়া থেকে বায়হাকী, জুহুরী সূত্রে ইসহাক এবং স্বীয় শিক্ষক সূত্রে

মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমা বলেছেন, তখন দ্বিপ্রহর। আমি শায়িত ছিলাম। এমন সময় ঘোষণা কানে এলো, হে লোকসকল! রুহুল কুদ্দুস অবতীর্ণ হয়েছে। এসো, আনুগত্যের শপথ সম্পন্ন করো। বহিষ্কৃত হও এবং এগিয়ে এসো আল্লাহ্‌র নামে। মুসলিম বর্ণনা করেছেন, হজরত সালমা বলেছেন, সর্বপ্রথম রসুল স. এর কাছে বায়াত গ্রহণ করলাম আমি। এরপর একে একে বায়াত হতে লাগলো অন্যান্যরা। এভাবে প্রায় অর্ধেক লোক বায়াত গ্রহণ করার পর রসুল স. আমাকে বললেন, সালমা। আনুগত্যের বায়াত গ্রহণ করো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমিতো বায়াত গ্রহণ করেছি। তিনি স. বললেন পুনরায় গ্রহণ করো। আমি পুনরায় রসুল স. এর পবিত্র হস্তে বায়াতের শপথ উচ্চারণ করলাম। এরপর রসুল স. সম্পন্ন করলেন অবশিষ্টদের বায়াত। যখন সকলের বায়াত শেষ হলো, তখন রসুল স. পুনরায় আমাকে বললেন, তুমি কি শপথ করবে না? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! আমি তো দু'বার শপথ উচ্চারণ করেছি— প্রথমে ও মধ্যভাগে। তিনি স. বললেন, আরো একবার করো, অধিকতর শুদ্ধভাবে। কাজেই আমি বায়াত গ্রহণ করলাম তৃতীয় বারের মতো। 'সহীহ্‌ বোখারী' গ্রন্থে এসেছে, হজরত সালমাকে পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনারা কিসের উপরে শপথ নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুর উপর।

'সহীহ্‌ মুসলিম' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত জাবের বলেছেন, একটি ফলবান বৃক্ষের নিচে যখন ওমর বায়াত গ্রহণ করছিলেন, তখন আমরাও অগ্রসর হলাম। তাঁর বায়াতের পর বায়াত গ্রহণ করলাম আমরা। তখন কেবল জদ ইবনে কায়েস ছাড়া সকলেই বায়াত গ্রহণ করে। জদ তখন লুকিয়েছিলো তার উটের পিছনে।

হজরত ইবনে ওমর থেকে তিবরানী, শা'বী সূত্রে বায়হাকী এবং জায়েদ ইবনে হুবাইশ সূত্রে ইবনে মানদাহ্ বর্ণনা করেছেন, ওই সময় সর্বপ্রথম রসুল স. এর কাছে এগিয়ে গেলেন আবু সানান আসাদী। বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হস্ত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে আনুগত্যের শপথ করতে ইচ্ছুক। রসুল স. বললেন, তুমি সেই কথার উপর আনুগত্যের শপথ করো, যা তোমার অন্তরে রয়েছে। হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আবু সানান তখন শুধালেন, আমার অন্তরে কী আছে? রসুল স. বললেন, হয় বিজয়, নয় মৃত্যু। আর তা হতে হবে আল্লাহ্র রসুলের সামনে। আবু সানান আর দ্বিরুক্তি না করে শপথ গ্রহণ করলেন। এরপর একে একে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন অন্যেরাও।

হজরত আনাস থেকে বায়হাকী এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সাহাবীগণকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করলেন তখন, যখন হজরত ওসমান দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন কুরায়েশদের কাছে। সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তিনি স. তাঁর এক হাত দিয়ে অন্য হাত আঁকড়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহ্! এই হাতটি ওসমানের হাত। আর এই হাত নিশ্চয় অন্যান্যদের হাতের চেয়ে উত্তম।

কুরায়েশেরা সুহাইল ইবনে ওমর, হুয়াইতাব ইবনে উজ্জা এবং মাকরয ইবনে হাফসকে রসুল স. এর কাছে পাঠালো। প্রথমোক্ত দু'জন পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুহাইল বললো, আপনার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিলো, তারা এরকম করেছিলো আমাদের অজান্তে। তাদের এরকম অপউদ্যোগকে আমরা সমর্থনও করি না। আমরা তাদের অপকীর্তির সংবাদ পেয়েছি পরে। তারা যে নিতান্ত মূর্খ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় আপনি যাদেরকে বন্দী করে রেখেছেন, তাদেরকে ছেড়ে দিন। আর ইতোমধ্যে আপনি নিশ্চয় জানতে পেরেছেন যে, ওসমানের শহীদ হওয়ার তথ্যটি ভিত্তিহীন। রসুল স. বললেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার সাথীদেরকে ছাড়বে না, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমিও তোমাদের লোকদেরকে ছাড়বো না। সুহাইল ও তার সাথীরা বললো আপনি ঠিকই বলেছেন। একথা বলে তারা শুতাইহাম ইবনে আবদে মানাফ তাঈমীকে কুরায়েশদের কাছে পাঠালো। কিছুক্ষণ পরে তারা কুরায়েশদের কাছ থেকে নিয়ে এলো হজরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীগণকে। রসুল স.ও বন্দী শত্রুদেরকে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পাওয়া হজরত ওসমানের সঙ্গীরা ছিলেন দশজন।

সুহাইল ইবনে হানিফ সূত্রে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এবং মারোয়ান ইবনে হাকাম সূত্রে সুনান রচয়িতাবৃন্দের বিবরণে এসেছে, হজরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীগণ যখন মক্কা থেকে ফিরে এলেন, তখন সুহাইল, হুয়াইতাব ও মাকরয ফিরে গেলো কুরায়েশদের কাছে। জানালো, মুসলমানেরা যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত। কুরায়েশেরা এ সংবাদ শুনে মুষড়ে পড়লো। প্রবীণেরা বললো, সবচেয়ে উত্তম হয় এই শর্তে সন্ধি করলে যে, এ বছর তাকে ফিরে যেতে হবে এবং আগামী বছর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করে ওমরা ও কোরবানী শেষে ফিরে গেলে আমরা তাঁর অন্তরায় হবো না। এভাবে সন্ধি করতে পারলে জনসমক্ষে প্রচার হয়ে যাবে যে, আমরা তাকে থামিয়ে দিতে পেরেছি। ফলে আমাদেরকে আর অপমানিত হতে হবে না। সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। সুহাইল তখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হলো রসুল স. এর দিকে। দূর থেকে তাকে দেখেই রসুল স. সাহাবীগণকে বললেন, কুরায়েশেরা সন্ধি করতে চায়। সুহাইলকে পাঠিয়েছে তারা সে কারণেই। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন সুহাইলকে এগিয়ে আসতে দেখে বললেন, তোমাদের কাজ এবার সহজ হয়ে গেলো। রসুল স. হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন। তাঁর মাথার দিকে দাঁড়িয়েছিলেন সশস্ত্র উববাদ ইবনে বিশর, সালমা ও আসলাম। প্রথম দু'জন ছিলেন বর্মবেষ্টিত। সুহাইল এসেই রসুল স. এর সম্মুখে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো এবং রসুল স. এর সঙ্গে শুরু করলো কথপোকথন। কখনো উচু গলায়, কখনো নিম্নকণ্ঠে। ইবাদ ইবনে বিশর একবার সুহাইলকে সাবধান করে দিলেন, রসুল স. এর সঙ্গে মার্জিতভাবে কথা বলো। শেষ পর্যন্ত দু'জনে একমত হলেন। সুহাইল বললো, তাহলে এবার সন্ধিপত্রের মুসাবিদা করা হোক।

রসুল স. হজরত আলীকে ডাকলেন। হজরত বারা ইবনে আজীব থেকে বোখারী এবং হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে হাকেম বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন হজরত আলীকে নির্দেশ দিলেন, লেখো, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম (পরম দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্র নামে)। সুহাইল বললো 'রহমান' ও 'রহীম' কে তাতো আমরা জানি না। সুতরাং তাকে লিখতে বলুন 'বিস্মিকাল্লহুম্মা' (আল্লাহ্র নামে)। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্র শপথ এরকম আমরা লিখতে পারি না। রসুল স. বললেন, তাহলে লিখে দাও 'বিইসমি কাল্লহুম্মা' (আল্লাহ্র নামে শুরু করছি)। এরপর লেখো— এটা হচ্ছে সেই চুক্তি, যার মীমাংসা করছেন মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্। সুহাইল বললো, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রসুলই মানতাম, তবে তো আপনার কাবাদর্শনের পথে প্রতিবন্ধকতা রচনা করতাম না। সুতরাং তাকে লিখতে বলুন কেবল মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্। রসুল স. হজরত আলীকে বললেন, তাহলে 'রসুলুল্লাহ্' কথাটি কেটে দাও। হজরত আলী বললেন, আমি তো একথা কেটে দিতে পারি না (কেননা এটাই তো আমার হৃদয়জ বিশ্বাস)। মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, তখন হজরত উসাইদ ইবনে হুজায়ের এবং হজরত সা'দ ইবনে আবী উবাদা হজরত আলীর হাত টেনে ধরলেন এবং বললেন, মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ্ ছাড়া অন্য কিছু

লিখো না, নতুবা তাদের ও আমাদের মধ্যে মীমাংসা করবে তরবারী। তারা এরকম প্রতিবাদ করলেন অত্যন্ত উচ্চস্বরে। রসুল স. তখন শান্তস্বরে বললেন, ঠিক আছে আমাকে জায়গাটি দেখিয়ে দাও, আমি নিজে হাতে কেটে দিচ্ছি। হজরত আলী নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে দিলেন। রসুল স. 'মোহাম্মাদুর রসুলুল্লহ' নিজ হাতে মুছে দিলেন। তারপর বললেন, এবার লেখো মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত বারা বলেছেন, রসুল স. তখন সন্ধিপত্রটি হাতে নিলেন এবং 'রসুলুল্লহ' কথাটি বিলোপ করে দিলেন স্বহস্তে। শেষে লেখা হলো, এটা সে-ই চুক্তি, যা সম্পাদিত হচ্ছে আবদুল্লাহ্র পুত্র মোহাম্মদ এবং সুহাইল ইবনে আমরের মধ্যে। আমরা এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছি যে, দশ বছর পর্যন্ত আমরা কোনো যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হবো না। এক পক্ষ অপর পক্ষকে কোনো বিষয়ে উত্যক্তও করবো না। আমাদের লোকেরা প্রত্যেকে চলাচল করতে পারবে নিরাপদে। রসুল স. তখন বললেন, তাহলে তোমরা সরে দাঁড়াও। আমাদেরকে ওমরা পালন ও কোরবানী করতে দাও। সুহাইল বললো, আল্লাহ্র শপথ! এবছর আপনাকে ফিরে যেতে হবে। নির্বিঘ্নে আপনারা ওমরা পালন করতে পারবেন আগামী বছর থেকে। একথাও চুক্তিপত্রে লিপিবদ্ধ করা হোক। আরো লিপিবদ্ধ করা হোক যে, আমাদের কোনো লোক তাদের অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে আপনার কাছে গেলে আপনি অবশ্যই তাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠাবেন, যদি সে মুসলমান হয়ে যায়, তবুও। কিন্তু আপনাদের কোনো লোক যদি আমাদের দলে এসে মিশে, তবে আমরা তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবো না। সাহাবীগণ বললেন, সুবহানাল্লহ্!

তা কী করে সম্ভব। কেউ আমাদের কাছে মুসলমান হয়ে এলেও কি আমরা তাকে বিধর্মীদের কাছে ফিরিয়ে দিবো? রসুল স. বললেন, যেতে দাও। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যদি আবার ধর্মত্যাগ করে চলে যায়, তবে আমাদের তাতে কী ক্ষতি হবে? যারা মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করবে না, তারা চলে গেলেই তো ভালো। আর তাদের কেউ মুসলমান হয়ে এলে আমরা তাকে ফেরত দিতেও রাজী। মনে হয়, এমতাবস্থায় আল্লাহ্ই নিশ্চয় কোনো না কোনো উপায় বের করে দিবেন।

হজরত বারা ইবনে আজীব বর্ণনা করেছেন, রসুল স. তখন তিনটি শর্তের উপর সন্ধি করেছিলেন। ১. অংশীবাদীদের মধ্য থেকে পালিয়ে এসে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাকে তাদের কাছে ফেরত দিতে হবে। ২. মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ যদি ধর্মত্যাগ করে তাদের দলে গিয়ে মিশে, তবে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না। ৩. এ বছর রসুল স.কে এই হুদায়বিয়া থেকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। তিনি স. ওমরা পালন করতে পারবেন আগামী বছর এবং মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন মাত্র তিন দিন। ওই সময় রসুল স. ও তাঁর সহাগামীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে হবে আপনাপন তরবারী কোষাবদ্ধ করে রেখে। চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে এই বিষয়েও অঙ্গীকার করা হলো যে, উভয় পক্ষ চুক্তির শর্তাবলী অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে। এর মধ্যে গোপনীয়তা বলে কিছু থাকবে না। আর এখন যে কেউ যোগ দিতে পারবে যে কোনো এক পক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে বনী খাজাআ লাফিয়ে সামনে এসে বললো, আমরা যোগ দিলাম মোহাম্মদের দলে। পরক্ষণে বনী বকর ঘোষণা দিলো, আমরা পক্ষ হলাম কুরায়েশদের। এভাবে চুক্তির সমস্ত কিছুই চূড়ান্ত হয়ে গেলো। বাকী রইলো কেবল উভয় পক্ষের স্বাক্ষর। হজরত ওমর দ্রুতগতিতে রসুল স. এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আপনি কি আল্লাহ্র সত্য রসুল নন? রসুল স. বললেন, অবশ্যই। হজরত ওমর বললেন, তাহলে আপনি এরকম অবমাননাকর চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছেন কেনো? এখনো তো তাদের সঙ্গে আমাদের শক্তি পরীক্ষা হলো না। তবু কি আমরা ফিরে যাবো? রসুল স. বললেন, আমি আল্লাহ্র সেবক ও তাঁরই বচনবাহক। সুতরাং আমি আল্লাহ্র আদেশের পরিপন্থী কিছু করতে পারবো না। আল্লাহ্ নিশ্চয় আমাকে ধ্বংস করবেন না। তিনিই আমার সাহায্যকর্তা। হজরত ওমর বললেন, আপনি কি আমাদেরকে একথা বলেননি যে, আমরা অবশ্যই কাবাগৃহ পর্যন্ত পৌছবো এবং তাওয়াফ করবো? তিনি স. বললেন, তাতো বলেছিই। কিন্তু একথা কি কখনো বলেছি যে, এই বছরই আমরা সেখানে পৌঁছতে পারবো? হজরত ওমর বললেন, তা অবশ্য বলেননি। রসুল স. বললেন, তোমরা অবশ্যই কাবাগৃহ পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তাওয়াফও করবে। হজরত ওমর তবুও প্রশমিত হলেন না। দেখা করলেন গিয়ে হজরত আবু বকরের কাছে। বললেন, আপনি বলুন, তিনি কি আল্লাহ্র সত্য রসুল নন? হজরত আবু বকর বললেন, অবশ্যই। হজরত ওমর বললেন, আমরা সত্যের উপরে, আর অংশীবাদীরা মিথ্যার উপরে কি প্রতিষ্ঠিত নয়? হজরত আবু বকর

বললেন, অবশ্যই। হজরত ওমর বললেন, আমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তারা বেহেশতে এবং তাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তারা কি দোজখে প্রবেশ করবে না? হজরত আবু বকর বললেন, নিশ্চয়ই। হজরত ওমর বললেন, তাহলে বলুন, কেনো তিনি এরকম অবমাননাকর এক চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছেন? অথচ এখনো তাদের সঙ্গে আমাদের শক্তি পরীক্ষা হলো না। তবুও কি আমরা ফিরে চলে যাবো? হজরত আবু বকর বললেন, ওমর! সংযত হও। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র সত্য বার্তাবাহক। তাঁর প্রভুপালনকর্তার পরিতোষের পরিপন্থী কোনোকিছু তিনি করতে পারেনই না। আল্লাহ্ই তাঁর সাহায্যকর্তা। তুমি আমৃত্যু তাঁর অনুসরণে অটল থাকো। নিঃসন্দেহে তিনি সত্যাধিষ্ঠিত। এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু বকর তখন বলেছিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি

আল্লাহ্‌র সত্য রসুল। হজরত ওমর বলেছিলেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র সত্য রসুল। হজরত ওমর তখন এই প্রশ্নটিও করেছিলেন যে, তিনি কি আমাদেরকে একথা বলেননি যে, আমরা কাবা গৃহে পৌঁছে যাবো এবং তাওয়াফও করবো? হজরত আবু বকর জবাব দিয়েছিলেন, তাতো বলেছেনই। কিন্তু একথা কি কখনো বলেছেন যে, এই বছরেই আমরা কাবাগৃহ পর্যন্ত পৌঁছবো ও তাওয়াফ করবো? হজরত ওমর বলেছিলেন, না, তাতো বলেননি। হজরত আবু বকর বলেছিলেন, তাহলে জেনে রেখো, অবশ্যই আমরা কাবাগৃহ পর্যন্ত পৌঁছবো, তাওয়াফও করবো।

যথাসূত্রপরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে, বাহ্যত অবমাননাকর হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিটি হজরত ওমরের নিকটে হয়েছিলো দুঃসহ। তিনি নিজেই বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমি আর কখনো রসুল স. এর সম্মুখে এরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করিনি। সেকারণেই আমি রসুল স.কে ওই অশিষ্ট প্রশ্নগুলি করেছিলাম। কেনো যেনো আমি তখন সংযম প্রদর্শন করতে পারছিলামই না। আমার এরকম অবস্থা দেখে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ বলেছিলো, হে খাত্তাবতনয়। সংযত হতে না যদি পারো, তবে পড়ো 'আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম'। আমি তাই করলাম। ইবনে ইসহাক ও ইবনে আমর আসলামী বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, আমার সেদিনের সেই অশিষ্ট আচরণের কথা মনে হলে আজো আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দান-খয়রাত করি, রোজা রাখি ও দাসমুক্ত করে দেই।

আহমদ, নাসাঈ ও হাকেমের বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল বলেছেন, আমরা কিঞ্চিত অসতর্ক অবস্থায় ছিলাম। অতর্কিতে তিরিশ জন বর্মপরিহিত শত্রুসেনা পাহাড়ের দিক থেকে এসে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসলো। রসুল স. তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে বধির করে দিলেন এবং রসুল স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কারো নির্দেশে এখানে এসেছো? তোমাদেরকে কি কেউ নিরাপত্তা প্রদান করেছে? তারা বললো, না। রসুল স. তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। তখন অবতীর্ণ হলো 'তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপরে তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর'।

হজরত আনাস থেকে আহমদ, মুসলিম ও ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, মক্কার আশিজন বর্মবেষ্টিত লোক তানঈম নামক পাহাড়ের দিক থেকে রসুল স. এর দিকে ধেয়ে আসে। উদ্দেশ্য ছিলো, সুযোগ পেলেই তারা রসুল স.কে আক্রমণ করে বসবে। রসুল স. তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রার্থনা করলেন। ফলে তারা হয়ে গেলো অন্ধ ও স্মৃতিশক্তিহীন। তাদেরকে তাই বন্দী করা সহজ হয়। রসুল স. তাদেরকে ছেড়েও দেন।

মারোয়ান ও মুসাওয়ার মাধ্যমে জুহুরীর বর্ণনায় এবং আহমদ, মুসলিম এবং আবদ ইবনে হুমাইদের বর্ণনায় এসেছে, হজরত সালমা বলেছেন, যখন আমি ইবনে যানীমের শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনলাম, তখন তরবারী হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলাম চারজন পৌত্তলিকের সামনে। তারা শায়িত ছিলো। আমি ক্ষিপ্রগতিতে তাদের অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করলাম এবং তাদেরকেও হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম রসুল স. এর কাছে। তখনই অবতীর্ণ হলো 'তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে.....'।

ইত্যবসরে হজরত আবু জনদল ইবনে সুহাইল ইবনে আমর হাতকড়া পরা অবস্থায় নিম্নভূমির দিক থেকে এসে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। সে মুসলমান হয়েছিলো বলে তার পিতা তাকে বন্দী করে রেখেছিলো। হজরত আবু জনদলকে দেখেই সাহাবীগণ আনন্দিত হলেন। তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং এভাবে চলে আসতে পারাতে তাঁকে সাধুবাদও দিলেন। সুহাইল তার ছেলেকে এভাবে দেখতে পেয়ে ভয়ানক রেগে গেলো। সামনে এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রহার করলো কাঠের ধারালো টুকরা দিয়ে। তারপর তার গায়ের জামা টেনে ধরে রসুল স. এর দিকে তাকিয়ে বললো, মোহাম্মদ! এই হচ্ছে প্রথম ঘটনা; এখন চুক্তি অনুযায়ী আপনি একে আমার কাছে ফেরত দিবেন। রসুল স. বললেন, এখনো আমরা স্বাক্ষর করিনি। সে বললো, শপথ আল্লাহ্‌র! তাহলে তো আমি স্বাক্ষর করবো না। রসুল স. বললেন, একে আমার কাছে জামানত রাখো। সুহাইল বললো, না, আমি তা করবো না। মাকরজ ও হুয়াইতাব রসুল স.কে বললো, আমরা আপনার কারণে একে আমাদের জিম্মাদারীতে গ্রহণ করছি। একথা বলেই তারা হজরত আবু জনদলকে তাদের দায়িত্বে নিয়ে নিলো এবং তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলো। হজরত আবু জনদল যেতে যেতে সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, হে ইসলামের অনুসারীরা! আমাকে কি মূর্তিপূজকদের কাছেই প্রত্যর্পণ করা হচ্ছে? কিন্তু আমি তো মুসলমান হয়ে তোমাদের কাছেই এসেছি। দ্যাখো, আমার উপর কী রকম অত্যাচার করা হয়েছে। রসুল স. উচ্চকণ্ঠে বললেন, আবু জনদল! ধৈর্য ধরো। পুণ্যের আশা রাখো। আল্লাহ্ নিশ্চয় তুমি ও তোমার মতো অসহায় মুসলমানদের রক্ষার সুব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এখন যে আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ। হজরত ওমরও হজরত আবু জনদলের দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন, রসুল স. তোমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছেন। সুতরাং ধৈর্য অবলম্বন করো। সওয়াবের আশা রাখো। ওরা মূর্তিপূজক। ওদের রক্ত কুকুরের রক্তের মতো। হজরত ওমর এভাবে

কথা বলতে বলতে তাঁর তরবারী হজরত আবু জনদলের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ভেবেছিলাম, হজরত আবু জনদল হয়তো আমার তরবারী ছিনিয়ে নিয়ে তার বাপকে মেরে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত আবু জনদলকে তার পিতা সুহাইলের হাতেই সমর্পণ করা হলো।

সাহাবীগণ রসুল স. এর প্রতি সতত সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর যখন শুনলেন, তাঁরা এবার কাবাদর্শন করতে পারবেন না, তখন তাঁরা হয়ে গেলেন ব্যথিত, বিমর্ষ ও মর্মাহত। তার উপর হজরত আবু জনদলের ঘটনা তাদের অন্তর্জ্বালাকে আরো বেশী বাড়িয়ে দিলো। সন্ধিপত্রে রসুল স. ও সুহাইল ছাড়াও স্বাক্ষর করলেন উভয় পক্ষের আরো কয়েকজন। মুসলমানদের পক্ষে স্বাক্ষর করলেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সুহাইল ইবনে আমর, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত মাহমুদ ইবনে সালমা এবং হজরত আলী ইবনে আবী তালেব রদ্বিআল্লহু আলাইহিম আজমাঈন। সন্ধিচুক্তি সম্পাদন শেষে রসুল স. ঘোষণা দিলেন, এবার সকলে গাত্রোত্থান করো। কোরবানী করো। মাথা মুণ্ডন করো। এই চুক্তিতে সাহাবীগণ কেউই সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কাবাগৃহের দর্শন থেকে বঞ্চিত হতে হলো বলে সকলেই মনমরা হয়ে বসেছিলেন। তাই রসুল স. এর নির্দেশ পালন করতে তাঁরা মন থেকে সাড়া পেলেন না। রসুল স.ও তাঁদের আচরণ দর্শনে দুঃখিত হলেন। তাঁবুর ভিতরে জননী উম্মে সালমাকে গিয়ে বললেন, মুসলমানেরা কি ধ্বংস হয়ে যেতে চায়? আমি তাদেরকে কোরবানী করতে বললাম। কিন্তু কেউ তা করলো না। জননী উম্মে সালমা বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তাদের আচরণে দুঃখিত হবেন না। আপনি সন্ধি করে ওমরা করতে ব্যর্থ হয়েছেন ভেবেই তারা মর্মাহত হয়েছে। আপনার দুঃখই তাদের দুঃখিত হওয়ার কারণ। আপনি বরং বাইরে যান। নিজ হাতে আপনার কোরবানী শুরু করুন এবং কাউকে দিয়ে আপনার মস্তক মুণ্ডন করুন। রসুল স. তাই করলেন। বাইরে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে নিজ হাতে তাঁর কোরবানীর পশু জবেহ করলেন। তারপর একজনকে ডাকিয়ে নিয়ে মুণ্ডিত মস্তক হলেন। সাহাবীগণ আর বসে থাকতে পারলেন না। রসুল স. এর অনুকরণে প্রত্যেকেই জবেহ করলেন নিজ নিজ কোরবানীর পশু এবং মুণ্ডিত মস্তক হলেন একে অপরের সাহায্যে।

হজরত ইবনে আব্বাস ও হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়ায় কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডন করেন এবং কেউ কেউ করেন কেশকর্তন। রসুল স. তা দেখে বললেন, হে আল্লাহ্! যারা মস্তক মুণ্ডন করেছে, তাদের উপরে তোমার রহমত বর্ষণ করো। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আর যারা চুল ছেঁটেছে? রসুল স. বললেন, তাদের উপরেও। এরপর রসুল স. পুনরায় প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ্! মুণ্ডিত মস্তকদের উপরে তোমার অনুকম্পা বর্ষণ করো। সাহাবীগণ আরজ করলেন, আর কেশকর্তনকারীদের উপর? তিনি স.

বললেন, তাদের উপরেও। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহী! আপনি যে দুই দুইবার মুণ্ডিতমস্তকদের জন্য দোয়া করলেন? তিনি স. বললেন, নিশ্চিন্ততা প্রকাশার্থে। অর্থাৎ ইহরাম শেষ হয়েছে। এখন আর সামনে অগ্রসর হতে হবে না। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, কিছুসংখ্যক সাহাবী তখনো ভাবছিলেন, হয়তো আমাদেরকে পুনরায় কাবা অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেওয়া হবে। সেকারণেই তারা মস্তক মুণ্ডন না করে কেশ কর্তন করেছিলেন। রসুল স. পুনঃপুনঃ মস্তকমুণ্ডিতদের জন্য দোয়া করেছিলেন সেকারণেই।

রসুল স. হুদায়বিয়ায় অবস্থান করেছিলেন উনিশ অথবা কুড়ি দিন। তখন ইহরাম পরিত্যাগ করা ও কোরবানী করার আগে রসুল স. হজরত কা'ব ইবনে আজরাকে বলেছিলেন, মাথার পোকার কারণে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে? হজরত কা'বের মাথা থেকে উকুন পড়তে দেখেই রসুল স. তাকে এরকম প্রশ্ন করেছিলেন। জবাবে হজরত কা'ব বলেছিলেন, হ্যাঁ। তিনি স. বলেছিলেন, মস্তক মুণ্ডন করো এবং ফিদিয়া দাও। ফিদিয়ার পদ্ধতি ছিলো তিনটি— রোজা রাখা, দান-খয়রাত করা এবং কোরবানী করা। ওই সময় অবতীর্ণ হয় 'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পরিপূর্ণরূপে পালন করো। যদি বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে কোরবানীর জন্য যা সহজলভ্য, তাই তোমাদের জন্য ধার্য করা হলো। আর তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত মস্তক মুণ্ডন করবে না, যতোক্ষণ না কোরবানী পৌঁছে যাবে যথাস্থানে'। সুরা বাকারার তাফসীরে এ প্রসঙ্গে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। যথাস্থানে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে মুসলিম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বায়হাকী, হজরত আবু হায়েশ থেকে তিবরানী, বায্যার, বায়হাকী এবং স্বশিক্ষকসূত্রে মোহাম্মদ ইবনে আমর বলেছেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রসুল স. প্রথমে মাররুজ জাহরানে এবং পরে আসফানে বিশ্রামের জন্য যাত্রাবিরতি করেন। শেষোক্ত স্থানে পৌঁছানোর পর দেখা দিলো খাদ্যসংকট। সাহাবীগণ রসুল স. এর কাছে গাধা জবেহ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি স. সম্মতি দিলেন। কিন্তু হজরত ওমর বললেন, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! এমন না করাই সমীচীন। বাহন থাকা বাঞ্ছনীয়। হঠাৎ যদি আমাদেরকে কোনো শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করতে হয়, তবে আমরা একই সঙ্গে অন্নহীন ও বাহনহীন হয়ে কীভাবে প্রতিহত করতে সমর্থ হবো তাদেরকে? তাই আমি বলি, আপনি নির্দেশ দিন, যার যার কাছে যৎকিঞ্চিত কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে তা সকলে এনে আপনার সামনে জমা করুক। আর আপনি তার উপর বরকতের জন্য দোয়া করুন। আমরা

আশা রাখি, আপনার দোয়ার বরকতে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের আর খাদ্যসংকট দেখা দিবে না। প্রস্তাবটি রসুল স. এর মনঃপুত হলো। তিনি স. তাঁর সামনে একটি চামড়ার দস্তরখানা বিছিয়ে দিলেন। আজ্ঞা করলেন, যার কাছে যতোটুকু আহার্যদ্রব্য আছে, তা এখানে এনে জমা করো, সকলেই আজ্ঞা প্রতিপালন করলেন। সবচেয়ে বেশী খাদ্য নিয়ে আসতে

পারলেন একজনই। আর তার পরিমাণ হচ্ছে চার সেরের মতো শুকনো খেজুর। রসুল স. দাঁড়িয়ে দোয়া করতে শুরু করলেন। ফলে প্রচুর বরকত বর্ষিত হলো জমানো খাদ্যদ্রব্যের উপরে। সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন এবং নিজেদের পাত্র ভর্তি করে নিয়েও গেলেন। তারপরেও দেখা গেলো, খাদ্যদ্রব্য রয়ে গিয়েছে আগের মতোই। এতো বরকত দেখে রসুল স. হেসে ফেললেন। উন্মোচিত হলো তাঁর সামনের সবকটি দাঁত। হজরত সালমা বলেছেন, তখন আমাদের লোকসংখ্যা ছিলো প্রায় চৌদ্দশত। রসুল স. তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রসুল— একথার উপরে যে বিশ্বাস রাখবে সে দোজখ থেকে থাকবে নিরাপদ।

জুহুরীর বর্ণনায় এসেছে, এরপর অবতীর্ণ হয় এই আয়াত— 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন বিশ্বাসবতীরা হিজরত করে তোমাদের নিকটে আগমন করে, তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। যদি তোমরা জানো যে, তারা প্রকৃতই বিশ্বাসবতী, তাহলে তাদেরকে আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে দিয়ে দাও। আর ওই বিশ্বাসবতীদেরকে যথোপযুক্ত মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না'। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত ওমর তাঁর এমন দু'জন স্ত্রীকে তালাক দেন, যাদেরকে তিনি বিবাহ করেছিলেন ইসলাম গ্রহণের আগে। পরে ওই দু'জনের একজনকে বিবাহ করেন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং আর একজনকে বিবাহ করেন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, তখন আল্লাহ্ ইমানদার নারীকে তার কাফের স্বামীর কাছে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করেন এবং যে মোহরানা তারা পরিশোধ করেছিলো, তা-ও দিয়ে দিতে নির্দেশ দেন।

হজরত মুসাওয়ার ইবনে মাখরিমা থেকে আহমদ, বোখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং জুহুরী সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন, রসুল স. হুদায়বিয়া থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করার কিছুকাল পরে আবু বসীর উতবা ইবনে আসাদ ছাক্বাফী মক্কা থেকে মদীনায় পালিয়ে এসে মুসলমান হয়ে যান। বনী ছাক্বিফ ছিলো বনী জোহরার মিত্র। আহ্বাস ইবনে শরীফ ছাক্বাফী এবং আজহার ইবনে আবদে আউফ জোহরা রসুল স. এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করলো। পত্রবাহক ছিলো খনিস ইবনে জাবের আমেরী। পত্রটিতে সন্ধির স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিলো, আবু বসীরকে যেনো অতি অবশ্যই ফেরত পাঠানো হয়। পত্রবাহক আমেরীর সঙ্গে মদীনায় এসেছিলো তার ক্রীতদাস কাওছার। রসুল স. আবু বসীরকে তাদের দু'জনের সঙ্গে ফেরত যেতে বললেন। বোঝালেন, দ্যাখো আমরা তাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর অঙ্গীকারভঙ্গ নিষিদ্ধ। তুমি যাও। তুমি ও তোমার মতো যারা, তাদের সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ একটা উপায় বের করে দিবেন। আবু বসীর তাদের দু'জনের সঙ্গে যেতে সম্মত হলেন। পথ চলতে চলতে তারা আবু বসীরকে নিয়ে উপনীত হলো জুলহুলাইফায়।

তিনি তাদেরকে বলে সেখানকার মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর তিনি তাঁর সঙ্গের খাবারের পুটলি খুলে খেজুর খেতে শুরু করলেন। তাদের দু'জনকেও খেতে ডাকলেন। তারাও তাঁর সঙ্গে খেতে শুরু করলো। আমেরীর সঙ্গে ছিলো তরবারী। সে খেতে খেতে হজরত আবু বসীরের সঙ্গে বাক্যালাপও করে যাচ্ছিলো। ওরওয়ার বর্ণনায় এসেছে, আমেরী তখন কোষ থেকে তরবারী বের করে বললো, আমি এই তরবারী দিয়ে আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করবো। আবু বসীর বললেন, তোমার খঞ্জরটি কি খুব ধারালো? আমেরী বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, দেখি দেখি। আমেরী তার তরবারীটি বাড়িয়ে দিলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তরবারীটির হাতল মজবুত করে ধরে সজোরে ঘা বসালেন আমেরীর উপর। অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্গত হলো তার প্রাণবায়ু। কাওছার প্রাণ ভয়ে দিলো দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে মদীনায় পৌঁছে আশ্রয় গ্রহণ করলো মসজিদে। রসুল স. তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? কী হয়েছে? সে বললো, আমার মনিবের দফা রফা হয়েছে। আর আমি কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। রসুল স. তাকে আশ্রয় দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমেরীর উটে সওয়ার হয়ে এসে পড়লেন আবু বসীর। উটটিকে মসজিদের বাইরে বসিয়ে রেখে তিনি ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করলেন মসজিদে। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আপনি তো আপনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। আমাকে ফেরত পাঠিয়েছেন তাদের প্রতিনিধির সঙ্গে। কিন্তু আমি নিজেকে নিরাপদ রাখতে পেরেছি আমার ধর্মবিশ্বাসের জোরে। রসুল স. বললেন, আক্ষেপ! এরকম করলে আবার জ্বলে উঠবে যুদ্ধের আগুন। এখন মক্কা থেকে কেউ এসে যদি একে নিয়ে যেতে পারতো। আবু বসীর নিহত আমেরীর মালমাত্তাসমূহ রসুল স. এর সামনে উপস্থিত করলেন, যাতে তিনি স. যুদ্ধলব্ধ সম্পদবন্টনরীতি অনুসারে সেগুলো থেকে নিয়ে নিতে পারেন তাঁর এক পঞ্চমাংশ প্রাপ্য। রসুল স. বললেন, আমি যদি এর এক

পঞ্চমাংশ গ্রহণ করি, তবে তারা ভাববে আমি অঙ্গীকারভঙ্গকারী। সুতরাং এগুলো থেকে আমি কিছুই গ্রহণ করবো না। এখন তুমি তোমার এসব মালমাত্তা নিয়ে যেখানে খুশী সেখানে চলে যেতে পারো।

বিশুদ্ধসূত্রপরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এর মন্তব্য ও মনোভাব বুঝতে পেরে আবু বসীর বুঝলেন, মক্কা থেকে কেউ এলে রসুল স. তাঁকে ফেরত পাঠাবেনই, তখন তিনি পালিয়ে গিয়ে পৌঁছলেন ঈস্ ও জিল মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে কুরায়েশদের বাণিজ্য গমনাগমনের পথে। তাঁর সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন এরকম আরো পাঁচজন। তাঁরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। এখবর মক্কায় পৌঁছলে আরো কয়েকজন নতুন মুসলমান কুরায়েশদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সন্তর্পণে গিয়ে পৌঁছলেন সেখানে।

মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর আবু বসীর সম্পর্কে মক্কার মুসলমানদের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। লিখলেন, রসুল স. চুক্তির

অনুসারে তাকে কীভাবে মক্কায় ফেরত পাঠালেন এবং কীভাবে সে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলো। কিন্তু সে এখন মদীনাতে নেই। সমুদ্রোপকুলবর্তী ঈসের জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে। সুতরাং তাকে ফেরত পাঠানোর দায় আর আমাদের উপরে নেই। এদিকে হজরত আবু জনদল, যাকে রসুল স. হুদায়বিয়ায় সন্ধিচুক্তি সম্পাদনকালে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, তিনি ও তাঁর মতো ৭০ জন নবমুসলমানকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে মিলিত হলেন হজরত আবু বসীরের দলের সঙ্গে। ফলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি হলো আরো। আর হজরত আবু বসীর তখন দলের নেতৃত্ব অর্পণ করলেন হজরত আবু জনদলকে। কারণ তিনি ছিলেন কুরায়েশ। নামাজেও তিনিই ইমামতি করতে শুরু করলেন। হজরত আবু জনদলের সংবাদ শুনে গিফার, আসলাম, জুহাইনা ও অন্যান্য গোত্রের কিছুসংখ্যকও যোগ দিলেন তাঁর সাথে। এভাবে হজরত আবু জনদলের লোকসংখ্যা হয়ে গেলো তিনশত জনের মতো। জুহুরী সূত্রে বায়হাকী এরকমই বর্ণনা করেছেন। কুরায়েশেরা বাণিজ্য করতে গেলে এই দলটি তাদের মালমাত্তা লুট করে নিতে লাগলেন। আবার কাউকে কাউকে করতে লাগলেন হত্যা। কুরায়েশেরা পড়লো ঘোর বিপদে। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রধান নেতা আবু সুফিয়ানকে তারা প্রেরণ করতে বাধ্য হলো মদীনায়। আবু সুফিয়ান মদীনায় গিয়ে রসুল স.কে বললো, তিনি স. যেনো হজরত আবু জনদলের বাহিনীকে মদীনায় ডেকে আনেন এবং এখানেই তাদের বসবাসের অনুমতি দেন। আমরা আর কাউকে ফেরত চাই না। চুক্তির এই শর্তটিকে তিনি স. যেনো কেটেই দেন। রসুল স. হজরত আবু বসীর এবং হজরত আবু জনদলকে লিখে জানালেন, তোমরা দু'জন আমার কাছে চলে এসো। অন্যান্যদেরকে বলো, তারা যেনো তাদের আপনাপন জনপদে ফিরে যায়। এখন থেকে আর কুরায়েশদের বাণিজ্যবাহিনীর উপরে আক্রমণ কোরো না। হজরত আবু বসীর তখন মৃত্যুপথযাত্রী। তিনি শুয়ে শুয়েই রসুল স. এর পত্রখানি পড়ে যেতে লাগলেন এবং পড়তে পড়তেই ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। হজরত আবু জনদল তাঁকে সেখানেই সমাধিস্থ করলেন এবং তাঁর সমাধির কাছে নির্মাণ করলেন মসজিদ। এরপর হজরত আবু জনদল কয়েকজনকে নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন। অন্যরা চলে গেলেন তাঁদের আপনাপন বসতিতে। যে সকল সাহাবী হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিকালে পালিয়ে আসা হজরত আবু জনদলকে ফেরত দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তারা এবার বুঝতে পারলেন; সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র রসুলের আনুগত্য নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। তিনি স. তখন বলেছিলেন, আল্লাহ্ নিশ্চয় এসকল অসহায় ও অত্যাচারিত মুসলমানদের জন্য একটা উপায় বের করে দিবেন। এখনতো সেরকমই ঘটলো। কুরায়েশেরা নিজেরাই রহিত করলো চুক্তির এই অবমাননাকর ধারাটি। আর মক্কাবিজয়ের দিন যখন রসুল স. কাবা শরীফের চাবি হস্তগত করলেন, তখন তিনি স. হজরত ওমরকে বললেন, আমি বলেছিলাম কাবাগৃহের চাবি আমার করায়ত্ত হবে। এবার দেখলে তো। রসুল স. বলেছিলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির চেয়ে বড় কোনো বিজয়

আর হয়নি। তাই-ই ঘটেছিলো বাস্তবে। আল্লাহ্র বান্দাগণ ত্বরাপ্রবণ। তাই গভীর গভীরতর রহস্যের কথা এবং আল্লাহ্র প্রজ্ঞাময়তার তত্ত্ব তারা স্বাভাবিক বুদ্ধি জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারে না। হুদায়বিয়ার ব্যাপারটিও ছিলো সেরকম। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা ছিলো মুসলমানদের জন্য অপমানজনক। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তা বিজয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বিদায় হজের সময় সুহাইল ইবনে আমর কোরবানীর উটগুলো রসুল স. এর কাছে নিয়ে যাচ্ছিলো, আর তিনি স. সেগুলোকে নিজ হাতে জবেহ করছিলেন। এরপর তিনি স. একজনকে ডাকিয়ে নিয়ে তাঁর মস্তক মুণ্ডন করালেন। সুহাইল ইবনে আমর তাঁর কর্তিত চুলগুলো নিয়ে চোখের উপরে রাখতে শুরু করলেন। অথচ হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনকালে তিনি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লিখতে দেননি। আল্লাহ্র প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। তিনি তাঁকে ইসলাম দানে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে— 'অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করবার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহ্র সঙ্গে অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন'। একথার অর্থ— এভাবে বায়াতের অঙ্গীকার সম্পন্ন করবার পর যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার দায়ভার বহন করতে হবে তাকেই, ভোগ করতে হবে অনন্তকালীন শাস্তি। আর যে অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ্ তাকে দান করবেন মহাপুরস্কার— জান্নাত, নৈকট্য ও দীদার।

❑ যে সকল মরুবাসী পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছে তাহারা তোমাকে বলিবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' উহারা মুখে তাহা বলে যাহা উহাদের অন্তরে নাই। উহাদিগকে বল, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাহারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে? বস্তুত তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

❑ না, তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাহাদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনই ফিরিয়া আসিতে পারিবে না এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হইয়াছিল; তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়!

❑ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেই সব কাফিরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

❑ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার প্রিয়তম রসুল! আপনি আহ্বান জানানো সত্ত্বেও যে সকল আরব গোত্র আপনার হুদায়বিয়াভিমুখী যাত্রায় অংশগ্রহণ করেনি, দেখবেন খুব শীঘ্র তারা আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করে আপনার সহগামী হওয়া থেকে বিরত থাকার নানাবিধ অজুহাত প্রদর্শন করবে। বলবে, সাংসারিক কাজকর্ম, দারা-পুত্র-পরিজন এসকলকিছুর জন্যই আমরা তখন আপনার সঙ্গী হতে পারিনি। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। হে আমার প্রত্যাদেশবাহক! আপনি কিন্তু তাদের একথা বিশ্বাস করবেন না। কেননা তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য মনে মনে এতোটুকুও অনুতপ্ত নয়। তাই আপনি তাদেরকে বলে দিন, সকল মঙ্গলামঙ্গলের নির্ধারয়িতা যে আল্লাহ্, তাতো তোমরা বিশ্বাসই করতে চাও না। তাই তো মৃত্যুভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তোমরা আমাদের সঙ্গ পরিহার করেছিলে। অথচ তোমরা একথা কেনো বুঝতে চাও না যে, আল্লাহ্ কারো অনিষ্ট করতে চাইলে তা প্রতিহত করার সাধ্য যেমন কারো নেই, তেমনি তিনি যদি কাউকে কল্যাণায়িত করতে চান, তবে তা থেকে নিবৃত্ত করার সামর্থ্যও কেউ রাখে না। আর একথাও তোমরা মনে করো না কেনো যে, তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে ছলচাতুরী করে তোমাদের প্রকাশ্য-গোপন দুরভিসন্ধিসমূহকে ঢেকে রাখতে পারবে। কেননা তাঁর জ্ঞানাতীত কিছুই নেই। সকলের সকল বিষয়ই তাঁর জানা।

হজরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন, এখানে 'মরুবাসী' বলে বুঝানো হয়েছে গিফার, মুজাইনা, জুহাইনা, নাখা ও আসলাম গোত্রের লোকদেরকে। হুদায়বিয়া গমনকালে রসুল স. তাদেরকে সহযাত্রী হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ভেবেছিলো কুরায়শদের সম্মিলিত আক্রমণের সামনে মুসলিম বাহিনী টিকে থাকতে পারবেই না। তাই তারা নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচবার

জন্যই রসুল স. এর সাহচর্য পরিহার করেছিলো। কিন্তু রসুল স. ও সাহাবীগণকে শান্তির সঙ্গে ফিরে আসতে দেখে তারা নিরুপায় হয়ে রসুল স. এর কাছে নানাপ্রকার মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শন করেছিলো।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ভবিষ্যতের সংবাদ। আল্লাহ্ এখানে তাঁর প্রিয়তম রসুলকে আগাম সংবাদ দিয়েছেন এইমর্মে যে, তারা কিন্তু এভাবে কৃত্রিম ওজর-অজুহাতের কথা বলবে এবং নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে জানাবে ক্ষমাপ্রার্থনার আবেদন। কিন্তু মন তাদের বিশুদ্ধতাবিবর্জিত। তারা আপনার অথবা আল্লাহ্র সন্তোষ-অসন্তোষের পরওয়াই করে না। আর এখানকার 'তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত' কথাটির অর্থ— হে কাপুরুষ ও মিথ্যাবাদীরা! তোমরা মুখে যা কিছুই বলো না কেনো, তোমাদের কোনো কিছুই আল্লাহ্র অজানা নয়। তোমরা যে সাংসারিক ব্যস্ততার জন্য নয়, মৃত্যুর আশংকায় আমার রসুলের আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে সে কথা আল্লাহ্ ভালোভাবেই জানেন।

পরের আয়াতে (১২) বলা হয়েছে— 'না, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসুল ও মুমিনগণ তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনোই ফিরে যেতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিলো; তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়'।

এই আয়াতের শুরুতে উল্লেখিত 'বাল' শব্দটি আগের আয়াতের শেষ বাক্যের 'বাল' এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এভাবে আগের আয়াতের বক্তব্যগত ধারা প্রবাহিত হয়েছে এই আয়াতেও।

এখানে 'এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিলো' কথাটির অর্থ রসুল স. ও তাঁর সাহাবীগণ এ যাত্রায় আর আত্মরক্ষা করতে পারবেন না— এমতো ভাবনাটি ভাবতে তোমাদের ভালোই লাগছিলো। নিঃসন্দেহে শয়তানই তোমাদের এই চিন্তাটিকে তোমাদের হৃদয়ে আকর্ষণীয় করে প্রতিভাত করেছিলো। আর তোমরা তো শয়তানদেরই সতীর্থ। 'তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে' অর্থ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সম্পর্কে অনেক খারাপ ধারণা তোমাদের অন্তরে লালন করেছিলো। বাসনাও করেছিলে যে, আল্লাহ্র বাহিনী মূর্তিপূজকদের গ্রাসে পরিণত হোক। আর 'তোমরা তো ধ্বংসরূপী এক সম্প্রদায়' অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল সম্পর্কে এরকম মন্দ ধারণা পোষণ করার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তোমরা অপরিণামদর্শী ও অবরুদ্ধ হৃদয়বিশিষ্ট। নচেৎ তোমরা বুঝতে পারতে যে, ধ্বংসের দিকেই চলেছে তোমাদের ক্রমাগত পদচারণা।

এরপরের আয়াতে (১৩) বলা হয়েছে— 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান আনে না, আমি সেই সব কাফেরের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি'। একথার অর্থ— যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রত্যাদেশবাহককে বিশ্বাস করতে চায় না, ঐসকল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি নরকের লেলিহান আগুন, যার আয়ত্ত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো উপায় তাদের নেই। অতএব,

সকলেই একথা ভালো করে বুঝে নিক যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস না করলে কোনো অনিষ্টই তাঁদের হয় না, অনিষ্ট হয় প্রত্যাখ্যানকারীদের।

এখানে 'সায়ীর' (জ্বলন্ত অগ্নি) শব্দটিতে সংযুক্ত তানভীন ভীতিপ্রকাশক। অর্থাৎ তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে ভয়ংকর অগ্নি। আর সর্বনাম ব্যতীত এখানে 'লিল্কাফিরীনা' উল্লেখ করে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস না করাই হবে তাদের নরকাগ্নিতে প্রবেশ করার কারণ। আর নরকই তাদের চিরকালীন বসবাস হওয়ার উপযুক্ত।

এরপরের আয়াতে (১৪) বলা হয়েছে— 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। একথার অর্থ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব যেহেতু আল্লাহ্র এবং তিনি যেহেতু সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ধারী, সেহেতু তাঁর অভিপ্রায়কে প্রতিহত করতে পারে এমন কেউ, অথবা কোনোকিছুই নেই। ক্ষমা ও শাস্তি তাঁর অপ্রতিরোধ্য অভিপ্রায়াধীন। তাই যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা, তাকে দেন শাস্তি। আর তিনি ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াপরবশ। ক্ষমা ও দয়ার দিকটিই তাঁর প্রবল এবং অপেক্ষাকৃতভাবে অপ্রবল শাস্তির দিকটি।

সূরা ফাতাহ্ ঃ আয়াত ১৫, ১৬, ১৭

❑ তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাইবে তখন যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল, তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে তোমাদের সঙ্গে যাইতে দাও।' উহারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করিতে চায়। বল, 'তোমরা কিছুতেই আমাদের সংগী হইতে পারিবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ।' বস্তুত উহাদের বোধশক্তি সামান্য।

❑ যেসব মরুবাসী পশ্চাতে রহিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে বল, 'তোমরা আহূত হইবে এক প্রবল-পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে; তোমরা উহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না উহারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

❑ অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নাই, খঞ্জের জন্য কোন অপরাধ নাই এবং পীড়িতের জন্য কোন অপরাধ নাই; এবং যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে তিনি তাহাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আমার রসুল! দেখবেন, হুদায়বিয়া যাত্রার সময় যে সকল মরুবাসী পশ্চাদপসরণ করেছিলো, তারা খায়বর অভিযানের সময় যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লোভে বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গী করে নাও। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি বদলে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তোমরা কোনোক্রমেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ্‌র আদেশ এরকমই। দেখবেন, তারা তখন বলবে, তোমরা তো বিদ্বেষবশতঃ এরকম বলছো। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে, তারা নিজেরাই বিদ্বেষপরায়ণ। আপাদমস্তক বিদ্বেষাচ্ছাদিত বলে তাদের বোধশক্তিও অন্তর্হিত প্রায়।

এখানে 'আমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও' অর্থ আমাদেরকেও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য তোমাদের অভিযানে অংশগ্রহণ করতে দাও। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানে 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ' বলে বুঝানো হয়েছে খায়বর অভিযানের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের কথা।

মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সাহাবীগণকে খায়বর অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। যারা হুদায়বিয়াতে গিয়েছিলেন,তাঁরা যথাসত্বর প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যারা হুদায়বিয়ায় যায়নি, তারাও গণিমতের লোভে খায়বর গমনের জন্য প্রস্তুত হলো। কেননা হুদায়বিয়া থেকে মুসলিম বাহিনীর অক্ষত অবস্থায় মদীনায় ফিরতে দেখে তাদের মনে হয়েছিলো মুসলমানেরা বিজয়ী হবে এবং লাভ করবে অনেক গণিমত। তারা মনে করতো, গণিমত লাভ করাই যুদ্ধ করার

আসল উদ্দেশ্য। একারণেই আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেন যে, ওই সকল লোক মুজাহিদ নয়। তাই তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

তাফসীরে মাযহারী/৬৮০

'তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি বদলে দিতে চায়' কথাটির অর্থ আল্লাহ্ আগেই তাঁর রসুলকে এই মর্মে নির্দেশ করেছেন যে, তাদেরকে খায়বর অভিযানে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। তারা আল্লাহ্র এমতো সিদ্ধান্তটি বদলে দিতে চায়। অন্য এক আয়াতেও এধরনের পূর্ব সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন 'অতঃপর তারা আপনার কাছে অভিযানে যাওয়ার অনুমতি কামনা করে। আপনি বলুন, তোমরা কখনোই আমার সঙ্গে যাবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবারে বসে থাকাই পছন্দ করেছো'। এরকম বলেছেন ইবনে জায়েদ ও কাতাদা।

আমি বলি, যারা হুদায়বিয়ায় যায়নি, তারা যখন জানতে পারলো যে, মুসলমানেরা যুদ্ধ করতে পিছপা নয়। তারা জেহাদের বায়াতও গ্রহণ করেছে। তাদের এরকম অনড় মনোভাবের কারণেই কুরায়েশদের মতো যুদ্ধপ্রিয় গোত্রও তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে। ফলে মূল আরবভূখণ্ডে নেমে এসেছে শান্তি। এখন মুসলমানেরা নিশ্চয় নতুন কোনো ভূখণ্ডের যুদ্ধলব্ধ সম্পদাধিকারী হবে। এসকল কথা ভেবে তাদের অনুশোচনা হলো। ইত্যবসরে রসুল স. নতুন করে খায়বর যাত্রার ঘোষণা দিলেন, যদিও তিনি স. একথা ভালো করেই জানতেন যে, খায়বরবাসীরা মক্কাবাসীদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। দশ হাজার রণনিপুণ যোদ্ধা তাদের প্রস্তুত থাকতো সব সময়। তৎসত্ত্বেও তিনি স. যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা দেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, মুসলিম বাহিনী যদি এতোই শক্তিশালী ছিলো, তাহলে তাঁরা জোর করে মক্কায় প্রবেশ করতে পারলেন না কেনো? এর কারণস্বরূপ বলা যেতে পার যে, এটা ছিলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মক্কাবাসীদের প্রতি করুণা। তিনি মক্কাবাসীদেরকে ইতোপূর্বেও এভাবে আবরাহার হস্তিবাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তো একথা জানতেনই যে, পরবর্তীতে তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে। তাদের বংশধরগণের মধ্যেও আগমন করবে বহুসংখ্যক পুণ্যবান বিশ্বাসী। আর একটি কারণ এরকমও হতে পারে যে, তুমুল যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী ভুলক্রমে ওই সকল মুসলমানদেরকেও হত্যা করে ফেলতেন, যারা তাদের ইমানকে গোপন রেখে অথবা নিগৃহীত হয়ে কোনোক্রমে মক্কায় নিজেদের জীবন রক্ষা করে যাচ্ছিলেন।

'বলো, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না' এই কথাটিও একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন, যেমন ইতোপূর্বেও আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তারা কিন্তু খায়বরে যেতে পারবে না। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার লিখেছেন, কথাটি কেবল না-সূচক হলেও এটি একটি নিষেধাজ্ঞা। 'আল্লাহ্ পূর্বেই এরকম ঘোষণা দিয়েছেন' অর্থ হে রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, এই নিষেধাজ্ঞাটি আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নয়, এই সিদ্ধান্তটি আমি পেয়েছি প্রত্যাদেশযোগে। আর সে প্রত্যাদেশের মর্ম এই যে, খায়বর অভিযানে অংশগ্রহণ করতে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে পারবে কেবল তারা, যারা ইতোপূর্বে হুদায়বিয়ায় গিয়েছিলো। অথবা, হুদায়বিয়ায় যারা যায়নি তারা আর কোনো অভিযানে অংশগ্রহণ করতে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করতে পারবে না।

তাফসীরে মাযহারী/৬৮১

উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য ওই সকল লোক নয়, যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলো 'ফাছতা'জানুকা' (তারা আপনার নিকট অনুমতি চেয়ে নিক) আয়াত। কেননা ওই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো আরো একবছর পরে নবম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে। আর আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত মরুবাসীদের ঘটনা ঘটেছিলো অষ্টম হিজরীতে হুদায়বিয়া যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে।

'তোমরা তো বিদ্বেষ পোষণ করছো' অর্থ তারা বললো, আল্লাহ্ এরকম প্রত্যাদেশ করেননি, তোমরা আমাদেরকে সঙ্গে নিতে চাইছো না কেবল হিংসে করে। আর 'বস্তুত তাদের বোধশক্তি সামান্য' কথাটির অর্থ— ওই সকল মরুবাসী একথা জানেই না যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনটা কল্যাণকর এবং কোনটা অকল্যাণকর। ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভবোধ তাদের একেবারেই নেই। কেননা তারা ঘোর পৃথিবীপ্রসক্ত। তাদের বোধ-বুদ্ধি সম্পূর্ণতই পার্থিবতাপ্রভাবিত।

পরের আয়াতে (১৬) বলা হয়েছে— 'যেসব মরুবাসী পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিলো, তাদেরকে বলো, তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে যতোক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো, তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! যারা আপনার হুদায়বিয়া যাত্রায় অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে বলে দিন, এরপর তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে মক্কাবাসীদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী এক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। ওই যুদ্ধ তোমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এই নির্দেশটি পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে জান্নাত দান করবেন। আর তোমরা যদি পুনরায় পিছিয়ে যাও, তবে তিনি তোমাদেরকে দিবেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

এখানে 'কুলিল্ মুখল্লাফীন' কথাটিতে প্রথম পুরুষ (তারা) সর্বনাম ব্যবহার করার পরিবর্তে 'মুখল্লাফীন' কথাটি মোট দু'বার উল্লেখ করে তিরস্কারের বিষয়টিতেই জোর দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধকালে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যে জঘন্য অপরাধ, সে কথাকে সুস্পষ্ট করাই এমতো শব্দ ব্যবহারের কারণ। আর এখানকার 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' অর্থ রোমীয়গণ। অর্থাৎ তাবুক সমর। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তাবুক অভিযানের কথা। এরকম বলেছেন কা'ব।

আমি বলি, এখানে এরকম বলা হয়েছে যে 'তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে ততোক্ষণ, যতোক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে'। সুতরাং এখানকার 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' অর্থ রোমবাসী হতে পরে না। কেননা তাবুকে না তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে, না তারা গ্রহণ করেছে ইসলাম। রসুল স. তাবুকে অপেক্ষা করেছিলেন দশদিন। কিন্তু রোমপ্রশাসক হেরাক্লিয়াস তার অবস্থান থেকে একটুও এগিয়ে আসেনি। তাই শেষ পর্যন্ত রসুল স.কে সেখান থেকে যুদ্ধ না করেই ফিরে আসতে হয়েছিলো।

সাঈদ ইবনে জোবায়ের ও কাতাদা বলেছেন, এখানে 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' বলে বুঝানো হয়েছে হাওয়াযেন, ছাক্বিফ ও গাতফান গোত্রকে। তাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিলো হুনায়েন প্রান্তরে। আমার মতে, এই অভিমতটিও সঠিক নয়। কেননা নির্ভুল সূত্রপরম্পরায় এরকম কথা আসেনি যে, রসুল স. ওই মরুবাসীদেরকে হুনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বলেছিলেন। তাছাড়া হাওয়াযেন ইত্যাদি গোত্রগুলো 'প্রবল পরাক্রান্ত'ও ছিলো না। বরং সংখ্যায় ও শক্তিতে তারা ছিলো মুসলমানদের চেয়েও দুর্বল।

জুহুরী ও মুকাতিল বলেছেন, বনী হুনাইফা, অর্থাৎ ইয়ামামাবাসী, যারা মুসাইলামা কাজ্জাবের অনুসারী হয়ে গিয়েছিলো, তাদের কথাই বলা হয়েছে এখানে। হজরত রাফে ইবনে খাদিজ বলেছেন, আমি এই আয়াত পাঠ করি, কিন্তু একথা জানি না যে, এখানে 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' বলে কাকে বোঝানো হয়েছে। এরপর যখন খলিফা হজরত আবু বকর আমাদেরকে বনী হুনাইফার লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানালেন, তখন আমরা জানতে পারলাম 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' বলে এখানে বুঝানো হয়েছে হুনাইফা সম্প্রদায়কে। অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত এটাই। বায়যাবীও এই অভিমতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর 'যতোক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে' অর্থ যতোক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। অর্থাৎ হয় যুদ্ধ, না হয় ইসলাম। তৃতীয় কোনো পন্থা প্রয়োগের অবকাশ এখানে রাখা হয়নি। 'জিযিয়া' কর নিয়ে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দানের সুযোগও এখানে রাখা হয়নি। 'জিযিয়া' প্রযোজ্য কেবল আরবের অবিশ্বাসী, মূর্তিপূজক ও ধর্মত্যাগীদের ক্ষেত্রে। রোমবাসী ও অন্যান্য অনারব অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও এই তিনটি পন্থার যে কোনো একটি অবলম্বন করা যায়— যুদ্ধ, ইসলাম অথবা জিযিয়া।

বর্ণিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে হজরত আবু বকরের খেলাফতের সত্যতাও প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা তিনিই যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, আতা ও ইবনে জুরাইজের মতে এখানকার 'প্রবল পরাক্রান্ত জাতি' অর্থ পারস্য জাতি। এমতাবস্থায় প্রমাণিত হয় যে, হজরত ওমরের খেলাফত সত্য এবং সেই সঙ্গে সত্য হজরত আবু বকরের খেলাফত। কেননা হজরত ওমরকে খলিফা নির্বাচিত করেছিলেন তিনিই। আর হজরত ওমরই যুদ্ধপরিকল্পনা করেছিলেন পারস্যবাসীর বিরুদ্ধে। আর এমতাবস্থায় 'যতোক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে' কথাটির অর্থ যতোক্ষণ না তারা পরাভব মানে এবংজিযিয়া দিতে সম্মত হয়।

'উত্তম পুরস্কার দান করবেন' অর্থ এখানে— দান করবেন জান্নাত। আর 'যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো' অর্থ যদি পিছটান দাও সেভাবে, যেভাবে পিছটান দিয়েছিলে হুদায়বিয়া যাত্রার প্রাক্কালে।

বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, তখন পাঁচজন প্রতিবন্ধী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশবাহক! তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে? তখন অবতীর্ণ হয় পরবর্তী আয়াত (১৮)। বলা হয়—

'অন্ধের জন্য কোনো অপরাধ নেই, খঞ্জের জন্য কোনো অপরাধ নেই এবং পীড়িতদের জন্য কোনো অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন'।

এখানে অন্ধ, খঞ্জ ও পীড়িতদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, অর্থ তারা যেহেতু যুদ্ধ করতে অসমর্থ, তাই যুদ্ধে না গেলেও আল্লাহ্ তাদেরকে অভিযুক্ত করবেন না।

সুরা ফাতাহ্ আয়াত ১৮, ১৯, ২০

❑ আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হইলেন যখন তাহারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল, তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন; তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়

❑ ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ, যাহা উহারা হস্তগত করিবে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

❑ আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যাহার অধিকারী হইবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন যেন ইহা হয় মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিচালিত করেন সরল পথে;

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে—নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসবানদের উপরে পরিতুষ্ট হলেন, যখন তারা হুদায়বিয়ার এই বৃক্ষতলে আপনার নিকট জেহাদের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো, তাদের অন্তরে যে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসুল এবং ইসলামের জন্য বিশুদ্ধ ভালোবাসা ছিলো, তা তো তিনি জানেনই। তাই তাদেরকে প্রতিফলরূপে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন খায়বরের অত্যাসন্ন বিজয় ও সুপ্রতুল যুদ্ধলভ্য সম্পদ, যা তাদের হস্তগত হবেই। আর এটা হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্রই নির্ধারণ।

এখানে 'বৃক্ষতলে' অর্থ হুদায়বিয়া প্রান্তরের সেই বৃক্ষটির নিচে, যেখানে সম্পন্ন হয়েছিলো অঙ্গীকারপর্ব। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণেই হুদায়বিয়ার বায়াতানুষ্ঠানকে বলা হয়ে থাকে 'বায়াতে রিদ্বওয়ান' বা সন্তুষ্টির শপথ। আর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বায়াত গ্রহণকারী সাহাবীগণের প্রশংসা বর্ণনার্থে এবং আগের আয়াত ছিলো বায়াতের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণার্থে।

'বোখারী' ও 'মুসলিম' গ্রন্থে এসেছে, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, হুদায়বিয়ায় আমরা বায়াত গ্রহণ করেছিলাম চৌদ্দশতজন। রসুল স. তখন বলেছিলেন, পৃথিবীতে তোমরাই সর্বোত্তম। ইমাম মুসলিম কর্তৃক সুপরিণতসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হজরত উম্মে বিশর বলেছেন, ওই গাছের নিচে যারা আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলো, তারা দোজখে যাবে না।

এখানে তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি, অর্থ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করলেন একাগ্রতা এবং তাদের প্রবৃত্তিকে করে দিলেন শান্তিমগ্ন। 'আসন্ন বিজয়' অর্থ খায়বর বিজয়। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে আয়েজ বর্ণনা করেছেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রসুল স. মদীনায় অবস্থান করেছিলেন দশ দিন। তারপর যাত্রা করেন খায়বরের দিকে। সুলায়মান তাঈমি বলেছেন, তিনি স. মদীনায় ছিলেন পনেরো দিন। উকবার বর্ণনায় এসেছে, জুহুরী বলেছেন, তখন মদীনায় ছিলেন তিনি কুড়ি দিন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, মুসাওয়ার ও মারোয়ান থেকে এসেছে, রসুল স. জিলহজ মাসে হোদাইবিয়া থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে অবস্থান করেন মহররম পর্যন্ত। মহররমেই তিনি স. খায়বর অভিযানে রওয়ানা হয়ে যান এবং খায়বর বিজয় সম্পন্ন হয় ৭ হিজরী সনের সফর মাসে। এরকম বলা হয়েছে ওয়াকেদি কর্তৃক রচিত মাগাজী গ্রন্থে। হাফেজ বলেছেন এবর্ণনাটিই সমধিক প্রকৃষ্ট।

'বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলভ্য সম্পদ' অর্থ প্রচুর পরিমাণ গণিমতের মাল। জননী আয়েশা বলেছেন, খায়বর বিজয় সুসম্পন্ন হওয়ার পর আমি বলেছিলাম, এখন থেকে আমরা পেট ভরে খেজুর খেতে পারবো। হজরত ইবনে ওমর বলেছেন, খায়বর বিজিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনো পেট পুরে আহার করতে পারিনি। হাফেজ মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী বলেছেন, খায়বরে ছিলো কৃষিক্ষেত্র, বহুসংখ্যক খেজুরের বাগান। আর তা ছিলো হুদায়বিয়া থেকে তিন দিনের পথের দূরত্বে ইরাকী হজযাত্রীদের যাতায়াত-পথের বামপ্রান্তে।

পরের আয়াতে (২০) বলা হয়েছে— 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি এটা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছেন এবং তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হস্ত নিবারণ করেছেন, যেনো এটা হয় মুমিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে'।

এখানে 'প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের' বলে বুঝানো হয়েছে সমুদয় যুদ্ধলভ্য সম্পদকে, যা মুসলমানেরা লাভ করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

হুদায়বিয়া থেকে মুসলমানগণ ফিরে আসেন মনঃক্ষুণ্ন হয়ে। কেননা দৃশ্যতঃ হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিটি ছিলো মুসলমানগণের জন্য অবমাননাকর। তাই তাঁদের সান্ত্বনা প্রদানার্থে তখন অবতীর্ণ হয়। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের'।

'তিনি তোমাদের থেকে মানুষের হস্ত নিবারণ করেছেন' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন শত্রুদের আক্রমণাশংকা থেকে। বাগবী লিখেছেন, রসুল স. যখন খায়বর অবরোধে ব্যস্ত ছিলেন, তখন গাতফান গোত্রের লোকেরা মদীনা আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেন। ফলে তারা আর অগ্রসর হওয়ার সাহস পায়নি।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, গাতফান গোত্র রসুল স. এর প্রতিপক্ষ ছিলো। তারা গোপনে গোপনে মদীনার ইহুদীদেরকে সাহায্য সহযোগিতাও করতো। তারা যখন শুনলো রসুল স. খায়বর গিয়েছেন, তখন তারা ইহুদীদেরকে সাহায্য করবার জন্য মদীনার দিকে যাত্রা করলো। কিছুদূর অগ্রসর হতেই সংবাদ পেলো, তাদের পরিবারের মধ্যেই শুরু হয়েছে গণ্ডগোল। বুঝতে পারলো, রসুল স. ও তাঁর সাহাবীগণ এসে পড়েছেন। তখন ভয়ে তারা আপন জনপদে ফিরে গিয়ে পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার কাজে মন দিলো। ফলে রসুল স. এর খায়বর যাত্রা হলো অধিকতর সুগম।

সাঈদ ইবনে শুতাইম সূত্রে ইবনে কানে', বাগবী ও আবু নাঈম বর্ণনা করেছেন, সাঈদের পিতা উয়াইনা ইবনে হিস্ন গাতফান বাহিনীর সঙ্গে ছিলো, সে বলেছে, আমরা হঠাৎ আওয়াজ শুনতে পেলাম, হে জনতা! পরিবার পরিজনের খবর নাও। তাদের উপরে হামলা করা হয়েছে। ওই আওয়াজ শোনামাত্র সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেলো। কেউ কারো দিকে তাকিয়েও দেখলো না। আমার মনে হলো, আওয়াজটি ভেসে এসেছিলো আকাশের দিক থেকে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার আবার বলেছেন, এখানকার 'তোমাদের থেকে মানুষের হস্ত নিবারণ করেছেন', অর্থ হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির কারণে আল্লাহ্ তোমাদের উপর শত্রুর আক্রমণাশংকা দূরীভূত করেছেন। আর তিনি তা করেছেন এজন্য যে, তোমরা যেনো নিরাপদে থাকো, কিংবা তোমরা যেনো সহজে লাভ করতে পারো গণিমতের মাল। এটাই হচ্ছে তোমাদের থেকে মানুষের হস্ত নিবারিত করা, যা হয়ে রইলো রসুল স. গণিমতের মাল সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার সত্যতার একটি নিদর্শন। আর এখানাকার 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে চালনা করেন ইসলামের আদর্শে, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং যাতে করে তোমরা তোমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে করতে পারো অধিকতর প্রসারিত।

খায়বর যুদ্ধের বিবরণঃ হজরত আবু হোরায়রা থেকে আহমদ ইবনে খুজাইমা ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, খায়বর যাত্রার প্রাক্কালে রসুল স. মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে রেখে যান সাবা ইবনে আরফাতাহ্কে। তিনি স. যখন খায়বর

অভিযানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন ইহুদীরা পড়লো বিপাকে। তারা তখন সাহাবীগণকে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য ওঠে পড়ে লেগে গেলো। নাছোড় বান্দার মতো ঋণী সাহাবীগণকে বলতে লাগলো, আগে আমাদের ঋণ পরিশোধ করো, তারপর কোথায় যাবে যাও।

আহমদ ও তিবরানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু জদর বর্ণনা করেছেন, আবু শাহম ইহুদী আমার কাছে পেতো পাঁচ দিরহাম। সে আমাকে ধরলো। আমি তাকে বললাম, ফিরে আসার পর আমি তোমার পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করবো। কটা দিন সময় দাও আমাকে। রসুল স. বলেছেন, খায়বর যুদ্ধ থেকে আমরা অনেক গণিমত পাবো। আবু শাহম বললো, কী মনে করেছো তোমরা। খায়বর যুদ্ধ কি সেরকম হবে, যেমন করে তোমাদের উপরে চড়াও হয় গ্রাম্য লোকেরা? শপথ তওরাতের। খায়বরে রয়েছে দশ হাজার রণনিপুণ যোদ্ধা। এরপর সে আমাকে নিয়ে হাজির হলো রসুল স. এর পবিত্র সাহচর্যে। সব শুনে রসুল স. আমাকে বললেন, তার পাওনা মিটিয়ে দাও। আমি তখন একটি বস্ত্র বিক্রয় করে তাকে দিলাম তিন দিরহাম।

রসুল স. খায়বরের সন্নিকটবর্তী সুহবা নামক স্থানে পৌছে নির্দেশ দিলেন, তোমাদের কাছে যা কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে, তা নিয়ে এসো। সকলে এনে জমা করতে লাগলো কেবল ছাতু। কেননা অন্য কোনো প্রকার খাদ্য তখন কারো ছিলো না। রসুল স. পানি দিয়ে ছাতু ভেজালেন। নিজে খেলেন। আমাদেরকেও খেতে বললেন। এরপর তিনি স. নামাজ পড়ালেন ওজু না করে। বোখারী, বায়হাকী। মোহাম্মদ ইবনে আমর বলেছেন, এরপর তিনি স. সেখান থেকে যাত্রা করে পৌছলেন খায়বরের এক বাজারে। ওই জায়গাটি খায়বর বিজয়ের পরে হজরত জায়েদ ইবনে সাবেতের ভাগে পড়েছিলো। তিনি স. সেখানে পৌছেন

রাতে। খায়বরের ইহুদীরা চিন্তাও করতে পারেনি যে, রসুল স. এতো দূরে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবেন। কেননা তারা সংখ্যায় ও শক্তিতে ছিলো মুসলমানদের চেয়ে বেশী শক্তিমান। যখন তারা এই সংবাদ জানতে পারলো, তখন থেকে প্রতিদিন তাদের দশহাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য প্রতিদিন খায়বরের বাইরে এসে টহল দিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর দেখা না পেয়ে ভাবতো, নাহ্। সংবাদটা মনে হয় ঠিক নয়। এতো বড় সাহস তাদের হবেই না। এরকম ভাবতে ভাবতে তারা হয়ে পড়লো অসতর্ক।

তাই যে রাতে রসুল স. সেখানকার বাজারে গিয়ে পৌঁছলেন, সে রাতে তাদের কোনো গতিবিধিই পরিলক্ষিত হলো না। তারা তখন ছিলো নিজ নিজ আবাসে নিদ্রাসুখে বিভোর। কিন্তু সকালে উঠেই বুঝতে পারলো বিপদ একেবারে নিকটে। ভয়ে ও আতংকে কাঁপতে লাগলো তারা। বেরিয়ে এলো দুর্গ থেকে। বোখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. খায়বরের উপকণ্ঠে পৌঁছলেন রাতে। তাঁর নিয়ম ছিলো, রাতে কোথাও পৌঁছে গেলেও তিনি শহরবাসীদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসতেন না। অপেক্ষা করতেন ভোর পর্যন্ত। তারপর শহর থেকে

আজান ধ্বনিত হলে আর আক্রমণ করতেন না। আক্রমণ করতেন তখনই, যখন সেখানে ভোরের আজান শোনা যেতো না। আমরা ভোরে সেখানে নামাজ পড়লাম। আজান শোনা গেলো। তিনি স. অশ্বারূঢ় হলেন। নিজ নিজ বাহনে উঠে পড়লেন সাহাবীগণও। দেখা গেলো শহরবাসীরা টুকরী কাস্তে কোদাল ইত্যাদি নিয়ে নিজ নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে আসছে। হঠাৎ তারা সম্মুখীন হলো সুসজ্জিত মুসলিম বাহিনীর। সভয়ে পিছিয়ে গেলো তারা। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করলো, মোহাম্মদ এসে গিয়েছে। সাথে সাথে উপস্থিত হয়েছে তাঁর পুরো বাহিনী। রসুল স. তাঁর উভয় হস্ত উর্ধ্বে উত্তোলন করে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন 'আল্লাহু আকবার'। খায়বর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন কোনো সম্প্রদায়ের অঙ্গণে প্রবেশ করি, তখন প্রথমে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। তবু যদি তারা নম্র না হয়, তখন তাদের ওই সকাল হয় নিতান্তই অমঙ্গলের (অর্থাৎ তাদেরকে লুণ্ঠন করা হয়)। রসুল স. নগরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুসলমানদেরকে সারিবদ্ধ করে বললেন, শোনো, কেউ যেনো আমার অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধ শুরু না করে। কিন্তু কী এক আশংকায় এক লোক এক ইহুদীকে আক্রমণ করেই বসলো। ইহুদীও শুরু করলো পাল্টা আক্রমণ এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হত্যাও করে ফেললো তাকে। কেউ কেউ বলতো লাগলো, অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়ে গিয়েছেন। রসুল স. বললেন, আমি তো তাকে আমার অনুমতি ছাড়া যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলাম। সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। রসুল স. বললেন, এক ঘোষককে ঘোষণা করে দিতে বলো যে, যারা অবাধ্য, তাদের জন্য জান্নাত বৈধ নয়।

হজরত জাবের থেকে তিবরানী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. সেদিন বলেছিলেন, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার আকাঙ্খা করবে না। বরং আল্লাহ্র কাছে সর্বাবস্থায় কামনা করবে নিরাপত্তা। কেননা একথা তোমাদের জানা নেই যে, যুদ্ধে কার পরিণতি কেমন হবে। কিন্তু যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য হলে প্রার্থনা করবে, হে আমাদের আল্লাহ্। আমাদের ও তাদের প্রভুপালনকর্তা! আমাদের ও তাদের তকদীর সম্পূর্ণতই তোমার কর্তৃত্বাগত। তাদেরকে কতল তুমিই করো। এবার তোমরা মাটি আঁকড়ে ধরে বসে পড়ো। শত্রুরা যখন তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তখন দাঁড়িয়ে যেয়ো এবং উচ্চারণ কোরো 'আল্লাহু আকবর'।

ইবনে ইসহাক ও মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেছেন, রসুল স. নিশান বণ্টন করে দিলেন। অনুমতি দিলেন যুদ্ধ শুরু করার। উপদেশ দিলেন, সর্বাবস্থায় মনোবল অটুট রাখতে হবে। সর্বপ্রথম অবরোধ করা হলো নাতাত এলাকার নায়েম দুর্গ। তুমুল যুদ্ধ হলো। নাতাতবাসীরা আক্রমণ প্রতিহত করলো প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে। রসুল স. নাজিয়াতে ফিরে এলেন। পরদিন পুনরায় যুদ্ধ হলো। কিন্তু তাদেরকে পরাস্ত করা গেলো না। এভাবে কয়েকদিন চলার পর কেল্লার পতন ঘটলো।

বায়হাকী, আবু নাঈম ও মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, মুসলিম বাহিনী যখন খায়বরে পৌঁছলো, তখন সেখানকার খেজুর ছিলো কাঁচা। কাঁচা খেজুর

খেয়ে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিলো জ্বরের প্রকোপ। সমস্যাটি উত্থাপন করা হলো রসুল স. সকাশে। তিনি স. বললেন, তোমরা মশকগুলো পানি দিয়ে ভরে নাও এবং সকালের দিকে দুই আজানের মধ্যবর্তী সময়ে বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শরীরে ঢেলে নিয়ো। সকলে তাই করলো। লাভ করলো সুস্থতা ও সবলতা। তাঁদের মনে হলো, চোখের সামনে যেনো খুলে গেলো কারাগারের দরোজা। মুক্তি ঘটলো বন্দীদশা থেকে, যেমন উটের পায়ের বাঁধন খুলে দিলে সে সতেজে উঠে দাঁড়ায়।

নায়েম কেল্লা বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী অবরোধ করলো সুয়াব ইবনে মুয়াজের কেল্লা। হজরত আবু ইয়াসির ও কা'ব ইবনে ওমর থেকে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, ওই কেল্লাটি ছিলো অত্যন্ত মজবুত। মুসলমানেরা তিন দিন পর্যন্ত ওই কেল্লা অবরোধ করে রাখে।

আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তির বরাত দিয়ে ইসহাক ও মাতাব আসলামী সূত্রে মোহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, আসলাম গোত্রের লোকটি বলেছেন, আমাদের গোত্রের লোকেরা ক্ষুধায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিলো। তবুও আমরা খায়বর পৌঁছে দশদিন পর্যন্ত নাতাত দুর্গ অবরোধে অংশগ্রহণ করলাম, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, এমন কোনো উপায় আমরা বের করতে পারলাম না। লোকেরা আসমা ইবনে হারেছাকে রসুল স. এর কাছে পাঠালো। আসমা তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমাদের গোত্রের লোকেরা আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন এবং বলতে বলেছেন, আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। রসুল স. বললেন, খাদ্যের ব্যবস্থা তো এখানেও নেই। পরক্ষণে বললেন, হে আল্লাহ্। সবচেয়ে বড় দুর্গটির পতন ত্বরান্বিত করো, যে দুর্গের মধ্য রয়েছে সবচেয়ে বেশী খাদ্যসম্ভার। এরপর তিনি স. নিশান তুলে দিলেন হজরত হাব্বাব ইবনে মুনজিরের হাতে। বললেন, হাব্বাবের নিশানের নিচে সকলে সমবেত হও। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমরা রসুল স. এর নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করবার আগেই শুনতে পেলাম সুয়াব ইবনে মুয়াজের দুর্গের পতন ঘটেছে। ওই দুর্গের মধ্যে ছিলো সর্বাপেক্ষা অধিক খাদ্যশস্যের মওজুদ। হজরত হাব্বাবকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এসেছিলো ইহুদী ইউশা। হজরত হাব্বাব তাকে কতল করে ফেলেন। এরপর বের হয়ে এলো জিয়াল। তাকে কতল করলেন হজরত আম্মারা ইবনে উকবা গিফারী। এসব দেখে লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, তার যুদ্ধ একেবারে বিফলে গেলো। রসুল স. বললেন, এর জন্য তার কোনো পাপ হবে না। বরং এতে করে সে পুণ্য লাভ করবে।

হজরত জাবের থেকে মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, সুয়াব দুর্গে মুসলমানেরা এতো বেশী খাদ্যসামগ্রী লাভ করে, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি, সেখানে জমা করা ছিলো বিপুল পরিমাণ খেজুর, ঘি, জয়তুনের তেল ও চর্বি। রসুল স. নির্দেশ দিলেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে পানাহর করো। কিন্তু নিয়ে যেয়ো না।

বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, মোহাম্মদ ইবনে ওমর বলেছেন, ইহুদীরা নায়েম ও সুয়াব দুর্গের পতনের পর চলে যায় যোবায়েরের দুর্গে। ওই দুর্গের চূড়ায়

অবস্থান নিয়েছিলো এক ইহুদি পুরোহিত। মুসলমানেরা ওই দুর্গটিও অবরোধ করলেন। অবরোধ চললো তিন দিন ধরে। গাজ্জাল নামক এক ইহুদী গোপনে রসুল স. এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবুল কাসেম! আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দিচ্ছি, যার দ্বারা আপনি দুর্গবাসীদের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। তবে শর্ত হচ্ছে, আমার পরিবার পরিজনকে নিরাপত্তা দিতে হবে। তাদেরকে নিয়ে যেতে দিতে হবে শাকেতে। কেননা আমি জানি যে, সেখানকার লোকেরা আপনার কথায় জীবন দিতে পারে। রসুল স. অঙ্গীকার করলেন, ঠিক আছে, তুমি যেমন বলছো, সেভাবেই নিরাপত্তা দেওয়া হলো তোমার পরিবার পরিজনকে। ইহুদী বললো, তাহলে শুনুন। আপনি এক মাস ধরে তাদেরকে অবরোধ করে রাখলেও তারা কাবু হবে না। কেননা তাদের আওতায় রয়েছে ভূগর্ভস্থ পানি। রাতে তারা সেখান থেকে পানি সংগ্রহ করে। আপনি যদি তাদের পানি সংগ্রহের সংযোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেন, তাহলে তারা বেকায়দায় পড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। রসুল স. তাই করলেন। ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো তাদের পানি সংগ্রহের পথ। মরিয়া হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো তারা। যুদ্ধ করলো প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে। মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজন শহীদ হলেন। আর তাদের লোক নিহত হলো দশ জন। অবশেষে ওই দুর্গটিও মুসলমানদের অধিকারে এলো। এটাই ছিলো নাতাতের সর্বশেষ দুর্গ।

রসুল স. এবার মনোযোগ দিলেন শাকের দিকে। সেখানকার দুর্গের একটি ছাউনিকে বলা হতো সামুয়ান। রসুল স. প্রথম নজর দিলেন সেদিকেই। ছাউনিটির লোকদের সঙ্গে শুরু হলো যুদ্ধ। গাজাওয়াল নামক এক ইহুদী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করলেন হাব্বাব ইবনে মুনজির। বের হলো আর এক ইহুদী। তাকে হত্যা করলেন হজরত আবু দুজানা। তারপর তার তলোয়ার ও বর্ম নিয়ে উপস্থিত হলেন রসুল স. সকাশে। রসুল স. তলোয়ার ও বর্মটি তাকেই দিয়ে দিলেন। এরপর এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো সকল ইহুদী। দাঁড়িয়ে রইলো আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। মুসলিম বাহিনী পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলো 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার'। তারপর ঢুকে পড়লো দুর্গাভ্যন্তরে। পুরোভাগে ছিলেন হজরত আবু দুজানা। সেখানেও মুসলমানেরা লাভ করেন বহুসংখ্যক ছাগল, ভেড়া এবং প্রচুর খাদ্যসামগ্রী। সেখানকার যোদ্ধারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো বানযাল দুর্গে। নাতাত্ থেকে সেখানে পালিয়ে গিয়েছিলো কেউ কেউ। রসুল স. এবার ওই দুর্গটিও অবরোধ করলেন। সেখানেও শুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। তাদের দিক থেকে ছুটে আসতে লাগলো অসংখ্য তীর। দু'টি তীর ছুটে এলো রসুল স. এর দিকেও এবং সেগুলো জড়িয়ে গেলো তাঁর পরিধেয় বসনে। তিনি সেগুলো একত্র করলেন। তারপর এক মুঠো কাঁকর নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন দুর্গের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গটি কাঁপতে শুরু করলো। দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়লো। মুসলমানেরা প্রবেশ করলো দুর্গের ভিতরে। বন্দী করে ফেললো সকল ইহুদীকে। সেখান থেকে কিছুসংখ্যক ইহুদী পালিয়ে যেতেও সমর্থ হলো। তারা চলে গেলো কাছীবা ছাউনির দিকে।

সেখানকার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিলো কামুস। ঘাঁটিটি ছিলো সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত। ইবনে আবী উকবা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. কামুস অবরোধ করে রাখলেন কুড়ি দিন ধরে। এভাবে অবরোধের পর অবরোধ পরিচালনা করতে গিয়ে রসুল স. কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হজরত সহল ইবনে সা'দ থেকে বোখারী, হজরত সালমা ইবনে আকওয়া থেকে বোখারী ও আবু নাঈম, হজরত ওমর, হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে আবু নাঈম, হজরত আবু হোরায়রা থেকে মুসলিম, বায়হাকী, হজরত আলী থেকে আহমদ, আবু ইয়ালী, বায়হাকী এবং হজরত বুরাইদাহ্ থেকে আবু নাঈম ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এর ছিলো আধ কপালী ব্যথা। ফলে তিনি স. দুই একদিন বাইরে যেতে পারতেন না। মস্তকের অর্ধাংশের ব্যথা শুরু হলো নিয়মিত। তিনি একদিন ঝাণ্ডা তুলে দিলেন হজরত আবু বকরের হাতে। ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে হজরত আবু বকর শুরু করলেন তুমুল যুদ্ধ। পুনঃপুনঃ আক্রমণ করলেন। তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হলো ব্যর্থ হয়ে। হজরত আলী বর্ণনা করেছেন, পর পর দুই দিনের যুদ্ধে ইহুদীরাই ছিলো প্রবল। পরিস্থিতি দেখে রসুল স. বললেন, আগামীকাল ঝাণ্ডা তুলে দিবো এমন লোকের হাতে, যার মাধ্যমে ঘটবে দুর্গের পতন। সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটবে না। সে-ও আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসে। প্রাণপণে যুদ্ধ করে সে বিজয় ছিনিয়ে আনবেই। হজরত বুরাইদাহ্ বলেছেন, রসুল স. এর এমতো ঘোষণা শুনে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, আগামীকাল আমরা বিজয়ী হবোই। কিন্তু সারারাত ধরে আমরা এই চিন্তাই করতে লাগলাম যে, রসুল স. আগামীকাল কোন সৌভাগ্যবানের হাতে তুলে দিবেন পতাকা। সকাল হলো। রসুল স. সকাশে সমবেত হলো সবাই। মনে মনে প্রত্যেকেই কামনা করছিলাম, আহা, আমিই যদি হতে পারতাম আজকের যুদ্ধের পতাকাবাহী। হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, হজরত ওমর বলেছেন, কেবল ওই দিনই আমার অন্তরে জেগেছিলো নেতৃত্বের আকাঙ্খা। ফজরের নামাজের পর রসুল স. পতাকা আনতে নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণ শুভ উপদেশাবলী প্রদান করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, তার তো চোখে অসুখ। হজরত সালমা বলেছেন, আমি আলীকে হাত ধরে নিয়ে এলাম। রসুল স. বললেন, কী হয়েছে তোমার? তিনি বললেন, আমার চোখ ব্যথা করছে। সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। হাকেম বর্ণনা করেছেন, হজরত আলী নিজেই বলেছেন, রসুল স. আমার মাথা তাঁর কোলে তুলে নিলেন। নিজ হাতে তাঁর মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন আমার চোখে। সাহাবীগণ বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে গেলো তার চোখের অসুখ। পরে আর কখনোই তাকে চোখের পীড়ায় ভুগতে হয়নি।

এরপর রসুল স. পতাকা দিলেন হজরত আলীর হাতে। হজরত আলী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবো ততোক্ষণ পর্যন্ত

যতোক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। রসুল স. বললেন, ধীরে ও দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হও। তাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ো। জানিয়ে দিয়ো তাদের উপরে কী অধিকার রয়েছে আল্লাহ্র এবং তাঁর রসুলের। তোমার মাধ্যমে যদি একজনও পথপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তুমি হবে লোহিত উষ্ট্রাধিকারী অপেক্ষা অধিক লাভবান। পতাকা হাতে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন হজরত আলী। দুর্গের কাছাকাছি গিয়ে পতাকাটি পুঁতে দিলেন মাটিতে। এক ইহুদী দুর্গের খিড়কি দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি আলী। তাঁর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীটি বললো, শপথ তাঁর, যিনি মুসার উপরে তওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন, তুমি জয়ী হবে। শেষ পর্যন্ত হজরত আলী সেদিনের যুদ্ধে বিজয়ী হয়েই ফিরেছিলেন।

হজরত জাবের থেকে মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত আলীর সঙ্গে খায়বর দুর্গ থেকে সর্বপ্রথমে যে ইহুদী মুকাবিলা করতে এলো, সে ছিলো মারহাবের ভাই হারেছ। হজরত আলী তাকে বধ করলেন। তার সঙ্গের লোকটি ভয়ে পালিয়ে গেলো দুর্গের ভিতর। এরপর দুর্গ থেকে বের হয়ে এলো আমের। সে ছিলো বিশাল বপুধারী। রসুল স. বললেন, আমের বেরিয়ে এসেছে। দ্যাখো দ্যাখো, সে প্রায় পাঁচ হাত লম্বা। সে মুকাবিলা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। হজরত আলী অল্পক্ষণের মধ্যে চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দিলেন আমেরের যুদ্ধের সাধ। এরপর এগিয়ে এলো ইয়াসির। হজরত আলী তার সামনে অগ্রসর হলেন। হজরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। হজরত আলী তাঁর কথা মেনে নিলেন। অগ্রসর হলেন হজরত যোবায়ের। তখন তাঁর পিতা রসুল স.কে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার ছেলে তো মরেই যাবে। তিনি স. বললেন, না, মরবে না। বরং মারবে। তাই হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই হজরত যোবায়েরের অস্ত্রাঘাতে নিহত হলো ইয়াসির। রসুল স. হজরত যোবায়েরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার জন্য আমার পিতৃব্য উৎসর্গীকৃত হোক। সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, প্রত্যেক নবীর থাকে একজন অন্তরঙ্গ সখা। আর আমার অন্তরঙ্গ সখা হচ্ছে যোবায়ের। হজরত সালমা ইবনে আকওয়া বলেছেন, মারহাব বেরিয়ে এলো রণোন্মত্ত কবিতা আওড়াতে আওড়াতে। হজরত আলী তাকে কতল করে ফেললেন। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, মারহাবকে কতল করার পর তার ছিন্নমস্তক নিয়ে আমি হাজির হলাম রসুল স. সকাশে। বায়হাকী ও মোহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, মারহাবকে কতল করেন মোহাম্মদ ইবনে সালমা। কিন্তু মুসলিম কর্তৃক যথাসূত্রপরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে, তাকে হত্যা করেন হজরত আলী।

ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবু রাফে' বলেছেন, রসুল স. যখন আলীকে পতাকা দিয়ে পাঠালেন, তখন আমিও ছিলাম তার সঙ্গে। আমরা দুর্গের কাছে উপস্থিত হলে দুর্গবাসীরা বাইরে বেরিয়ে এলো। এক ইহুদী প্রচণ্ড আঘাত করলো। পড়ে গেলো আলীর হাতের ঢাল। সামনেই পড়ে

ছিলো দরজার একটা কপাট। সঙ্গে সঙ্গে কপাটটি উঠিয়ে নিলো আলী এবং ওই কপাটকেই বানিয়ে নিলো তার ঢাল। অবশেষে আল্লাহ্ বিজয় দান করলেন। যুদ্ধ শেষে কপাটটি ফেলে দিলো আলী। সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসে। আমি সহ সেখানে আমরা ছিলাম আটজন। আমরা আটজন মিলে ওই বিশাল কপাটটিকে ওঠাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

বায়হাকী দু'রকম পদ্ধতিতে মোহাম্মদ হানাফিয়া সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, খায়বর বিজয়ের দিন হজরত আলী সেই কপাটটি উঠিয়ে দুর্গের দেওয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে দেন। যাতে করে মুসলমানেরা তার উপরে চড়ে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে এবং খুলে দিতে পারে দুর্গের সকল দরোজা। পরে আমরা ওই কপাটটি চল্লিশ জন মিলেও ওঠাতে পরিনি। এই বর্ণনাপরম্পরার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। নির্ভরযোগ্য নন কেবল লাইস ইবনে সলিম।

এক বর্ণনায় এসেছে, হজরত জাবের বলেছেন, সত্তর জন মিলে চেষ্টা করেছিলো ওই কপাটটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু পারেনি। সালেহী বলেছেন, হাকেমও এরকম বর্ণনা করেছেন। কামুসে আবদুল হাকিক কেল্লার ভিতর থেকে কিছুসংখ্যক রমণী বন্দী হয়ে এলো। হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাও ছিলেন তাদের মধ্যে। পরবর্তীতে তিনি হন উম্মতজননী। রাস্তায় যেখানে ইহুদীদের লাশ পড়েছিলো, সেখান থেকে তাঁকে ও তাঁর আর একজন সহচরীকে নিয়ে আসেন হজরত বেলাল। সাফিয়্যার সহচরীটি রসুল স.কে দেখেই চীৎকার শুরু করে। নিজের মুখে নিজেই মাখতে থাকে ধূলোবালি এবং আঘাত করতে থাকে নিজের মুখে। রসুল স. তাকে দেখে বললেন, এই শয়তানীটিকে এক্ষুণি এখান থেকে নিয়ে যাও। এরপর সাফিয়্যাকে বললেন তাঁর পিছনে পিছনে আসতে। একটি চাদর দিয়ে বললেন, শরীরে জড়িয়ে নাও। এ দৃশ্য দেখেই সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন, রসুল স. তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন। হজরত বেলালকে তিনি স. তখন একথাও বলেছিলেন যে, তোমার অন্তরে কি দয়ামায়া নেই, তুমি এই দুই রমণীকে সেখান দিয়ে নিয়ে এসেছো, যেখানে রয়েছে তাদের পুরুষদের লাশ?

প্রথমে হজরত সাফিয়্যার বিবাহ হয়েছিলো কেনানা ইবনে রাবী ইবনে আবীল হাকিকের সঙ্গে। ওই সময় তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর কোলের উপরে এসে পড়েছে চাঁদ। এই স্বপ্নের কথা তিনি কেনানাকে জানালেন। কেনানা মন্তব্য করলো, তার মানে তুমি আরবশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদের আকাংখার পাত্রী। একথা বলেই সে তাঁর মুখে চপেটাঘাত করলো। নীল হয়ে গেলো তাঁর চোখের চতুষ্পার্শ্ব। রসুল স. এর সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধা হওয়ার পরেও তাঁর মুখমণ্ডলে ওই নীল দাগের চিহ্ন ছিলো। রসুল স. যখন এর কারণ জানতে চেয়েছিলেন তখন তিনি খুলে বলেছিলেন সব।

এক বর্ণনায় এসেছে, তখন হজরত দাহিয়া কালবী রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! বন্দিনীগণের মধ্য

থেকে আমাকে একটি বাঁদী দান করুন। রসুল স. বললেন, দ্যাখো, দেখে যাকে পছন্দ হয়, নিয়ে নাও। হজরত দাহিয়া পছন্দ করলেন হজরত সাফিয়্যাকে। জনৈক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! হুয়াই ইবনে আখতাব বনী কুরায়জা ও বনী নাজির উভয় গোত্রের সর্বজনমান্য জননায়ক। আপনি তাঁর কন্যাকে দাহিয়ার হাতে তুলে দিলেন? কিন্তু তিনি তো ছিলেন কেবল আপনার জন্যই উপযুক্তা। রসুল স. আদেশ দিলেন, ওদেরকে ফিরিয়ে আনো। হজরত দাহিয়া তাঁকে নিয়ে ফিরে এলেন। রসুল স. বললেন, একে ছাড়া অন্যান্যদের মধ্য থেকে যাকে খুশী তাকে নিয়ে নাও। এরপর রসুল স. যুদ্ধবন্দিনী সাফিয়্যাকে স্বাধীন করে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হলেন। ফিরে আসার পথে জননী উম্মে সালমা তাঁকে সাজিয়ে গুছিয়ে রসুল স. এর বাসর যাপনের আয়োজন করলেন। সেদিন সকালেই রসুল স. বললেন, খাদ্যদ্রব্য কিছু থাকলে নিয়ে এসো। এই বলে তিনি স. চামড়ার দস্তরখানা বিছিয়ে দিলেন। সাহাবীগণ ওই দস্তরখানে জমা করতে লাগলেন খেজুর, ঘি, ছাতু ইত্যাদি। রসুল স. সবকিছু এক সাথে মিশিয়ে হালুয়া প্রস্তুত করলেন। এই হলো বরপক্ষের পক্ষ থেকে ওলীমার ভোজ। হজরত সাবেত একবার হজরত আবু হামযাকে জিজ্ঞেস করলেন, রসুল স. হজরত সাফিয়্যাকে দেনমোহর বাবদ কী দিয়েছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং বিবাহ করেছিলেন। ওই মুক্তিই ছিলো তাঁর দেনমোহর।

'বোখারী' ও 'মুসলিম' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা বলেছেন, খায়বর অভিযানের সময় একদিন আমরা খাদ্যসংকটে পড়লাম। এমন সময় কিছুসংখ্যক গৃহপালিত গর্দভ হস্তগত হলো আমাদের। আমরা সেগুলোকে জবাই করে সেগুলোর গোশত রান্না করতে শুরু করলাম। রান্না প্রায় শেষ, এমন সময় রসুল স. এর পক্ষ থেকে এক ঘোষক এসে ঘোষণ করলো, হাঁড়ি পাতিল উল্টিয়ে দাও। গাধার গোশত হালাল নয়।

দারা কুতনীর বর্ণনায় এসেছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, রসুল স. বন্টনের পূর্বে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিক্রয় করতে এবং গর্ভবতী ক্রীতদাসীর সঙ্গে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, অন্যের শস্যক্ষেত্রকে কী তোমরা নিজেদের পানি দ্বারা প্লাবিত করবে? এছাড়া তিনি স. পালিত গাধার গোশত ও যে কোনো তীক্ষ্ণ ও ধারালো দাঁতবিশিষ্ট জন্তুর গোশত ভক্ষণও নিষেধ করেছেন। মোহাম্মদ ইবনে আমর বলেছেন, তখন জবেহ করা হয়েছিলো বিশ অথবা তিরিশটি গাধা।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একের পর এক কেল্লা ফতেহ করে যাচ্ছিলেন এবং লাভ করছিলেন প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। বাকী ছিলো কেবল ওতিহ ও সালালাম নামক কেল্লা দু'টো। ওই কেল্লা দু'টো জয় করা দুরূহ হয়ে পড়লো। ইহুদীরা ওই কেল্লার দরোজা খুবই মজবুত করে বন্ধ করে রাখলো। রসুল স. স্থির করলেন, তাদের দুর্গ ভাঙার জন্য ব্যবহার করবেন প্রস্তরনিক্ষেপক কামান, যাতে দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলা যায়। এভাবে গত হয়ে গেলো একচল্লিশ দিন। শেষে নিরুপায় হয়ে কেল্লাবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। কেনানা ইবনে আবীল

হাকীক শামমাস নামক এক ইহুদী সন্ধিপত্র নিয়ে উপস্থিত হলো রসুল স. এর মহান সান্নিধ্যে। রসুল স. তাদের সন্ধি-প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ওই সন্ধিপত্রে লেখা ছিলো এরকম— দুর্গের অভ্যন্তরে যারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে, তাদের ও তাদের পরিবার পরিজনদের জীবনরক্ষা করতে হবে। তারা খায়বর ছেড়ে অন্য কোনো দূরদেশে চলে যাবে, আর ছেড়ে যাবে সোনাচাঁদি, পোশাক-আশাক, জমি-জমা, অস্ত্র-অশ্ব সমস্ত কিছু। পরিধেয় বসন ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই থাকবে না। রসুল স. তাদের দূতকে বললেন, তোমরা যদি কিছু লুকিয়ে রাখো, তবে শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ্ ও রসুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। সন্ধিপত্র অনুযায়ী রসুল স. তাদের সকল সামগ্রী বুঝে নিলেন। তারাও রওয়ানা হয়ে গেলো দূরদেশের দিকে। দেখা গেলো তারা ছেড়ে দিয়েছে একশত লৌহবর্ম, চারশত তরবারী এবং তীরসহ চারশত আরবী ধনুক। আর কসিবাতে আগেই পাওয়া গিয়েছিলো তীরসহ পাঁচশত ধনুক।

হজরত ইবনে ওমর থেকে ইবনে সা'দ, বায়হাকী এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে সা'দ ওই সন্ধিপত্রের বিষয়াবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সেখানেও একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এই বলে শপথ করতে হবে যে, তারা কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখবে না। যদি কেউ এরকম করে তবে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, হজরত সাফিয়্যার আগের স্বামীর নাম কেনানা ইবনে আবুল হাকীক। তাঁর ভাই ভাবী ও তার পিতৃব্যপুত্রকে রসুল স. এর কাছে আনা হলে তিনি স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হুয়াইয়ের সেই সোনা ভর্তি চামড়ার থলিটি কোথায়, যা বনী নাজির নিয়ে এসেছিলো? দুই ভাই জবাব দিলো, যুদ্ধসরঞ্জাম কিনতে গিয়ে তা শেষ হয়ে গিয়েছে। রসুল স. বললেন, কিন্তু সোনা তো ছিলো অনেক। তোমরা দু'জনে নিশ্চয় তা লুকিয়ে রেখেছো। শোনো, যদি তোমরা তা গোপন করে রাখো এবং তা খুঁজে যদি পাওয়া যায়, তবে তোমাদের দু'জনকে হত্যা করা এবং তোমাদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনকে দাস বানানো আমার জন্য হবে বৈধ। কেনানা বললো, হ্যাঁ, তা তো হবেই। বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে, ওরওয়া ও মোহাম্মদ ইবনে ওমর বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সেই লুক্কায়িত সম্পদের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। রসুল স. তখন কেনানাকে বললেন, আসমানী আদেশ অনুসারে তোমরা মিথ্যাবাদী। তারপর জনৈক আনসারীকে ডেকে বললেন, প্রান্তরে যাও। সেখানে দেখবে, ডানে ও বাঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'টো খেজুর গাছ। ওই দুই গাছের মাঝখানেই মাটিতে পোঁতা রয়েছে ওই স্বর্ণভর্তি থলিটি। থলিটি যথাসত্বর আমার কাছে নিয়ে এসো। ওই আনসারী যথারীতি নির্দেশ প্রতিপালন করলেন। দেখা গেলো থলিতে রক্ষিত ওই সোনার মূল্য দশ হাজার দীনারের মতো। রসুল স. ওই দুই ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলেন। তাঁদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে করে দিলেন দাসদাসী।

হজরত ইবনে ওমর থেকে বোখারী এবং হজরত ইবনে ওমর থেকে মুসা ইবনে উকবা ও ওরওয়া সূত্রে বায়হাকী লিখেছেন, রসুল স. যখন খায়বর জয়

করে নেন, তখন ইহুদীরা বলে, হে আবুল কাসেম! আমাদেরকে এখানেই থাকতে দিন। আমরা এখানেই থাকবো এবং চাষাবাদ করবো। রসুল স. তাদের প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। ঠিক করে দিলেন, উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক পাবে তোমরা, আর অর্ধেক দিতে হবে আল্লাহ্র রসুলকে। মুসলমানেরা চাষাবাদে অনভিজ্ঞ ছিলো বলেই রসুল স. এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছিলেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. তখন আরো বললেন, আমি যতোদিন চাইবো, ততোদিন এই ব্যবস্থা বহাল থাকবে। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি স. তখন বললেন, যতোদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ এই ব্যবস্থা বহাল রাখবেন, ততোদিন পর্যন্ত আমিও তা বহাল রাখবো। এরপর থেকে প্রতি বছর হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা খায়বরে গিয়ে উৎপাদিত ফসল এক জায়গায় জমা করতেন এবং তা থেকে অর্ধেক নিয়ে আসতেন মদীনায়। ইহুদীরা তাঁকে ঘুষ দিয়ে বশ করতে চেয়েছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে রসুল স. এর কাছে নালিশও দিয়েছিলো তারা। ঘুষের কথা শুনে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রওয়াহা বলেছিলেন, হে আল্লাহ্র শত্রুরা! তোমরা কি আমাকে হারাম ভক্ষণ করাতে চাও? আমি যাঁর কাছ থেকে এসেছি, তিনি আমার কাছে সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয়। আর তুমি আমার কাছে অধিক অপ্রিয় শূকর ও বানরের চেয়েও। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি অবিচারপ্রবণ নই। ইহুদীরা

তখন বলেছিলো, এই ন্যায়বিচারের উপরেই তো টিকে আছে আসমান ও জমিন। এভাবেই ইহুদীরা তাদের স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলো দীর্ঘ দিন। কিন্তু হজরত ওমরের শাসনামলে তারা প্রতারণা শুরু করে। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে ফেলে দেয় বাড়ির ছাদ থেকে। তাঁর হাতের কবজিও মচকে দেয় তারা। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর সেখানে রাত্রিযাপনকালে যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন তারা তাঁর উপরে যাদু করে। সকালে উঠে তিনি দেখতে পান তাঁর কবজি বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে এমনভাবে ফেরানো যে, দেখলে মনে হয়, যেনো তা আলাদা করে বাঁধা। তাঁর সফরসঙ্গী যিনি ছিলেন, তিনিই এসে শেষে তাঁর হাত ঠিক করে দিলেন। ইহুদীদের এমতো অপআচরণ দৃষ্টে হজরত ওমর অপ্রসন্ন হন এবং জনসমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেন, খায়বরের ফসলী বন্দোবস্ত সম্পর্কে রসুল স. বলেছিলেন, আল্লাহ্ যতোদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে বহাল রাখবেন, আমিও ততোদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে বহাল রাখবো। আবদুল্লাহ্ সেখানে ফসলের অংশ আনতে গিয়েছিলো। তার উপরে তারা রাতে হামলা করেছে। মুচড়ে দিয়েছে তার হাতের কবজি। সেখানে ওই ইহুদীরা ছাড়া আমাদের আর কোনো শত্রু নেই। আমাদের প্রতি রয়েছে তাদের চরম বিদ্বেষ। এমতাবস্থায় আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আমি তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবো। খায়বরে যার যার অংশ রয়েছে, তারা তাদের নিজেদের জমি-জমা বুঝে নিক। যখন হজরত ওমর তাদেরকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করলেন, তখন বনী আল হাকীক সম্প্রদায়ের এক জননেতা এসে বললেন, হে মুসলমানদের অধিনায়ক! আপনি আমাদেরকে দেশান্তর করবেন না। যেভাবে আপনাদের রসুল এবং আপনার

পূর্বসূরী আবু বকর আমাদেরকে বহাল রেখেছিলেন, সেভাবে আপনিও আমাদেরকে রেখে দিন। হজরত ওমর বললেন, তুমি সম্ভবতঃ একথা বিস্মৃত হয়েছো যে, রসুল স. তোমাকে বলেছিলেন, সে সময় তোমার কী অবস্থা হবে, যখন দ্রুতগতিসম্পন্ন উষ্ট্রী রাতারাতি তোমাকে নিয়ে পলায়ন করতে থাকবে। ইহুদী জননেতা বললো, সেটা তো ছিলো আবুল কাসেমের একটি রসিকতা। হজরত ওমর বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী। শেষ পর্যন্ত তিনি ইহুদীদেরকে খায়বর থেকে বিতাড়িত করলেনই।

হজরত আনাস থেকে বোখারী, মুসলিম, হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে সা'দ, হজরত আবু নাঈম, হজরত জাবের, হজরত আবু সাঈদ এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে জুহুরীসহ কয়েকজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, তখন মারহাবের ভাইয়ের মেয়ে ও সালাম ইবনে মাশকামের স্ত্রী জয়নাব সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলো, রসুলুল্লাহ্ ছাগলের কোন্ অংশের গোশত পছন্দ করেন? তাঁরা বললেন, রানের গোশত। জয়নাব একটি বকরীর গোশত রান্না করে সবগুলো টুকরাতেই বিষ মিশিয়ে রাখলো এবং রানের গোশতে বেশী করে বিষ মিশিয়ে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করলো হজরত সাফিয়্যার কাছে। হজরত সাফিয়্যা সমস্ত গোশতই রসুল স. এর সামনে উপস্থিত করলেন। সেখান থেকে তিনি স. উঠিয়ে নিলেন রানের গোশত এবং তাঁর পাশে উপবিষ্ট হজরত বিশ্‌র তুলে নিলেন অন্য একটি টুকরা এবং তা মুখে দেওয়ার পর গলাধঃকরণও করলেন। কিন্তু রসুল স. গোশত মুখে দেওয়ার পর পর তা উগলে ফেলে দিলেন। জুহুরী বলেছেন, রসুল স. ও হজরত বিশর দু'জনেই ওই গোশত মুখে পুরেছিলেন। হজরত বিশর তা গলাধঃকরণ করলেন এবং রসুল স. তা তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, বিশর সংযত হও। বকরিটি আমাকে খবর দিচ্ছে, এর মধ্যে মেশানো রয়েছে বিষ। হজরত বিশর বললেন, শপথ তাঁর, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। আমি তো গোশতের টুকরাটি গিলে ফেলেছি। আমিও গোশত মুখে দেওয়ার সাথে সাথে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছি। কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি তো আপনার চেয়ে আমার জীবনকে অধিক মূল্যবান মনে করি না। আমি ভেবেছিলাম, তেমন কিছু যদি হয়, তবে আপনি নিশ্চয় বলবেন। কিন্তু এর মধ্যেই যে আমি টুকরাটি গিলে ফেলেছি। এরপর হজরত বিশর কিছু বলতে পারলেন না। সেখান থেকে উঠতেও পারলেন না আর। তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। রসুল স. সঙ্গে সঙ্গে হজরত আবু হিন্দকে ডেকে নিজের কাঁধে সিঙ্গা লাগালেন, যাতে বিষাক্ত রক্ত বের করে ফেলা যায়। এভাবে রসুল স. সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। কিন্তু বিষের মন্দক্রিয়া তাঁকে বয়ে বেড়াতে হয়েছিলো আজীবন। রসুল স. কখনো কখনো বলতেন, খায়বরের সেই বিষের ক্রিয়া কখনো কখনো আমাকে কষ্ট দেয়। এরপর রসুল স. ওই ইহুদী রমণীকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তুমি কি বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়েছিলে? সে বললো, আপনাকে কে বলেছে? রসুল স. বললেন, আমার হাতে যে ছিলো। সে বললো, হ্যাঁ,

আমিই বিষ মিশিয়েছিলাম। তিনি স. বললেন, কেনো? সে বললো, আমার সম্প্রদায়ের যে দুর্গতি আপনি করেছেন, তা তো আপনার অজানা নয়। আমি ভেবেছিলাম, আপনি যদি রাজা-বাদশাহ জাতীয় কেউ হন, তাহলে আপনার অত্যাচার থেকে আমরা মুক্তি পাবো। আর যদি আপনি সত্যি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন, তবে তো আগাম খবর আপনি পাবেনই। তার এ রকম অকপট স্বীকৃতি শুনে রসুল স. তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

মুয়াম্মার সূত্রে জুহুরীর বর্ণনানুসারে আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে লিখেছেন, সেই ইহুদী রমণী মুসলমান হয়ে যায় এবং রসুল স. তাকে মুক্তি দেন। সুলায়মান তাঈমি বর্ণনাটি সমর্থন করেছেন এবং আরো যোগ করেছেন— ওই রমণী আরো বলেছিলো, আপনি যদি প্রকৃত নবী না হন, তবে মানুষ আমার মাধ্যমে আপনার অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি, আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্‌র নবী। আমি আপনাকে এবং এখানে যারা উপস্থিত আছেন, তাদের সকলকে সাক্ষী মেনে বলছি, আমি আপনার ধর্মকে কবুল করলাম। আমি স্বীকার করছি 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল'। বর্ণনাকারী আরো বলেছেন, রসুল স. আর তাকে অপরাধিনী সাব্যস্ত করেননি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বায্যার বলেছেন, সেই ইহুদী রমণীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর রসুল স. তার রান্না করা গোশতের দিকে হাত বাড়ালেন এবং সঙ্গীগণকে বললেন, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাও। সকলেই 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে খেলেন। কিন্তু কারোই কোনো ক্ষতি হলো না। হাফেজ ইমাদুদ্দীন বলেছেন, বর্ণনাটি দুষ্প্রাপ্য ও পরিত্যক্ত।

মোহাম্মদ ইবনে ওমর বলেছেন, তখন রসুল স. এর আদেশে সমস্ত গোশত জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। হজরত জাবের বলেছেন, হজরত বিশর যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন রসুল স. ওই ইহুদী রমণীকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। মোহাম্মদ ইবনে আমেরের নিজস্ব সূত্র থেকে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তখন সেই ইহুদী রমণীকে হজরত বিশরের কাছে সোপর্দ করা হলো এবং তার মৃত্যুর পর লোকেরা তাকে বধ করে ফেললো।

বায়হাকী বলেছেন, এরকমও হতে পারে যে, প্রথমে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, তারপর করা হয় হত্যা। সুহাইলি বলেছেন, রসুল স. নিজের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাননি। তাই প্রথমে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে হজরত বিশরের মৃত্যুর বদলা হিসেবে তার উপরে কার্যকর করেছিলেন মৃত্যুদণ্ড।

হজরত জাফর ইবনে আবু তালেবের আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন ঃ হজরত আবু মুসা আশয়ারী বলেছেন, আমরা ইয়েমেনে ছিলাম। সেখানে সংবাদ পেলাম, রসুল স. মক্কা থেকে মদীনায় চলে গিয়েছেন। আমরাও হিজরত করে তাঁর কাছে যাবো মনস্থ করলাম। কিন্তু যে নৌকায় আমরা আরোহণ করলাম, তা আমাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আবিসিনিয়ার দিকে। সেখানে জাফর ইবনে

আবু তালেবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত ঘটলো। জাফর বললেন, রসুল স.ই আমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন, আমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে। তোমরাও এখানে থেকে যাও। আমরা সেখানেই বসবাস করতে শুরু করলাম। বেশ কিছুকাল পর রসুল স. যখন খায়বর জয় করেন, তখন আমরা আবিসিনিয়া থেকে তাঁর কাছে চলে যাই। তিনি স. আমাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদেও অংশীদার করেন। আবিসিনিয়ার হিজরতকারীদের ছাড়া আর এমন কাউকে রসুল স. খায়বরের গণিমতের অংশ দান করেননি, যারা ওই যুদ্ধে শরীক ছিলো না। জাফরকে পেয়ে তিনি স. এতোই খুশী হন যে আবেগপ্রবণ হয়ে বলে উঠেন, আল্লাহ্ই ভালো জানেন, কোন ঘটনায় আমি বেশী খুশী হয়েছি— খায়বর বিজয়ে, না জাফরের আগমনে। জাফর এক দৃষ্টিতে রসুল স. এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। রসুল স. কিঞ্চিত লজ্জিত হলেন। তাঁর সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের জন্য রয়েছে দু'টি হিজরত করার সওয়াব— আবিসিনিয়ার ও মদীনার। এরপর রসুল স. চুম্বন করলেন জাফরের দুই চোখের মাঝখানে। বায়হাকী।

হজরত আবু হোরায়রা ও দওস সম্প্রদায়ের লোকদের আগমন ঃ হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, দওস সম্প্রদায়ের আশিটি পরিবার নিয়ে আমি মদীনায় এলাম। তারপর খায়বর পৌঁছলাম ওই সময়, যখন রসুল স. নাতাত জয় করেছেন এবং অবরোধ করে রেখেছেন কসিবা। আমরা কসিবা দুর্গের পতন না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করলাম। সেখানকার যুদ্ধলব্ধ সম্পদে রসুল স. আমাদেরকেও অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আহমদ, বোখারী, হাকেম, বায়হাকী, ইবনে খুজাইমা।

ফিদাকের ঘটনা ঃ খায়বরবাসীদের সঙ্গে রসুল স. কী করেছিলেন তা পৌঁছে গিয়েছিলো ফিদাকবাসীদের কানে। তাই তারাও এই মর্মে সন্ধি-প্রস্তাব পাঠালো যে, আমাদের জীবন রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। চলে যেতে দিতে হবে দূরদূরান্তরে। বিনিময়ে আমরা ছেড়ে চলে যাবো সকলকিছু। রসুল স. তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আপাততঃ এখানেই বসবাস করো। পরে আমরা তোমাদের চলে যাবার বন্দোবস্ত করবো। ফিদাকবাসীরা হৃষ্টচিত্তে এ প্রস্তাবটিকে মেনে নিলো। উল্লেখ্য, খায়বর বিজিত হয়েছিলো যুদ্ধের মাধ্যমে। তাই রসুল স. খায়বরের জমি জমা সবকিছু যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফিদাক হস্তগত হয়েছিলো বিনা যুদ্ধে। তাই রসুল স. ফিদাকের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদ রেখেছিলেন নিজের অধিকারে। পরে হজরত ওমর তাঁর খেলাফতের সময় খায়বরবাসীদের মতো ফিদাকবাসীদেরকেও বহিষ্কার করেছিলেন।

খায়বরের গণিমত বন্টন ঃ ওতিহ্ ও সালালামের যুদ্ধে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ জমা করে রাখা হলো আপৎকালের জন্য। হজরত আবু মুসা আশয়ারী, সফিনাহ'র সঙ্গীগণ ও দওস সম্প্রদায়ের লোকদেরকে রসুল স. ওই তহবিল থেকে

কিছু কিছু দান করেন। হজরত মুসা ইবনে উকবা বলেছেন, খায়বরের কিছু অংশের বিজয় সম্পন্ন হয়েছে সন্ধির মাধ্যমে। অর্থাৎ সন্ধির মাধ্যমে হস্তগত হয়েছে ওতিহ্‌ ও সালালাম। এখন যা বাকী রইলো, তা হচ্ছে 'ওয়া শাভিরহুম ফীল আমরি' এই আয়াতের আদেশ মোতাবেক সাধারণ আলোচনা। তাতে কারো অধিকার খর্ব করার কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, খায়বরে কেবল শাক, নাতাত ও কসিবা'র ধনসম্পদের ভাগ-বন্টন করা হয়েছিলো। রসুল স. কসিবা'র ধনসম্পদের এক পঞ্চমাংশ দিয়েছিলেন আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, পবিত্র সহধর্মিণীগণ এবং ওই সকল লোকদেরকে যারা চিঠি পত্র আদান প্রদান করতো রসুল স. ও ফিদাকবাসীদের মধ্যে। এর মধ্যে হজরত মাহীসা ইবনে মাসউদও ছিলেন। রসুল স. তাঁকে দিয়েছিলেন তিরিশটি উটের বোঝা পরিমাণ যব এবং তিরশটি উটের বোঝা পরিমাণ খেজুর। নাতাত ও শাক এই দুই জায়গার ধনসম্পদ বন্টন করে দেওয়া হয় কেবল যোদ্ধাদের মধ্যে। রসুল স. নাতাতের সম্পত্তির পাঁচটি এবং শাকের তেরোটি অংশ করেন। এভাবে সর্বমোট অংশ হয় আঠারোটি। এই আঠারো অংশ বন্টন করে দেওয়া হয় চৌদ্দশ' যোদ্ধার মধ্যে। এদের মধ্যে কেবল হুদায়বিয়ায় থাকা সত্ত্বেও খায়বরে অনুপস্থিত ছিলেন হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌। অন্যান্যরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন উভয় স্থানে। হজরত জাবের খায়বরে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দেয়া হয়েছিলো একজনের সমপরিমাণ। পদাতিকের জন্য এক অংশ, ঘোড়ারোহীদের জন্য দুই অংশ— এক অংশ নিজের, অন্য অংশ তার ঘোড়ার, বন্টন করা হয়েছিলো এভাবে। ঘোড়ার সংখ্যা ছিলো দুই শত। এই সম্পত্তিতে রসুল স. এর অংশও ছিলো একজন যোদ্ধার সমপরিমাণ।

কুরা উপত্যকা বিজয়ের ঘটনা ঃ রসুল স. যাত্রা করলেন কুরা উপত্যকার দিকে। সেখানে পৌছে তিনি ওই উপত্যাকাবাসীদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলো। রসুল স. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করলেন এবং তাদের ধনসম্পদ গণিমতের মাল হিসেবে যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) রাখেন নিজের জন্য। আর সেখানকার জমিজমা সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যেই খায়বরের বন্দোবস্তের নিয়মে বন্দোবস্ত দেন।

সুরা ফাতাহ্ঃ আয়াত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬

❑ এবং আরও রহিয়াছে যাহা এখনও তোমাদের অধিকারে আসে নাই, উহা তো আল্লাহ্ আয়ত্তে রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

❑ কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করিলে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত, তখন উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইত না।

❑ ইহাই আল্লাহ্র বিধান— প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তুমি আল্লাহ্র বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

❑ তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদের হস্ত তোমাদিগ হইতে এবং তোমাদের হস্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

❑ উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল-হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত যদি না থাকিত এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে, ফলে তাহাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত, আমি উহাদের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।

❑ যখন কাফিররা তাহাদের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা— অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন; আর তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন, এবং তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

প্রথমোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে— হে আল্লাহ্র রসুলের সহচরবৃন্দ! তোমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে আরো বিজয়, যা এখানো রয়েছে তোমাদের সম্মুখে। আল্লাহ্ ওই বিজয়কে এখনো তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। তাই তা অনির্ধারিত। কেননা তিনি যে সর্বশক্তিধর। তাঁর নির্ধারণের বিপরীতে কিছু হওয়া অসম্ভব।

এখানে 'আরো রয়েছে' কথাটির সম্পর্ক রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতের 'যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদ' কথাটির সঙ্গে। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আল্লাহ্ তোমাদেরকে আরো অনেক অমূল্য সম্পদ প্রদানের অঙ্গীকার তোমাদের সঙ্গে করে রেখেছেন। অথবা কথাটির সম্পর্ক রয়েছে 'হাজিহী'(এই) শব্দের সঙ্গে। অর্থাৎ আল্লাহ্ এরপরে অন্যান্য স্থানের যুদ্ধলব্ধ সম্পদও তোমাদেরকে দান করবেন। অথবা কথাটি এখানে উহ্য থাকা কোনো একটি ক্রিয়ার কারক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অন্যান্য যুদ্ধলভ্য সম্পদও নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

'লাম তাক্বদিরু আ'লাইহা' অর্থ যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে বহু রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়েছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের আগে আরবীয়রা পারস্য ও রোমের মতো বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চিন্তাও করতে পারতো না। ইসলামই তাদেরকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। হজরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল এরকমই ব্যাখ্যা করেছেন। কাতাদার মতে এখানে 'যা কখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি' বলে বুঝানো হয়েছে মক্কা বিজয়ের কথা। ইকরামা বলেছেন, এর উদ্দেশ্য হুনায়েন বিজয়। মুজাহিদ বলেছেন, পরবর্তী সময়ের সকল বিজয়ই কথাটির উদ্দেশ্য।

'তা তো আল্লাহ্ আয়ত্তে রেখেছেন' অর্থ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাফল্যমণ্ডিত করবেনই। 'আহাতা' অর্থ বেষ্টন বা আয়ত্তে রাখা। অর্থাৎ তোমাদেরকে বিজয়দানের বিষয়টি যেহেতু আল্লাহ্‌র জ্ঞানায়ত্ত, তাই বিজয় তোমাদের হবেই। আর 'আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' অর্থ যেহেতু তোমরা কোনো বিষয়েই আল্লাহ্‌র ক্ষমতাকে খর্ব করবার যোগ্যতা, ক্ষমতা ও অধিকার রাখো না, সেহেতু বিশ্বাস করো কেবল তাঁকে, নির্ভর করো কেবল তাঁরই উপর এবং ইবাদত করো শুধু তাঁর।

পরের আয়াতে (২২) বলা হয়েছে—'কাফেরেরা তোমাদের মুকাবিলা করলে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতো, তখন তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতো না'। একথার অর্থ— মক্কাবাসীরা যদি হুদায়বিয়ায় তোমাদের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ না হতো, তবে তারা অবশ্যই হেরে যেতো। কোনো বন্ধু অথবা সাহায্যকারী তারা পেতোই না।

এরপরের আয়াতে (২৩) বলা হয়েছে— 'এটাই আল্লাহ্‌র বিধান— প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে, তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না'। এ কথার অর্থ— হে আমার রসুল! জেনে রাখুন, এটাই আল্লাহ্‌র চিরাচরিত রীতি যে, অবশেষে তিনি বিজয় দান করেন তাঁর প্রিয়ভাজনগণকে। এই শাশ্বত রীতিতে আপনি কোনো হের ফের দেখতে পাবেন না। এরকম বিজয়ের অঙ্গীকার ঘোষণা করা হয়েছে অন্যান্য আয়াতেও। যেমন— ১. 'আমি ও আমার রসুল নিঃসন্দেহে বিজয়ী হবো' ২. 'আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে' ৩. 'আল্লাহ্‌র দলই হবে বিজয়ী' ৪. 'আল্লাহ্‌র এই বিধান বিগত যুগের উম্মতদের ক্ষেত্রেও কার্যকর ছিলো'।

এরপরের আয়াতে (২৪) বলা হয়েছে— 'তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হস্ত তোমাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবার পর, তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ তা দেখেন'। একথার অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি তো জানেনই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে আপনার দল ও আপনার বিপক্ষদল উভয়কেই আল্লাহ্ নিরাপদ রেখেছেন আক্রমণ— প্রতিআক্রমণ থেকে এবং পরবর্তীতে আপনার দলকেই করেছিলেন বিজয়ী। আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা। তাই তিনি আপনাদের ও তাদের ও অন্যান্য সকলের সকল কর্মকাণ্ডই প্রত্যক্ষ করেন।

হজরত আনাস বলেছেন, সত্তুর অথবা আশিজনের একটি দল মুসলমানদেরকে আক্রমণ করার জন্য তান্ঈম পর্বতের দিক থেকে নেমে আসে। কিন্তু তারা মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে যায়। রসুল স. তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াত। হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্‌ফাল বলেছেন, তান্ঈম পর্বতের দিক থেকে আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য নেমে এসেছিলো তিরিশ জনের একটি দুর্ধর্ষ নওজোয়ানের দল। হজরত মুসলিম ইবনে আকওয়া বলেছেন, আমি তখন আমার তরবারী উন্মুক্ত করেছিলাম তাদের চারজনের বিরুদ্ধে।

আর এখানকার 'তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ তা দেখেন' অর্থ— হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের সকল কিছুই আল্লাহ্‌র পর্যবেক্ষণভূত। সুতরাং জেনে রেখো, তোমাদের কার্যাবলীর উপযুক্ত প্রতিফল তিনি যথাসময়েই প্রদান করবেন।

এরপরের আয়াতে (২৫) বলা হয়েছে— 'তারাই তো কুফরী করেছিলো এবং নিবৃত্ত করেছিলো তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে ও বাধা দিয়েছিলো কোরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো, যদি না থাকতো এমন কতক মুমিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জানো না, তোমরা তাদেরকে পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে, ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়নি— এজন্যই যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তারা পৃথক হতো, আমি তাদের মধ্যে কাফেরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম'।

এখানে 'তারাই তো কুফরী করেছিলো' অর্থ সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিলো তো মক্কাবাসীরাই। 'আ'নিল্ মাসজিদিল হারাম' অর্থ নিবৃত্ত করেছিলো তোমাদেরকে কাবাগৃহ গমন থেকে। 'হাদ্ইয়া' অর্থ কোরবানীর জন্য আবদ্ধ পশু। আর 'মাহিল্লাহ্' অর্থ মহল বা স্থান, এখানে যথাস্থান, অর্থাৎ হেরেমের অভ্যন্তরে। হানাফীগণ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, হারামভুক্ত এলাকায় কোরবানী করা বৈধ। কিন্তু কাউকে যদি পথিমধ্যে বলপূর্বক থামিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে যেনো অন্যের মাধ্যমে তার কোরবানীর পশুকে হেরেম এলাকায় পৌঁছিয়ে দেয়। সুরা বাকারার যথাস্থানে এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

'এমন অনেক মুমিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জানো না' অর্থ মক্কাবাসী নিগৃহীত বিশ্বাসী নারী-পুরুষদের সকলকে তোমরা চিনো না। যুদ্ধ লাগলে মুশরিক মনে করে তোমরা তাদেরকেও হত্যা করে ফেলতে। সেকারণেই তো যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে দেওয়া হয়েছে সন্ধির আদেশ।

'মাআ'র্‌রতুন' অর্থ গোনাহ বা পাপ। অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে তোমরা মুসলমান নারী-পুরুষকে হত্যা করলেও গোনাহগার হতে। একারণেই ভুলবশতঃ হত্যা করার কারণেও প্রায়শ্চিত্ত করা অত্যাবশ্যক। আর এখানে 'বিগইরি ইলম' অর্থ অজ্ঞাতসারে।

তিবরানী ও হজরত আবুল আলিয়ার বর্ণনায় এসেছে, হজরত আবু জামআ জুনাইদ ইবনে সাবা বলেছেন, দিবসের শুরুতে যখন আমি কাফের ছিলাম, তখন আমি যুদ্ধ করেছিলাম রসুল স. এর বিরুদ্ধে এবং দিবসের শেষাংশে যখন আমি মুসলমান হয়ে যাই, তখন আমি রসুল স. এর সাথী হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করি। আমরা এরকম অবস্থায় ছিলাম তিনজন পুরুষ এবং সাতজন নারী। আমাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে 'এমন কতক মুমিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জানো না'।

'লিইউদ্‌খিলাল্লহু ফী রহমাতিহী মাঁইয়াশাউ' অর্থ তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। অর্থাৎ যাকে খুশী তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। মক্কায় প্রবেশ করা না করার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বাক্যটির গতিপ্রকৃতি এখানে এই ইঙ্গিত দেয় যে, কথাটির সম্পর্ক রয়েছে একটি উহ্য ক্রিয়ার সঙ্গে। অর্থাৎ জোর করে মক্কায় প্রবেশ করা নিষেধ করার এটাই হচ্ছে কারণ যে, এর সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করা না করার কোনো সম্পর্ক নেই। বিষয়টি তো সম্পূর্ণতই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহনির্ভর। আর 'যাকে ইচ্ছা তাকে' অর্থ মক্কাবাসীদের মধ্যে যাকে খুশী তাকে। এজন্যই দেখা গিয়েছিলো, মক্কাবিজয়ের পরক্ষণে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো বহুসংখ্যক মুশরিক। অথবা এখানে 'অনুগ্রহ দান করবেন' অর্থ মক্কার অত্যাচারিত মুসলমানদেরকেই তিনি আরো অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখবেন। অতর্কিত যুদ্ধে প্রাণ হারাতে দিবেন না। আর 'যদি তারা পৃথক হতো, আমি তাদের মধ্যে কাফেরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম' কথাটির অর্থ যদি ওই অত্যাচারিত মুসলমানেরা মক্কার মুশরিকদের নিকট থেকে পৃথক কোনো স্থানে সরে যেতে

পারতো এবং পৃথক হয়ে যেতে পারতো তারাও, যারা নিকট ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ করবে, তাহলে সেখানে সমবেত থাকতো কেবল কাফেরেরা। আর তখনই কেবল আমি তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে তোমাদের মাধ্যমেই তাদেরকে শায়েস্তা করতে পারতাম। তখন তারা তোমাদের হাতে হতো নিহত, অথবা বন্দী।

এরপরের আয়াতে (২৬) বলা হয়েছে— 'যখন কাফেরেরা তাদের অন্তরে পোষণ করতো গোত্রীয় অহমিকা— অজ্ঞতার যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁর রসুল ও মুমিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন। এবং তারাই ছিলো এর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন'।

এখানে 'ইজ জ্বাআ'লা' হচ্ছে ক্রিয়ার কালাধার বা সময়। এর সম্পর্ক রয়েছে, আগের আয়াতের 'আ'জ্জাব্‌না' অথবা 'সদ্দু' এর সঙ্গে। কিংবা এটা হচ্ছে উহ্য থাকা একটি ক্রিয়ার কর্মপদ। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়ায়— হে আমার রসুল! ওই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো অজ্ঞতার যুগের অনর্থক অহংকার। আল্লাহ্‌র রসুলকে তারা আল্লাহ্‌র গৃহে যেতে দেয়নি, সন্ধিপত্রের শুরুতে লিখতে দেয়নি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'। 'মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্' কথাটিকেও তারা বিলোপ করার জন্য জেদ ধরেছিলো। মুকাতিল বলেছেন, মুশরিকেরা তখন বলেছিলো, তারা আমাদের পুত্র ও ভ্রাতাদেরকে হত্যা করেছে। এখন আবার আমাদের উপরে চড়াও হতে চায়। আরববাসীরা বলবে, তারা আমাদেরকে বের করে মক্কায় অনুপ্রবেশ করেছে। লাত্ ও উজ্জার শপথ! এ বছর তাদেরকে আমরা মক্কায় প্রবেশ করতে দিবোই না। এসকল কিছুই ছিলো তাদের অজ্ঞতার যুগের তীব্র গোত্রীয় অহমিকাপ্রসূত বাক্য।

'আল্লাহ্ তাঁর রসুল ও মুমিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন' অর্থ তাদের অহমিকার বিপরীতে আল্লাহ্ই তাঁর রসুল ও রসুলের সহচরবর্গকে তখন দান করলেন বিশেষ আত্মিক প্রশান্তি। ফলে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করতে এবং আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় পূরণ করতে পেরেছিলেন। যুদ্ধ করবার মতো যথেষ্ট শক্তিমত্তা থাকা সত্ত্বেও কেবল শান্তির জন্য বিরত থাকতে পেরেছিলেন যুদ্ধংদেহী মনোভাব থেকে।

হজরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, জুহাক, ইকরামা, সুদ্দী, ইবনে জায়েদ ও অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, এখানকার 'তাদেরকে তাক্ওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় রাখলেন' অর্থ তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখলেন 'লাইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার' এই বাক্যের উপর। আতা ইবনে আবী রেবাহ বলেছেন, এখানে 'তাকওয়ার বাক্য' অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহ্‌দাহু লা শরীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বদীর।

তাক্ওয়ার বাণী অর্থ— সংযমীদের বাণী। কলেমায়ে তাওহীদ। আর কালেমায়ে তাওহীদই হচ্ছে তাক্ওয়ার ভিত্তি ও নিমিত্ত। মক্কার কাফের কুলের চেয়ে সংযমী মুসলমানগণই তাক্ওয়ার সমধিক যোগ্য। তারা সমধিক যোগ্য বলে

বিবেচিত আল্লাহ্‌পাকের অনন্ত-অনাদি জ্ঞানে। একারণেই আল্লাহ্‌পাক তাঁর স্বীয় দ্বীন ও রসুলের সহায়তাকল্পে মনোনীত করেছেন তাঁর প্রিয় সহচরবৃন্দকে। রাফেজীদের মতবাদ— মান্যবর সাহাবায়ে কেরাম কাফের, মুনাফিক (আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন)। তাদের ঔদ্ধত্য ধরা পড়েছে এই আয়াতে— আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হলেন বিশ্বাসীদের উপর। যখন তারা বায়াত করেছিলো আপনার সাথে গাছের নিচে।

রসুল স. হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বেই দর্শন করেছিলেন একটি স্বপ্ন। স্বপ্নে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং সুসম্পন্ন করেছেন ওমরা। সম্মানিত সহচরবৃন্দ তাঁর এ স্বপ্ন-বৃত্তান্তের কথা জানতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের পর তিনি যখন মদীনাতে প্রত্যাবৃত হলেন, তখন হজরত সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নিকট নিবেদন জানালেন— তাহলে দৃষ্ট স্বপ্নের তাৎপর্য কী? তখন অবতীর্ণ হলো নিম্নের আয়াত।

সূরা ফাতাহ্‌ ঃ আয়াত ২৭, ২৮, ২৯

❑ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাঁহার রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইয়াছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে— তোমাদের কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করিবে আর কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না। আল্লাহ্‌ জানেন তোমরা যাহা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।

❑ তিনিই তাঁহার রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

❑ মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল; তাহার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকূ' ও সিজ্‌দায় অবনত দেখিবে। তাহাদের লক্ষণ তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজ্‌দার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকিবে; তওরাতে তাহাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জীলেও তাহাদের বর্ণনা এইরূপই। তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ্‌ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— হে রসুলের সহচরবর্গ! শোনো, নিশ্চয় আল্লাহ্র রসুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সে স্বপ্নটি সত্য। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, তোমরা সকলে তাঁর সঙ্গে ইহ্রাম পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করছো, তাওয়াফ করছো আল্লাহ্র গৃহ। এভাবে ওমরা সম্পন্ন হলো। তোমরা কোরবানী করলে, তারপর ইহ্রাম খুলে ফেললে মস্তকমুণ্ডন অথবা মস্তকের কেশকর্তনের পর। সকল কিছুই তোমরা সম্পন্ন করলে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে। তাঁর এই স্বপ্নটি যথাসময়ে বাস্তবরূপ লাভ করবেই। সুতরাং তোমরা এ বছরে ওমরা করতে পারলে না বলে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। কেননা আল্লাহ্ যা জানেন, তা তোমরা জানো না। তাই তিনিই কেবল জানেন, কখন কীভাবে বিকাশ ঘটাতে হবে সত্যের, বিজয়ের, সাফল্যের। তাছাড়া অত্যাসন্ন আর একটি মহাবিজয়ের শুভসংবাদ তো তিনি ইতোমধ্যে দিয়েছেনই। তিনিই তাঁর রসুলকে পথনির্দেশ করে থাকেন এবং তাঁকে সত্য ধর্মাদর্শসহ তো প্রেরণ করেছেন তিনিই। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি অন্য সকল ধর্মাদর্শের উপরে ইসলামকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করাবেন। আরো শোনো, সাক্ষী হিসেবে যেহেতু আল্লাহ্ই যথেষ্ট, সেহেতু তোমরা তাঁর সাক্ষ্যকেই চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করো এবং অনর্থক মনঃক্ষুণ্ন না হয়ে প্রশান্তচিত্তে জীবন যাপন করো এমতো বিশ্বাসানুসারেই। মুজাহিদ, বায়হাকী প্রমুখ বলেছেন, হুদায়বিয়ার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ও।

'সদাক্ব' অর্থ যথাযথ। 'লাক্বদ সদাক্ব' বলে কথাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে অতীত কালের ক্রিয়াসহযোগে, যদিও স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হয়েছে ভবিষ্যতে। এরকম করা হয়েছে কেবল ঘটনাটির নিশ্চিতার্থকতা বোঝাতে। যেনো স্বপ্নটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েই গিয়েছে।

জাওহারী বলেছেন, 'সিদক্ব' (সত্য) ও 'কিজ্ব' (মিথ্যা) যেমন কথায় ব্যবহৃত হয়, তেমনি ব্যবহৃত হয় কাজেও। কোনো সংবাদ ঘটনার অনুকুল হলে, তাকে বলা হয় সত্য, না হলে বলে মিথ্যা। তেমনি কোনো কর্ম ঘটনানুগ হলে তা হয় সত্য, আর এর ব্যত্যয় ঘটলে তা হয় মিথ্যা। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা এমন লোক, যারা আল্লাহ্র কাছে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে নিয়েছে, দেখিয়েছে সত্য করে'। এমতাবস্থায় এখানকার 'আররুইয়া' শব্দটি 'রসুলাহু' শব্দ থেকে হবে পূর্ণ অনুবর্তী। অর্থাৎ স্বপ্নটি সত্য করে দেখিয়েছেন। মর্মার্থ— রসুলকে দেখিয়েছেন সত্যবাদীরূপে। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'রসুলাহু' শব্দটির মূল রূপ ছিলো 'লিরসুলিহী'। জের প্রদানকারী অব্যয় লোপ করে হয়েছে রসুলাহু।

জাওহারী আরো লিখেছেন, 'সদাক্ব' কখনো দুই কর্মপদবিশিষ্টও হয়। যেমন 'লাক্বদ সদাক্বকুমুল্লহু ওয়া'দাহু'। এখানে 'কুম' প্রথম কর্মপদ এবং দ্বিতীয় কর্মপদ হচ্ছে 'ওয়া'দাহু'। এমতাবস্থায় এখানে 'রসুলাহু' ও 'আররুইয়া' হবে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় কর্মপদ। বায়যাবী লিখেছেন, বক্তব্যটির অর্থ— আল্লাহ তাঁর রসুলের স্বপ্নকে সত্য করে দিয়েছেন। 'মাদারেক' রচয়িতা লিখেছেন, এখানে জের প্রদানকারী অব্যয়কে লোপ করার পরে জের প্রদত্তকে করা হয়েছে কর্মপদ।

'বিল হাক্ব' অর্থ যথাযথভাবে, গভীর প্রজ্ঞার সঙ্গে। আর সেই গভীর প্রজ্ঞা হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাসকে শিথিল বিশ্বাস থেকে পৃথকরূপে প্রদর্শন। এরকমও হতে পারে যে, এখানকার 'বিল হাক্ব' এর 'বা' হচ্ছে শপথপ্রকাশক। অর্থাৎ শপথ সত্যের। আল্লাহ্রও এক নাম 'হাক্ব' এবং 'হাক্ব' (সত্য) বলা হয় বাতিলের (মিথ্যার) বিপরীত হওয়াকেও।

'আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে'— ইবনে কীসান বলেছেন, কথাটি রসুল স. এর। আল্লাহ্ এখানে কথাটি উদ্ধৃত করেছেন। রসুল স. তাঁর সাহাবীগণকে এভাবেই বিবৃত করেছিলেন। আবার এরকমও হতে পারে যে, কথাটি ছিলো স্বপ্নের ফেরেশতার কথা। আর এখানে আল্লাহ্ তা উদ্ধৃত করেছেন আল্লাহ্।

'ইনশাআল্লাহ্' অর্থ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। 'ইন্' (যদি) অব্যয়টি ব্যবহৃত হয় সন্দেহজনক বাক্যে। কিন্তু এখানে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহ্র প্রতি আদব প্রদর্শনার্থে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে সতত স্বাধীন অভিপ্রায়ধারী সে কথা বোঝাতে। কিন্তু কথাটি এখানে নিশ্চিতার্থক। এমতো আদব প্রদর্শনের জন্য অন্য এক আয়াতে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। যেমন 'ইন্শাআল্লাহ্' উচ্চারণ ব্যতিরেকে আপনি এরকম বলবেন না যে, আমি এটা আগামীকাল করবো'। হজরত আবু উবায়দা বলেছেন, 'ইন্' এখানে শর্তসূচক নয়। বরং 'ইন্' এখানে ব্যবহৃত হয়েছে 'ইজ্' (স্থান-কাল) অর্থে। যেনো বলা হয়েছে— যখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন।

হোসাইন ইবনে ফজল বলেছেন, এখানে 'ইন' ব্যবহৃত হয়েছে তার আসল অর্থেই। অর্থাৎ 'ইন' এখানে সম্ভাব্য। কেননা দর্শিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছিলো দীর্ঘ এক বছর পরে, আর ওই বছরেই রসুল স. পাড়ি দেন অনন্তধামের দিকে। এমতাবস্থায় কথাটির অর্থ দাঁড়াবে— তোমরা প্রত্যেকে 'ইনশাআল্লাহ্' মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে।

'মুহাল্লিক্বীনা রুউসাকুম ওয়া মুক্বস্সিরীন' অর্থ তোমাদের কেউ কেউ মস্তকমুণ্ডন করবে, আর কেউ কেউ করবে কেশ কর্তন। 'তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না' কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে নিঃশংক থাকার গুরুত্ব। অথবা বাক্যটি একটি পূর্ণ বাক্য ও ভবিষ্যৎকালবোধক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর কখনো তোমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে না। 'আল্লাহ্ যা জানেন, তোমরা তা জানো না' অর্থ বিজয় বিলম্বিত করার প্রকৃত রহস্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে আল্লাহ্ই কেবল জানেন; তোমরা তা জানো না।

'সত্য দ্বীন' অর্থ দ্বীন ইসলাম। 'আবার সমস্ত দ্বীনের উপর' অর্থ অন্যান্য ধর্মগুলোর উপর, যেগুলো একদা বলবৎ ও কার্যকর ছিলো। অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত পূর্ববর্তী ধর্মগুলোকে রহিত করে সর্বশেষ ধর্মমত ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই অবতারিত হয়েছে শেষোক্ত ধর্মমতটি। আর 'কাফাবিল্লাহি শাহীদা' অর্থ আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। অর্থাৎ মক্কাবিজয়ের শপথ সত্য হওয়া সম্পর্কে, অথবা মোহাম্মদ মোস্তফা স. যে আল্লাহ্র সত্য রসুল— সে সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কথাটি গুরুত্ব আরোপ করছে বিশেষ করে মসজিদে হারামে প্রবেশ করার বিষয়টিকেই।

শেষোক্ত আয়াতে (২৯) বলা হয়েছে— 'মোহাম্মদ আল্লাহ্র রসুল ঃ তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে; তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এরূপই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় নবকিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফেরদের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের'।

এখানে 'তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর' অর্থ শেষ রসুলের সাহাবীগণও তাঁদের রসুলের মতোই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি ইমানের ব্যাপারে নিরাপোষ। বলা বাহুল্য, এমতো কঠোরতা আল্লাহ্তায়ালার অভিপ্রেত। এক আয়াতে এরকম কঠোরতার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। যেমন 'হে আমার নবী! সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী ও কপটাচারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন এবং তাদের উপর

বলপ্রয়োগ করুন'। অন্যত্র এরশাদ করেছেন 'আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি আপনার মনে যেনো মমতার উদ্রেক না হয়'। আরো বলেছেন 'তোমাদের মধ্যে যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূত'।

'নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল' অর্থ রসুল স. এর প্রতি তীব্র ভালোবাসার কারণে তাদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে গভীর মমত্ববোধ। প্রিয়জনের প্রিয়জন তো প্রিয়জনই হয়ে থাকে। হাদিসে কুদসিতে এসেছে মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ বলবেন, আমার শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাবে যারা নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আশ্রয় দান করবো আমার অনুগ্রহের ছায়ায়। হজরত আবু হোরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন মুসলিম। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয় নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে রূঢ়'। বিভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় বলে, সাহাবীগণ একে অপরের প্রতি পোষণ করতেন শক্রতা ও বিদ্বেষ। তাদের ভাগ্যে জুটুক অপমানের বোঝা। আলোচ্য আয়াত তাদের অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধের দলিল।

'রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে' অর্থ তারা নামাজে মশগুল থাকতে ভালোবাসে। কেননা হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, নামাজ মুমিনগণের মেরাজ। 'আল্লাহ্র অনুগ্রহে ও সন্তুষ্টি কামনায়' অর্থ তারা নামাজে মশগুল থাকতে ভালোবাসে আল্লাহ্র উপহার জান্নাত ও মহাউপহার দীদারের আশায়।

'তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে' অর্থ মহাবিচারের দিবসে তাঁদের মুখমণ্ডলে নূর চমকাতে থাকবে, যাতে করে সর্বসমক্ষে সুস্পষ্ট হবে যে, তাঁরা সেজদা করতে ভালোবাসতেন এবং সেজদা করতেন বেশী বেশী করে। আতা ইবনে আবী রেবাহ এবং রবী ইবনে আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, যারা নামাজ পড়তে পছন্দ করে, তাদের চেহারা পৃথিবীতেই জ্যোতির্ময় হয়। শাহর ইবনে হাওশাব বলেছেন, পরকালে তাদের ললাটদেশ হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল। কেউ কেউ বলেছেন, 'সী-মা' (লক্ষণ) অর্থ এখানে বিশেষ নিদর্শন। অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতার সৌন্দর্য, অথবা বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। ওয়ালেবির বর্ণনায় হজরত ইবনে আব্বাসের এরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মুজাহিদও এরকম বলেছেন। জুহাক বলেছেন, তাঁদের চেহারা হলুদাভ ছিলো রাত জেগে নামাজ পাড়ার কারণে।

হাসান বলেছেন, এখানে 'লক্ষণ' অর্থ তাদের চেহারা এমন ছিলো যে, দেখলে মনে হতো অসুস্থ, প্রকৃত প্রস্তাবে অসুস্থ ছিলেন না।। ইকরামা এবং সাইদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, এর অর্থ তাদের কপালে ছিলো মাটির দাগ। আবুল আলিয়া বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে— তাঁরা অধিকতর আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশ করার জন্য মাটির উপরেই সেজদা করতেন। কাপড় বা জায়নামাজের উপরে সেজদা করতেন না।

'তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইঞ্জিলেও তাদের বর্ণনা এরূপই' অর্থ শেষে রসুলের সাহাবীগণের এ সকল গুণাবলী ইতোপূর্বে অবতারিত তওরাত

শরীফ ও ইঞ্জিল শরীফেও এভাবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাগবী লিখেছেন, এখানে 'ফীত্ তাওরাত' এর পরে পড়বে যতিচিহ্ন। এরপরে শুরু হয়েছে নতুন বাক্য। এভাবে বক্তব্যটি দাঁড়িয়েছে— আর ইঞ্জিলে তাদের প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে ঃ তারা যেনো

একটি চারাগাছ, যা থেকে উদ্‌গত হয় নবকিশালয়, তারপর এক সময় তা হয় দৃঢ় ও পরিপুষ্ট এবং শেষে তা দাঁড়িয়ে যায় স্বকাণ্ডের উপরে সুস্থিরভাবে, যা দেখে তার কৃষক হয় আনন্দিত। এভাবেই আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণকে করেন শুভ, শুভ্র ও সমৃদ্ধ, যার ফলে কলুষ অন্তরবিশিষ্ট সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে।

বিষয়টি রীতিসম্মত না হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, তওরাতের সঙ্গে ইঞ্জিলের বিবরণ হবে পরস্পরসম্পৃক্ত। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণের এ সকল গুণাবলী বিবৃত হয়েছে তওরাত ও ইঞ্জিল উভয় গ্রন্থে। এমতাবস্থায় নতুন বাক্য শুরু হবে 'কা যার্‌ই'ন' থেকে। এরকমও হতে পারে যে, 'জালিকা' (এইরূপ) এখানে ইঙ্গিতময়তা এবং 'কা যার্‌ই'ন' থেকে শুরু হয়েছে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা।

'শাত্বআহু' বলে বীজের অভ্যন্তর থেকে সর্বপ্রথম উদগত অংকুরকে। 'ফাস্‌তাগ্‌লাজা' অর্থ পরিপুষ্ট। আর 'ইউ'জ্বিবুয্ যুর্‌রাআ' অর্থ চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। উভয় বর্ণনাতে এখানে সাহাবীগণের গুণবত্তাই বর্ণিত হয়েছে। প্রথম উপমা সমগ্র উম্মতের জন্য শান্তি। কেননা এর অন্তর্ভূত হয়েছেন এই উম্মতের আউলিয়াগণও। কিন্তু দ্বিতীয় উপমার অন্তর্ভূত রয়েছেন কেবল সাহাবীগণই।

আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে এককভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেছেন। তারপর তৎসঙ্গে মিলিয়েছেন তাঁর প্রিয়ভাজন সহচরবৃন্দকে যেমন কোনো কৃষক জমিতে বৃক্ষরোপন করে ক্রমাগত দেখে দেখে আনন্দিত হতে থাকে যে, উত্তরোত্তর এই বৃক্ষের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এভাবে একে একে এসেছেন হজরত আবু বকর, হজরত আলী, হজরত বেলাল। তাঁদের পরে হজরত ওসমান, হজরত তালহা, হজরত যোবায়ের, হজরত সা'দ' হজরত সাঈদ, হজরত হামযা, হজরত জাফর প্রমুখ। এভাবে চল্লিশতম ক্রমিকে যুক্ত হন হজরত ওমর। শুরুতে ইসলাম ছিলো কচি কিশলয়ের মতো দুর্বল, অথচ সম্ভাবনা-উন্মুখী ওই সতেজ উন্মেষকে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা চিরতরে ধূলিসাৎ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। কিন্তু যা আল্লাহ্‌র দয়া ও সাহায্যপুষ্ট, তাকে মুছে ফেলতে পারে কে? ইসলামের ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও। মুহাজির ও আনসারগণ মিলে ইসলাম রূপ বৃক্ষকে ক্রমশঃ করতে থাকেন সুদৃঢ় ও পরিপুষ্ট। রসুল স. এর মহাতিরোভাবের পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই তাঁরা এ বৃক্ষকে পরিপুষ্ট করেন নিজেদের রক্ত দ্বারা সিঞ্চন করে। তাঁর মহাপ্রস্থানের পরেও তাঁরা এ সিঞ্চনকর্ম প্রবহমান রাখেন। বিশেষ করে এ বৃক্ষকে সতেজ ও সফল রাখার চেষ্টা করা হয় হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরের খেলাফতকালে। এভাবেই ক্রমে ক্রমে এই বৃক্ষ বিস্তৃত হয়েছে দেশে দেশে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে। ইসলামের এমতো পরিণতি ও পূর্ণত্ব

সম্পর্কে আল্লাহ্ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি সমাপ্ত করলাম আমার অনুগ্রহায়ন এবং ইসলামকেই পছন্দ করলাম তোমাদের আচরিত ধর্মাদর্শরূপে'।

রসুল স. বলেছেন, আমার উম্মত কখনো ভ্রষ্টতার উপরে ঐকবদ্ধ হবে না। তিনি স. আরো বলেছেন, আমার উম্মতের একটি অংশ চিরকাল আল্লাহ্‌র বিধানকে সমুন্নত রাখবে। কারো সাহায্যহীনতা, অথবা বিরুদ্ধাচরণ তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। বলাবহুল্য, এমতো বিশেষত্বের ক্ষেত্রে সাহাবীগণই সর্বাগ্রগামী। পরবর্তীদের কেউই তাঁদের মর্যাদায় কখনো পৌঁছতে পারবে না। রসুল স. বলেছেন, আমার সহচরগণকে তোমরা মন্দ বোলো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, তবু সে আমার কোনো সাহাবীর অর্ধ সের যব দান করার সমান পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস থেকে ইমাম আহমদও এরকম বর্ণনা করেছেন।

রসুল স. আরো বলেছেন, আমার সাহাবীগণ যে দেশে সমাধিস্থ হবে, মহাবিচারের দিবসে সেই দেশের জান্নাতবাসীগণের জন্য তাকেই বানানো হবে অগ্রণী ও জ্যোতি। এরকম বর্ণনা করেছেন হজরত বুরাইদা থেকে তিরমিজি। সাহাবীগণের মধ্যে আবার এই সোহবতের বরকত ও মর্যাদার তারতম্যও রয়েছে। যেমন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর এবং প্রথম দিকের সাহাবীগণ ইসলামের সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন অনেক বেশী। তাঁরা ছিলেন পরবর্তী সময়ের সাহাবীগণ অপেক্ষা রসুল স. এর অধিক সংসর্গধন্য। তাঁদের মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয়েছে এই নিরিখেই। এক আয়াতে তাই তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তোমাদের মধ্যে যে মক্কাবিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে অন্যদের মতো নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে পরে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের অঙ্গীকার প্রদান করেছেন'। আর এক আয়াতে বলা হয়েছে 'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারগণের মধ্যে প্রবীণ এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রীত'। আমি আমার 'আস সাইফুল মাসলুল' গ্রন্থে বিশেষ ও সাধারণ সাহাবীগণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। যে সকল হাদিসে তাঁদের গুনাবলীর কথা এসেছে, সেগুলো সেখানে উল্লেখ করেছি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে।

বাগবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌পাক ইঞ্জিল শরীফে সাহাবীগণ সম্পর্কে বলেছেন— শুরুতে তারা হবে স্বল্প সংখ্যক। তারপর ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকবে তাদের। কাতাদা বলেছেন, রসুল স. ও তাঁর সাহচর্যধন্যগণের সম্পর্কে ইঞ্জিলে বলা হয়েছে— তাদের বাড়-বাড়ন্ত হবে জমির ফসলের চারার মতো। তারা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং নিষেধ করবে মন্দ কাজ করতে। কারো কারো কাছে এখানকার 'চারাগাছ' অর্থ রসুল স. স্বয়ং এবং সেই গাছের ফুলকলি হচ্ছেন তাঁর অনুচরবর্গ ও অন্যান্য বিশ্বাসীগণ।

মুবারক ইবনে ফজল সূত্রে হাসান বলেছেন, এখানে 'আল্লাজীনা মাআ'হু' অর্থ হজরত আবু বকর, 'আশিদ্দাউ আ'লাল কুফ্ফার' অর্থ হজরত ওমর, 'রুহামাউ বাইনাহুম' অর্থ হজরত ওসমান 'তারাহুম রুক্কাআ'ন সুজ্জাদান' অর্থ হজরত আলী এবং 'ইয়াব্তাগুনা ফাদ্বলাম মিনাল্লহি ওয়া রিদ্বওয়ানা' এর অন্তর্ভূত আশারা মুবাশ্শারাগণ (দশজন বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী)। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে সাহাবীগণের যে সকল গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল গুণাবলীর অগ্রনায়ক হচ্ছেন আ'শায়েরা মুবাশ্শারাগণ। অর্থাৎ রসুল স. একটি বীজ বপণ করেছেন, হজরত আবু বকর ঘটিয়েছেন তার অঙ্কুরোদ্গম। হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব তাকে শক্তি যুগিয়েছেন এবং হজরত আলীর সাহায্যে সে গাছ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে শক্ত কাণ্ডের উপর। 'মাদারেক' রচয়িতা লিখেছেন, হজরত আবু বকরের কারণে ইসলাম বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম ঘটতে পেরেছে। বাগবী লিখেছেন, হজরত ওমর ইসলাম গ্রহণের পরক্ষণেই বলেছেন, এখন থেকে আল্লাহ্র ইবাদত আর গোপনে করা হবে না।

এখানকার 'লিইয়াগীজা বিহিমুল কুফ্ফার' (কাফেরদের প্রতি কঠোর) এর 'বিহিম' সর্বনাম দ্বারা 'আল্লাজীনা মাআ'হুম' (যারা তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন) কে বুঝায় কিংবা অর্থের দিক দিয়ে এর দ্বারা 'শাত্বআহু' (ফসলের ক্ষেত) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা এখানে 'যা থেকে উদ্গত হয় কিশলয়' অর্থ এখানে তাঁরা, যাঁরা ইমান এনেছিলেন ইসলামের সূচনালগ্নে। এভাবে তাঁদেরকে এবং পরবর্তীকালে সকল সাহাবীগণকেই আল্লাহ্ 'কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভুতিশীল' এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি দান করেছিলেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, এখানে যারা সাহাবীবিদ্বেষী, তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে 'এভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন'।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল বর্ণনা করেছেন, রসুল স. আজ্ঞা করেছেন, আমার সাহাবীগণ সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো! আল্লাহ্কে ভয় করো! আমার পৃথিবীত্যাগের পর তোমরা তাদেরকে তিরস্কারের লক্ষ্যবস্তু কোরো না। যে তাদেরকে ভালোবাসবে, সে তাদেরকে ভালোবাসবে আমাকে ভালোবাসে বলেই। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে, কষ্ট দিবে, সে কষ্ট দিবে আমাকেই। আর যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাকে অচিরেই পাকড়াও করবেন। তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি দুস্প্রাপ্য।

সবশেষে বলা হয়েছে— 'ওয়াআ'দাল্লাহুল লাজীনা আমানু ওয়া আ'মিলুস্ সলিহাতি মিনহুম মাগফিরাতাঁও ওয়া আজ্বরন আ'জীমা' (যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের)। অর্থাৎ বিশ্বাসী ও পুণ্যকর্মশীল যারা তারা আল্লাহ্র মার্জনাভাজন ও প্রীতিধন্য। এটা হচ্ছে তাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্র অনুগ্রহস্নাত প্রতিশ্রুতি। এখানে 'মিনহুম' এর 'মিন' বর্ণনামূলক। অর্থাৎ এখানে 'হুম' ও 'বিহিম' সর্বনাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে সাহাবীগণকেই। আর 'মাগফিরাতান' (ক্ষমা) ও 'আজ্বরন' (মহা পুরস্কার) শব্দ দু'টোতে সংযুক্ত 'তানভীন' মর্যাদাপ্রকাশক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে এখানে বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়েছে সাহাবীগণের অনন্যসাধারণ মর্যাদার।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য এই যে, সাহাবীগণ প্রত্যেকেই ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ এবং সত্যাধিষ্ঠিত। আর সকলেই ছিলেন আল্লাহ্র মার্জনাধন্য ও সন্তোষভাজন।

দশম খণ্ড সমাপ্ত